বর্ষ শেষ ও নববর্ষ।

পুরাতন বর্ষের মৃত্যু।

(১)

ঢং ঢং টিং টিং——যামিনী পোহায় ;
আয়ু তার শেষ হ'ল, আত্মা বাহিরায়!
আহা বুড়া ছিল বেশ! দোষে গুণে ছিল!
কত লোকে ওর সাথে হাসিল কাঁদিল!
শশাঙ্ক দিগন্ত তলে, বিষণ্ণ অন্তরে,
ঢালিছে মলিন জ্যোতি চিতার উপরে!
অকস্মাৎ ফুঁকে আহা! আলোকে অশোকে
ছেড়ে গেল চিতা—বুড়া গেল পরলোকে!
নাচিছে সংক্রান্তি বুড়া, দেমাগে জ্বলিয়া
করিছে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, মন্ত্র উচ্চারিয়া!
এস এস, আমরাও মৃত জনে স্মরি
ফেলি দুটি অশ্রুবিন্দু চিতার উপরি!
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল,
কত লোকে ওর সাথে হাসিল কাঁদিল!

(২)

বিপুল সাম্রাজ্য ছিল, অশেষ ঐশ্বর্য্য
সব লুপ্ত একে একে, বুড়ার কি ধৈর্য্য!
বারটি পুত্রকন্যা ছিল, দ্বাদশটি নাতি ;
কেহ শেষে না রহিল বংশে দিতে বাতি!
বুড়া বয়সের পুত্র আছিল "বসন্ত",
তারেও হরিল হায় করাল কৃতান্ত!
তাই সে ভীষ্মের মত, "ইচ্ছা মৃত্যু" ডাকি!
চলি গেল ; আমা সবাকারে দিয়ে ফাঁকি!
আমরা নশ্বর নর ; মহত্ত্বের কায়া
গ্রাসে যদি কালদৈত্য, বিষাদের ছায়া
পড়ে আমাদের চক্ষে! এস সবে মেলি
ঢালি ওর মৃত দেহে অশ্রুর অঞ্জলি!
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল,
কত লোক ওর সঙ্গে হাসিল কাঁদিল!

(৩)

আহা! ওর দোষ নাই হায় গো জননি,
তিন বছরের কন্যা, নয়নের মণি,
হারালে আশ্বিনে ; তব নয়নের শূল
তাই ও কি ? কে জননি কোরো না গো ভুল!
চৈত্রমাসে, জন্মদিনে, হাসিয়া কাঁদিয়া,
ধরিলে নবকুমার অঙ্ক বিদারিয়া!
বুড়ার আমোদ কত ছেলেদের সাথে,
সূতিকা গৃহের দ্বারে, "সর্প" লয়ে হাতে,
কত রঙ্গ করেছিল, কেন তবে রোষ?
ও'ত অবস্থার দাস, ওর নহে দোষ!
অন্নপ্রাশনের দিন দেখিবার সাধ
ওরো ছিল ; বিধি কিন্তু সাধিল গো বাদ!
আজি বড় সুখে যারা, তারো তরে শোক
করি মোরা ; ওতো ছিল আপনার লোক!
এস তবে, আমরাও মৃত জনে স্মরি,
ফেলি দুটি অশ্রুবিন্দু চিতার উপরি!
আহা বুড়া ছিল বেশ, দোষে গুণে ছিল,
কত লোকে ওর সঙ্গে হাসিল কাঁদিল!

নববর্ষের অভিষেক।

(১)

সারথী চালায় রথ ; রথের ঘর্ঘর
ওই শোন, ওই এল নব বংশধর,
অনন্তের—নববর্ষ, নবীন ভূপতি,
মাস, দণ্ড, ঋতু, পল, তাঁহার সংহতি।
ওই এল—খুলে গেল পূর্ব্বাশার দ্বার!
একি দৃশ্য! জ্যোতিঃ খেলে আলোক ছটার!

(২)

দিব্য তেজ, দ্বাদশটি অশ্ব ছিল জোড়া
পুরের তোরণ দ্বারে [illegible] রৈল খাড়া
মাঝে না লাগাম রাশ, মাঝে নাহি [illegible],
দেখিছ ও যোটি কটি? সর্ব্ব পুরোভাগে
দাঁড়াইয়া, খুর দিয়া বিদারে মেদিনী,
"বৈশাখ" উহার নাম অশ্ব শিরোমণি।

(৩)

আহা কি সুন্দর [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৪)

দিগঙ্গনা, [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
কোন বালা [illegible] মালা,
কাঁদিয়ে কাহারে দিল [illegible]!

(৫)

প্রভাতে মঙ্গল গায় পিক পিকবধূ,
এস, এস নববর্ষ, তব সুধাবিন্দু
ছড়াইবারে, আমরা ও যত নর নারী,
এ প্রভাতে, দাঁড়াইয়া আছি, সারি সারি!
ভালে তব টীকা দিতে "নবপঞ্জী" কার
আছে দাঁড়াইয়া, ওই ব্রাহ্মণ কুমার!

(৬)

অভিষেক হোল শেষ—ওহে নব রাজা,
পুরাতন বরষের পুরাতন প্রজা
ছিনু মোরা ; হেরি তব সুন্দর আনন,
নব আশা নবোৎসাহে ভরিল জীবন!
দীন [illegible] কবি আমি, দুঃখের সংসারে,
আনিত [illegible] সুর পুরানো সেতারে!

(৭)

সম্রাট নীতির [illegible] হল তব দীক্ষা ;
শোন, শোন, [illegible] রাজাদের শিক্ষা ;
কঙ্কাল [illegible] বিকট রাক্ষস
দুর্ভিক্ষ [illegible]
[illegible] কর প্রতিকার,
[illegible] রাক্ষসেরে করিয়ে সংহার।

(৮)

[illegible] বিশাল [illegible]
[illegible] মিটাইয়া দাও
[illegible]—"[illegible]" লেখা
আকাশে উড়াইও তব রথের পতাকা!
দিব্য [illegible] ভারতীর সারস্বত কুঞ্জে
বসাও ফুল কুসুমে মধুকর পুঞ্জে ;

(৯)

সেই স্বর্ণময় কুঞ্জে, রবি জ্যোৎস্নানাথ
ঢালুক্ গো দিবারাত্রি আলোক প্রপাত!
সরলা বালার আশা পাদপদ্ম চুমে
সাহিত্য অশোক তরু, কুসুমে কুসুমে
থাক্ ভরি ; গান গাক্ দিগঙ্গনা বালা—
আমিও সাজিয়া লই দেশরা বেহালা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল।

সূচনা।

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত "বেলগ্রাম" নিবাসী গোবিন্দ ভট্টের নিকট বালবোধ অক্ষরে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থের তিনটি মাত্র পত্র, এবং তাহাতে সমস্তশুদ্ধ ২৪টি পংক্তি। উক্ত গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে :—

"দুষ্টাচার বিনাশায় প্রাদুর্ভূতো মহীতলে।
স এব শঙ্করাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যনায়কঃ ॥
নিধিনাগেভবহ্ন্যব্দে বিভবে শঙ্করোদয়ঃ।
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ ॥
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।
কল্যব্দে চন্দ্রনেত্রাঙ্ক বহ্ন্যব্দে গুহাপ্রবেশঃ।
বৈশাখে পূর্ণিমায়ান্তু শঙ্করঃ শিবতামগাৎ ॥"

সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়ক শঙ্করাচার্য্য দুষ্টাচার বিনাশ জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ৩৮৮৯ কলি গতাব্দে (৭১০ শকাব্দে) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্ট বর্ষে বেদ চতুষ্টয়ে ও দ্বাদশবর্ষে সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ষোড়শ বর্ষে তিনি ভাষ্য রচনা করিয়া দ্বাত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ৩৯২১ কলি গতাব্দে (৭৪২ শকাব্দে) বৈশাখী পূর্ণিমায় তিনি শিবত্ব লাভ করেন।

এই প্রমাণ অবলম্বন করিয়া পণ্ডিত কে, বি, পাঠক মহাশয় প্রচার করেন যে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন; ৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় *।

পাঠক মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুবিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার বলেন যে, "তার্কিককুলশিরোমণি শঙ্করের জন্ম মৃত্যুর অব্দ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।" ইহা বলিয়া তিনি পাঠক মহাশয়ের মতানুমোদন করেন †। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য ও ভারতীয় লেখকগণ অনেকেই সেই মত গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবদ্‌গীতার প্রারম্ভে আমরা ভাষ্যকারের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতেও শঙ্করের আবির্ভাবকাল ৭১০ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য কাশীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ মহাশয় উল্লেখিত প্রমাণ ও তদাবলম্বী মত সমীচীন নহে বিবেচনায় "ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরি" নামক সাময়িক পত্রিকায়

---

* The Indian Antiquary. Vol. XI., P. 174.

† India: What Can It Teach Us? P. 354, & P. 360

"শঙ্করাচার্য্যের সময়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহার কিয়ৎকালান্তে তিনি তৎসম্পাদিত "মুদ্রারাক্ষস" নাটকের উপক্রমণিকায় সেই প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তৈলঙ্গ মহাশয় খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে শঙ্করের আবির্ভাব কাল অবধারণ করিয়াছেন *।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকার মহাশয়, পাঠক ও ম্যাক্সমূলারের প্রচারিত মত অগ্রাহ্য করিয়া খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগ শঙ্করের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন †।

সর্ব্বশেষে মান্দ্রাজনিবাসী পণ্ডিত এন, ভাষ্যাচার্য্য "থিওসফিষ্ট" পত্রিকায় শঙ্করের সময় সম্বন্ধে একটি বিশেষ উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ‡। সেই প্রবন্ধে তিনি শঙ্করের আবির্ভাব কাল খৃষ্টাব্দের পঞ্চমশতাব্দী অবধারণ করিয়াছেন।

আমরা উল্লেখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমূহ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রবাদ সমালোচনা।

১নং প্রবাদ ঃ—

দক্ষিণদেশে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, গোবিন্দ ভট্ট নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বংশীয়া চারিটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে বররুচি, ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে উজ্জয়িনীর অধিপতি সুবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য, বৈশ্য কুমারীর গর্ভে পণ্ডিতপ্রবর ভট্টি, এবং শূদ্র কন্যার গর্ভে ভর্তৃহরি জন্মগ্রহণ করেন। গোবিন্দ ভট্ট বানপ্রস্থাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক গোবিন্দ যোগী আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য এই গোবিন্দ যোগীর শিষ্য; সুতরাং শঙ্কর বিখ্যাত নরপতি বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক।

* Mudrarakshasa : Introduction. P. lii.

† Bhandarkar's Sanskrit Mss. (1882-83) P. 15.

‡ The Theosophist, Vol. XI. Nos. 122, 124 & 125.

উল্লেখিত প্রবাদের সহিত নানা প্রকার অলঙ্কার সংযুক্ত হইয়া থাকে, যথা :—শঙ্করাচার্য্য ভট্টপাদকে তর্ক সংগ্রামে পরাজিত করেন। এই ভট্টপাদ রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম রত্ন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য ৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মিতাক্ষরা নামক টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর শঙ্করের শিষ্য ছিলেন। বিজ্ঞানেশ্বর স্বীয় গ্রন্থ বিক্রমাদিত্যকে উৎসর্গ করেন। সুতরাং মিতাক্ষরা-প্রণেতা উক্ত নরপতির সমসাময়িক। অতএব টীকাকারের গুরু বিক্রমের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে নবরত্নের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রন্থকার আপনাকে নবরত্নের অন্যতম রত্ন কালিদাস বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে; সুতরাং উক্ত গ্রন্থ নিতান্ত অপ্রামাণ্য। ইহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না।

বৌদ্ধগয়ার একখণ্ড শিলালিপির অনুবাদ সার চার্লস্ উইলকিন্‌স্ সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন।* উহা ১০১৫ বিক্রম-সম্বতে লিখিত হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে বিক্রমের নবরত্নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অমরদেব নামক ব্যক্তি সেই নবরত্নের অন্যতম এবং তিনি বিক্রমাদিত্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, ইহা উক্ত প্রস্তর লিপিতে খোদিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে অন্য কোনও রত্নের নাম দৃষ্ট হয় না।

ভট্টপাদ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ শারীরিক ভাষ্যের কোন কোন স্থলে তিনি ভট্টপাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ভট্টপাদ স্বীয় তন্ত্রবার্ত্তিকে কবিচূড়ামণি কালিদাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কালিদাস শঙ্করের বহুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। বিজ্ঞানেশ্বর অদ্বৈতবাদী হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শঙ্করের শিষ্য নহেন। ধারানগরাধিপতি ভোজ, অপরার্ক এবং বররুচি বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী। বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরের উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, তিনি কল্যাণাধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত ছিলেন। কল্যাণাধিপতি চালুক্যবংশীয়দিগের অনেকগুলি তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে চারিজন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথম বিক্রমাদিত্য ৫৯২ শকাব্দ এবং চতুর্থ বা শেষ বিক্রমাদিত্য ৯৯৮ শকাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। সুতরাং বিজ্ঞানেশ্বর ইহার মধ্যবর্ত্তী কালে জীবিত ছিলেন। ধারেশ্বর সুবিখ্যাত ভোজ-নরপতি ৭৮৪ শকাব্দে জীবিত ছিলেন।

৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সম্বৎ-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিতেন; প্রচলিত প্রবাদ ব্যতীত ইহার কোনও রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ডাক্তার ভাউদাজী বলেন, একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন খোদিত লিপিতে বিক্রম সম্বৎ ব্যবহৃত হয়

* Asiatic Researches. Vol. I., P. 243 & P. 244, (2nd Ed.).

নাই *। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্‌সমূলার ও ফারগুসন বলেন, উজ্জয়িনীপতি হর্ষবিক্রমাদিত্য ৫৫০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন। খোদিত লিপি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কুরুক্ষেত্রে শক ও ম্লেচ্ছদিগকে পরাজয় করেন। সেই সময় হইতে সম্বতের উৎপত্তি, অর্থাৎ তাহার ৬০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে একটি দিন স্থির করিয়া সেই ৬০০ বৎসর "হাতের পাঁচ" স্বরূপ রাখিয়া ৫৪৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার গণনা আরম্ভ করা হইয়াছিল †। ডাক্তার ভুলার ও হলটাস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন না। আমাদের বিবেচনায় ম্যাক্‌সমূলার ও ফারগুসনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত নিতান্তই কাল্পনিক ও অশ্রাব্য। কারণ, হর্ষবিক্রমাদিত্যের অভিষেকের পূর্ব্বে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের শাসনকালে মালব দেশে "সম্বত" অব্দ প্রচলিত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি ‡। সুতরাং ম্যাক্‌সমূলার ও ফারগুসন সাহেবের উল্লিখিত প্রমাণহীন অপূর্ব্ব যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত খণ্ড হইয়া যাইতেছে। ম্যাক্‌সমূলার ও ফারগুসনের উল্লেখিত সিদ্ধান্তকে ডাক্তার হলটাস্‌ "A baseless theory" বলিয়াছেন। ৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে জনৈক মালবপতি কর্ত্তৃক যে সম্বতাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

কবিচূড়ামণি কালিদাস খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন বলিয়া যে প্রমাণহীন মত প্রচারিত হইয়াছে, ডাক্তার ভাউদাজী ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের বিবেচনায় ইহাও সমীচীন নহে। কারণ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী সত্যাশ্রয় পৃথিবী-বল্লভ মহারাজের খোদিত লিপিতে কালিদাসের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ¶। উক্ত নরপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সমসাময়িক। দ্বিতীয় পুলকেশী এবং হর্ষবর্দ্ধন শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে কালিদাস প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন। সুতরাং কালিদাস ইহার বহুকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

ভট্টি ও ভর্ত্তৃহরি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জীবিত ছিলেন। গ্রন্থের উপসংহারে ভট্টি বলিয়াছেন, তিনি বল্লভিপতি দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে যে ভট্টিকাব্য প্রচলিত আছে তাহাতে গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীধরের পুত্র এবং নরেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত ভট্টিকাব্যে শ্রীধরসূনু স্থলে "শ্রীধর সেন" শব্দ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে পণ্ডিত ভাষ্যাচার্য্য বলেন, ভট্টি, শ্রীধর সেন নামক বল্লভী নরেন্দ্র দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার মিত্র মহাশয় বলেন,

* Journal Bo. R. A. S. Vol. VIII, P. 242.

† India :—What Can It Teach Us. P. 282, and J. R. A. S. (N. S). Vol. XII. P. 273.

‡ Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III., P. 83.

¶ Indian Antiquary, Vol. VIII., P. 243.

ভট্টি খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন *। কিন্তু ম্যাক্স্‌মুলার ভট্টিকে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর লোক অবধারণ করিয়াছেন †। শ্রীধরসূনু স্থলে "শ্রীধর সেন" স্থির হইলেও তদ্দ্বারা ভট্টির সময়াবধারণ করা নিতান্ত সুকঠিন। কারণ, সুবিখ্যাত বল্লভী রাজবংশে আমরা ৪জন শ্রীধর সেনের দর্শন পাইতেছি। প্রথম শ্রীধর সেন বংশের স্থাপন কর্ত্তা সেনাপতি ভট্টার্কের পুত্র। দ্বিতীয় শ্রীধর সেন, গুহসেনের পুত্র; তিনি ২৫২ হইতে ২৭০ বল্লভী অব্দে (৫৭১—৫৮৯ খৃষ্টাব্দঃ) রাজ্যশাসন করিয়াছিল। তৃতীয় শ্রীধরসেন প্রথম ধরগ্রাহের পুত্র, তিনি ৬২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। চতুর্থ শ্রীধর সেন, ধ্রুবসেনের পুত্র, ইনি ৩২৬ বল্লভী অব্দে (৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসন আরোহণ করেন। এতন্মধ্যে কোন্ শ্রীধর সেন কর্তৃক ভট্টি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় দ্বিতীয় শ্রীধর সেন ভট্টির প্রতিপালক হইতে পারেন, কারণ উল্লিখিত চারি জন শ্রীধর সেনের মধ্যে ইনিই দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন। আমাদের এই অনুমান সত্য হইলে ভট্টি খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ভাগে জীবিত ছিলেন।

পণ্ডিত এন ভাষ্যাচার্য্য বলেন, "ভর্তৃহরি স্বপ্রণীত পাতঞ্জল মহাভাষ্যের "বাক্যপদীয়" নামক টীকায় বসুরাতের শিষ্য বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। এই বসুরাত এবং চন্দ্রাচার্য্য (এক ব্যক্তি না হইলেও) সমসাময়িক বটেন। চন্দ্রাচার্য্য কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাশ্মীরে প্রথমতঃ মহাভাষ্য প্রচার করেন †। অভিমন্যু ৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। সুতরাং ভর্তৃহরি তৎকালে জীবিত ছিলেন।" আমাদের বিবেচনায় অভিমন্যু খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন। কারণ তিনি শককুলজ কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও যষ্কের পরবর্ত্তী নরপতি। এই কনিষ্ক দ্বারা যে অব্দ প্রচলিত হয়, তাহা "শককাল" বা "শকাব্দ" নামে পরিচিত রহিয়াছে। অভিমন্যু সুবিখ্যাত বৌদ্ধ নাগার্জুনের সমসাময়িক সুতরাং শকাব্দের প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে (খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে) তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। চন্দ্রাচার্য্য এবং তাঁহার সমসাময়িক ভর্তৃহরি সেই সময়ের লোক হইতেছেন ‡।

১ নং প্রবাদে যে সকল মহাত্মার নাম এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দ যোগী বররুচি, বিক্রমাদিত্য, ভট্টি, ভর্তৃহরির পিতা হইতে পারেন না। সুতরাং এই প্রবাদ বাক্য নিতান্তই কাল্পনিক বলিয়া পরিত্যাগ করা হইল।

* Notice of Sanskrit Mss. Vol. VI., P. 148.

† India : What Can It Teach Us ? P. 343 & P. 353.

‡ চন্দ্রাচার্য্যের কৃত ব্যাকরণ প্রাচীন কালে সর্ব্বত্র অধীত হইত।

২ নং প্রবাদ ঃ—

কেরল উৎপত্তি গ্রন্থের মতানুসারে ৩৫০১ কলি গতাব্দে (৩২২ শকাব্দে) ভাদ্র মাসের আর্দ্রানক্ষত্রে শঙ্করাচার্য্য ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। কেরল দেশান্তর্গত কালদী বিভাগের কৌপল্লে নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ৩৮ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। চেরুমাল পেরুমাল রাজার শাসনকালে তিনি আবির্ভূত হন। তৎকালে সেই দেশে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল।

কেরল উৎপত্তি গ্রন্থ প্রামাণ্য ইতিহাস নহে। বিশেষতঃ চেরুমাল পেরুমাল নরপতি আবদুল রহিমান সমেরি নামক মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচারক দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মক্কায় গমন করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধি মন্দিরের খোদিত শিলা লিপিতে তাঁহার মৃত্যুকাল ২১৬ হিজরি সাল (৭৬০ শকাব্দ) লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং কেরল উৎপত্তির বর্ণনা বিশ্বাস যোগ্য নহে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, শঙ্করের পূর্ব্বে ভারতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ ছিল। তিনি হিন্দুদিগকে ৭২ বর্ণে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনা দ্বারাই এইগ্রন্থ নিতান্ত অপ্রামাণ্য স্থির হইতেছে।

৩ নং প্রবাদ ঃ—

"কোঙ্গু দেশরাজ কাল" গ্রন্থের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য রাজা ত্রিবিক্রম দেবের শাসন কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত নরপতিকে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

ত্রিবিক্রমদেব স্কন্দপুরের রাজা। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞবর ডাউসন অবধারণ করেন যে, ত্রিবিক্রমদেব নামে দুইজন নরপতি ছিলেন। প্রথম ত্রিবিক্রমদেব খ্রীষ্টাব্দের ৬ষ্ট শতাব্দীতে এবং দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমদেব খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। পণ্ডিত-প্রবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্দারকার মহাশয় কয়েক খানা তাম্রশাসন অবলম্বন করিয়া বলেন, প্রথম ত্রিবিক্রম দেব খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে ও দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমদের খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। বিজ্ঞবর ফ্লিট সাহেব ভান্দারকার মহাশয়ের লিখিত তাম্র-লিপিগুলিকে কূট (জাল) নির্ণয় করিয়াছেন *। সুতরাং ৩ নং প্রবাদ দ্বারাও শঙ্করের আবির্ভাব কাল নির্ণয় হইতে পারে না।

৪ নং প্রবাদ ঃ—

তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সমূহ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বাবু শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় সুবিখ্যাত বৌদ্ধদার্শনিক পণ্ডিত এবং মাধ্যমিক মতপ্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুনের যে জীবন-

* Indian Antiquary. Vol. XII., P. 111.

চরিত প্রকাশ করিয়াছেন *। তাহাতে লিখিত আছে যে শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত ধর্ম্মমত (অদ্বৈতবাদ) খণ্ডন করিয়া নাগার্জ্জুন বৌদ্ধ প্রাবাদ সংস্থাপন করেন।

শককুলতিলক মহারাজ কনিষ্কের শাসনকালে বৌদ্ধদিগের চতুর্থ মহাসঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত মহাসঙ্ঘে স্থবির শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা পার্শ্বের প্রধান শিষ্য অশ্বঘোষ। অশ্বঘোষের শিষ্য নাগার্জ্জুন। মহাত্মা নাগার্জ্জুন কনিষ্কের কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠ হইতেছেন। ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অভিমন্যু, কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও যষ্কের পরবর্ত্তী নরপতি এবং নাগার্জ্জুন তাঁহার সমসাময়িক। নাগার্জ্জুন খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে জীবিত ছিলেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। এই বাক্য বিশ্বাস করিবার অন্য কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৫ নং প্রবাদ :—

নেপাল দেশীয় ইতিহাসের মতে সূর্য্য (লিচ্ছবি) বংশীয় নরপতি বৃষদেবের রাজ্য-শাসন কালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমন করিয়া বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করেন। উক্ত ইতি-হাস গ্রন্থে সূর্য্যবংশীয় (লিচ্ছবি) নরপতিদিগের রাজ্যকাল যেরূপ লিখিত হইয়াছে কাল্পনিক অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক যুক্তি অনুসারে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, বৃষদেব ৪০০ শকাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন, এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রামাণ্য না হইলে তাহা এককালে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না; ইহা আমরা "লিচ্ছবিরাজগণ" প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজীর মতে বৃষদেব ১৮২ শকাব্দে জীবিত ছিলেন †। কিন্তু বিজ্ঞবর ফ্লিট সাহেবের মতে বৃষদেব ৬৩০—৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যশাসন করিয়াছেন ‡। আমাদের গণনা অনুসারে বৃষদেব খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে জীবিত ছিলেন। বৃষদেবের শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য নেপালে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া পণ্ডিত প্রবর তৈলঙ্গ মহাশয় ও এই গ্রন্থকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

নেপালের ইতিহাসলেখক যাহা বলিয়াছেন, সেই বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার কয়েকটি কারণ আছে, সেই সকল কারণ যথা স্থানে উল্লেখ করা যাইবে।

৬ নং প্রবাদ :—

এই প্রস্তাবের আরম্ভে বেলগ্রাম নিবাসী গোবিন্দ ভট্টের গৃহস্থিত যে ক্ষুদ্র গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই গ্রন্থের মতে শঙ্কর ৭১০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ এবং ৭৪২ শকাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

---

* Life and Legend of Nagarjuna (J. A. S. B. Vol. LI., P. 115).

† Inscriptions from Nepal. Page 52.

‡ Corpus Inscription. Indicarun, Vol. III., P. 189 ûm.

উক্ত গ্রন্থে মাধবাচার্য্যকে মধু দৈত্যের পুত্র বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা যে উক্ত গ্রন্থ খানি কেবল অসার প্রতিপন্ন হইতেছে এমত নহে, মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী কোন হিংসা-পরায়ণ অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীদিগের কুৎসাকীর্ত্তন করিবার জন্য এই গ্রন্থরচনা করিয়াছিলেন *। মাধবাচার্য্য খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং উক্ত গ্রন্থ তৎপরবর্ত্তী হইতেছে। এবম্প্রকার অসার গ্রন্থের প্রতি নির্ভর করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সময়াবধারণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

৭ নং প্রবাদ :—

দাবিস্থানের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য ১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হন। দাবিস্থান. পারসী গ্রন্থ, বিশেষ প্রত্যয়োপযোগী নহে।

উল্লেখিত প্রবাদ বাক্যসমূহ দ্বারা শঙ্করের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু ৫ নং প্রবাদ বাক্য যে সত্যের প্রতিবিম্বযুক্ত তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

রুধিরোৎসব।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে বাঙ্গলার জমীদারদের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। সুলতান সাহ সুজা সম্রাট সাহাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন—তাঁহার মন্ত্রণাদাতারা সরকার হইতে বাঙ্গালা জমীদারদের উপর এক রুবকারী জারি করিয়াছেন—ইহাতেই যত বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে।

সুজার রুবকারী বা আদেশপত্র এই, বাঙ্গলার প্রধান প্রধান জমীদার ও সামন্তবর্গের প্রতি মহাপ্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের ও ভারতের একমাত্র সম্রাটের মহিমান্বিত পুত্র সুলতান সাহ সুজার এই আদেশ যে সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে বঙ্গদেশের অধীশ্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন। সাহ সুজার ইচ্ছা যে দেশের

---

* পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য বলেন, "If a work of only three pages and 24 lines, two of which contain a fiction and the rest uncertainty, is to be seriously considered as an authority, we cannot see any reason why Manimanjari of the Dwaitees, which speaks of Sri Sankaracharya as a Rakshasa (or demon) of Kaliyug should not be considered so too. Yet that worthless MS. is seriously considered, and the date of Sankaracharya, deduced from it by Professor Max Muller, Dr. Tiele and M. Barth.

সমস্ত প্রধান প্রধান জমীদারবর্গের ও সামন্তগণের সহিত সদ্ভাব বর্দ্ধন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি এই পরোয়ানা জারি করিতেছেন, যে উক্ত জমীদার ও সামন্তবর্গ আগামী চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিনে—রাজমহলে তাঁহার বিস্তৃত দুর্গমধ্যে দিল্লীর সম্রাটদের প্রথানুমোদিত যে "খোসরোজ" মহোৎসব হইবে তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব কন্যা ও স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। দিল্লীতে বা আগরাতে তাঁহার গৌরবান্বিত প্রপিতামহ পিতামহ ও পিতা, যেরূপ এবং যে উদ্দেশ্যে এই প্রকার খোস্‌রোজ মহোৎসব করিয়া থাকেন— রাজমহলে তাহাই হইবে। যে সকল জমীদার ও সামন্তবর্গ—সম্রাটপুত্রের সহিত সদ্ভাব রাখিতে বা দিল্লীশ্বরের প্রতি সম্মান দেখাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা উক্ত দিবসে অপরাহ্নের পূর্ব্বে রাজমহলের দুর্গে স্বস্ব দুহিতা ও স্ত্রীগণকে প্রেরণ করিবেন। অন্যথাচরণে তাহাদিগকে সরকারের চিরপ্রচলিত গৌরবান্বিত প্রথার অবমাননাকারী বলিয়া গণ্য করা যাইবে। সর্ব্বশেষে এই লিখিত, যে প্রকার উৎসবে পরাক্রমশালী রাজপুত রাজন্যবর্গ ও সামন্তগণ স্বস্ব দুহিতা পুত্রবধূ ও স্ত্রীদিগকে প্রেরণ করিতে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন বাঙ্গালার জমীদারদের প্রতি সেই সম্মান প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিতে চাহেন।"

সরকারী পরোয়ানা এইরূপ,—কিন্তু বাঙ্গালার জমীদার-রাজার মধ্যে কাহারও এইরূপে গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা রাজপুত রাজা ও সামন্তগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে অনেক হীন বোধ করিতেন। তাঁহাদের মনের ইচ্ছা তাঁহারা যেমন নগণ্য হইয়া পড়িয়া আছেন সেইরূপই থাকুন উক্তরূপ উচ্চ সম্মানে তাঁহাদের কাজ নাই।

৩

সুজার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কথা কেনা জানেন? দিবারাত্র কামিনীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিলাস সুখেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। রৌসন খাঁ মন্ত্রণায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। সে দিন দিন সুজার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহার বিলাসিতার পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। কেননা এই উপায়ে যুবরাজকে বাধ্য এবং ব্যস্ত রাখাতেই তাহার লাভ।

বিলাস বিভ্রমে,—মদিরাময় রমণী কটাক্ষে—স্বর্ণপাত্র পরিপূর্ণ সেরাজীতে,—কলকণ্ঠ কামিনীর সঙ্গীত কাকলীতে সুজার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রৌসন তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে—রাজপুতানা, ইরাণ, পারস্য, কাশ্মীর প্রদেশের রমণীবৃন্দের অপেক্ষা বঙ্গান্তঃপুরে শতগুণ লাবণ্যবতী রমণীগণ বিরাজ করিতেছেন। ইহাতেই সুজার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুজা প্রায় সাতমাস হইল বঙ্গদেশে আসিয়াছেন—ইহার মধ্যে বাঙ্গলার কয়েকটি আশ্রয়হীনা সুন্দরী তাঁহার অন্তঃপুরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন—তখন রৌসনের পরামর্শে রঘুদেব ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী কন্যাকে বেগম করিবেন বলিয়া ফুস্‌লাইয়া

লইয়া গিয়াছেন। রঘুদেবের কন্যা বস্তুত সুন্দরী। সুজা রঘুদেবের কন্যার রূপোন্মত্ত হইয়া দিবারাত্র তাহার কাছে পড়িয়া থাকেন।

রৌসন ভাবিল— এইবার ত বেশ উপযুক্ত অবসর। সুজা এবার বাঙ্গালী রমণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া উন্মত্ত। ইহাকে এই সকল বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে আমারই যথেষ্ট লাভ। লুটের পথ ত খোলাই আছে—তাহা ছাড়া প্রকারান্তরে আমিই বাঙ্গলার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া পড়িব। এ সুখ, এ ঐশ্বর্য্য কে কোথায় ছাড়িতে পারে?

তাই রৌসন—সুজাকে সহজে প্রলোভিত করিয়া "খোসরোজের" পরামর্শ দিয়াছিল। সুজাকে উচ্ছন্নের পথে লইয়া যাইবার ইহাপেক্ষা আর সহজ উপায় কিছু নাই। কাজেই যোগাড় যন্ত্র করিয়া সে এই "খোস্‌রোজের" পরোয়ানা জারি করিয়াছিল।

বাঙ্গলার জমীদারদের নিকট যখন পরওয়ানা পৌঁছিল তখন তাঁহারা সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বাদসাহের পুত্র—ভবিষ্যতে বাদসাহও হইতে পারে—তাহার আজ্ঞা কি করিয়া লঙ্ঘন করিবেন!—অথচ যবনের অন্তঃপুরে কুলকন্যা প্রেরণ—অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। না হয়—পাঠানই হইল—কিন্তু তাহার যে কি পরিণাম হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কলঙ্কী, নারকী কলুষিত চরিত্র, মদিরাপায়ী, যথেচ্ছাচারী সুজার অন্তঃপুরে প্রাণসম দুহিতা, প্রেমময়ী ভার্য্যা কোন্ প্রাণে তাঁহারা পাঠাইবেন?

সুজারও পরওয়ানা পৌঁছিল। এ দিকে জমীদারদের মধ্যে লেখালেখি আরম্ভ হইল। ইনি উহাকে লেখেন—উপায় কি—কি করিবে? কিরূপে জাতি সম্ভ্রম রক্ষা হইবে? সকলেরই মুখে "কি উপায়! কি উপায়!" কিন্তু উপায় কি তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে দিনাজপুরের জমীদার কিরণচন্দ্র রায়—সমস্ত প্রধান প্রধান জমীদারবর্গকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আসুন আমরা সকলে ঢাকায় সমবেত হইয়া এ বিষয়ের একটা উপায় নির্দ্ধারণ করি।" সকলে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে গোপন ভাবে ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। মুন্সী যুগোলকিশোর, সুজার দরবারের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী। এ ব্যাপারে তাঁহারও সম্পূর্ণ বিপদ—তিনি কর্ম্মচারী হইলে কি হয় তাঁহার দুহিতা পরম রূপবতী, তাঁহারও ভাগ্য জমীদারদিগের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ। রৌসন তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার বলে রৌসন এ পর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

দিনাজপুরের জমীদার যুগলকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন;—"ভাই, তুমিও ত পরওয়ানা পাইয়াছ আমাদের যদিও নিস্তার আছে তোমার ত কিছুতেই নাই। তুমি তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী—তোমার উপর তাঁহার জোর অধিক। কিন্তু তুমিই আমাদের মধ্যে পরামর্শ দানে শ্রেষ্ঠ। কি করিলে মান বাঁচে—বলিয়া দাও।"

অনেকে উৎকণ্ঠার ও আগ্রহের সহিত সেই উন্মুক্ত চিত্রপট দেখিতে আসিয়াছিল—সুজার নিষেধাজ্ঞায় সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল।

যুগলকিশোরও সম্ভাবিত বিপদ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, আগামী রাত্রে তাঁহার বাটীতে অন্যান্য জমীদারদিগকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া একটা উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠক একবার ঢাকা ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে রাজমহলে চলুন। সুজার প্রাসাদে কি ঘটনা হইতেছে একবার দেখিয়া আসি। একটী নির্জ্জন কক্ষে সাহসুজা সুন্দরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ বা মদ্যপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া বিলোল কটাক্ষে হাবভাব দেখাইয়া সুজার হস্তে দিতেছে—আর পানপাত্র মুহূর্ত্তে নিঃশেষিত হইতেছে। কোন সুন্দরী বা মাঝে মাঝে কোকিল কণ্ঠে এক একটী গীতের এক এক চরণ মাত্র ঝঙ্কার দিতেছেন, কেহবা সুগ্রথিত পুষ্পমালিকা লইয়া বাদসাহ পুত্রের গলদেশে দিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া মন ভুলাইতেছেন। কেহবা সুজার উচ্ছিষ্ট উষ্ণ অধরোষ্ঠ-চুম্বিত পাত্রাবশিষ্ট সেরাজী পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন—কেহবা কোমল বাহুলতা দ্বারা বঙ্গেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া অলসভাবে তাঁহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন। সকলেই আমোদে উন্মত্ত—সকলেরই প্রাণ মদিরায় মাতোয়ারা—সকলেরই হৃদয়ে সুখের ফোয়ারার পূর্ণোচ্ছ্বাস বহিতেছে—কিন্তু একটী সুন্দরী নীরবভাবে গৃহের এক কোণে সুজার দৃষ্টির বাহিরে বসিয়া—কুপিত বাঘিনীর ন্যায় তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেছে। তাহার মুখে ক্রোধ ও জিঘাংসার পরিস্ফুট ছায়া—অনেক কষ্টে অসামান্য কৌশলে প্রশমিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মনে কোন গভীর উদ্দেশ্য জাগিতেছিল—তাই সে গৃহের এক পার্শ্বে—সেই রমণীমণ্ডলীর সীমার বাহিরে বসিয়া একটা মতলব আঁটিতেছিল।

সুজাকে যে সমস্ত রমণীগণ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই দিল্লী হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কাশ্মিরী, ইরাণী ও হিন্দুস্থানী রমণীর ভাগই অধিক। ইহাদের অধিকাংশই মুসলমানী। একটী ক্ষুদ্রকায়া তাতার দেশীয় বালিকা বঙ্গেশ্বরের ক্রোড়প্রান্তে উপবিষ্টা ছিল। সে বলিল—"জাঁহাপনা আমরা সকলে আছি—কিন্তু সেই বাঙ্গালী রমণী কোথায়? তাহাকে আপনি অত ভালবাসেন—কিন্তু সে তাহার তিলমাত্র প্রতিদান করে না, বরঞ্চ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে—কিন্তু আমরা এত করিয়াও আপনার একবিন্দু অনুগ্রহ পাই না।"

কথা শেষ না হইতে হইতেই পূর্ব্বকথিত রমণী নিজ স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে—সুজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—বলিল—"জাঁহাপনা কি হুকুম হয়? দাসী উপস্থিত আছে। পাছে ইহারা আমোদে কোন বিঘ্ন বোধ করেন তাই আমি দূরে বসিয়াছিলাম।"

যে তাতার বালিকা যুবরাজের নিকট বাঙ্গালি স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে বলিতেছিল—এক্ষণে সহসা তাহাকে সম্মুখীন দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া বসিল, সুজা বলিলেন—"বিবি! দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? আইস এখানে—আমার কাছে উপবেশন কর।"

বঙ্গদেশীয়া অগত্যা তাঁহার হুকুম তামিল করিল—এবং যুবরাজের ইচ্ছানুসারে একপাত্র উষ্ণ সিরাজী তাঁহার মুখের কাছে ধরিল। যুবরাজ মদিরাপাত্র শেষ করিয়া—জড়িতস্বরে তাহাকে বলিলেন—"বিবি! তুমি বড় সুন্দর—তোমার সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে বড়ই মধুর লাগিয়াছে—বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের মধ্যে এত দূর সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহা আমার জ্ঞান ছিল না—আমি আমি—আমার হারেমের—শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে পূর্ণ রাখিব। তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইবে।"

"না জাঁহাপনা—আমি তাহাদের অধীশ্বরী হইতে চাহি না—চিরকাল আপনার চরণ সেবা করিব—ইহাই দাসীর জীবনের কামনা।"

"তবে সুন্দরি—এস সরিয়া এস—আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর—তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সকল দেশের স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য লইয়া—আল্লা বাঙ্গালা দেশের রমণী গড়িয়াছেন—এ কথা সত্য নয় কি?" সুজা এবার রমণীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন।

রমণী বলিলেন,—"জাঁহাপনা দাসীর যেরূপ গৌরব বাড়াইলেন, তজ্জন্য সে অতি গৌরবান্বিত মনে করে। ভারতের ভাবী সম্রাট সাহ সুজার মুখের কথার যে মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাও সে জানে। কিন্তু জাঁহাপনা, দাসী শতগুণে নীচ, যদি দিনাজপুরের জমীদার কিরণ রায়ের কন্যা কখনও বাদসাহের চক্ষুগোচর হইতেন—তাহা হইলে এই সুন্দরী কুল মহাসমুদ্রে তৃণোচ্ছাসের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেন। যুবরাজ! সে সৌন্দর্য্য! সে রূপগরিমা! না—আমি তা বর্ণন করিতে পারি না—এই দেখুন, তাঁহার চিত্র!"

তখনই সেই কোমলাঙ্গীর বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি আলেখ্য ধীরে ধীরে সুজার সম্মুখে উন্মোচিত হইল। সাহ সুজা তাঁহার ক্রোড়ে শুইয়া অমরাবতীর সুখ উপভোগ করিতেছিলেন—কিন্তু চিত্রপট দেখিয়া সহসা শীকার লোলুপ ব্যাঘ্রবৎ উঠিয়া বসিলেন। চিত্রখানি তাঁহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—মনোহর চিত্রপট দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"না—না—এ প্রলোভন আমি একবার কাটাইয়াছি। শীঘ্র এই চিত্র ছিঁড়িয়া ফেল—আর আমি উহা দেখিতে চাহি না।"

সাহ্ সুজা কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে চিত্রপটপ্রদাত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন—পরে গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করিলেন—"তোমরা সকলেই এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। কেবল-মাত্র এই সুন্দরী আমার কাছে থাকিবেন।' যুবরাজের আদেশ মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ পালিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই উৎসবময় কক্ষ নীরব হইয়া পড়িল—সুন্দরীগণ টলিতে টলিতে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কেবলমাত্র সাহ সুজা ও সেই বঙ্গীয় সুন্দরী কক্ষমধ্যে রহিলেন।

পাঠক! এই বঙ্গদেশীয়াকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই সেই রঘুদেব ঘোষা-লের অপহৃতা—প্রলুব্ধা—কুলকলঙ্কিনী কন্যা—রত্নময়ী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নময়ীকে নির্জ্জনে পাইয়া সাহ সুজা উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুন্দরি! তবে বল দেখি এ চিত্র কোথায় পাইলে?" এই প্রশ্নকালে কি জন্য জানি না—সুজার মস্তিকে মদিরার তেজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। তিনি এখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ।

রত্নময়ী বলিল—'জাঁহাপনা—আমার পিতার পূর্ব্ব বাসস্থান দিনাজপুর। কিরণ রায়ের কন্যা আমার—সই। দুইজনে সর্ব্বদা একত্রে কাল কাটাইতাম। আমাদের দুইজনের বড়ই প্রীতি ছিল। প্রভাবতীই আমাকে সখীত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ এই চিত্র উপহার দিয়াছিল।"

"তবে আমায় ইহা দেখাইলে কেন? সখীত্বের পবিত্র নিদর্শন অপবিত্র করিলে কেন? তাহার মিত্র হইয়া শত্রুর কার্য্য করিলে কেন?"

"শত্রুর কাজ করিয়াছি! দাসী বাঁদীমাত্র! জাঁহাপনার সুখ সম্ভোগের দিকে কেবল তাহার লক্ষ্য। আজ আমার রূপ যৌবন আছে—তাই আপনার অনুগ্রহ—কিন্তু চিরকাল ত এ পোড়া রূপ থাকিবে না—তখন কি হইবে? তাই মনে ভাবিয়াছি—যাহাতে দাসী বাদসাহের চির অনুগ্রহ পায় তাহারই উপায় করিব। আমি কিরণ রায়ের—পরম রূপবতী কন্যাকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া দিব।"

"সুন্দরি বল কি? না না—তুমি এরূপে আমার সহিত রহস্য করিতেছ—? সাহজা-হাম বাদসাহের পুত্র এরূপ রহস্য পছন্দ করেন না।"

"না—যুবরাজ আপনার সহিত রহস্য করে দাসীর কি ক্ষমতা! তবে নিতান্ত চরণা-শ্রিতা বলিয়াই এরূপ বলিয়াছি। আপনাকে তাহার প্রতি আসক্ত করিব বলিয়াই এই চিত্রপট আনিয়াছি। যদি যুবরাজের ইচ্ছা হয়—তবে তাহাকে খোস্‌রোজের পরই আপনার অন্তঃপুরচারিণী করিব।"

"বটে—বটে—কিন্তু সুন্দরি—তুমি যে তোমার সখীর এত সহজে সর্ব্বনাশ করিবে ইহা ত আমার বোধ হয় না।"

"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ কিসের যুবরাজ? যিনি আজ বাদে কাল সমস্ত হিন্দুস্থানের অধিপতি হইবেন—তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হওয়া যদি সর্ব্বনাশ হয় তাহা হইলে আর সুখ কিসে? বাদসাহের পুত্রগণের সহিত যে সম্পর্ক স্থাপনে অম্বর, মারওয়ার, যশল্মীর, বিকানীর চরিতার্থ বোধ করে—সামান্য জমীদার কিরণ রায় কি তাহাতে আপনাকে সৌভাগ্যযুক্ত বোধ করিবে না!"

"হাঁ—হাঁ—তা সত্য। কিন্তু প্রিয়তমে দেখ, আমি এ বালিকাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আমি দুর্ব্বৃত্ত কিরণ রায়কে বিশেষ জানি। যখন আমি ঢাকায় ছিলাম তখন কোন বিশেষ কারণে কিরণকে রাজধানীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি এই বালিকাকে প্রথম দেখি। এখন সে কতই না সুন্দরী হইয়াছে—সেই প্রভাত কমলবৎ অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য এখন কিরূপ মোহিনীরূপে না জানি ফুটিয়া উঠিয়াছে! তখন কোন বিশেষ কারণে আমাকে তাহার আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই চিত্রপটে আবার আমাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে! সুন্দরি! আমায় রক্ষা কর ইহার জন্য যাহা কিছু করিতে হয় সকলেতেই আমি প্রস্তুত—তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

"জাঁহাপনা আর এক পক্ষ অপেক্ষা করুন। আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।—আমি যে এ প্রকার অবস্থায় এখানে আছি তাহা সে জানে না। "খোস্‌রোজের" দিন নিশ্চয়ই তাহাকে এখানে আসিতে হইবে। কিরণ রায় বড় ভীরু—সে বাদসাহের আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিবে না। প্রভাবতী এখানে আমাকে দেখিয়া ভাবিবে হয়ত তাহার ন্যায় আমিও খোস্‌রোজ দেখিতে আসিয়াছি। তার পর যাহা করিতে হয় আমি করিব।"

সুজার হৃদয়—এই কথায় বিশেষ প্রলুব্ধ হইল—তিনি আর এক পাত্র মদিরা পান করিয়া ধীরে ধীরে সেইস্থানে শুইয়া পড়িলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে রাজমহলের দুর্গ মধ্যে দীপাবলি-উজ্জলিত কক্ষে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোল্লিখিত ঘটনাবলীর অভিনয় হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে ঢাকার ফৌজদার যুগলকিশোরের অন্ধকারময় ভবনের এক নিভৃত কক্ষে আর এক গোপনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছিল। কক্ষটী সুসজ্জিত হইলেও ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার মলিন আলোক-ছটায় তাহার

সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নয়নগোচর হইতেছিল না। হর্ম্ম্যতলে এক বিস্তৃত গালিচার উপর উপবেশন করিয়া বাঙ্গলার আটজন ক্ষুদ্র দিক-পাল—নিভৃতে এক গূঢ় মন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিলেন।

কক্ষমধ্যে সকলেই মলিন মুখে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন—সকলেরই মুখ প্রফুল্লতা-হীন ও ঘোর চিন্তারেখাঙ্কিত। মহাঝটিকার পূর্ব্বে যেমন সমস্ত প্রকৃতি স্থির ভাব. ধারণ করে তাহারা সকলে মুখোমুখী হইয়া সেই রূপ স্থিরভাবে উপবিষ্ট।

গভীর নিশীথ—চরাচর সুপ্ত—সমস্ত প্রকৃতি অন্ধকার তলে নীরবে বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নৈশপবনের সন্ সন্ শব্দ—আর পথিপার্শ্বস্থ সারমেয়ের চীৎকার ধ্বনি সেই গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

যুগলকিশোর সর্ব্বপ্রথমে সেই নির্জ্জন কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। তিনি বাদসাহের ফৌজদার বঙ্গেশ্বর সুজার অধীনস্থ হইলে কি হয়, দিল্লীর সরকার হইতে তিনি নিয়োজিত হইয়াছেন; তাঁহার সাহস অতুল। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"আপনারা কি স্থির করিলেন জানিতে ইচ্ছা করি।"

এক জন জমীদার উত্তর করিলেন—"আমার মতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের স্ত্রী কন্যাকে তথায় না পাঠানই ভাল। যখন উভয় দিকে শোচনীয় পরিণাম তখন প্রথম অপেক্ষা শেষটাই আমাদের ঘটুক।" আর এক জন বলিলেন—"মুখের কথা ও কাজের কথার অনেক প্রভেদ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ কার্য্যফল এই উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক। খোস্‌রোজে কন্যা প্রেরণ করিলে যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে আপনি অনুমান করিতেছেন, কার্য্যকালে সেটা আরও ভয়ঙ্কর হইতে পারে। বিশেষতঃ সুজা প্রথম স্থলে আমাদের কি অনিষ্ট করিবেন? তাঁহার এতদূর সাহস হইবে না—যে তিনি ভদ্র মহিলাগণকে কবলে পাইয়া কোন প্রকার অবমাননা করেন। দৈবের উপর.নির্ভর করিয়া সকলকে পাঠান যাক্ পরিণাম যাহা হয় হইবে। এক্ষেত্রে দৈবই রক্ষা করিবেন।"

আর এক জন বলিলেন—"দৈব পুরুষ কাজের বিরোধী। দেবতা রক্ষার ভার মানবের নিজের হাতেই দিয়াছেন। মানব কেবল দৈবের সহায়তা গ্রহণ করে মাত্র। মানব যদি ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনেন তাহা হইলে দৈব কিছুতেই রক্ষা করিতে পারেন না।"

আর এক জন বলিল—"এক কাজ করা যাক্ কতকগুলি স্বৈরিণী সংগ্রহ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া কুলকন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে পাঠান যাউক, তাহারা স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা ও হাবভাবে সুজাকে অনায়াসে প্রতারিত করিয়া আসিবে এবং আমাদেরও কুলমান রক্ষা হইবে।"

আর এক জন বলিলেন—"সরল ভাবে কার্য্য করিলে বোধ হয় সুজা কোন অত্যাচার

করিতে সাহসী হইবেন না—বস্তুতঃ তিনিত সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত নহেন্। কিন্তু এ প্রকার প্রতারণায় প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে আর সেই অগ্নিতে সমস্ত বাঙ্গালার জমীদারগণ ভস্মীভূত হইবে।”

দিনাজপুরের জমীদার—কিরণ রায় মহাশয় চুপ করিয়াছিলেন; এ পর্য্যন্ত কথা কহেন নাই—এক্ষণে বলিলেন, “আমার মতে বৃদ্ধ বাদসাহের নিকট এ সম্বন্ধে আবেদনপত্র দিয়া উকীল পাঠান হউক। এবং সুজাকে কোন বিশেষ ওজর দেখাইয়া উৎসব-কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখান হউক।”

বিজ্ঞ, পক্ককেশ যুগলকিশোর সকলেরই যুক্তি শুনিলেন এবং পরিশেষে হাস্য করিয়া কহিলেন—“মহাশয়গণ, আপনাদের সকলকার কথাই শুনিলাম কিন্তু আমার মতে সুজার দরবারে সকলেরই স্ত্রী কন্যা পাঠান হউক। রাজমহলে তাহাদের ত একাকী পাঠান হইতেছে না আমরা ত সকলেই দলবলে যাইতেছি, সাহসুজা যে জমীদারবর্গকে একেবারে ভয় করিয়া চলেন না তাহাও নহে। বিশেষতঃ ন্যায়পরায়ণ বাদসাহ যতদিন সিংহাসনে বিরাজমান ততদিন সুজা ইচ্ছা থাকিলেও কাহারও উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। এই উৎসবকার্য্যে বাধা দিলে আমাদের হয়ত বাদসাহেরও কোপমুখে পড়িতে হইবে। কিন্তু এ কার্য্যে সম্মতি দিলে তাহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ দিল্লীর রাজনৈতিক আকাশ ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন। বাদসাহের মধ্যে মধ্যে পীড়াদি উপস্থিত হওয়াতে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া কুমারগণের মধ্যে মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইতেছে। এ সময়ে কোন গর্হিত ব্যবহার করিলে সুজার অনিষ্ট বই ইষ্টসাধন হইবে না। এক্ষেত্রে আমাদের দৈবে নির্ভর করিয়া পাঠানই উচিত।”

যুগলকিশোর নিস্তব্ধ হইলে অন্যান্য সকলে স্থিরভাবে তাহার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন—“আপনার যুক্তিই আমাদের গ্রহণীয়”। কিন্তু কিরণ রায় সর্ব্বশেষে গম্ভীর অথচ কম্পিত স্বরে বলিলেন—“আমার মত আপনাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আপনারা যাহা করিতে হয় করুন আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমার পরিবারবর্গের কাহাকেও আমি রাজমহলে যাইতে দিব না। ইহাতে পরিণাম যাহা হয় হউক আমি তাহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

যদি সেই সময়ে সহসা বজ্র পতন হইত তাহা হইলে গৃহস্থিত সকলে ততদূর চমকিত হইতেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিরণচন্দ্র রায় মহাশয় উত্তেজিতভাবে সেই গভীর রাত্রে তাঁহার ঢাকার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঢাকায় তাঁহার নিজবাড়ী, কিন্তু সুজার উৎপীড়নে তিনি পূর্ব্বে এক-বার ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে সুজা আর ঢাকায় থাকেন না—সুতরাং তিনি সেই খানে অবস্থান করিতেছিলেন।

রজনীর দ্বিযাম অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এমন সময়ে কিরণ রায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাহ্য জগতের অন্ধকারের ছায়া তাঁহার ভবিষ্যতের উপর পড়িয়াছিল, তিনি ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একটী কক্ষে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন, "মা প্রভা! তুই কি এখনও ঘুমাস্‌নি—আমার জন্য জাগিয়া আছিস্?"

প্রভা পিতার স্বর শুনিয়া সানন্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল—বলিল, "বাবা! আমি এখনও ঘুমাই নাই—তোমাদের মন্ত্রণার কি হইল শুনিব বলিয়া এখনও বসিয়া আছি। হাঁ বাবা—সকলের পরামর্শে কি স্থির হইল?"

প্রভার একটু পরিচয় আবশ্যক। প্রভা কিরণচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয়ের অতুল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। প্রভার জন্মের পূর্ব্বে তাহার দুইটী ভাই হইয়াছিল, তাহারা একটী আট বৎসরের ও অপরটী দশ বৎসরের হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

প্রভা মাতৃহীনা,—ভ্রাতাদের মৃত্যুর পরই তাহার মাতা রুগ্না হইয়া পড়েন এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর সময় প্রভার বয়স তিন বৎসর। তাহার এক মাতৃস্বসা কিরণ রায়ের গৃহে বাস করিয়া তাহার লালন পালন করেন।

প্রভা সকল সৌন্দর্য্যের আধার! সে রূপরাশি পরিস্ফুট করিতে সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহার প্রশান্ত কমণীয় মুখে প্রভাত কমলের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। সে মুখে পবিত্রতা আরও শুভ্রতর হইয়া বিরাজ করিতেছে। সে হৃদয়ে স্নেহ, দয়া, মমতা, সর্ব্বজীবে সমভাব, আত্মসমান-বোধ সকলই পাশাপাশি হইয়া অবস্থান করিতেছিল। বিধাতা বাহ্যিক আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্যই যেন প্রভার সৃজন করিয়াছেন!

প্রভা বাল্যকাল হইতে মাতৃহীনা সুতরাং পিতার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। তাহার বয়স এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসর। বাঙ্গালীর ঘরে সেকালে এতবড় মেয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার কিন্তু উপায় না থাকিলে কি হইবে? প্রভার পিতার এপর্য্যন্ত একটী পাত্রও পছন্দ হয় নাই। কাজেই প্রভার বিবাহে এত বিলম্ব।

সেই স্নেহময়ী বালিকা পিতার জন্য সযত্নে খাদ্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রভা কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে রায় মহাশয়ের আহার হইত না। তিনি আহারে বসিলেন, প্রভা একখানি পাখা লইয়া পিতাকে ব্যজন করিতে লাগিল।

যাহার হৃদয়ে দুশ্চিন্তা তাহার মুখে আহার রুচিবে কেন? কিরণ রায়ের' পাত্রস্থ দ্রব্য সেই রূপই রহিল, তিনি আচমণ করিয়া উঠিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ আরম্ভ করিলেন, প্রভা বলিল—"বাবা, আমি ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও দিব্য চক্ষে দেখিতেছি কোন দুশ্চিন্তা তোমার মনে জাগরূক, এই চিন্তা যদি অদ্যকার ঘটনা সম্ভূত হয়—তাহা হইলে আমি তাহার প্রতিকার করিব।"

"তুমি তাহার প্রতিকার করিবে কি করিয়া মা? ক্ষুদ্র বালিকার এমন কি ক্ষমতা যে সে পিতার ঘোর চিন্তার অপনয়ন করিতে পারে? মা তোর জন্যই আমার ভাবনা!"

"বাবা, তুমি মন্ত্রণাস্থলে যাইবার পূর্ব্বেই আমি উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমি বালিকা, কিন্তু মন্ত্রণায় কি স্থির হইবে আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। বাবা—আমি তোমারি কন্যা, তোমার মনের ভাব আমি বেশ জানি।"

"আচ্ছা বল দেখি প্রভা, আমাদের কি মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে?"

"সকলেই বাদসাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে কেবল তুমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, কেমন ইহা কি প্রকৃত কথা নয়?"

কিরণ রায় বালিকাকে তাঁহাদের মন্ত্রণীয় কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই সুতরাং প্রভার তীক্ষ্ণ প্রতিভায় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন বালিকা কি অমানুষী-শক্তিসম্পন্না? বালিকা পিতার মনের ভাব বুঝিয়া ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে বলিল—"পিতঃ! আমি বালিকা এই মেদ মাংস দেহ তোমা হইতেই উৎপন্ন, আমি তোমার চেয়ে কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিবার কোন' স্পর্দ্ধা রাখি না। কিন্তু নিশ্চয় জানিও পিতঃ, সুজার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে ঘোর বিপদ! যে বিপদের জন্য তুমি এত চিন্তিত হইয়াছ তাহা আপনি আসিয়াই উপস্থিত হইবে। বাবা আমার কথা শুন তোমার স্নেহময়ী বালিকার কথা শুন, আমাকে সুজার দরবারে পাঠাইয়া দাও। সকলে যখন যাইতেছে আমি কেন না যাইব? তারপর সেখানে গিয়া যাহা করিবার তাহা করিব সে উপায় আমার মনে আছে—তাহাতে চিরকালের জন্য সুজার এ প্রকার অত্যাচারের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।"

কিরণ রায় নিস্তব্ধে কন্যার কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু তাহার শেষাংশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না, ধীর কণ্ঠে বলিলেন, "প্রভা, তোমার উদ্দেশ্য কি কিছুইত বুঝিলাম না! আমি যাহা হইতে তোমাকে নিবৃত্ত করিতে যাইতেছি তুমি তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত! তুমি বালিকা, বোধশূন্যা বালিকা হৃদয়ের উত্তেজনা বশে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ।"

"না পিতা, উত্তেজনা নয় সকল কথা না বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। সুজার মৃত্যুবাণ আমাদের হস্তে রহিয়াছে। বাবা তুমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি

ভুলি নাই। পিতঃ! তিন বৎসরের পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। যখন দুর্ব্বৃত্ত সুজা তোমাকে সপরিবারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বন্দী করে, তখন দুরাত্মা আমাকে তাহার নিজ গৃহের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র সুসজ্জিত গৃহে অবরোধ করিয়া রাখে। সেই সময়ে এক দিন গভীর নিশীথে দুর্ব্বৃত্ত যে ভয়ানক মন্ত্রণায় তাহার মন্ত্রীবর্গের সহিত লিপ্ত হইয়াছিল তাহার আদ্যোপান্ত আমি জানি। সম্রাট সাহাজাহানের সেই সময়ে ঘোর পীড়া; সুজা সম্রাটের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্বীয় ভ্রাতৃগণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া সম্রাটকে বিষ খাওয়াইব্যর মন্ত্রণা করে। সে এ সম্বন্ধে তাহার ভ্রাতা আরঙ্গীবকে ও প্রধান অনুচর মওয়াজি খাঁকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা আমারই হাতে আছে। পত্রখানি নানা কারণে পাঠান হয় নাই। সে রাত্রে সুজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আগরায় চলিয়া যায়; সেই রাত্রে আমি পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া এক ক্ষুদ্র গলিপথে কতকগুলি কাগজ পত্র কুড়াইয়া পাই; তাহার মধ্যে সুজার নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয়ক ছিল, সেই অঙ্গুরীয়কের সহায়তায় সুজার গমনের ক্ষণকাল পরেই আমি মুক্তিলাভ করি। কাগজগুলি পরে আমি সময়ক্রমে আমাদের বৃদ্ধ দেওয়ানকে দিয়া পড়াইয়া রাখিয়াছিলাম; তাহার মধ্যে দুর্ব্বৃত্তের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহসূচক পত্র খানিও ছিল, আমি সেই খানির সহায়তায় এবার কার্য্যোদ্ধার করিব।"

কিরণ রায় স্থির হইয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, কথা শেষ হইবা মাত্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "মা! যা বলিলে সমস্তই বুঝিলাম, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত যদি ইহাতে ভয় না পায় যদি তোর উপর কোন অত্যাচার করে, তোর পবিত্র কুমারী ধর্ম্মের উপর কোনরূপ কলঙ্ক পড়ে, তখন কি হইবে মা? তুই কি মনে করিয়াছিস্ বৃদ্ধ কিরণ রায় বংশের কলঙ্ক লইয়া জীবিত থাকিবে!"

"পিতঃ! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, তাহার উপায় আমার হাতে। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া প্রাণ অপেক্ষা সতীত্বের মূল্য বুঝি। পিতঃ! প্রাণ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিব।" কিরণ রায় আর কার্য্যের প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন প্রভা যা ধরে তাহা ছাড়ে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব দিন রাত্রে—প্রভাবতী একবারও চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই। নানাবিধ চিন্তায় রজনী কাটিয়া গিয়াছে। প্রভাবতী প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধানা হইয়া তাহাদের গৃহদেবতা কালিকার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

বালিকা দেবীর সম্মুখে বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দেবীর পদে পুষ্পাদি অর্পণ করিল। যুক্তহস্তে উর্দ্ধমুখে ভবাণী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "মা গো! চিরকাল নিজ হস্তে সেবা করিয়াছি—বাল্যকাল হইতে তোর মন্দির মার্জ্জনা করিতে শিখিয়াছি, যখন মনে কোন যাতনা হইয়াছে তখন তোকেই জানাইয়াছি, কিন্তু দেখিস্ মা! এবার যেন মান রক্ষা হয়। আমি অকুলে আত্মসমর্পণ করিতে চলিলাম মা! তুই গৌরী রূপে কুমারী মূর্ত্তি—দেখিস্ মা যেন আমার কুমারিধর্ম্মে আঘাত না লাগে।" বালিকা প্রণত হইয়া দেবীর উৎসৃষ্ট পুষ্প লইয়া মন্দির ত্যাগ করিল।

সেই দিন তিথিনক্ষত্র ভাল, কিরণ রায় কক্ষে আসিয়া প্রভাবতীকে বলিলেন, "প্রভা! যদি যাইতেই হইবে তবে শুভলগ্নেই যাত্রা প্রশস্ত। আজ দিন ভাল চল, আজই যাত্রা করা যাক।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে সকলে রাজমহলে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজমহলের ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যস্থ—অন্তঃপুর সংলগ্ন প্রাঙ্গণটী আজ নূতন বেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। সদর দ্বার হইতে এই উঠান পর্য্যন্ত দুই ধারে লাল মখমল মণ্ডিত কানাত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কানাতের মধ্যনিবিষ্ট দণ্ড সমূহের উপর প্রত্যেক ধারে এক একটী নিশান এবং প্রত্যেক নিশানের মূলদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত। কানাতের শেষে একটী ক্ষুদ্র দ্বার এই দ্বারের পরই প্রাঙ্গণ। প্রবেশ দ্বারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধবেশী স্ত্রীলোকগণ পুরুষোচিত সাজে সজ্জিত হইয়া মুক্ত অসি হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

প্রাঙ্গণের শোভা আরও মনোরম। মধ্যে মধ্যে প্রস্তরময় কৃত্রিম বেদিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে—বেদিকার নাগকেশর চম্পক গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পাচ্ছাদনে আবৃত, মধ্যে মধ্যে পুষ্পময় কুঞ্জ; তাহাতে হীরামণ, পাপিয়া ভীমরাজ, বুলবুল প্রভৃতি মনের আনন্দে তান ছাড়িতেছে। একস্থানে দশজন অন্তঃপুরচারিণী একত্রিত হইয়া একতানে সারঙ্গ, বীন্, সেতার লইয়া করতালীর মধুর তালে সুরের উচ্ছ্বাস তুলিতেছে।

প্রাঙ্গণটী স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। সুজার অন্তঃপুরচারিণীগণ ও মুসলমান ওমরাহের পত্নী ও দুহিতাগণে প্রাঙ্গণ প্রায় অর্দ্ধেক পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তগণেরও পরিবারদের

মধ্যে অনেকে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। এ মেলা সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী স্ত্রীলোকের মেলা! যে দিকে দেখা যায় বোধ হয় যেন সৌন্দর্য্য স্বয়ং নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

কে কাহাকে দেখে তাহার স্থির নাই। সকলেই নিজ নিজ খাদ্য-দ্রব্য ও আলাপ পরিচয় লইয়া ব্যস্ত। যাহারা এ ক্ষেত্রের সমস্ত কারণ কায়দা জানে না তাহার অপরের দেখিয়া কাজ করিতেছে। কেবল জনতার মধ্যে দুইটী সুন্দরী—প্রাঙ্গণ পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র কামিনী বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে—"ভাই! তুমি মুসলমান ও আমি হিন্দু হইলেও এখন আর তোমায় আমায় কোন ভেদ নাই। আমি ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ঘরে জন্মিয়া যবনের উপভোগ্যা হইয়াছি। এখন আমাদের দুইজনের অদৃষ্ট সমসূত্রে বদ্ধ। তুমি আমার হিতকামনা না করিলে কে আর করিবে? দেখ! এই উৎসবে আমি আমোদ করিতে আসি নাই—প্রতিহিংসা লইতে আসিয়াছি! যুবরাজ আজ এই উৎসবে অমৃতের ভোগ লইবেন আমি ইচ্ছা করিয়া গরলের অংশ গ্রহণ করিব। আমি যাহা বলি তাহা তোমার করিতেই হইবে।"

অপরা উত্তর করিল—"দেখ বিবি! তুমি যা করিতে বলিবে তাহাতেই আমি প্রস্তুত, কিন্তু তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বের কোন কথা আমার কাছে গোপন করিলে চলিবে না। এক বিষয়ে যখন বিশ্বাস করিতেছ—তখন সকল বিষয়েই বিশ্বাস থাকা চাই; বল দেখি আজ কি করিলে তোমার উপকার করা হইবে?"

প্রথমা উত্তর করিল—"ভগিনি! তবে শোন। হৃদয়ের জ্বালাময় কথা—যাহা উষ্ণ ধাতুস্রাবের ন্যায় হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার উচ্ছ্বাস দেখি! তুমি বোধ হয় জান আমি পিতৃহীনা হইয়া নিরাশ্রয় হওয়াতেই আমার এই দুর্দ্দশা। কিন্তু আমার পিতাকে বধ করিল কে তাহার নাম শুনিবে? সে পাপিষ্ঠ জমীদার কিরণ রায়। আমাদের না ছিল কি? সুখ ঐশ্বর্য্য সবই ছিল কিরণ রায় তাহাতে আগুণ ধরাইয়া গিয়াছে।

"কিরণ রায় কি আগে এত বড় জমীদার ছিল?"

"না তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুরাত্মা ভয়ানক ষড়যন্ত্রে তাহার মৃত জ্যেষ্ঠের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে। আমার পিতা তাহার জ্যেষ্ঠ কুমুদ রায়ের বাল্যসখা। বন্ধুত্বের অনুরোধে তিনি কিরণের দুষ্ট সংকল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া পাপিষ্ঠের আমার পিতার উপর জাতক্রোধ জন্মে। সে আমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া পিতাকে পথের ভিখারি করিল। আমার এক বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সতীত্ব নাশ করাইল। আমি পিতামাতা হারাইয়া দারুণ মনস্তাপে পথের ভিখারিণী হইলাম, যবনসেবায় আত্মবিক্রয় করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, পিতার মৃত্যুশয্যায় যে প্রতিশোধের শপথ করিয়াছি তাহা যুবরাজের সহায়তায় একদিন না একদিন কোন না কোন উপায়ে রক্ষা হইবে। আজ সেই প্রত্যাশিত দিন উপস্থিত।

"ভগিনি! আত্মকৌশলে তাহার কন্যার একখানি প্রতিকৃতি অপহরণ করিয়া সুজাকে দেখাইয়াছি। যুবরাজের মনে তাহাতে ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছে। যুবরাজ আর একবার বহুদিন পূর্ব্বে তাহাকে আটক করিয়াছিলেন কিন্তু সেবার কার্য্য সিদ্ধি হয় নাই। এবার এক বাণে দুই পাখী মরিবে। আমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং যুবরাজেরও রূপতৃষ্ণা নিবারণ। কেমন বুঝিলেত? আমি কিরণ রায়ের কন্যার উপর প্রতিশোধ লইব। যুবরাজকে পূর্ব্বে আমি তাহার সখী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছি ও এ ব্যাপারে প্রলুব্ধ করিয়াছি।"

যে শুনিতেছিল—সে বলিল—"কি করিতে হইবে শীঘ্র বল, অই দেখ উঠান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সাহ সুজা এখনই বাহির হইবেন। তুমি যাহা বলিবে তাহাতেই আমি প্রস্তুত।"

অপরা বলিল—"দেখ নানাকারণে আমি কিরণ রায়ের কন্যা প্রভাবতীর সম্মুখে যাইব না। তুমি উৎসবের গোলমালের মধ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাকে যে কোন কৌশলে পার অথচ তাহার মনে সন্দেহ না হয় এরূপ ভাবে উত্তর দিকের গলি-পথের বিশ্রাম গৃহে লইয়া যাইবে। ইহার পর যাহা করিতে হয় আমি করিব।

পাঠক! উপদেশ-দাত্রীকে চিনিয়াছেন কি? ইনি আপনাদের পূর্ব্ব পরিচিত রঘুদেবের কন্যা রত্নময়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইবার দুই ঘণ্টা বিলম্ব আছে এমন সময়ে সহসা নহবত ধ্বনি হইল। একটা রব উঠিল সাহ সুজা আসিতেছেন। প্রাঙ্গণের এত কোলাহল মুহূর্ত্তেকে তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

যুবরাজ অন্তঃপুর হইতে বাহির প্রাঙ্গণে আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার প্রধানা বেগম লুৎফুন্নিসা। পশ্চাতে দুইজন বাঁদি। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী প্রফুল্ল মুখে প্রত্যেক বেদিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুদ্রার বিনিময়ে বাদসাহী প্রথা-মত ক্রয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ক্রয় শেষ হইলে তাঁহারা বিক্রেয়িত্রীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদনে সেস্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থলে গমন করিতে লাগিলেন।

যাহাদের ক্রয় বিক্রয় হইয়া গেল, তাহাদের একে একে সকলেই চলিয়া গেল, ক্রমে বাদসাহ কিরণ রায়ের কন্যা প্রভাবতী যেখানে ছিলেন তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

যুবরাজকে দেখিয়া প্রভা লজ্জাবতী লতার ন্যায় সংকুচিতা হইল, তাহার সর্ব্ব শরীর

শিহরিয়া উঠিল, যখন দেখিলেন বাদসাহ একদৃষ্টে তাহার দিকে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন তখন স্বাভাবিক আরক্তিম গণ্ডস্থল আরও লোহিত রাগ রঞ্জিত হইল। যুবরাজের সঙ্গে এখন আর কেহ নাই তিনি একাকী। কেবল একটা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

বাদসাহ প্রভাকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে সহাস্তে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুন্দরি! তোমার পরিচয় জানিতে সৌভাগ্যবান হইব কি?

প্রভাবতী সসম্ভ্রমে লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন, "আমার নাম—প্রভাবতী। আমি দিনাজপুরের জমীদার কিরণ রায়ের কন্যা।

সুজার শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে, শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে পাশবিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তিনি একটু হাস্য করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। মনের ভাব হরিণী ফাঁদে পড়িয়াছে।

যুবরাজ চলিয়া গেলে প্রভাবতী নিজের দাসীকে শিবিকার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন, কিন্তু দাসীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়া নিজে তাহার অনুসন্ধানে গেলেন।

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সরোবর, তাহার কূলে ৫। ৭ খানি শিবিকা দেখা যাইতে-ছিল। দাসী হয়ত সেই দিকে গিয়াছে ভাবিয়া প্রভা ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন। পথে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বিনীতভাবে বলিল—"বিবি! আপনি কি কোন সাহেবের সহিত দেখা করিবেন?" প্রভা উত্তর করিলেন, "না আমি বাটী যাইব আমার দাসীকে শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকে খুঁজিতেছি।"

"ওখানে যে সব পাল্কী দেখিতেছেন উহা মুসলমান ওমরাহ পত্নীদের; আপনি যদি বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার পাল্কী আনিয়া দিতেছি।"

প্রভা নিজ দাসীর উপর একটু রাগ করিয়া সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকটী তাহাকে একটী গলি পথে লইয়া গিয়া বলিলেন—"আপনি আমার গৃহমধ্যে বিশ্রাম করুন, আমি পাল্কী আনিতে চলিলাম। যদি যবনী বলিয়া ঘৃণা না করেন, তবে এই খানে গৃহমধ্যে আসিয়া বসুন।"

মুগ্ধস্বভাব প্রভা—তাহার যত্নে ভুলিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য গৃহ প্রবেশ করি-লেন; এবং তৎক্ষণাৎ তড়িৎবেগে সেই গৃহের দ্বার আবদ্ধ হইয়া গেল। হতভাগিনী প্রভাবতী ব্যাধের ফাঁদে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। অনেক টানাটানি করিলেন কিছুতেই দ্বার খুলিল না। প্রভা অগত্যা সেই কক্ষমধ্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুজা উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কক্ষে কোন সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময়ে রত্নময়ী আসিয়া সংবাদ দিল "জাঁহাপনা! পক্ষিণী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। আপনার শয়নগৃহের পার্শ্বের ঘরে তাহাকে আবদ্ধ করা হইয়াছে।"

সুজা সংবাদ শুনিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

আর হতভাগিনী প্রভা! সে অশ্রুজলে সেই মখমল মণ্ডিত কক্ষ ভাসাইয়া দিতেছে! সে ভাবিতেছে "হায়! কেনই বা দুঃসাহসে ভর করিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসিলাম? না জানি অদৃষ্টে কি আছে? নিশ্চয়ই এ সাহসুজার চক্র। জীবন থাকিতে দুরাচার আমার উপর কখনই অত্যাচার করিতে পারিবে না। আমার যে দুইটী অমোঘ অস্ত্র আছে, তাহার একটীও কি কাজে আসিবে না? ভবানী! হৃদয়ে বল দাও মা—যেন এ পরীক্ষায় আজ উত্তীর্ণ হইতে পারি।"

সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল, গৃহের অপর পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, সাহ সুজা সেই দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুজা মদিরা পান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু লাল—মুখে ঘোর পাশব প্রকৃতির ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে—হৃদয়ে ঘোর সম্ভোগবাসনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"সুন্দরি! বঙ্গেশ্বর সাহ সুজা নিজে তোমাকে সম্মান দেখাইতে আসিয়াছেন, তোমার পদতলে বিক্রীত হইতে আসিয়াছেন। ভারত-সম্রাটের পুত্র হিন্দুস্থানের ভাবী অধিকারী সাহ সুজা তোমার নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সুন্দরি! দাসের প্রতি প্রসন্না হও।"

দৃপ্ত সিংহিনীর ন্যায় প্রভা একবার সেই দুর্দ্দান্তের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া এবং পরক্ষণেই মুখ অবনত করিয়া স্থির ভাবে উত্তর করিল—"জাঁহাপনা, অধিনী ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। আপনি রক্ষাকর্ত্তা হইয়া নিজে এ প্রকার অত্যাচার করিলে আশ্রিতদের উপায় কি? এ মাতৃহীনা হতভাগিনী বালিকার উপর অত্যাচার করিয়া তাহাকে কলুষিত ভাবে সঙ্গোপন করিয়া আপনার লাভ কি? আমায় ছাড়িয়া দিন আপনার মহত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে এ স্থান হইতে চলিয়া যাই।"

সুজা দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রভার কাছে আসিয়া বসিলেন। প্রভা মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইল। সুজা সস্নেহ স্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! বিরাগ প্রকাশ করিও না। কিরণ রায়ের কন্যাকে আমি বড়ই ভালবাসি। তোমার পিতাকে সেবারে খাজনার জন্য যখন আবদ্ধ করিয়াছিলাম তখন কেবল তোমার মুখ চাহিয়া আমি তাহাকে পীড়ন করি নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। তুমি আমার

হৃদয়ের পূজনীয়া দেবীর ন্যায় আসন অধিকার করিয়া থাকিবে। এই হিন্দুস্থান এক দিন হয়তঃ তোমার পদতলে নত হইবে। সাহ সুজা কখনও উপযাচক হইয়া কাহারও কাছে প্রেমভিক্ষা করেন নাই, তুমিই কেবল সেই বিষয়ে সৌভাগ্যবতী হইয়াছ।”

“না—না—যুবরাজ, আমি সৌভাগ্য চাহি না। সমগ্র হিন্দুস্থান অপেক্ষা পর্ণকুটীর আমার পবিত্র সাম্রাজ্য। যুবরাজ একবার আপনার প্রপিতামহের মহত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেই গৌরবান্বিত আকবর সাহের পবিত্র গৌরবের অনুরোধে আমায় ছাড়িয়া দিয়া হৃদয়ের উদারতা দেখান।

“না—না—শুধু কথায় হইবে না তুমি বড়ই অবোধ বালিকা! সুন্দরি, যাহা বলি শোন—সহজে না শুনিলে বল প্রকাশ করিব।”

“হাঁ—নিরীহ—নিঃসহায় কুমারীর প্রতি বল প্রয়োগে আপনার পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না।”

সুজা এ উত্তরে ভুলিলেন না, বালিকার হাত ধরিলেন। প্রভার শরীরে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল তথাপি সে সাহস সঞ্চয় করিয়া সবলে নিজ হস্ত ছাড়াইয়া লইল, সুজা আবার ধরিতে গেলেন বালিকা সরিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাঘ্র যেমন শীকারের উপর লম্ফ দিবার পূর্ব্বে স্থির হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে সুজার অবস্থাও তদ্রূপ। পাছে প্রভা উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া যান এই ভয়ে দুর্ব্বৃত্ত দ্বারটী আগে বন্ধ করিয়া দিল। প্রভাবতী আরও নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন।

সুজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—“সুন্দরি! খোস্‌রোজের এই উৎসবের আয়োজন কেবল তোমায় ধরিবার জন্য। আমি তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি জীবনে কখনও কাহারও এত উপাসনা করি নাই তাহাও করিতেছি। এই লও আমার রত্নখচিত মুকুট তোমার পদতলে অর্পণ করিলাম। হিন্দুস্থানের ভাবী বাদসাহ তোমার পায়ে ধরিতেছেন তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্না হও। এই বলিয়া সুজা—বালিকার চরণ স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন।

“সাবধান—চরণ স্পর্শ করিয়া এ দেহ কলঙ্কিত করিও না। আমায় ছাড়িয়া দাও আমি চিরকাল তোমা অপেক্ষা তোমার মহত্বকে শত গুণে পূজা করিব।”

প্রভার কথাগুলি সেই নির্জ্জন কক্ষে ধীরে মিলাইয়া গেল। সুজা আর অপেক্ষা করিতে পরিতেছেন না তিনি দ্বারের দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় প্রভাকে আলিঙ্গন-নিপীড়িত করিতে ধাবিত হইলেন।

“যুবরাজ! এখনও বলিতেছি সাবধান! নচেৎ তোমার সম্বন্ধে কোন অশুভকর কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। সে কথা প্রকাশ হইলে নিশ্চয় জানিও তুমি পথের

ভিখারীরও অধম হইয়া পড়িবে। হয়ত বৃদ্ধ সম্রাটের জল্লাদের হস্তে তোমার ঐ মুকুট-শোভিত মস্তক ধরাশায়ী হইবে।”

সুজা বলিলেন—“সুন্দরি! এমন কি কথা—যাহাতে আমি তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িব! ভারতসম্রাটের পুত্র জীবনে এমন কোন কার্য্য করেন নাই যাহাতে এক অপরিচিত নগণ্য বালিকা তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়!” বলিয়া সাহসে আবার তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রভা দিক পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন—“যুবরাজ সাবধান! মওয়াজী খাঁর সহিত চক্রান্তের ব্যাপার প্রকাশ হইলে বোধ হয় আপনার কোন ইষ্ট নাই।”

সহসা আশীবিষ দষ্ট হইলে মানব যেরূপ কাতর হইয়া পড়ে সুজাও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ শবের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। তাঁহার দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল। মওয়াজী খাঁর নাম সুজার কাণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র তিনি মন্ত্রৌষধি রুদ্ধ ভুজঙ্গবৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন।

প্রভা দেখিলেন ঔষধ ধরিয়াছে, ধীরে ধীরে বলিলেন—“ঘটনা ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তনে দাসী যদি ভারতেশ্বরের পুত্রের প্রতি কোনরূপ অসম্মান ব্যবহার করিয়া থাকে তজ্জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। যুবরাজ আপনার সম্মুখের দ্বার খুলিয়া দিন, আমায় বাহিরের পথ দেখাইয়া দিন আমি গিয়া আপনার এসব অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যাই। আমি দেবতার নামে শপথ করিতেছি আমার দ্বারা একথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হইবে না।

যুবরাজ আরও শুনুন মওয়াজি খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া বাদসাহকে বিষ প্রয়োগ জন্য আপনি কুমার আরঞ্জীবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও আমার কাছে; এই দেখুন তাহার পাণ্ডুলিপি।”

সুজা পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আদ্যোপান্ত পড়িলেন তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, অতএব অত্যাচারী হইয়াও তিনি শিশুর ন্যায় স্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি দেয়াল ধরিয়া এক আসনের উপর উপবিষ্ট হইলেন।

সাহ সুজা অনেক ক্ষণ ধরিয়া আবার এক নূতন মৎলব আটিলেন। তাঁহার মনে যে ভয় হইয়াছিল ক্রমে তাহা অপসারিত হইল তিনি প্রকাশ্যে ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন, “সুন্দরি! যদিবা তোমার উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হইত এখন তাহা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। আমি তোমার ধৃষ্টতার যথেষ্ট প্রতিফল দিব। তোমার ধৃষ্টতার ফলে আজি বৃদ্ধ কিরণ রায় অবরুদ্ধ হইয়া অন্ধ তমসাবৃত কারাগার আশ্রয় করিবে।” এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সবেগে তাহার নিকটস্থ হইলেন।

“তবে দেখ দুরাত্মা, হিন্দুরমণী কিরূপে আপনার সতীত্ব রক্ষা করে, কিরূপে তাহার কুমারী ধর্ম্ম পালন করে।” এই কথা বলিয়া প্রভা নিজ বক্ষ মধ্যস্থ বস্ত্র হইতে এক তীক্ষ্ণ

শাণিত ছুরিকা বাহির করিলেন। দীপালোকে সেই ছুরিকা ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল এবং সুজা দ্বারের নিকট ফিরিতে না ফিরিতে তাহা সবেগে তাহার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ হইল। সুলতান ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। রক্তস্রাবে গৃহ ভাসিয়া গেল তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

* * * * *

এই শোচনীয় ঘটনার পর তিন দিন অতীত হইয়াছে সুজা অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষ মধ্যে রুগ্ন শয্যায় শায়িত। একজন রমণী বসিয়া তাহাকে ব্যজন করিতেছেন ও তাঁহার ক্ষত স্থানে প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছেন।

সাহ সুজা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন, ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায়?" আজ তাঁহার প্রথম চেতনা হইয়াছে। পার্শ্বোপবিষ্টা রমণী তৎক্ষণাৎ কাতর ভাবে বলিলেন, "যুবরাজ—জাঁহাপনা, কথা কহিবেন না চিকিৎসকের নিষেধ ক্ষণকাল স্থির ভাবে থাকুন। সবই শুনিবেন।"

"না—না—আমি এখনই শুনিতে চাই। আমার সকল কথা মনে পড়িতেছে। কোথা সে পাপীয়সী কিরণ রায়ের কন্যা কোথায়! তাহার পিতার মস্তক-শোণিতে কি এখনও ধরাতল শীতল হয় নাই! কে আছিস্! শীঘ্র আয়—শীঘ্র কিরণ রায়ের ও তাহার কন্যার মস্তক এই স্থানে আনিয়া দে————

সুজা আর বলিতে পারিলেন না—উত্তেজনা বশে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পার্শ্বোপবিষ্টা তাঁহাকে কোন উত্তেজক ঔষধ দিলেন তাহাতে আবার চেতনা আসিল। সুজা আবার নয়ন উন্মীলন করিলেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"প্রিয়তমে, প্রভাবতী তুমি কোথায়? একবার হৃদয়ে এস এ যাতনা লাঘব করিয়া দাও।—না না তুই পিশাচী!

পার্শ্বোপবিষ্টা সুন্দরী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"হাঁ যুবরাজ! সে সত্য সত্যই পিশাচী! সে সত্য সত্যই সয়তানী! রঘুদেবের কন্যা তাহারে পলায়নের সময় পথরোধ করিতে গিয়াছিল, তাহাকেও সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলাইয়াছে। যুবরাজ সে পাষাণীর সে হতভাগিনীর নাম আর মুখে আনিবেন না।"

সুজা ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিলেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বহিয়া গেল, তিনি ধীরে ধীরে অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"হায়? সুখের উৎসব রুধিরোৎসবে পরিণত হইল।"

ইহার পর সুজা বহুকষ্টে আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু যত দিন জীবিত রহিলেন রুধিরোৎসব স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিল না।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বিলাতের শ্রমজীবীসম্প্রদায়। *

"All work and no play makes Jack a dull boy" ইংরাজীতে এই যে প্রাচীন প্রবচনটি আছে, বিলাতের শ্রমজীবীর তাহাই মূলমন্ত্র। তাহাদের উদ্দেশ্য তত প্রশংসনীয় না হইলেও তাহাদের উদ্যম-পূর্ণ সঙ্কল্প যে অনুকরণীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৈনিক আট ঘণ্টার বেশী পরিশ্রম করিতে তাহারা নিতান্ত নারাজ। মাঝারী রকমের কারিকর লইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় সে ব্যক্তি সুস্থ এবং বলিষ্ঠ কিন্তু তার মস্তিষ্কের কর্ষণ কিছু বেশী মাত্রায় হওয়ায় সে এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে দৈনিক দশ ঘণ্টা পরিশ্রম তাহার আর বরদাস্ত হয় না। জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় কার্য্যসাধনোপযোগী শিক্ষা হইতে কোন স্ত্রী পুরুষকেই বঞ্চিত করা উচিত নহে, কিন্তু যখন পল্লী-সমিতি-বিদ্যালয় সমূহে (Board Schools) ফরাসী ভাষা, সঙ্গীত, এবং বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া চাষাভূষার ছেলেদের রুচির উৎকর্ষ সাধন করা হয়, তখন এই অতি উৎসাহে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কোন লাভ হইবে কি না, এই রকম একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে স্বতই আসিয়া পড়ে।

এখনকার দিনে প্রভু ভৃত্যের মধ্যে আর পূর্ব্বের মত সদ্ভাব নাই, এখন যার দম বেশী তারই জয়; এমন একদিন ছিল বটে যখন যাহারা ধর্ম্মঘট করিত তাহাদেরই সর্ব্বনাশ হইত, কিন্তু সে কাল আর নাই, এখন শ্রমজীবীসম্প্রদায়ের জোটের এমনই বল হইয়াছে যে হঠাৎ তাহারা কারবার বন্ধ করিয়া দেয়, এবং তাহাতে অনেক সময় মহাজনকে পর্য্যন্ত ফেরার হইতে হয়।

একখানি বিখ্যাত দৈনিক পত্রে এই গুরুতর বিষয়ে নানাশ্রেণীর ও নানা অবস্থার লোকে কতকগুলি পত্র লিখিয়া আপনাদিগের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন; এই আন্দোলনের জনৈক নেতা অতি দক্ষতার সহিত যে পত্র লিখিয়াছেন কেবল তাহাতেই কিছু যুক্তির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, লেখক বলেন যে, "যে সকল শ্রমজীবী পরিশ্রমের সময় কমাইতে চাহে তাহাদিগের অধিকাংশই নিম্নলিখিত প্রধান যুক্তিত্রয় দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছে;—১ম যুক্তি, যে সকল লোক কার্য্য অভাবে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছে তাহাদের সংখ্যার কথা শুনিলে মনে ত্রাস জন্মে, তাহাদের সংখ্যা এখন চারি লক্ষে উপনীত হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনিক পরিশ্রমের সময়-হার কমাইলে অপেক্ষাকৃত অধিক লোক কাজ পাইবে। ২য় যুক্তি, শ্রমজীবীগণের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে এক্ষণে তাহারা শ্রমপ্রসূত অর্থের যে অংশ পাইয়া থাকে, তাহাদিগের প্রাপ্য তাহা অপেক্ষা

* যে সহৃদয়া ইংরাজললনা মিস্ মরিসের Illustrated Magazine নামক একটি প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হয়, এই প্রবন্ধটিও তাঁহার লিখিত। কিন্তু এবার আমরা মূল প্রবন্ধটির পরিবর্ত্তে কেবল অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করিলাম। বলা বাহুল্য লেখক এবং অনুবাদক উভয়েরই নিকট আমরা এই নিমিত্ত যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। ভাং সং

অধিক; শিক্ষার প্রসর বৃদ্ধি হওয়ায় শ্রমজীবীগণ অর্থব্যবহার কিছু কিছু বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে এবং এখন তাহারা অর্থনীতি ধর্ম্মনীতি, ও পদার্থতত্ত্বের মূলসূত্র অনুসারে তাহাদের শ্রমপ্রসূত অর্থের আরো কিছু বেশী অংশ তাহাদের হস্তগত হওয়া উচিত বলিয়া দাবী উত্থাপন করিয়াছে। ৩য় যুক্তি, এই যে তাহাদের প্রকৃতির উৎকৃষ্টতর বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধনের ইচ্ছা দিন দিনই বলবতী হইতেছে; তাহাদের দাবী এই যে দীনাদপি দীন শ্রমজীবীরও অপেক্ষাকৃত সভ্য ভব্য অবস্থার জন্য "প্রাণ আকুল" হইয়া উঠে।

প্রথমোক্ত যুক্তিটির সারবত্তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু শেষোক্ত যুক্তিদ্বয় সন্দেহাত্মক। আমার বোধ হয় বর্ত্তমান অবস্থার অপেক্ষা উন্নততর অবস্থার জন্য আমাদের সকলেরই প্রাণ আকুল হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা ব্রিটিশ শ্রমজীবী নই বলিয়াই সে অবস্থা পাইবার জন্য ধর্ম্মঘট করিতে সক্ষম নহি, তাই শুধু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চির-আকুলতা বহন করিয়া থাকা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উপায় নাই।

কোন কোন শ্রেণীর শ্রমজীবীগণ তাহাদের পরিশ্রমের তুলনায় অতি অল্প বেতন পাইয়া থাকে, তাহারা তাহাদের ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টা করিলে সকলেরই সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদর্শন করা উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া অল্পদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের সূত্রধরপুঙ্গবেরা যে কম সময়ে বেশী বেতনের দাওয়া করিতেছিল তাহার কি কোন কারণ থাকিতে পারে? তাহাদের এই ধর্ম্মঘট সাত মাস পর্য্যন্ত ছিল, রাজমিস্ত্রী সকল ঘোর নৈরাশ্যে মাথা কুটিয়া মরিয়াছিল, মেজের তক্তা ও ছাদের কড়ি বসান না হওয়াতে শত শত ঘর বিপদসঙ্কুল অবস্থায় পড়িয়াছিল, গৃহের আসবাব-বিক্রেতাদিগের কষ্টের সীমা ছিল না; এই সমস্ত সূত্রধরকুলের জোটবন্ধন এতই দৃঢ় হইয়াছিল এবং নানাশ্রেণীর শ্রমজীবীগণের সমিতি সমূহ তাহাদের এরূপ প্রভূত পোষকতা করিতে লাগিল যে অবশেষে নিয়োগকর্ত্তাগণ তাহাদের দাবীর অধিকাংশই গ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন।

সূত্রধরেরা এখন ঘণ্টায় ১ শিলিং হারে দিন আট ঘণ্টা কাজ করিয়া থাকে। সপ্তাহে দুই পাউণ্ড আট শিলিং এক জন সামান্য শ্রমজীবীর পক্ষে কম উপার্জ্জন নহে, এরূপ অসঙ্গত উচ্চদরে কল কারখানার অধিকারীগণকেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় তা নয়, গৃহস্থদিগেরও নানা অসুবিধা; ঘর মেরামতের খরচ ক্রমেই চড়িয়া উঠিতেছে। এক জন ভাল ছুতার লাগাইতে হইলে তাহাকে ঘণ্টায় ১ শিলিং ৩ পেন্স হিসাবে মজুরী দিতে হয়, এক জন যে টুকিটাকী কাজ করিবে তাহাকেও ঘণ্টায় দশ পেন্সের কমে পাওয়া যায় না। যদি নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করিতে না হয় তাহা হইলে বিলাতী কারিকরকে খাটাইয়া সে কেমন চিজ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে বড় আমোদ পাওয়া যায়। ক্রীষ্ট্‌মাসের সময় ভয়ানক বরফ পড়ায় জমাট জলের পাইপ লইয়া গৃহস্থদিগকে বিষম জ্বালায় পড়িতে হয়, এই তুষারপাতের সময় ফোঁস্‌ফাঁস্ টকাস্

টকাস্ প্রভৃতি নানাবিধ অদ্ভুত শব্দ শুনিলে আর বুঝিতে বাকি থাকে না যে পাইপ গুলি ফাটিয়া গিয়াছে। রাত্রিকালে এরূপ ঘটিলে আমোদ কিছু বেশীদূর গড়ায়, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে ঝাইলদারের (plumber) কাছে লোক পাঠাইতে হয়, লোককে বলিয়া দিতে হয় যে উক্ত অনিষ্টের প্রতিকারের জন্য যে সমুদয় যন্ত্রের প্রয়োজন তাহা যেন সে লইয়া আসে এবং সে যেন শীঘ্র আসিয়া পৌছে। সচরাচর ঝাইলদার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই হাজির হয় এবং বালকরূপ এক লেজুর সঙ্গে করিয়া আনে। বলা বাহুল্য এই লেজুর ছাড়িয়া ব্রিটিশ শ্রমজীবী পদমেকং ন গচ্ছতি। সে আসিয়া পাইপ দেখিতে থাকে এবং তাহার পর সহচর বালকটিকে দোকান হইতে প্রয়োজনীয় অস্ত্রাদি আনিতে পাঠায়, ইত্যবসরে তাহার অগ্নি সেবন কার্য্য চলিতে থাকে, ও রান্নাঘর নিজের ঘরবাড়ী করিয়া লয়। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বালকটি ফিরিয়া আসে, তখন সে ধীরে সুস্থে ভগ্নস্থান পরীক্ষা করে; এই কার্য্য শেষ হইলে আপন ঘড়ির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলে যে মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে উক্ত কার্য্য সমাধা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, উপস্থিত মত তালিতুলি দিয়া রাখা যাউক, অপরাহ্নে ফের সে আসিবে। এবং অপরাহ্নে আসেও বটে কিন্তু এতই বেলা কাটাইয়া আসে যে অন্ধকারে আর কোন কাজই হয় না, কাজেই যে তালি সেই তালিই থাকিয়া যায়; অবশ্য বেলা যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই সে বলিবে আর একটা সামান্য কাজের জন্য তাগাদা আসিয়াছিল; সুতরাং সেখানে যাইতে হইয়াছিল; যাহা হউক এই রকমে তাহার কাজ চলিতে থাকে কিন্তু যখন দফাওয়ারী বিল আসিয়া উপস্থিত হইল তখন দেখিতে পাওয়া গেল যে এই পাইপ মেরামত করিতে দুই দিন লাগিয়াছে! গৃহস্বামীর বিশেষ সৌভাগ্য যে এই রকম করিয়া সে আরও দুই এক দিন বেশী খাটায় নাই। সকল স্থানেই এবং সকল ব্যবসাতেই শ্রমজীবীগণের এই অভিন্নমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিয়া শুনিয়া সেকেলে কারীকরের জন্য আমাদের "প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।" সত্য বটে তাহারা দুই 'আর 'দুইএ কত হয় তাহা বলিতে পারিত না, কিম্বা এ আর ওর মধ্যে কি তফাৎ তাহা বুঝিতে পারিত না, কিন্তু তাহারা নিজ নিজ ব্যবসা বুঝিত এবং নিজের কাজ সত্বর এবং সুসম্পন্ন করিতে পারিত।

বর্ত্তমান শিক্ষার বিস্তার যে অবিমিশ্র মঙ্গলের উৎপাদক তাহা গভীর সন্দেহের বিষয়; অতি দরিদ্রদিগকে লিখিতে পড়িতে ও একটু অঙ্ক কসিতে শিখানই পূর্ব্বে গ্রাম্যসমিতি স্কুল (Board Schools) স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু কি গ্রাম্যসমিতি-বিদ্যালয় এবং কি বিবিধ জ্ঞানদায়িনী বিদ্যালয় (Polytechnics) সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান দিগন্ত প্রসারিণী শিক্ষাপ্রণালী ইষ্টের সহিত প্রভূত অনিষ্ট আনয়ন করিয়াছে।

আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি উচ্চশিক্ষা বিস্তারে দাস দাসীদিগের কিছু মাত্র উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। কারীকরেরা ফরাসী ভাষায় এবং বিবিধ বিষয়ে অসম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ

করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কার্য্যদক্ষ হইয়াছে কি না তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না কারণ এ বিষয়ে আমার তাদৃশ বহুদর্শিতা নাই তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের শিক্ষা নিতান্তই বৃথায় হয় নাই কারণ ইহা তাহাদের বিলক্ষণ কাজে লাগিয়াছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ে পঞ্চায়েত সভা (Unions) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহারা চাকর ছিল তাহারা একণে কতকটা মনিবের পদ দখল করিয়া লইয়াছে।

কয়েক বৎসর গত হইল একজন শ্রমজীবী পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হন। আমার যতদূর মনে পড়িতেছে নটিংহাম সহর হইতেই যেন তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করা হয়। সাধারণ লোকের ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল তিনি হাউস্ অব্ কমন্স সংস্কার করিয়া তোলপাড় করিয়া দিবেন। এই নব পদবীতে সভাগৃহে তাঁহার প্রথম উপস্থিতি দেখিবার জন্য তাহারা ব্যাকুলতার সহিত উদ্গ্রীব হইয়া রহিল; তাহারা নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিল যে তাঁহার অপেক্ষাকৃত অভিজাত সহযোগীগণ (More aristocratic colleagues) কখনই তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিবে না। তাঁহার এই অগ্নি পরীক্ষা দৃঢ়সঙ্কল্পে নির্ব্বাহ করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রমের অপচয় হইয়াছিল তাহা ভাবিলেও কষ্ট হয়। যাহাহউক কমন্স সভার সভ্যেরা তাঁহাকে শিষ্টাচারের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে সকলেই মনোযোগের সহিত তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন, এবং সেই হইতে তাঁহার কথা আর বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। তথাপি পঞ্চায়েৎ সভা সকল (The Unions) এই ভাবিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে যে পার্লিয়ামেণ্টে তাহাদের একজন প্রতিনিধি রহিল এবং যে আশা তাহারা এতদিন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছে তাহা পূর্ণতার পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া রহিল।

সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ী লোকেরই পঞ্চায়েৎ সভা আছে, প্রত্যেক কারীকরই স্ব স্ব ব্যবসায়ের সভায় চাঁদা দিয়া থাকে এবং যখন কাজকর্ম্ম দুষ্প্রাপ্য হয় ও অনেক লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে পঞ্চায়েৎ সভা এই নিষ্কর্ম্মা লোকদিগকে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া থাকে; ধর্ম্মঘট করাও এই সমিতির কার্য্য। কোন ব্যবসায়ে ধর্ম্মঘট উপস্থিত হইলে অন্যান্য ব্যবসায়ের লোকেরা সমবেত হইয়া উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে; যাহাহউক তাহাদিগের ভাণ্ডার কিছু অক্ষয় নহে, যদি অনেক দিন ধরিয়া এ হেঙ্গামা চলে কিম্বা কর্ম্মবন্ধকারীদিগের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে অন্নকষ্ট এবং অনশন জনিত ক্লেশ উপস্থিত হয়।

গত শীতকালে ইংলণ্ডে ভয়ানক সময় গিয়াছে। সেইসময় শত শত লোক দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগের ব্যবসায়ের নাম ও দাবীর বিষয় পতাকায় লিখিয়া সেই পতাকা উড়াইয়া রাজপথে সদর্পে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ট্র্যাফাল্গার স্কোয়ার (Trafalger Square) নামক স্থানে সভার পর সভার অধিবেশন হইতে লাগিল, এবং স্থানে স্থানে সামান্য দাঙ্গা

হাঙ্গামাও হইয়া গেল। রেলওয়ের চাকর বাকর, ডকের মজুর, গ্যাসের লোকজন, দরজীর দল এবং আরো কত শত ব্যবসাদার ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়া দিল, ইহাতে কাহারও কাহারও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হইল, কাহারও বা দাবী দাওয়া আংশিক রূপে গৃহীত হইল। এরূপ ব্যাপারের সর্ব্বাপেক্ষা বিষময় ফল এই যে ইহাতে ব্যবসা মাত্রেই একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, কারণ পঞ্চায়েৎ সমিতির নেতৃবর্গ (unionist-leaders) স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখে, যে সকল লোক সমিতির কার্য্যে যোগদান করে নাই, ইহারা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সমিতির অনভিলষিত কার্য্য হইতে বিরত করে।

যখন কতকগুলি গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্র ধর্ম্মঘট করিয়া পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিল, তখনই ধর্ম্মঘট-কীর্ত্তি চূড়ান্তে পৌঁছিল; স্কুলের নিয়মিত সময় হ্রাস করা, ব্যাকরণ কমাইয়া লওয়া এবং প্রহার একেবারে উঠাইয়া দেওয়াই ইহাদিগের ধর্ম্মঘটের উদ্দেশ্য। তাহারা বয়োবৃদ্ধদিগের ন্যায় সত্য সত্যই পতাকা হস্তে রাজপথে সদর্পে বিচরণ করিতে লাগিল। বলা অনাবশ্যক যে অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদিগকে ধনঞ্জয় দিয়া আবার স্কুলে আনা হইল, কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই তাহারা সামান্য সামান্য লোকসান করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে পর্য্যন্ত স্বাধীন শিক্ষার ফল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে সেই কাল হইতে ভদ্র লোক হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে, ইংলণ্ডের প্রত্যেক স্ত্রী ও প্রত্যেক পুরুষই আজ কাল ভদ্রপদবাচ্য। আমার কোন বন্ধু কিছুতেই এই বর্দ্ধিতায়তন ভদ্রসমাজ চক্রের সহিত মিলিয়া চলিতে পারিলেন না, এক দিন ত তিনি চটিয়াই লাল; কোন কয়লা প্রস্তত-কারিণীর (Char woman) অনুসন্ধানে বাহির হইয়া তাহার সন্ধান জানিতে চাহিলে এক ব্যক্তি কহিল, "কুটীরবাসিনী ভদ্র মহিলা কয়লা পোড়াইতে বহির্গত হইয়াছেন।" তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেখানে সতরঞ্চ ঝাড়িবার কোন লোক পাওয়া যায় কি না, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি একঝুড়ি তরকারীর সম্মুখোপবিষ্ট এক ফলবিক্রেতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিল, "এই ভদ্রলোকটী সতরঞ্চ ঝাড়িয়া থাকেন।" কয়েক বৎসর গত হইল এই বিষয়টিকে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করিয়া কাগজে একটি গল্প ছাপান হয়; জনৈক মহিলা কোন দোকানে কতকগুলি দ্রব্য কিনিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোন কোন জিনিষ মনোনীত না হওয়ায় তদ্বিনিময়ে আর কতকগুলি দ্রব্য লইবার জন্য তিনি সেই দোকানে পুনরায় উপস্থিত হইলেন, দোকানী হাস্যবদনে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ দীর্ঘ শ্মশ্রুল ভদ্রলোকটি কিম্বা ঐ কৃষ্ণকেশধারী মহোদয় কি আপনাকে এ সকল দ্রব্য দিয়াছিলেন?" মহিলা উত্তর করিলেন, "দুজনের কেহই দেয় নাই, ঐ টাকযুক্ত মহান্ সম্রান্ত ব্যক্তিই আমাকে এই সমস্ত দ্রব্য দিয়াছিলেন।"

এই সমস্ত নূতন ভদ্রশ্রেণী আবার অত্যন্ত বিচক্ষণ, এমন শত শত সমিতি (Club)

আছে যাহাদের হস্তে বার্ষিক সামান্য চাঁদা ন্যস্ত করিলেই শ্রমজীবীর অসময়ের জন্য আর কোন ভাবনা থাকে না। এই সকল সমিতি দ্বারা কত উপকার হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; এই সমস্ত সমিতি অন্যদীয় সাহায্য সাপেক্ষ নহে, সেই জন্যই অবিচারিত দানে যে দারিদ্র্য উপস্থিত হয় ইহারা সেই দারিদ্র্যের হস্ত হইতে মুক্ত; অধিকন্তু এই সমস্ত সমিতি দ্বারা মিতব্যয়িতার উৎসাহ বর্দ্ধন হইয়া থাকে, এই মিতব্যয়িতা দ্বারা জাতি বিশেষের যে উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা, বাহ্য চাকচিক্যময় আধা জ্ঞান-চর্চ্চার দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হইবার সম্ভাবনা নাই।

যত প্রকার সমিতি আছে তাহার তালিকা দেওয়া সহজ নহে, এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এমন পল্লী এবং সহর অতি বিরল যেখানে কারীকরদিগের সমিতি নাই। প্রত্যেক সমিতির সহিত পুস্তকালয়ে এবং সংবাদপত্র পাঠার্থ গৃহ সংলগ্ন থাকায় শ্রমজীবীগণ আমোদ এবং আরাম উপভোগ করিতে পারে, সমিতি দ্বারা আরো একটি বিশেষ হিতকর কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে সমিতির কোন সভ্য পীড়িত হইলে, যতদিন পীড়া আরোগ্য না হয় তত দিন সে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য পায় এবং বিনা ব্যয়ে ডাক্তার পাইয়া থাকে; এমনও কোন কোন সমিতি আছে যাহার কোন সভ্যের স্ত্রী কিম্বা সন্তান সন্ততির মৃত্যু হইলে সমিতি তাহাকে কিছু টাকা দিয়া সাহায্য করে এবং স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী কিছু অধিক অর্থও পাইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন সমাধিদান-সভা, বস্ত্রধৌতন-সভা, কয়লা-সংগ্রহ-সভা প্রভৃতি আরো অনেক সভা আছে যদি পাঠকবর্গের প্রীতিকর হয় তাহা হইলে এই সমুদয় সভার বিস্তৃত বিবরণ এবং শ্রমজীবীগণের উপকারের জন্য লণ্ডনে যে সমুদয় সদনুষ্ঠান আছে তাহার বৃত্তান্ত প্রবন্ধান্তরে পাঠকগণকে অবগত করাইব; বিষয়টি এত বৃহৎ যে বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থান হওয়া কঠিন।

যাহা হউক বৃটীস শ্রমজীবী সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিব, শ্রমজীবীগণের মধ্যে সকলেই যে এক সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত তাহা নহে। আমি লিখিতে লিখিতে দেখিতে পাইতেছি আমাদের বাগানের মালী হাড় ভাঙ্গিয়া খাটিতেছে, তাহাকে অনেকখানি জায়গা দুরস্ত করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী মালী সে স্থানটুকুর দিক দিয়াও যায় নাই। কাজ কর্ম্ম দেখাইয়া দেওয়া দূরে থাক, সে কিরূপে কাজ করিতেছে আমি কখনও তাহা দেখিতেও যাই না কিন্তু তথাপি সে কাজে কিছুমাত্র ফাঁকি দেয় না, কারণ আমার বোধ হয় সে কখন ফরাসী কিম্বা গ্রীক লাটিন পড়ে নাই।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়।

ধর্ম্ম-পথ।

(মহাত্মা বুদ্ধদেবের বাক্য ও উপদেশ)

১

আমরা যাহা কিছু তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তার ফল-স্বরূপ, চিন্তাই সকল বিষয়ের মূল; এই চিন্তা হইতেই সকল বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। শকটের চক্র যেমন চালকের অনুগমন করে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অসদভিপ্রায়ে কথা কহে বা অসদভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করে, যন্ত্রণা নিয়তই তাহার পশ্চাদ্গমন করে।

২

আমরা যাহা কিছু তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী চিন্তার ফল-স্বরূপ, চিন্তাই সকল বিষয়ের মূল; এই চিন্তা হইতেই সকল বস্তু নির্ম্মিত হইয়াছে। ছায়া যেমন মনুষ্যকে কদাচ পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি সদভিপ্রায়ে কথা কহে বা সদভিপ্রায়ে কোন কার্য্য করে, আনন্দ সততই তাহার অনুগমন করে।

৩

"অমুক আমাকে নিন্দা করিয়াছে, অমুক আমাকে প্রহার করিয়াছে, অমুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে,—অমুক আমার চুরি করিয়াছে"—যতদিন এ সমস্ত চিন্তা মনের ভিতর অবস্থান করিবে, ততদিন ঘৃণাও মন হইতে বিদূরিত হইবে না।

৪

"অমুক আমাকে নিন্দা করিয়াছে,—অমুক আমাকে প্রহার করিয়াছে,—অমুক আমাকে পরাজয় করিয়াছে,—অমুক আমার চুরি করিয়াছে"—এ সমস্ত চিন্তা যাহার মনোমধ্যে অবস্থান করে না, তাহার মন হইতে ঘৃণাও বিদূরিত হয়।

৫

কারণ, ঘৃণাদ্বারা কখনও ঘৃণার উপশম হয় না, (বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে) প্রেমেরই দ্বারা ঘৃণার উপশম হয়—ইহাত একটি পুরাতন কথা।

৬

কতকগুলি ব্যক্তি জানেন না যে আমাদের (কি ধনী কি ভিখারী) সকলেরই পরিণাম এক, যাঁহারা এ কথা জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কলহ নাই।

৭

যাঁহারা কেবল মাত্র আমোদ খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি সমূহ অবশীভূত, তাঁহারা ভোগ-বিষয়ে অপরিমিত এবং অলস ও বলহীন। প্রবল বাত্যায় যেমন জীর্ণ তরুকে উৎপাটন করে, কাম প্রবৃত্তি (ও) সেইরূপ তাঁহাদিগকে পরাজয় করে।

৮

যাঁহারা এই পৃথিবীতে কেবলমাত্র আমোদের নিমিত্তই জীবন ধারণ করেন না, তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি-সমূহ বশীভূত, তাঁহারা ভোগ বিষয়ে পরিমিত, এবং বিশ্বাসী ও বলিষ্ঠ ; বাত্যায় যেমন শিলাময় পর্ব্বতকে টলাইতে অক্ষম, কামপ্রবৃত্তি তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতেও সেইরূপ।

৯

যিনি আপনাকে পাপ হইতে মুক্ত না করিয়াই, কেবল পবিত্র গেরুয়াবসন পরিধানের অভিলাষ করেন, ও যিনি পরিমিততা ও সত্যের অবমাননা করেন, তিনি গেরুয়াবসন পরিধানের নিতান্ত অযোগ্য।

১০

কিন্তু যিনি আপনাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, ও ধর্ম্মে দৃঢ় এবং পরিমিততা ও সত্যের মান্য করেন, তিনিই গেরুয়াবসন পরিধানের যথার্থ উপযুক্ত। (নচেৎ বাহ্যকে গেরুয়াবসন পরিধান পূর্ব্বক ভণ্ডামি করিবার আবশ্যক নাই)।

১১

যাঁহারা অসত্য হইতে সত্যের কল্পনা করিতে পারেন না, যাঁহারা সত্যকেও অসত্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা কদাচই যথার্থ সত্যের নিকট পৌছিতে পারেন না, ও তাঁহারা সততই কলুষ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়েন।

১২

যাঁহারা সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই যথার্থ সত্যের নিকট পৌছেন ও সাধু অভিপ্রায় সকলের অনুগমন করেন।

১৩

যে বাটী উত্তমরূপে আচ্ছাদিত নহে, তাহাতে যেরূপ বৃষ্টি-ধারা প্রবেশ করে, সেইরূপ অপরিষ্কার (ও অনাচ্ছাদিত) মনেও কাম প্রবৃত্তি প্রবেশ করিয়া থাকে।

১৪

উত্তমরূপ আচ্ছাদিত বাটীতে যেরূপ বৃষ্টি-ধারা প্রবেশ করিতে পারে না, সেইরূপ পবিত্র ও পরিষ্কৃত মনে কামপ্রবৃত্তি কদাচ প্রবেশ করিতে পারে না।

১৫

কুকর্ম্মী ব্যক্তি ইহ জগতে আক্ষেপ করে, এবং পরজগতেও আক্ষেপ করে, ইহাকে উভয় জগতেই আক্ষেপ করিতে হয়। ইহাকে আক্ষেপ করিতে হয়, ও নিজ কর্ম্মের কুফল দৃষ্টিগোচর পূর্ব্বক বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

১৬

সাধু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহজগতে ও পরজগতে আনন্দ অনুভব করেন ; তিনি উভয়

জগতেই আনন্দ অনুভব করেন। তিনি নিজ কার্য্যের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা দর্শনে বিশেষ প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করেন।

১৭

কুকর্ম্মী ব্যক্তি ইহজগতে ও পরজগতে উভয় জগতেই অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করেন। তিনি নিজ কুকর্ম্ম স্মরণ করিয়া কষ্ট পান এবং তিনি কুপথ অনুসরণ কালেও ততোধিক কষ্ট পান।

১৮

ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ইহজগতে ও পরজগতে উভয় জগতেই সুখ লাভ করেন। তিনি নিজ সৎকর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া সুখী হয়েন ও যখন তিনি সৎপথে গমন করেন তখন তিনি বিপুল সুখ লাভ করেন।

১৯

একজন নির্ব্বিবেক ব্যক্তি বিধানানুযায়ী কার্য্য না করিয়া রাশি রাশি বিধান আওড়াইতে পারিলেও কদাচ পৌরোহিত্যের অধিকারী হইতে পারে না। তিনি কেবল মাত্র গোপালক হইয়া অপরের গরু গুণিতে গুণিতেই জীবন কাটান। (এরূপ জীবন ধারণ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

২০

যিনি বাস্তবিকই বিধানানুযায়ী সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আর যদি তাঁহার বিধানের কিয়দংশও স্মরণ থাকে, এবং যদি তিনি কামপ্রবৃত্তি, ঘৃণা, মূর্খতা ও মূঢ়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথার্থ জ্ঞান ও মনের শান্তি লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহজগতে বা পরজগতে কোন জগতেই কাহাকেও গ্রাহ্য করিতে হয় না। এবং তিনিই যথার্থ পৌরোহিত্যের অধিকারী হইবার যোগ্য।

২১

আলোচনাই অমরত্বের পথ, অবিবেকতা মৃত্যুস্বরূপ। যাঁহারা চিন্তা করেন তাঁহাদের মৃত্যু নাই, আর যাঁহারা অবিবেক বা চিন্তাশূন্য, তাঁহারা সকল সময়েই মরিয়া আছেন।

২২

যাঁহারা এতদ্বিষয় বিশুদ্ধরূপে বুঝিয়াছেন, যাঁহারা চিন্তাপথে অগ্রসর, তাঁহারা চিন্তা হইতে সুখানুভব করেন, এবং (আর্য্য) মনোনীত ব্যক্তিদিগের বিষয় চিন্তা করিয়া যথার্থ প্রীতি লাভ করেন।

(যাঁহারা নির্ব্বাণ-পথে বা মুক্তিপথে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর্য্য (মনোনীত) ব্যক্তি বলা যায়।)

২৩

এই জ্ঞানীব্যক্তিগণ ধ্যাননিরত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। ইহারা মুক্তিরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

২৪

একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি আপনাকে জাগ্রত করিতে পারেন, যদি তিনি ভ্রান্ত না হন, যদি তাঁহার কার্য্য সকল পবিত্র হয়, যদি তিনি বিবেচনা পূর্ব্বক সকল কার্য্য করেন, যদি তিনি আপনাকে দমন করিতে পারেন, ও বিধানানুসারে জীবন যাপন করেন তাহা হইলে তাঁহার মর্য্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

২৫

চিন্তা এবং নিজের উপর আধিপত্য দ্বারা যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে জাগ্রত করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজের জন্য এমন একটী দ্বীপ নির্ম্মাণ করেন যাহা কদাচ জলপ্লাবনে ধ্বংশ হইবে না। অর্থাৎ কোন প্রকার কুপ্রবৃত্তি কদাচ তাহাদিগকে পরাজয় বা ধ্বংশ করিতে পারিবে না।

২৬

মূর্খ ও অজ্ঞান ব্যক্তিরাই গর্ব্ব করিয়া থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিন্তাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া জ্ঞান করেন।

২৭

গর্ব্বিতার অনুসরণ করিও না, জঘন্য কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের বশবর্ত্তী হইও না। যিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়ে চিন্তা বা আলোচনা করেন, তিনি অতুল আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

আমরা কি ?

"নানা মুনির নানা মত" একথাটি সকল লোকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই জানেন যে ঋষিদিগের মত ভিন্ন ভিন্ন। অনেকে আবার "নাসৌমুনির্য্যস্ত মতং ন ভিন্নং" শ্লোকটিও এই প্রচলিত প্রবাদের সমর্থন হেতু বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্লোকটি কোন সময়ে ও কোন অবস্থায় কোন মুনি কর্ত্তৃক প্রথম উচ্চারিত হয় অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম যে তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। কেহ কেহ ঋষির নাম একটি বলিতে পারেন কিন্তু কোন সময়ে ও কোন অবস্থায় শ্লোকটির জন্ম হয় তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বলিলেন না। যাহাই

হউক একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে ঐ কথাটি বহু প্রাচীন কথা। এমন কি যে সময়ে মীমাংসা দর্শনের জন্ম হয় নাই সে সময়ের কথা। যে কালে কতকগুলিন দর্শনকার ধর্ম্মলোপ-নিবারণ ও নাস্তিকতা দমনার্থ নানা বিধ যুক্তি ও উপায় আপন আপন দর্শনে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করেন তাহার পরেই একথার উদ্ভব হয়। তৎপরে যদিও মীমাংসক ঋষিদ্বয় সমুদয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া দুটি মীমাংসা-দর্শন প্রকাশ করেন কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব দর্শনের ন্যায় ঐ কথাটিও আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে।

আর এক কথা এই যে লোকপরম্পরায় যে সমুদয় প্রবাদ আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে তৎসমুদয় যে বিজ্ঞ অর্থাৎ মহাজন পরম্পরাগত এমত নহে। প্রত্যুত তাহার মধ্যে অধিকাংশই অন্ধ পরম্পরাগত। এই কারণে আমরা কখন শুনি যে দুষ্ট গরু অপেক্ষায় শূন্য গোশালা ভাল, আবার কেহ ইহাও বলেন যে "মামা না থাকা অপেক্ষায় কাণা মামাও ভাল"। ফল কথা সময় ও অবস্থানুসারে ব্যবহৃত হইলে উভয় প্রবাদই শুভ ফলপ্রদ হয় নচেৎ কেবল নিজ নিজ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ব্যবহার দ্বারা উভয়কেই প্রমাদের কারণ করা যায়। আজকাল এইরূপ প্রায় সকল বিষয়েই ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মকাণ্ডের প্রস্তাবে জ্ঞানকাণ্ডের বচন ও যুক্তি ব্যবহার, এবং জ্ঞানকাণ্ডের প্রস্তাবে কর্ম্মকাণ্ডের শ্লোক ব্যবহার করাকেই যে "কাণ্ডজ্ঞান শূন্যতা" বলে তাহা আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দেবগুরু বৃহস্পতি নাস্তিক মতের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়া চার্ব্বাক দর্শন প্রচার করেন আর দৈত্য গুরু শুক্রাচার্য্য নীতি শাস্ত্র প্রচার করেন। চার্ব্বাক দর্শনের প্রণেতা বলিয়া বৃহস্পতি কোন কালেও এক দণ্ডের জন্য আপন উচ্চপদ হইতে ভ্রষ্ট হয়েন নাই অদ্যাপি দেবগুরুই আছেন। অথচ ঐ মতের অনুগামীগণ ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত হইয়াছে। শুক্রাচার্য্য নীতিশাস্ত্রের কর্ত্তা হইয়াও কিছু পদোন্নতি লাভ করেন নাই। পূর্ব্বে যাহা ছিলেন তাহাই আছেন। যিনি যেরূপ যে পদে ছিলেন তিনি সেই রূপই আছেন এ কথার তাৎপর্য্য এই যে দেবতারা সুনীতি সম্পন্ন স্বভাবতই সরল প্রকৃতি এবং স্বধর্ম্ম নিরত সুতরাং তাহাদিগকে ঐ ঐ বিষয়ে আর কিছু শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। শিষ্যের যাহা অভাব তাহাই গুরু পূরণ করেন। সরল প্রকৃতি দেবতাদিগকে বাদীদিগের কুতর্ক কিরূপ তাহা অবগত করাইবার নিমিত্ত বৃহস্পতি ঐ কুতর্কপূর্ণ দর্শন প্রণয়ন করেন যদ্দ্বারা দেবতারা ঐরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। এ পক্ষে দৈত্যেরা স্বভাবতই কুনীতিপরায়ণ, সুতরাং শুক্রাচার্য্য তাহাদিগের চরিত্র সংস্কার করণোদ্দেশে সুনীতি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। এইরূপ প্রত্যেক দর্শনকার ও শাস্ত্রকার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন কেবল মতভেদ দেখাইবার নিমিত্ত নহে।

শাস্ত্রের বা বচনের উদ্দেশ্য স্থির না রাখিয়া কেবল শ্লোকার্থ গ্রহণে যে কি অনর্থ

ঘটে তাহা "নেত্র রোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌছিত্বা কটিং দহেৎ" এই বচনের ব্যবহারেই প্রকাশ আছে। বচনার্থ এই, চক্ষু রোগ হইলে তাহার কর্ণ ছেদন ও কটিদেশ তপ্ত লৌহের দ্বারা দগ্ধ করিবে। এটি অশ্বচিকিৎসা অধিকারের বচন। এই বচন অনুযায়ীক কোন চিকিৎসক মনুষ্য চিকিৎসা করিয়া রোগীকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছিলেন এবং নরহত্যা করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে কোন ভাল চিকিৎসক উপস্থিত হওয়ায় এই দায় হইতে ত্রাণ পাইলেন। কাণ্ডজ্ঞানশূন্যতার ন্যায় এটি অধিকারিভেদ অর্থাৎ পাত্রাপাত্র জ্ঞান শূন্যতার একটি দৃষ্টান্ত।

দর্শন অনেকগুলিন। তন্মধ্যে ছয় খানি প্রধান। ১ ন্যায়, ২ কনাদ, ৩ সাংখ্য, ৪ পাতঞ্জল, ৫ পূর্ব্বমীমাংসা, ৬ উত্তর মীমাংসা। এই ছয় খানি, আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, ন্যায় ও কনাদ এই দুইকে ন্যায় দর্শন বলে। সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই দুইকে সাংখ্য দর্শন বলে, এবং পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাকে মীমাংসা-দর্শন বলে। এই কারণে ন্যায় সাংখ্য ও মীমাংসার উল্লেখ করিলে ঐ ষষ্ঠ দর্শনেরই কথা বলা হয়।

আর্য্য শাস্ত্রের সর্ব্বত্রেই জ্ঞান উপার্জ্জনের উপায় তিনটি নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা, শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন। উক্ত তিন শ্রেণীর দর্শন এই তিনটি উপায়ের সমর্থনের প্রধান সোপান স্বরূপ। শ্রুতব্য বিষয় কি তাহা ন্যায় দ্বারা নিরাকরণ হয়। মন্তব্য বিষয় কি তাহা সাংখ্য দ্বারা অবগত হওয়া যায়, এবং শেষে নিদিধ্যাসিতব্য কি তাহা মীমাংসা দ্বারা স্থির হয়। এ পর্য্যন্ত লোক জিজ্ঞাসু থাকেন। পরে এই সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের সংশয় উচ্ছেদ হইলে, তিনি আপন ইষ্ট লাভের নিমিত্ত উচিত উপায় অবলম্বন করিয়া কর্ম্মারূঢ় হয়েন।

উপরোক্ত ভাবে দৃষ্টি করিলে দর্শন পরস্পরের মধ্যে মত-ভেদ দৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত পরস্পরকে পরস্পরের সহায়ক বলিয়া উপলব্ধি হয়। সাধারণত দর্শনকারদিগের মধ্যে মতভেদের যে কথা শুনা যায় তাহার দুটি কারণ আছে। প্রথম রূপান্তর; অর্থাৎ আসল দর্শন এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। আমরা যে সকল ন্যায় বা সাংখ্য, পাতঞ্জল আদি দেখি তাহা আসল নহে। ঐ সকল গ্রন্থ আসলের ছায়া লইয়া অনেক পরে প্রণীত হয়। এরূপ একবার নহে বারম্বার আসলের কোন অংশ লোপ কোন কোন্ অংশের কলেবর বর্দ্ধিত কোন কোন অংশ রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। একথা পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

দ্বিতীয় কারণ একদেশদর্শিতা। অর্থাৎ এক এক ব্যক্তি এক এক দর্শন পাঠ করিয়া অন্যান্য দর্শন অনবগত থাকা হেতু তাহাতে দোষ দর্শন। এটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির একটি পরিচয় মাত্র। স্বীয় স্বীয় পঠিত দর্শনের রূপান্তর করাও এই কারণে অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে। সমুদয় দর্শনবেত্তা পণ্ডিতকে কখন কখন এই মতভেদ মতের সমর্থন করিতে দেখা যায় না, বরং তাঁহারা পুরাণাদি গ্রন্থও আদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই দর্শনগুলির আর একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মনুষ্য কায়দ্বারা, বাক্যদ্বারা, এবং মনদ্বারা কার্য্য করে। এই ত্রিবিধ কার্য্যের সহিত এই তিন শ্রেণীর ছয় খানি দর্শনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কণাদ পরমাণুজগতের অর্থাৎ শরীরী-জগতের আলোচনা করেন। ন্যায় শব্দ বা বাক্য জগতের আলোচনা করেন। সাংখ্য মনের সংশয়াত্মক জগতের বিষয় আলোচনা করেন। পাতঞ্জল মনের সঙ্কল্পাত্মক জগতের আলোচনা করেন। পূর্ব্ব মীমাংসা, অর্থাৎ ধর্ম্ম মীমাংসা, (কর্ম্ম কাণ্ড) বুদ্ধির অভিমানাত্মক (অহংকারাত্মক) জগতের আলোচনা করেন, এবং উত্তর মীমাংসা (ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত) বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মক বিষয়ের আলোচনা করেন। এ বিষয়ে সাবকাশ অনুসারে পরে বিশেষ করিয়া বিবৃত করা যাইবে। আপাততঃ একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। সকলেই জানেন যে কর্ম্মকাণ্ড (পূর্ব্ব মীমাংসায়) এবং জ্ঞানকাণ্ডে (উত্তর মীমাংসায়) বিশেষ বিরোধ আছে। কর্ম্ম কাণ্ডের মতে বৈদিক কর্ম্মই চিত্ত শুদ্ধির জনক। আবার জ্ঞানকাণ্ডের মতে সকল প্রকার কর্ম্মই বন্ধনের এবং মনোমালিন্যের কারণ। ইহার তাৎপর্য্য কি একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যায় যে, বাসনাপ্রবল অসংযতেন্দ্রিয় লোক সকলের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ড এবং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন লোকদিগের জন্য জ্ঞানকাণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। অসংযত লোকের পক্ষে স্বেচ্ছাচার অপেক্ষায় বিধিমত বিবাহাদিই শ্রেয় ও চিত্ত প্রসাদের একটি মহান উপায়, এবং শম দমাদি সম্পন্ন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিবাহ বিধির অপ্রয়োজন; কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই প্রয়োজন। যেরূপ লোকের পীড়িতাবস্থাতেই তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত ঔষধ এবং পথ্যাদি বিহিত। সুস্থকায় লোকের জন্য যাহাতে তিনি কোন ভ্রম প্রমাদ উপস্থিত হইয়া রোগাক্রান্ত না হয়েন এপ্রকার জ্ঞানেরই প্রয়োজন। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডের বিধি উপদ্রব উপশমনের উপযোগী। অর্থাৎ তাহা অন্তঃকরণের রোগঘ্ন (Curative), আর জ্ঞানকাণ্ডের বিধি স্বাস্থ্যরক্ষাকর (Health Preserving) বলিলে দোষ হয় না। এই উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ নাই। লোকের অবস্থা বা অধিকার ভেদে ইহাদের প্রয়োগের ভেদ আছে। পাত্রাপাত্র ভেদে যোগ্যাযোগ্যের বিচার করিতে হয়। নচেৎ কাম, ক্রোধ, লোভ ধর্ম্মে অর্থাৎ বিবাহের সময়, ধনোপার্জ্জনের সময়, বৈরনির্যাতন ও ইন্দ্রিয় বিলাসের সময় আর পিতৃ শ্রাদ্ধাদির সময়, এবং দৈবকার্য্যে বীতরাগীত্ব এবং আহার বিহারে স্বেচ্ছাচারিত্ব এইরূপ আচারই কাণ্ডজ্ঞান-রহিত্যের ও কলিধর্ম্মের (অর্থাৎ আহার-বিহার পরায়ণতার) পরিচয় মাত্র। এটি ধর্ম্মও নহে জ্ঞানও নহে কেবল সুবিধা।

কলিধর্ম্মের অন্য একটি নাম আসুরিক সম্পত্তি। এই আসুরিক সম্পত্তির কারণ বিষ্ণু মায়া। বিষ্ণু মায়াকে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তিও বলে। এই দেহে আত্মবোধই ঐ মোহিনী মূর্ত্তি। অর্থাৎ দেহাত্মবাদকেই বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি শাস্ত্রে বলে, এবং এই দেহে আত্মবোধ হেতুক অসুরেরা চিরদিনই সুধার স্থলে গরল পান করিয়া অমৃত ভ্রষ্ট হইতেছেন।

কলিধর্ম্ম ঐ মোহিনী-মূর্ত্তির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মে প্রচলিত পৌত্তলিকতা নাই বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে নিতান্ত জঘন্য প্রকারের পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব আছে। আর্য্য শাস্ত্রের উপদিষ্ট প্রকৃতি পুরুষে যোগের (জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব) পরিবর্ত্তে ইহাতে সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারকেই শ্রেষ্ঠ করে! শম দমাদি সম্পত্তির পরিবর্ত্তে রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রাই ইহাতে প্রধান সম্পত্তি! মদ্য পানে অঙ্গ অবশ হওয়াই ইহার উপরতি। মাংসই ইহার শ্রদ্ধা! এবং কণ্টকাকীর্ণ মৎস্যই ইহার তিতীক্ষা!

এই ধর্ম্মের এক্ষণে জগতের প্রায় সর্ব্ব স্থানেই প্রাদুর্ভাব। এই দেহাত্মবাদ প্রথমে বৌদ্ধ-প্রস্থান রূপে প্রচার হয় পরে তন্ত্র রূপে পরিণত হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করে।

দুঃখের বিষয় এই; বঙ্গদেশে একটিও বৈজ্ঞানিক দর্শন এ পর্য্যন্ত আইসে নাই। ন্যায় শাস্ত্রকে (Logic) বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে না, পরন্তু বিজ্ঞানের অভাবে ন্যায় শাস্ত্র কুতর্ক ও বিতণ্ডা-কারক মাত্র। যেরূপ গীত শূন্য তান মান, সেইরূপ বঙ্গদেশের ন্যায়শাস্ত্র সাংখ্য ও মীমাংসা অভাবে কেবল ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছে। তবে যে ন্যায়ের মধ্যে মুক্তিবাদের কথা আছে তাহা মৃদঙ্গে মহিম্ন স্তোত্রের ন্যায়। এক দিকে কুতর্ক প্রবল, অপরদিকে প্রাচীন সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অবজ্ঞা! ফল এই হইল-যে কোন প্রকারে হউক নিজ পক্ষ সমর্থন এবং বিপক্ষকে পরাজয় করাই সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে বিশকর্ম্মার পুত্রেরা আবার বাইশ কর্ম্মা হইতে লাগিল। ব্রহ্মাবর্ত্তে ও আর্য্যাবর্ত্তে যাহা যাহা আছে তৎসমুদয়ই একে একে বঙ্গদেশে উপ-রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সংমিলন—বঙ্গের উপ-প্রয়াগ অর্থাৎ ত্রিবেণীতে ঐ তিনের পুনঃ বিচ্ছেদ। পুরুষোত্তম জগন্নাথ—উপ-পুরুষোত্তম মাহেশে উপনীত হইলেন। বৃন্দাবনের পরিবর্ত্তে গুপ্তবৃন্দাবন স্থাপিত হইল। মকুন্দ শ্যামরায় বাগবাজারে মদনমোহন বেশে উপস্থিত। কাশীর বিশ্বনাথ তারকেশ্বরে উদয় হইলেন। কর্ম্মনাশা নদীর ফল ব্রহ্মপুত্রই দিতে লাগিলেন—ভূ-কৈলাশ কৈলাশ রূপে দেখা দিলেন। এইরূপে নানা স্থানের নানা দেবদেবী বঙ্গের নব নাট্যশালায় উপ-রূপে উপনীত হইলেন।

কেবল যে উপদেবতারাই বঙ্গে আসিলেন এরূপ নহে। নূতন উপধর্ম্মেরও আবির্ভাব হইতে লাগিল। নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম নূতন শাক্তধর্ম্ম এবং নূতন হিন্দুধর্ম্মও জন্ম লইলেন। কেবল তাহাই নহে। নূতন নূতন ধর্ম্মের নূতন নূতন উপ-অবতারও অবতীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বে চৈতন্যপ্রভু, আগম প্রভৃতি ছিলেন। অধুনা বঙ্গের নাট্যলীলায় অসংখ্য অবতার প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ হইতেছে। পূর্ব্বে ধার্ম্মিক লোকেই অবতার বলিয়া গণ্য হইতেন; অর্থাৎ ধর্ম্মের কারবারীগণই মহাত্মা নামের অধিকারী ছিলেন, এখন যে দু লাইন গদ্য লেখে সেও অবতার; যে দু লাইন পদ্য লেখে সেও অবতার, আর চীৎকার করিয়া যে বিষয়েই হউক দুইটা কথা কহিতে পারিলে সেও অবতার!

সুতরাং চৈতন্যের স্থান নবচৈতন্যে অধিকৃত ! আর চূড়ামণি মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত !

ইহাতেই বোধ হইতেছে আমরা আর্য্য হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি। এই জাতির সৃষ্টি কেন হইল পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, যেরূপ আফিসে যাইবার সময়ে ছেক্ড়া গাড়ির প্রয়োজন ও তাহা টানিবার নিমিত্ত একটা ঘোড়ার সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক তদবৎ কেরানিগিরি করিবার নিমিত্ত এই বাঙ্গালি জাতির সৃষ্টি। আমাদিগকে বাঙ্গালি তদ্ভাবে কেরাণি বিকল্পে গোলামের জাতি বলা যাইতে পারে।

এক্ষণে আমাদিগের ধর্ম্মবিষয়ক কারণ কতক বুঝিবার পথ পাওয়া গেল। দাসত্বকেই কুক্কুর বৃত্তি বলে। দাসত্বই শূদ্রত্বের মূল। দাসত্বের স্বভাব অনুকরণপ্রিয়তা এবং তন্নিমিত্ত আধিপত্যেচ্ছা বিলাসপ্রিয়তা ও নির্দ্দয়তা। প্রভু যেরূপ আপন দাসের সম্বন্ধে ব্যবহার করেন দাস সে গুলি মন্দ জানিয়াও আদর্শ জ্ঞানে অল্পে অল্পে তাহাই শিক্ষা করে। প্রভুর আধিপত্য দেখিয়া দাস আপন পোষ্যবর্গের বিশেষ স্ত্রীর উপর দ্বিগুণ আধিপত্য দেখায়। প্রভু অল্প নিষ্ঠুর হইলে দাস তাহার চতুর্গুণ নিষ্ঠুর হয়। প্রভু মিথ্যাবাদী হইলে দাস একটি দস্যু হইয়া উঠে। এই সকল কারণে আর্য্য শাস্ত্রে দাসত্ব নিষিদ্ধ এবং যদ্যপি কখন দাসত্ব করা নিতান্ত প্রয়োজন হয় তবে উচ্চ বর্ণের নিকট করিবার বিধি আছে, হীনাচারের দাসত্ব এক কালীন বর্জ্জনীয়। দাসত্ব হৃদয়কে সংশয় পূর্ণ, বিদ্বেষপূর্ণ, ঈর্ষাপূর্ণ, কৃতঘ্ন এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। এই হৃদয়সঙ্কীর্ণতা প্রযুক্ত দাসকে ছোট লোক বলা প্রচলিত হইয়াছে। আমি স্বজাতীয় দাস সম্বন্ধেও প্রভুকে ঐ কথা প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি। তাহা যে অযোগ্য হয় নাই ইহা বলা বাহুল্য ! পাচক ব্রাহ্মণেরা ইহার এক প্রধান দৃষ্টান্তের স্থল। এক্ষণে কেহ যদি বলেন যে শূদ্রত্বের চিহ্ন আপন আপন স্বাক্ষরে দাস শব্দের উল্লেখ করা—তাহা কই ? তাহাতেও আমাদের ত্রুটি নাই ! your most obedient servant (অর্থাৎ আপনার আজ্ঞাবহ দাসানুদাস) এই পদটি আমাদিগের মধ্যে সভ্য সম্প্রদায়ের স্বাক্ষরের সম্মানসূচক পাঠ। সুতরাং আমরা কোন বিষয়েই ন্যূন নহি ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। যাহাই হউক আমরা কি ছিলাম এবং ক্রমে ক্রমে কি হইলাম ! যে দগ্ধ উদর এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির নিমিত্ত এই সমস্ত ঘটিয়াছে তাহারই বা কষ্ট বিদূরিত কি হইয়াছে ? দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট, কন্যাভার ইত্যাদি ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। হা বিধাতঃ !

একটি প্রাচীন এই প্রকারে কিঞ্চিৎ মুক্ত-কণ্ঠে চিন্তা করিতেছিলেন। এই সময়ে সমীপবর্ত্তি একটি যুবক আর নীরব থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "মহাশয় অনেক কথা বলিতেছেন ইহার মধ্যে সকল গুলিই স্বীকার করিতে পারি না ! যাহা হউক এ রোগের ঔষধি কি বলিতে পারেন তো বলুন।" শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। *

* লেখক লোকান্তর-গত। ভাং সং

আপনা হতে তুমি আপনা।

বিরহ কারে কয়?
আমি ত দিবানিশি তোমাতে আছি মিশি
জগৎ সদা হেরি—তুমি-ময়!
বিরহ কারে কয়?
প্রভাতে রবি ওঠে কাননে ফুল ফোটে
পাখীরা গাহে গান, বাতাস ধীরে বয়;
তাহে—তোমারি দরশন তোমারি পরশন
তোমারি মধুভাব উথলয়!
দুপুরে খর জ্যোতি তাপের তেজ অতি
তাহে—আর এক ভাতি তোমারি!
কাহারো কটু ভাষে যখন মরি ত্রাসে,
অমনি রোষানল নেহারি!
আকাশে ঘনঘটা ঢাকিয়া রবি ছটা
যখন বারিধারা বরষে,
আমার অভিমান, তোমার প্রেম গান
আকুল সাধাসাধি—যেন সে।
আবার মেঘ ছুটে আলোক ওঠে ফুটে,
প্রশান্ত চারিদিক—অতিশয়;
ফুরায় ধীরে বেলা, মেঘের চারু খেলা
তোমার প্রেম-লীলা—প্রকাশয়!
সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে, জ্যোৎস্নার ফুল ফোটে
পাপিয়া গাহে গান, তারকা হেসে চায়!
আবেশে ঢল ঢল, মধুর সুকোমল
অলস দিশা হারা—চাহনি তব ভায়।
রজনী সুগভীর নিদ্রায় ধীর স্থির
স্বপন তোমারি যে, বিরচয়!
বিরহ হেথা যত মিলনে অনুরত
গাঁথিছে মিলেমিশে—প্রেমের-সুবিস্ময়!
কে বলে তুমি দূরে! আমার হৃদিপুরে
তোমার করিয়াছি স্থাপনা!
আমি ত দিবানিশি তোমাতে আছি মিশি
আপনা হতে তুমি আপনা!

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

রতিবিলাপ।

রতিবিলাপ পড়িতে পড়িতে দুটী একটী কথা বড় ঠিক বলিয়া মনে হয়। সেই দুই একটী শ্লোক কুমারসম্ভবের পৃষ্ঠা হইতে ভারতীর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যতটুকু বক্তব্য ঠিক সেইখান হইতে আরম্ভ না করিয়া দুই সর্গ পিছাইয়া গল্প করা যাক্। যাঁহারা কুমারসম্ভব পড়েন নাই, তাঁহাদের পক্ষে তাহা হইলে বুঝা সহজ হইবে, এবং যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের ভাল কথা দুবার শুনিলে ক্ষতি নাই।

সেনাপতি কার্ত্তিকের জন্ম না হইলেই নয়, তারকাসুরের দৌরাত্ম্যে দেবতাগণের দুর্দ্দশার একশেষ। তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনাদের দুঃখের একটী লম্বা ফর্দ্দ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট এক ডেপুটেশন পাঠাইলেন। বৃহস্পতি শর্ম্মা তাঁহাদের বক্তা। অনুনাসিক ক্রন্দন সমেত তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মাদেব নাকে চসম আঁটিয়া—(N. B. এটা রূপক, গম্ভীর সত্য নয়)—উপস্থিত দেবমণ্ডলীর উপর দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া

বলিলেন, "বাবাজিউ সকল! তোমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, তোমাদের সে কান্তি আর নাই, বদনারবিন্দ দুই হাত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে"— তাহার পর এমন একটা উপমা ব্যবহার করিলেন যাহা উপস্থিত দেবতাবৃন্দের মধ্যে বৃহস্পতি ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। মনে কর কিরূপ উপমা?—বৈয়াকরণিক! মনে করিতে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! ব্রহ্মাদেব বলিলেন, "উৎসর্গ যেরূপ অপবাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাশূন্য হয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ তোমরা সেইরূপ বলবত্তর শত্রু কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছ।" এখানে উৎসর্গের অর্থ সামান্য শাস্ত্র, অপবাদের অর্থ বিশেষ শাস্ত্র। যথা "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃকৃতী" এই উৎসর্গ 'নোদন্তস্য' এই অপবাদ কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত হয়। ইন্দ্রপ্রমুখ অধিকাংশ দেবতা টোলের ছাত্রও নহেন, কিম্বা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষার্থী অতএব সংস্কৃতাধ্যায়ী বঙ্গ যুবকও নহেন, সেই জন্য মল্লিনাথের টীকাটা তাঁহাদের তেমন সড়গড় নাই, অতএব অতর্কিতে এতখানি তিক্ত ব্যাকরণের ডোজ গলাধঃকরণ করিতে তাঁহাদের কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছিল বেশ অনুমান করা যায়, কিম্বা তাঁহাদের দীর্ঘায়িত বদনমণ্ডলের উপর এই উপমাটি কিরূপ নিরীহ নির্ব্বুদ্ধিতা বিস্তার করিয়াছিল তাহা কল্পনা করিতেও আমোদ আছে। তাহার পর ব্রহ্মাদেব কি বলেন শোন:—"অবস্থা সব বুঝিতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার হাত পা বাঁধা; জানইত স্বহস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করিলেও তাহাকে আর নিজে উৎপাটন করিতে নাই, সুতরাং আমি তোমাদের দুঃখমোচন করিতে পারিলাম না, তবে এক সৎপরামর্শ দিই শোন, আমাদের শঙ্কর ভায়ার বিবাহের যোগাড় দেখ। তাঁর আত্মজ শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্র ভিন্ন আর কেহ তারকাসুরকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না। সুতরাং সে যোগীর যোগ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বিবাহের পথে লওয়াও, তাহাতে তোমাদেরও উপকার আছে, আর হিমালয়ের বিবাহযোগ্যা কন্যা রহিয়াছে ঘরে, সে ভদ্রলোককে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহারও একটা উপকার করা হয়। অতএব উমার সহিত শিবচন্দ্রের বিবাহটী ঘটাইয়া দাও।" এই শুধু আর কিছু নয়? এ ত সহজ কথা। দেবতাগণ উৎফুল্ল হইয়া আপনাদের মধ্যে আবার মিটিং ডাকিয়া এক রেজলিউশন্ মুভ্ করিলেন যে, মদনকে তাহার ফুলশর হইয়া স্থাণুর আশ্রমে পাঠান হউক। তাহাই স্থির হইল। কন্দর্প স্বেচ্ছায় বহ্নিমুখে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মাও তাহাই চান; মদন একবার তাঁহাকে বড় অপদস্থ করিয়াছিল; ব্রহ্মা এখনও তাহা ভুলিতে পারেন নাই, এখনো তাঁহার মনে তাই প্রতিশোধ-স্পৃহা জাগিতেছে। এতদিনে তাহা চরিতার্থ করিবার সুবিধা ঘটিল।

মদন, রতি ও বসন্তকে লইয়া স্থাণুর আশ্রমে পদার্পণ করিতেই দেখিতে দেখিতে সে কাননে ফুল ফুটিয়া উঠিল, মলয় ছুটিল, ভ্রমর উড়িল, কোকিলের কুহুতানে কানন মাতিয়া উঠিল বাহ্যপ্রকৃতির এমন সরস মধুর ভাবে অন্তঃপ্রকৃতিও পাল্টিয়া গেল। সে আশ্রমে যত জীবজন্তু ছিল সকলেরই হৃদয় আপন আপন সহচর সহচরীর প্রতি প্রেমরসে

প্লুত হইল। মহাদেবের অনুচর প্রমথগণের ভৌতিক হৃদয়ও একবার চঞ্চল হইবার উপক্রম * হইল। নন্দী দেখিল সর্ব্বনাশ। প্রভুর বিরুদ্ধে দেবতাগণের ষড়যন্ত্র সে বুঝিল। সত্বর বাম হস্তে হেমবেত্র ধারণ করিয়া লতাগৃহ দ্বারে আসিয়া অধরে অঙ্গুলি স্থাপন পূর্ব্বক সঙ্কেত করিল। মুহূর্ত্তে সব শান্ত। পাখী আর গায় না, মৃগ আর চরে না, মলয় আর বহে না, সবই নিবাতমৃনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্, সবই যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। কখন কোকিল গাহিতেছিল, কখন নন্দীর শাসনে তাহার গান বন্ধ হইল, মহাদেব তার কিছুই জানিলেন না। তিনি অনন্যমনে ধ্যানপরায়ণ। তাঁহার দাঢ্য দেখিয়া মদনের সাহস কমিয়া আসিল, হাত হইতে ফুলবান খসিয়া পড়ে পড়ে। কিন্তু সহসা দেখিল অদূরে দুই বনদেবীর মাঝে পুষ্পাভরণা উমা আসিতেছে, যেন সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা। বসন্তের যত কুসুম তাহার অঙ্গ আভরণ। হাতে অশোকের বলয়, কবরীতে কর্ণিকার, গলায় সিন্ধুবার, কটিদেশে বকুলের মেখলা। নিশ্বাস সৌরভে তৃষিত হইয়া ভ্রমর অধরের নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উমা প্রতিক্ষণ চঞ্চল দৃষ্টিতে লীলাপদ্ম নাড়িয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিতেছে। মদনের হৃদয়ে আবার বল ফিরিয়া আসিল, সে ধনুক আঁটিয়া ধরিল। নন্দী গিয়া মহাদেবকে জ্ঞাপন করিল শৈলসুতা তাঁহার শুশ্রূষার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ভ্রূক্ষেপের দ্বারা অনুমতি করিলে নন্দী উমাকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া আসিল। উমা মহাদেবকে প্রণাম করিল, প্রণাম করিবার কালে তাহার সুনীলঅলকশোভী নবকর্ণিকার মাটিতে খসিয়া পড়িল। মহাদেব আশীর্ব্বাদ করিলেন, "অনন্যভাজন পতি লাভ কর।" তাহার পর উমা স্বহস্তে গ্রথিত মালা আনিয়া মহাদেবের নিকট ধরিল। রুদ্র তাহা গ্রহণ করিতে গিয়া একবার মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য হারাইলেন। উমার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন কুসুমময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকার মুখে হৃদয়ের ভক্তি-সৌন্দর্য্যের ছায়া পড়িয়া তাহাকে আরো দ্বিগুণ সুন্দর করিয়াছে। শুধু আজ নয়, প্রতিদিন উমা শঙ্করকে শুশ্রূষা করিতে আসে; তাহার অটল ভক্তি ও প্রেম ভক্তবৎসলের হৃদয়ে বোধ করি এতদিনে প্রতিধ্বনি জাগাইয়াছে। আজ যখন মহাদেব উমার মুখের প্রতি চাহিলেন, উমাও তাহার হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে পারিল না, তাহার শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল, সে লজ্জায় চোখে চোখে চাহিতে পারিল না, মুখ ঈষৎ আড় ভাবে রাখিল। মহাদেব মুহূর্ত্তের জন্য ধৈর্য্য হারাইলেন। চন্দ্রোদয়ের আরম্ভে সমুদ্রের জলরাশি যেমন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠে, এ সেইরূপ চঞ্চলতা; কবি বলিলেন এই সময় মদন সম্মোহন নামে বাণ ছাড়িয়াছিলেন তাই মহাদেবের এ চাঞ্চল্য। কিন্তু সে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয় ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া তাঁহার বিকৃতির কারণ জানিবার নিমিত্ত দিগন্তে দৃষ্টি প্রসারণ করিলেন। দেখিলেন মদনের দক্ষিণ অপাঙ্গে মুষ্টি লগ্ন রহিয়াছে, স্কন্ধদেশ নত, বামপদ কুঞ্চিত, পুষ্পচাপ চক্রাকারে ধরিয়া তাঁহারই প্রতি বাণ উদ্যত করিয়াছে। তপোভঙ্গে

ত্রিলোচনের ক্রোধ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার উপর মদনকে এই ভাবে দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার ললাটনেত্র সহসা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। দেবতাগণ অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহারা মদনের আসন্ন বিপদ দেখিয়া মহাদেবকে শান্ত করিবার নিমিত্ত আকাশ হইতে শতকণ্ঠে কাতরে অনুনয় করিয়া উঠিলেন, "ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর" কিন্তু তাঁহাদের এ বাণী আকাশে থাকিতে থাকিতেই ত্রিলোচনের ললাট-নেত্রজাত বহ্নির দ্বারা মদন ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। রতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, রুদ্র অন্তর্ধান হইলেন। উমাকে নিগ্রহ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন—পিতার অভিলাষ ব্যর্থ, তাহার দেহলালিত্য ব্যর্থ; উমা এই কারণে আরও বড় ব্যথা পাইল যে তাহার সখীদের সাক্ষাতেই তার এই লজ্জাকর অবস্থা সহিতে হইল। সে শূন্যহৃদয়ে কোনমতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। নগেন্দ্র যখন দেখিলেন, রুদ্রের ভয়ে উমা চোখ আর মেলিতে পারে না, যখন বুঝিলেন মহাদেব অনাদর করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন উমার হৃদয়ের ব্যথা তাঁর বুকে আসিয়া বাজিল, দুই হাতে করুণস্নেহে কন্যাকে বুকে ধরিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। মহাদেবকে বশ করা দেবতারা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন এখন দেখিলেন তত সহজ নয়; তাঁহাকে বশ করিতে গিয়া মদন ভস্মাবশেষ হইলেন, রতি মৃতপ্রায়া হইলেন, উমা মর্ম্মাহত হইল, নগেন্দ্র নতশির হইলেন।

মূর্চ্ছাপন্না রতি ক্রমে ক্রমে চেতনা লাভ করিলেন, কিন্তু তখনও এ জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই যে মদন চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন। সহসা ভূমিতে পুরুষাকৃতি হরকোপানলভস্মের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তখন রতি ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে নীরব অশ্রুপাত নহে, একসর্গ ধরিয়া আর্ত্তনাদপূর্ণ বিলাপ। রতি বলিলেন, "তোমার যে অঙ্গ সুপুরুষের উপমাস্থল ছিল, আজ তাহার এই দশা, অথচ আমার বক্ষ এখনও বিদীর্ণ হইল না, নারীহৃদয় নিতান্তই কঠিন।" নির্ব্বাসিতা সীতাও পঞ্চবটী বনে মূর্চ্ছাপন্ন রামকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়াও আমি বাঁচিয়া আছি, নারী হৃদয় সত্যই বড় কঠিন।" সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, প্রোফেসর লম্ব্রোজো এই সত্যের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দিয়াছেন। এতদিন নারীরা শুধু আপনার উপর অভি-মান করিয়া নিজেকে কঠিন হৃদয় বলিতেন, কিন্তু সে কথাটা নিজেই বিশ্বাস করিতেন না, আর ইহাও জানিতেন পুরুষেরাও তাহা বিশ্বাস করেন না, সেই সাহসেই কথাটা প্রকাশ্যে, মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেন, স্থির জানিতেন পুরুষেরা দ্বিগুণ উৎসাহভরে তাঁহা-দের প্রতিবাদ করিবেন। কিন্তু আজকাল সে দিন গিয়াছে, এখনকার পণ্ডিতেরা আমাদের মুখনিঃসৃত কথাকে বেশী হুবোহুব রূপে বিজ্ঞানের ভাষায় তর্জ্জমা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তার ভাবটার প্রতি আর লক্ষ্য রাখিতেছেন না, অতএব আমি বলি, রমণীদের আজকাল পুরুষসমাজে আত্মদোষ চাপিয়া যাওয়াই ভাল, কেননা পুরুষেরা তাঁহাদের সরলতার বড় অপব্যবহার করিতেছেন। আসল কথাটা এই, মানুষের শরীরের

বামপার্শ্বে হৃদয় বলিয়া যে একটা পদার্থ অবস্থিত আছে, সেটা নিতান্তই ক্ষণভঙ্গুর জিনিষ নহে; আমার বিশ্বাস সেটা একটা তরল রকম ব্যাপার। তাহাতে কখনো জোয়ার, কখনো ভাটা খেলিতে থাকে, তাহার কোন অংশ বা সময়বিশেষে স্ফীত হইয়া উঠে, কোন অংশ দমিয়া যায়; তাহা কখনো তপ্ত, কখনো বা শীতল। তাহাতে তরল পদার্থের সমস্ত গুণই বর্ত্তমান, সুতরাং তাহার পরমাণুগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা বড় শক্ত, তাই কবিতা ও উপন্যাস ছাড়া আর কোথাও বড় একটা বুক ফাটিয়া মরার কথা শোনা যায় না।

রতির বিলাপে মাঝে মাঝে পুরুষজাতির প্রেমের দৃঢ়তার প্রতি, স্ত্রীজাতির সন্দেহ ও অবিশ্বাস বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রতি বসন্তকে ডাকিয়া বলিতেছেন, "বসন্ত! শীঘ্র আমার চিতা প্রস্তুত কর, জাননা তোমার সখা আমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারেন না।" বসন্তকে এইরূপ বুঝাইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে মনে ক্রমাগত ভয় হইতেছে, পাছে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইলে কোন চতুর সুরকামিনী আসিয়া তাঁহার সুন্দর স্বামীটিকে দখল করিয়া বসে, স্বামীটিকে স্বর্গে একলা ছাড়িয়া দিয়া তিনি কোন মতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। একবার মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন; "আমি এত ডাকিলাম, না হয় শুনিলে না, কিন্তু তোমার সখা বসন্তকেও কি প্রত্যুত্তর দিবে না? পুরুষদের স্ত্রীর প্রতি প্রেমই চঞ্চল জানি, কিন্তু বন্ধুর প্রতি প্রণয় ত চিরকাল অটল।" রমণীর উপর পুরুষজাতির ঐকান্তিক আস্থা সম্বন্ধে রতি স্পষ্টই ঘোর সন্দেহবাদী। আর একটা শ্লোকে রতির একটা মেয়েলী ভাব বড় ধরা পড়িয়াছে। তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন যে, "মদনের মৃত্যুর পর ক্ষণমাত্র কালও রতি বাঁচিয়াছিল, লোকে চিরকাল এই বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিবে।" অতি দুঃখের সময়ও রমণী লোকনিন্দা, লোকলজ্জা ভুলিতে পারে না। আমার প্রিয়জনের অভাবে আমার যে আন্তরিক কাতরতা তাহা যেন অত্যন্ত পবিত্র, নিভৃত বস্তু নয়, লোকের সম্মুখে তাহার একটা পরিষ্কার বড় রকম হিসাব ধরিতে না পারিলেই নয়, পাছে লোকের চোখে তাহাকে দেখিতে কম হয় এই ভয়েই রমণী সারা।

রতি বিলাপ করিতে করিতে একবার বলিলেন, "আমাকে তোমার বিরহ বেশী দিন ভোগ করিতে হইবে না, কেননা আমি ত এখনি চিতায় আরোহণ করিয়া পরলোকে তোমার অনুগমন করিব, কিন্তু এই পৃথিবী তোমাতে বঞ্চিত হইয়া কিরূপে বাঁচিয়া থাকিবে? ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখং।" মদন আর রতির সম্পর্ক ছাড়িয়া, মূর্ত্তির সম্পর্ক ছাড়িয়া, কবি একবার মানুষের সম্পর্কে প্রেমকে দেখিলেন; প্রেমহীন জগতের নীরসতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া বলিলেন—

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতেপুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ
বসতিং প্রিয়! কামিনাং প্রিয়া ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ।

রজনী মাথার উপর তিমিরের অবগুণ্ঠন টানিয়া চারিদিক গাঢ় অন্ধকারময় করিয়া রাখিয়াছে; কড় কড় বজ্রের শব্দে বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তবু সে ভীরু রমণী সেই অন্ধকার বাহিয়া চলিয়াছে, এত তাহার হৃদয়ে প্রেম; অবলা নারী প্রেমবলে এমনি বলীয়ান্ যে কঠিন, বিরোধী, অন্ধ, জড়প্রকৃতির সহিত দ্বন্দ্বে সেই বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু তাহার প্রেমটুকু কাড়িয়া লও, জড়প্রকৃতি তাহার প্রভু হইয়া, তাহাকে পদদলিত করিয়া চলিয়া যাইবে।

নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে
অসতি ত্বয়ি বারুণী মদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা।

প্রণয়ীর সহিত এক পাত্রে বারুণী মদ পান করিয়া প্রমদার অরুণনয়ন যদি ঈষৎ ঘুরিয়া আসে, আর প্রেমবচন একটু আধটু স্খলিত হয় তাহাতেও তত ক্ষতি নাই, প্রেম-সুন্দর হৃদয় একটুখানি স্ফূর্ত্তিময় করিবার জন্য এ মদিরা পান কি না, তাই ইহার ভিতরও যেন একটু সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু যখন প্রমদারা শুধু মদ্যপানের জন্যই মদ্যপান করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে প্রেমের লেশ নাই, তখন সে নয়ন ঘূর্ণন নিতান্তই কুৎসিত দৃশ্য।

অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ প্রিয়বন্ধোস্তব নিষ্ফলোদয়ঃ
বহুলেঽপি গতে নিশাকর স্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ মোক্ষ্যতি।

কৃষ্ণপক্ষাবসানে শুক্লপক্ষে প্রতিদিন এক এক কলা করিয়া চাঁদের বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু নরনারী আর আকুল আগ্রহভরে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে না। তেমনি সুন্দর চাঁদ, তেমনি মধুর জ্যোৎস্না; কিন্তু কোথা সে প্রেমিকযুগল, কোথা তাহাদের মুগ্ধ আঁখি? প্রেমহীন পৃথিবীতে চন্দ্রোদয় শুধু বিড়ম্বনা।

হরিতারুণচারুবন্ধনঃ কলপুংস্কোকিল শব্দসূচিতঃ
বদ সম্প্রতি কস্য বাণতাং নবচূতপ্রসবো গমিষ্যতি।

বসন্তকালে আম্রের গাছে সেই নূতন পাতা ধরিয়াছে, ডালে ডালে কোকিল গাহিতেছে, জড় প্রকৃতি তেমনি সুন্দর সাজিয়াছে, কিন্তু আমি এ সব কিছুই উপভোগ করিতে পারিতেছি না, পৃথিবীর এত সৌন্দর্য্য আমার পক্ষে সব ব্যর্থ, কেননা আমার হৃদয়ে প্রেম মরিয়াছে।

রতিবিলাপের এই চারিটী শ্লোকে কবি সমস্ত মানবের হইয়া প্রেমের মরণে শোক-গীতি গাহিয়াছেন। বাকী শ্লোকগুলি পাঠক একবার পড়িয়া ভুলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু এই চারিটী শ্লোক বহুদিন ধরিয়া মনে জাগিবে।

শ্রীসরলা দেবী।

সাহিত্যের সত্য।

(পত্র)

আপনি আমার কাছ থেকে বঙ্গসাহিত্যের খপরাখপর চেয়েছেন। কিন্তু আমি সাহিত্য-বৈদ্য নই যে তার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের নিখুঁৎ বিবরণ পাঠাতে পারব। তবে আপনি আমাকে অব্যবসায়ী জেনেও যখন নাছোড়বন্দা হয়ে হুকুমের উপর হুকুম জারী করছেন, তখন আমার নাচার হয়ে শিক্ষানবীশের কলমটা চালাতে হচ্চে, দেখা যাক্ কি রকম দাঁড়ায়। আপনারা বুঝি সেখানে হাস্যরসের অভাবে নিতান্ত মিইয়ে পড়েছেন, তাই আমার শরণাপন্ন হয়েচেন? ভাল, ভরসা করি যথেষ্ট পরিমাণ এই চিঠির মধ্যে তা মোড়ক করা পাবেন। ফলেই ঔষধের গুণের পরিচয়, অতএব এখানে ফলটা কিরূপ হয় শোনবার জন্যে বিশেষ উৎসুক রইলুম।

গোড়াতেই আমায় বল্‌তে হচ্চে যে আজকাল সাময়িক পত্র ও পত্রিকায় সাহিত্যের মূল ও ভিত্তি নিয়ে যে রকম নাড়া চাড়া পড়েচে তাতে আর কিছু না হোক্ এটা বেশ বোঝা যাচ্চে যে, বঙ্গসাহিত্য আর তার দোলনার উপরে রঙ্গিণ নেটের ঢাকার মধ্যে হাত পা গুটিয়ে শয়ন করে সুখে নিদ্রা যেতে রাজী নয়; এখন তার হাত পা হয়েছে, সে ন'ড়ে চ'ড়ে বেড়াতে চায়। সে আপনাকে খুব বিজ্ঞভাবে দেখে বটে, কিন্তু তাই বলে চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদের যদি তাকে সেই ভাবে নিতে হয়, তবে অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়ীর জিনিস পত্র ভেঙ্গে চুরে, ফেলে ছড়িয়ে, ঘরের সুব্যবস্থাকে অব্যবস্থায় পরিণত করে আপনার সম্যক্ মর্য্যাদা রক্ষা করতে তাঁর বড় অধিক সময়ের প্রয়োজন করে না। এমন কি হয়ত তাঁর জন্যই আবার ডাক্তার ডাকার উদ্দেশ্যে চারদিকে লোক দৌড়তে হয়। সে এখনও চঞ্চল, অধীর, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য—সে আপনি পুতুল গড়ে ভাঙ্গে; আর পুতুলটাকে মানুষের মত করে আপনার মনে তার অন্নপ্রাশন থেকে বিবাহ পর্য্যন্ত দিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। এইজন্যে তার বাপমারা ভারি নারাজ যে, কেহ তার খেলাধূলাকে গম্ভীর ভাবে নিয়ে তার উপর সুদীর্ঘ নীতি-উপদেশ বর্ষণ করে। বক্তৃতা দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়; নিন্দে বান্দা করাও আমার উদ্দেশ্য নয়; তবে ছেলেকে নিতান্ত অধিক মাত্রায় আদর দিলে তার ব'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাই পাড়াপড়শীদের এ সম্বন্ধে দুটো কথা বলা হয়ত নিতান্ত অসঙ্গত হবে না।

আজকালকার লেখা থেকে মনে হয় যেন সাহিত্য আর কাব্য দুটো একই জিনিস—তবে কখন কখন এরূপ ভাবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যাকে ইংরাজীভাষায় বলে "বিশুদ্ধ বা অমিশ্র সাহিত্য"। আর ইহাও দেখা যায় যে এমনও কেউ কেউ আছেন যাঁরা "বিশুদ্ধ"

কথাটার জোরে আমাদের মধ্য আসিয়াস্থ আদিপুরুষদের ন্যায় অপর সকলকে "অনার্য্য" পদবাচ্য করে থাকেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস কথাটা আগাগোড়া সমস্তই ভুল।

আমাদের জ্ঞান ও আনন্দের এক মাত্র আধার আমাদের সম্মুখে বিরাজিত বিশ্ব। যে রকমের জ্ঞান বা আনন্দই হোক না কেন সমস্তই পাবার জগৎসংসার ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। মানুষের সমগ্র দেহ মন ও আত্মার সম্যক স্ফূর্ত্তি ও বিকাশের হেতু জগৎ। এমন কি আমরা যে ঈশ্বরের উপর দেহ মন ও আত্মা সমর্পণ করে আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করি তাও বিশ্বের সাহায্যে, বিশ্বের ভিতর দিয়েই বিশ্বপাতার স্নিগ্ধ মধুর জ্ঞান ও আনন্দ জ্যোতি আমাদের নিকট বিভাসিত হয়।

এই বিশ্ব হতেই বিভিন্ন ভাবাপন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন জাতীয় সত্য আহরণ করে জনসমাজে প্রচার করেন। ভাষার সাহায্যে যে ভাব যে সত্য প্রকাশিত হয় তাহাই সাহিত্য। ইহা সাহিত্যের বিরাটমূর্ত্তি। এইভাবে সাহিত্যের উপাসনা করলেই তবে তিনি জাগ্রত দেবতা হন, উপাসনার ফল হাতে হাতে লাভ হয়। অপর ভাবে সাহিত্যের পূজা ঘোর পৌত্তলিকতা মাত্র। সত্যান্বেষণের প্রণালীবৈচিত্র্যবশতঃ বিশেষ জাতীয় ভাব ও সত্য লাভ ক'রে কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ কবি, কেহ বা ঐতিহাসিক প্রভৃতি নানান্ আখ্যা লাভ করেন। তবে প্রকৃত কবি দার্শনিক প্রভৃতির বিশেষত্ব এই যে, সকলেই চক্ষুষ্মান। অসামান্য দৃষ্টিবলে তাঁরা সকলেই বিশ্বের নিভৃত অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তার অপূর্ব্ব রহস্যময় গতি নীতি ও প্রকৃতি দেখতে পান। এই দিব্য দৃষ্টি থাকলেই তিনি সাঁচ্চা, নচেৎ সহস্র প্রকার বুদ্ধিগত গুণের আধিক্য সত্ত্বেও ঝুটা।

সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতির মধ্যেই শুধু কাব্য ও সাধারণ সাহিত্য কেন সমগ্র বিরাট সাহিত্যেরই ধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি। অতএব সাহিত্যকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে তার প্রাকৃতিক পিতৃত্বের হানী করে ফল কি? কাব্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসাদির মধ্যে প্রকৃতিগত যে ভ্রাতৃ সম্বন্ধ রয়েচে তার বিচ্ছেদ করে লাভ কি? এরূপ ভাবে ভায়ে ভায়ে বিবাদ করা তরুণবয়স্ক বঙ্গসাহিত্যের পক্ষেই শোভা পায়। কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি বয়েসের বৃদ্ধিসহকারে এ ভাবেরও পরিবর্ত্তন শীঘ্র ঘটবে। তবে ভাষা ব্যবহারের সুবিধার খাতিরে যদি কাব্য ইত্যাদিকে কোন বিশেষ নাম দিতে হয় দাও— ইংরাজীর অনুকরণে "বিশুদ্ধ বা অমিশ্র সাহিত্য" বললেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু ভায়ে ভায়ে বিবাদ বিসম্বাদে কালহরণ না করে যদি সকলে মিলে মিশে কাজ করে, তবেই কালে পিতৃগৃহ অশেষ ধন রত্নে সমুজ্জ্বল হবার সম্ভাবনা, নচেৎ সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিদানের মত হয়ে দাঁড়াবে।

আমি পূর্ব্বেই বলেচি অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবেই আমাদের সত্য লাভ হয়, বুদ্ধির সাহায্যে এ কার্য্য সুসিদ্ধ হবার নয়। এই অন্তঃদৃষ্টি বা অজ্ঞাত ক্ষমতার অপর এক নাম প্রতিভা। কাব্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই প্রতিভার স্থান আছে, তার

অভাবে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য রচনা অসম্ভব। দর্শনের পক্ষে শুদ্ধ নামকরণ হতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও কথাটা যে ঠিক নয় তা বলা যায় না। আতাপড়া সংসারে চিরদিনই ঘট্‌ছে, সেই মান্ধাতার আমল হতে নিউটনের সময় পর্য্যন্ত আপামর সাধারণ সকলেই আতাপড়া দেখে আস্‌ছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্ক্রিয়ার জন্যে ত' নিউটনের প্রতিভার প্রয়োজন হয়েছিল!

দার্শনিক অন্তর ও বাহির থেকে আমাদের মানসিক প্রকৃতির ক্রিয়া, বিশ্বের সত্ত্বা ও নিয়মাবলীর তত্ত্ব নির্দ্দেশে প্রয়াসবান; ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর-পরম্পরা হতে সংসারে মানব ঘটনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশে প্রয়াসবান; বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর পরম্পরা হতে তাদের আভ্যন্তরিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশে প্রয়াসবান্; সাধারণ সাহিত্য-মালাকার মানব অন্তর ও জীবনের গূঢ় রহস্যময় কথাপ্রচারে প্রয়াসবান্। শুদ্ধ কাব্য অথবা সাধারণ সাহিত্যের কেন বিরাট সাহিত্যের সর্ব্ব বিভাগের সঙ্গেই মানব জীবনের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ—এই কারণেই সংসারে সাহিত্যের এত মর্য্যাদা! সকলের অন্তরেই সত্যের আলয়। নচেৎ সংসারে কাহারই কিছু মূল্য থাকত না।

এই অজ্ঞাত রহস্যময় শক্তির আধিক্য অথবা প্রতিভার প্রভাবে যেন আত্মা বাহিরে গিয়ে বিশ্বরহস্য উদ্ভেদ ক'রে ঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আর মানসিকশক্তিবর্গ যথাযোগ্যভাবে সেই সত্যগুলিকে আত্মস্থ ক'রে প্রকাশ করে। আত্মাহরিত সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে বুদ্ধি যে পূর্ণমাত্রায় তাকে বজায় রাখ্‌তে পারেন তা নয়—অন্তরের ভাষাকে প্রকাশের ভাষায় আনতে গিয়ে অনেকস্থলে বুদ্ধি আত্মহারা হ'য়ে ভুল করে বসেন। কাকের বাসায় কোকিলশাবকের জন্ম হয় বলে কি তাতে কাকের বিশেষ বাহাদুরী প্রকাশ পায়? যদি কেহ বলেন যে সকলের আত্মাই সমভাবে চক্ষুষ্মান, তবে সেই সংগৃহীত সত্য যাঁর যে পরিমাণে আপনার অথবা অপরের নিকট প্রকাশ করবার ক্ষমতা থাকে তিনি সেই পরিমাণে প্রতিভাশালী বলে স্বীকার করতে হয়। এই প্রতিভাই সাহিত্যের একমাত্র বল—ইহাই সাহিত্যের প্রাণ, ইহার অভাবে সমস্তই জড়পিণ্ডবৎ হয়ে যায়।

এই অজ্ঞাত ক্ষমতার আভাস আমাদের রুচি হতেই পাওয়া যায়। না ভেবে চিন্তে কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা ভাবের দ্বারা আমরা যে স্বতঃই আকৃষ্ট হই, তাহা এই অজ্ঞাত শক্তির একপ্রকার চৌম্বিক কার্য্যের বলে। এই মহৎ কুলে জন্ম বলিয়াই সংসারে রুচির মূল্য এত অধিক। ইহাই একভাবে আমাদের নিজত্ব। আর এই কারণেই সংসারে রুচিভেদে মানুষের মধ্যে এত গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়।

বিশ্বসংসারের সমগ্র মহৎ ও উদার ভাব যে কবি অথবা সাধারণ সাহিত্যরচনাকার ভগবানের নিকট থেকে দশশালা বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছেন, এমনটি বলা চলে না। এ মহত্ত্ব যে শুদ্ধ লেখক জাতির মধ্যেই আবদ্ধ তাও নয়, সংসারের সর্ব্ব-বিভাগের প্রতিভাশালী মনস্বীগণেরই উহা সাধারণ সম্পত্তি। তবে কেহই সম্পূর্ণ আদর্শরূপে সংসারে জন্ম-

গ্রহণ করেন নি; মানব জাতির সমগ্র গুণ পূর্ণ মাত্রায় কোথাও এক আধারে লক্ষিত হয় না; অসম্পূর্ণতাই মানব জীবনের একটী প্রধান লক্ষণ। এই কারণেই ব্যক্তিবিশেষে প্রতিভার এত তারতম্য লক্ষিত হয়! তা ছাড়া এমন কি সাধারণ সাহিত্যকারের মধ্যেও কি প্রতিভাবৈশিষ্ট্য শ্রেণীবিভাগ ও গুণ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় না? কবিগণের মধ্যেও কি মহাকাব্যরচনোপযোগী প্রতিভা, নাট্যপ্রণয়ণোপযোগী প্রতিভা, ও গাথারচনোপযোগী প্রতিভা দৃষ্ট হয় না? তাঁদের ঘরের মধ্যেই যখন এতগুলি সরিক রয়েছে তখন এ কথা বলা কি সাজে যে, সাধারণ সাহিত্যাকারের প্রতিভা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! প্রতিভার জাতিগত গুণাবলীর বিচার কে করতে পারেন? প্রতিভাশালী বাগ্মী ও ধর্ম্মপ্রচারক, যাঁরা আত্মপ্রভাবে সংসারে অবিলোপী ছাপ রেখে যান, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ গ্রন্থভুক্ত না হইলেও কি সাহিত্যশ্রেণী ভুক্ত নয়?

সংসারে মোটামুটী দুই শ্রেণীর প্রতিভার দর্শন পাওয়া যায়। ১ম সৃজনী, ২য় অনুকারিণী। যেমন সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গায়ক অথবা বাদক এবং উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও সুর-প্রণেতা। জীবনের সর্ব্ব বিভাগেই প্রতিভার এই শ্রেণী পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই মোটামুটী বিভাগের মধ্যস্থলে অসংখ্য ক্ষুদ্র শ্রেণীবিভাগ আছে, এমন কি বল্লে বলা যেতে পারে যে, যতগুলি প্রতিভাশালী ক্ষণজন্মা মনস্বীর সংসারে আবির্ভাব হ'য়েছে তাঁরা সকলেই নিজে নিজে এক এক বিশেষ শ্রেণী ভুক্ত। সকল মহাজনগণেরই রচনা মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে তাঁদের প্রতিজনেরই মনের অন্তস্তলে অবস্থিত কতকগুলি বিশেষ সরল সত্য আমাদের নজরে পড়ে। এই অবিভাজ্য সত্যগুলি তাঁদের অন্তরের মূল ভিত্তি, তার নীচে আর আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। সেগুলি তাঁর নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যগুলি যদি আপনার নিকটেও সত্য হয় তবেই সে লেখক আপনার নিকট পূজ্য ও তাঁহার রচনা আপনার নিকট প্রকৃষ্ট ভাবে মূল্যবান হয়, নচেৎ নয়। এরূপ কতকগুলি করিয়া সত্য আপামর সাধারণ সকলেরই অন্তরে অবস্থিত, তবে প্রতিভাশালী মনস্বীর নিকট তাহারা গভীর প্রাণসংযুক্ত সত্য, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু কার্য্যতপক্ষে ইহা কি ঘোর পার্থক্য স্থাপন করে!

যে সত্যগুলি কোন প্রতিভাবিশেষের অন্তঃসত্য সে গুলি যদি সেই কালে সাধারণ্যের নিকটেও সত্য হয় তবেই তিনি প্রকৃত চক্ষুষ্মান্ বীর বলিয়া পূজিত হন, নচেৎপক্ষে তীর্থের কাকের মত তাঁকে তদুপযোগী কালের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। অতএব দেখা যাচ্চে যে কালও প্রতিভাবিকাশের পক্ষে কতকাংশে কার্য্যকর। এবং কালেই আবার তাহার বিনাশ। যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক! কোন গ্রন্থের অন্তঃসত্যগুলি যখন কালের পরিবর্ত্তন সহকারে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় অথবা প্রকাশের প্রণালীর পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন সে লেখকের সে রচনা মারা পড়ে। কোন সুবিজ্ঞ ইংরাজ সমালোচক বলেচেন, "There is an element of decay and

death in poems which we vainly style immortal." ইনি কাব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে যা বলেছেন সমগ্র সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই এ কথা সম্যক প্রযোজ্য। শুধু তাই নয় সমগ্র জীবনের সমস্ত বিভাগেই এ কথার সত্যতা প্রমাণিত হচ্চে দেখা যায়। এই মৃত্যু-রেখা কতক গ্রন্থের শিরোদেশে দেখা দিয়েছে। যেমন, বেকনের এসেস এখন নাকি হেল্পসরচিত এসেস কর্তৃত্ব স্থানচ্যুত হচ্চে বলে শুনা যায়। যে কালে যে কতকগুলি সত্য সাধারণ্যের অন্তরে গুপ্তভাবে নিহিত থেকে কার্য্য করছে, যে প্রতিভা সেগুলিকে আপনার অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর অপার্থিব মোহন স্পর্শের ক্ষমতা বলে সাধারণ্যের সেই গুপ্তভাবগুলিকে জীবন্ত ও জাগ্রত করে তুলতে পারলেন, তিনিই সে যুগের প্রকৃত অবতার অথবা প্রফেট!

সাহিত্যের প্রতি বিভাগের সত্য ভিন্ন প্রকৃতির। দর্শন, নীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের সত্য ও কার্য্য সম্বন্ধীয় সত্য সমস্তই বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন শ্রেণীর বটে, তবুও আমরা এ সকলকেই সত্য বলে থাকি। তার অর্থ এই মাত্র যে বিভিন্ন প্রণালী ও উপায় লব্ধ বিভিন্ন শ্রেণীর সত্য, তবে তারা সকলেই আমাদের নিকট সত্য বটে।

সাহিত্যকারগণের অন্তঃসত্যগুলিই সাহিত্যের মূল ভিত্তি, এ গুলি যতকাল জীবন্তভাবে সাধারণ্যের মধ্যে কার্য্যকারী থাকে, ততকাল তাহার উপরস্থ সাহিত্য-অট্টালিকা অটল-ভাবে আপন উচ্চ শির উত্তোলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; আর যখন এই ভিত্তি শিথিলমূল হয়ে পড়ে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকাটিও ভূমিসাৎ হয়ে যায়। ইহাই সাহিত্যের সত্য। কালের পরিবর্ত্তন সহকারে রুচি ও ফ্যাশানের অনুযায়ীরূপে সাহিত্য অট্টালিকার এ-ধার ও-ধারের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু মানবপ্রকৃতিকে মূল ভিত্তি স্বরূপ করে তার উপরে সাহিত্য-অট্টালিকা সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত। এ মূল যত কাল পর্য্যন্ত না সংসার হতে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে তত কাল সাহিত্যের মরণ নাই। সাহিত্য অপর এক ফীনিক্স পক্ষী—মৃত্যুর পরেও তার ভস্মাবশেষ হতে সন্তানের উৎপত্তি হয়, আর সে তখন তার পিতৃস্থান অধিকার করে। এইরূপে তার বংশের ধারাবাহিকত্ব সংসারে অক্ষতভাবে রক্ষিত হইয়া যায়।

শ্রীকাশ্যপচন্দ্র শিক্ষানবীশ।

সংস্কৃত গান। *

মন্দং মন্দং বায়ৌ বিচলতি
নীরে শীতে স্বচ্ছে নিবহতি।
গুঞ্জতি ভৃঙ্গে চলতি সুখং
মনসিজ মৃদুশর মুক্তঃ কঃ॥ ১॥

শীতকরেঽস্মিন্‌পীযূষকম্‌
নব পঙ্কজনেত্রে লঘু বমতি।
মাধবমাসে সম্প্রাপ্তে
মনসিজমৃদুশর মুক্তঃ কঃ॥ ২॥

আম্রকিশলয়-রক্ত পরভৃত-
ভুক্তে বিকসতি কান্তারে।
বৃক্ষা ললিতলতাশ্লিষ্টাঃ
বিহগা প্রিয়নিনদাকৃষ্টাঃ॥ ৩॥

মন্যেঽখিলমপি বিশ্বংমধু-
মল রক্তং বিলসতি রম্ভোরু।
বিঘটতি শিরোপরি লয়রতি মধুসখা
মনসিজ মৃদুশরমুক্তঃ কঃ॥ ৪॥

* এই গানটী পুণা বালিকাবিদ্যালয়ের একটী আট নয় বৎসরের বালিকা কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ শ্লোকের তৃতীয় চরণের কোন মানে হয় না। ঐ চরণে এবং আরো কোন কোন স্থানেও ছন্দোভঙ্গ হইয়াছে। সে দোষ রচয়িতার বোধ হয় না, সম্ভবতঃ বালিকার ভুল হইয়া থাকিবে। শ্রী স—

স্বরলিপি।

ইতিপূর্ব্বে ভারতীতে সঙ্গীত শিক্ষার সঙ্কেত প্রণালী বিস্তারিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিম্নলিখিত সঙ্কেত অনুসারে আমরা পুনর্ব্বার ভারতীতে গানের স্বরলিপি প্রকাশ করিবার সংকল্প করিয়াছি।

১। সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, এই শুদ্ধ সুর গুলি লিখিবার সময় উহাদের আ-কার, ই-কার বাদ দিয়া লিখিতে হইবে। কিন্তু উহাদের কোমল সুর বুঝাইতে হইলে অক্ষর গুলিতে ও-কার যোগ করিতে হইবে এবং উহাদের তীব্র অর্থাৎ কড়ি বুঝাইতে হইলে ঈ-কার যোগ করিতে হইবে। যথা:—শুদ্ধ রিখাব র; কোমল রিখাব রো; শুদ্ধ মধ্যম ম; কড়ি মধ্যম মী।

২। মধ্য সপ্তকের সুরে কোন চিহ্ন থাকিবে না। উপরের সপ্তকের সুরের মাথায় রেফ্ থাকিবে এবং নিম্ন সপ্তকের সুরের নীচে হসন্ত থাকিবে।

৩। প্রত্যেক তাল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় বিভক্ত যেমন কাওয়ালি চতুর্মাত্রিক একতালা ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি। চতুর্মাত্রিক তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে প্রত্যেক চারিমাত্রা অন্তর একেকটী দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে। সেইরূপ অন্য কোন তালযুক্ত গানের স্বরলিপিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার পর তালের পূর্ণ আবৃত্তি বুঝাইবার জন্য একেকটী দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে।

৪। সহজে একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাকে একমাত্রা কাল কহে। একটী সুর যতগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে, তাহার মাথার উপর সেই চিহ্নিত অঙ্ক দেওয়া যাইবে। যথা:—স১-এই সুরটী একমাত্রা কাল স্থায়ী অর্থাৎ শুদ্ধ সা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে সেই সময় পর্য্যন্ত সুরটী স্থায়ী। স২—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর এক আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা, সা—আ।

স৩—ইহাতে সা উচ্চারণ করিয়া আর দুই আ পর্য্যন্ত টানিয়া রাখিতে হইবে। যথা, সা—আ—আ— ইত্যাদি।

আবার এক মাত্রার মধ্যে যদি দুইবার সা উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে প্রত্যেক সা অর্দ্ধ মাত্রিক হয় যথা সস১। এক মাত্রার মধ্যে যদি চারিবার সা উচ্চারণ করা যায় তাহা হইলে ঐ প্রত্যেক সা সিকি মাত্রিক হয়। যথা সসসস১ ইত্যাদি। কোন মাত্রা চিহ্নিত সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সুরে কিম্বা সুরগুলিতে যদি মাত্রাচিহ্ন না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মাত্রা-চিহ্নিত স্বরের কাল-মধ্যেই ঐ সুর গুলি উচ্চারিত হইবে। যথা, সরগমপ১। অর্থাৎ একমাত্রা কালমধ্যেই সরগমপ উচ্চারিত হইবে।

৫। প্রধান সুরের সহিত আনুষঙ্গিক ক্রমে যখন একটী কিম্বা ততোধিক, অত্যল্প

কালস্থায়ী সুরকে স্পর্শমাত্র করা হয় তখন সেই সুর কিম্বা সুরগুলিকে প্রধান সুরের গায়ে ছোট অক্ষরে লেখা হয়। এই সুরগুলিকে ভূষিকা বলে, ভূষিকাতে কোন মাত্রা থাকে না, কারণ তাহা এত অল্পকাল স্থায়ী যে তাহার মাত্রার পরিমাণ হয় না। যথা,

সর গ্ঃ গম প্ঃ।

৬। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন [ ] ব্রাকেট্। যে পদ হইতে পুনরাবৃত্তি হইবে তাহার আরম্ভে এই প্রমুখী বন্ধনী [, এবং যেখানে গান ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহার শেষে এই বিমুখী বন্ধনী] ;

৭। তালের সম, ফাঁক, প্রথম তাল, দ্বিতীয় তাল প্রভৃতির চিহ্ন যথাস্থানে সুরের মাথার উপরে নির্দ্দিষ্ট হইবে। সমের চিহ্ন ×, ফাঁকের চিহ্ন ০।

৮। সুরের আওয়াজের চিহ্ন এইরূপ :—

প্রবল আওয়াজ	...	(ব)
মৃদু আওয়াজ	...	(মৃ)
অতি প্রবল আওয়াজ	...	(বব)
অতি মৃদু আওয়াজ	...	(মৃমৃ)
মধ্য বলের চিহ্ন	...	(ম)
আওয়াজ বৃদ্ধির ঐ	...	(বৃ)
হ্রাসের ঐ	...	(হ্র)
ক্রমশঃ বৃদ্ধির ঐ	...	(ক্র বৃ)
ক্রমশঃ হ্রাসের ঐ	...	(ক্র-হ্র)

এই অক্ষরগুলি সুবিধা বুঝিয়া পদের নীচে কিম্বা সুরের মাথায় বসিবে।

৯। অনেক সময় গানের শেষ কলি গাহিয়া পুনর্ব্বার প্রথম কলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তবে গান শেষ হয়। বারবার প্রথম কলির স্বরলিপি না করিয়া সে স্থলে কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিলে সুবিধা হয়। যে সুরের নীচে (আ-প্র) (অর্থাৎ আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন) এই চিহ্নটী দেখিবে সেখান হইতে প্রথম কলিতে ফিরিয়া যাইবে। এবং প্রথম কলির যেখানে (শেষ) লেখা থাকিবে সেইখানে গান শেষ করিবে।

১০। গানের স্থায়ী, অন্তরা প্রভৃতি একেকটী কলির শেষে দুইটী করিয়া দাঁড়ির চিহ্ন থাকিবে।

নীচে সংস্কৃত গানটীর স্বরলিপি দেওয়া হইল।

মিশ্র বেহাগ—কাওয়ালি।

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
[স১ গ১ স১ গ১ । স১ গ১ মগ১ রস১ । ন্১
ম ন্দং ম ন্দং বা য়ৌ বিচ লতি । নী

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
র১ ন্১ র১ । ন্১ র১ গর১ সন্১ । স১ গগ১ স১
রে শী তে স্ব চ্ছে নিব হতি । শুন্ জতি ভৃঙ্

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
গ১ । সর১ গম১ প২ । পম১ গর১ পম১ গর১ । স১
গে চল তিসু খম্ । মন সিজ মৃদু শর ম

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
স১ স২ ॥] র্স১ নধ১ প১ ম১ । গ১ ম১ প১ ধন১ ।
ক্তঃ কঃ ॥১॥(শেষ) শী তক রেস্ মিন্ পী যূ ষং নব

+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ +
র্স১ নধ১ প১ ম১ । গম১ গম১ র২ । র্স১ নধ১
পঙ্ কজ নে ত্রে লঘু বম তি । মা ধমা

৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
প১ ম১ । গ১ ম১ প১ পধ১ । পম১ গর১ পম১
মা লে সম্ প্রাপ তে — মন : সিজ মৃদু

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ১
গর১ । স১ স১ স২ ॥ স১ স১ রস১ ন্স১ । র১
শর মু ক্তঃ কঃ ॥২॥ আ ম্র কিশ লয় র

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
র১ গর১ সর১ । গ১ গ১ মগ১ রস । ন্১ র১ স২ ।
ক্ত পর ভৃত ভু ক্তে বিক সক্তি• কান্ তা রে ।

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩
গ১ গ১ মগ১ রগ১ । ম১ ম১ ম২ । গর১ গ১ রস১
বৃক্ ষা ললি তল তা শ্লিষ্ টা বিহ গা প্রিয়

০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
ন্স১ । র১ র১ র২ ॥ প১ প১ ধপ১ মগ১ । ম১
নিন দা রু ষ্টা ॥৩॥ ম ন্থে থিল মপি রি

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০
ম১ পম১ গর১ । গ১ গ১ মগ১ রস১ । ন্১ র১ স২ ।
শ্বম্ মধু মল রক্ তম্ বিল সতি রম্ ভো রু

১ + ৩ ০ ১ + ৩ ০ ১
সন১ ধপ১ সন১ ধপ১ । মধ১ পম১ ধপ১ মগ১ । পম
বিম্ব টতি শিরো পরি লয় রতি মধু সখা মন

\+ ৩ ০ ১ + ৩ ০
গর১ পম১ গর১ । স১ স১ স২ ॥
সিজ মৃদু , শর মু ক্তঃ কঃ ॥৪॥ (আ—প্র)

শ্রী সরলা দেবী

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উন্মাদিনী। প্রথম ভাগ পশুপতি মিত্র প্রণীত। ইহা একখানি সামাজিক উপন্যাস। ইহার প্রধান গুণ ঝুটা-উপাদানে ইহা রচিত নহে ইহাতে আমরা যথার্থই আমাদের দেশের সমাজ চিত্র দেখিতে পাই।

আজকাল বিলাতি ভাবের আমদানীতে দেশীয় ভাবের মূল্য ক্রমিকই হ্রাস হইতেছে, অথচ দেশাচারকে একেবারে ছাঁটিয়া ফেলাও যায় না সুতরাং গাছটা সেই বটে, সেই পুরাতন জমির উপরই দাঁড়াইয়া; কিন্তু ভিতরে ঘুন ধরা, নিস্তেজ, শ্রীসৌন্দর্য্য-বিহীন। বাহির হইতে দেখিতে হিন্দুসমাজের একান্নবর্ত্তীত্ব প্রায় তেমনি আছে, কিন্তু বিনি উপার্জ্জন করেন, বাড়ীর যিনি প্রকৃত কর্ত্তা, তাঁহার মনে আর আগেকার মত সমগ্র পরিবারের প্রতি একটা প্রশস্ত আত্মভাব নাই, কাজেই সেরূপ দায়ীত্ববোধও নাই। তিনি দায়ে পড়িয়া তাহাদের অন্ন বস্ত্র দান করেন সত্য, কিন্তু মনে মনে সে জন্য বিরক্ত। তিনি যে নিজের উপার্জ্জনে নিজের স্ত্রীপুত্রকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারিতেছেন না, ইহাতে তিনি বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট; আর স্ত্রীর অসন্তুষ্টির ত কথাই নাই। স্বামীর পরিবারেরা স্বামীর যতটুক আপনার স্ত্রীর ততটুকুও নহে। সুতরাং গৃহ-বিচ্ছেদ, অশান্তিই ইহার অনিবার্য্য ফল। লেখক তাঁহার পুস্তকে এই চিত্র আঁকিয়াছেন। পুস্তকে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু চিত্রাঙ্কনে তাঁহার নিপুণতার অভাব লক্ষিত হয়। লেখার প্রধান দোষ ঘটনা বিন্যাস দ্বারা চিত্রগুলি সর্ব্বাঙ্গিন পরিস্ফুট করিয়া তোলা হয় নাই। গল্পের প্রথম দিকটা বিশেষ যেন বড় তাড়াতাড়ি করিয়া লেখা হইয়াছে; ভাষাও একটু অসংযত। ইহা সত্ত্বেও বইখানি বিশেষ প্রশংসনীয়, বই খানির শেষদিক এতটা হৃদয়গ্রাহী যে এই অসমাপ্ত পুস্তকেই পাঠকের সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি জন্মে।

নির্ঝর। শ্রীবিনয়কুমারী বসু প্রণীত। বিজ্ঞান জগতে বৈদ্যুতিক আলোকের ন্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য জগৎ সহসা এক অপূর্ব্বালোকে উদ্ভাসিত। পূর্ব্বে কবিত্ব জগতে পুরুষ-দিগেরি একাধিপত্য দেখা গিয়াছে এমন কি আমাদের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ভাষাতেও কবি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ পর্য্যন্ত নাই তা বঙ্গ ভাষার কি কথা! সহসা ভাষায় অর্থবিপর্য্যয় ঘটাইয়া তদ্দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই অনেকগুলি রমণী কবি অভ্যুদিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে কাহারো কাহারো প্রতিভাজ্যোতি—এমন কি বঙ্গের খ্যাতনামা, নিজের প্রতিভালোকে ঝলসিত-নয়ন পুরুষ কবিকেও বিস্মিত, মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইহা বঙ্গ সাহিত্যের কম গৌরবের কথা নয়।

আমাদের সমালোচ্য পুস্তকখানি একজন বালিকার লেখা। কবিতা গুলির ভাষা মধুর, ভাব মধুর এবং দু-একটিতে ভাবেরও নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তবে ভাবের গভীরতা তেমন নাই; আর ইংরাজিতে যাহাকে বলে—আপনার কাছে আপনি Pose করা—ইহার অনেকগুলি কবিতাতে সেই দোষ ঘটিয়াছে। কোন বালিকার হৃদয়োত্থিত করুণ গান শুনিলে শ্রোতা আপনা হইতেই বলিয়া উঠেন আহা এমন কিশোর বয়সে এমন করুণ বিলাপ! কিন্তু এস্থলে কবি শ্রোতার মুখের কথা কাড়িয়া নিজেই নিজেকে কিশোর বলিয়া অনেক স্থলে দুঃখ করিয়াছেন!—যেন ভাবুক হইলে কাঁদিতে হয় এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া আপনার সম্মুখে আপনি করুণার পাত্ররূপে দাঁড়াইয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

আকুল-আহ্বান।

কোথায় মরণ।

নেও প্রভাতের ফুল তরুণ জীবন!
এখনো শিশির মাখা, আধ ফোটা আধ ঢাকা
এখনো পড়েনি তায় অরুণ কিরণ।
করুণ কোমল করে, তুলে নেও দয়া করে,
ধরা যে দারুণ মরু ভীম দরশন;
হেথাকার খরতর, জ্বালাময় রবিকর,
সাধ নাই হৃদে দেব, করিতে ধারণ!
শুনেছি দুখীরা কয়, তুমি নাকি সুধাময়,
তুমি পরশিলে আর রহেনা বেদন!
রোগ-যাতনায় যবে, মানব অথির ভবে,
কিছুতে পারেনা জ্বালা করিতে বারণ;
তুমি এসে নিলে কোলে, সব তাপ যায় চ'লে,
আরামে অমনি নর মুদে দুনয়ন।
গেহ হারা তারাটিরে, বুকে তুলে নেও ধীরে,
শান্তির তিমির স্নিগ্ধে হয়ে সে মগন।
বিরাম-নিলয় তুমি, সবারি আশ্রয় ভূমি,
কাতরা বালিকা চায় চরণে শরণ।
কোথায় মরণ!

এ কবিতা একজন বালিকার মর্ম্মোত্থিত মৃত্যু আহ্বান নহে ইহার অথচ একটি করুণ ভাবও আছে। বালিকা নিজের মৃত্যুতে অন্যের মমতা অনুভব করিয়াই কাঁদিতেছেন; সেই কষ্ট ভাবিতেও তাঁহার সুখ। তাই তিনি কাঁদিতেছেন, অথচ তিনি আপনাকে বোঝাইতে চাহেন, তাঁহার আর সংসারে কিসের সুখ, মরিলেই ভাল। যাহা হউক, ইহাতে বালিকা-হৃদয়েরি অপরিপক্ব ভাব ফুটিয়াছে, আশা করি, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে। আমরা নিম্নে তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন দিতেছি।—

কে বুঝিবে?

নিরখি নয়ন কোণে এক বিন্দু অশ্রুবারি
কে বুঝিবে বল?
প্রাণের ভিতর তব কি সিন্ধু লুকায়ে আছে
কত তার তরঙ্গ প্রবল!

২

একটি দীরঘ শ্বাসে কে বুঝিবে এ জগতে?
কি ভীম তুফান,
হৃদয়ের মাঝে তব বহিতেছে দিবানিশি,
চুরমার করিছে পরাণ!

৩

শুনিয়া ও ক্ষীণ কণ্ঠে বিষাদের মৃদু তান
কে বুঝিবে হায়,
কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে কি গভীর হাহাকারে
বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায়?

৪

সজল নয়ন যুগে কাতর চাহনি আধ,
দেখি একবার,
কে বুঝিবে হৃদি-মাঝে আকুল পিয়াস ভরা
কি বাসনা, কি ভিক্ষা তোমার?

৫

বিন্দুমাত্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা
কেন আকিঞ্চন?
কে এত মরমগ্রাহী দেখিয়া বালুকা কণা,
মরুদৃশ্য বুঝিবে কেমন!

প্রভাত কুসুম। শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। বলা বাহুল্য ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলির অধিকাংশই নীতি-উপদেশ। লেখক তাঁহার লিখিত কবিতার মধ্যে যে গুলি সাহিত্য শিক্ষার্থী ছাত্রগণের অধ্যয়নের উপযুক্ত মনে করিয়াছেন তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আমাদের মতে এরূপ উপদেশ কবিতার বিষয় নহে। তাহাতে কবিতারও মাধুর্য্য নষ্ট হয়, উপদেশেরও বল থাকে না।

কবিতা হইতে যে আমরা নীতি শিক্ষালাভ করি না এমন নহে, কিন্তু তাহা আড়ম্বর যুক্ত, নীরস, চর্ব্বিত চর্ব্বণ, বাঁধাগৎ-উপদেশে নহে। কবিতার নীরব উচ্চ ভাবের সহিত একপ্রাণতা লাভ করিয়া আমরা যখন বিশ্বরাজ্যের নৈতিক শৃঙ্খলা হৃদয়ে উপলব্ধি করি তখন। 'আমরা' বলিতে এখানে বয়স্কগণই নহেন, আবাল বৃদ্ধ সকলেই ইহার অন্তর্গত। তবে বালকদিগের অস্ফুটিত বুদ্ধি ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া এরূপ কবিতা রচনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন এবং সেরূপ ক্ষমতাও অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। সমালোচ্য পুস্তক খানিতেও সে ক্ষমতার অভাব।

একটী প্রবন্ধ।

একটী প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। একটা কিছু জিনিস প্রস্তুত করিতে গেলে প্রথমে উপাদান সংগ্রহ করা চাই, সেই জন্য আমার প্রবন্ধের উপাদান কি কি চাই, তাহারই জোগাড় প্রথমে করিতে হইবে। লোকে বলে কালী কলম মন, লেখে তিন জন। আমি কালী সংগ্রহ করিয়াছি। বাজারে যে কালীর গুঁড়া বিক্রয় হয়, তাহাই গরম জলে গুলিয়া কালী প্রস্তুত করিয়াছি, হংস পুচ্ছ কাটিয়া কলম প্রস্তুত করিয়াছি, কালীতে কলম ডুবাইয়া টেবিলের উপর কাগজ ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া লিখিতে বসিয়াছি, কিন্তু লেখার প্রধান উপাদান মনটি যে আমার কোথায় রহিয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি তখন একবার চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত যদি খুঁজিয়া মনের তল্লাস পাওয়া যায়; লেখাটা সমাপ্ত করিতে পারি। আমি আমার মনের অনুসন্ধানের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় কে যেন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'তোমার মন কি কখনও ছিল?' কথাটা শুনিয়াই ত আমি চমকিয়া উঠিলাম। লোকটি কে ঐ কথা বলিল তাহাকে কিন্তু দেখিতে পাইলাম না কিন্তু স্বরটি বড় মিষ্ট লাগিল সেইজন্য ঐ কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমার ত বেশ মনে হচ্চে যে আমার মন ছিল। সেই মনের ভিতর কত সুখের সংকল্প রাখিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আজি কে বলিল যে আমার মন কখনও ছিল না।

আমার মন ছিল এটা নিশ্চয় কথা কিন্তু আমার সেই মন কি রকম বস্তু তা ত কখনও ভাবি নাই। মনটা আমার কেমন বস্তু ছিল, তাহা আজি একবার ভাবিয়া দেখিতে হইতেছে।

আমি একজন চেতন মনুষ্য আমার একটা দেহ আছে, ঐ দেহে একটি শক্তি আছে তাহার নাম জীবনী শক্তি। ঐ দেহের উপর ঐ জীবনী শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, আমি ঐই সব ক্রিয়ার ফল ভোগ করিতেছি। আমার মন যাহাকে বলি উহাও সেই জীবনীশক্তির কি একটা ক্রিয়া?

জীবনী শক্তি কি? মন কি? এই জিজ্ঞাসু হওয়াতে আমার মাথাটা যেন একটু ঘুরিয়া গেল, কালী কলম ছাড়িয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। একটু তন্দ্রাও আসিল, তন্দ্রাবস্থাতে দেখি যে একখানা বিপুল পরিধির চাকা আমার সামনে ঘুরিতেছে ও নাদস্বরে একটা ধ্বনি হইতেছে। ঐ চক্রটি সূর্য্যসম তেজোময়। চাকাখানি অবিরাম ঘুরিতেছে এবং নানাবর্ণের কতকগুলা তেজস্ফুলিঙ্গ ঐ চাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবিরাম গতিতে কোথায় চলিতেছে ও কতকগুলা কণা চারি দিক হইতে আসিয়া

টুপ টাপ ঝুপ ঝাপ করিয়া ঐ চাকায় আসিয়া পড়িতেছে। ঐ সময় আমি দেখি যে, আমি একটি ছোট তেজোকণা; ঐ চাকার পরিধিতে পড়িবার জন্য বেগে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছি, অবশেষে চাকার কাছে আসিয়া একটি নাম জোরে উচ্চারণ করিয়া ঝুপ করিয়া উহার পরিধিতে পড়িয়া গেলাম, তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া মনে হইতেছে যে ঐ সূর্য্যসম তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট চক্রটিই আমার জীবনী-শক্তি, আমার মন একটি তেজোকণা যাহা ঐ চক্র হইতে বাহির হইয়া কোথায় চলিয়া যায়, এবং কখনও বা ফিরিয়া আসিয়া ঝুপ করিয়া ঐ চাকার পরিধিতে মিশিয়া যায়। ঐ জ্যোতির্ম্ময় মধ্যস্থলটিতে সুনীল আকাশ, সেই আকাশের রূপ দেখিলে আর ভোলা যায় না, ঐ নীলিমাকে বড় ভালবাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

জীবনী শক্তি ও মনের কথা যাহা বলিলাম, আমার ঐ কথাতে অনেকেই আপত্তি করিতে পারেন, বলিতে পারেন যে "তুমি কি বলিলে উহার ত কোন অর্থ দেখিতেছি না"। উত্তরে আমি কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, তোমরা ঐ কথার অর্থ বুঝিলে না, কিন্তু ঐ চাকাখানি যদি দেখিতে তবে অর্থ বুঝিতে পারিতে। স্বপ্নের ভাষায় জীবনী শক্তি ও মন কি তাহা ত এক রকম ঠিক করিলাম, এখন জাগ্রত মানুষের ভাষাতে জীবনী শক্তিটা কি তাহাও ত একবার ভাবিতে হইতেছে। জীবনী শক্তি কথাতে আমি সোজাসুজি এই বুঝি যে দেহের মধ্যে যে আগুন জ্বালাইয়া রাখার জন্য আমার প্রত্যহ ভোজন করিতে হয়, উহার নাম জীবনী শক্তি। সূর্য্যের তেজ যেমন সূর্য্যের শক্তি সেইরূপ আমার দেহের একটা তেজ আছে, উহাই আমার জীবনী শক্তি। কতকগুলা কাঠ এক জায়গায় রাখিয়া আগুন ধরাইয়া দিলে চারি দিকের বাতাসের সহিত কাঠের কণায় রাসায়নিক সংযোগ হয় এবং কাষ্ঠ থেকে একটা তেজ বাহির হইতে থাকে, উহার নাম আগুন, জীবনী শক্তিও সেইরূপ একটা আগুন। কাষ্ঠ যেমন বায়ুসাগরে ডুবিয়া থাকিয়া জ্বলিতে থাকে, আমার দেহও সেইরূপ এক মহাসাগরে ডুবিয়া আছে, আমার দেহের অণুসকল কি-এক আশ্চর্য্য আকর্ষণ বশে স্থূলভাব-ছাড়িয়া ক্রমাগত সূক্ষ্মভাবাপন্ন হইয়া শেষে সেই মহাসাগরে মিলিতেছে এবং উহার ফলে একটা অনির্ব্বচনীয় আভ্যন্তরিক আগুন জ্বলিতেছে। ঐ যে মহাসাগরের কথা বলিলাম উহার কুল কিনারা নাই। আমার দেহের কণা সকল দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মহাসাগরের স্রোতে অনন্ত দূরে চলিতেছে আবার আমার দেহের ঐ সমস্ত কণা পূরণ করিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ ইচ্ছা কখন ক্ষুধা, কখন তৃষ্ণা, কখন কাম, কখন জ্ঞান, কখন সংকল্প রূপে পরিণত হইতেছে। অন্তরের এই অগ্নির কথা যখন ভাবি এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন ঐ মহাসাগরের কথা মনে হয় তখন দেখি যে আমার হৃদয়ের আগুনের জ্যোতিই অনন্তব্যাপী। দেহটা যেন ঐ আগুনের ঢাকনি, কিন্তু ঐ দীপশিখার তেজ দেহ ভেদ করিয়া অপার সমুদ্রের স্রোতে চলিতেছে। তখন আমার হৃদয়েও যেমন দীপ শিখা দেখি, সকলের হৃদয় মধ্যেই সেই-

রূপ এক একটি দীপশিখা দেখিতে পাই। এই অসংখ্য দীপশিখা কে জ্বালিল, কেন জ্বালিল ? কে বলিতে পারে ? ইহার উত্তর দিবার জন্য দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রের কথা এখন কহিতে চাহি না।

এক দিন কার্ত্তিক মাসে বালিকারা নদীতে প্রদীপ ভাসাইয়া দিতেছে দেখিয়াছিলাম, যে যাহার প্রদীপটি ভাসাইয়া দিয়া একাগ্রমনে সেই প্রদীপের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, শেষে ভাসিয়া ভাসিয়া প্রদীপ অদৃশ্য হইলে পর উহারা ঘরে ফিরিয়া গেল। ঐ প্রদীপ ভাসানর দৃশ্য আমার মনে যে কি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় করিয়াছিল, তাহা ত আমার বর্ণনার ক্ষমতা নাই। আমার এখন মনে হয় আমার হৃদয়-প্রদীপ ভাসাইয়া দিব বলিয়াই ঐ প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছি। সাগরের কূলে পঁহুছিবার পূর্ব্বে পাছে বাতাসে প্রদীপ নিবিয়া যায়, তাই দেহের ঢাকনে ঐ প্রদীপ ঢাকা দিয়া রাখিয়াছি।

আমার মন কি ঐ দীপশিখা ? ঠিক তাহা নহে। আমার মন ঐ দীপশিখা-নিঃসৃত এক প্রকার জ্যোতি। ঐ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ কখন মাথা থেকে বাহির হয় কখন হৃদয় থেকে বাহির হইয়া থাকে। মনের সংজ্ঞাটা আমি এই করিতে ইচ্ছা করি। হৃদয়ের অন্তরস্থ জীবনী শক্তিরূপ অগ্নির তেজ যখন হৃদয় ও মস্তিষ্ক রূপ ডোমের ভিতর দিয়া বাহির হয় তখন উহাকে মন নাম দেওয়া যায়। এইত মনটা পদার্থ কি একরকম স্থির হইল। এখন মনটাকে খুঁজিবার জন্য দেখিতে হইবে যে আমার জীবনাগ্নির তেজ হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়া বাহির হইয়া এখন কোথায় যাইতেছে।

হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম, প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা এখন বলিতে পারিলাম না। তথা হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে চলিয়া গিয়া এক মনো-পুরুষের সঙ্গে দেখা হইল তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলাম যে তিনিই আমি, তিনি জ্ঞানী, আমি অজ্ঞানী। অজ্ঞানী আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমার মন কোথায় বলিয়া দিতে পারেন ? জ্ঞানী আমি বলিলেন তোমার মনত এখন ভিতরে নাই মন যে তোমার বাহিরে। আমি তখন দেখিলাম মন আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির উপর রহিয়াছে। জ্ঞানী আমি হৃদয়ে নামিয়া আসিয়া, হৃদয়ের ভিতর হইতে বলিলেন, "মন কাহার তোমার না আমার ? তোমার কি কখনও মন ছিল ?" অজ্ঞানী আমি বলিলাম, "মন আপনার আমার মন কখনও ছিল না।" জ্ঞানী আমি বলিলেন, "মন তোমারও নহে আমারও নহে, মন বিশ্বরূপের অংশ।" ব্যোম শব্দে আকাশটা ফাটিয়া গেল! উহার পর কি হইল মনে নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।

শূন্য গৃহ।

THE DESERTED HOUSE.

(টেনিসন।)

গেছে প্রাণ, গেছে চিন্তা, দূরে
চ'লে গেছে দোঁহে পাশাপাশি,
খুলে ফে'লে দুয়ার জানালা
গৃহবাসী ছুটিতে উদাসী !

গৃহমাঝে নৈশ অন্ধকার,
আলো রশ্মি নাহি জানালায়,
নিনাদিত সেই গৃহ দ্বারে
আজি—বারেক শব্দ নাহি, হায় !

ফেলে দাও শাশীগুলি, রুদ্ধ কর দ্বার,
নতুবা যাইবে দেখা তার ফাঁক দিয়া
মরুময় শূন্যভাব, নগ্নতার ছায়া
আঁধার এ ত্যক্ত গৃহ রয়েছে ব্যাপিয়া !

এস চ'লে ; ব'লোনা খেলার কথা হেথা,
আনন্দ উল্লাস ধ্বনি ক'রোনাক আর ;
মৃত্তিকায় হয়েছিল ও গৃহ নির্ম্মিত,
মৃত্তিকায় পরিণত হইবে আবার !

চলে এস ; প্রাণ, চিন্তা ত্যজিয়া এ গৃহ
বসতি করিছে এক অমর নগরে,
—সুবৃহৎ সে নগর দূর দুরান্তরে—
বাঁধিয়াছে নীড় তথা—দোষ স্পর্শ হীন ;
সেখানে হয়তো দেখা হবে এক দিন।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

বলরাম ও বলরামী সম্প্রদায়।

মেহেরপুর নদীয়া জেলার একটি প্রাচীন ভদ্রপল্লী, পূর্ব্বে ইহা যথেষ্ট সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল এরূপ জনরব শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আজ কাল তাহার সে অপবাদ কেহ দিতে পারে না ; পূর্ব্বে মেহেরপুরে অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস ত ছিলই, তা ছাড়া চাষী গৃহস্থের সংখ্যাও অল্প ছিল না, সুখ স্বচ্ছন্দতা ছোট বড় সকলেরই ছিল ; কিন্তু ১৮৬৩ কি ৬৪ সালে যে দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া নদীয়া ও যশোহর এই উভয় জেলাকে যুগপৎ আক্রমণ করে, তাহাতেই এই পল্লীর সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, গ্রামের অর্দ্ধেক লোক এই মহামারীতে মৃত্যু-মুখে পতিত হয় এবং শত শত প্রাচীন বংশ নির্ম্মূল হইয়া যায়, মেহেরপুরের এই ক্ষতি কখনো পূরণ হইবে কি না সন্দেহ ; এখনো ইহা ভদ্র পল্লী বটে, কিন্তু ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের প্রায় দশক্রোশ দূরে অবস্থিত বলিয়া এবং প্রান্ত প্রবাহিত নদীর অবস্থা অত্যন্ত

শোচনীয় হওয়ায় ইহার উন্নতির কোন আশা করা যায় না। গ্রামের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি মনে করিয়া কাহারো দুঃখ হয়, বর্ত্তমান দুরবস্থা মনে করিয়া কেহ বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন ; কিন্তু তথাপি এক শ্রেণীর লোকের নিকট মেহেরপুর পুরুষোত্তম, বারাণসী বা দ্বারকা প্রভৃতি তীর্থ স্থানের ন্যায় সম্মানিত হয়, এক সম্প্রদায়ের লোক বৎসরান্তে এখানে সম্মিলিত হইয়া অতি নিষ্ঠার সহিত ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলী তাহাদের গুরুদেবের উদ্দেশে অর্পণ করে ; এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম বলরাম, তাঁহার নাম অনুসারে এই সম্প্রদায়ের নাম বলরামী সম্প্রদায়। এই অপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায় ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনার্থ নিম্নে লিখিতেছি।

মহাত্মা ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয় তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নিতান্ত অল্প ও অসম্পূর্ণ। আমরাও যে বিশেষ কিছু বলিতে পারিব সে আশা নাই, কারণ এই 'উপাসক সম্প্রদায়ের' ধর্ম্মমত, নীতি পদ্ধতি, ধ্যান ধারণা অতি গোপনে থাকে, তাহা বাহিরে প্রচারিত কিম্বা প্রকাশিত হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই, তবে আমরা বাহির হইতে যাহা দেখিতে ও শুনিতে পাই, তাহাই পাঠকগণকে বলিতেছি।

বলরাম জাতিতে হাড়ী ছিলেন, কোন সালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, তবে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমেই যে তিনি জন্মিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই, তাঁহার বাল্যকালের কোন বিবরণ সংগ্রহ করাও দুরূহ ; কেবল ইহাই জানা যায় যে তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে, মেহেরপুরের অন্যতম জমীদার মল্লিক বাবুদের বাড়ী এক দরোয়ানের পদে নিযুক্ত হন, এই কর্ম্মে তাঁহার জীবনের অনেক দিন অতিবাহিত হয়।

আনন্দবিহারী এই মল্লিক পরিবারের গৃহ দেবতা, একদিন সকালে সকলে দেখিতে পাইল আনন্দবিহারীর গা হইতে কয়েক খানি গহনা চুরি গিয়াছে ; মহা আন্দোলন পড়িয়া গেল, বলরামের বিশাল দেহ, প্রবল পরাক্রম ও অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যের কথা মনে করিয়া সকলেই ভাবিল ইহা তাহারই কাজ। এ সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক হইল না, বলরাম যথেষ্ট তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইলেন, পৃষ্ঠের উপর দিয়া খানিকক্ষণ অবিশ্রান্ত লাঠি বৃষ্টিও হইয়া গেল, তাহার পর তিনি পদচ্যুত হইলেন।

একটি কথা না বলিয়া তিনি গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া বাহিরে আসিলেন, একটি নির্ব্বেদ ভাবে তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ, বাড়ির দিকে না ফিরিয়া নগরের রাস্তা ধরিয়া চলিলেন, বাড়ীর পরিবারবর্গের কাতরতাপূর্ণ স্নেহ আলিঙ্গন অপেক্ষা, উদার আকাশ, অনন্ত পৃথিবী, চতুর্দ্দিকের একটা প্রকাণ্ড শূন্যভাব যেন তাঁহার হৃদয়ে শান্তি স্থাপন করিতে অধিক সমর্থ।

ইতিমধ্যে এক সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, সাধুটি তীর্থ ভ্রমণে চলিতেছিলেন, বলরাম তাঁহার সঙ্গ লইলেন।

একদিন প্রভাতে উভয়ে এক আড্ডায় বসিয়া আছেন, নিকটে একটি বৃহৎ বৃক্ষ,

বলরাম দেখিলেন বৃক্ষের একটি শাখা ভূতলস্পর্শ করিয়াছে, এবং যত আবর্জ্জনা ও ময়লা সেই ধরাশায়ী শাখার উপর নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর বলরাম নিকটবর্ত্তী সাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, আপনার সঙ্গে আমার প্রভেদ কি ?"

সাধু—"প্রভেদ বিস্তর, আমি উচ্চকুলোদ্ভব, তুমি নীচজাতি, আমার শাস্ত্রে অধিকার আছে, তোমায় নাই, আমি সকল স্থানেই বসিতে দাঁড়াইতে পারি তুমি পার না।"

বলরাম—"আপনি আমার পূজনীয় গুরু, যেখানে আপনার প্রবেশাধিকার আছে, সেখানে হয়ত আমার নাই, কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা স্থানে যাইতে পারেন ?"

সাধু—"কেন পারিব না, তুমি অস্পৃশ্য, তোমার অনুরোধে কি আমার নিজের অধিকার, সুবিধা ত্যাগ করিব ? কখন না।"

বলরাম বলিলেন, "তবে আর আপনাকে আমার প্রয়োজন নাই, মানুষগুরুরা সুধু গুরুপদবী ধরিয়া আপনাদের মহিমাই প্রকাশ করিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত নহে, আমি মহত্ত্ব চাই। প্রকৃতি প্রবঞ্চনা করিতে জানে না, যে উপদেশ দেয় তাহা কার্য্যদ্বারা, আমি প্রকৃতির নিকটই উপদেশ লইব। ঐ দেখুন বিশাল বটবৃক্ষ, উহার একটি সামান্য শাখা ভূমিস্পর্শ করিয়া আছে, আর লোকে তাহার উপর যত আবর্জ্জনা এবং অস্পৃশ্য দ্রব্যরাজি ফেলিয়া গিয়াছে, তথাপি বৃক্ষ সে শাখাকে পরিত্যাগ করে নাই, অনুরাগের সহিত ধরিয়া আছে, যেখানে প্রেম আছে, অনুরাগ আছে, সেখানে অশুদ্ধ কিছু নাই, অনুরাগে অশুদ্ধকে শুদ্ধ করিয়া লয়। আপনার হৃদয়ে প্রেম ও অনুরাগের সঞ্চার থাকিলে আপনার মুখে পূর্ব্বোক্ত অশ্রদ্ধার কথা শুনিতে পাইতাম না, ঐ বৃক্ষই আমার গুরু, আপনি আপনার পথ দেখুন, আমিও আমার যুক্তি অনুসারে চলি।"

সাধু ভাবিলেন বলরামের মস্তিষ্কে কিছু বিকৃতি উপস্থিত হইয়া থাকিবে, তাঁহাকে সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বলরাম সেই বৃক্ষমূল ত্যাগ করিলেন না। দেখিয়া শুনিয়া সাধু অভীষ্ট স্থানে চলিয়া গেলেন। বলরাম দুই একদিন সেই বৃক্ষমূলে থাকিয়া কোথায় গেলেন কেহ জানিল না।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে তিনি দেশে ফিরিলেন, কিন্তু আর গৃহবাসী হইলেন না; নদীর ধারে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন; চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ লতা লাগান হইল, ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াই তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন, দুই একজন শিষ্য সঙ্গেই আসিয়াছিল, আরো দুই একজন আসিয়া জুটিতে লাগিল, তাহারাই ভিক্ষাদি করিয়া আনিত এবং রন্ধনাদি করিত, অবশিষ্ট সময় গুরুর উপদেশ শুনিয়া ও তাঁহার চরণসেবা করিয়া কাটাইয়া দিত।

ক্রমে বলরামের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, কিন্তু স্থানীয় লোকের মধ্যে তাঁহার

শিষ্য নাই বলিলেই হয়, দু একজন যাহারা ছিল, বা আছে, তাহারা বলরামের স্বজাতি এবং আত্মীয়। কুষ্টীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, রাজসাহী ইত্যাদি স্থানে বলরামের অনেক শিষ্য আছে; কুষ্ঠ বা অন্য কোন দুশ্চিকিৎস্য কঠোর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াও অনেকে বলরামের সেবা লইয়াছে এরূপ দেখা যায়; কাহারো কাহারো রোগ আরোগ্য হইয়াছে, ইহাও শুনা যায়, বলরামের বলে কি তাহাদের বিশ্বাসের বলে তাহা জানি না। মৃত্যু-কালে বলরামের বয়স ৬০।৬২ হইয়াছিল, কিন্তু সে বয়সেও তিনি বলিষ্ঠ ছিলেন ও শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমেই বাস করিয়া গিয়াছেন, এই আশ্রম "বলরামের আখ্ড়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এখন এই আশ্রমটি অতি সুন্দর হইয়াছে, চারিদিকে রোপিত বৃক্ষগুলি অনেক বড় হইয়াছে এবং স্থানটি এতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে সেকালের মুনি ঋষির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে যেখানে বলরামের কুটীর ছিল, কয়েক বৎসর হইল সেখানে একখানি অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু বলরামের উপাসনীর কুটীরটি এখন পূর্ব্বাবস্থাতেই আছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে গৃহবিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে; এক দল বলিত, বলরাম চিরকাল কুটীরে বাস করিয়া গিয়াছেন, এখন সে কুটীর ভাঙ্গিয়া অট্টালিকা করিলে তাঁহার অপমান করা হইবে; অন্য সম্প্রদায় কিছু উন্নতিশীল ও তাহাদের সংখ্যা অধিক। তাহাদের চেষ্টাতে এই অট্টালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। এই অট্টালিকায় বলরামের শয্যা, খড়ম, বসিবার একখানি চেয়ার এবং লাঠি রাখা হইয়াছে, শয্যাটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভক্তগণ প্রত্যহ প্রত্যূষে তাহা প্রস্ফুটিত পুষ্পে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বলরামের লাঠি গাছটির দৈর্ঘ্য ও পরিধি দেখিলে মনে হয় বলরাম দ্বাপর যুগের লোক।

আশ্রমে বেশী লোক থাকে না, এখন তিন চারিজন পুরুষ ও সেই পরিমাণ স্ত্রীলোক আছে, স্ত্রীলোকগুলি সকলেই বিধবা ও প্রায় বৃদ্ধা, স্ত্রীলোকের করণোপযোগী কাজ কর্ম্ম তাহারা করে, এবং অবসর মত ভিক্ষা করিয়া থাকে; পুরুষের মধ্যে কেহবা যুবা, কেহ অধিক বয়স্ক কিন্তু সকলেই অবিবাহিত, খ্রীষ্টীয় ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের Vow of celibacy র মত ইহাদের মধ্যে যাহারা আশ্রমের তত্ত্বাবধারক হয়, ।ঙ্গা আশ্রমে বাস করে, তাহাদের বিবাহ করিবার নিয়ম নাই, তবে যাহারা আশ্রমে থাকে না, অর্থাৎ গৃহ-বাসী তাহারা স্ত্রীপুত্র লইয়াই বাস করে। আশ্রমে যাহারা বাস করে, ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা; বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা করিবার সময় 'হরিবোল' বা 'জয় গৌর নিত্যানন্দ' বলিয়া ভিক্ষা করে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষুকেরা 'জয় বলরাম চন্দ্র' বলিয়া ভিক্ষা চাহে। হাতে নারিকেলের প্রকাণ্ড খোলার্দ্ধ ভিক্ষাপাত্র, ও মস্তকে প্রকাণ্ড চুল গুচ্ছাকারে বাঁধা, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহারা 'বলরামী ভিক্ষুক'। স্থানীয় লোকে সাধারণতঃ ইহাদিগকে 'দরবেশ'ও বলিয়া থাকে, এবং এই আশ্রমকে অনেকে 'দরবেশের আখ্ড়া' বলে।

ইহাদের শব দাহ হয় না, বৈষ্ণব বা মুসলমানের ন্যায় ইহারা শব সমাহিত করে;

বলরামের শব তাঁহার আশ্রমের প্রায় এক মাইল দক্ষিণে ভৈরব তীরে সমাহিত করা হইয়াছিল; ফাল্গুনমাসে দোল পূর্ণিমার বারো দিন পরে ইহাদের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হয়, প্রতি বৎসর উৎসবান্তে বলরামের সমাধির উপর ইহারা ক্ষুদ্র কুটীর ও তাহার ভিতর বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া আসে, কিন্তু বর্ষাকালে এই কুটীরের কোন চিহ্নমাত্র থাকে না, যেথানে কুটীর সে সময় সেখানে দশ বারো হাত জল হয়।

বলরামী সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান পর্য্যন্ত এই সম্প্রদায়ের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোক অতি অল্পই, কিন্তু তাহারা সকলেই বিদেশীয়; উৎসবের সময় আসিয়া তাহারা তিনদিন এই আশ্রমে থাকে এবং উৎসবান্তে চলিয়া যায়। ইহাদের অধিকাংশই চাষকর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এমনো শুনিতে পাওয়া যায় যে তাহারা স্বদেশে গিয়া স্বজাতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে এবং তাহাদের মধ্যে নির্ব্বিরোধে ক্রিয়া কর্ম্ম চলে,. তথন তাহারা জাতিভেদও মানে, তবে যে বলরামের আশ্রমে তাহারা জাতিভেদ মানে না, তাহার কারণ বলরামের মাহাত্ম্য, যেমন জগন্নাথের মাহাত্ম্যে পুরুষোত্তমে হিন্দুর জাতিভেদ নাই।

এই বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ভুক্ত বহুলোক বলরামের আশ্রমে উপস্থিত হয়। স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়। উৎসবের তিন দিন এই আশ্রমেই তাহাদের আহারাদি চলিয়া থাকে। প্রথম দিন অন্ন মহোৎসব, দ্বিতীয় দিন চিপিটক ও তৃতীয় দিন লুচি মহোৎসবে উৎসবের উপসংহার হয়। এই উপলক্ষে ইহাদিগকে কোন জিনিসই ক্রয় করিতে হয় না, দেশবিদেশ হইতে উপস্থিত সকল যাত্রীই চাল, ডাল, লবণ, তৈল, ময়দা, ঘৃত চিনি ইত্যাদি দ্রব্য এত প্রচুর পরিমাণে লইয়া আসে যে উৎসবের পরও আশ্রমের ভাণ্ডারে অনেক দ্রব্য মজুত থাকে। উৎসবের কয় দিন ২৪ ঘণ্টাই আশ্রমে খোল করতাল বাজে, কীর্ত্তনের সুরে সঙ্গীত হয় এবং তর্কাদি চলিয়া থাকে। উৎসবের প্রথম দিন 'বলরামের দোল'; বলরামের কাষ্ঠপাদুকা সিংহাসনে তুলিয়া তাহা পুষ্পমালা বিভূষিত করিয়া ইহারা দোল করে। শুনিতে পাই, বলরাম যথন বাঁচিয়াছিলেন, তথনো তাঁহার দোল হইত, তিনি নিজেই দোলমঞ্চে উঠিয়া ঝুলিতেন।

এই সম্প্রদায়ের অতি অল্প লোকই সামান্য লেখাপড়া জানে, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত তার্কিক, ইহাদের আর এক বিশেষত্ব এই যে, তর্কে পরাস্ত হইয়াও ইহারা আপনাদিগের জিৎ সাব্যস্ত করে। কিন্তু ইহাদের এই বিশেষত্ব আজ কাল শুদ্ধ ইহাদের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, সনাতন ধর্ম্মাভিমানীর অনেকেরই আজকাল এ গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিন বলরামের এক চেলা আমাদের বাড়ী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের এক আত্মীয় সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁহে বাপু, বলরাম ত

জাতে ছিল হাড়ী, তোমরা সকলে তার পূজো কর কোন্ হিসাবে ?” লোকটা বলরামের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিল, “ওকথা বল্‌বেন না, তিনি পরম পুরুষ, ভগবানের অবতার, তিনি যখন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন, তখনি তাঁর হাড়ী হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।” কথাটা পরিষ্কার না হওয়ায় আত্মীয় মহাশয় একটা পরিষ্কার অর্থ চাহিলেন, সে ব্যক্তি উত্তর দিল, “বুঝিলেন না, হাড়ী কাকে বলা যায় ? না, যার হাড় আছে সেই হাড়ী, সুতরাং মানুষমাত্রেই হাড়ী, আমিও হাড়ী আপনিও হাড়ী।” আত্মীয় মহাশয় কিছু ক্রোধ-প্রবণ ব্যক্তি, তিনি ভয়ানক চটিয়া বলিলেন, “বেটার আস্পর্দ্ধা দেখেছো হে, ভিক্ষে ক'র্‌তে এসে গাল দিয়ে যায়, ঘা কতক দিয়ে দিতে হচ্চে।” লোকটা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বলিল, “মার্‌বেন ? মারুন কিন্তু তাই বোলে যা ঠিক তা কি ব'ল্‌বো না ? আপনাদের ভাল না লেগে থাকে, আর বলবো না।” এই বলিয়া সে গম্ভীরভাবে প্রস্থান করিল, তাহার সে গাম্ভীর্য্য ও সাহস দেখিয়া আমরাই যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম।

সেবার আমরা ইহাদের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সে দিন ভোজ, আমাদের দেশে ভদ্রসমাজে বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে যে রকম ভোজ হয়, বলরামী ভোজ দেখিলাম তদপেক্ষা অনেক ভাল। আমাদের পাঠকবর্গের অনেকেরই হয় ত পল্লীগ্রামের ভোজ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অতএব কথাপ্রসঙ্গে পল্লীগ্রামের ভোজের একটু বিবরণ তাঁহাদের নিকট বোধ হয় নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে না।

অন্নপ্রাশনেই হউক আর বিবাহে বৌভাত উপলক্ষেই হউক, পল্লীগ্রামের ভোজ বেলা তিনটের আগে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ভোজ জিনিসটা বড় প্রলোভন জনক, যে সমস্ত ছেলে পিলে বেলা ১০টার মধ্যে ভাত না পাইলে কাঁদিয়া খুন, তাহারা তীর্থের কাকের মত সেই সন্ধ্যে বেলা পর্য্যন্ত বুড়োদের মধ্যে বসিয়া থাকে, এবং দলপতিদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া অতি গম্ভীরভাবে বড় বড় ঝগড়া করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে। ২টা বাজিয়া গিয়াছে, ভোজের সমস্ত প্রস্তুত, এমন সময়ে কুটুম্বমহলে ভয়ানক গোলযোগ পড়িয়া গেল, ব্যাপার কি ? না পাঁচকড়ি নন্দী ১২৭১ সালে ভাগবৎ চৌধুরীর বড় ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের যখন বিবাহ দেন তখন তিনি সকলকে ৪টা করিয়া সন্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু গুরুচরণ সরকারকে ২টার বেশী দেওয়া হয় নাই এবং তাঁহার উপযুক্ত মামা শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দে যথাসময়ে নিমন্ত্রণ পান নাই, অতএব তাঁহারা মামা ভাগিনেয় অপমানিত হইয়াছেন এবং বর্ত্তমান ভোজে তাঁহারা নন্দীমহাশয়ের বাড়ীতে আহার করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেছেন না। মহা গোলমাল চলিতে লাগিল, শেষে নানাদিক্ হইতে বিবিধ অনুনয় বিনয়, উপরোধ অনুরোধ বর্ষিত হইলে এবং ক্ষুধার আধিক্য কিছু বর্দ্ধিত হইলে ৪টার পর গোলযোগ মিটিয়া গেল, সকলেই আহারস্থানে চলিলেন, আহারের স্থান হইয়াছে গৃহপ্রাঙ্গণে, উপরের খানিকটা

একশত ছিদ্রাচ্ছন্ন চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, সূর্য্য তখন পশ্চিম আকাশে, সুতরাং চন্দ্রাতপ থাকা আর না থাকা সমানই। সূর্য্যের প্রচণ্ডকিরণ ভোজনোপবিষ্ট কুটুম্ব মহাশয়দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল, তাঁহারাও "পেটে খেলে পিঠে সয়" এই নীতি অবলম্বন করিয়া অকাতরে ভোজন করিতেছেন। শাক, তরকারী, ডাল, মাছের ঝোল সমস্ত মিশিয়া এক রাসায়নিক উপাদান নির্ম্মিত হইয়াছে, এদিকে পরিবেষক মহাশয়ের কোমরে গামছা বাঁধা, হাতে অম্বলের পাত্র, সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাপ্লুত, কপাল ও বক্ষঃ হইতে ঘর্ম্ম ঝরিয়া পড়িতেছে, আর তিনি দ্রুতহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন, অতি মধুর দৃশ্য!

কিন্তু বলরামী সম্প্রদায়ের ভোজে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিলাম না। আশ্রমটি তপোবনের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, সুতরাং বৃক্ষচ্ছায়ায় পরিব্যাপ্ত সেই আশ্রমাঙ্গনে সকলে দল বাঁধিয়া খাইতে বসিয়াছে, একটু শব্দ নাই, একটির পর আর একটি এই রকম করিয়া পর পর সমস্ত তরকারী দেওয়া হইতেছে, এক তরকারী বা ব্যঞ্জন থাকিতে কাহারো পাতে অন্য তরকারী দেখিতে পাইলাম না।

আমরা আহারাদি দেখিয়া চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, আমার এক বন্ধু বলরামের একটি শিষ্যের সহিত কথোপকথন জুড়িয়া দিয়াছেন, ব্যাপারখানা কি বুঝিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বুঝিলাম বলরামের সেই শিষ্যটি জাতিতে ব্রাহ্মণ, আজ তাহাকে হাড়ী ও অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতির সহিত একাসনে বসিয়া অন্ন উদরস্থ করিতে দেখিয়া ভায়া তাহার উপর অত্যন্ত চটিয়া উত্তম মধ্যম কিছু শুনাইয়া দিতেছেন; দেখিলাম লোকটাও ভারি উৎসাহের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে বলিতেছে সকলকেই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেরই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা সকলের প্রতিই সমান স্নেহবান, তাঁহার কাছে ছোট বড় নাই, সুতরাং কাহারো সহিত কাহারো আহার ব্যবহারে আপত্তি হইতে পারে না, তবে যে আপত্তি হয় সে কেবল অহঙ্কারপূর্ণ ভ্রম মাত্র। সকল মানুষের আকারই এক; একজন মুসলমান ও একজন ব্রাহ্মণে আনীত জলের আস্বাদনের কোন পার্থক্য নাই। তাহারা যদি পৃথক্ স্থানে ভাত রাঁধিয়া রাখে ত একজন আগন্তুক ব্যক্তি ভাত দেখিয়া কিম্বা খাইয়া কখনই বলিতে পারে না যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের কিম্বা মুসলমানের রাঁধা খাইয়াছে। সুতরাং যাহার তাহার সঙ্গে খাইলে কিম্বা যাহার তাহার হাতে খাইলে জাতি যায় একথাটা ভ্রমমাত্র।

আমার বন্ধু তাহার সেই দীর্ঘ বক্তৃতার অতি সংক্ষেপ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "বাপু হে ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে, শেষকালে পরকালটা একেবারে নষ্ট করলে।" সেই লোকটার ভ্রমের জন্য দেখিলাম বন্ধু বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, যাহাহউক সেই লোকটা ভ্রান্ত কি আমার বন্ধু ভ্রান্ত এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বলরামের আশ্রমের মিউনিসিপাল ট্যাক্স নাই। অনেক দিন আগে ইহাদের আখড়ার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়, কিন্তু ইহারা কিছুতেই ট্যাক্স দেয় না, অবশেষে মিউনিসিপা-

লিটী ইহাদের বাটীর দুয়ার জানালা ওয়ারেণ্ট করিয়া লইয়া যান, কিন্তু ইহারা অটল! দুই একবার ইহাদের দ্রব্যাদি নিলাম করাও হইল, অবশেষে 'ধর্ম্মস্থান' বলিয়া আশ্রমের ট্যাক্স রহিত করা হইয়াছে।

বলরামের দৈববল সম্বন্ধে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক লোমহর্ষণ অদ্ভুত গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে আর সে সকল বলিবার ইচ্ছা নাই তবে নমুনা স্বরূপে একটি গল্প করিতেছি।

একবার বলরাম দুই একজন শিষ্যের সহিত গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে ভয়ানক পিপাসা লাগায় তিনি সশিষ্যে নিকটস্থ এক সূত্রধরের বাড়ী উপস্থিত হইয়া একটু জল চাহিলেন। সূত্রধর তখন তাহার কাজে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্ত ছিল, বলিল, "আমার ঘরে জল নাই অন্য বাড়ীতে দেখ।" তাহার ঘরে যে জলের কলস ছিল দেখিতে দেখিতে তাহা বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সমস্ত ঘর ভাসাইয়া জল বাহির পর্য্যন্ত গড়াইয়া আসিল। সূত্রধর বলরামকে মহাপুরুষ বিবেচনা করিয়া তাহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বলরাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

বলরামের মহত্ত্ব সম্বন্ধে যে দুই একটী গল্প শুনিতে পাওয়া যায় তাহা অতি মনোরম এবং উপদেশজনক; আমার ভক্তিভাজন পিতৃদেব একদিন আমাদের সাক্ষাতে বলরাম সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প বলিয়াছিলেন, আজ পাঠকবর্গকে সেইটি উপহার দিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বলরামের সময়ে মেহেরপুরে চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় নামক একজন প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন, জমীদারীর অপেক্ষা তাঁহার প্রতাপের মাত্রাটা কিছু বেশী ছিল। এক দিন সকালে তিনি নদীতে স্নান করিতে যাইতেছেন সঙ্গে রঘু ও রূপো লাঠিয়ালদ্বয়;—জমীদার মহাশয় বাড়ীর বাহির হইয়াই দেখিলেন, বলাই সর্দ্দার তাঁহার সম্মুখ দিয়া কোথা যাইতেছে, বলাই বলরামের একজন প্রিয় শিষ্য; ইহারা দেবতা ব্রাহ্মণকে কখন প্রণাম করে না; সুতরাং জমীদার হইলেও বাবুকে দেখিয়া প্রণাম করা দূরে থাক, সঙ্কুচিতভাবে রাস্তা ছাড়িয়াও দাঁড়াইল না। চন্দ্রমোহন বাবু এ রকম 'ছোট লোকের' এত উদ্ধত ব্যবহার পূর্ব্বে আর কখন দেখেন নাই, ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলাইকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেটা, তোরা হয়েছিস কি? দেবতা ব্রাহ্মণকে দেখে প্রণাম করিস্ নে, ঘা কতক জুতো না খেলে বুঝি কায়দা শিখবিনে?" বলাই ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আপনি যাহাই বলুন, বলরামচন্দ্রের শ্রীচরণে আমাদের মাথা বেচেছি, অন্য কারো কাছে তা নীচু হবে না।" 'বটে' বলিয়া জমীদার মহাশয় রঘু ও রূপোকে বলিলেন, "বেটাকে আচ্ছা ঘা কতক দিয়ে দেত রে।"

রঘু ও রূপো লাঠিয়াল,—তাহারা ইহাই চায়। তাহারা দুজনে গিয়া বলাইয়ের হাত চাপিয়া ধরিল, বলাইও এদিকে "ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শাল প্রাংশু মহাভুজ" শরীরে সামর্থ্যও

তদনুরূপ; বলাই ইচ্ছা করিলে রূপো ও রঘুকে হাতে ঝুলাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বলরামের উপদেশ ছিল তাঁহার শিষ্যেরা যেন কেহ কাহারও বিরুদ্ধে হাত না তোলে। আজ সে গুরুবাক্য অবহেলা করিতে পারিল না, প্রতিকারে সক্ষম হইয়াও দাঁড়াইয়া মার খাইল; বাঁশের লাঠি দিয়া ভয়ানক প্রহার করিয়া রূপা ও রঘু প্রভুর সহিত চলিয়া গেল।

বলাই অতি কষ্টে আশ্রমে ফিরিয়া আসিল। বলরাম বলাইএর দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় দুঃখিত হইলেন, এবং তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; বলাই বলিল, "চন্দ্রমোহন বাবু তাঁর লাঠিয়াল দিয়ে আমার সর্ব্বশরীর গুঁড়ো করে দিয়েছে, এর বিচার করতে হবে। প্রভু, আমি কোন দোষ করিনি।"

তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল সমস্ত বলিল। উদারহৃদয় বলরাম সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "বলাই এ সমস্ত আঘাত আমার শরীরেই হয়েছে, আমি কি বিচার করবো ভগবানই সুধু বিচারের কর্ত্তা। আর দেখ, চন্দ্রমোহন তোকে মেরেছে বলে তোর দুঃখ হয়েছে, কিন্তু চন্দ্রমোহন কি মানুষ, মানুষ কি মানুষকে মারতে পারে? মানুষ কি মানুষের বুকে ছুরী বেঁধে? কখন না। মানুষের ধর্ম্ম কি? মানুষ মানুষকে ভালবাসবে, ভক্তিশ্রদ্ধা করবে, প্রেমালিঙ্গন দেবে, যারা এ সমস্ত ভুলে সুধু পরস্পরের হিংসা করে, ঝগড়া করে, মারামারী করে, তারা মানুষ নয় পশু; তুই চন্দ্রমোহনের মানুষের মত হাত পা চোখ মুখ সব দেখতে পাচ্ছিস কিন্তু তার পশুর মত ভয়ানক ধারাল দাঁত, নখ, হিংসা ও অহঙ্কারে পূর্ণ অতি কুৎসিৎ মুখভঙ্গি সুধু আমার চোখে পড়চে; একটা কুকুর কি একটা শিয়াল যদি তোরে কামড়াতো তা হলে তুই কি তাদের নামে নালিশ করতে আসতিস? আয় তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই সকল ব্যথা দুর হবে।" এই বলিয়া বলরাম বলাইকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন, এবং তাহার গায়ে দু এক বার হাত বুলাইয়া দিলেন; গুরুর আদর ও উপদেশে তাহার বেদনা দুর হইল।

বলরাম ছোট লোকের ছেলে ছিলেন, কখন লেখা পড়া শেখেন নাই কিম্বা শিখিতে চেষ্টা করেন নাই, কখনো শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসেন নাই, যত অশিক্ষিত চাষা-ভুষো তাঁহার সহচর ছিল; কিন্তু তথাপি তাঁহার দেবোচিত মহত্ত্বের অতি সুন্দর সুন্দর গল্প শুনিয়া স্বতই মনে হয় এই অশিক্ষিত নীচ জাতীয় পুরুষবর আমাদের সভ্যভব্য শিক্ষাভিমানীর সমাজ হইতে কত উচ্চে ছিলেন! অকারণে এতগুলি নরনারী তাহাদের হৃদয়ের ভক্তি উপহারে দেবতাবোধে বলরামের পূজা করে না; তাহারা যতই ভ্রান্ত বা অন্ধ হউক তাহাদের হৃদয়ে শান্তি দান করিবার মত সত্যটুকু বলরামের ছিল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈদেশিক সাক্ষী।

প্রথম সাক্ষী চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান :—

ফাহিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। * তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে "বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভীষণ শত্রু" কুমারিল ভট্ট কিম্বা শঙ্করাচার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। তদ্দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, কুমারিল এবং শঙ্কর ফাহিয়ানের ভারতভ্রমণের পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী চীন পরিব্রাজক সুংযুন :—

ইনি ৫১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। তিনি পেসবার ও নগরহার দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে ভারতের প্রাচীন কাহিনী কিছুমাত্র লিখিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তৃতীয় সাক্ষী ত্রিপিটকাচার্য্য হিয়োন সাঙ্ :—

ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যে, হিয়োন সাঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্ত-গ্রন্থে † কুমারিল ভট্ট কিম্বা শঙ্করাচার্য্যের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রমণ হোউলি এবং যেনসুং প্রণীত হিয়োনসাঙ্গের জীবনচরিত গ্রন্থে, হিয়োনসাঙ্গের নালান্দায় অবস্থান কালে তিনি যে সকল "বিধর্ম্মীর" সহিত তর্কসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে "ভূতবাদী"- "নির্গ্রন্থা" (জৈন) "কাপালিক" "জ্যোতিক" (?) "সাংখ্য" এবং "বৈশেষিক" সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু কোন স্থলেই অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। আমরা ইহার কিছুমাত্র কারণ অনুভব করিতে পারিতেছি না। ইহা দ্বারা দুই প্রকার সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ মহর্ষি জৈমিনীর মতাবলম্বী কর্ম্মবাদী সম্প্রদায়ের পুনরভ্যুত্থানকারী কুমারিল ভট্ট এবং অদ্বৈতবাদ-প্রচারক মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য, হিয়োন সাঙ্গের পরবর্ত্তী। দ্বিতীয়তঃ কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্করাচার্য্য দ্বারা বৌদ্ধগণ বিশেষরূপে

---

* Pilgrimage of Fa Hian (Calcutta—1848)

Beal's Travels of Sung-yun and Fa-hien.

† Si-yu-ki ; Translated by Beal. (2 vols.)

পরাস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া হিয়োন সাঙ্ তাঁহাদের নাম কিম্বা ঐ দুই সম্প্রদায়ের উল্লেখও করেন নাই। ইহার কোনটি সত্য সুবিজ্ঞ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

চতুর্থ সাক্ষী চীন পরিব্রাজক ই-সিং :—

ভারত-ভ্রমণাভিলাষে ই-সিং ৬৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে কেণ্টন নগরী পরিত্যাগ করেন। তিনি অর্ণবপোতারোহণে শ্রীভোজ (সুমাত্রা), কোয়েদা, নাগপত্তন, রাক্ষিয়াং প্রভৃতি দেশ দর্শন করিয়া তাম্রলিপ্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি ভারতের ৩০টি প্রধান রাজ্য এবং বৌদ্ধগয়া ও অন্যান্য তীর্থস্থান দর্শন করিয়া সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ৪০০ গ্রন্থ সংগ্রহ করত ৬৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চীন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতপ্রবর বিল ই-সিং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ না হইলে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা যাইতে পারে না। * পরিব্রাজক ই-সিং তাহার গ্রন্থে আরও ৪৩ জন পরিব্রাজকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে সেই সকল পরিব্রাজকের নামোল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

পঞ্চম সাক্ষী আলবেরুণী :—

আবুরিহান আলবেরুণী পারস্যদেশবাসী। † তিনি ৩৬০ হিজরী (৯৭১ খৃষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। আলবেরুণী ৪০ বৎসর ভারতে অবস্থান করিয়া "তারিখুল হিন্দ" নামক অতি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন (১০৩১ খৃষ্টাব্দে)। ‡ আলবেরুণী ভারতের ধর্ম্ম, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি সম্বন্ধে তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় যে, তিনিও শঙ্করের সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই।

ষষ্ঠ সাক্ষী তারানাথ :—

ইনি ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বতদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জাতীয় নাম কুন সনজিং। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্বদেশবাসী যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন জন্য ভারতে আগমন করিয়াছেন তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতীয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে কুন সনজিং "তারানাথ" আখ্যা প্রাপ্ত হন। খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি ভারতে আগমন করেন। তদানীন্তন প্রচলিত প্রবন্ধ ও বৌদ্ধগ্রন্থাদি হইতে সারসংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করত, ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে "বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস"

---

* ই-সিং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। তিনি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের যেরূপ গুণানুবাদ করিয়াছেন তদ্দ্বারা নৃপকুলতিলক হর্ষকে সত্য সত্যই রত্নাবলী-প্রণেতা বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে। সেই সকল যথাস্থানে বর্ণিব।

† আবু রিহাণ আলবেরুণীর জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

Alberuni's India : Translated into English—by Prof. Edward Sachau (2 Vols.)

‡ Life of Hiuen-Tsiang : Translated by Beal pp. 161, 162.

লিপিবদ্ধ করেন। জর্ম্মাণ ভাষায় তারানাথের গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু জর্ম্মাণ ভাষার প্রবন্ধ-লেখকের আয়ত্ত নাই, সুতরাং কুমারী লায়েলের "মগধের রাজন্য-বর্গের বিবরণ"ই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। *

তারানাথ বলেন, "মগধরাজ" "প্রাদিত্য" যৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে সম্রাট বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত হইতেন, সেই সময় বালচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র, কামরূপ ও তীরভূক্তি (মিথিলা) দেশ শাসন করিতেছিলেন। তিনি (কোষকার) অমর সিংহের আশ্রয়দাতা।

"সম্ভবত এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভীষণ শক্র শঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশে এবং তাঁহার শিষ্য ভট্টাচার্য্য উড়িষ্যা দেশে আবির্ভূত হন। ইহার কিছুকাল পরে দক্ষিণাপথবাসী বৌদ্ধগণ কুমারিল এবং কনাদরুরু দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। অবশেষে ধর্ম্মকীর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য এবং কুমারিলকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময় হইতেই বৌদ্ধদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারতাকাশের পশ্চিম প্রান্তে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্ম-কীর্ত্তি তিব্বতা-ধিপতি শ্রোং জান-গাম্বুর † সমসাময়িক।"

উক্ত নরপতি ৬০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃ-বিয়োগের পর তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমে (৬১৬ খৃষ্টাব্দে) তিনি ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন জন্য থৌমি সম্ভূত (সম্ভুট) এবং আরও ১৮ জন যাজককে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতীয় বর্ণমালা ‡ এবং বিবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করত স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

উল্লিখিত নরপতি নেপালাধিপতি জ্যোতিবর্ম্মার কন্যা বিবাহ করেন। বলা বাহুল্য যে, তিব্বতের ইতিহাস লেখকগণ যাহাকে জ্যোতিবর্ম্মা লিখিয়াছেন, নেপালের ইতিহাসে তিনি অংশুবর্ম্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই নরপতি "ঠাকুরী" বংশ সম্ভূত। কৈলাসকূটভবন তাঁহার রাজধানী ছিল। আমরা "লিচ্ছবি রাজগণ" প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, অংশুবর্ম্মার সময়ে নেপাল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ঠাকুরী বংশজগণ কৈলাস-

---

* Taranatha's Account of Magadha Kings : Translated From Vassilief's work on Budhism-by Miss E. Lyall.

† Srong—tzan-garu-bo, or Srong-btsan sgam-po; পরিব্রাজক ফাহিয়ান ধর্ম্মকীর্ত্তি নামক জনৈক বিখ্যাত শ্রমণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (Fo-kwo-ki. Ch. XXX VIII) ইনি ফাহিয়ানের সমসাময়িক। হিয়োনসাং ধর্ম্মকীর্ত্তির নামোল্লেখ করেন নাই।

‡ Sarat Chandra Dass' Sacred and Ornamental Characters of Tibet J. A. S. B. LVII ii 41); Sarat Chandra Dass' Contributions on Tibet (J. A. S. B. L i. 291); Rockhill's Life of The Buddha. p. 212.

কূটভবনে এবং লিচ্ছবিগণ মানগৃহে বাস করিতেন। লিচ্ছবিবংশজ মহারাজ বৃষদেব অংশুবর্ম্মণের সমসাময়িক, সুতরাং তারানাথের বর্ণনা দ্বারা ৫ নং প্রবাদ সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

তারানাথের মতে কুমারিল ভট্ট শঙ্করের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী হইতেছেন। আমরা ইহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মাধবাচার্য্যের মতে কুমারিল ভট্ট বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তিনি শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক। সুতরাং তারানাথের এরূপ সামান্য ভ্রম গ্রাহ্য যোগ্য নহে।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সাক্ষীদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে দেশীয় মহাত্মাগণ শঙ্করের সম্বন্ধে কে কি কথা বলিয়াছেন তাহারই উল্লেখ করিব। প্রথমেই "পুরাণ" প্রণেতাদিগের কথা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ কে কোন সময়ে কোন গ্রন্থ রচনা করিলেন, তাহা প্রায় সকলেই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ ধর্ম্ম সংগ্রামে উন্মত্ত হইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং আত্মনাম ও সময় গোপন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করত চিরকালের জন্য ভারতবাসীদিগকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ পুরাণ মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ প্রণীত বলিয়া সর্ব্বত্র কথিত হইয়া থাকে। যে মহাত্মা বেদ বিভাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, উপনিষদে যাঁহার নাম দৃষ্ট হয়, সেই মহাত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত পরিপোষণকারী অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রুতি ও দর্শন সমূহ হইতে সংগৃহীত অংশগুলি পৃথক্ রাখিলে পুরাণগুলিকে কবির লড়াই বলা যাইতে পারে। আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যেরূপ পথে দাঁড়াইয়া কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া আমাদিগের দেবতাগুলিকে নিতান্ত ঘৃণিতভাবে গালিগালাজ করিয়া থাকেন, পুরাণকারগণ ৮। ৯ শতাব্দী পূর্ব্বে তদ্রূপ অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে কেবল বৌদ্ধ, চার্ব্বাক প্রভৃতিকে ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন, এমত নহে, আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের যে তিনটি প্রধান দেবতা, তাঁহারও কোন কোনটিকে নরকে নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে আমাদিগকে দারুণ শিববিদ্বেষী এক পুরাণের নামোল্লেখ করিতে হইবে। ইহার নাম

পদ্মপুরাণ। কোন গোঁড়া বৈষ্ণব কর্ত্তৃক এই পুরাণ রচিত হইয়াছে। তাহাতে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগকে "ক্ষিতিপাবনাঃ" বলা হইয়াছে। উক্ত পুরাণের উত্তর খণ্ডের ৭৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে পাষণ্ড। যে অজ্ঞ ব্রাহ্মণ একবার মাত্র শিবাদি দেবতার প্রসাদ ভোজন করে, সে নিশ্চিত চণ্ডাল। সে নরকাগ্নিতে কোটি সহস্র কল্প দগ্ধ হয়।" এই দারুণ শিববিদ্বেষী গ্রন্থকার শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, (উত্তর খণ্ড, ৪২ অধ্যায়) মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করত অদ্বৈতবাদ প্রচার পূর্ব্বক জগৎ বিনষ্ট করিব।" কি ভয়ানক হিংসা!

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত স্বপ্রণীত উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে ইহা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই শিব এবং শঙ্কর বিদ্বেষী পুরাণের উত্তর খণ্ড খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে রচিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় ইহা চৈতন্যের পরবর্ত্তী। এবম্প্রকার গ্রন্থ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল নির্ণয় হইতে পারে না। অন্য কোন পুরাণে শঙ্করের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

২। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য (শিষ্যের শিষ্য) সর্ব্বজ্ঞ মুনি বা সর্ব্বজ্ঞাত্মা স্বীয় পরম গুরু শঙ্করের পদানুসরণ করতঃ ব্রহ্ম সূত্রের যে সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করেন তাহার নাম "সংক্ষেপ শারীরক"। উক্ত গ্রন্থে সর্ব্বজ্ঞ মুনি লিখিয়াছেন যে তিনি "মানব গোত্রজ আদিত্য নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতির শাসনকালে এই "সংক্ষেপ শারীরক রচনা করেন।"

পণ্ডিত প্রবর ডাক্তার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার বলেন, "এই আদিত্য নরপতি অবশ্যই চালুক্য বংশজ হইবেন। দ্বিতীয় পুলকেশির উত্তরাধিকারী বিক্রমাদিত্যকেই (প্রথম) বোধ হয় সর্ব্বজ্ঞ মুনি আদিত্য নরপতি লিখিয়াছেন। ক্ষোদিত লিপি অনুসারে এই নরপতি ৬২৪-৬৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।"

একমাত্র "মানব গোত্রজ" শব্দ দ্বারা আমরা ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতানুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। চালুক্য নরপতিদিগের ক্ষোদিত লিপি সমূহে তাহাদিগকে "মানব গোত্রজ" এবং "হারিতি গোত্রজ" বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। চালুক্য বংশ ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন রাজবংশের "মানব গোত্রজ" দৃষ্ট হয় না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ মুনির লিখিত আদিত্য নরপতি যে চালুক্য বংশজ তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু ভাণ্ডারকারের ন্যায় আমরা বিক্রমাদিত্যকে (প্রথম) আদিত্য নরপতি অবধারণ করিতে পারি না। অনেকগুলি তাম্র শাসন ও প্রস্তর লিপি অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা চালুক্য নরপতিদিগের একখণ্ড সুদীর্ঘ বংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছি। সেই বংশাবলীর কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

বংশাবলীর কিয়দংশ।

১। জয়সিংহ মহারাজ। (৪১১ শকাব্দ।)

২। রণরাজ (রণরসিক) মহারাজ।

৩। পুলকেশি বল্লভ মহারাজ।

৪। কীর্ত্তিবল্লভ মহারাজ (৪৮৯ শকাব্দ।)

৫। মঙ্গলীশবল্লভ মহারাজ

৬। পরমেশ্বর সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভ মহারাজ। দ্বিতীয় পুলকেশি (৫৩২-৫৬ শকাব্দ)

জয়সিংহ মহারাজ। (নাসিকের শাসন কর্ত্তা।)

কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন। বেঙ্গীরাজ্যের এবং প্রাচ্যচালুক্য বংশের আদি নরপতি

চন্দ্রাদিত্য। সাবন্তবাড়ীর শাসনকর্ত্তা।

৭। বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয় পৃথিবী বল্লভ মহারাজ (৬০২ শকাব্দে পরলোক গমন করেন)

আদিত্য মহারাজ কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রানদীর সঙ্গম স্থলে রাজপাঠ স্থাপন করেন।

৮। বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভ মহারাজ। (৬০৩—১৮ শকাব্দ)

৯। বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভ মহারাজ (৬১৮—৫৫ শকাব্দ)

১০। বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভ মহারাজ (৬৫৫—৬৬৯ শকাব্দ।

১১। কীর্ত্তিবর্ম্মণ সত্যাশ্রয় (৬৭৫ শকাব্দে রাষ্ট্রকুটাপতি দান্তিদুর্গ দ্বারা রাজ্যচ্যুত হন।

প্রকাশিত তালিকার ৬নং নরপতি, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধণ শিলাদিত্যের সমসাময়িক। তাঁহার বীরত্ব কাহিনী যে কেবল চালুক্য নরপতিদিগের ক্ষোদিত লিপিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে এমত নহে। চীন পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ্ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার বিক্রম-কাহিনী উজ্বল ভাষায় "সি-উ-কি" গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই নরপতির সময় সম্বন্ধেও কোন গণ্ডগোল নাই। কারণ তিনি হর্ষবর্দ্ধণ এবং হিয়োন সাঙের সমসাময়িক। তাঁহার তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি দ্বিতীয় পুত্র বিক্রমাদিত্যকে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রকে আধুনিক সাবন্তবাড়ী প্রদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গম স্থলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অভিনব রাজ্য সংস্থাপন করিয়া পুলকেশির (দ্বিতীয়ের) তৃতীয় পুত্র আদিত্যকে সেই রাজ্যের রাজসিংহাসনে স্থাপন করা হয়। উক্ত আদিত্য মহারাজ ব্যতীত চালুক্য বংশে আর কোন আদিত্য নরপতির নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ইহা এক প্রকার স্থির ভাবে বলা যাইতে পারে যে, দ্বিতীয় পুলকেশির তৃতীয় পুত্র উল্লিখিত আদিত্য মহারাজের শাসন কালে তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ নিবাসী সর্ব্বজ্ঞ মুনি "সংক্ষেপ শারীরক" রচনা করিয়াছিলেন। আদিত্য মহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রমাদিত্য ৬০২ শকাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও তৎসমসাময়িক সর্ব্বজ্ঞ মুনি শকাব্দের ষষ্ঠ-শতাব্দীর অন্তে এবং সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে জীবিত ছিলেন। এই গল্প অনুসারে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ নির্ণীত হইতেছে।

৩। মহীসুরের মৃত মহারাজ শৃঙ্গগিরি মঠের মোহান্তদিগের নামের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেই তালিকা অবলম্বনে পণ্ডিত এন ভাষ্যাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, শঙ্করের পর বিশ্বরূপ তৎপর নিত্যবোধঘন, জ্ঞানঘন, জ্ঞানোত্তম, জ্ঞানগিরি, সিংহ গিরিশ্বর, ঈশ্বর তীর্থ, নৃসিংহতীর্থ, বিদ্যাশঙ্করতীর্থ এবং ভারতী কৃষ্ণতীর্থ সেই মঠের মোহান্ত হইয়াছিলেন। তদনন্তর ১২৫৩ শকাব্দে বিদ্যারণ্য সেই মঠের গদি প্রাপ্ত হন। বিদ্যারণ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ১১জন মোহান্তের সময়—প্রতি জন গড়ে ৫০ ধরিলে—৫৫০ বৎসর হইতে পারে।* তদনুসারে শঙ্করের আবির্ভাবকাল শকাব্দের অষ্টম শতাব্দীর আরম্ভে নির্ণয় হইতেছে। কিন্তু এই তালিকার সত্যতার সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্ত হইতে পারিলাম না।

নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে শঙ্করের সময়াবধারণ করা যাইতে পারে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে এরূপ অন্য কোন গ্রন্থ নাই। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা শঙ্কর বিজয় লেখকদিগের গ্রন্থের আলোচনা করিব।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র সিংহ।

---

* গড়ে ৩০ বৎসরের অধিক গণনা করা যাইতে পারে না।

নিমচাঁদের মর্ত্ত্য দর্শন।

একদিন যমরাজ সিংহাসনোপরি বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মন্ত্রী চিত্রগুপ্ত রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া এই নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! মর্ত্ত্যলোক হইতে যে সকল লোক আসে, তাহাদিগের বিচার এতদিন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ কাল একটি বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাই। যাহারা দণ্ড পায়, তাহারা তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করে এবং এই বলে যে 'দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমার কিছুই দোষ নাই। পৃথিবীতে অতি নির্দ্দোষভাবে কাটাইতে পারিতাম, কেবল আমার স্ত্রীর জন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে হইয়াছে। দোহাই, আমি কিছুই জানি না। সব দোষ আমার স্ত্রীর।' এইরূপে মহারাজ, যে দণ্ড পায় সে এই কথা বলে। ইহাতে দেখা যাই-তেছে যে, আজ কাল পৃথিবীতে স্ত্রীরা নূতন প্রকার ভাব ধারণ করিয়াছে। কেননা এ প্রকার অভিযোগ আগে শুনা যাইত না। মহারাজ এ বিষয় অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা হউক। যেহেতু এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখানে যাহা বিচার হয়, তাহা অন্যায় এবং অযথা বলিয়া স্থির হইবে। ইহাতে আপনার নামে কলঙ্কও আসিবে।" যমরাজ মন্ত্রীর কথা শুনিয়া বিশেষ ভাবিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ রাজসভা আহূত হইল। মন্ত্রীরা উপস্থিত। যমরাজ সিংহাসন হইতে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তৎপর বিচার আরম্ভ হইল। অনেকক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডার পর ইহা স্থির হইল যে, যমপুরী হইতে একজন মন্ত্রী মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবে এবং সেখানে মানুষের জীবন অবলম্বন করিয়া একথা ঠিক কি না তাহার নির্ণয় করিয়া যমরাজকে অবগত করাইবে। কিন্তু ধরাতলে আসিতে সকলেই বিমুখ। যমরাজ ইহা দেখিয়া আজ্ঞা দিলেন যে স্ফূর্ত্তি খেলা হইবে এবং যাহার নাম তাহাতে পড়িবে তাহাকেই যাইতে হইবে। সুসঙ্গত বলিয়া একজন যমপুরের কর্ম্মচারী এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সে পাঁচ লক্ষ টাকা সঙ্গে লইয়া এখানে আসিবে, আসিয়া বিবাহ করিবে এবং মনুষ্যের ভাগ্যে যে সকল দুর্ঘটনা এবং কষ্ট ঘটে, সে সকলি তাহার সহ্য করিতে হইবে ইহা স্থির হইল। নাম পর্য্যন্ত তাহার বদলাইতে হইবে—সেইজন্য সে নিমচাঁদ নাম ধারণ করিয়া যমপুরের অন্যান্য অনেক-গুলি লোক লইয়া একেবারে কাশ্মীরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। অতীব ধনসম্পন্ন বণিক বলিয়া লোকের নিকট পরিচিত হইয়া নিমচাঁদ একটি বৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করিয়া সেই-খানে অবস্থিতি করিতে লাগিল। নিমচাঁদ দেখিতে মন্দ নহে। বিদ্যা বুদ্ধি আছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে টাকাও আছে। এই দেখিয়া অনেক লোকে তাহাদিগের কন্যার সহিত নিমচাঁদের বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিল। নিমচাঁদও সেই সকল প্রস্তাব শুনিয়া

মহা আগ্রহ প্রকাশ করিল। অবশেষে অনেক দেখিয়া শুনিয়া একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে মনোনীত করিল। কন্যাটির নাম মনোরমা, তাহার পিতা মাতা গরীব, সুতরাং কন্যার বিবাহ দিবার সময় নিমচাঁদের সহিত তাঁহারা এই ঠিক করিয়া লইলেন যে, নিমচাঁদকে তাহার দুই ভগিনীর বিবাহ দিতে হইবে এবং তিন ভ্রাতাকে অর্থ দিয়া বাণিজ্যার্থে বিদেশে পাঠাইতে হইবে। নিমচাঁদের বিবাহ হইল। ঘোর ঘটা করিয়া বিবাহ হইল এবং নিমচাঁদ প্রথম দিবস হইতে স্ত্রীর দাসানুদাস হইয়া পড়িল। স্ত্রীর অনুরোধে সে সকলই করিত। অনেক অর্থ দিয়া দুই শ্যালিকার বিবাহ দিল এবং পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দিয়া একটি একটি শ্যালককে বিদেশে পাঠাইল। নিমচাঁদ সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহিত জীবন অনেক সময় অধিক দিন সুখে কাটে না। নিমচাঁদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। সে স্ত্রীর মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সদাই রত, কিন্তু স্ত্রীর কামনা কখন পূর্ণ হয় না। স্ত্রীর মন যোগাইতে তাহাকে শীঘ্রই সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইল। কিন্তু সকল হারাইয়াও যদি স্ত্রীকে সুখী করিতে পারিত, তাহাতে হানি ছিল না। তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। স্ত্রীর যেমন রাগ, তেমনি অহঙ্কার। স্বামীকে কটু কথা বলা মনোরমার একটি প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য ছিল, এবং কখন কখন অহঙ্কার করিয়া স্বামীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াও হইত। একে স্ত্রীর গঞ্জনা দিবারাত্রি, তাহাতে টাকার অভাব! নিমচাঁদের দিবসে স্ফূর্ত্তি নাই, রাত্রে বিশ্রাম নাই। শরীর শীর্ণ হইল, মুখ ম্লান হইল এবং মনও গ্লানিতে পূর্ণ হইল। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, যেহেতু তাহার পৃথিবীতে দশ বৎসর থাকিবার কথা। সর্ব্বক্ষণ স্ত্রীর করালবদন শয়নে স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থায় তাহার সম্মুখে উপস্থিত। শেষে এমন হইল যে যদি কেহ বলিত যে তোমার স্ত্রী আসিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গ বিকল হইয়া সে জ্বরে পড়িত। প্রাণ দুঃসহ হইল। আবার বিপদের উপর বিপদ। যে কয় শ্যালককে টাকা দিয়া বিদেশে পাঠাইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, আর একজনের জাহাজ সমুদ্রে জলমগ্ন হয়। যাহা কিছু আশা ছিল, তাহাও গেল। এদিকে সহরের লোকেরা জানিতে পারিল যে নিমচাঁদের আর কিছুই নাই। তাহাদিগেরই অনেকের নিকট সে ঋণী হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা নিমচাঁদকে জেলে পাঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। নিমচাঁদ দেখিল যে আর রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং 'পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। এই মনে করিয়া একদিন পার্শ্ব দরজা দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া সে পলায়ন করিল। ক্ষণকাল পরে সহর মধ্যে জনরব হইল যে নিমচাঁদ পলাইয়া গিয়াছে। যাহারা তাহাকে টাকা ধার দিয়াছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। নিমচাঁদ ছুটিতেছে, তাহারাও ছুটিতেছে। তাহারা নিমচাঁদের এত নিকটবর্ত্তী হইল যে নিমচাঁদের কর্ণে তাহাদিগের ঘোড়ার টকাবক্ শব্দ প্রবেশ করিল। সে রাস্তায় আর যাইতে না পারিয়া এক মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়াও

অসম্ভব হইল। অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া সে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক কৃষকের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কৃষক তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাকে কতকগুলা ঘাসের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। পশ্চাৎবর্ত্তী লোকেরা অনেক অন্বেষণ করিয়া তাহাকে না পাইয়া চলিয়া গেল। অবশেষে নিমচাঁদ বিপদ চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া বাহিরে আসিল এবং কৃষককে বলিল, "ভাই! তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখন ভুলিব না। তুমি যাহাতে অনেক অর্থোপার্জ্জন করিয়া সুখী হও, তাহা আমি করিব।" এই বলিয়া সে আদ্যোপান্ত নিজের ইতিহাস কৃষককে বলিল। সে মনুষ্য নহে, যমরাজের প্রজা, মর্ত্ত্য-লোকে কি কারণে আসিয়াছিল, এখন তাহার এরূপ দুরবস্থা কি সূত্রে হইয়াছিল, এ সমুদয় সবিস্তারে কহিয়া সে কৃষককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে কৃষক! তুমি শীঘ্র শুনিতে পাইবে যে এই সহরের একজন স্ত্রীলোককে ভূতে পাইয়াছে। এ সমাচার পাইলেই তুমি স্থির করিয়া লইও যে আমি তাহাকে পাইয়াছি। আর তুমি আমাকে যাইতে না বলিলে আমি সে স্ত্রীলোককে কখন ছাড়িব না। এইরূপে তুমি তাহার পিতার নিকট হইতে যত টাকা ইচ্ছা হয়, লইতে পার।" এই বলিয়া নিমচাঁদ তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিছুদিন পরে কৃষক শুনিতে পাইল যে সহরে বলদেব নারায়ণ বলিয়া একজন ধনবান্ লোকের কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে। সে নানা প্রকার প্রলাপ বকিতেছে। লোকে না বলে যে মেয়েটা কল্পনা দ্বারা চালিত হইয়া অস্বাভাবিক ব্যবহার করিতেছে এইজন্য ভূত তাহার মুখ দিয়া সংস্কৃত কহিতে লাগিল, যোগশাস্ত্রের নানা বিধি দিল এবং অনেকের ভিতরকার কথা সকল বাহির করিতে লাগিল। অমুক পুরোহিত এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, অমুক সাধু অমুকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এই প্রকার গোপনীয় কথা প্রকাশ করাতে অনেকের মহা আমোদ হইল, কাহারও ভয় হইল এবং কতকগুলি লোকের মনে মহা ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হইল। মেয়ে আর সারে না। অবশেষে কৃষক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলদেব নারায়ণকে বলিল যে, আমাকে যদি ৫০০৲ টাকা দেন, আমি আপনার কন্যাকে স্বাস্থ্য দান করিব। পিতা সম্মত হওয়াতে কৃষক কন্যার কর্ণে ফুস ফুস্ করিয়া বলিল, "নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, আমি সেই কৃষক। এখন এই কন্যাকে ছাড়িয়া যাও।" নিমচাঁদ বলিল, "তুই এসেছিস্। আচ্ছা, আমি যাচ্চি! কিন্তু পাঁচ শত টাকাতে কি তুই বড়মানুষ হইবি? ইহাতে তোর কি উপকার হইবে? আমি আর দিন কয়েক পরে উদয়পুরের রাজার কন্যাকে পাইব। তুই সেইখানে গিয়া অনেক টাকা চাহিস। চাহিলেই পাইবি।" এই বলিয়া নিমচাঁদ চলিয়া গেল, কন্যা আরোগ্য লাভ করিল এবং কৃষক পাঁচ শত টাকা পাইয়া একটি বাড়ী কিনিল।

কিছু দিন পরে উদয়পুরের রাজার কন্যাকে ভূতে পাইল। অনেক ওঝা আসিল, অনেক মন্ত্র উচ্চারিত হইল, উপাধ্যায়েরা আসিয়া বিধিমত এবং শাস্ত্রমত সমুদয় ক্রিয়া কলাপ করিল কিন্তু কিছুতেই কিছুই হইল না। অবশেষে রাজা কৃষকের কথা শুনিয়া

তাহাকে আনাইলেন। কৃষক ৫০,০০০ টাকা চাহিল। রাজা সম্মত হওয়াতে কৃষক নিমচাঁদকে যাইতে বলিল। নিমচাঁদ যাইবার সময় কৃষককে বলিল, "তুই এখন বড়-মানুষ হইয়াছিস। তোর ঋণ আমি শুধিয়াছি। আর তুই আমার কাছে কিছুই পাইবি না। এখন যা সুখে দিন কাটাগে। কিন্তু তোর সঙ্গে আমার এই শেষ দেখা। আমা হইতে সদা দূরে থাকিস। আবার দেখা হইলে তোর যে উপকার করিয়াছি তাহা উপকার না হইয়া অপকার হইয়া উঠিবে।" কৃষক সম্মত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুখে দিন যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু কৃষকের পরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। দিল্লীর সম্রাটের কন্যাকে ভূতে পাইয়াছে এই সংবাদ একদিন কৃষক হঠাৎ শুনিল। তাহার দ্বারে রাজদূত উপস্থিত। "তোমাকে দিল্লীতে যাইতে হইবে মহারাজা এই আজ্ঞা করিয়াছেন।" কৃষক অনেক আপত্তি করিয়া রাজদূতকে বিদায় দিয়া কিছু দিনের জন্য অব্যাহতি পাইল। কিন্তু সম্রাট কৃষকের অসম্মতি গ্রহণ করিলেন না। কাশ্মীর দিল্লির অধীনস্থ ছিল। সুতরাং দিল্লীশ্বর কাশ্মীরাধিপতিকে কৃষককে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। কৃষকের অনন্য-গতি হইয়া দিল্লীতে যাইতে হইল। সম্রাটের সম্মুখে সে বলিল—"আমার ভূত তাড়াইবার ক্ষমতা ছিল বটে। কিন্তু আমি সকল অবস্থাতে কৃতকার্য্য হই না। ভূতেরা অতিশয় স্বেচ্ছাচারী এবং একগুঁয়ে, তাহাদের তাড়ান দুরূহ।" সম্রাট বলিলেন—"যাহাই হউক না কেন আমার কন্যাকে যদি ভাল করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার ফাঁসি হইবে। কৃষক এই কথা শুনিয়া ভয়ে অস্থির। উপায়ান্তর নাই, যাহাহউক একটা কিছু করিতে হইবে। হৃদয়ে যতটুকু পরিমাণ সাহস ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া অবশেষে সে রাজকন্যাকে তাহার নিকটে আনয়ন করিতে বলিল। রাজকন্যা আসিলে সে তাহার কর্ণে এই কথাগুলি বলিতে লাগিল—"নিমচাঁদ, নিমচাঁদ, তোমার পায়ে পড়িতেছি। এবার আমার কথাটি শুন। তোমার যে উপকার করিয়াছিলাম; নিদেন তাহার জন্য কৃতজ্ঞতার অনুরোধে এই বারটা আমার কথা শুন। আমার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে জান ত?" নিমচাঁদ কৃষকের গলা শুনিয়া রাগসম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে বলিয়া উঠিল—"ওরে বিশ্বাসঘাতক, আবার আমার কাছে এসেছিস। বড়মানুষ হইয়া তোর বুঝি ভারি অভিমান হয়েছে! দেখ্ তোর ক্ষমতা অধিক কি আমার ক্ষমতা অধিক! তুই ফাঁসি যাইবি, আর আমি আনন্দের সহিত তাহা দেখিতে থাকিব!" কৃষক অধো-বদন হইয়া ফিরিয়া আসিল। অথচ তাহার মনে রাগ হইল। সে মনে করিতে লাগিল, আমি মানুষ আর ও ভূত। মানুষের বুদ্ধি অধিক না ভূতের? ভূতের অধিক ইহা ত আমি প্রাণ গেলেও স্বীকার করিব না। আচ্ছা দেখা যাউক ভূতের কত বুদ্ধি।" এই মনে করিয়া সে মহারাজার কাছে গিয়া বলিল—"অন্নদাতা, আমি যাহা মনে করিয়া-ছিলাম তাহাই ঠিক। কতকগুলা ভূত এত লক্ষ্মীছাড়া যে তাহাদের কিছু বলিলেও তাহারা কথা শুনে না। এ ভূতটাও সেই শ্রেণীর। যাহাহউক আমি যাহা বলিতেছি

সেইমত কার্য্য করিতে হইবে। মহারাজ, ময়দানের মধ্যে একটা বৃহৎ মাচা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা স্বর্ণাচ্ছাদনে ভূষিত করিতে হইবে এবং সহরের যত সম্ভ্রান্ত লোক আছে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। কাল প্রাতে মহারাজ মন্ত্রীবর্গ বেষ্টিত হইয়া সভাস্থলে উপবেশন করিবেন। পূজা সাঙ্গ হইলে রাজকন্যা তথায় আনীত হইবেন। আর একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে রাজ্যে যত ঢাক, ঢোল, নাগরা, খোল, কাঁসর, ঘণ্টা আছে যাহাতে প্রকাণ্ড নারকিক শব্দ হয়, সেই সকল যন্ত্র একত্রিত করিয়া সেইখানে উপস্থিত করাইবেন। আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র তাহা বাজিয়া উঠিবে"। সম্রাট তদনুরূপ আজ্ঞা করিলেন। পরদিন প্রাতে সহরের মধ্যে ঘোর কলরব। মহা জনতা এবং সমারোহ দেখিয়া নিমচাঁদ মনে করিল যে কৃষক মনে করিয়াছে এবার আমাকে আর থাকিতে দিবে না। ঢোল ঢাকের শব্দে আমাকে তাড়াইবে। যেন নরকে এর অপেক্ষা ভয়ানক শব্দ আমরা শুনি না। যাহাহউক কৃষকের কপালে অনেক ভোগ আছে।" কৃষক নিমচাঁদের কাছে আসিয়া বলিল,—"নিমচাঁদ, এস না, বাহির হইয়া এস।" নিমচাঁদ বলিল—"ওরে হতভাগা, তুই মনে করেচিস আমি কিনা অসাধারণ কার্য্য করিয়াছি। তোর ফাঁসি না দেখিয়া আমি এখান হইতে যাব না।" কৃষক অনেক মিষ্টবাক্য অনেক সাধ্য সাধনা, অনেক মিনতি করিতে লাগিল। কিন্তু নিমচাঁদের আক্রোশ ততই বাড়ে। যখন কৃষক দেখিল আর কোন উপায় নাই, সে ইঙ্গিত করিল আর তখনি যত ঢাক ঢোল ছিল সকলই এককালে বাজিয়া উঠিল। বাদ্যকারেরা ক্রমশঃ নিমচাঁদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। নিমচাঁদ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কৃষককে জিজ্ঞাসা করিল ইহার অর্থ কি? কৃষক উত্তর দিল—"নিমচাঁদ, হায়! কি বলিব তোমার স্ত্রী আসিতেছে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে আসিতেছে।" স্ত্রীর নাম শুনিয়া নিমচাঁদের মুখ হঠাৎ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। সে কি করিবে ঠিক করিতে পারিল না। কৃষকের কথা সত্য কিনা ইহা চিন্তা করিবার সময় না পাইয়া সে আর কিছু না বলিয়া এক লম্ফ দিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রাজকন্যা বাঁচিয়া গেলেন, কৃষক প্রচুর পুরস্কার পাইল, আর নিমচাঁদ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া যমপুরে আসিয়া যমরাজের সম্মুখে সমুদয় বিবরণ বিস্তৃত রূপে বলিয়া স্বাধীন ভাবে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। যমরাজও জানিলেন যে আজকাল পৃথিবীর স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বানর্থের মূল।

শ্রীনারীপদ দাস।

স্বরলিপি।*

গতবারে বলা গিয়াছে পুনরাবৃত্তির চিহ্ন [ ] ব্রাকেট। কিন্তু পুনরাবৃত্তি করিলেও সাধারণতঃ সমস্তটা না গাহিয়া দ্বিতীয়বারে কতকদূর পর্য্যন্ত গাহিয়া বাকী সুরগুলিকে ডিঙ্গাইয়া অন্য কলিতে যাওয়া হয়। যে সুরগুলিকে ডিঙ্গাইতে হইবে তাহাদের এইরূপ { } গুম্ফবন্ধনীর ভিতর আটক করা যাইবে। যথা :—

[রগ' সর' সম' গ' । রগ' ম' পপ' পধপ'। {মগ' ম'
কত কা লপ রে বল ভা রত রে দুখ সা-

পপ' পধ' । র্সনো' ধ' পম' গমগ'। }] মগ' ম' মধ'
গর সাঁ তারে পা রহ বে। অব সা দহি

ধ-নোধ' । পধ' ধনোর্স' নোধ' প' ।
মে — ডুবি য়ে ডুবি য়ে

এখানে "কতকাল পরে" এই পদের আরম্ভে ব্রাকেটের আরম্ভ এবং "পার হবে" ইহার শেষে ব্রাকেটের শেষ দেখিয়া বুঝিতে পার ঐ সমস্ত কলিটি দুইবার গাহিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আবৃত্তির কালে দেখিবে "দুখ সাগর সাঁতারে পার হবে" এই অংশটুকু গুম্ফবন্ধনীতে আটক রহিয়াছে, সুতরাং দ্বিতীয়বার ঐ অংশটুকু আর না গাহিয়া "ভারতরে" ইহার পরেই একেবারে "অবসাদ হিমে" এই কলিটি ধরিবে।

১। যদি প্রথম তালে গান আরম্ভ না হইয়া ফাঁক কিম্বা অন্য কোন তালে আরম্ভ হয় তাহা হইলে আ-প্র (আরম্ভে প্রত্যাবর্ত্তন) এই সঙ্কেতের একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

০ আ + ৩ ০
রগ' । সর' সম' গ' রগ। ম' পপ' পধপ' মগ'।
কত কা লপ রে বল ভা রত রে দুখ

* ভুল সংশোধন;—গতবারে সংস্কৃত গানের যে স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছিল তাহাতে
সন' ধপ' সন' ধপ' ইহার পরিবর্ত্তে র্সন' ধপ' র্সন' ধপ' হইবে।
বিষ টতি শিরে পরি বিষ টতি শিরে পরি

ম॰	পপ॰	পধ॰	সনো॰ ।	ধ॰	পম॰	গ॰	রগ॰ ॥
সা	গর	সাঁ	তারে	পা	রহ	বে	কত (আ-প্র)

এখানে (আ-প্র) চিহ্ন দেখিয়া আরম্ভে অর্থাৎ "কত" এই পদে ফিরিয়া যাইবার কথা, কিন্তু উহা ফাঁকে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া তাল পূরণ করিবার নিমিত্ত "পার হবে" র সঙ্গেই উহা গীত হইয়াছে সেই জন্য আ-প্র লেখা থাকিলেও এখন "কত" তে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া "কাল পরে" এই থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। এইরূপ গোলমালের স্থলে ঠিক যেখান হইতে পুনরায় আরম্ভ করিতে হইবে তাহার মাথায় (আ) লেখা থাকিবে, যেমন উপরের গানটীতে "কালপরে" এই পদের "কা" এই অক্ষরের উপর (আ) লেখা রহিয়াছে।

৩। নিম্নে যে মান্দ্রাজী গানটীর স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখিবে অনেকস্থলে ছুটী সুরের মধ্যে ⌣ এইরূপ একটী বন্ধন চিহ্ন রহিয়াছে। প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখিবে যে সুরদ্বয় ঐরূপ বন্ধনযুক্ত তাহারা বিভিন্ন সুর নহে একই সুর। ঐ বন্ধন চিহ্নের অর্থ এই যে উহার প্রথম সুরটী বাজাইয়া দ্বিতীয় সুরের সময় পর্য্যন্ত তাহাকে টানিয়া রাখিতে হইবে, দ্বিতীয় সুর আর স্বতন্ত্র ভাবে বাজান হইবে না।

গগ॰ ।	গম॰	পধ॰	প॰ ⌣ পম॰ ।	প॰
বন।	মা	—	লী -সু	রা

এখানে গলায় গাহিবার সময় বন্ধনচিহ্ন না থাকিলেও দ্বিতীয় পা স্বতন্ত্র ভাবে উচ্চারিত হইত না, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে তাহার আবৃত্তি হইত, সেইটী নিবারণ করিবার জন্য এই চিহ্ন। ইহাতে এই দাঁড়াইল যে "লী" এই কথাটী শুধু একমাত্রা কাল স্থায়ী না হইয়া দেড়মাত্রা কাল স্থায়ী হইল, কেননা প্রথম 'প'য়ের মাত্রা সংখ্যা এক, এবং দ্বিতীয় 'প'য়ের মাত্রা সংখ্যা আধ।

৪। পূর্ব্বে বলিয়াছি কোন মাত্রা চিহ্নিত সুরের পূর্ব্ববর্ত্তী সুরে কিম্বা সুরগুলিতে যদি মাত্রা চিহ্ন না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মাত্রা চিহ্নিত স্বরের কাল মধ্যেই ঐ সুর গুলি উচ্চারিত হইবে। যথা, সর॰ এখানে একমাত্রা কালের মধ্যেই ঐ দুইটী স্বর উচ্চারিত হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক স্বর অর্দ্ধমাত্রা কাল স্থায়ী হইল।

সরগ॰—এখানে একমাত্রা কালের মধ্যে তিনটী স্বর উচ্চারিত হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক স্বর এক তৃতীয়াংশ কাল স্থায়ী ; এখানে সময়ের বিভাগ প্রত্যেক স্বরের পক্ষে সমান।

কিন্তু ঐ তিনটী স্বরের মাঝে কোথাও কসি চিহ্ন দিয়া দুই স্বরের মধ্যে ব্যবধান ঘটাইয়া যদি এইরূপ একটী স্বরলিপি থাকে স—রগ১ তাহা হইলে তিনটী স্বর আর সমভাগে বিভক্ত হইল না, 'স' আর 'রগ' এই দুইটী ভাগ হইল। ইহার প্রথম ভাগ 'স' শেষ ভাগ 'রগ' র সমান অর্থাৎ 'স' এই একটী সুর একলা অর্দ্ধমাত্রিক এবং 'রগ' এই দুইটী সুর একত্রে অর্দ্ধমাত্রিক—তাহা হইলে স—রগ১ এবং সরগ১ এই দুইরূপ স্বরলিপির প্রভেদ বুঝিতে পারিতেছ বোধ হয়।

৫। শুধু কসির উপর মাত্রা চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে কোন সুর গীত হইবে না, ঐ সময়টুকু ধরিয়া শুধু বিশ্রাম। যথা

গ১　স১　—১　—১　|

এখানে গ১ স১, ইহা গাহিয়া, গান ছাড়িয়া দিয়া দুইমাত্রা কাল বিশ্রাম করিবে।

৬। এবারে যে গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্থানে স্থানে ভূষিকা আছে। ভূষিকার সংজ্ঞা গতবারে দেওয়া হইয়াছিল, পাঠকের সুবিধার জন্য আর একবার তাহা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—প্রধান সুরের সহিত আনুষঙ্গিক ক্রমে যখন একটী কিম্বা ততোধিক, অত্যল্প কালস্থায়ী সুরকে স্পর্শ মাত্র করা হয়, তখন সেই সুর কিম্বা সুরগুলিকে প্রধান সুরের গায়ে ছোট অক্ষরে লেখা হয়। এই সুরগুলিকে ভূষিকা বলে, ভূষিকাতে কোন মাত্রা থাকে না, কারণ তাহা এত অল্প কালস্থায়ী যে তাহার মাত্রার পরিমাণ হয় না।

৭। ক্রমাগত তালের চিহ্নাবৃত্তি অনাবশ্যক। শুধু দুইঘর পর্য্যন্ত তালবিশেষের সম, ফাঁক, প্রথম তাল, তৃতীয় তাল প্রভৃতির চিহ্ন দেওয়া যাইবে, সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইবে বোধ হয়।

নিম্নে একটী মান্দ্রাজী গান এবং তাহা হইতে পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক যে ব্রহ্মসঙ্গীতটী ভাঙ্গা হইয়াছিল তাহাদের একত্রে স্বরলিপি দেওয়া গেল। কিন্তু মান্দ্রাজী গানে একটী কলি বেশী আছে। ব্রহ্মসঙ্গীতটী শিখিবার সময় সে কলিটী বাদ দিয়া যাইবে। আর একটী কথা ; মান্দ্রাজী গানের চতুর্থ কলিতে একস্থলে "ইরাম ইরাম" ইত্যাদি দুই ঘর ধরিয়া তান চলিয়াছে। সেখানে ব্রহ্মসঙ্গীতে তান নাই, কিন্তু এক ঘরের সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ চারিমাত্রা কাল পর্য্যন্ত সেখানে বিশ্রাম দিয়া, পুনরাবৃত্তি করিবে।

বেগড়া—কাওয়ালী।

বনমালী মুরালী কপালী মুতাসুরবিফলী বনমালী। ১।

জনকতনয়ামুখ সরসিজশোভনবিভথা রাজাগদেকসুচরিতা। ২।

ধ প ম গ, গ ম প প, ম প ধ, প ধ নি নি ধপ বনমালী। ৩।

ভীমস্থর, গমনগোত্রকরদীভ্রুত, কারণ শরণাগতবৎসল সারসাঙ্ক

সুগুণরক্ষ মাধব বনমালী। ৪।

জলনিধিযুমদন সকলস্থরসমূহ অস্থরয়োধ বিফলদাজ পদযুগ। ৫।

বনরুহ ভবমুথ, বরমৃহ সুথ[illegible] [illegible]হারী বিনুতকৃপা। ৬।

বারিরাজশয়নাগমবন্দিত, বাসুদেব অনুপমঘন সুগুণা [illegible]

রাঘব, পেরুরিনিবাস কেশব। ৭।

মাদ্রাজী ভজন।

প্রণমামি অনাদি, অনন্ত, সনাতন, পুরুষ :

নিখিল জগত-পতি, পরম-গতি, মহান্,

ভকত-জীবন-ধন ;

ভূমা, প্রভু, পরম-ব্রহ্ম, পরমায়ণ, কারণ,

শরণাগত-বৎসল, পূর্ণ সত্য, সকল দুখ-বারণ।

ভব-জলধি-তরণ, শরণ, অতি পবিত্র, শুভ-নিধান,

অজর, অভয়, অবিনাশী।

সুর-নর-বন্দন, জগ-চিত-রঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন, বিতর কৃপা।

দীন-নাথ, করুণাময়, সুন্দর, প্রেম-সিন্ধু, মধুময়,

নাহি উপমা, নাম-রূপ-গুণ-অতীত, চিন্ময়,

অন্তরে তোমার আসন।

মাদ্রাজী বেগড়া—কাওয়ালী।

আ

০ ১ + ৩ ০

গগ' । গম'. পধ' প' পম' । প' মপ' ধ' পধ' ।

বন মা — লী —সু রা লীক পা লীসু

প্রণ মা — মি —অ না দিঅ নন্ তস

নন' ধপ' মপ' গ' । গ' গগ' গম' গমপধ' ।

তা সুর বিক্ষ লী — বন মা ———

না তন পুরু ষ — প্রণ • মা ———

ধ১　পমগ১　র১ রপ১ । গপমগ১ গর১　স১　গগ১ ।
—　—　—　.　লী　—　—　বন
—　—　—　মি　—　—　প্রণ

গমগমপ১　ধপ১　প২　। ।　স´স´১　র´স´১　গ´গ´১　র´স´১
মা　—　লী　।১।　জন　কত　নয়　মুখ
মা　—　মি　।১।　নিখি　লজ　গত　পতি
(শেষ)

স´স´১　ধপ১　স´১　নস´র´১ ।　স´২　স´২ ॥স গ।。　নর্স´১　র´স´১
সর　সিজ　শো　—　ই　ই　জন　কত　নয়　মুখ
পর　মগ　তি　—　—　—　নিখি　লজ　গত　পতি

স´স´১　ধপ১　স´১　স´স´১ ।　স´স´১　ধধ১　পপ১　ধপ১ । পধ১
সর　সিজ　শো　ভন　বিভ　—খা　রাজা　গাদে　—ক
পর　মগ　তি　—　মহা　—ন　ভক　তজী　—ব

পপ১　মগ১　গগ১　। ।　ধ২　প২ ।　মগ১　মর১　গ-গম১　প২ ।
সুচ　রিত　বন　।২।　ধা　পা　মা　গা　গা　মা
নধ　ন　প্রণ　।২।
(আ-প্র)

প১　মপ১　ধ১　পধ১ ।　নন১　ধপ১　প১　মগ১　। ।
পা　মাপা　ধা　পাধা　নিনি　ধাপা　—　বন　।৩।
(আ-প্র)

ধ১ ধপ১　প১ পম১ ।　মগ১　মর১　র১　গ১ ।　ম১　প১পম১
ভী　ম　সু　র　গ　ম　ন　গো
ভূ　মা　প্র　ভু　প　র　ম　ব্র

মগ॰ । গ॰ ম॰ র॰ সন্॰ । স॰ প পম॰ । প॰ মপ॰
ত্র ক র দী ক্র ত কা র ণ শর
ন্ধ প র মা য় ণ কা র ণ শর

ধা॰ পধ॰ । র্স॰ র্সর্স॰ র্স॰ র্রর্গ॰ । র্গর্গ॰ র্গর্ম॰ র্রর্র॰ র্সর্স॰ ।
ণা গত বৎ সল সা রসা কৃষ সুগু ণর কৃষ
ণা গত বৎ সল পূ র্ণস —ত্য সক লদুঃ —

র্সধ॰ ধধ॰ — । । ধধ॰ পধ॰ ধপ॰ মগ॰ ।
ণা —ধ ব বন ।৪। জল নিধি যুম দন
বা —র ণ প্রণ ।৩। ভব জল ধিত রণ

(আ-প্র)

ধধ॰ পধ॰ ধপ॰ মগ॰ । গগ॰ গগ॰ গম॰ রর॰ ।
সক লসু রস মূ হত্ত সুর যো ধবি
শর ণঅ তিপ বি ত্রগু ভনি ধানৃ অজ

সস॰ সস॰ সস॰ সস॰ । { স॰ স॰ স॰ স॰ । স॰ স॰
ফল দাজ পদ যুগ { ই রা ম ই রা ম
রঞ্জ ভয়া বিনা —শী { — — — —}]

—॰ —॰ । } গগ॰ মপ॰ মগ॰ মর॰ । গগ॰ মপ॰
।৫। } বন রুহ ভব মুখ বর মৃদু
।৪। } সুর নর বন্ দন জগ চিত

মগ॰ মর॰ । গগ॰ মপ॰ মগ॰ মর॰ । গগ॰ সন্॰ স॰ ।
সুখ নখ বস নস দয়া হারী বিমু তরু পা ।৬।
র ঞ্জন ভব ভয় ভ ঞ্জন বিত রক্ত পা ।৫।

স'　রগ' গ—মগ'　রগ'　।　পমী'　পধ'　প'　পপ'　।
বা　রি রা　—　জ　শয়　　না　গম　বন্　দিত
দী　ন না　—　থ　, করু　　না　ময়　সুন্　দর

পস' রগ' গ—মগ'　রগ'　।　পমী'　পধ'　প'　পপ'　।
বা　রিরা　—　জ　শয়　　না　গম　বন্　দিত
দী　ন না　—　থ　করু　　না　ময়　সুন্　দর

পমী'　পধ'　পপ'　পপ'　।　ধপ'　র্স র্স'　র্স র্স'　র্স'　।
বা　সু দে　—ব　অনু　　পম　ঘন　সুগু　ন
প্রে　ম সি　—ন্ধু　মধু　　ময়　নাহি　উপ　মা

{ র্স-র্র র্স'　ন-র্স ন'　ধ-নোধ'　প'　। }　র্স'　র্র গ' গ র্গ'
{ নী　—　—　—　— }　নী　ল মে　—　ঘ
{ া　—　—　—　— }　না　ম রু　—　প

র্গ র্গ'　।　র্গ র্গ'　র্ম র্র'　র্র র্স'　র্স র্স'　।　র্স'　র্স র্স'　নর্র'　নন'　।
সম　শরী　—র　রা　ঘব　—　—পে　—　—রু
গুণ　অতী　—ত　চিন্　ময়　—　—অ　—　নন্ত

ধধ'　পপ'　প'　পপ'　।　মী প'　গ'　গগ'　॥
—রি　— নি　বা　স কে　—　শ　ব　বন্　।৭।
—রে　— তো　মা　র আ　--　স　ন　প্রণ　।৬।

(আ—প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

ঈথর।

গণিত জ্যোতিষের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত স্থানের বিশাল বিস্তৃতির ভাব যতই মানব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, ততই জ্ঞানীগণ ভাবিতে লাগিলেন এই যে মহাশূন্য এই যে অনন্ত স্থান ইহাতে কি আছে। প্রকৃতি কখনই শূন্য হইতে পারে না। স্বভাবের স্বভাব ইহা নহে যে কোন-কিছু দ্বারা পূর্ণ না হইয়া থাকে। কিন্তু সে কোন-কিছু কি? কেহ কেহ বলেন সে কোন-কিছু যাহাই হউক, তাহা নিশ্চয়ই জড়ধর্ম্মী, তাহা পদার্থ। নতুবা, জড়রাজ্য, সমগ্র সৌরজগৎ, ঈদৃশ বিস্তারিত ভাবে কখনই তিষ্ঠিতে পারিত না। যেমন একটা রবারের গোলা, বায়ু সহকারে স্ফীত না হইলে কুঞ্চিত হইয়া থাকে, বিশ্ব জগতও তেমনি কোন-কিছু পদার্থ দ্বারা যদি স্ফীত না হইত কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আবার ইহাও দেখিতে হয় যে, বস্তু নিচয়ের সহজ ভাবে ও অবাধে নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইবার জন্য শূন্যতাও আবশ্যক। যদি সমুদয় স্থান জড় পদার্থ দ্বারা পূর্ণই হয়, তাহাহইলে আর কাহারও নড়িবার একটু স্থান হয় না। সকলে গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিবে। স্বাধীন গতি বা স্বাধীন আকর্ষণ কোথাও কাহারও থাকিবে না।

অথচ, আমরা দেখিতেছি মহাশূন্যে অগণিত গ্রহ তারকা, সূর্য্য চন্দ্র প্রবল বেগে স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর উপর জীব জন্তু ও অন্যান্য গতিশীল পদার্থ-অনায়াসে ও স্বেচ্ছামত স্থানান্তরিত হইতেছে। সুতরাং, এই অনন্ত শূন্য পূর্ণ করিয়া যে এক অতীন্দ্রিয় পদার্থ, ব্রহ্মাণ্ডরূপী এই প্রকাণ্ডায়তন গোলাকে স্ফীত রাখিয়াছে এবং জড়, উদ্ভিদ ও জীব কাহারও গতির অন্তরায় সংঘটন করিতেছে না, সে সূক্ষ্ম দৃষ্টির অগোচর, অনুভূতির অতীত পদার্থ কি, সে কোন-কিছু কি? সে কোন কিছু যে বায়ু—অতি সূক্ষ্ম বায়ুও হইতে পারে না, তাহা কতকগুলি ভৌতিক তথ্য হইতে সহজেই স্থির করা যাইতে পারে—যেমন আলোকের গতি। আলোক এত দ্রুতবেগে ধাবিত হয় যে সাধারণ ও পরিচিত কোন জড় পদার্থ দ্বারা তাহা কোনমতেই পরিচালিত হইতে পারে না। সকলেই জানেন আলোকের তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৯০,০০০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। আর বায়ুর মধ্য দিয়া যে শব্দ তরঙ্গ চালিত হয় তাহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট মাত্র।

তদ্ব্যতীত একটি আলোক রেখা কোন স্ফটিকের (Crystal) মধ্যদিয়া তির্য্যক ভাবে নিঃসৃত করিলে যে নূতন প্রকার তরঙ্গ কম্পন (Polarisation) প্রকাশ করে, তাহা দ্বারাও বোঝা যায় বায়ু কখনই সমস্ত স্থানকে পূর্ণ করিয়া থাকিয়া সকল প্রকার গতি ও তেজের মধ্যবর্ত্তিতা সম্পাদন করিতে পারে না। এ ছাড়া, যখন আমরা মাধ্যাকর্ষণ কি

যোগাকর্ষণের কার্য্য; কিম্বা কোন একটি জড়কণা অপর একটিজড়কণাকে কিরূপে দূরে থাকিয়া আকর্ষণ করে; অথবা একটি পরমাণু কি, কিরূপেই বা পরমাণুরা পরস্পরকে আঘাত করিয়া লাফাইয়া উঠে; কোন প্রকার চাপের বলে চেপ্টা না হইয়া স্থিতিস্থাপক গোলকের ন্যায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়; যদি পরমাণুরা কঠিন পদার্থ না হইয়া ঘাত-প্রতিঘাতকের সময় স্থিতিস্থাপকধর্ম্মী পদার্থ সদৃশই হয় তাহা হইলে উহারা কিসের দ্বারায় গঠিত, ইত্যাদি কোন একটি বিশেষ আধিভৌতিক দৃশ্য হইতে বিশ্বজগতের মূল শক্তি ও শক্তির কার্য্য, অথবা একটি ক্ষুদ্র পরমাণুর ধর্ম্ম চিন্তা করিতে যাই, তখনই উপলব্ধি করি যে, অনন্তস্থান যেমন শূন্য হওয়া আবশ্যক তেমনি অতি সূক্ষ্ম অবিচ্ছিন্ন, জড়ধর্ম্মী বস্তুদ্বারা পূর্ণ হওয়াও আবশ্যক; কিন্তু তাহা কখনই বায়ু নহে।

আমরা ইতি পূর্ব্বে আলোক তরঙ্গের দ্রুতগতির কথা উল্লেখ করিয়াছি। বায়ু-মধ্যবর্ত্তিতার দ্বারা কখনই তদ্রূপ বেগশীল তরঙ্গ পরিচালিত হইবার নয়, প্রত্যেক প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানার্থী ইহা জানেন। আবার, আলোকতরঙ্গের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে ইহার কম্পন অসংলগ্ন মৌলিকাণু দ্বারা পরিচালিত হইবার নয়। তাহা করিতে গেলে সে মৌলিকাণুগুলির পরস্পর-সমবেত হইয়া কঠিন পদার্থের ন্যায় হওয়া আবশ্যক। কঠিন পদার্থ বায়বীয় পদার্থ অপেক্ষা নিরেট, তাহার একটী গুণ আছে যেটী বায়বীয় পদার্থে নাই—সেটী অপেষণীয়তা (Rigidity)। অর্থাৎ কোনরূপ চাপ বা বল প্রয়োগ করিলেও কঠিন পদার্থের আকারে কোন পরিবর্ত্তন হয় না, বায়বীয় পদার্থের তাহা হইয়া থাকে। আবার, যদি কোন বস্তু কোনরূপ কম্পনের দ্বারা পরিচালিত হইবার উপযোগী হয়, তাহার নিশ্চেষ্টতা (inertia) থাকা চাই। "নিশ্চেষ্টতা" বস্তুমাত্রের সেই ধর্ম্মকে বলা হয় যাহার প্রভাবে একটি নিশ্চল বস্তু আপনাকে স্থির রাখে, এবং যখন সেই নিশ্চলতার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া উহাকে গতিশীল করা যায় তখন সরল রেখায় বেগের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবিত হইতে পারে। তাবৎ পদার্থেরই এই ধর্ম্ম অছে, কিন্তু বায়বীয় পদার্থের আর একটি বিশেষ গুণ আছে যাহাকে স্থিতিস্থাপকতা (Volume elasticity) বলে। নিরেট (Rigid) পদার্থের এ ধর্ম্ম নাই। এই জন্য কঠিন পদার্থ কেবল আড়াআড়ি বিকম্পন (transverse vibration) পরিচালনা করিতে পারে; লম্বালম্বি বিকম্পন (longitudinal vibrations) কঠিন পদার্থ দ্বারা পরিচালিত হয় না। কিন্তু বায়বীয় পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা থাকার জন্য যে তরঙ্গ লম্বভাবে ধাবিত হয়, সেই তরঙ্গ পরিচালনে ইহা সবিশেষ উপযোগী। আলোকের তরঙ্গ আড়াআড়ি ভাবে প্রধাবিত হয়। জল ও বায়ুর কঠিনতা নাই, অথচ ইহারা স্বচ্ছ, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যদিয়া আলোকের সেই প্রান্তিক তরঙ্গ অবাধে গমন করিতে পারে। সুতরাং ইহাই খুব সম্ভব যে, উহাদের মধ্যে যে ঈথর আছে সেই ঈথরই আলোকের তরঙ্গ-কম্পন বহন করিয়া লইয়া যায়।

অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি যে ঈথরেরও নিশ্চেষ্টতা (inertia) এবং নিরেটত্ব বা অপেষণীয়তা (rigidity) আছে।

বায়ু হইতে ঈথর নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র পদার্থ। সৌর জগতের তাবৎ স্থানে বায়ু আছে বটে কিন্তু তাহা ঈথরের তুলনায় অনন্তগুণে ভারী। এইজন্য ঈথরকে imponderable matter অর্থাৎ ভারশূন্য পদার্থ বলে। ইহা এত সূক্ষ্ম যে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ইহার প্রতি খাটে না। তা বলিয়া ইহা প্রকৃততঃ একবারেই ভারশূন্য নয়। কেহ কেহ অনুমান করেন ইহা নিতান্ত সূক্ষ্ম হইলেও কোন কোন ধূমকেতুর অসীম বেগের ইহা কতক পরিমাণে অন্তরায় সংঘটন করে।

যতদূর জানা গিয়াছে ঈথর সম্পূর্ণরূপে এক অবিচ্ছিন্ন, অপেষণীয়, অসঙ্কোচনীয় এবং সর্ব্বত্র সমঘন ও একধর্ম্মী পদার্থ। ইহাকে পরমাণুতে পরিণত করা যায় না। আমাদের পরিজ্ঞাত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে না; অপর সমুদয় পদার্থ মৌলিকাণুদ্বারা গঠিত, সুতরাং পরমাণুতে বিভাজ্য। এই নিমিত্ত সাধারণ পদার্থ হইতে ঈথর স্বতন্ত্র জিনিস। ইহাকে তরল বা বায়বীয় (liquid or fluid) পদার্থ বলা হয়; কেহ বা ইহার সঙ্কোচন বা পেষণীয়তা গুণের অভাবের জন্য অর্থাৎ কঠিন পদার্থের ন্যায় ইহার অনমনীয়তা ও শক্তত্তা (rigidity) আছে বলিয়া ইহাকে কঠিন পদার্থ নামে অভিহিত করেন। কিন্তু প্রত্যুত, ইহা উপর্যুক্ত কোন প্রকার শব্দের মধ্যে বাচ্য হইবার নহে। ঈথর বলিলে আমার শুধু এই বুঝি যে ইহা সেই এক সম্পূর্ণরূপে নিরবচ্ছিন্ন, প্রতিঘাতশূন্য পদার্থ, যাহা আমাদের বোধেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়া বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অথচ ইহা জড়ধর্ম্মী, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় ইহাও নিশ্চেষ্টতা গুণসম্পন্ন। ইহা সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছেদ রহিত ও কোন প্রকার পেষণ বা ভার দ্বারা সঙ্কুচিত বা পিষ্ট হইবার নয়। ইহা তাবৎ পদার্থেরি প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া একটিকে অপরটির সহিত যোগ করিয়া রাখিয়াছে। সমুদায় জড় সংসার এই ঈথরের অকূল সমুদ্রগর্ভে নিহিত। ঈথর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রে মধ্যগত পদার্থ স্বরূপ রহিয়াছে বলিয়াই ইহার দ্বারা দৃশ্যবস্তু নিচয়ের কার্য্য সাধিত হইতেছে। ঈথরই একমাত্র সার্ব্বভৌমিক মধ্যগত পদার্থ। ইহারি সাহায্যে পদার্থ নিচয়ের পরস্পরের প্রতি যোগ ও বিয়োগ কার্য্য সম্পাদিত হয়।

ঈথর দুই প্রকার; মুক্ত ও বদ্ধ। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যদি এক খণ্ড বেলোওয়ারি কাচের (prism) ভিতর দিয়া আলোককে প্রতিকম্পিত করা যায়, তাহা হইলে প্রিজমের অপর পার্শ্ব দিয়া আলোক বহির্গত হইবার সময় কতকটা বক্রভাবে নিঃসৃত হইবে। কাচখণ্ডের উপর প্রথমে যেরূপ সরল রেখার মত আলোক নিপতিত হইয়াছিল, ইহার অভ্যন্তর দিয়া অপর পার্শ্বে বহির্গত হইবার সময় ইহা ঠিক সেইরূপ সরল রেখা পথে নির্গত হয় না; তির্য্যক্ ভাবে বহির্গত হয়। বেলোয়ারি কাচখণ্ডের বাহিরে ঈথর, উহার অভ্যন্তরেও ঈথর, তথাপি কাচখণ্ডের অভ্যন্তরস্থ ঈথরের মধ্য দিয়া আলোক তরঙ্গ আসি-

বার সময় অন্য প্রকার আচরণ করে। বাহিরের ঈথর মুক্ত ঈথর; ঈদৃশ কাচখণ্ডের অভ্যন্তরস্থ ঈথর বদ্ধ ঈথর। মুক্ত ঈথরের মধ্য দিয়া সকল প্রকারের তরঙ্গ কম্পন সমান বেগে প্রবাহিত হয় কিন্তু বদ্ধ ঈথরের মধ্য দিয়া তাহা হয় না। এইজন্য যখন একটি সূর্য্যকিরণরেখাকে একখণ্ড প্রিজমের মধ্যদিয়া প্রতিফলিত করা যায়, তখন নির্গত রশ্মি নানা বর্ণের হইয়া বাহির হয়। সূর্য্য রশ্মি শুভ্রবর্ণ, কিন্তু উহাতে ইন্দ্রধনুর মত সাত প্রকারের রং আছে। সপ্তবিধ বর্ণ একত্র মিশ্রিত হইয়াই শুভ্র হইয়াছে। এখন, আলোক বিজ্ঞানের এক নিয়ম এই যে আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্য উহার কম্পনের সময়ের ব্যাপকতার উপর নির্ভর করে। যদি অধিকক্ষণ ধরিয়া কোন তরঙ্গ কম্পিত হয়, সে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইবে, অল্পক্ষণ কম্পিত হইলে তরঙ্গ ছোট হইবে। আর, এই তরঙ্গ মালার দৈর্ঘ্যের তারতম্যানুসারেই বর্ণভেদ হয়। কোন পদার্থের অভ্যন্তর দিয়া কোন তরঙ্গ চলিয়া যাইবার সময় ছোট ছোট তরঙ্গ গুলি বৃহৎ তরঙ্গ গুলি অপেক্ষা অধিকতর বাধা পায়। সেইজন্য প্রিজমের অভ্যন্তর দিয়া আলোক তরঙ্গ গমন করিবার সময়, উহার ছোট ছোট তরঙ্গ গুলি বাধা পায় অর্থাৎ বৃহৎ তরঙ্গ গুলির পশ্চাতে পড়ে। ইহাই বৈজ্ঞানিক ভাষায় আলোক-বিশ্লেষণ। যতক্ষণ মুক্ত ঈথরের মধ্যদিয়া আলোক তরঙ্গ আসিতে থাকে ততক্ষণ অবাধে আসে, সুতরাং বিশ্লেষণ ঘটেনা। বদ্ধ ঈথরের মধ্যে বাধা পাইয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এইজন্যই বেলওয়ারি কাচের ভিতর দিয়া আলোক রেখা নিঃসৃত হইলে আলোকের আদিম বর্ণ গুলি পর্য্যায়ক্রমে আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়।

Sir William Thomson. এর আবর্ত্তন মতবাদ (Vortex theory) (যদিও তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নহে—এখনও প্রমাণসাপেক্ষ রহিয়াছে) অনুসারে ঈথরই এই প্রকাণ্ডায়তন অসীম নাক্ষত্রিক রাজ্য ও সৌরজগৎসমন্বিত সুবিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের হেতু। Sir William এর মতবাদানুসারে আদিতম পরমাণু বা নীহারিকা পুঞ্জ আর ঈথর স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। তিনি বলেন যে, ঈথরের সর্ব্বব্যাপী প্রকাণ্ড আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতেই ইহারি কতকাংশ কঠিন ও সম্বদ্ধ হইয়া গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব জগৎরূপে সুচিত হইয়াছে। পরমাণুরা অবিনাশী কিন্তু কাহারই আপনাপনি গঠিত হইবার ক্ষমতা নাই। ইহারা নিরেট অণুকণা নহে, কিন্তু প্রত্যকের ভিতরে আবর্ত্তিত-ঈথর, প্রত্যেকেই স্থিতিস্থাপকধর্ম্মী, প্রত্যেকেরই অপরের সহিত সংহত ও সংমিশ্রিত হইবার শক্তি আছে।

আবর্ত্তিত-ঈথর-সঞ্জাত এই অণুকণা সকলে বিশ্বের সীমান্ত ব্যাপিয়া পরিব্যাপ্ত। কতকগুলি বা স্থির, অথবা অনাবর্ত্তিত গতিশীল, নিয়ত তরঙ্গ বিস্তার করিতেছে। এই তরঙ্গ পুঞ্জই জ্যোতি বা আলোক রূপে আমাদের নিকট পরিচিত। কতকগুলি আবর্ত্তিত গতিমান হইয়া ক্রমাগতই সমগ্র ঈথর সমুদ্র হইতে বিশ্লিষ্ট হইতেছে। এই ঘূর্ণিত অংশই আমাদের জড় পদার্থ। ঘূর্ণিত হইতে হইতে এই অংশ দৃঢ়

ও শক্ত হয় এবং পরে ইহা হইতে অগণ্য জড় পিণ্ড ও তাবৎ জড় পদার্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে।

ঈথর সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রচলিত মতবাদ এই :—

"One Continuous substance filling all space; which can vibrate as light, which can be sheared into positive and negative electricity; which in whirls constitutes matter; and which transmits by comtinuity, not by impact, every action and reaction of which matter is capable," অর্থাৎ :—

ইহা এক অবিচ্ছিন্ন পদার্থ যাহা সমস্ত স্থানকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে; ইহার বিকম্পনেই আলোকের উৎপত্তি; ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিপরীত ধর্ম্মী দুই তাড়িত প্রবাহ (Pos-Neg) উৎপন্ন করা যায়; ইহা আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জড় পদার্থ রূপে পরিণত হয় এবং সম্পাতের দ্বারা নহে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের দ্বারা, জড় পদার্থের যত প্রকার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সম্ভব, তাহা প্রবর্ত্তন করে।

বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত এই অদৃশ্য পদার্থ ঈথর বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিকের কল্পনা প্রসূত নহে। ঈথর সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রচলিত থাকিলেও ইহার অস্তিত্ব অবিসম্বাদিত। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও বিশ্ব জগতের নানা কার্য্য ও দৃশ্য হইতে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ লাভ করি যে ঈথর অবস্থিত করিতেছে। সুতরাং কল্পনা বলিয়াই উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে, অন্য পক্ষে ঈথরের অবস্থিতি স্বীকার না করিলে, অনেক ভৌতিক ক্রিয়ার মীমাংসাই হইতে পারে না। *

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়

মালতীমাধব।

ভবভূতি ভিন্ন আর যে কোন প্রাচীন সংস্কৃত কবির নাটক খুলিয়া দেখ, সকলেরই প্রস্তাবনায় দেখিবে, কবির আত্ম-অবতারণা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত এবং অনুদ্ধত। কিন্তু ভবভূতিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না। তাঁহার রচিত প্রত্যেক নাটকের আরম্ভেই, তিনি অলীক বিনয় পরিহারপূর্ব্বক, নাটকের প্রস্তাবনাচ্ছলে, সূত্রধারের মুখ দিয়া সবিস্তারে আত্মগরিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথমবার "বীরচরিতে" তাঁহার উর্দ্ধতন তিনপুরুষের পরিচয় প্রদান করিয়া বংশমর্য্যাদা কীর্ত্তন করিতেই সময় অনেকটা সংক্ষেপ

* সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে সার গ্যাবরীয়েল ষ্টোক‍্স্ নাকি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া ঈথরের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছেন। ভাং-সং

হইয়া আসিয়াছিল, নিজের কথা আর বেশী বলা হয় নাই, সেই একটুকু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম "মালতীমাধবে" সে ত্রুটী সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। তিনি যে বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য যোগ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ,—শুধু তাহাই নহে,—নাটককারের উপযোগী সমস্তগুণও যে তাঁহাতে বর্ত্তমান তাহা সুস্পষ্টরূপে ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তবে আবার তাহার অনতিবিলম্বেই সন্দেহক্ষুভিত হৃদয়ের এ স্পর্দ্ধাবাক্য কেন ?

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তিতে কিমপি তান্‌প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

"যাঁহারা এই গ্রন্থের প্রতি অবজ্ঞাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহারা অতি জ্ঞানী লোক (?), তাঁহাদের জন্য আমার এ আয়াস নহে। আমার মর্ম্মগ্রাহী কোননা কোন ব্যক্তি একদিন এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবেন, কিম্বা হয়ত বা এখনই করিয়াছেন, কারণ কাল অনন্ত, এবং পৃথিবী বহুবিস্তীর্ণা।" শুধু অবহেলার সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া এতখানি তীব্রতা মনে সঞ্চিত হয় না, অযোগ্য অবহেলা যে একবার ভোগ করিয়াছে তাহারই এ গর্ব্বিতবাক্য। বীরচরিতে কবি আপনার সম্বন্ধে এবং আপনার পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মালতীমাধবে তাহার পুনরুক্তি, এবং তাহার সঙ্গে এই উপরী গর্ব্বিতবাক্যটী দেখিলে মনে হয় যেন, কবির বংশমর্য্যাদাজ্ঞানটা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল ছিল। প্রথমবারে সেই উচ্চবংশের দাবী করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে উপায় নিষ্ফল হওয়াতে আহত-অভিমান প্রযুক্ত দ্বিগুণ দম্ভভরে বলিলেন—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি, তান্‌প্রতি নৈষ যত্নঃ।

ভবভূতির কুলযশ ঘোষণা করিবার কতকটা আবশ্যকও ছিল। বিদর্ভ তাঁহার জন্মস্থান, কিন্তু তিনি কনোজরাজ যশোবর্ম্মার আশ্রিত সভাকবি। কনোজে তিনি বিদেশী, অপরিচিত, অজ্ঞাতকুলশীল, এবং সম্ভবতঃ রাজার অনুগ্রহভাজন বলিয়া রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী দেশীয় ইতর কবিগণের বিদ্বেষের পাত্র। এরূপ স্থলে বৈদেশিক সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠাদান করিবার নিমিত্ত আত্মযশকীর্ত্তন কতকটা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু যে রাজানুগৃহীত, সে কেন ইতরের অবহেলায় ক্ষুণ্ণ হয় ? অভিমানী হৃদয়ের স্বভাবই তাই ; সে, যে ক্ষুদ্রতম, হীনতম জীবের ঘৃণার কোনই মূল্য নাহি জানে, তাহারো ঘৃণায় ব্যথা পায় ; কাহারো নিকট হইতে অবজ্ঞা সহিতে পারে না। তাই অযোগ্য অবহেলা প্রাপ্ত মানী নিজের বেদনার স্থলে এই সান্ত্বনা-প্রলেপটী অর্পন করিয়াছিলেন :—

উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী।

মালতীমাধবের নাটকাংশের বর্ণনার পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। এই গ্রন্থখানি ঠিক সাধারণ নাটক নহে, ইহা একটী প্রকরণ, অর্থাৎ দশ-অঙ্কের নাটক। ইহার প্রস্তাবনায় সূত্রধার নটকে বলিয়াছিল "এই নাটকখানি বিশেষ করিয়া অভিনয় করিবার কারণ এই যে ইহা সর্ব্বগুণসম্পন্ন; ইহাতে রসের প্রাচুর্য্য, ঘটনার বৈচিত্র্য, ওজস্বিতা ও বাক্যবিন্যাসের পটুতা কিছুরই অভাব নাই।" ঠিক; ইহার অশেষ গুণ আছে; কিন্তু তাহা সত্বেও ইহা পাঠে প্রবৃত্ত হইবার কালে একটী বিভীষিকা, সমস্ত গুণরাশির মধ্য হইতে মাথা তুলিয়া, যখন তখন উঁকি মারে—সেটী, সংক্ষিপ্ততার ঐকান্তিক অভাব। একে দশ অঙ্ক, তাহাতে প্রত্যেক অঙ্কটী অসাধারণ দীর্ঘ, এবং দুরূহ, সমাস-বহুল পদে পূর্ণ; ইহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে উল্টাইতে মানব জীবনের নশ্বরতা স্মরণ করিয়া কস্মিন্‌কালে পুস্তক সমাপ্তি সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু একান্ত ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার রসগ্রহণে যত্ন করিলে, পরিশেষে অনেকখানি প্রীতির দ্বারা পুরস্কৃত হওয়া যায়।

প্রস্তাবনা শেষ হইলে অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথম অঙ্কের আরম্ভেই কামন্দকী নাম্নী একটী বৌদ্ধপরিব্রাজিকা এবং তাঁহার শিষ্যা অবলোকিতার কথোপকথনে নাটকের উপাখ্যানভাগ প্রকটিক হইয়াছে। কামন্দকী বলিলেন "বৎসে অবলোকিতে! তোমার কি মনে হয় বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাতের পুত্র মাধবের সহিত অমাত্যভূরিবসুর কন্যা মালতীর বিবাহ সহজে নিষ্পন্ন হইবে!" অবলোকিতা বলিল "ভগবতি! আপনার এ আশ্চর্য্য চিত্ত চাঞ্চল্য। আপনি চীরবসনা, ভিক্ষুব্রতাবলম্বিনী, আপনাকে কেন অমাত্য ভূরিবসু এই সাংসারিক ব্যাপারে নিযুক্ত করিলেন, আপনিই বা কেন স্বীকৃত হইলেন আমি কিছু বুঝিতে পারি না।" ভগবতী বলিলেন "তুমি কি জাননা আমরা বাল্যসঙ্গী! বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত নানাদিগ্‌দেশ হইতে আমরা বহুসংখ্যক ছাত্র ও ছাত্রী একই আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলাম। সেখানে ভূরিবসু ও দেবরাত, আমাকে ও সৌদামিনীকে সাক্ষী রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে একজনের পুত্রের সহিত, আর একজনের কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাদের বাল্যপ্রণয় চিরকাল অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। আমাকে যে ভূরিবসু এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন সে আমাদের বাল্যস্নেহের ফল। আমি প্রাণপণ করিয়াও যদি সুহৃদের এই কাজটী করিতে পারি তাহা হইলে করিব। দেবরাতের পুত্র মাধব এখন আন্বীক্ষিকী অধ্যয়ন করিতে এই নগরেই আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই ভূরিবসুর পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কন্যা মালতীর সহিত মাধবের প্রকাশ্য বিবাহ দেওয়া অসম্ভব, কারণ রাজা তাঁহার সুহৃদ নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহ দিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিবাহ

দিলে অমাত্যভূরিবসু তাঁহার ক্রোধের পাত্র হইবেন। সেইজন্য তিনি এরূপ ভাণ করিতেছেন যেন মাধবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত তাঁহার অবিদিত। মাধব ও মালতীকে পরস্পরের প্রতি আসক্ত করিয়া তাহাদের চোরিকা বিবাহ ঘটাইতে হইবে, তাহাদেরও জানিতে দেওয়া হইবে না যে ভূরিবসুর ইহাতে সম্মতি আছে, কারণ তাহা না হইলে তাহারা শৈশবসুলভ সরলতা বশতঃ কোন দিন ইহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া মহা অনর্থ ঘটাইবে। ভূরিবসুর আগাগোড়া এইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যেন রাজা তাঁহাকে তিলমাত্র সন্দেহ করিতে না পারেন। কারণ—

বহিঃ সর্ব্বপ্রকারপ্রগুণরমণীয়ং ব্যবহর
নৃপরাভ্যূহস্থানান্যপি তনুতরাণি স্থগয়ন্।
জনং বিদ্বানেকঃ সকলমভিসন্ধায় কপটৈ
স্তটস্থঃ স্বানার্থান্ ঘটয়তি চ, মৌনং চ ভজতে॥

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাহিরে সর্ব্বতোভাবে হৃদ্যতার সহিত আচরণ করিয়া, অতিসূক্ষ্মতর সন্দেহের স্থল পর্য্যন্ত সাবধানে ঢাকিয়া রাখেন; এবং কপটাচরণের দ্বারা ঔদাসীন্যের ভান করিয়া নীরবে স্বার্থসিদ্ধি করিয়া যান।" বৌদ্ধপরিব্রাজিকার মুখে একি নীতিবাক্য? বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সরল, উন্নত নীতিতন্ত্র এই জেসুইটিক্যাল, কূট, পলিসিতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে? অবলোকিতা কামন্দকীর নীতি অনুমোদন করিয়া বলিল "আমিও আপনার আদেশমত, কোননা কোন ছল করিয়া, মাধবকে ক্রমাগত অমাত্যভূরিবসুর প্রাসাদবর্ত্তী রাজপথ দিয়া সঞ্চরণ করাইয়াছি। মালতীর ধাত্রী লবঙ্গিকার মুখে শুনিলাম, প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে মাধবকে দেখিয়া মালতী তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছে। এখন সে প্রতিদিন গাঢ় উৎকণ্ঠার সহিত, কম্পিত কলেবরে মাধবের দর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। একদিন আত্মবিনোদের নিমিত্ত একখানি চিত্রপটে, মাধবকে আঁকিয়াছিল। লবঙ্গিকা সেই চিত্র মন্দারিকার হাতে সমর্পণ করিয়াছে। মন্দারিকা মাধবভৃত্য কলহংসের প্রেয়সী। সুতরাং আশা করিতেছি তাহার সাহায্যে সে চিত্র ক্রমশঃ মাধবের হস্তগত হইবে। আর আজ আমি মাধবের কৌতূহল উদ্রেক করাইয়া তাহাকে মকরন্দোদ্যানে মদনোৎসব দেখিতে পাঠাইয়াছি। সেখানে নিশ্চয়ই মালতীর সহিত তাহার দেখা হইবে।" কামন্দকী ইহা শুনিয়া সহর্ষচিত্তে, অবলোকিতাকে সাধুবাদ করিতে করিতে বলিলেন "বৎসে আমার প্রিয়ানুষ্ঠানে তোমার তৎপরতা দেখিয়া আমার পূর্ব্বশিষ্যা সৌদামিনীকে মনে পড়িতেছে।" তখন অবলোকিতা ভগবতীকে সৌদামিনী সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য সম্বাদ জ্ঞাপন করিল। সে বলিল "ভগবতি! এই নগরের মহাশ্মশানে করালী নামে এক জীবরক্তপায়ী চামুণ্ডামূর্ত্তি আছে। সেখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীপর্ব্বতনিবাসী, রাত্রিবিহারী, নরমুণ্ডধারী, কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যা মহাপ্রভাবা কপালকুণ্ডলা আসিয়া থাকে। তাহার নিকট শুনিয়াছি সৌদামিনী, শ্রীপর্ব্বতে

কাপালিকব্রত ধারণ করিয়া আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালিনী হইয়াছেন।” কামন্দকী কিছুমাত্র বিস্মিত না হইয়া প্রশংসার ভাবে বলিলেন “সৌদামিনীর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে।”

বৌদ্ধভাবের এতদূর অবনতি কিরূপে হইল? ভবভূতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষাশিষি বিরাজ করিয়াছিলেন এবং চীন পরিব্রাজক হিউন্‌সাঙ্‌ ঐ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। তিনি আসিয়া দেখিয়াছিলেন তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের আর ততটা প্রভাব নাই। হিন্দুধর্ম্ম পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুমন্দির, এবং বৌদ্ধবিহার অনেকস্থলে নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। পাঞ্জাব, কাশ্মীর, গুজরাট ও মগধ এই চারি প্রদেশ ভিন্ন আর কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের তাদৃশ প্রতিপত্তি নাই এবং ঐ চারিটী প্রদেশেই উহা যা-কিছু বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অনেকটা বিকৃত, কলুষিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যতই কেন বিকৃত হউক না উহার মূলমন্ত্র যে “অহিংসা পরমো ধর্ম্ম” তাহা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া বৌদ্ধযোগিনীর কাপালিক ব্রত অবলম্বন করা এবং দ্বিতীয় যোগিনীর তাহাতে প্রশংসাবাদ, এ হেঁয়ালীর উত্তর কি? বৌদ্ধধর্ম্ম কোন্ সুরঙ্গ পথে সহস্র বৎসরের মধ্যে তান্ত্রিক ধর্ম্মে নামিয়া আসিল একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা হউক।

বুদ্ধদেব যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজেরই আবিষ্কৃত নহে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কপিলের সাংখ্যদর্শনের উপরই সে ধর্ম্মের ভিত্তি। তাহার প্রমাণ—অনেকগুলি বিষয়ে উভয় ধর্ম্মের মিল। তাঁহারা উভয়েই মানবের অশেষ দুঃখের যথার্থ প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। উভয়েই বৈদিক প্রতীকারবিধি ঘৃণাভরে বর্জ্জন করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে জীবহত্যা দ্বারা দেবতার তুষ্টিসাধনের আদেশ বিধিবদ্ধ ছিল। উভয়েই উপনিষদের পুনর্জ্জন্মবাদ গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন শুধু সৎকার্য্যের দ্বারাই মানুষ উন্নততর লোকে প্রয়ান করিতে পারে, শরীর খেদ নিষ্ফল। উভয়েই নির্জ্জন চিন্তা ও জ্ঞানালোককে মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া নির্ব্বাণকে মোক্ষের চরমসীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব তাহার নীতিতন্ত্রে নহে, তাহার গঠনতন্ত্রে। কপিল শুধু “থিওরিষ্ট”; তিনি বিদ্বৎসমাজে তাঁহার দর্শনপ্রচার করিয়া, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনার নিমিত্ত একটী নূতন উপলক্ষ্যের সৃষ্টি করিয়া মাত্র নিশ্চিন্ত হইলেন। তাই তাঁহার সাংখ্যবাদ একটী ক্ষুদ্র দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রহিল, একটী বৃহৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে গড়িয়া তুলিল না। কিন্তু বুদ্ধের হৃদয় একটি নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের আনন্দেই স্থির থাকিতে পারিল না। তাঁহার প্রাণ সমস্ত মানবের জন্য কাঁদিয়াছিল, নিতান্ত দরিদ্র ইতর দুঃখী মানবকেও মুক্তির আনন্দ বিতরণ করিয়া তাহার দুঃখের ভার লাঘব করিবার জন্য তিনি কাতরতা বোধ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার তত্ত্বকে কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত

তিনি বৌদ্ধসঙ্ঘ গঠন করিলেন। তাঁহার নীতিতন্ত্র অপেক্ষা তাঁহার সঙ্ঘই বৌদ্ধধর্ম্মকে জীবনী শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহার দ্রুত প্রচারের সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু ঐই সঙ্ঘই পরিশেষে তাহার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসনের কারণ হইল। তাহার নীতিতন্ত্র অবলম্বন করিয়া যখন একটী বৃহৎ, ক্ষমতাবান্, সুগঠিত, ধর্ম্মসম্প্রদায় জাগিয়া উঠিল তখন ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। কিন্তু সাংখ্যদর্শন টিঁকিয়া রহিল; সে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে গড়িতে চেষ্টা করে নাই কিনা সেইজন্য তাহার প্রতি কেহ বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না। বরঞ্চ তাহাকে সর্ব্বসাধারণগ্রাহী করিবার নিমিত্ত তাহার নাস্তিকতা দোষটী দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইয়া সেই দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া যোগশাস্ত্র নামক আর একটী নূতন ধর্ম্মশাস্ত্রের অভ্যুদয় হইল। কপিলের দর্শনের সহিত আস্তিকতার সংমিশ্রণ করিতে গিয়া পাতঞ্জল তাহাতে নানাবিধ প্রচলিত কুসংস্কার ও অলৌকিক ক্ষমতা লাভের জন্য অদ্ভুত গুপ্ত ক্রিয়াবিধি যোগ করিয়া দিলেন। এবং এই যোগশাস্ত্র হইতে কালক্রমে বীভৎস তান্ত্রিকশাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। একালের থিয়সফিষ্টেরা যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, occultism তাহার একটী প্রধান অঙ্গ সুতরাং তাহাকে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম বলা যায় না, তাহা এই যোগধর্ম্ম সংমিশ্রিত এক প্রকার রূপান্তরিত, কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সাংখ্য মত দিয়া এক এক ধাপ করিয়া কিরূপে তান্ত্রিক ধর্ম্মে নামিয়া আস যায় বর্ত্তমান থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ই তাহার প্রমাণস্থল। মালতীমাধবে এই কাপালিক ব্রতাবলম্বিনী বৌদ্ধযোগিনী সৌদামিনী, শ্রীপর্ব্বতনিবাসী অঘোরঘণ্ট এবং তাহার মহাপ্রভা শিষ্যা কপালকুণ্ডলার সহিত আমাদের বারবার সাক্ষাৎ হইবে, সেইজন্য আগে হইতে তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এতটা সবিস্তারে আলোচনা করা গেল।

সম্পাদকের চিত্রচয়ন।

জাপানী উপাখ্যান।

জাপানের ইয়েদো নগরের অনতিদূরে মেগুরো নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেই গ্রামের একটী বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্রে, নগরের কোলাহল হইতে বহু দূরে, স্নিগ্ধ শ্যাম তরুর ছায়ায় শৈবালাচ্ছন্ন দুইখানি জীর্ণ প্রস্তর পড়িয়া আছে। একটী প্রস্তরে লেখা রহিয়াছে "শিয়োকুর সমাধি-মন্দির।" "শিয়োকু" এক প্রকার কাল্পনিক যুগল-পক্ষী, ইহাদের একই দেহে দুইটী স্বতন্ত্র প্রাণের অধিষ্ঠান; এই অপূর্ব্ব রহস্যময় দ্বিত্ব জাপান দেশে দাম্পত্য

প্রেমের পরিব্যঞ্জকরূপে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় প্রস্তর খণ্ডে অপেক্ষাকৃত সবিস্তারে উপাখ্যানটী খোদিত রহিয়াছে। তাহা এই :—

"সেই বহু পূর্ব্বে সে তাহার ফুলের-মত-সুন্দর প্রিয়তমের জন্য ম্রিয়মান হইয়াছিল; এখন এই পুরাতন সমাধি স্তম্ভের শৈবালের তলে তাহার আর সকলই মরিয়াছে, কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই অনিত্য জগতের শত পরিবর্ত্তনের মাঝে, এই সমাধি স্তম্ভ শিশির ও বর্ষায় ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; নিজেরি ধূলির মাঝে লয় প্রাপ্ত হইয়া সে রেখা মাত্রাবশেষ হইতেছে। পথিক! এই স্তম্ভের ধ্বংশ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য দান কর; আমরাও প্রাণপনে তোমার সাহায্য করিব। ইহাকে পুনঃ সংস্থাপন করিয়া, ভবিষ্য বংশের জন্য ইহাকে রক্ষা করি এস, এবং তাহার উপর এই শ্লোকটী খোদিত করি!—চেরি পুষ্পের ন্যায় সুকুমার এই দুইটী পাখী অকালে প্রাণ হারাইয়াছিল, যেমন বায়ুবেগে অস্ফুট ফুল অকালে ঝরিয়া যায়।" প্রথম প্রস্তর খণ্ডের তলে হত্যাপরাধী দস্যু গোম্পাচী এবং তাহার প্রেয়সী কোমুরাসাকীর ভস্ম একত্রে নিহিত রহিয়াছে। কোমুরাসাকীর দুঃখ ও অবিচঞ্চল প্রেমের স্মৃতিতে স্থানটী পবিত্রিত হইয়াছে, এবং এখনও ভক্তেরা সেই সমাধির উপর ধূপ জ্বালাইয়া পুষ্পাঞ্জলি করিয়া যায়। তবে গোম্পাচী ও কোমুরাসাকীর প্রেমকাহিনী শোনঃ—

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে ইনাবা প্রদেশের কোন ভূম্যধিকারীর, শিরাই গোম্পাচী নামক একটী ষোড়শ বর্ষীয় যুবক অনুচর ছিল। সেই কিশোর বয়সেই সে তাহার কন্দর্প তুল্য রূপ, প্রভূত বীর্য্য ও অস্ত্রকুশলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। একদিন তাহার একটী পোষা কুকুরের সহিত তাহার স্বজাতীয় আর একটী যুবকের কুকুরের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কাহার কুকুর বেশী পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল এই বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে দুই উদ্ধত যুবক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, এবং গোম্পাচীর অস্ত্রাঘাতে তাহার প্রতিপক্ষের মৃত্যু হইল। রাজদণ্ডের ভয়ে গোম্পাচী ইয়েদো নগরাভিমুখে পলায়ন করিল। পথে যাইতে যাইতে একদিন রাত্রে পথিপার্শ্বস্থ একটী সরাইয়ে প্রবেশ করিয়া, আহারান্তে সেই খানে শয়ন করিয়া সে অজ্ঞাতসারে বিপদকে আলিঙ্গন করিল। সে সরাইটী দস্যুদের আড্ডাস্থান। গোম্পাচী সরাইয়ে প্রবেশ করিবার কালে দশজন দস্যু সেখানে উপস্থিত ছিল। গোম্পাচীর নিকট অর্থ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার তরবারী এবং ছোরা বহুমূল্যবান, দস্যুগণ তাহারই প্রতি লোভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই রাত্রে গোম্পাচীকে হত্যা করিতে সংকল্প করিল।

গভীর রাত্রে গোম্পাচীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, মনে হইল কে যেন চুপি চুপি দ্বার খুলিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া দ্বারাভিমুখে চাহিয়া দেখিল একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকা, তাহার শয্যার নিকট আসিয়া তাহাকে নীরব থাকিতে সঙ্কেত করিয়া, কাণের কাছে চুপি চুপি বলিল, এই "সরাইয়ের রক্ষক

একজন দস্যুপতি; তাহারা তোমার কাপড় ও অস্ত্রের লোভে আজ রাত্রে তোমাকে হত্যা করিবে স্থির করিয়াছে। আমি মিকাওয়া নগরের এক বণিকের কন্যা। গত বৎসর দস্যুরা আমাদের গৃহ লুঠপাঠ করিয়া আমাকে ধরিয়া আনে। তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া এই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে পালাও," এই কথা বলিতে বলিতে বালিকা রোদন করিতে লাগিল। গোম্পাচী কিছুক্ষণের জন্য স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "সুন্দরি! তোমার ভয় নাই আজ রাত্রেই আমি দস্যুদের হত্যা করিয়া তোমাকে মুক্ত করিব। কিন্তু আমাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলেই তুমি বাহিরে গিয়া কোথাও লুকাইয়া থাকিও, তাহা না হইলে অস্ত্রাঘাতে তোমার সুকুমার দেহ ছিন্ন হইতে পারে।" বালিকা তাহাতে সম্মতি দিয়া চলিয়া গেল। গোম্পাচী নিশ্বাস রোধ করিয়া অন্ধকারে দস্যুদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিলে, সে সহসা এক কোপে প্রথম দস্যুর মাথা কাটিয়া ফেলিল। তখন অবশিষ্ট নয় জনের সহিত ভীষণ সংগ্রাম বাধিল। কিন্তু গোম্পাচীর অস্ত্রাঘাতে একে একে সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিল। যুদ্ধজয় করিয়া গোম্পাচী বাহিরে আসিয়া বালিকাকে ডাকিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া মিকাওয়াভিমুখে যাত্রা করিল। মিকাওয়াতে পৌঁছিয়া, বালিকাকে তাহার বৃদ্ধ পিতার হাতে সমর্পণ করিয়া বলিল, "আপনার কন্যা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে।" এই বলিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিল। যখন বৃদ্ধ বণিক এবং তাঁহার পত্নী বহুদিন পরে তাঁহাদের একমাত্র কন্যাকে ফিরিয়া পাইলেন তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কৃতজ্ঞচিত্তে গোম্পাচীকে তাঁহাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া যজ্ঞের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের দুহিতাকে সে যজ্ঞের আমোদ প্রমোদ স্পর্শ করিতে পারিল না, সে শুধু গোম্পাচীর অতুল বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিশিদিন তাহারই চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিল। অপুত্রক বণিক গোম্পাচীকে তাঁহার গৃহে পুত্রবৎ থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু গোম্পাচী ইয়েদো নগরে কোন বড় লোকের অধীনে সৈনিক পদ গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল, সেই জন্য বৃদ্ধের অনুরোধ ও বালিকার কোমলতর অনুনয়ও তাহাকে গৃহে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বৃদ্ধ অবশেষে তাহাকে দুই শত ভরি রৌপ্য উপহার দিয়া দুঃখিত চিত্তে বিদায় দিলেন।

হায়! সে অবোধ বালা যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে, যাহার সহিত বিচ্ছেদ সম্ভাবনায় বুক ফাটা দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, সে যশোলিপ্সু যুবক প্রেমের মর্য্যাদা কি বুঝিবে? সে বালিকার নিকট আসিয়া বলিল, "অশ্রু মোছ প্রিয়ে, আমি শীঘ্রই আবার আসিব। যতদিন না ফিরিয়া আসি আমার প্রতি সমান প্রেমময়ী থাকিও, কখন অবিশ্বাসী হইও না। তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিও।" গোম্পাচী শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে শুনিয়া বালিকার মুখে আবার হাসি ফুটিল, সে অশ্রু মুছিল।

গোম্পাচী পুনরায় ইয়েদো অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করিল। কিন্তু তখনও তাহার বিপদের অবসান হয় নাই। ইয়েদোর সন্নিকটে সুজুগামারি নামক প্রদেশে পুনর্ব্বার ছয় জন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহাদের মধ্যে দুইজনকে সে রণে পরাজিত করিল, কিন্তু অবশিষ্ট চারিজন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। সে দীর্ঘ পথশ্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া তাহাদের আর রোধ করিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময় একজন প্রধান নগর-রক্ষক, চোবেই, তাঁহার কাষ্ঠাসনে আরোহণ করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি গোম্পাচীর বিপদ দেখিয়া অবিলম্বে কেদারা হইতে নামিয়া ছোরা বাহির করিয়া দস্যুদের আক্রমণ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। গোম্পাচী চোবায়ের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আপনি কে আমি জানি না, কিন্তু যেই হউন, আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়া আমাকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।"

চোবেই বলিলেন, "আমি একজন সামান্য নগর-রক্ষক মাত্র। দস্যুরা যে পলায়ন করিয়াছে সে আমার বীর্য্যের গুণে নহে, সৌভাগ্যগুণে; কিন্তু তোমার এই কিশোর বয়সে এরূপ বল ও সাহস দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। তোমার গন্তব্যস্থল জানিতে পারি কি?"

"আমি নিজেই তাহা জানি না, আমি চালচুলাহীন পলাতক অপরাধী, আমার গন্তব্যের কোন ঠিকানা নাই।"

ইহা শুনিয়া বালকের প্রতি চোবায়ের মমতার উদ্রেক হইল। তিনি ভদ্রতা করিয়া বলিলেন, "আমি সামান্য নগর-রক্ষক বলিয়া আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে যদি তোমার অপমান বোধ না হয়, তাহা হইলে যতদিন না কোন বড় লোকের অধীনে কাজ পাও ততদিন আমার গৃহে অতিথি স্বরূপ থাকিলে সুখী হইব।"

গোম্পাচী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহার সৌজন্যতাপূর্ণ আতিথ্য গ্রহণ করিল। তাঁহার গৃহে তিন চারিমাস কাল অবস্থান করিল। কিন্তু এখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকায় সে অসৎ সংসর্গে পড়িল। রূপ এবং রূপা এ দুটারই অভাব ছিল না তাহার, সুতরাং যোশী-পাড়ার সৌন্দর্য্য-ব্যবসায়িনী-মহলে তার আদরের শেষ রহিল না।

এই সময়ে যোশীপাড়ায় কোমুরাসাকী নামে একটী নবাগতা সুন্দরীর রূপ এবং কলা-কুশলতার প্রশংসায় সমস্ত নগর ধ্বনিত হইতে লাগিল। গোম্পাচী কৌতুহলী হইয়া এক দিন তাহাকে দেখিতে যাইল। গৃহদ্বারে পরিচারিকার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সে যে ঘরে কোমুরাসাকী বসিয়াছিল, সেই ঘর দেখাইয়া দিল। গোম্পাচী ঘরে প্রবেশ করিয়া কোমুরাসাকীর সম্মুখীন হইতে হইতে অর্দ্ধপথে চমকিয়া উঠিয়া নিবৃত্ত হইল। কোমুরাসাকীর মুখ হইতেও বিস্ময় সূচক শব্দ নিঃসৃত হইল। এই কোমুরা-সাকী, যোশীপাড়ার এই বিখ্যাত সুন্দরী আর কেহই নহে, এ সেই বণিক কন্যা, যাহাকে কয়েক মাস পূর্ব্বে গোম্পাচী দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মিকাওয়াতে তাহার বৃদ্ধ

পিতা মাতার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। সে তাহাকে পিতার স্নেহে সম্পদের কোলে লালিত দেখিয়া আসিয়াছিল, সেখানে বিদায়ের দিন তাহারা পরস্পরের প্রতি চির-প্রেমের শপথ বিনিময় করিয়াছিল। এখন এক প্রকাশ্য বেশ্যাগৃহে তাহাদের পুনর্মিলন। একি পরিবর্ত্তন! একি বৈষম্য! অত ঐশ্বর্য্য কোথায় লুপ্ত হইল, সে. প্রেম-শপথ কিরূপে মিথ্যাতে পরিণত হইল। গোম্পাচী কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "একি কোমুরাসাকী? তুমি কেন যোশীপাড়ায়? এ রহস্যের অর্থ কি?" কোমুরাসাকী গোম্পাচীর সহিত এই অপ্রত্যাশিত পুনর্মিলনে আনন্দে ও লজ্জায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার দুঃখের কাহিনী বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তুমি আমাদের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর, চতুর্দ্দিক হইতে বিপদ রাশি আসিয়া বৃদ্ধ পিতাকে ছাইয়া ফেলিল। একে একে ধনরত্ন সবই বিলুপ্ত হইল, যখন আর এক কপর্দ্দকও বাকী রহিল না, তখন আমি বিক্রীত হইলাম, দুঃখে শোকে পিতা মাতার মৃত্যু হইল। আমার মত অভাগিনী পৃথিবীতে আর কে আছে। ওগো অসীম বলশালী এ অবলা বালিকাকে রক্ষা কর, একবার তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, এবার যেন পরিত্যাগ করিও না।" বালিকার কাতর ক্রন্দনে গোম্পাচীর হৃদয় আর্দ্র হইল। সেও অশ্রুসিক্ত স্বরে বলিল, "তুমি আশ্বস্ত হও, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। আমার নিকট এমত অর্থ নাই যে আমি তোমার দাসীত্ব মোচন করিতে পারি, কিন্তু এখানে তোমার আর কোন রূপ উপদ্রব যাহাতে সহিতে না হয় তাহা আমি দেখিব। আমার প্রতি বিশ্বাস রাখিও প্রিয়ে; আমাকে ভাল বাসিও।" গোম্পাচীর এরূপ সস্নেহ সান্ত্বনা বাক্যে কোমুরাসাকী আশ্বস্ত হইল; অশ্রু মুছিয়া গোম্পাচীর সহিত মিলনের সুখে পূর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইল। গোম্পাচী সেদিন চোবেইয়ের গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াও কোমুরাসাকীকে ভুলিতে পারিল না। তাহার পর হইতে সে প্রতি দিন যোশীপাড়ায় কোমুরাসাকীর নিকট যাইত। কোন দিন দৈবক্রমে যাইতে না পারিলে, কোমুরাসাকী উদ্বিগ্ন হইয়া সম্বাদজ্ঞাপনার্থে লোক প্রেরণ করিত। কিন্তু এরূপ অলস জীবন নির্ব্বাহ করিতে করিতে তাহার সঞ্চিত অর্থ ক্রমশঃ নিঃশেষ হইয়া আসিল। এখন দেখিল পলাতক অপরাধীর বড়লোকের গৃহে কাজের সম্ভাবনাও বিরল। অথচ শূন্যহাতে যোশীপাড়ায় গমন করিলে, সেখানে মান থাকিবে না, কোমুরাসাকীকে অন্যের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতেও পারিবে না, তাহার দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণ করিতে পারিবে না, তাহার দাসীত্বও মোচন করিতে পারিবে না। ইহার প্রতীকারের উপায় ভাবিতে ভাবিতে সে পাগলের মত হইয়া একজন পথিককে হত্যা করিয়া, তাহার অর্থ লইয়া যোশীপাড়ায় গমন করিল। অসৎ পথের ঢালু জমিতে একবার পা বাড়াইলে আর রক্ষা নাই, গোম্পাচীর দ্রুত অধোগতি আরম্ভ হইল। কোমুরাসাকীর প্রতি প্রবল প্রেমে তাহার দারিদ্র্য দূরীকরণের নিমিত্ত সে প্রতিদিন হত্যা পাপে লিপ্ত হইতে লাগিল।

ক্রমে সেই সুন্দর যুবকের অন্তর নরকের ন্যায় কুৎসিত হইয়া উঠিল। চোবেই তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তাহার মৃত্যুর দিন ঘনাইয়া আসিল। রাজপুরুষেরা তাহাকে একদিন ধৃত করিয়া প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। সুজুগামোর প্রদেশের বধ্য ভূমিতে নীত হইয়া সে হত্যাপরাধী দস্যুর ফাঁসি হইল। তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া চোবেইয়ের হৃদয় আবার সে যুবকের প্রতি স্নেহে আর্দ্র হইল। বধ্যস্থান হইতে তাহার মৃতদেহ আনিয়া মেগুরো গ্রামে বরঞ্জি মন্দিরের সমাধিক্ষেত্রে তাহাকে গোর দিলেন।

কোমুরাসাকী লোকের মুখে তাহার প্রিয়তমের এই ভীষণ পরিণামের কথা শুনিয়া, শোকে অধীর হইয়া, গোপনে যোশীপাড়া হইতে পলায়ন করিয়া মেগুরোয় আসিল। সেখানে গোম্পাচীর সমাধির উপর লুণ্ঠিত হইয়া হৃদয় বিদারক অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাহার নাম ধরিয়া মধুর স্বরে ডাকিয়া, বুকে ছোরা বসাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। মন্দিরের পুরোহিত কিছুক্ষণ পরে সেখানে আসিয়া বালিকার মৃতদেহ দেখিয়া, তাহার প্রগাঢ় প্রেমের নিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া গোম্পাচীর পার্শ্বে তাহাকে শয়ন করাইয়া উভয়ের সমাধির উপর লিখিয়া রাখিলেন "শিয়োকুর সমাধি-মন্দির।"

জাপানে ফুল-বিন্যাস।

জাপানে ফুল-সাজান ব্যাপারটী বহুশতাব্দী ধরিয়া, পুরুষানুক্রমে একটী রীতিমত বিজ্ঞানে গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ ধর্ম্মভাব হইতেই ইহার প্রথম উৎপত্তি; কালক্রমে ধর্ম্মমন্দিরের অনুকরণে বাসগৃহেও ফুলের বেদী স্থাপিত হইল; তাহার সহিত সামাজিকতার সংমিশ্রণ হইয়া জাপানে একটী ফুলের ভাষা গঠিত হইল। অন্যান্য দেশে যে সকল সামাজিক শিষ্টাচার কথায় বার্ত্তায় প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীহীন হইয়া পড়ে, জাপানে তাহাই শুধু ফুলের দ্বারা সুশোভনরূপে ব্যক্ত হয়। ফুল-বিন্যাস শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ, সুন্দর ফুলদানী সৃষ্টিরও আবশ্যক হইল। জাপানী "পুষ্পসভায়" কিরূপ আদব কায়দা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, কণ্ডার সাহেব তাঁহার "জাপানের পুষ্প" নামক গ্রন্থে তাহার সবিস্তার ও সরস বিবরণ লিখিয়াছেন।

"পুষ্পসভায়" কোন বিশেষ অতিথিকে তাঁহার ফুল-বিন্যাস চাতুর্য্য দেখাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। আগন্তুক, প্রতীক্ষাশালায় তাঁহার পাখা রাখিয়া আসেন, এবং অভ্যর্থনা গৃহে প্রবেশ করিয়া পুষ্পবেদীর সম্মুখে উপবেশন করেন। যদি তিনটী

Kakemonos * থাকে, তাহা হইলে প্রথমে মাঝেরটী তাহার পরে বাম পার্শ্বেরটী এবং সর্ব্বশেষে দক্ষিণ পার্শ্বেরটী পরীক্ষা করেন। তাহার পর সেই পুষ্পস্তম্ভ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে হয়। কোন ফুলটীকে কতটা প্রশংসা করা উচিত সে সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। ভদ্রসমাজে বিচারহীন উচ্ছ্বাস অত্যন্ত অকর্ত্তব্য। এইরূপ সসম্ভ্রমে পুষ্পস্তম্ভ পরিদর্শন এবং তাহার সম্বন্ধে যথোচিত প্রশংসাবাক্য সমাপ্ত হইলে গৃহকর্ত্তা একটী পাত্রের উপর কতকগুলি ফুল, ডাল, একটী ছুরি, একটী কাঁচি, একটী ক্ষুদ্র করাত, একটী ফুলদানী ও হাত মুছিবার জন্য একখানি কাপড় লইয়া আসেন। তাহার আগেই ক্যাকিমোনোগুলি মুড়িয়া ফেলা হয়, কেননা একজন অতিথি ক্যাকিমোনোর সহিত মিলাইয়া উপস্থিত মত ফুল-বিন্যাস করিবেন ইহা প্রত্যাশা করিলে, অতিথির প্রতি একটু বেশী জুলুম করা হয়। তবে তিনি যদি স্বেচ্ছায় সেই অপরিচিত ক্যাকিমোনো সম্মুখে রাখিয়া তাহারই সহিত মিলাইয়া ফুল-বিন্যাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধা দেওয়া হয় না। গৃহকর্ত্তা তাঁহার সম্মুখে একটী বহুমূল্য, সুন্দর ফুলদানী ধারণ করেন। অতিথি অনেক বিনয়পূর্ব্বক বলেন তিনি এত সুন্দর ফুলদানীতে ফুল সাজাইবার উপযুক্ত নহেন। গৃহকর্ত্তা বেশী পীড়াপীড়ি করিলে তখন তাঁহাকে সেই ফুলদানীতেই ফুলবিন্যাস করিতে হয়, কিন্তু তাঁহার নজর রাখিতে হয় যেন তাঁহার বিন্যাস বেশী জমকাল হইয়া ফুলদানীর বাহারকে ঢাকিয়া না ফেলে। সাজান শেষ হইলে, আর সকল অস্ত্রাদি সরাইয়া রাখা হয় কেবল কাঁচিটী ফুলের এক পাশে থাকে; সেটী গৃহকর্ত্তার প্রতি শিল্পী অতিথির সবিনয়, মৌন অনুরোধ যে তাঁহার ফুল-বিন্যাসে যদি কোন ত্রুটি থাকে গৃহকর্ত্তা যেন তাহা সংশোধিত করেন। ছিন্ন পাতা, ডাল প্রভৃতি সব জঞ্জাল পরিষ্কার করা হইলে অন্যান্য অভ্যাগতেরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই ফুল-বিন্যাসের প্রশংসা করেন। বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে শিল্পী যদি খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি না হন, তাহা হইলে ফুলদানী হইতে সে ফুলগুলি উঠাইয়া দিয়া যান, কারণ "নিজের শিল্পচাতুর্য্যের চিহ্ন নাশ না করা শিল্পীর পক্ষে অত্যন্ত অবিনয়ের কাজ।" যেদিন সুগন্ধি পুষ্প ব্যবহারের নিষেধ আছে, সেদিন যদি গৃহকর্ত্তা ভুলক্রমে সুগন্ধিপুষ্প আনয়ন করেন, তাহা হইলে, শিষ্টাচারী অতিথি, কিছু না বলিয়া, ফুটন্ত ফুলগুলি বাদ দিয়া, শুধু গন্ধহীন কুঁড়ি লইয়া সাজান। একেবারে ডালপালাশুদ্ধ ফুল লইয়া আসা হয়, কেননা ছাঁটাছেঁটা ফুল আনিলে মনে হইতে পারে তাহা যেন পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

---

* জাপানি দেওয়ালের পর্দ্দা।

সসীম ও অসীম।

সসীমে অসীমে মিশি,
গাহিতেছে দিবানিশি,
এক মহা বিলাপের তান,
অসীম কাঁদিয়া গায়,
আমার নাহিক হায়,
এক তিল দাঁড়াবার স্থান ;

সসীম কাঁদিয়া বলে,
অনন্ত এ বিশ্বতলে,
মোর কেন এত ক্ষুদ্র প্রাণ ;
যুগ যুগান্তর ধরে,
দোহে কাঁদে দোঁহা তরে,
মাঝখানে চির ব্যবধান।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ধরার ধারা।

কি রকম এ দাবী তোমার,
সদাই চাহ ক্ষমা ক্ষমা,
একবার, হিসাব খুলে দেখোদেখি,
কতটা রেখেছ জমা !
বাকী কিছু রাখ নাক
পেলে পরের খুঁটিনাটি
তখন পদদাপে আঁৎকে ওঠে,
ঘরের মধ্যে পাষাণ মাটী।
তারা বুঝি গরীব দুঃখী,
কর্ম্মের ফল তাদের বেলা।
নবাবের আর কিসের জবাব,
আপনি কর লীলাখেলা ?
সবাই পাপী সবাই তাপী,
অপরাধী বিশ্বজোড়া,
তুমিই কেবল মাঝখানেতে
দাঁড়িয়ে আছ ফুলের তোড়া।
মনরে, একি ধরার ধারা,
কেউ চাহে না আপন পানে,
সবাই কেবল ভ্রূ বাঁকায়ে
পরের প্রতি দৃষ্টিহানে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী

পত্র।

আমরা পুনার ফ্যানসি ড্রেস বলে গিয়াছিলাম বই কি; এবার তোমাকে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিব বলিয়া আগের চিঠিতে আর সে সব কিছু লিখি নাই; কথাটা লুকাইবার কোন অভিপ্রায় ছিল এমন মনে করিও না।

বলিব কি, সে ভাই এক অপরূপ দৃশ্য! বসন্তের দিনে যেমন মলয়হিল্লোল ছোটে, চাঁদ উঠিলে যেমন জ্যোৎস্নার হিল্লোল খেলে তেমনি ভাই, উন্মুক্তপৃষ্ঠ, নগ্নকণ্ঠ রমণীয়-বেশ অপূর্ব্ববরণী সুন্দরীগণ অনুপম সুন্দর পুরুষদিগের সহিত মিলিয়া, সুসজ্জিত, আলোকখচিত গৃহ চতুর্গুণ আলোকিত করিয়া যখন ব্যাণ্ডের তালে তালে দলে দলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে থাকেন তখন সেই গৃহের চারিদিকে যেন একটা রূপের হিল্লোল বহিতে থাকে।

ফ্যান্সি ড্রেস বলে কাহারো একরূপ সাজ দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলেই প্রায় এক একটা কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ সাজ করিয়া থাকেন; কখনো না জানিয়া দুইজনে এক নাম গ্রহণ করিলেও উভয়ের সাজের কিছু না কিছু তফাৎ হইয়া পড়ে। মনে কর, দুজনেই সাজিয়াছেন রাত্রি, দুইজনেরি কাল কাপড়ের উপর তারার ফুল ঝক্ ঝক্ করিতেছে; কিন্তু একই স্থান হইতে কিছু আর দুজনে পোষাক প্রস্তুত করান নাই, সুতরাং কাহারো কাপড়ে বা ছোট ছোট তারা; কাহারো বড় বড়, কাহারো মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ঝক্‌ঝকে মুকুট, কাহারো মাথায় চাঁদ নাই; কাল ওড়নার উপর জরির তারাফুল শোভা পাইতেছে।

এইরূপে কেহ সাজিয়াছেন রাত্রি, কেহ উষা; উষায় মৃদু গোলাপাভ বা বেগুনাভ শুভ্রবেশ, তাহার উপর ইতস্ততঃ ফুলরাশি ফুটিয়াছে; মাথায় সোনালিরংয়ের মুকুট হইতে শুভ্রশ্বেত সূক্ষ্ম বস্ত্র ঝুলিতেছে। কেহবা বসন্ত সাজিয়াছেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বসন্তের ফুল বিকশিত। কেহ বা শুভ্র পুঁতিখচিত শুভ্র বস্ত্র পরিয়া তুষার সাজিয়াছেন। কাহারো বা জিপ্‌সি-রাণীর সাজ, হাতে ট্যাম্বারিণ, গলায় স্বর্ণমুদ্রার মালা, পায়ের উপরে ওঠা, খাট গাউন পরা। কেহ বা নর্ত্তকী বেশী; আজকাল দেশীয় নর্ত্তকীর অনুকরণে বিলাতে একদল নর্ত্তকী হইয়াছে; তাহারা অবশ্য ঠিক এদেশের নর্ত্তকীদের মত সাজ সজ্জা করে না, বা নাচে না; তবে তাহাদের ভাবভঙ্গী টাকে দখল করিয়া লইয়া তাহার উপর আপনাদের সুনিপুণ শিল্পচাতুর্য্য খাটাইয়াছে। তাহাদের হাতে গলায় গহনা; কাপড় ও দেশীয় ধরণে ফিরাইয়া ঘুরাইয়া বেশ সুচারু-রূপে পরা, নাচের ধরণটাও অবশ্য দেশী রকম; তবে আরো সুভাবভঙ্গীময় ও মনো-রম। ফ্যান্সি বলে যিনি নর্ত্তকী সাজিয়াছেন, তিনি অবশ্য নাচিতেছেন না। কাহারো

পারসী ললনার সাজ, কেহ জাপানী ললনার জাঁকালো কোর্ত্তা পরিয়াছেন। (জাপানী-বেশী রমণীটি কিছু স্থূলকায়, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অন্য একজন মহিলা নেপথ্যে বলিলেন, (She is too fat for that dress)। কেহ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কেহ পঞ্চদশ শতাব্দীর কেহ যোড়শ শতাব্দীর মহিলার সাজে সজ্জিত, যেমন কুইন মেরি, ডাচেস্ অব বাকিংহম্ ইত্যাদি। কাহারো বা সামান্য শুভ্রবস্ত্রের উপর হরতন বা রুইতনের ছক্কা পঞ্জার নক্সা, তিনি আর কি পঞ্জা বা ছক্কা সাজিয়াছেন। এইরূপ গৃহপূর্ণ বিচিত্র সাজ, অধিকাংশ সাজই সুদৃশ্য সুশোভন; এক একটি সাজে যে কত খরচ পড়িয়াছে তাহার ঠিক নাই; কেবল একরাত্রির জন্য; তাহার পর সম্ভবতঃ সে কাপড় আর ব্যবহারযোগ্য থাকিবে না; হইলে কি হয়, যখন সুকৌশলময় সাজসজ্জার প্রতিফলকে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যচ্ছটা অত্যুজ্জ্বল প্রভায় বিকীরিত হইতে থাকে; শতশত মুগ্ধ মানব স্তম্ভিত প্রসংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে যখন সেই রূপজ্যোতিকে অভিবাদন করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, তখন সে রাত্রি কি আর শুধু একটা রাত্রি; তখন সুবেশীর নিকট মুহূর্ত্ত অনন্তে পরিণত হইয়াছে। তবে এমনো ইংরাজ মহিলা আছেন যাঁহারা এক রাত্রির জন্য এরূপ ব্যয়ে কুণ্ঠিতচিত্ত; তাঁহারাই এসময়ে কেহ পঞ্জা ছক্কা বা দাসী বাঁদি সাজেন। নহিলে সকল সুন্দরীগণেরই মনোগত অভিপ্রায় কিসে তিনি অন্যের সাজের উপর টেক্কা দিবেন।

পুরুষদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই আমাদের দেশীয় সাজ পরিয়াছেন, তবে বাঙ্গালী বাবুর সাজ ভাবিও না; চীনেম্যানের সাজই বেশীর'ভাগ; কেহবা সম্ভ্রান্ত চীন, কেহবা গরীব চীন, কেহ কাবুলি, কেহ নবাব, কেহ রাজা। একজন সিদ্ধীবেশীর চমৎকার অনুকরণ হইয়াছিল, রংয়েএও ইংরাজ বলিয়া চেনা যায় না; এমন রং মাখিয়াছেন, ঠিক সিদ্ধি দেখাইতেছে। একজন সমস্ত গায়ে ছবির কাগজ মারিয়া বিজ্ঞাপন সাজিয়াছে, একজন ভাঁড় সাজিয়া সকলের সঙ্গে ভাঁড়ামি করিয়া বেড়াইতেছে। একজন লাইট হাউস সাজিয়াছেন, তাঁহার মাথায় লাইট হাউসের মত ক্ষুদ্র স্তম্ভ, তাহার মধ্যে প্রজ্জলিত দীপ। সেই স্তম্ভ মাথায় করিয়া কিরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, ইহাও আশ্চর্য্য, তবে তিনি নাচেন নাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত ব্যপার একজনের সয়তান সাজ। মুখে কালী, মাথায় শিং এবং পিছনে এক গুটান ল্যাজ। দেখিলে সত্যই শিহরিয়া উঠিতে হয়, আমি ভাবিতেছিলাম তিনি নাচের সঙ্গী পাইলেন কিরূপে; ইহা ছাড়া চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, যোড়শ শতাব্দীর নাইট, দস্যু রাজা, প্রভৃতির সাজে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ব্যাণ্ড বাজিতেছে, আর এই সকল বিচিত্রবেশী সুন্দর সুন্দরীগণ ধীর চরণবিক্ষেপে মসৃণ-কাষ্ঠ-গৃহতল তালে তালে ঘর্ষণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যেমন বাজনা থামিল তাঁহারাও থামিলেন; এবং মহিলাগণ পুরুষের বাহুতে হস্ত ন্যস্ত করিয়া চন্দ্রাতপাচ্ছন্ন পানাহার গৃহে গমন করিলেন। কোন দুইটিবা মুক্ত আকাশতলে জাপানিক ল্যাণ্টার্ন শোভিত কানন মাঝে, সুদৃশ্য সুকোমল শোভায় বসিয়া মৃদু মৃদু কথোপকথন আরম্ভ

করিলেন। আবার ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, যিনি যেখানে ছিলেন দ্রুতবেগে নাচঘরে আসিয়া পৌছিলেন, যাঁহার সহিত যাঁহার নাচিবার কথা আছে দুজনে পাশাপাশি হইয়া দাঁড়াইলেন, আবার নাচ আরম্ভ হইল। নাচঘরের দুই পার্শ্বে উচ্চ মণ্ডপ; যাঁহারা নাচেন না, শুধু দর্শক, তাঁহারা সোপানারূঢ় হইয়া সেই খানে আসিয়া বসিয়াছেন; আমরাও বসিয়াছি, সম্মুখের উত্তেজনা, উন্মত্ততা, ঘূর্ণ্যমান অপূর্ব্ব দৃশ্যের দিকে অবাক নেত্রে চাহিয়া ভাবিতেছি, অসভ্য ভুটিয়া নরনারীর নাচে, আর এই সুসভ্য মহামহিমার্ণব ইংরাজ নরনারীর সতাল চরণ বিক্ষেপে ভাবগত রুচিগত প্রভেদটা এমনি কি?

অবশ্য মর্ত্তের লোক তারকার সহিত দীপালোকেরই তুলনা করিয়া থাকে, আমরা বঙ্গনারী, তাই বুঝি আমরা মনে করি ওরূপ উন্মত্ত সুখ উন্মত্তভাব-প্রণোদিত আমোদ সুরুচিজনক সুখের বিরোধী!

ইহারই কিছুদিন পরে একটা (Flower dress ball) ফুল বেশে নাচ হইয়াছিল, কিন্তু আমরা তাহা দেখিবার জন্য পুনায় অপেক্ষা করি নাই।

কেবল বল নহে, পুনার ইংরাজ সমাজ তখন নানারূপ আমোদ প্রমোদ ভরপূর। গভর্ণর তখন পুনায় তাই পুনার তখন Season চলিতেছিল। আজ গভর্ণমেণ্ট হাউসে বল, কাল সিভিলিয়ানদের ডিনার, পরশু মাঠে ঘোড়দৌড়, তরশু নদীতে বাচ খেলা ইত্যাদি। যতদিন না গভর্ণর মহাবালেশ্বরের পাহাড়ে যান ততদিন পুনায় এইরূপ আমোদের স্রোত বহিতে থাকে। ইংরাজের মত অদম্যোৎসাহ, সবল শির, উদ্দামতেজ নরনারী পুঙ্গবেরাই এরূপ অবিশ্রান্ত আমোদ, অশ্রান্ত অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি না মানিয়া উপভোগ করিতে পারেন, ক্ষীণজীবী আমরা অল্প পরিশ্রমেও যেমন কাতর হইয়া উঠি, অধিক আমোদেও তেমনি হাঁফাইয়া পড়ি।

সোলাপুরে আসিবার আগে একদিন কেবল আমরা ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলাম। সে কি ভয়ঙ্কর উত্তেজনাময় দৃশ্য! শ্বেত নীল পীত হরিৎ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের পরিচ্ছদধারী ঘোড়সওয়ারগণ চিহ্ন স্থান হইতে একত্রে অশ্বচালনা, করিয়া তীব্র বেগে লক্ষ্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের সেই প্রাণপণ অশ্ব চালনা, নিজের জীবনের প্রতি, অশ্বের জীবনের প্রতি মায়া মমতা বিহীন উন্মত্ত ভাব, আর কষাহত পদাহত, সফেন মুখ, উৎগ্রীব, মৃত্যুভয়হীন অশ্বগণের পবন গতি সত্ত্বেও এই একজন অগ্রগামী পরক্ষণেই অন্যজন অগ্রগামী অবশেষে মুহূর্ত্তের ফেরে বা ভাগ্য ফেরে চুলের তফাতে মাত্র এক জনের জয়, অন্য সকলের হৃদয়ভেদী পরাজয়, কেহ বা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত; এই ঘোড়ার উপর সে তাহার সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিল এই সকল দেখিতে দেখিতে হৃৎকম্পিত হইতেছে, চক্ষু আপনা হইতে বার বার বুজিয়া আসিতেছে, এত উন্মত্ততাময় উত্তেজনাময় বহুজনের হৃদয় বিদারক দৃশ্য চক্ষু যেন আর সহিতে পারে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ দেখিয়া স্ত্রীলোকের মনের ভাব কিরূপ হয় সেই দিন ঘোড়দৌড়

দেখিয়া তাহা আমি বুঝিয়াছি। স্ত্রীলোকের পলিটিক্যাল অধিকার পাওয়া উচিত কি না, তাহারা ইহা পাইবার উপযুক্ত কিনা আজকাল ইয়োরোপে এই এক তর্ক উঠিয়াছে। বিপক্ষসভাবলম্বীদিগের একটি যুক্তি স্ত্রীলোকেত কখনো সংগ্রাম করিতে পারিবে না, ইহাতে যখন তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ তখন রাজনৈতিক অধিকারে তাহারা দাবী করে কি বলিয়া? ইহার উত্তর স্বরূপ অন্যপক্ষেরা বলেন, কত স্থানে স্ত্রীসৈন্য ছিল; কত স্ত্রীলোক পূর্ব্বে যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, অধিকার দিলে স্ত্রীলোকে কেনই বা সংগ্রাম করিতে না পারিবে!

কোন্ পক্ষের যুক্তি বলবত্তর তাহা ভবিষ্যতের কার্য্যক্ষেত্রে মীমাংসিত হউক, বা চিরদিন অমীমাংসিত থাকুক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু সেই দিন হইতে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে এই যে, বাক্‌যুদ্ধে সুনাম লাভ করিলেও বাহুযুদ্ধ স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বা কর্ম্ম নহে। তবে এজন্য তাঁহাদের দুঃখিত বা নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলের দিন দিন যেরূপ প্রভাব বাড়িতেছে, ধারাল বুদ্ধির নিকট ধারাল অস্ত্রকেও যেরূপ হৃতমান হইতে দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুরুষদিগের আশা ভরবা যে সমূলে নির্ম্মূল, নিঃসঙ্কোচে এরূপ দৈববাণী করা যায়।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বীরমালা। প্রাচীন ও আর্য্যবীরগণের ধারাবাহিক বিবরণ। শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল প্রতি সংখ্যা ✓০ আনা।

গ্রন্থকার পুস্তকখানি অংশে অংশে প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আশা করি তিনি সমগ্র গ্রন্থ খানি সুচারু রূপে সম্পূর্ণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উপকার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি সুদূর প্রসারিত। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে যে সকল যোদ্ধ্‌পুরুষ অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহাদেরি জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে; জাতীয় ইতিহাসে যে যে মহাত্মাগণ, জীবনের যে কোন বিভাগেই হোক, প্রকৃষ্ট স্থান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরি জীবনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইবে। গ্রন্থকার জগতের বীরগণকে তিন শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। প্রথম, রাজনৈতিকবীর—যোদ্ধা, রাজা ও রাজনীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ; দ্বিতীয়, সাহিত্যবীর—গণিতবিৎ, বৈজ্ঞানিক, কবি প্রভৃতিগণ; তৃতীয়, ধর্ম্মবীর,—ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, সংস্কারক, দার্শনিক ও ধর্ম্মনীতিবিশারদ ব্যক্তিগণ। এইরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর জাতীয় বীরগণের সমগ্র

জীবন একত্র লিপিবদ্ধ করিতে বহু যত্ন, বহু পরিশ্রমের আবশ্যক। পাশ্চাত্য দেশে কেহ এরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিলে অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সহায়তা করিয়া থাকেন, কিন্তু এদেশে একের উপর সমস্ত নির্ভর সুতরাং লেখক তদ্দ্বারা এই অগাধ পরিশ্রমের জন্য দেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন। বলা বাহুল্য ইহা সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের এক খানি উজ্জ্বলতম রত্নস্বরূপ হইবে। দুই একটি বিষয়ে লেখকের সহিত আমাদের মতভেদ আছে, তাহার সংক্ষেপ উল্লেখ করা যাইতেছে।

লেখক বলিতেছেন, "মানব অবস্থার দাস ; বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতির অবস্থার উপরেই মানবের চরিত্র সম্পূর্ণ নির্ভর করে। জল, বায়ু, আহার্য্য ও আবাস ভূমি বাহ্য প্রকৃতির তিনটি প্রধান সাধন, অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির প্রভাব হইতেই জনিত।" অবস্থার উপর—চতুষ্পার্শ্বস্থ বহিঃ ও অন্তরাবস্থার উপর মানব চরিত্রের গঠন কতক পরিমাণে নির্ভর করে সত্য, কিন্তু মানবের অন্তর্নিহিত নিজস্ব প্রাকৃতিক শক্তিই যে এ ক্ষেত্রে প্রধান কার্য্যকারী তাহার আর সন্দেহ নাই। আমের আঁটি রোপণ করিলে তাহা অবস্থার সাহায্যে বৃদ্ধি পাইয়া ফল ধারণ করে সত্য ; কিন্তু কোন রূপ অবস্থার প্রভাবে কি উহা জাম গাছে পরিণত হইতে পারে? অবস্থাভেদে যেমন মানব বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হয় তেমনি প্রকৃতি ভেদেও মানব-চরিত্র বিভিন্ন ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

২য়। জাতিভেদ সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন, "ভারতে জাতিভেদ ধর্ম্মমূলক, অপর দেশে অর্থমূলক, একটি সাত্বিক, অপরটি তামসিক। একটির উদ্দেশ্য সমাজ রক্ষা, অপরটির উদ্দেশ্য সমাজধ্বংস। ভারতীয় আর্য্যের জাতিভেদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরিভাগে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত, ইংরেজ প্রভৃতির জাতিভেদ এখনো ক্ষণস্থায়ী সামান্য উপভিত্তির উপর ন্যস্ত, অদ্যাপি তাহার উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হয় নাই, তাহার নীতি পরিপক্কতা লাভ করে নাই, নানা কারণে তাহা এখনো একটি দুরূহ সামাজিক সমস্যারূপে রহিয়াছে, কতদিনে তাহার মীমাংসা হইবে অনুমান করা কঠিন।" আমাদের বোধ হয় লেখক স্বদেশগৌরবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া একটু বেশী পরিমাণে একদিকে ঘেঁসিয়া পড়িয়াছেন। ভারতের জাতিভেদ অবশ্য কতক পরিমাণে ধর্ম্মমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে তাহা নহে। তাহা হইলে সে জাতিভেদ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ এই দুই বর্ণে বিভক্ত হইত ; একজাতি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতেন এবং অপর জাতি সাংসারিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধনে যত্নশীল থাকিতেন। কিন্তু তাহা না হইয়া যখন পূর্ব্বকালেও চারিবর্ণ ছিল তখনই বুঝা যায় যে ব্রাহ্মণেতর বর্ণভেদ কেবলমাত্র ধর্ম্মমূলক নহে অর্থ ও সামাজিক কার্য্যমূলক বটে। আর বর্ত্তমানে যে অসংখ্য জাতিভেদ লক্ষিত হয় তাহা কি মুহূর্ত্তের জন্যও ধর্ম্মমূলক বলা যাইতে পারে?

লেখক ভৃগুপদানুসরণ করিয়া বলিতেছেন বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই, পূর্ব্বে ব্রহ্মা যখন এই জগৎ স্থাপিত করিলেন, তখন ইহা কেবল মাত্র ব্রাহ্মণময় ছিল; তখন বর্ণভেদ ছিল না। ক্রমে সেই এক ব্রাহ্মণ জাতিই কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণে পরিণত হইয়াছেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণ ও ক্রোধ স্বভাব, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা যুদ্ধাদি সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারাই লোহিতাঙ্গ হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িলেন। যাহারা গো সমূহ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া কৃষিজীবী হইল, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যাহাদের আর আসক্তি রহিল না, তাহারা পীতবর্ণ হইয়া বৈশ্যত্ব লাভ করিল, এবং যে সকল দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যা রত হইল, সকল প্রকার কর্ম্ম দ্বারাই যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তাহারা শৌচ হইতে পরিভ্রষ্ট এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শূদ্র হইয়া পড়িল! এসম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই এখনো কি এইরূপ অব্রাহ্মণোপযোগী কার্য্য করিলে কাহাকেও জাতিচ্যুত হইতে হয়? এখন ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই এরূপ এবং ইহাপেক্ষাও জঘন্যতর কার্য্য ব্রাহ্মণকে করিতে দেখা যায় কিন্তু তাঁহাদের কয় জন জাতিচ্যুত হন! আমাদের হাড়ে হাড়ে নীচ ও জঘন্যভাব প্রবেশ করিয়াছে; এখন কয়জন বা আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শাস্ত্র মানিয়া কাজ করেন? যাঁহারা চাল কলা বাঁধেন এবং ধর্ম্ম ব্যবস্থা দেন তাঁহাদের মধ্যে বহুসংখ্যক দুরাচরণের কথা কাহার না কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে! ধর্ম্মাধিকরণে ঈশ্বর সমক্ষে শপথে কত ব্রাহ্মণ না জ্ঞাতসারে আইনের মিথ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন! আমরা যদি বুকের উপর হাত রাখিয়া নির্ভয়ে, আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অপরকে জাতিচ্যুত করি তাহা হইলে আধুনিক হিন্দুর ধর্ম্মমূলক জাতি কি কথাতেও থাকিতে পারে? আর এক কথা লেখক ভারতে বর্ণভেদের তিনটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। "প্রথম, ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা; দ্বিতীয়, প্রজাবৃদ্ধি বা যুগ ধর্ম্ম; তৃতীয়, জীবন সংগ্রাম।" এ সম্বন্ধে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে এই তিনটি কারণের সংযোগেও কি পাশ্চাত্য জাতিভেদ আমাদের নিকট বোধগম্য হয় না; সর্ব্বদেশের জাতিভেদের সারমর্ম্ম উপরোক্ত কয়টি কারণ অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। তবে তাহাদের জাতিভেদ প্রথার গুণের ইতর বিশেষ আছে। ধর্ম্মমূলক জাতিভেদে বহুবিধ গুণ আছে সত্য কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিভেদের কি কোনই গুণ নাই? উহা কি কেবলি দোষপূর্ণ? এমন কথা কোনমতেই বলা চলে না। ধর্ম্মমূলক জাতিভেদে জ্ঞান বুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতার আদর থাকে, সাধারণের চক্ষের সমক্ষে সর্ব্বক্ষণ অর্থ ও সাংসারিক উচ্চতা ব্যতিরেকেও জীবনের অন্য উচ্চ আদর্শ থাকে, এবং এই 'মহৎ আদর্শকে তাহারা আপনাপন প্রবৃত্তি ও অবস্থানুসারে স্বস্ব জীবনে কার্য্যতঃ খাটাইতে পারে সুতরাং ইহা দেশ ও সমাজের পক্ষে সামান্য লাভ নহে। তবে পাশ্চাত্য জাতিভেদে যে জীবন্তভাব আছে, এক শ্রেণী হইতে শ্রেণ্যন্তরে যে গতায়াত সম্বন্ধ আছে তাহা দ্বারাও কি জাতি ও সমাজের অশেষবিধ উপকার সাধিত হয় না? সমাজকে যদি শরীর

যন্ত্রভাবে দেখা ন্যায্য হয় তবে অপ্রাকৃতিক দুর্ভেদ্য শ্রেণী বিভাগ থাকিলে ত আর দেহ-তন্ত্রের কার্য্য সম্যক্‌রূপে চলিতে পারে না ?

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অনেক সময়ে ধরাবাঁধা নিয়মের দ্বারা জাতির মোটামুটি বহু উপকার সাধিত হয়, কিন্তু তাহাতে আবার অনেক সময় ব্যক্তি-বিশেষের মহত্ত্ব বিকাশের পক্ষেও বিশেষ মাত্রায় প্রতিবন্ধক ঘটে। ব্যক্তি বিশেষের মহত্ত্ব বিকাশ হইলে অবশ্য তাহাতে সমাজেরও উপকার বই অপকার নাই, আর এই উপকার সাধনের পথ প্রতিরোধিত হয় বলিয়াই ধরাবাঁধা সামাজিক নিয়মের দ্বারা সমাজের ক্ষতি হয়। এরূপ না হইলে কাহারো কিছু বলিবার থাকিত না, আর এইরূপ হয় বলিয়াই সমাজ নিয়মেরও এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে ও এই কারণেই সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে ছাড়ছোড় দিয়া দণ্ডবিধান করিতে হয় নচেৎ পক্ষে সমাজ-শরীর শীঘ্রই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। পূর্ব্বকালে যে জাতিভেদ অপেক্ষাকৃত শিথিল ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সেকালের সমাজের জীবনী শক্তি সবল ছিল তাই সে নানারূপ অনিয়মকেও সহজে পরিপাক করিয়া লইতে পারিত এখন আর সমাজ শক্তির সেরূপ বল নাই তাই অজীর্ণরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় তাহাকে এত নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়।

মিহির। মাসিক পত্রিকা। সেখ অব্দের রহিম সম্পাদিত। মিহির পড়িয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইলাম। যদিও ইহার ভাষা বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষা নহে মুসলমানী বাঙ্গালার রেষ যুক্ত, তথাপি প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই পঠনীয়। আলহামরা উপন্যাসটি উপাদেয়; পারস্য ভাষা হইতে অনুবাদিত প্রবন্ধগুলি ও প্রীতিজনক। এইরূপ অনু-বাদে বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় মুসলমানগণ যে বঙ্গভাষার এতদূর আদর করিতেছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়।

আয়ুর্ব্বেদ প্রবেশ। শ্রীরামচন্দ্র যোগবিশারদ কবিরাজ প্রণীত। বইখানি সকলের ঘরে ঘরে রক্ষিত হওয়া উচিত। আমাদের বৈদ্যশাস্ত্রের মুষ্টিযোগ যে কিরূপে উপকারক তাহা হিন্দু মাত্রেই বোধ হয় জানেন অথচ আজ কাল অতি অল্প লোকেই মুষ্টিযোগ প্রকরণ নিয়মাদি জ্ঞাত আছেন। নরনারীর শরীরতত্ত্ব স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে বৈদ্যশাস্ত্রে যাহা কথিত আছে, আয়ুর্ব্বেদ প্রবেশে তাহা সহজ পরিষ্কার ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কত সামান্য গাছ গাছড়ায় কত উৎকট পীড়ার শান্তি হইতে পারে তাহা এই পুস্তক খানিতে জানিতে পারা যায়।

তরুবালা। মধুর রসাশ্রিত সামাজিক নাটক। শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত। এ নাটক খানি থিয়েটারে অভিনীত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার সবিস্তার বর্ণনা অনাবশ্যক। সংক্ষেপে নাটকের গল্পটি এই :—ইংরাজি পুস্তকে "লভ" পড়িয়া পড়িয়া একজন নব্য বঙ্গের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘরে তাঁহার রূপবতী, গুণবতী, সাধ্বীসতী স্ত্রী, তিনি তাঁহার

মুখ দর্শন করেন না; তাঁহার বিশ্বাস বাপ মা যাহার সহিত বিবাহ দিয়াছেন তাহার সহিত কি স্বর্গীয়, পবিত্র, কবিতাময়, রোমাণ্টিক্ লভ হয়! তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের ভিখারী হইয়া তাহার অনুসন্ধানে নির্গত হইলেন, প্রেমও মিলিল। কিন্তু অবশেষে জ্ঞান জন্মিল, তাহাতে বিশুদ্ধতা নাই এবং ঘরের স্ত্রীতেও প্রেম মিলে। তখন তাঁহার মতিগতি ফিরিল। নাটক খানি সময়োপযোগী বটে, ইহার অভিপ্রায় ভাল, রচনা ভাল, ভাষা ভাল, ইহাতে হাসি খুসীও যথেষ্ট পরিমাণে আছে, লেখক রচণাকুশল, রসজ্ঞ। কিন্তু ইহার দোষ এই ইহা সুমার্জ্জিত রুচিপূর্ণ, নহে। দু একটি দৃশ্যের স্থানে স্থানে দু একটি অভব্য কথায় বই খানির সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে। নাটককার ইহার উত্তরে এই বলিতে পারেন সাধারণকে আমোদ দেওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুতরাং সাধারণের নিকট যেরূপ রুচির আদর তাহাই তাঁহাদের রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। অবশ্য রঙ্গভূমিতে এই সকল বিকৃত রুচিপূর্ণ নাটকের অভিনয়ে দেশের সাধারণ শোচনীয় রুচির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিলে অল্পে অল্পে ইহার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে ইঁহাদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা। তাঁহারা যদি কেবল মাত্র একটু সাহসের উপর নির্ভর করিয়া এই ক্ষমতার যথাব্যবহারে অভিনেয় নাট্য সম্বন্ধে সুরুচির অবতারণা করেন ত তাঁহাদের দ্বারা দেশের একটি মহৎ কার্য্য সাধিত হয়।

রাজা বাহাদুর। শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহা একখানি প্রহসন নাট্য। ইহাতে হাসিবার উপকরণ যথেষ্ট আছে তবে ইহাতেও মার্জ্জিত রুচির অভাব।

বিলাপ। বিদ্যাসাগরের স্বর্গারোহণ। ইহাও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রণীত। বইখানিতে বিদ্যাসাগরের গুণাবলী বেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, বইখানি পড়িতে কোনরূপ খট্‌কা লাগে না। তবে স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ষ্টেজে নকল মূর্ত্তি ধরিয়া নকল বিদ্যাধরীদিগের সহিত তার সংযুক্ত আসনে বারম্বার শূন্য পথে উঠিতেছেন,' আর নামিতেছেন ইহা খুব মনোহারী দৃশ্য নহে বলিতে হইবে।

নবীনা জননী। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, প্রণীত। লেখক বোধ হয় অনেক গুলি ইংরাজী নীতিগ্রন্থ পড়িয়া মনে মনে নবীনা জননীর একটি আদর্শ প্রতিমা গড়িয়াছেন। কিন্তু তাহাকে আমাদের দেশের উপযোগী করিতে পারেন নাই। তার বিদেশী হাবভাব প্রতিপদে ধরা পড়ে, বাঙ্গালা দেশের জল বায়ুর সহিত সে এখনো নিজেকে বেমালুম মিশাইয়া ফেলিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে নবীন লেখকের কল্পনার অসংযততা প্রকাশ পায়। কিন্তু লেখকের ভাষায় দখল আছে, এবং আশা হয় ইনি ভবিষ্যতে এক জন সুলেখক হইতে পারিবেন।

মথুরায় বৌদ্ধাধিকার।

প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই হিন্দু-দিগের প্রাচীন ও প্রধানতম পবিত্র তীর্থ সমূহেই বুদ্ধদেব স্বধর্ম্ম প্রচারে অধিক-তর যত্নবান হইয়াছিলেন। ইহার দুইটী উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথমতঃ এই সকল স্থান বহুজন-পূর্ণ জনপদ; দ্বিতীয়তঃ তীর্থস্থানে, ধর্ম্মের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ আর অন্য কোন স্থলেই নহে। কোন ধর্ম্মপ্রচারক স্বীয় নব প্রচারিত ধর্ম্মের দৃঢ় ও তীক্ষ্ণ যুক্তিগুলি বিশেষরূপে সাধারণের গ্রহণীয় করিবার ইচ্ছা করিলে এই সকল স্থানেই প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণের সহিত তর্কাদি আরম্ভ করিয়া থাকেন। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় বুদ্ধদেব হিন্দু ধর্ম্মের সেই বিহ্বল অবস্থায় যে যে স্থানে নিজেও না উপস্থিত হইয়াছিলেন তথায় নিজ শিষ্য প্রেরণ দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মপোষক রাজন্যবর্গও ঐ সকল স্থানে প্রচারক প্রেরণ বা উপনিবেশ, বিহার ও মঠাদি স্থাপন করিয়া ভক্ত ধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।

সকল স্থলেই প্রাচীন প্রত্নতত্ত্বের সম্মুখে অতীত কালের একটী কৃষ্ণবর্ণের দৃঢ় যবনিকার আবরণ। এ আবরণ সহজে উন্মোচিত হয় না, অনেক চেষ্টায় আশে পাশে উঁকি মারিয়া যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই সংগ্রহকারকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। এরূপ উপায়েও যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা হয়ত বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন। কিন্তু যাঁহারা প্রাচীনত্বের বিশেষ পক্ষপাতী তাঁহারা ইহাতেই যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করেন। আমরা এই প্রকার অনির্দ্দিষ্ট উপায়ে চেষ্টা করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি তাহাই এই প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়। পরে গয়া ও বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকার কালের ইতিহাস জানিতে হইলে বড়ই কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়িতে হয়। এই সময়ে সমাজের অতিশয় উন্নতির অবস্থা; ভারতীয় প্রাচীন রাজধানী ও নগর সমূহ এই সময়ে উন্নতির জ্যোতিতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কোন সমসাময়িক পণ্ডিতই ইহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যান নাই। এই সকল সময়ের ঘটনাবলী-প্রকাশক সমাজের চিত্রস্বরূপ কাব্য ও নাটকাদির মধ্যে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতে আবার কল্পনার কালছায়া। সুতরাং এই সময় ছাড়িয়া আমাদিগকে আরও পরবর্ত্তী সময়ের মধ্যে এই বৌদ্ধপ্রধান কালের ইতিবৃত্তের অনুসন্ধান করিতে হয়।

স্বদেশীয়দিগের অপেক্ষা দুইজন বিদেশীয় আসিয়া সেই প্রাচীন কালের ইতিহাস সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ইতিবৃত্তের সম্বন্ধে অনেক সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের নাম ফাহিয়ান ও হিউএন সাঙ্গ। ইহারা চীন দেশীয় পরিব্রাজক। ইহারা প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির ও পতনের অবস্থার মধ্যে যেখানে যাহা কিছু দেখিয়া গিয়াছিলেন সকলই লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিবৃত্তের অনেকটা উদ্ধারের পথ করিয়া গিয়াছেন।

ফাহিয়ান খৃঃ ৪০০ শতাব্দীতে ভারতের প্রধান প্রধান নগরীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন গোঁড়া বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপত্তি স্থান ভারতক্ষেত্র তাঁহার পক্ষে অতীব পবিত্র। পালেষ্টাইন বা জেরুজালেম যেমন ধার্ম্মিক খৃষ্টানের পবিত্র তীর্থ ফাহিয়ানের পক্ষে এই বিশাল জম্বুদ্বীপ—বুদ্ধের জন্ম ও কার্য্যক্ষেত্রসমূহ তদ্রূপ পবিত্রকর। কিন্তু তিনি যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে গোঁড়ামীর ও একদেশদর্শিতার গন্ধ পাওয়া যায়।

ফাহিয়ান মথুরায় একমাস বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে সেই সময়ে নিজ মথুরা নগরীতে ও যমুনার অপর পার্শ্বস্থ স্থান সমূহে প্রায় কুড়িটী "বৌদ্ধাশ্রম" (Monastereis) ছিল এবং এই সমস্ত আশ্রমে প্রায় তিন সহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিত। এতদ্ব্যতীত ছয়টী স্তূপ ছিল এবং ইহার মধ্যে প্রধান তিনটী বুদ্ধের প্রধান শিষ্য ও প্রচারক সারিপুত্রের নামে উৎসর্গীকৃত। "আনন্দ" বলিয়া একজন প্রচারক ছিলেন তিনি স্ত্রীজাতির নিকট পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার নামেও উৎসর্গীকৃত একটী মঠ ছিল। আর তৃতীয়টী "মুদ্গল পুত্রের" নামে, আর বাকী তিনটী "অভিধর্ম্ম", "সূত্র" ও "বিনয়"—এই তিনটী বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের নামে উৎসর্গীকৃত ছিল।*

* এই তিনটী ধর্ম্ম শাস্ত্রের সংযুক্তাখ্যা ত্রিপেটক। "অভিধর্ম্ম", "সূত্র" ও "বিনয়" এই তিন গ্রন্থকে "ত্রিপেটক" বলে। বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থ প্রচার করেন নাই—অথচ শুনিতে পাওয়া যায় পৃথিবীতে প্রায় ৮০ সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচারিত আছে। ইহার মধ্যে নয় খান গ্রন্থ "নবধর্ম্ম" নামে কথিত—ইহাদের নাম—

অষ্টসাহস্রিক।	লঙ্কাবতার।	সুবর্ণ প্রভাস।
সমাধিরাজ।	কারণ্ডব্যূহ।	দশভূমীশ্বর।
সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক।	তথাগত গুহ্যক।	ললিত বিস্তর।

এই সমুদয় ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থ আবার সূত্র, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, দান, নিদান, ইত্যুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, অভিধর্ম, অবদান ও উপদেশ এই দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি অধিকাংশই পালি ভাষায় রচিত। কেবল মাত্র কয়েকখানি (তাহাদের নাম ও সংখ্যা আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই) সংস্কৃত ভাষায়। জনপ্রবাদ

ইহার পর হিউয়ান সাঙ্‌ ভারত ভ্রমণ করিতে আইসেন। তিনি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ষোড়শ বর্ষ ব্যাপিয়া ভারতে ছিলেন। ইহার পর তিনি দেশে ফিরিয়া গিয়া চীন সাম্রাজ্যের বিশেষ আজ্ঞায় "প্রাচ্যদেশের ইতিবৃত্ত" বলিয়া এক বৃহৎ গ্রন্থ লিখেন। ইহাতে প্রায় ১২৮টী রাজ্যের ইতিবৃত্ত ছিল। এই রাজ্যগুলিতে তিনি যে নিজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এরূপ নহে, বিবরণ সংগ্রহকালে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রমণকারী ও চলিত কিম্বদন্তীর উপরও তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ইহাতে মথুরার এই প্রকার বর্ণনা আছে—"মথুরার পরিবেষ্টন ২০ লি বা চার মাইল ছিল, ইহাতে ২০টী বৌদ্ধাশ্রম এবং ২০০০ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করিত। ইহার মধ্যে ৫টী হিন্দুদেবদেবীর মন্দিরও ছিল। এতদ্ব্যতীত শাক্যমুনির শিষ্যগণের * সম্মানার্থে অশোক রাজা কর্ত্তৃক আরও কতকগুলি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই সময়ে যখন বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত কোন সংযম, উপবাস বা ব্রতাদি হইত তখন নগরস্থ সমস্ত বৌদ্ধ একত্রিত হইয়া এই সমস্ত স্তূপের নিকট উৎসবাদি সম্পন্ন করিত। এই সময়ে গন্ধ দ্রব্যের (ধূপ ও গুল্‌গুলাদি) সুগন্ধে ও স্তূপাকার মাল্য ও পুষ্পের আয়োজনে সেই স্থান নন্দন কাননের ন্যায় হইয়া পড়িত। † নগর হইতে চার পাঁচ "লি" দূরে একটি পর্ব্বত গাত্রে কয়েকটি গুহা ছিল, জনপ্রবাদ এই যে বিখ্যাত প্রচারক "উপগুপ্ত" তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই গুহার কিছু দূরে একটী সরোবর ছিল এই সরোবরটী সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে যে বুদ্ধদেব একদিন চিন্তাযুক্ত ভাবে এই সরোবর তীরে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময়ে এক বানর আসিয়া তাঁহাকে কতকটা মধু

এই যে বুদ্ধদেব নিজে সঠিক সংস্কৃতে কোন উপদেশ দেন নাই—তাঁহার উপদেশ সমস্ত প্রাকৃত, পালী ও মাগধী ভাষায় বিতরিত হইয়াছিল। শুনিতে পাই সেই সময়ে বুদ্ধাজ্ঞা সকল সংস্কৃতে অনুবাদিত হওয়াও নাকি নিষিদ্ধ ছিল। যে "ত্রিপেটক" সম্বন্ধে বলিতেছি তাহাও পালি ভাষায় গ্রথিত। ইহা বৌদ্ধদিগের মূলগ্রন্থ। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ব্রাহ্মণ-শিষ্য কাশ্যপ "অভিধর্ম্ম"; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ "সূত্র" ও তাঁহার শূদ্র-শিষ্য উপালী "বিনয়" গ্রন্থ রচনা করেন। বিনয় নামক গ্রন্থে শাক্যের জীবনী, ও বৌদ্ধদের সৎকর্ম্ম পদ্ধতি, "সূত্র" শাক্যের উপদেশ, ও "অভিধর্ম্মে" মুক্তি ও তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ আছে। "ত্রিপেটক" শব্দের অর্থ—"ত্রি" তিন, "পেটক" সিন্দুক, অর্থাৎ তিনটি সিন্দুক যাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সমস্ত কথাই আছে।

* ইহাদের নাম—সারিপুত্র, মোদ্গল্যায়ন, পূর্ণ, মৈত্রেয়ানিপুত্র, উপলী, আনন্দ, রাহুল, মঞ্জুশ্রী।

† বৎসরে তিনবার এই প্রকার উপবাস মহোৎসব হইত। ইহার মধ্যে প্রথমটী বৈশাখী পূর্ণিমায়, দ্বিতীয়টী ভাদ্রী পূর্ণিমায় ও শেষটী পৌষী পূর্ণিমায় হইত।

উপহার দিল। বুদ্ধদেব তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিলেন তুমি ইহাতে জলমিশ্রিত করিয়া সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকগণের মধ্যে বিতরণ কর। বুদ্ধের প্রসন্নতায় বানরের এতদূর উল্লাস জন্মিল যে সে এক লম্ফে সরোবরে গিয়া পড়িল এবং তাহাতেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পরজন্মে বুদ্ধের প্রতি ভক্তির জন্য এই বানর মনুষ্য যোনি পরিগ্রহণ করিয়াছিল। এই পুষ্করিণী তীরে কপিপ্রবরের স্মরণার্থে সেই সময়ে এক একটী মেলা হইত। এবং নানা স্থান হইতে মধুবিক্রেতারা আসিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে মধু বিতরণ করিত।

এই পুষ্করিণীর কিছু উত্তরে একটী বন ছিল সেই বনে অনেকগুলি স্তূপও ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় এই স্থলে চারিজন পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধ ও সহস্র বুদ্ধ শিষ্য ও প্রায় দ্বাদশ উপশিষ্যগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

"ললিত বিস্তর" গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন গ্রন্থ। বুদ্ধ সম্বন্ধে জানিতে হইলে ইহার উপর যতদূর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় এরূপ আর কিছুরই উপর নহে। ইহাতে শাক্য বা শেষ বুদ্ধের জীবনের সমস্ত ঘটনা যথাসাধ্য সুশৃঙ্খলতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি উরুবিল্ল (বুদ্ধগয়া) বারাণসী মগধ প্রভৃতি দেশে যে ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহারও অনেক ইতিবৃত্ত ইহাতে আছে।* বুদ্ধ সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বারাণসীতে শেষ ধর্ম্ম প্রচার করেন কিন্তু ইহার পরে চল্লিশ বৎসর—যে সময় তিনি বিশেষ দৃঢ়তা ও পূর্ণতার সহিত ভারতের সর্ব্বস্থানে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং হিউয়ান্ সাঙ্ তাঁহার মথুরায় ধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কোন সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা স্থির করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মথুরার ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু ও জনপূর্ণ স্থানে যে তিনি আদৌ আসেন নাই তাহা নিতান্ত অসম্ভব। "অভিনিক্রমণ সূত্র" গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, † মথুরা তৎকালীন ঐশ্বর্য্যের জন্য সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজধানী সদৃশী বলিয়া কথিত হইতেছে। ইহাতে আরও লিখিত আছে "যে বুদ্ধ প্রথমতঃ এই স্থানে জন্মিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু মথুরার তৎকালীন প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজ সুবাহু ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় বিশৃঙ্খল মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া তিনি মথুরায় জন্মগ্রহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।

* শাক্যসিংহ শেষ বুদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞ সুগত, বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, তথাগত, সমন্ত ভদ্র, ভগবান, লোকজিৎ শারজিৎ, জিন, ষড়ভিজ্ঞ দশবল, অদ্বয়বাদী, বিনায়ক, মুণীন্দ্র, শ্রীঘন, শাস্তা, ও মুনি প্রভৃতি কয়েকজন বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর শাক্য সিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, গৌতম, অর্কবন্ধু ও মায়াদেবীসুত এই ছয়টী নাম শাক্য সিংহের। তিনি শেষ বুদ্ধ বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ব কথিত অষ্টাদশ নামও তাঁহার পক্ষে ব্যবহৃত হয়।

† Beal সাহেব ইহা চীন ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন।

অন্যান্য স্থানের রাজবংশে তাঁহার জন্মিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহাদের কোন প্রকার বংশগত কলঙ্ক থাকাতে অথবা তাহারা ক্ষত্রিয় না হওয়াতে তিনি সেই সকল স্থলেও অবতীর্ণ হইবার সংকল্প পরিত্যাগ করেন। বারাণসী ও উজ্জয়িনীতে অবতার হইবার সম্বন্ধেও তাঁহার ঐ প্রকার আপত্তি ছিল। হিয়াং সাঙ্গের বর্ণনানুসারে "মথুরা রাজ্যের পরিবেষ্টন প্রায় পাঁচ হাজার "লি" * অর্থাৎ ৯৫০ মাইল, লোকেরা ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ও বীর্য্যবান ও ধর্ম্মকার্য্যতৎপর। "প্রদেশের ক্ষেত্র সমূহ উর্ব্বর, শস্যাদি প্রচুর" এই বর্ণনা হইতে মথুরার তৎকালীন ঐশ্বর্য্যময় অবস্থার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রকার স্থলে যে বুদ্ধদেব মথুরায় স্বধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন নাই ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

কালের পরিবর্ত্তনে ও স্বাভাবিক নিয়মের বশে ফাহিয়ানের ও হিয়াংসাঙ্গের বর্ণিত বৌদ্ধ মথুরার চিহ্ন অতি অল্পই বর্ত্তমান আছে। যাহা কিছু আজও বর্ত্তমান তাহা ভগ্নাবশেষ অবস্থায়। আর কূপাদি খনন কালে অথবা প্রাসাদাদির ভিত্তি সংস্থাপন সময়ে ঘটনা ক্রমে যে সমস্ত প্রাঙ্গন চিহ্ন স্খলিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে ও বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বের অঙ্গ পুষ্টি করিয়াছে তাহা কেবল প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কনিংহামের জীবনব্যাপী বহুমূল্য পরিশ্রমের ফলমাত্র।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

কেদার রায় ও চাঁদ রায়।

এক সময়ে বঙ্গদেশে দ্বাদশ ভূঞিয়ার প্রাধান্য ছিল। দেশের মধ্যে তাঁহারাই সময় সময় রাজউপাধি ধারণ করিয়া প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ করতঃ নামে মাত্র বাদসাহ গণের অধীনতা স্বীকার করিতেন। আবার কেহ কেহ সম্ভবতঃ গড়, সৈন্য প্রভৃতি রাখিয়া রাজবিদ্রোহও ঘটাইতেন। এই "দ্বাদশ ভূঞিয়া"দিগের মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য, ক্ষিদিরপুরের ইষা খাঁ, ভুষণার মুকুন্দ রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প নারায়ণ, বিক্রমপুরের কেদার রায় চাঁদ রায় প্রভৃতিগণ অগ্রগণ্য। অধিকাংশ ভৌমিকগণেরই আমূল বৃত্তান্ত কোন রূপ ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ নাই। কেবল মাত্র কিম্বদন্তী, লোকপ্রবাদ, প্রস্তরলিপি অথবা ভগ্নাবশেষ বাটীর চিহ্ন দ্বারা অনুমাণ ও কতকটা প্রাচীন লোকের

---

* এক "লি" র পরিমাণ ইংরাজি মাইলের প্রায় এক পঞ্চমাংশ।

নিকট হইতে শ্রুত আষাঢ়ে গল্প ভিন্ন আর কোনরূপে কিছুই জানা যায় না। আমরা বিক্রমপুরের কেদার রায় চাঁদ রায় নামক ভ্রাতাদ্বয়ের বিষয় অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ সাধারণের জ্ঞাতব্যের জন্য প্রকাশ করিলাম।

ঢাকা জেলায় স্বনাম বিখ্যাত বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত স্ফীত-জলা পদ্মা নদীর তীরে একদিন কেদার রায় চাঁদ রায়ের প্রভূত ক্ষমতা, যথেষ্ট ধন, প্রচুর প্রতিপত্তি, অপরিসীম সাহস, অতুল্য উদ্যম, অনন্য উৎসাহ, আশ্চর্য্য মাতৃভক্তি ও ভগবতপ্রেম বিস্ফুরিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, যে সময়ে দিল্লী নগরীতে প্রতাপের মহীয়সী শক্তি অর্দ্ধ চন্দ্রাকার মোগল-বিজয়-বৈজয়ন্তী স্বগর্ব্বে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, করাচী হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বায়ুভরে উড্ডীন হইয়াছিল, সেই সময় সেই ন্যায়পরায়ণ আকবর সাহের রাজত্ব কালে এই দুই ভ্রাতার অভ্যুদয় হয়। একটী জনপ্রবাদ ভিন্ন এই সত্যতার অপর কোন প্রমাণ নাই। যৎকালে কেদার রায় চাঁদ রায় উন্নতির পথে উঠিয়া রাজবৎ ব্যবহৃত হইতেছিলেন, তখন শুনিয়াছি তাঁহারা নাকি কথায় কথায় বলিতেন;— "রাজা তনমনই আমাদের নাম ও যশলয় করিবেন। সুতরাং তাঁহার আগমনের অগ্রেই তনু ও মন পরিষ্কার ও প্রস্তুত রাখিব। অর্থাৎ যাহাতে শরীর ও মন সতেজ থাকে তাহাই করা কর্ত্তব্য।" এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া ভ্রাতাদ্বয় "তনমন দেউল" নামে একটী প্রকাণ্ড দুর্গাকার দেবালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় স্বকরে আরাধ্য সেই "পিঠযন্ত্র" স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। এই গল্পের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান হয় যে, রাজা টোডড়-মল্লই, রাজা তনমন হইবেন। সুতরাং ইহা সত্য হইলে, কেদার রায় চাঁদ রায় আকবরের সমসাময়িক তাহার সন্দেহ নাই। কেননা রাজা টোডড়মল্ল আকবরের প্রতি-নিধিরূপে কিছুকাল বঙ্গদেশের শাসনভার চালাইতেন; এবং রাজস্বের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

ঢাকা প্রবাসী একজন প্রবীন উকীলের নিকট শুনিয়াছি যে, আজ কাল যে স্থানে ঢাকা জেলার "বহর" নামক স্থান আছে উহারি অতি সন্নিকটে "রূপটা" নামক স্থানে কেদার রায় চাঁদ রায়ের বাটী ছিল। এক সময়ে এই বহর ঢাকা জেলার একটী চৌকি ছিল (প্রায় মহকুমা বিশেষ) বর্ত্তমান সময়ে সেই বাটীর কোন রূপ চিহ্ন নাই।

অধুনা পদ্মা নদীর যে অংশকে লোকে কীর্ত্তিনাশা বলিয়া থাকে উহার গর্ভেই কেদার রায় চাঁদ রায়ের বাটী ছিল। রাজনগরের অপর পারে বহরের সন্নিকটে "রাজবাড়ী" বলিয়া অদ্যাপি যে নগর আছে, উহাই নাকি কেদার রায় চাঁদ রায়ের রাজধানী ছিল। উহার মধ্য হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পদ্মা পর্য্যন্ত একটী সরল খালের খাদ বর্ত্তমান আছে, লোকে বলিয়া থাকে কেদার রায় চাঁদ রায়ের সঞ্চিত অর্থরাশি ঐ পথ দিয়া পদ্মার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল, তাই খালের আকার হইয়াছে। এই স্থানে অদ্যাপি উন্নতাকার একটী মঠ কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। সাধারণ মধ্যে প্রবাদ আছে,

রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ করিয়া পদ্মার "কীর্ত্তিনাশা" নাম হইয়াছে; এ কথা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেহেতু রাজা রাজবল্লভের জন্মের অনেক পূর্ব্বে ঘটকগণের কুলজীতে কীর্ত্তিনাশার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ বিখ্যাত রাজনগরের সেই সমস্ত নবরত্ন ও একুশ রত্ন প্রভৃতি কীর্ত্তি গুলি প্রায় আজ ৩০।৪০ বৎসর মাত্র লয় হইয়াছে। এখনো এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা রাজবল্লভের রাজনগরকে প্রায় সৌধমালায় ভূষিত দেখিয়াছেন। এমন কি অদ্যাপিও তাহার অনেক চিহ্ন আছে। এই ৩০।৪০ বর্ষ অগ্রেও পদ্মার নাম কীর্ত্তিনাশা ছিল। সুতরাং কেদার রায় চাঁদ রায়ের কীর্ত্তিনাশকারিণী বলিয়াই পদ্মার নাম কীর্ত্তি-নাশা। এই বিষয়ের আর একটী জনপ্রবাদ আছে যথা;—ব্রহ্মাণ্ডগিরি নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ বঙ্গের পূর্ব্বাংশে ভ্রমণ করিতেন। তিনি নাকি পৌরাণিক সেই দুর্ব্বাসা ঋষির ন্যায় ৬০ হাজার না হউক অনেক শিষ্য লইয়া ভ্রমণ করিতেন। কেদার রায় চাঁদরায় কিশোর কালেই পিতৃহীন হইয়া এক মাত্র মাতাকে ছাড়িয়া ইঁহার শিষ্যদলে প্রবেশ করেন। এক দিন ব্রহ্মাণ্ডগিরি সশিষ্য কোন যবনের বাড়ীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হন। যবন, তাঁহাকে কতকগুলি যাবনিক খাদ্য আনিয়া দেয়; তাহা দেখিয়া তিনি শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহেন, "এই দেখ, খাদ্য দেখ; পিঁয়াজ মুরগী খাইতে হইবে।" তাহাতে কেদার রায় চাঁদ রায় ব্যতীত আর সকল শিষ্যই গুরুর সহিত সেই যাবনিক খাদ্য আহার করেন। কিছুদিন পরে আর এক দিন ব্রহ্মাণ্ডগিরি, এক জন কর্ম্মকারের বাটী অতিথি উপস্থিত হয়েন। কর্ম্মকার তখন তাঁহাকে নিজ স্বভাব দোষে উত্তপ্ত অগ্নিবৎ লৌহ অঙ্গার আহার করিতে দেয়। তখন সিদ্ধপুরুষ তাহারি দুই খণ্ড অগ্নিবৎ লৌহ আহার করিয়া শিষ্যদিগকে আহার করিতে আহ্বান করিলেন। শিষ্যমণ্ডলী তপ্ত লৌহ অখাদ্য এবং অসাধ্য জানিয়া পরাঙ্মুখ হইলে, ব্রহ্মাণ্ডগিরি তাহাদিগকে কহিলেন; "এ কি? তোমরা যদি ইহা আহার করিতে না পারিলে তবে যবনান্ন খাইলে কেন? নরাধমেরা আমার নিকট হইতে দূর হও; কেবল কেদার ও চাঁদ তোমরাই খাঁটি লোক, আইস তোমাদের সঙ্গই আমার বাঞ্ছনীয়।" এই হইতে কেদার আর চাঁদ তাঁহার প্রিয় হইলেন।

এক দিন যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে সিদ্ধপুরুষ কেদার ও চাঁদের জন্মভূমি রূপটায় উপস্থিত হইলেন। সেই সময় কেদার আর চাঁদের জননী কাঁদিয়া তাঁহাকে কহিলেন; "আপনার এই দুই শিষ্য আমার পুত্র, আমি বৃদ্ধা আমার উপায় কি?" তখন ব্রহ্মাণ্ডগিরি ভ্রাতাদ্বয়কে কহিলেন;—"অতঃপর তোমরা আমার সঙ্গ ত্যাগ কর; এই সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি গর্ভধারিণীর সেবা কর, তাহাতেই তোমাদের ধর্ম্ম হইবে। আমি তোমাদিগকে এই যে "পিঠ" দিতেছি তোমরা ইহার পূজা করিবে। ইঁহারি কৃপায় তোমরা দেশের মধ্যে, সমাজের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবে। কল্য প্রাতেই এই পিঠকে পদ্মার জলমধ্যে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিও প্রচুর অর্থ পাইবে; কিন্তু সাবধান! যে দিন

তোমরা দুই ভায়ের একজন না একজন ইহার পূজা করিবে সেই দিন হইতেই তোমাদের কুগ্রহ হইবে। যে পদ্মা নদী তোমাদের কীর্ত্তির ধ্বজা বক্ষে করিয়া ছুটিয়া বহিবে সেই পদ্মাই আবার তোমাদের কীর্ত্তিনাশ করিয়া লইবে।"

সিদ্ধপুরুষের অনুগ্রহে নাকি ভ্রাতাদ্বয়ের উন্নতি সূচিত হয়। আর সেই "পিঠযন্ত্র" পূজা করিয়া তাঁহারা দেশে প্রাধান্য লাভ করেন। এই পিঠযন্ত্র সেবা তাঁহাদের সমস্ত উন্নতির মূল। যেরূপেই হউক কেদার রায় চাঁদ রায় এক সময়ে বিক্রমপুর পরগণায় রাজা বলিয়া ঘোষিত ছিলেন। সোনারং বা সুবর্ণগ্রাম বলিয়া যে ইতিহাসে একটী সমৃদ্ধি-শালী জনপদের নাম আছে উহা এই দুই ভ্রাতার নির্ম্মিত বলিয়া কাহার কাহার নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। ইতিহাস বলিতেছে যে, টোডড়মল্লই কেদার এবং চাঁদ রায় এই দুই ব্যক্তিকে উপযুক্ত দেখিয়া তাঁহাদের রাজস্ব আদায়ের ভার এবং ভৌমিক উপাধি দিয়া যান। কিন্তু আবার কাহার কাহার নিকট শুনি যে, টোডড়মল্লই ইঁহাদিগকে পরা-জয় করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন। যুদ্ধের সময় পিঠযন্ত্রের একদিন পূজা হয় নাই বলিয়া সিদ্ধপুরুষের আজ্ঞায় তাঁহাদের হীনতা উপস্থিত হয়। যাহা হউক যে কোন গতিকে হউক বিক্রমপুর অঞ্চলে কেদার রায় চাঁদ রায় নামক দুইজন প্রধান ব্যক্তির নাম অনেকেই জানেন। ইঁহারাই পূর্ব্ব অঞ্চলের মধ্যে দ্বাদশ ভূঁইয়ার অন্যতর। দৈববলেই হউক, আর বাহুবলেই হউক এই দুই ব্যক্তির প্রভূত ক্ষমতা এবং দেশময় খ্যাতি ছিল। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই বঙ্গের ভৌমিক দ্বাদশের মধ্যে দুই চারিজন বাদে সকলি দেবানু-গৃহীত। তবে আমাদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই এবং লিখিবার নিয়মও কেহ জানিত না। তাই লোকপ্রবাদে রাজা জমিদার প্রভৃতিগণের কার্য্য সকল ঐশী শক্তির সহিত গ্রথিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের কালী, সীতারামের লক্ষ্মানারায়ণ, মুকুন্দরামের শিবলিঙ্গ ইহার দৃষ্টান্ত।

আমি যে প্রবীণ উকীলটীর নিকট এই গল্পটী শুনিয়াছিলাম তিনি আমায় বলিয়া-য়াছেন যে,"আমি আজ প্রায় ২৫।৩০ বর্ষ হইল জীর্ণ পুঁথিতে কেদার রায় চাঁদ রায়ের জীবনী এইরূপে পড়িয়াছি। তাহাতে একস্থানে দেখিয়াছিলাম যে দিল্লী হইতে যে সমস্ত সৈন্য আসিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে কেদার এবং চাঁদ পরাস্ত হন নাই। দাম্ভিকতা বশতঃ বিপক্ষের নৌকার উপর তলওয়ার হস্তে লাফাইয়া পড়িয়া ভগ্ন হওয়ায় অমান তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করা হয়।

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য,

মাগুরা।

মহীসুরী গান।

নিম্নে যে গানটীর স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে, সেটী একটী মহীসুরী গান। মহীসুরের মহারাণীর বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের দিন একটী সাত আট বৎসরের বালিকা এই গানটী গাহিয়াছিল। আর একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কৃষ্ণা বালিকা-দেওয়ান রঙ্গচার্লুর দৌহিত্রী—যে গানটী গাহিয়াছিল, তাহার মানে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু যিনি আমাদের পাশে বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম সেটী একটী "প্যাথেটিক্" গান। বালিকা নির্ভয়ে, নিঃসঙ্কোচে শতলোকের মাঝে দাঁড়াইয়া আপনার মনে, আপনার খেয়ালে গাহিয়া গেল। সে গানের করুণরস সে নিজে কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল না; অথচ তাহার অপূর্ব্ব কৌশলময়, অনায়াসকৃত, তান গমক ও মূর্চ্ছনার শত প্রত্যাবর্ত্তনে সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া তাহার মধুর ও সবলকণ্ঠ হইতে করুণরস আপনা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। বাঙ্গালী সঙ্গীতপ্রিয়, কিন্তু মহীসুরে সঙ্গীত চর্চ্চার প্রাবল্য দেখিলে আমাদের লজ্জা পাইতে হয়। কলিকাতার বালিকাবিদ্যালয়ে দেশীয় সঙ্গীত শিক্ষার কোনই সুবন্দোবস্ত নাই। পারিতোষিক বিতরণের সময়কালে বৎসরান্তে একবার করিয়া বিশ পঁচিশটী বালিকাকে ধরা পাকড়া করিয়া গান শিখান হয়। সারা বৎসর যাহাদের কোন শিক্ষা হয় নাই, গলা থাকিলেও যাহাদের গলা সাধা নহে, পনের দিনের অভ্যাসে তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপে গান সাধিত হইবে ইহা কিরূপে আশা করা যায়? আর কোনরূপ দেশীয় যন্ত্র বাজান ত তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, কারণ স্কুলে তাহা শিক্ষা দিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। মহীসুর বালিকাবিদ্যালয়ের একটী প্রধান নিয়ম এই যে প্রত্যেক বালিকাকেই গান ও বাজনা শিখিতে হইবে। যদি কোন বালিকার নিতান্তই গলা না থাকে, তবুও তাহাকে দিনকতক অভ্যাস করিয়া দেখিতে হইবে যে, চর্চ্চার দ্বারা গলার উন্নতি হয় কি না। আমাদের যেমন জাতীয় যন্ত্র, সেতার, মহীসুরে সেইরূপ জাতীয় যন্ত্র বীণা। প্রাইজের দিন আট দশটী বয়ঃপ্রাপ্ত বালিকা একত্রে বসিয়া বীণা বাজাইল। একটী নয় দশ বৎসরের বালিকা বেহালায় আশ্চর্য্য কৌশল দেখাইল। কলিকাতার বিদ্যালয়ে যে যন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চর্চ্চা হয়—পিয়ানো, সেই যন্ত্র বাদনেই মহীসুরী বালিকারা কিছু পশ্চাৎপদ। কিন্তু তাহারা যে দেশীয় যন্ত্রকে সর্ব্বপ্রথম স্থান দিয়া, বিদেশীয় যন্ত্রকে তাহার নীচে আসন দিয়াছে, ইহা তাহাদের পক্ষে গৌরবের কথা, লজ্জার কথা নহে। কলিকাতা বালিকাবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্কুলে দেশীয় সঙ্গীত শিক্ষা প্রবর্ত্তনা করিলে অনেক অভিভাবকগণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েন।

এই গানে সুরের 'মৃদু', 'প্রবল' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আওয়াজের চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। চিহ্নিতরূপে প্রবল মৃদু আওয়াজের তারতম্য রক্ষা করিয়া গাহিলে গানের ভাবটী সম্যক্‌রূপে ফুটিয়া উঠিয়া গানকে আরো সুমিষ্টতর করে; চিত্রে যেমন আলো ও ছায়ার সমাবেশে চিত্রটী আরো ফুটিয়া উঠে।

সুরের আওয়াজের চিহ্ন বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুবিধার জন্য আবার উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

প্রবল আওয়াজ	...	(ব)
মৃদু আওয়াজ	...	(মৃ)
অতি প্রবল আওয়াজ	...	(বব)
অতি মৃদু আওয়াজ	...	(মৃমৃ)
মধ্য বলের চিহ্ন	...	(ম)
আওয়াজ বৃদ্ধির ঐ	...	(বৃ)
হ্রাসের ঐ	...	(হ্র)
ক্রমশঃ বৃদ্ধির ঐ	...	(ক্র·বৃ)
ক্রমশঃ হ্রাসের ঐ	...	(ক্র·হ্র)

এই অক্ষরগুলি সুবিধা বুঝিয়া পদের নীচে কিম্বা সুরের মাথায় বসিবে।

কোন বিশেষ চিহ্নের পর যতদূর এইরূপ বিন্দুশ্রেণী, ..., থাকিবে ততদূর পর্য্যন্ত সেই চিহ্নের কার্য্য চলিবে।

মহীসূরী দেশ—একতালা।

শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী না চিন্তদির্পবুম্‌মা। ১।
চিদ্‌রূপিণী শিবশঙ্করী চিদানন্দ স্বরূপিণী। ২।
কানাতালি নিউগদা বীণাপামু বীণারদা
মুহুমুকুনি ত্রোবোলেদা মুনিজন সন্তাপাদা। ৩।
সারানাণ্টিনি নিন্নুনে পরমদয়াকরী শুভকরী
গিরিরাজকুমারী নিন্নু করুনিস্‌ ত্রো উত্তারলি। ৪।
সেব গিরীশ্বরী রাণী শৈব গমসারিণী
কায়বে অভিরাণী কৈবল্য প্রদায়িনী। ৫।

মহীসূরী দেশ—একতালা।

১　+　৩

স´১ । [স´১ স´১ ´স´১ । নো১ প১ ম১ । ম১ গো১ র১ ।
শ্রী [— — — ত্রি পু রা সু — ন্দ
(প্র)................... ...　(ক্র-হ্র) ....

০

স১ ন্‌ো১ ধ্‌১ । ন্‌ো১ ধ্‌১ ন্‌ো১ । স১ রস১
রী না — চি — ন্ত দি র্
....

ন্‌ো১ । স২ স১ । স১ স১ স॥১]
প বুম্ মা — — —
..............................(মৃ)

প২ নো১ । নো১ ধপ১ ধ১ । ধ১ ধ১
চিদ্ রূ — পি ণী — —
(প্র)

ধ১ । ধনো১ স´২ । ন১ স´১ স´১ । স´১
— শিব শঙ্ ক রী ণরি —

স´১ স´১ । প২ নো১ । নো১ ধপ১
— — চিদ্ রূ — পি

ধ১ । ধ১ ধ১ ধ১ । ধনো১ স´২ ।
ণী — — — শিব শঙ্

ন১ স´২। স´২ নোধ। পমগ১ ম২। প২
ক রী — — — — চিদ্
(ক্র-হ্র) ....মৃ

নো১। নো১ ধপ১ ধ১। ধ১ ধ১ ধ১।
রূ — পি নী — — —

ধনো১ ধনো১ স´১। ন১ স´২। স´১ ধ১ নো১।
শিব শ ঙ্ ক রী — রি —
(ক্র-বৃ)..........

ধনো১ স´১ নস´১। র´১ স´র´১ গো´১।

র´গো´১ ম´১ ম´গো´১। র´১ গো´র´১ স´১।
— — — — — —
....(হ্র)

স´২ র´স´১। নো১ ধপ১ ধ১। ধ১ ধ১
চিদ্ রূ — পি নী — —

ধ১। ধনো১ ধনো১ স´১। ন১ স´১ র´১
— শিব শ ঙ্ ক রী চি

স´১ নো১ ধপ১। ম১ প১ ম১। গো১
দা — ন — ন্দ স্ব রূ
(মৃ)

র১ র১ । রগোমপ১ ধনো১ স´১ ।
— পি নী — —
(ক্র-বৃ)................................

স´১ স´নোপ১ স´১ । স´২ নো১ । প১ ম১
— শ্রী — — ত্রি পু রা
(প্র)

ম১ । পম১ গোর১ স১। ন্ো১ ধ১ ন্ো১ ।
সু ন্দ রী না চিঁ — ন্ত
(হ্র) (ক্র-হ্র)........... ....

স১ রস১ ন্ো১ । স২ স১ । স৩
দি ব্ প বুম্ মা —
....(মৃ)...........

[প১ প১ ধ১ । ধ২ ধ১ । ধ১ প১
কা না তা ল্লি নি উ গ
(ম)

পধ১ । নো১ নো১ নো১ । ধ১ নো১ স´১ ।
দা — — — বী ণা পা
(প্র)....................................

স´২ ধ১ । নো১ প১ পধ১ । নোস´১ নোধ১
মু বী ণা — র — —

পমগ১ । ম১ ম১ ম১] র´র´১ র´১ গো´১ ।
— — — — মুমু মু কু

র´১	স´১	নো১।	ধ	ধনো১	স´১।	নস´১
নি	ভ্রো	বো	লে	দা	—	রি

র´১	স´১।	স´১	স´১	স´১।	র´র´১	র´১
—	—	—	—	—	মুহু	মু

র্গো১।	র´১	স´১	নো১।	ধ১	নো১	র´১।
কু	নি	ভ্রো	বো	লে	দা	মু

স´১	নো১	ধ১।	প১	ম১	গো১।	র১
নি	জ	ন	স	—	সু	তা

র১	রগোমপ১।	ধনো১	স´২।
পা	দা	—	—

(ক্র-বৃ)..

স´১	র্সনোপ১	স´১।	স´২	নো১।	প১	ম১
—	শ্রী	—	—	ত্রি	পু	রা

(প্র)

ম১। পম১	গোর১	স১।	ন্‌ো১	ধ্‌১	ন্‌ো১।	
সু ন্দ	রী	—	চি	—	ত্ত	

(ক্র-হ্র) ....

স১	রস১	ন্‌ো১।	স২	স১।	স১	স১	স১॥
দি	ব্	য	বুম্	মা	—	—	—

....(মূ)

[পপ১　ধ২ । ধ১　ধ১　ধ১ । ধ১　পধ১
সারা　নান্　টি　নি　নি　নু　নে
(ম)　　　　　　(প্র)

নো১ । নো১　নো১　নো১ । নো১　ধনো১
—　—　—　—　—　পর
....(হু)

স´১ । স´১　স´২ । স´১　স´১　নো১ । ধ১
ম　দ　রা　ক　রী　শু　ভ
(ম)　(মৃ)

প১　ম১ ।] র´র´১　র´১　গো´১ । র´১　স´১
ক　রী]　গিরি　রা　—　জ　কু

স´নো১ । ধ১　ধ১　ধনো১ । স´১　নস´১　র´১ ।
মা　—　রী　রি　—　—　—

স´১　স´১　স´১ । স´১　র´র´১　র´১ । গো´১
—　—　—　—　গিরি　রা

র´১　স´১ । স´নো১　ধ১　নো১ । স´১　স´১
জ　কু　মা　—　রী　নি　নু

র´১ । স´১　নো১　ধ১ । প১　ম১　গো১ ।
ক　রু　নি　ন্　মু　ত্রো　উ

র১ রগোমপ১ ধনো১ । র্স১ র্স১ স১ । র্স১ র্সনোপ১ র্স১ ।
তার লি — — — — — শ্রী —

র্স২ নো১ । প১ ম১ ম১ । পম১
— ত্রি পু রা সু ন্দ
(ক্র-হ্র)..............

গোর১ স১ । ন্‌্যো১ ধ্‌১ ন্‌্যো১ । স১ রস১ ন্‌্যো১
রী না চি — ন্ত দি র্‌ প

স২ স১ । স১ স১ স১ ॥] প১ প১
বুম মা — — — ।] সে ব
(মৃ)

ধ১ । ধ২ ধ১ । ধ১ প১ পধ১ । নো১
গি রী শ্ব রী রা ণী —
(যা)

নো১ নো১ । ধনো১ র্স২ । { নোধ১ প১
— — সৈ বা { গ ম

পধ১ । নোর্স১ নোধ১ পমগ১ । ম৩ । }] নোধ১
সা — রি নী — }] গ

প১ র্স১ । নো১ ধ১ পমগ১ । ম৩ ।
ম সা — রি নীঁ —

র্গো   র্   র্স।   র্স।   নো   ধ
কা   য়   বে   —   অ   ভি
(প্র)

ধনো।   র্স   র্স   নর্স।   র্   র্স
রা   —   নী   রি   —   —

র্স।   র্গো   র্   র্স।   র্স   নো   ধ।
—   কা   য   বে   —   অ   ভি
(প্র)

ধনো   র্স   র্স।   র্   র্স   নোধ।
রা   —   নী   কৈ   ব   ল্য

পম   গো   র্।   রগোমপ   ধনো   র্স।
প্রদা   —   য়ি   নী   —   —

র্স   র্সনোপ   র্স।   র্স   নো।   প   ম
—   শ্রী   —   —   ত্রি   পু   রা
(প্র)

ম।   পম   গোর   স।   ন্নো   ধ্   ন্নো।
সু   ন্দ   রী   না   চি   —   স্ত
(ক্র-হ্র)..

স   রস   ন্নো।   স   স।   স॥
দি   র্   প   বুম্   মা   —
....(মৃ)

শ্রীসরলা দেবী।

৩

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল।

চতুর্থ অধ্যায়।

শঙ্কর বিজয়।

সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে "শঙ্কর বিজয়" বৃত্তান্তমূলক তিন খানি গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে আনন্দগিরিকৃত "শঙ্কর দিগ্বিজয়", মাধবাচার্য্যকৃত "সংক্ষেপ শঙ্করজয়" আমরা দর্শন করিয়াছি। চিদ্বিলাস যতিকৃত "শঙ্কর বিজয়" আমরা দর্শন করি নাই। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন তাহাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং যে দুই খানা গ্রন্থ স্বয়ং দর্শন করিয়াছি, তাহার কথাই পূর্ব্বে আলোচনা করা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

আনন্দগিরিকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়। গ্রন্থকার আপনাকে শঙ্করের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের এই পরিচয়ের উপর পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য যে বিষম সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত বিষম সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইয়াছে। সেই সকল কথা পশ্চাৎ উল্লেখ করা যাইবে।

এই গ্রন্থকার বলেন, দক্ষিণ আরকট জেলার অন্তর্গত চিদম্বর নগরে সর্ব্বজ্ঞ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নীর নাম কামাক্ষী। এই কামাক্ষীর গর্ভে সর্ব্বজ্ঞের এক কন্যা জন্মে, তাহার নাম বিশিষ্ঠা। বিশ্বজিৎ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বিশিষ্টার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্বজিৎ দারপরিগ্রহের অল্পকাল পরেই সংসার সুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক বাণপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। বিশিষ্ঠা স্বামী বিরহে অধীর হইয়া চিদম্বরেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ করত নিরন্তর তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। মহাদেবের কৃপায় বিশিষ্ঠা শঙ্করাচার্য্যকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন।

কোন্ সময়ে শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন তাহা গ্রন্থকার ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই।

পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য বলেন, "শঙ্করাচার্য্যের খ্যাতনামা শিষ্য আনন্দগিরি এই গ্রন্থ প্রণেতা কি না তৎসম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে, কারণ এই গ্রন্থ গদ্য এবং কবিতা ছন্দে লিখিত। ইহার স্থানে স্থানে অলঙ্কার দোষ পরিলক্ষিত হয় এবং ভাষা অপরিপক; সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, শঙ্কর দিগ্বিজয় লেখক আনন্দগিরি একজন নবীন লেখক। এই গ্রন্থের ৩২, ৩৩, ৩৪ এবং ৪৪ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র, কুবের, যম, চন্দ্র প্রভৃতি দেবোপাসকদিগকে শঙ্করাচার্য্য জয় করিয়াছিলেন, অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই সকল সম্প্রদায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই সকল সম্প্রদায় নবীন লেখকের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে।"

উক্ত গ্রন্থকার বলেন, "পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মণাচার্য্যঃ কিল দিগ্বিজয়ং কৃত্বা কাংশ্চিদ্ব্রাহ্মণাদীন্ ছিদ্রোর্দ্ধপুণ্ড্রধারণশঙ্খচক্রাঙ্কুরভাস্বরভুজযুগলান্ কৃত্বা বহুশিষ্যসমেতঃ পুনরাবৃত্য পরমগুরুচরণং নত্বা তদনুজ্ঞাবশাত্ মতবিজৃম্ভণহেতুকং ভাষ্যাদিগ্রন্থচয়মকরোত্। হস্তামলকস্তু ভূমধ্যাত্ পশ্চিমখণ্ডদিগ্বিজয়ং কৃত্বা ভগবদষ্টাক্ষরমন্ত্রজপাসক্তান্ কৃত্বা স্বয়ং বিজ্ঞাপয়িতুং পরমগুরুংপ্রাপ।"

পূর্ব্বভাগে লক্ষ্মণাচার্য্য দিগ্বিজয় করতঃ ব্রাহ্মণদিগকে ছিদ্রযুক্ত উর্দ্ধ পুণ্ড্রধারী ও শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নযুক্ত ভুজযুগলবশিষ্ট বৈষ্ণব করিলেন এবং বহুশিষ্য সহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরমগুরুর পদে প্রণত হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে মত প্রচার জন্য ভাষ্যাদি গ্রন্থ সমূহ প্রণয়ন করিলেন। পশ্চিমভাগে হস্তামলক দিগ্বিজয় করত মানব সমূহকে ভগবানের অষ্টাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া পরমগুরুকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তৎসমীপে গমন করিলেন।

শঙ্কর দিগ্বিজয় প্রণেতা আনন্দগিরির উল্লিখিত বর্ণনা নিতান্ত অসঙ্গত এবং এই বর্ণনা দ্বারা আনন্দগিরি ও তৎপ্রণীত "শঙ্কর দিগ্বিজয়" খ্যাতনামা দ্বৈত ভাষ্যকার রামানুজ ও মাধবাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য লিখিয়াছেন যে It is also stated * that he had two disciples named Lakshman and Hastamalaka, the former of whom was afterwards called Sri Ramanujacharya ! and who preached the Vaishnava religion and wrote a Bhasya (commentary) on the Vedanta Sutra ; while the latter went to Udipi and preached the Dwaita philosophy. There cannot be a sillier statement. For it is quite certain that Sri Ramanujacharya was born in 1017 A. D. and Sri Madhavacharya in 1119 A. D. and they have disputed in their Bhashyas the system advocated by Sri Sankaracharya. By mentioning these two reformers it is pretty certain that the writer of this Sankarvijaya lived after their times, and the work thus bears the stamp of its having been written only lately, and not during or immediately after the time of Sri Sankaracharya as we may be led to think, from the writer's statement that he was his disciple.

আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয় কিরূপ প্রামাণ্য গ্রন্থ তাহা পাঠকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের সাহায্য অবলম্বনে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের চেষ্টা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র।

২। মাধবাচার্য্য কৃত সংক্ষেপ শঙ্করজয়। মাধবাচার্য্য একজন বিখ্যাত ভাষ্যকার।

---

* Chap. 68.

পরাশর সংহিতা ভাষ্যের উপক্রমণিকায় খ্যাতনামা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তাঁহার পিতার নাম মায়ণ, মাতার নাম শ্রীমতী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সায়ণ।*

ধাতুবৃত্তিগ্রন্থে সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন, "মায়ণের পুত্র মাধবের অনুজ, সঙ্গম নরপতির প্রধান মন্ত্রী সায়ণাচার্য্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। † রামায়ণে যে স্থান কিষ্কিন্ধ্যা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং অধুনা যে স্থান গলকণ্ডা নামে জগতে পরিচিত, সেই স্থানে সঙ্গম নরপতির পুত্র হরিহর এবং বুক্ক "বিজয়নগর" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সঙ্গম নরপতি যদুবংশীয় কম্প নরপতির পুত্র। সঙ্গমের পুত্র হরিহরের ক্ষোদিত লিপিতে ১২৬১ শকাব্দ এবং তৎকনিষ্ঠ বুক্কের ক্ষোদিত লিপিসমূহে ১২৭৬, ১২৭৭, ১২৭৮ এবং ১২৯০ শকাব্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা স্থিরভাবে বলা যাইতে পারে, যে সঙ্গম নরপতি এবং তৎসমসাময়িক মাধবাচার্য্য শকাব্দের ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভাগে জীবিত ছিলেন। ‡

* শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তির্মায়ণঃ পিতা।
সায়ণঃ সোমনাথশ্চ মনোবুদ্ধি সহোদরৌ॥

† ইতিপূর্ব্ব দক্ষিণপশ্চিমসমুদ্রাধীশ্বর কম্পরাজসুত সঙ্গমরাজমহামন্ত্রিনা মায়ণ পুত্রেন মাধবসহোদরেন সায়ণাচার্য্যেন বিরচিত।

‡ ক্ষোদিত লিপি অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্গম নরপতির যে বংশাবলী প্রস্তুত হইয়াছে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যে নরপতির প্রশস্তিতে যে অব্দ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই অব্দ সেই নরপতির নামের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে।

কম্প।
|
সঙ্গম।
|

হরিহর (প্রথম)	বুক্ক।	অন্য তিন পুত্র।
১২৬১ শকঃ।	১২৭৬, ৭৭, ৭৮, ৯০ শকঃ।	(কম্প, মারপ ও মুদপ।

বুক্ক
|
হরিহর (দ্বিতীয়।)
১৩০১, ০৭, ১৭, ২১ শকঃ।
|
দেবরাজ (প্রথম)
১৩৩২, ৩৪ শকঃ।
|
বিজয়।
১৩৪০ শকঃ।
|
দেবরাজ (দ্বিতীয়।)
১৩৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৩, ৭১ শকঃ।

সর্ব্বসাধারণের এরূপ ধারণা যে এই মাধবাচার্য্যই "সংক্ষেপ শঙ্করজয়" রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর এন্ ভাষ্যাচার্য্য বলেন, "শঙ্কর বিজয় লেখক কখনই সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্য হইতে পারে না। কারণ মাধবাচার্য্য তাঁহার সকল গ্রন্থেই আরম্ভে কি উপসংহারে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শঙ্কর বিজয় লেখক মাধব সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। বিশেষতঃ সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ সমূহের ভাষার সহিত শঙ্কর বিজয়ের ভাষার বিলক্ষণ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। বোধ হয় শঙ্কর বিজয় লেখক মাধব শৃঙ্গগিরি মঠের কোন মোহান্ত ছিলেন।"

অন্য একটি বিশেষ কারণে আমরা পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্যের এই মতানুমোদন করিতে বাধ্য হইয়াছি। সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্য দ্বৈতবাদী। প্রস্তাবের আরম্ভে আমরা বেলগাম নিবাসী গোবিন্দ ভট্টের নিকটস্থ যে ক্ষুদ্র গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি সেই গ্রন্থখানা সুবিখ্যাত মাধবাচার্য্যের সমসাময়িক কোন অদ্বৈতবাদী দ্বারা লিখিত,' গ্রন্থকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মাধবাচার্য্যকে মধুদৈত্যের পুত্র লিখিয়াছেন। সংক্ষেপ শঙ্করজয় লেখক মাধবাচার্য্য অদ্বৈতবাদী। উক্ত গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই মাধ্যার্জ্জুন নামক শিবলিঙ্গের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে প্রভো! মাধ্যার্জ্জুন আপনি সর্ব্ব উপনিষদের অর্থস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ; বেদ কি বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে ব্রহ্ম দ্বৈত কি অদ্বৈত, এবিষয়ে সাধারণের হৃদয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া সেই সংশয় ছেদন করুন। শঙ্করাচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণে মাধ্যার্জ্জুন লিঙ্গ হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক জলদ গম্ভীরস্বরে বলিলেন:—

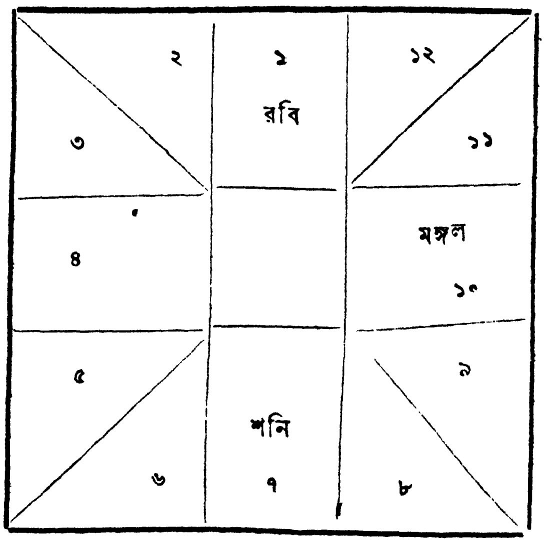
"সত্যমদ্বৈতং,
"সত্যমদ্বৈতং,
"সত্যমদ্বৈতং।"

অদ্বৈত (বাদ) সত্য, অদ্বৈত (বাদ) সত্য, অদ্বৈত (বাদ) সত্য। এই বাক্য তিনবার উচ্চারণ করতঃ মাধ্যার্জ্জুন লিঙ্গ মধ্যে বিলীন হইলেন।

জনৈক প্রকৃত দ্বৈতবাদীকে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিলেও তাহার লেখনী হইতে এই দেবদুর্লভ বাক্য বহির্গত হইবে না। এ জন্যই বলিতেছিলাম যে, সায়ণের অগ্রজ দ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্য কখনই সংক্ষেপ শঙ্করজয় লেখক নহেন। "সংক্ষেপ শঙ্করজয়" লেখক অদ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্য; দ্বৈতবাদী মায়ণ পুত্র মাধবের পরবর্ত্তী। *

* পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মাধবাচার্য্যকৃত প্রধান গ্রন্থ সমূহের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন; (ভারতী ও বালক। ১০ম ভাগ ২৯১—৯২ পৃষ্ঠা।) তাহাতে দ্বৈত এবং অদ্বৈত সম্প্রদায়ের মতপোষণোপযোগী গ্রন্থের নাম দৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারা ইহা অবশ্যই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বেদভাষ্যকার সায়ণের অগ্রজ মাধব দ্বৈতবাদী এবং পঞ্চ-

মাধবাচার্য্যকৃত 'সংক্ষেপ শঙ্করজয়' গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল, কোন অব্দ দ্বারা লিখিত হয় নাই। উক্ত গ্রন্থের মতে শঙ্করাচার্য্য মলয়বার দেশান্তর্গত কালাদি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু এবং মাতার নাম সতীদেবী। শঙ্করের জন্মকালে রবি মেষে, মঙ্গল মকরে এবং শনি তুলা রাশিতে ছিলেন। যথা,



গুরু কেন্দ্রস্থানে ছিলেন। কেন্দ্র বলিতে গেলে লগ্ন এবং লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম এবং দশম গ্রহ বুঝায় (ল, চ, স, দ, কেন্দ্রাঃ)। কিন্তু গ্রন্থকার লগ্ন স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই, বৃহস্পতি লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে কিম্বা দশম গৃহে ছিলেন তাহাও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার এইরূপ বর্ণনা দ্বারা শঙ্করের আবির্ভাব কাল কিছুমাত্র নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

মাধবকৃত সংক্ষেপ শঙ্করজয় গ্রন্থের মতানুসারে নীলকণ্ঠ, হরদত্ত, ভট্টভাস্কর, দণ্ডী,

---

দণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মাধব অদ্বৈতবাদী। সংক্ষেপ শঙ্করজয় অদ্বৈতবাদী মাধবের প্রথম গ্রন্থ। এজন্য ইহার ভাষা অপরিপক্ক এবং যুক্তিতর্কগুলি স্থানে স্থানে নিতান্ত দুর্ব্বল। বৌদ্ধদিগের সহিত শঙ্করের তর্কসংগ্রামে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য খণ্ডন জন্য মাধবাচার্য্য প্রতিভার পূর্ণভাস্কর, তার্কিককুলশিরোমণি মহাত্মা শঙ্করের মুখে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও তাহা নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হইতেছে।

ময়ূর, বাণ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রণেতা শ্রীহর্ষ, অভিনবগুপ্ত, মুরারিমিশ্র, উদয়নাচার্য্য, বিষ্ণুশর্ম্মা এবং ব্রহ্মগুপ্ত * প্রভৃতি পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

এক্ষণে দেখা উচিত এই সকল ব্যক্তিগণ কে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহারা শঙ্করের সমসাময়িক হইতে পারেন কি না।

নীলকণ্ঠ—মাধবাচার্য্য বলেন, নীলকণ্ঠ "শিবতৎপর (বেদান্ত) সূত্রভাষ্যকর্ত্তা"। আমরা উক্ত ভাষ্য দর্শন করি নাই। পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য বলেন, উক্ত ভাষ্যে নীলকণ্ঠ রামানুজের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি রামানুজের পরবর্ত্তী। নীলকণ্ঠকৃত দেবী ভাগবতের টীকা আমরা দর্শন করিয়াছি। উক্ত টীকার আরম্ভেই নীলকণ্ঠ বারংবার শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্মযুগলে প্রণিপাত করতঃ তদনন্তর স্বীয় জননী লক্ষ্মীদেবী, পিতা রঙ্গনাথভট্ট, গুরু কাশীনাথ ও শ্রীধর প্রভৃতিকে অভিবাদন করিয়াছেন। † অতএব কাশীনাথ এবং শ্রীধরের শিষ্য নীলকণ্ঠকে শঙ্করের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের প্রতি নীলকণ্ঠের অসাধারণ ভক্তি ছিল। এজন্যই তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের চরণ বন্দনা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠের গুরু শ্রীধরকে বিষ্ণু ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর অবধারণ করা যাইতে পারে না; কারণ নীলকণ্ঠ বিষ্ণুভাগবতের টীকাকার শ্রীধরের মতের দারুণ বিরোধী। ‡

হরিদত্ত—ইনি আপস্তম্ব ও গৌতমসূত্রের ভাষ্য এবং কাশিকাবৃত্তির 'পদমঞ্জরী' নাম্নী টীকা রচনা করেন। মাধবকৃত "সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ের" মতানুসারে হরদত্ত নীলকণ্ঠের শিষ্য, (১৫ অধ্যায় ৩০ শ্লোক)। সুতরাং ইনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী হইতেছেন।

---

* সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ের পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই সকল নাম দৃষ্ট হইবে।

† নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাব্জায়োপকারিণে।
যস্য প্রত্যুপকারায় নম ইত্যেব কেবলম্॥৩॥
শ্রীমল্লক্ষ্মবতীং লক্ষ্মীমাতরং দেশিকোত্তমাম্।
পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে॥৪॥
কাশীনাথং গুরুং নত্বা শ্রীধরাখ্যং গুরুং তথা।
অন্যেচ সন্তি গুরবস্তান্ সর্ব্বানভিবাদ্যচ॥৫॥
দেবী ভাগবত টীকোপক্রমনিকা।

‡ নীলকণ্ঠ কৃত গীতার টীকা আমরা দর্শন করিয়াছি। বোধ হয় তৎকৃত মহাভারতের টীকা আছে।

ভট্টভাস্কর—ইনি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের "জ্ঞানযজ্ঞ" নামক ভাষ্য রচনা করেন। উক্ত ভাষ্য পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, "ভট্টভাস্কর খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ইনি ব্রহ্মসূত্রে যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহাতে শঙ্করের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ইনি শঙ্করাচার্য্যের বহুকাল পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"

ময়ূর ও বাণ—ইঁহারা উভয়েই মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ময়ূর ও বাণ শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক হইতে পারেন কি না, তৎসম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করা যাইবে।

দণ্ডী—ইনি দশকুমারচরিত এবং কাব্যাদর্শ নামক গ্রন্থ প্রণেতা। দণ্ডী বোধ হয় মহারাষ্ট্রদেশবাসী ছিলেন, কারণ কাব্যাদর্শের, প্রথম পরিচ্ছেদের ৩৪ শ্লোকে তিনি মহারাষ্ট্রদেশের প্রচলিত ভাষার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। * উক্ত গ্রন্থে তিনি কীর্ত্তিবর্ম্মা রাজার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইনি অবশ্যই চালুক্যবংশীয় মহারাষ্ট্রপতি কীর্ত্তিবর্ম্মণ্ হইবেন। পাশ্চাত্য চালুক্যবংশে দুইজন কীর্ত্তিবর্ম্মার নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে যে বংশাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে তদ্দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যাইবে যে, প্রথম কীর্ত্তিবল্লভ মহারাজ ৪৮৯ শকাব্দে জীবিত ছিলেন এবং দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্ম্মণ্ সত্যাশ্রয় ৭৭৫ শকাব্দ দান্তিদুর্গ দ্বারা রাজ্যচ্যুত হন। দণ্ডী অবশ্যই ইহার অন্যতর নরপতির সমসাময়িক হইবেন। পণ্ডিত এন্ ভাষ্যাচার্য্যের মতানুসারে দণ্ডী খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। সুতরাং ইনি কীর্ত্তিবর্ম্মণ্ সত্যাশ্রয়ের সমসাময়িক আমরা এই মত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ কলাপব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গসিংহ দণ্ডীর গ্রন্থ হইতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং দণ্ডী দুর্গসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। এই দুর্গসিংহ শকাব্দের ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। অতএব বোধ হইতেছে দণ্ডী শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগ অর্থাৎ মহারাষ্ট্রপতি প্রথম কীর্ত্তিবল্লভ মহারাজের সমকালে জীবিত ছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্॥

জীবন-প্রান্তোপনীতের জীবন।

আমি আমাদের দেশের সমস্ত বৃদ্ধ মনুষ্যদিগকে একটী কলেজের ছাত্র জ্ঞান করি। সেই কলেজের নাম বৃদ্ধ মানুষের কলেজ। যাঁহারা চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি ঐ কলেজের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ, যাঁহারা পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ, যাঁহারা ষাইট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ, এবং যাঁহারা সত্তোর বৎসর পার হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এম, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ জ্ঞান করি। যে দুই একটি লোকের আশি বৎসর বয়স তাঁহাদিগকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেণ্ট জ্ঞান করি। তাঁহারা উক্ত ষ্টুডেণ্টযিপ প্রাপ্ত হইয়া কলেজ আউট্ হয়েন। চল্লিশ বৎসরের লোক এত কম বয়স্ক লোক যে তাঁহারা এক প্রকার গ্রেস্ (Grace) দ্বারা কলেজে ভর্ত্তি হয়েন, সে গ্রেস্

"বল বুদ্ধি ভরসা
চল্লিশ হলে ফর্সা।"

এই জনসাধারণ বাক্যের প্রতি সম্মাননিবন্ধন, আর কোন কারণে নহে। সত্য হউক আর না হউক, জন সাধারণ বাক্যকে মান্য করিতে হয়, আর ঐ বাক্য এদেশে কতকটা সত্য তাহা কেন না বলিব।

এই কলেজটি বাপের-টাকা-পাওয়া অলস ছাত্রের পক্ষে বড় সুবিধার কলেজ। এখানে লেখা পড়া অনুসারে লোক উপাধি প্রাপ্ত হয় না; কেবল বয়সের আধিক্য অর্থাৎ Seniority অনুসারে উপাধি প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী বাক্য "বয়সের আধিক্য" দ্বারা বিলক্ষণরূপে মনের ভাব প্রকাশিত হয় না, সেই জন্য বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে বাঙ্গলা আমাদের ইংরাজী হইয়াছে ও ইংরাজী বাঙ্গলা হইয়াছে।

আমি এম, এ, উপাধি প্রাপ্তিকালের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। এক্ষণে আমার কেমন হইয়াছে কেবল অতীতই ভাল লাগে, বর্ত্তমান কিছুই ভাল লাগে না। বাল্যকালে প্রভাকর যেমন দেখাইত তেমন আর দেখায় না, সুধাকর যেমন সুধাময় ঠেকিত তেমন আর ঠেকে না, বায়ু যেমন সে সময় গায়ে মধু ঢালিত সেরূপ আর ঢালে না, সেই সময়ের পুরুষ যেমন শ্রেষ্ঠ বোধ হইত এখন আর কোন পুরুষকেই সেরূপ শ্রেষ্ঠ বোধ হয় না, সেই সময়ে স্ত্রীলোককে যেমন সুন্দরী দেখিতাম এখন একটী স্ত্রীলোকও চোখে সেরূপ সুন্দরী ঠেকে না। বর্ত্তমান কিছুই আর ভাল লাগে না। সর্ব্বদা বাল্যকালের জন্য এবং পুনরায় বালক হইবার জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছি।

"Oh! would I were a boy again,
When life seemed formed of sunny years.

And all the heart then knew of pain,
Was wept away in transient tears.
A time when meadow, grove, and stream,
The earth and every common sight,
To me did seem,
Apparelled in celestial light,
The glory and freshness of a dream."

ভূত কাল ভূত নামের উপযুক্ত নহে, ভাবী কালই ঐ নামের উপযুক্ত, যেহেতু ভূত যেমন অস্পষ্টদৃশ্য অপচ্ছায়া, ভাবী কালও সেইরূপ, তাহার কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। বর্ত্তমানের উপর আমি একেবারে চটিয়া গিয়াছি। বর্ত্তমানের মত প্রবঞ্চক জিনিষ আর নাই, না বলিতে বলিতে অতীত হইয়া যায়। সে কালের বাঙ্গালা ভূগোলে Isthmus শব্দের অনুবাদ করিত, "ডমরু মধ্য", এক্ষণে "যোজক" করিয়া থাকে। আমি এমনি অতীত কালের অনুরাগী যে "যোজক" শব্দ অপেক্ষা "ডমরু মধ্য" আমার ভাল লাগে। বর্ত্তমান কাল, ভূতকাল (বিষ্ণু ! অতীতকাল) ও ভাবী কালের মধ্যে এমনি সরু ডমরু-মধ্য যে তাহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। একটী কথা আছে "বাবুর বুদ্ধি এমনি সূক্ষ্ম যে নাই বলিলে হয়।" বর্ত্তমান কালও সেইরূপ। বর্ত্তমান কালের উপর চটিয়া গিয়া আমি কতকগুলি সংকল্প করিয়াছি, সে সকল সংকল্প নিম্নে দফাওয়ারী লিখিত হইল।

১। চল্লিশ বৎসরের নীচের লোকের সহিত আর বাক্যালাপ মাত্র করিব না। চল্লিশ বৎসরের নীচে যাহারা তাহারা পৃথিবীর আধুনিক উৎপত্তি, অতএব হেয়। সকল প্রকার আধুনিক হেয় ; সকল প্রকার বুনিয়াদি পূজনীয়। যদি চল্লিশ বৎসরের নীচের লোক আমাকে কোন কথা বলিতে চাহেন, চল্লিশ বৎসরের উপরের লোকের দ্বারা তাহা আমাকে জানাইবেন। আমার এক্ষণে একটী বৃদ্ধ লোককে অমূল্য নিধি বলিয়া বোধ হয়। আমার মনের ও শরীরের ভাব তিনি যেমন বুঝিতে পারেন এমন যুবকেরা বুঝিতে পারে না। Bulwer Lytton যথার্থই বলিয়াছেন "There is a line of demarkation between the old and the young" যুবক বৃদ্ধের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশকারী রেখা আছে। বৃদ্ধ মানুষদিগকে আমি এত ভালবাসি যে ইচ্ছা হয় ভিন্ন ভিন্ন বয়সের বৃদ্ধ মানুষ সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধাশ্রম নামক একটি আশ্রম রাখিয়া দিই এবং সেই আশ্রমমধ্যে দিনরাত্র বসিয়া থাকি, এবং আশ্রমবাসী জীবদিগের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করি। কিন্তু ইহা আমার সাধ্যের অতীত।

২। বাল্যকালে যে বাটীর যে ঘরে অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছিলাম, সেই ঘরে সর্ব্বদা থাকিব। শরীর রক্ষার জন্য ব্যায়াম আবশ্যক স্বীকার করি, সেই জন্য সেই ঘরে দিনের মধ্য কিয়ৎক্ষণ পাইচারি করিব। ইচ্ছা যে সারাদিন অনন্যরত হইয়া তিন ও

চারের দফায় (সেই দুই দফা দেখিতে আজ্ঞা হউক) উল্লিখিত কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিব, আর এই ঘরে বসিয়া কেবল চল্লিশের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনা সকল ক্রমাগত স্মরণ করিব।

৩। আমার এক রোগ আছে—লোকে আমাকে যে চিঠি লেখে তাহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা। বাল্যকাল হইতে আমি এইরূপ করিতেছি। কিন্তু এখন আমার চল্লিশ বৎসর বয়সের আগে লোকে আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিল তাহাই কেবল রাখিয়া দিব, আর সকল চিঠি আধুনিক বলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। প্রথমোক্ত চিঠিগুলি দিনরাত্র দেখিব; সৌভাগ্য ক্রমে সে সকল চিঠি অল্প নহে, রাশীকৃত।

৪। চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমের আগে Murray's Spelling Book হইতে Hooke's History of Rome পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক পড়িয়াছিলাম তাহাই কেবল পুনঃ পুনঃ পড়িব, আর কোন বহি পড়িব না। সে সকল পুস্তক কি মধুর! বিশেষতঃ উক্ত Spelling Book। আমি বাল্যকালে পঠিত Spelling Book ও Reader পুনঃ পুনঃ পড়িতে বড়ই ভালবাসি; তাহাদের প্রত্যেক পংক্তির সহিত কি পুরাতন মধুর ভাব সকল জড়িত রহিয়াছে। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

উপাখ্যানমালা।

কৃষক এবং স্বর্গ।

একজন কৃষক ধরাধামে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল যে একজন পৃথিবীর ধনী লোক আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিবা মাত্র স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল এবং স্বর্গস্থ দেব দেবীরা আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। ধনীকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল এবং তাঁহারা সেই আনন্দ কিরূপে প্রকাশ করিবেন তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিবিধ বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে, নানা প্রকার সুললিত সঙ্গীতধ্বনি করিতে করিতে, ধনীকে স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া স্বর্গের ভিতরে লইয়া গেলেন। কৃষক দ্বারে মৌনভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল। সে ভাবিল, "কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে যাহা স্বর্গেও তাহা। মর্ত্ত্যলোকে বড়মানুষদিগের আদর এবং নির্ধনদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা। এখানেও তাই! আমাদিগের তবে কোথাও বাঁচিয়া সুখ নাই।" এইরূপ ভাবিতেছিল এমন সময় দেব দেবীরা ধনীকে স্বস্থানে রাখিয়া কৃষককে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহারা তাহাকেও সেইরূপ সমারোহ করিয়া লইয়া গেলেন।

কিন্তু কৃষক পথিমধ্যে নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে না পারিয়া একজন দেবকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"হে দেব! পৃথিবীতে ধনীদিগের আদর দেখিয়া আসিয়াছি। এখানেও কি সেইরূপ।" দেব উত্তর দিলেন "না, ধনী নির্ধনের বিচার স্বর্গে নাই। এখানে বড়মানুষের যেমন আদর গরিবেরও তেমনি। তুমি মনে করিও না যে ধনীকে দেখিয়া আমাদের যতটা আনন্দ হইয়াছিল তোমাকে দেখিয়া তদপেক্ষা কিছু ন্যূন হইয়াছে, তাহা নহে, তুমি আমাদিগের বিশেষ স্নেহের পাত্র।" তবে যে এক জন ধনীকে এইমাত্র আমরা বিশেষ আদর করিলাম ইহার কারণ এই যে ধনীদিগের মধ্যে একশত বৎসরের মধ্যে একবার একজন এখানে আসেন। আর নির্ধনেরা এখানে প্রত্যহই আসিয়া থাকে। এবার অনেক বৎসর পরে একটি ধনী আসিয়াছেন। সেই জন্য আমাদিগের এত আহ্লাদ হইয়াছিল।

গাধা এবং জ্যোতিষ।

কাশীতে এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বাস করিত। তাহার নাম রাম শর্ম্মা। সে দিন রাত্রি কেবল আকাশের তারা দেখিত। তাহার গৃহে বড় বড় জ্যোতিষের পুস্তক স্তূপাকৃত ছিল, এবং নানাপ্রকার যন্ত্রও তাহার পাঠমন্দিরকে সুশোভিত করিয়া থাকিত। দেয়ালে আকাশের মানচিত্র সকল দোদুল্যমান, তাই ঘরে প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে এ মর্ত্ত্যলোক নহে, কোন গ্রহ কিম্বা নক্ষত্র মণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাম শর্ম্মার নাম ধরাতলে বিখ্যাত ছিল। নবজাত পুত্রের জীবন বিষয়ক শুভাশুভ গণনা করিতে হইলে লোকে তাহাকেই ডাকিত। নব বিবাহিতা কন্যাকে স্বামী-গৃহে পাঠাইতে হইলে শুভদিনের তত্ত্ব রাম শর্ম্মা আসিয়া বলিত। তাহার বিদ্যার এতদূর শক্তি ছিল যে সে রাবণ সীতাকে যে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে তাহা পর্য্যন্ত বলিয়া দিয়াছিল। এইরূপে রাজা প্রজা সকলের কাছে রাম শর্ম্মা একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য ছিল।

একদিন রাম শর্ম্মা লেখা পড়ার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার গৃহে বিশ্রাম করিতেছে। তাহার কুটীরটি ভারি সুন্দর, তাহার সন্নিকটে বড় বড় ভূমিখণ্ড, সেই ভূমিতে নানা প্রকার শস্য জন্মিয়াছে। সে বৈকালে বসিয়া আছে; নয়ন কেবল আকাশের দিকে এবং অঙ্গুলি নড়িতেছে—যেন কোন একটা বৃহৎ অঙ্ক কশিতে নিযুক্ত আছে। এমন সময় একজন বৃদ্ধ মৃদু মন্দ গতিতে রাম শর্ম্মার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গর্দ্দভোপরি আরোহণ করিয়াছিল। গর্দ্দভকে একটি বৃক্ষের তলায় বাঁধিয়া রাম শর্ম্মাকে বলিল "দাদা, তোমাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি। আর একঘণ্টা পরে এমন ঝড় উঠিবে যে তাহাতে তোমার শস্য সকল নষ্ট হইয়া যাইবে। এবং তোমার ঘরও স্থির থাকিবে না। সেই জন্য

বলিতেছি যে সকল পদার্থ তোমার বাহিরে পড়িয়া আছে, এখনি ঘরের ভিতর লইয়া যাও এবং কোন প্রকারে শস্যগুলিকে রক্ষা কর।"

রাম শর্ম্মার চক্ষু কখন, মর্ত্ত্যলোকে স্থাপিত থাকিত না। আকাশে তিন বার চক্ষু ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল "কৈ! আমিত ঝড়ের কোন লক্ষণ দেখিতেছি না, আকাশে কণামাত্র মেঘ নাই এবং চারিদিক উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখিতেছি। কোন্ শাস্ত্রে আজ ঝড় হইবে লিখিত আছে?" বৃদ্ধ বলিল "আমার শাস্ত্রও আছে এবং সত্যও আমার দিকে।" রাম শর্ম্মা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "আমার সঙ্গে আর ঠাট্টা করিতে হইবে না। রাম শর্ম্মাকে আর যে সে পাও নাই। এখনি এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা এই যন্ত্র দিয়া তোমার উদর বিঁধিব।" বৃদ্ধ চলিয়া গেল। কিন্তু ঠিক এক ঘণ্টা পরেই আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা দিল। তৎপরেই গগণমণ্ডলে বিদ্যুৎ ভিন্ন আর কিছু দৃষ্টিগোচর হইল না। তাহার পর যেমন বৃষ্টি, তেমনি শিলা, তেমনি বজ্রপাত। আর বাতাসের আধিপত্যের ত সীমা রহিল না। ক্রমে ক্রমে রাম শর্ম্মার শস্যগুলি সব নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহার কুটীরও ভগ্ন তরীর ন্যায় ভাসিতে লাগিল। রাম শর্ম্মা প্রাণ রক্ষার্থ বাহির হইয়া পড়িল এবং দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই বৃদ্ধের কুটীরে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধকে দেখিয়া বলিল "ভাই আমার অপরাধ হইয়াছে, মার্জ্জনা কর। তোমার কথাই সত্য হইল। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি কোন্ জ্যোতিষীর পাঠশালায় পড়িয়াছ, এবং তোমার গুরু কে?" বৃদ্ধ বলিল "দাদা, প্রকৃতি পাঠশালায় আমার অধ্যয়ন হইয়াছে এবং আমার গুরু এই গাধাটি, যাহার উপর আমি আরোহণ করিয়া থাকি।" রাম শর্ম্মা আকাশের দিকে তাকাইয়াছিল। এই কথা শুনিয়া সে কিয়ৎক্ষণের জন্য মর্ত্ত্যলোকে আসিল এবং গাধার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধকে বলিল "ভাই, আমার সহিত ঠাট্টা করিও না। বাস্তবিক তোমার গুরু কে তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" বৃদ্ধ বলিল "সত্য সত্য বলিতেছি যে আমার গুরু এই গাধাটি ভিন্ন আর কেহ নহে। অদ্য ঝড় হইবে কি আকাশ পরিষ্কার থাকিবে এ গূঢ় কথা আমি গাধার কাছে শিখিয়াছি। আমায় ইহার জন্য জ্যোতিষ পড়িতে হয় না এবং কোন যন্ত্রও ব্যবহার করিতে হয় না। যদি ঝড় হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে দেখিতে পাই যে সে পৃষ্ঠদেশ উচ্চ করে, গাত্রের লোমগুলি দাঁড়াইয়া উঠে, আর লাঙ্গুল পদদ্বয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। আর যদি অদ্যকার মত প্রলয়ের ঝড় উঠে, তাহা হইলে কর্ণ চক্ষু আকাশের দিকে ফিরায়, আর চারি পা তুলিয়া এমনি লম্ফ দেয় যেন বোধ হয় রাজ্যের মশা আসিয়া তাহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপে আমার কোন জ্যোতিষীর আবশ্যকতা হয় না। কারণ আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে গাধাই জ্যোতিষী এবং জ্যোতিষীই গাধা।" বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া রাম শর্ম্মা আর কিছু বলিল না, কেবল তাহাকে এই কথাটি গুপ্ত রাখিতে অনুরোধ করিল। নিস্তব্ধে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সেই ঝড়ে যে মহা জলপ্লাবন হইয়াছিল তাহার মধ্যে

যত জ্যোতিষের পুস্তক, যত যন্ত্র, সব একত্র করিয়া নিক্ষেপ করিল। কিন্তু এমন আশ্চর্য্য কথা গোপন থাকিবে কেন? তাহার পর দিন হইতে রাম শর্ম্মা কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাকে শুনাইয়া এক জন আর একজনকে বলিত "ভাই, আমাদের গাধাই জ্যোতিষী—আর আমাদের জ্যোতিষীই গাধা।"

শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন।

সম্পাদকের চিত্রচয়ন। *

জাপানী প্রহসন।

নাট্টোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

বৌদ্ধমন্দিরের পুরোহিত।...মন্দিরের সেবাধারী।...তিনজন গ্রামবাসী

দৃশ্য—মন্দির।

পুরোহিত—আমি এই মন্দিরের পুরোহিত। আমার সেবাধারীকে ডেকে একটা সম্বাদ জ্ঞাপন কর্‌তে হবে। ওহে সেবাধারি! ঘরে আছ হে!

সেবাধারী—আজ্ঞে এই যে দাস হাজির, কি মনে করে দাসকে স্মরণ করা হয়েছে?

পুরোহিত—তোমাকে ডাকবার কারণ শুধু এই:—এই মন্দিরের অযোগ্য পুরোহিত, আমি, এখন বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হয়েছি তাই এখন মন্দিরের সব কাজ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে ওঠা আমার পক্ষে একটু কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্যে আজ হতে তোমাকে আমার পদে নিযুক্ত করে আমি মন্দিরের পৌরহিত্য হতে অবসর গ্রহণ কর্ত্তে সংকল্প করেছি।

সেবা—আমি মশায়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেম। কিন্তু যেহেতু আমার এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি, এবং যেহেতু আপনি যত বিলম্বেই অবসর গ্রহণ করুন না কেন, আমার কখনই তাকে বিলম্ব বলে বোধ হবে না, সেইজন্যে আমার অনুরোধ এই যে আপনি আর কিছুকাল বিলম্বে অবসর গ্রহণ করবেন।

পুরো—তোমার বিনয়ে আমি বড় প্রীত হলেম। কিন্তু এইটে জেনো যে পৌরহিত্য হতে

* "চিত্রচয়ন," এখানে চিত্র অর্থে 'বিচিত্র' বুঝিতে হইবে, 'ছবি' নহে। দুই চারি জন পাঠক উহার 'ছবি' অর্থ করিয়া পরের কথার সহিত মিলাইতে না পারিয়া আমাদের জানাইয়াছেন। তাঁহাদের অনুরোধে এই নোট করিতে বাধ্য হইলাম। ভাং সং।

অবসর গ্রহণ কর্‌লেও আমি মন্দির ত্যাগ করে যাব না। আমি পিছনের একটা ঘরে বাস কর্‌ব, যদি কোন রকম বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হয়, আমাকে জানিও।

সেবা—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আপনি যখন এত করে বল্‌ছেন আমি আর কি করে অস্বীকার করি?

পুরো—আর এ কথাটা যদিও বলাই বাহুল্য তবু একবার বলে রাখি যে দেখো এমন ভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ কোরো যেন গ্রামের সকলেই সন্তুষ্ট হয়, এবং মন্দিরেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়।

সেবা—আজ্ঞে সে জন্যে ভাববেন না; আমি এমন করে চালাব যাতে সকলেই খুসী হয়।

পুরো—আচ্ছা তাহলে আমি এখনই বিদায় গ্রহণ করছি। যদি কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে আমাকে ডেকো।

সেবা—যে আজ্ঞে।

পুরো—আর গাঁয়ের লোক যদি কেউ মন্দিরে আসে ত আমাকে জানিও।

সেবা—যে আজ্ঞে।

(পুরোহিতের নিষ্ক্রমণ)

সেবা—হা! হা! হা! বড় মজাই হয়েছে। আমিও মনে মনে ভাবছি "পুরুৎ ঠাকুর ছুটী নেবে কবে?" "পুরুৎ ঠাকুর ছুটী নেবে কবে?" আর ঠিক এই সময় শুনি না আমাকে পুরুৎগিরি দিয়ে তিনি বিশ্রাম করবেন। গাঁয়ের লোকে শুনলে খুব খুসী হবে; এমনি করে চালাব যাতে সবায়ের মন কাড়্‌তে পারি।

(জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ)

গ্রামবাসী—আমি এই পাড়ায় থাকি। আমার এক জায়গায় কাজে যেতে হচ্ছে, কিন্তু হঠাৎ যে রকম মেঘ করে এসেছে তাতে বোধ হচ্ছে ছাতা না নিয়ে গেলে চলবে না, গাঁয়ের মন্দির থেকে একটা ছাতা ধার নিলে হয়। এই যে মন্দির! ওহে কে আছ! আমি মন্দিরে প্রবেশ প্রার্থনা করি।

সেবা—একজন কে দরজা ঠেলছে। দরজা ঠেলে কেও? কে প্রবেশ প্রার্থনা করে?

গ্রামবাসী—এই আমি।

সেবা—ওঃ আপনি! স্বাগত!

গ্রাম—অনেকদিন যাবৎ আপনাদের খোঁজখবর নিতে আসতে পারিনি। ভরসা করি আপনি এবং পুরোহিত মশায় দুজনেই নিরাময় দেহে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন?

সেবধারী—আজ্ঞে হ্যাঁ আমরা দুজনেই ভাল আছি। কিন্তু একটা নতুন খবর আছে; কি জানি কি ভেবে ঠাকুরমহাশয় আমাকে তাঁর পদে নিযুক্ত করে নিজে অবসর গ্রহণ করেছেন। ঠাকুরমশায়ের আমলে যেমন সদাসর্ব্বদা আপনাদের দর্শন পাওয়া যেত, এখনও যেন আমাদের প্রতি সেরূপ অনুগ্রহ থাকে।

গ্রামবাসী—আপনার এ পদোন্নতির সম্বাদ ত অতি শুভ সম্বাদ, তবে এতদিন জানতেম

না বলে আমাদের আনন্দ প্রকাশ কর্ত্তে আসতে পারিনি, সে জন্যে মাপ করবেন। এখন আমি একটী কাজে এসেছি। আমি এক জায়গায় যাচ্ছিলেম, পথে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে আপনার কাছে একটা ছাতা চাইতে এলেম। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহ করে একটা ছাতা ধার দেন তাহলে বড় উপকার হয়।

সেবা—স্বচ্ছন্দে—তাতে আর কি—আপনাকে ছাতা দেব সে ত আমার খুব ভাগ্যি, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন।

গ্রাম—আপনি আমাকে বড়ই বাধিত করলেন।

সেবা—(ছাতা আনিয়া) এই নিন—আপনার জন্য এই নূতন ছাতাখানি নিয়ে এলেম।

গ্রাম—আপনি আমার বড়ই উপকার করলেন।

সেবা—তা আপনার যখন যা আবশ্যক হয় আমাকে বলতে কিছু সঙ্কোচ বোধ করবেন না।

গ্রাম—তা বৈ কি! আপনাকে বলব না ত কাকে বলব। তা আমি এখন আসি।

সেবা—চল্লেন নাকি?

গ্রাম—আজ্ঞে হাঁ আমি এখন বিদায় হই।

সেবা—তা আসুন।

গ্রাম—আমি আপনার নিকট বড় বাধিত রইলেম।

সেবা—আপনি এখানে এসেছেন এই আমার সৌভাগ্য।

(সেবাধারী ও গ্রামবাসী পরস্পরে পরস্পরের প্রতি গ্রীবাভঙ্গী সহকারে দন্ত-পংক্তি ঈষৎ উন্মোনন পূর্ব্বক ভদ্রতা প্রকাশ করিতে করিতে অবশেষে গ্রামবাসীর নিষ্ক্রমণ)

সেবা—ঠাকুরমহাশয় বলেছিলেন কোন ভদ্রলোক দেখা কর্ত্তে এলে তাঁকে খবর দিতে। যা যা হল তাঁকে সব বলে আসা যাক্। (দ্বারে আঘাত করিয়া) মহাশয় ঘরে আছেন কি?

পুরোহিত—কে হে! তুমি বুঝি?

সেবা—আজ্ঞে হাঁ—মশায়ের একলা একলা বড় বিরক্ত লাগছে না?

পুরোহিত—না, আমি বেশ আছি।

সেবা—এই মাত্র এক জন লোক এসেছিলেন।

পুরো—মন্দিরে পূজো কর্ত্তে না আমাদের সঙ্গে কোন কাজে কর্ম্মে?

সেবা—একটা ছাতা ধার চাইতে এসেছিলেন—তাই তাঁকে একটা দিলেম।

পুরো—তা ভালই করেছ। কিন্তু কোনটা দিলে বল দেখি?

সেবা—সে দিন যেটা নতুন এসেছে সেইটে দিয়েছি।

পুরো—আরে! দেখ দিখি! তোমার যদি কিচ্ছু বিবেচনা আছে! নতুন ছাতাটা ফস্‌করে দিয়ে ফেলতে হয়? সেটা যে একবারও ব্যবহার করা হয়নি! তা যাহোক,

তোমার কাছে এই রকম প্রায়ই লোকে চাইতে আসবে—ভবিষ্যতে তোমার যখন দেবার ইচ্ছে না থাকবে তুমি একটা কোন ওজর করে কাটিয়ে দিও।

সেবা—কি রকম করে কাটাতে হবে?

পুরো—এই রকম একটা কিছু বল্লেই হবে:—"আপনি আমার কাছে একটা সামান্য জিনিষ চেয়ে আমাকে বড় লজ্জা দিচ্ছেন, কিন্তু এই দুএক দিন হল ঠাকুরমশায় সেটা নিয়ে যেমন বেরোবেন আর চৌমাথায় একটা বাতাসের দমকা লেগে তার চামড়াটা এক দিকে উড়ে গেল আর পাঁজরগুল আর এক দিকে ছট্‌কে পড়ল। তাই আমরা সব এক সঙ্গে বেঁধে কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রেখেছি। এরকম অবস্থায় ওটা আপনার কোন কাজে লাগবে কি না সন্দেহ।" এই রকম যা হয় একটা কিছু ওজর করে দিও যাতে নিতান্ত আজগুবি বলে না ঠেকে।

সেবা—যে আজ্ঞে ফিরেবারে আপনার আদেশ স্মরণ রাখ্‌ব, তাহ'লে এখন আমি বিদায় হই।

পুরো—চল্লে?

সেবা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পুরো—আচ্ছা এস—

সেবা—এর মানে কি? ঠাকুর মশায় যাই বলুন না কেন ঘরে জিনিষ থাকতে কেন যে ভদ্র লোককে ধার দেব না তাত বুঝতে পাচ্ছিনে।

(দ্বিতীয় গ্রামবাসীর প্রবেশ।)

২য় গ্রাম—আমি এই পাড়ায় থাকি। আমার আজ অনেকটা দূর যেতে হবে তাই মন্দিরে গিয়ে একটা ঘোড়া চাব ভাবছি। শীগ্‌গির যাওয়া যাক্‌। এই যে মন্দিরে এসে পড়্‌লেম। কে আছ? প্রবেশ প্রার্থনা করি।

সেবা—আবার কে দরজায় ডাকাডাকি করে? কেও?

২য় গ্রাম—আমি।

সেবা—ওঃ আপনি? স্বাগত!

২য় গ্রাম—মহাশয় আমার সাহস মাপ কর্‌বেন, আমার আসবার অভিপ্রায় আর কিছু না, আমার আজ অনেক দূরে যেতে হবে তাই আপনার কাছে একটা ঘোড়া চাইতে এসেছি, যদি একটা ঘোড়া দিতে পারেন তাহ'লে আমার বড় উপকার হয়।

সেবা—আপনি আমার কাছে একটা সামান্য জিনিষ চেয়ে আমাকে বড় লজ্জা দিচ্ছেন, কিন্তু এই দুই একদিন হ'ল ঠাকুরমহাশয় সেটা নিয়ে যেমন বেরিয়েছেন, আর চৌমাথায় একটা বাতাসের দমকা লেগে তার চামড়াটা একদিকে উড়ে গেল, আর পাঁজরগুল আর একদিকে ছট্‌কে পড়্‌ল। তাই আমরা সব একসঙ্গে

বেঁধে কড়িকাটে ঝুলিয়ে রেখেছি। এরকম অবস্থায় ওটা আপনার কোন কাজে লাগবে কি না সন্দেহ।

২য় গ্রাম—সে কি? আমি যে ঘোড়ার কথা বলছি!

সেবা—তাই তো ঘোড়াটার কথাইত হচ্ছে।

২য় গ্রাম—তাহলে অবিশ্যি আর কোন উপায় নাই। তা আমি চল্লেম।

সেবা—চল্লেন?

২য় গ্রাম—হাঁ আজ বিদায় হই।

সেবা—তা আসুন। আপনার সঙ্গে আজ দেখা হল বড় সুখের বিষয়।

২য় গ্রাম—(স্বগত) লোকটা বলে কি! এমন আজ্‌গুবি কথাও ত কখন শুনিনি।

(নিষ্ক্রমণ)

সেবা—এবার ত ঠাকুর মহাশয়ের আদেশ মত কথা বল্লেম। এবার বোধ হয় উনি খুব খুসী হবেন। (দ্বার ঠেলিয়া) মশায় ঘরে আছেন ত?

পুরো—তুমি এসেছ বুঝি? কোন কাজ আছে?

সেবা—এই মাত্র আমাদের ঘোড়া চাইতে একজন লোক এসেছিল।

পুরো—তা দিয়েছ ত? আজ ত ঘোড়াটার অন্য কোন কাজ ছিল না।

সেবা—কৈ না আমি ত দিই নি, আমি আপনার আদেশ মত উত্তর দিয়েছি।

পুরো—ঘোড়ার বিষয়ে তোমাকে কিছু বলেছি বলে ত মনে পড়্‌ছে না, তুমি কি বলেছিলে?

সেবা—"আপনি আমার কাছে একটা সামান্য জিনিষ চেয়ে আমাকে বড় লজ্জা দিচ্ছেন, কিন্তু এই দুই এক দিন হল ঠাকুরমশায় তাকে নিয়ে যেমন বেরিয়েছেন, আর চৌমাথায় একটা বাতাসের দম্‌কা লেগে তার চামড়াটা এক দিকে উড়ে গেল আর পাঁজরগুল আর এক দিকে ছট্‌কে পড়ল। তাই আমরা সব এক সঙ্গে বেঁধে কড়ি কাঠে ঝুলিয়ে রেখেছি, এরকম অবস্থায় ওটা আপনার কোন কাজে লাগ্‌বে কি না সন্দেহ।

পুরো—কি আপদ! আমি তোমাকে ছাতার বেলা ওরকম উত্তর দিতে বলেছিলেম; ঘোড়া চাইতে এলে তাকে কেউ কখনো অমন কথা বলে? ভবিষ্যতে তোমার যদি কখনো ঘোড়া না দেবার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে একটা উপযুক্ত রকম ওজর কোর।

সেবা—কি রকম বলতে হবে?

পুরো—তোমার বলতে হবে "আমরা কিছু দিন হ'ল ঘোড়াটাকে ময়দানে ঘাস খেতে ছেড়ে দিয়েছিলেম, হঠাৎ কিরকম ফূর্ত্তি হয়ে ছুটছুটি কর্ত্তে গিয়ে সে পা মুচ্‌কে ফেলেছে, এখন তাকে আস্তাবলে বিচিলি ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রেখেছি।" এই রকম একটা কিছু বোল যাতে কথাটা সত্যি বলে ঠেকে।

সেবা—আচ্ছা ফিরে বারে এই রকমই বোলব।

পুরো—দেখো আবার যেন কোন রকম বোকামি কোর না।

সেবা—এ রকম করলে ত আর পারিনে। উপদেশ মত কাজ করে ধমকানি খেতে হল। গলদটা যে কোথায় হয়েছে তাত কিছু ধর্ত্তে পার্‌ছিনে; মন্দিরের কর্ত্তা হয়েও ঝন্‌ঝট্‌ এড়াবার ত কোন উপায় দেখ্‌ছিনে।

(তৃতীয় গ্রামবাসীর প্রবেশ)

৩য় গ্রাম—আমি এই পাড়াতেই থাকি। আমার মন্দিরে একটু কাজ আছে তাই সেখানে যাচ্ছি—একটু তাড়াতাড়ি চলা যাক্। এই যে এসে পৌঁচেছি দেখ্‌ছি। কে আছ? প্রবেশ প্রার্থনা করি।

সেবা—আবার দরজায় কে গোলমাল লাগিয়েছে। কেও আস্‌তে চাচ্ছে? কে ডাকাডাকি করছে?

৩য় গ্রাম—এই যে আমি।

সেবা—ওঃ আপনি! স্বাগত।

৩য় গ্রাম—অনেক দিন আপনাদের কোন খোঁজ খবর নিতে আস্‌তে পারিনি, কিন্তু ভরসা করি আপনি আর পুরোহিত মহাশয় দুজনেই বেশ ভাল আছেন।

সেবা—আজ্ঞে হ্যাঁ আমরা দুজনেই ভাল আছি; কিন্তু একটা নতুন খবর আছে; কি জানি কি ভেবে ঠাকুর মহাশয় আমাকে তাঁর পদে নিযুক্ত করে নিজে অবসর গ্রহণ করেছেন।

৩য় গ্রাম—এ ত খুব সুখের বিষয়। এ খবর আগে জান্‌তেম্ না বলে আমাদের আনন্দ প্রকাশ কর্ত্তে আস্‌তে পারি নি, কিছু মনে করবেন না। কাল আমার বাড়ীতে একটু ক্রিয়ে কর্ম্ম আছে, তা আপনি এবং পুরোহিত ঠাকুর যদি অনুগ্রহ করে আসেন তাহলে আমি বড়ই বাধিত হই।

সেবা—তা বেশ ত আমি যাব এখন, কিন্তু ঠাকুরমহাশয় বোধ হয় যেতে পার্‌বেন না।

৩য় গ্রাম—কেন? তাঁর অন্য কাজ আছে বুঝি?

সেবা—তা কিছু না। কিন্তু আমরা ওঁকে সম্প্রতি ঘাস খেতে ময়দানে ছেড়ে দিয়েছিলেম, আর হঠাৎ কি রকম ফূর্ত্তি হয়ে দৌড়োদৌড়ি কর্ত্তে গিয়া তিনি পা মুচ্‌কে ফেলেছেন। এখন তাঁকে আস্তাবলে বিচিলি ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রেখেছি। এ অবস্থায় তিনি আর কি করে যান।

৩য় গ্রাম—কি বলেন মহাশয়! আমি পুরোহিত মহাশয়ের কথা বলছি।

সেবা—তাইতো আমিও ঠাকুর মহাশয়েরই কথা বলছি।

৩য় গ্রাম—তা এরকম দুর্ঘটনার কথা শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলেম। যাহোক আপনি নিজে অনুগ্রহ করে আসবেন ত?

সেবা—আমি নিশ্চয়ই যাব।

৩য় গ্রাম—আমি তাহ'লে এখন চল্লেম।

সেবা—চল্লেন!

৩য় গ্রাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখন বিদায় হই।

সেবা—তা আসুন। আপনার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে বড় সুখী হলেম।

৩য় গ্রাম—(স্বগত) হরি! হরি! বলে কি! ওর কথার মানে বুঝে ওঠা ভার!

(নিষ্ক্রমণ)

সেবা—এবার ঠাকুর মশায় নিশ্চয়ই খুব সন্তুষ্ট হবেন। (দ্বার ঠেলিয়া) ঘরে আছেন কি?

পুরো—এই যে তুমি এসেছ। কোন কাজ আছে না কি?

সেবা—এই মাত্র এক জন লোক আমাদের দুইজনকেই নিমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছিলেন, কাল তাঁদের বাটিতে কি ক্রিয়া কর্ম্ম আছে। তা আমি বলে দিয়েছি যে আমি যাব কিন্তু আপনি বোধ হয় নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্ত্তে পার্বেন না।

পুরো—আহা ওকথাটা না বল্লেই হোত। আমি কাল খুব খুসী হয়ে যেতেম। আমার ত কাল কোন কাজ কর্ম্ম ছিল না।

সেবা—কিন্তু আমি ত আপনার আদেশ মতই বলেছি।

পুরো—কৈ এ বিষয় আবার তোমাকে কি আদেশ দিয়েছিলেম? তুমি কি বলেছিলে বল দেখি।

সেবা—আমি বল্লেম যে সম্প্রতি মশায়কে ঘাস খাবার জন্যে ময়দানে ছেড়ে দেওয়া গিয়েছিল, তাতে আপনার একটু বেশী ফূর্ত্তি হওয়াতে দৌড়োদৌড়ি কর্ত্তে গিয়ে পা মুচ্‌কে ফেলেছেন, তাই বিচিলি ঢাকা দিয়ে আস্তাবলে শুইয়ে রেখেছি।

পুরো—তুমি সত্যি সত্যি এই কথা বলেছ?

সেবা—সত্যিই বলেছি।

পুরো—আ মোলো যা! এমন গাধাও ত দেখিনি! আমি যতই বকে মরি না কেন, তোমার মাথায় কিছুতেই কিছু ঢোকাতে পারিনে। ও কথা যে আমি তোমাকে ঘোড়ার বেলা বলতে বলেছিলেম! এর থেকে বুঝতে পাচ্ছি বাপু তোমার দ্বারা পুরোহিতের কাজ হবে না, তুমি দূর হও। (প্রহার)

সেবা—উঃ উঃ!

পুরো—যাবি নে বেটা! যাবিনে বটে।

সেবা—আরে মলুম গো গেলুম। ঠাকুরমশায় আপনি আমার মুনিব আছেন ত মুনিব আছেন, তাই বলে আমার উপর মারধোর কর্‌বেন কেন। আর আমি এমনি কি অন্যায় কথা বলেছি, আপনার কি কখনও ফূর্ত্তি হয় না।

পুরো—আমার আবার কবে ফূর্ত্তি দেখ্‌লি ঠিক করে বল। (প্রহার)

সেবা—এই যে বলছি মশায়।

পুরো—ঝট্ করে বল্।

সেবা—মন্দিরের বাইরে যে সে দিন ইচি দাঁড়িয়েছিল।

পুরো—ইচি দাঁড়িয়েছিল তা কি হয়েছে।

সেবা—শুনুন বলি। আপনি তাকে ইসারা করে ডেকে গাছতলায় আড়ালে নিয়ে গিয়ে গালটিপে আদর কর্‌লেন, তখন যে আপনার বিলক্ষণ ফূর্ত্তি হয়েছিল, তাত আর অস্বীকার কর্ত্তে পার্‌বেন না।

পুরো—পাজি বেটা। আমাকে এ রকম অপমান? তোর মুনিবের নামে এ রকম মিথ্যে বদ্‌নাম রটান। আজ আর আমি তোকে আস্ত রাখ্‌ছিনে।

সেবা—ভ্যালা মুনিব আমার, আমিও ছেড়ে কথা কচ্ছিনে। (পরস্পরকে প্রহার)

উভয়ে—মার মার উঃ উঃ ইত্যাদি (পুরোহিতের পতন)

সেবা—বুড়ো বেটাকে আজ আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছি। বেটাকে ঠেঙ্গিয়ে দিল বড় খোস্ হল।
প্রস্থান।

পুরো—উহুঃ হুঃ মুনিবকে মেরে ফেলে লক্ষ্মীছাড়াটা পালাল কোথা। কে আছে ওখানে—ওকে ধর—আমি কিছুতেই পালাতে দেব না—কিছুতেই ছাড়্‌ব না ইত্যাদি।

কবিতাগুচ্ছ।

হায়!

হায়—ক্ষুদ্র এক কথা—
তার মাঝে কত আকুলতা!
তার মাঝে কি গভীর ব্যথা!
হায়—একটী নিশ্বাস,
তার মাঝে কত না পিয়াস!
কি গম্ভীর ঝটিকা নিরাশ!
হায়—ফোঁটা অশ্রুধার,
তার মাঝে রুদ্ধ যাতনার,
কি গভীর মহা পারাবার!
হায়—একটী নিমেষ,
তারি মাঝে জীবনের শেষ!
তারি মাঝে অনন্তের দেশ!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

তরুর বিলাপ।

লতা বলে, তুমি তরু ক্ষুদ্র আমি লতা,
ভালবাসি নাহিক ক্ষমতা,
যত বাসি আরো বাসিবার,
হৃদে উঠে বাসনা অপার,
কিছুই ত পূরে না তাহার,
থেকে যায় শুধু আকুলতা।
তরু বলে, প্রেয়সি আমার!
ভালবেসে নাশিছ জীবন,
পূরে না তবুও আকুলতা
না জানি সে বাসনা কেমন।
সোহাগের বন্ধনের ফেরে—
তনু অবসন্ন জরজর,
বিহ্বল প্রেমের সুধা ঘোরে,
জ্ঞানহীন আছি মর মর।
একদিন ছিনু বটে তরু,
এখন যে কাষ্ঠমাত্র সার,
ক্ষুদ্র লতা আজি সে বিশাল,
পদতলে পড়ে আছি তার।
কোমলতা ভেঙ্গেছে পাষাণ,
লতাতেই পড়িয়াছি ঢাকি,
পূরিল না বাসনা এখনো,
মরিতে যে আছে শুধু বাকী।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

খোকা।

কি মোহ মদিরা ভোর, দেছিস পরাণে মোর—
এ কোন স্বপন ঘোর, সবি গেছি ভুলে
কবিতার কল্পনার একটি কি ছিন্ন তার
বাজিতেছে চারিধার হৃদি উপকুলে।
জ্যোছনা কিরণ ধারা আনমনে আত্মহারা,
আমার হৃদয়ে সারা—ঘুরে খেলা ছলে।
তুই কোথা হতে এসে, বাঁধিলি এ মায়া ফাঁসে,
ভেবেছিনু বেলা শেষে হেসে যাব চলে।
চেয়ে ও মুখেতে হায়, ভুলে যাই আপনায়,
কি মধু হাসিটি ভায় ও রাঙ্গা অধরে—
কোমল চরণ ফেলে, হাসি শিশু যেন খেলে,
ফুটে আপনায় ভুলে যুঁই থরে থরে।
অমনি মধুর হেসে, পরাণে থাকিস মিশে,
স্নেহরাশি ভালবেসে উজলে নয়ন।
আরো তুই বাঁধ মোরে এ মোহ স্বপন ঘোরে,
চিরটি জীবন ধোরে রহিব মগন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

পত্র।

পুনার চিত্রশালায় রবিবর্ম্মার কতকগুলি সুন্দর ছবি আছে, তাহার মধ্যে একখানি বড় মজার! কোন যুবতী স্বামীর সহিত আড়ালে যে সকল প্রণয় কথা কহিয়াছেন, তাঁহার গৃহপালিতা চতুরা সারিকা সে সমস্ত শিখিয়া লইয়া শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের সাক্ষাতে তাহা আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে! যুবতীর বিপদ ভাবিয়া দেখ! তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া দুষ্ট সারির মুখ চাপিয়া ধরিয়াছেন। ক্রোধ, লজ্জা, বিরক্তির ভাব অতি সুন্দররূপে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পুনার প্রদর্শনী গৃহে দেখিবার সামগ্রী এখনো যথেষ্ট আছে। পুনার নির্ম্মিত পিত্তল কাঁসার দ্রব্যাদি এবং মৃত্তিকা মূর্ত্তি, এদেশীয় শিল্পনৈপুণ্যের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। সেই দিন কোন কারণে কিছুক্ষণের জন্য একবার আমরা একটা রাস্তার ধারে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া আছি, সেই সময় দেখিলাম, পথপ্রান্তে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ইষ্টকনির্ম্মিত উচ্চ শিবালয়; সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার ভূষিতা একটি বালিকা সেই দেবালয়ে উঠিল, উঠিয়া দেবপ্রণাম করিয়া প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিল। সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে, এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণের পর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা নিয়ম, কিন্তু বালিকা কিছুতেই মনস্থির করিয়া প্রদক্ষিণ পূজা শেষ করিতে পারিতেছে না, বার বার থামিয়া থামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, আবার অন্যমনস্কভাবে প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া প্রণাম করিতেছে। এইরূপে ক্রমশঃই তাহার গতি অলস এবং প্রতিবারেই তাহার প্রণামের আনতি কম হইয়া পড়িতেছে। প্রথমবার সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়াছিল, দ্বিতীয়বার বেশ একটু নীচু হইয়া ঘাড় নোয়াইল, তৃতীয়বার অমনি ঘাড় নোয়াইল, চতুর্থবার ঘাড় নাড়িলমাত্র; পঞ্চমবার যেমন ঘাড় তেমনি রহিল, অঙ্গুলি দ্বারা কপাল স্পর্শ করিয়া প্রণাম শেষ করিল, ষষ্ঠবার কি করিল, জানি না, জানিবার জন্য কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছি, দেখিলাম, মন্দিরের নিকটের একটি গৃহ দ্বারে এতক্ষণ যে রমণী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি বালিকার নিকটে আসিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কি বলিলেন, বালিকা তখন সভয়ে রীতিমত প্রকারে প্রদক্ষিণ শেষ করিল। রমণী যে বালিকার মাতা তাহা বোধ হয় বুঝিয়াছ। মাতার ভয় পূজানুষ্ঠানের ত্রুটিতে কন্যা দেবতার ক্রোধভাজন হইবে, কন্যার ভয় পূজা ঠিক না হইলে মাতার নিকট শাস্তি পাইবে, উভয়ের সম্মিলিত ভয়ে মাঝখান হইতে মহাদেব সসম্মানে পূজা লাভ করিয়া লইলেন। এখন কথা হইতেছে ভয়ের পূজা কি পূজা, না প্রেমের পূজাকেই আসল পূজা বলিবে? পুনায় আমাদের এক ক্ষ্যাপা বন্ধু আছেন, তিনি বলেন, ভয়ও যা প্রেমও তা একই কথা; যেখানে যত প্রহার সেইখানে তত প্রেম, প্রহার নইলে প্রেম টেঁকে না। তিনি অনেকবার প্রেমে পড়িয়াছেন, কিন্তু প্রহারনিপুণ নহেন বলিয়া বিবাহ করেন নাই।

অন্য পক্ষে সে বিষয়ে নিপুণা হইলেও বা হইত; কিন্তু তাহারো কোনরূপ প্রমাণ না পাওয়াতে বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাকে একেবারেই হতাশ্বাস হইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে যেমন বিবাহ করা অমনি 'Bastinado' (লগুড়াঘাত) সুরু না করিলে সমস্ত বিশৃঙ্খল!

ইনি তাই এক অদ্ভুত ব্যাপার! পুনার শোভা সৌন্দর্য্যের কথা তোমাকে আগেই বলিয়াছি, কিন্তু সে সকল কিছুই এখানকার তাজ্জব নহে। এখানে আসিয়া যদি তাজ্জব দেখিতে চাও ত আমাদের বন্ধুটিকে দেখা আবশ্যক।

বাহ্যাকারে ইঁহার যে বিশেষ কিছু অদ্ভুতত্ব আছে তাহা নহে; দেখিতে সাধারণ ভদ্রলোকেরই মত। একটু খাটখোট, পাতলা সাতলা, গৌরবর্ণ সুশ্রীমুখ, সুপুরুষ বলিলেও নিতান্ত অসঙ্গত হয় না, সাজ সজ্জাতেও অসাধারণত্ব কিছু নাই; সাধারণ বিলাত ফেরতের বেশ; অর্থাৎ হ্যাটকোটধারী, তবে সন্ধ্যা বেলা যখন হ্যাটের বদলে বালিশের খোলের মত এক অপরূপ বস্ত্রাবরণ তাঁহার মাথার উপর দিয়া কপাল ঢাকিয়া কাণ পর্য্যন্ত নামে, আর কোটের বদলে এক ঢিলা ঢালা আলখাল্লায় দেহমণ্ডিত হয়, তখন বটে সে সাজে তিনি যেন খোলসছাড়া স্ব-রূপে বিরাজিত হন, বাহ্যাকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির ইহাতে এমন একটা অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

দুদিন যদি তোমার ইঁহার সঙ্গে আলাপ হয় তাহা হইলেই বস্, ইনি তোমার নিকট স্বপ্রকাশ! কথায় কথায় অদ্ভুত বিশেষণের বুলি, অবিরাম মুখভঙ্গী, সমস্তক্ষণ একই প্রসঙ্গ, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুদিগকে লইয়া অবিশ্রান্ত নাড়াচাড়া, তাহাদেরই কথা, তাহাদেরই গল্প, তাহাদের সুখ দুঃখের রহস্যময় বিশ্লেষণে পরমানন্দ লাভ করিয়া অনবরত হাস্য, আর এইরূপ ভাষ্য, হাস্য, রহস্যে তোমার অবশ্যম্ভাবী সম্প্রীতি প্রকাশক ভাবের ব্যত্যয় দেখিলে আশ্চর্য্য এবং বিরক্তিসূচক আর্ত্তনাদ যথা Do you hear, do you understand,—ইত্যাদি, এবং এইরূপ গল্প ও চীৎকারের মাঝখানে সহসা আধচ্ছত্র গানের সুর টানা, বা সহসা হাস্যকর গম্ভীরভাব ধারণ করা;—খানিকক্ষণ, তাঁহার কাছে বসিয়া এই সকল ব্যাপার দেখিলে সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব যে কিরূপ তাহাতে তোমার অভিনব জ্ঞান জন্মিবে, আর সাধু সঙ্গে তুমি নিজে ঠিক প্রকৃতিস্থ আছ কি না, সে সম্বন্ধেও তোমার সন্দেহ উপস্থিত হইবে।

তিনি যখন একাকী থাকেন তখন যে তাঁহার গল্পের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, তাহাও নহে। দূর হইতে দেখ, তিনি একাকী আপন মনে কথা কহিতেছেন, হাত নাড়িতেছেন, আর মাঝে মাঝে হাসিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছেন। কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা কর ব্যাপারখানা কি তাহা হইলে আবার সেই সকল পুরাণ গল্প,—কিরূপ করিয়া কোন্ দিন তাঁহার কোন্ করুণাস্পদ বন্ধুদম্পতী পরস্পরের উপর রাগ করিয়া মুখ গোম্সা করিয়া বসিয়াছিল, কোন্ দিন কোন্ আহাম্মক কিরূপ গদগদ ভাবে কোন্ সুন্দরীর সহিত কথা কহিয়াছিল, কোন্ দিন তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার রহস্যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক চটিয়া গিয়াছিল, বিবাহ

প্রস্তাব করিয়া তিনি কিরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিলেন—আর চূড়ান্ত হাস্য-জনক ঘটনার দৃষ্টান্তস্বরূপ—তাঁহার সেই প্রত্যাখ্যানকারিণী প্রণয়িণী পরে নিজে হইতে আবার কিরূপে তাঁহাকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি নানা গল্পের মধ্যে যেটি আপাততঃ তাঁহার হাস্যের কারণ সেইটির পুনরাবৃত্তি করিবেন।

হংস যেমন নীর ছাড়িয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, সেইরূপ ইনি বন্ধুদিগের গভীর দুঃখের মধ্য হইতেও হাস্যরসের সার সংগ্রহ করিয়া নিজের জীবনের খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা হইতে যদি তুমি মনে কর যে, ইঁহার বন্ধুতা সব ফাঁকিজুঁকি, লোকটা নিতান্ত হৃদয়হীন, অসার, চপলচিত্ত, তাহা হইলে কিন্তু ভুল বুঝিবে। ইনি যে অসার নহেন, তাহার প্রমাণ, সকল শাস্ত্রের সার অঙ্কশাস্ত্র, ইঁহার মস্তিষ্কমন্থিত হইয়া সাধারণে বিতরিত হইয়া যায়। আর ইঁহার বন্ধুবাৎসল্য এত অধিক যে কঠিন মৃত্তিকাও দ্বিধা হইয়া থাকে, কিন্তু ইঁহার বন্ধুত্ব কখনো ভাঙ্গে না। এই দেখনা আমার ভ্রাতার সহিত বহুদিন পূর্ব্বে ইঁহার বিলাতে প্রথম আলাপ, তার পর একজন কর্ম্মসূত্রে একজন জন্মসূত্রে, উভয়ে প্রায় ৩৫ বৎসর ধরিয়া এই একই অঞ্চলের নিবাসী, ইহা সত্বেও ইঁহাদের বন্ধুত্ব এই দীর্ঘকাল সমভাবে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। "Familiarity breeds contempt" এ প্রবাদ বাক্যটি যদি কোথাও খাটে ত ইঁহার সম্বন্ধে খাটিবার সম্ভাবনা ছিল, অথচ এ সম্ভাবনাটা তাঁহার পক্ষে যেমন অসম্ভব দেখিতেছি, এমন আর কোথাও নহে। আসল কথা, বন্ধুদের খরচে ইনি হাসেন বটে, কিন্তু সে হাসি এমন কাঁটাখোঁচা হীন মোলায়েম, যে তাহাতে বন্ধুত্বের উপর কোনই আঘাত লাগে না। বরঞ্চ তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যবহারের মধ্য দিয়া এতটা বন্ধুবাৎসল্য প্রকাশিত হয় যে, বন্ধুগণও তাহাতে ক্ষুণ্ন না হইয়া তৃপ্তিলাভ করেন।

চপলতা বলিতে যাহা বুঝায়, অর্থাৎ অনুরাগের অস্থিরতা, ইঁহার স্বভাবে তাহা আদপে নাই বলিলেই হয়। সমস্ত অনুরাগই ইঁহার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ইনি সঙ্গীতানুরাগী—ইমন, মল্লার প্রভৃতি ইঁহার যে কয়টি প্রিয় রাগিণী আছে, তাহা শুনিলে সানন্দে গলিয়া যান, ক্ষেপিয়া উঠেন, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্যান্য রাগ রাগিণী ইঁহার নিকট যেন সপত্নীসন্তান, কেহ গাহিলে বলেন, "উহা থাক, ইমন্ গাও, মল্লার ধর" বলিয়াই নিজে "গরজত বরষত ভি—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। গান, গল্প, বোলচাল সকল বিষয়েই তাঁহার এই এক ভাব, এমন কি তাঁহার প্রেমাভিনয়ও এই ভাবে ধারাবাহী হইয়া একটি পরিবারের তিনটি বোনের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। ইঁহার বয়স এখন ৫০ হইবে, এখনো ইনি অবিবাহিত। তিনি যখন উক্ত পরিবারের প্রথম ভগিনীর প্রেমে পড়েন—তখন তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়টির প্রেমে পড়িয়া তিনি প্রত্যাখ্যাত হন; তৃতীয়টি তাঁহার কন্যাস্থানীয়া; তাহার বয়স এখন ২০ মাত্র; অবশ্য এ কারণে ইঁহার সহিত

তাঁহার প্রেমাভিনয়ের কোন ব্যাঘাত নাই, তাহাকে শাসাইয়া রাখিয়াছেন, অন্য কেহ তাহার হস্ত প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিবেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বিবাহ না হওয়ায় লাভ ছাড়া তাঁহার লোকসান নাই। একবার বিবাহ হইলে দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রস্তাবের সুখলাভে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত; এখন চিরজীবন ধরিয়া চিরনবীনাগণের নিকট তাঁহার হৃদয়াশা প্রকাশ করিতে পারেন।

স্ত্রীলোক দেখিতে খারাপ হইলে ইঁহার আদপে সহ্য হয় না। কুরূপা দেখিলেই তাঁহার নেপথ্য-সম্ভাষণ, Horrid, Beast; আর যখন যাহার উপর রাগ হয় তখন সেও Horrid, Beast। বন্ধুগণ কেবল এরূপ সাদর সম্ভাষণ হইতে বঞ্চিত,তাঁহারা সব Silly, জগতের সার সকলি তাঁহার নিকট Silly, বিশেষতঃ হিন্দুজাত এবং ব্রাহ্মণেরা; কেননা তিনি নিজে খৃষ্টান হইলেও তাঁহার জন্ম ব্রাহ্মণ বংশে এবং হিন্দু বন্ধুবান্ধব লইয়াই তাঁহার কারবার।

ইঁহার একটা বিশেষ প্রিয়বাক্য "কিক্ দি বকেট" অর্থাৎ শিঙ্গে ফোঁকা। মৃত্যু বুঝাইতে হইলে, তিনি ইহার পরিবর্ত্তে কখনো অন্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে নাই। বাল্তিতে কেহ লাথি মারিলে ইঁহার দুঃখ হয় না, তা সে কেন যতই বন্ধু হউক না, "তিনিও ত বাল্তির দিকে দিন দিন পা বাড়াইতেছেন, যেমনি লাথিটা মারিবেন অমনি কর্ম্ম নিকাশ।" (এইখানে শবাভিনয়)।

কখন কি একটা কথায় যে ইঁহার কাহাকে ভাল লাগিয়া যায় তাহার ঠিক নাই। এক জনের একদিন মাথা ধরিয়াছিল ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন এইত তুমি বেশ ছিলে, হঠাৎ অসুখ করিল কেন? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর করিলেন "কি করিয়া বলিব; ভগবানের মর্জ্জি" অমনি 'আচ্ছা', 'good', 'nice' এইরূপ প্রশংসাভিনন্দন তাঁহার উপর বর্ষিত হইতে লাগিল এবং সেই দিন হইতে সৌভাগ্যবান বক্তা এবং তাঁহার মহামূল্য বাক্য কয়েকটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আমাদের বন্ধুবরের হৃদয়রাজ্যের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অমরত্ব লাভ করিল। এখন শুনি যখন তখন হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠেন "খোদাকি মর্জ্জি" এবং সেই সঙ্গে ক্ষণজন্মা বক্তারও গুণরাশি কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

তাঁহার বন্ধুপরিবারস্থ তরুণ বয়স্ক বালক বালিকার সহিত বিশেষতঃ বালিকার সহিত তাঁহার বড় ভাব। ভাবের প্রধান লক্ষণ মুখভঙ্গী করিয়া চুল টানিয়া মাথায় কাগজের টুক্রা দিয়া (তিনি বলেন তিনি পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পূজা করিতেছেন) মনের সাধে তাহাদের বিরক্ত করা। যাহারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারে, যে যত শুধ শুদ্ধ তাঁহার ব্যবহার তাঁহাকে ফিরাইতে পারে, তাহাকে তিনি তত ভাল বাসেন। এমন কি তাঁহার প্রিয়তম 'বোকা' হইতেও সে তাঁহার প্রিয় হইয়া উঠে। (বোকা তাঁহার প্রিয় বিড়ালের নাম সম্প্রতি সে বাল্তিতে লাথি মারিয়াছে, তাহার স্থলে আর একটি বিড়াল অধিষ্ঠিত)। ইঁহার টুপি ও ছাতি অধিকার করিতে পারিলেই ইনি বিশেষ জব্দ, তাহাতে কোন বালকবালিকা হাত দিলে ইনি যেন ব্যাটারির আঘাতে অধীর হইয়া উঠেন। তবে ইহা তাঁহার সখের

সাজা, ইহাতে তিনি থাকেন ভাল,তাঁহাকে নির্ঘাত জব্দ করিবার উপায় তিনি যখন তোমার বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া বাস করিতেছেন তখন ইংরাজদিগকে নিমন্ত্রণ করা। এইরূপ নিমন্ত্রণকে তিনি যেমন ভয় করেন, ছেলেরা মুখোষকেও সেরূপ করে না। সোলাপুর পুনার কত নিকট কিন্তু ঐ ভয়ে তিনি এখানে আসা একেবারে ছাড়িয়াছেন। এবার আমরা পুনা ছাড়িবার সময় তিনি তাঁহার বাঁধাগৎ-বিদায়াভিবাদন-রসিকতা (অর্থাৎ রুমালে ঘন ঘন চোখ মোছা আর কান্নার সুরটানা) শেষ করিয়া আমাদিগকে কথা দিলেন, পরের হপ্তায় তিনি নিশ্চয় আসিতেছেন। তাহার পর এমন কত হপ্তা পার হইয়াছে, এখনো ত তাঁহার দেখা নাই। প্রতি চিঠিতেই আশ্বাসবাণী "এই আসিলেন বলিয়া; বেশী দেরী হইবে না, বড় জোর হপ্তা খানেকমাত্র; এই সোলাপুরের ক্রিকেট ম্যাচটা বা ডিনার পার্টিটা বা গভর্ণর সেখানে যাইতেছেন সে হেঙ্গামটা চুকিবার মাত্র অপেক্ষা। তবে আমরা জানি রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণের আশা করাও যা, তাঁহার সোলাপুরে আসার আশা করাও তাই একই; কেননা এমন একটি সপ্তাহ আসিবে, যে সপ্তাহে এখানে ছোট খাটও একটি পার্টি থাকিবে না এরূপ হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তাহা হইলে ত এখানকার ইংরাজ সমাজের শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইবে। এমনিতেই ত সোলাপুর Dull, Dull করিয়া তাঁহারা অস্থির। এখানকার অল্প স্বল্প আমোদে তাঁহারা যেন কলসির জলে কই মাগুরের মত ধড় ফড় করিতেছেন, সে জলটুকুও যদি একেবারে খালি হইয়া যায় তাহা হইলে কি আর রক্ষা আছে। আচ্ছা আমি ত অনেকবার আমার চিঠিতে ইংরাজ সমাজের উল্লেখ করি; শুনিলে তোমার কি মনে হয় পিপড়ার সার, কি পতঙ্গ পাল না মৌমাছির চাক কি বল দেখি? আসলে সে রকমটা কিছুই না; জজ, মাজিষ্ট্রেট, আসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পুলিস কর্ত্তা এবং রেলওয়ে উচ্চ কর্ম্মচারী দুই চারি জন মাত্র লইয়া এই সমাজ। রেলওয়ের নিম্নশ্রেণীর ইংরাজ কর্ম্মচারীদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহারা নীচের দল সুতরাং এ সমাজের বার। তাহারা ইঁহাদের সহিত কখনো ক্রিকেটম্যাচে যোগ দেয় কখনো বা ইঁহাদের কোন সখের নাট্যাভিনয় বা গীতবাদ্যের নিমন্ত্রণে আসে। এরূপ নিমন্ত্রণ পাইলে অবশ্য তাহারা আপনাদিগকে সম্মানিত জ্ঞান করে। ইংরাজদের আমাদের মত জাতিভেদ নাই; কিন্তু তাঁহাদের মত পদমর্য্যাদানুরাগ আর কোথাও দেখা যায় না। ভূতপূর্ব্ব কলেক্টার মিষ্টার ক্যান্‌ডি এ সম্বন্ধে বড় ভাল ছিলেন। এখানকার সবজজ মিষ্টার 'ম' ফিরিঙ্গি বলিয়া কয়েকজন গোঁড়া সিভিলিয়ান তাঁহাকে জিমখানার মেম্বর হইতে দেন নাই, মিষ্টার ক্যান্‌ডি কলেক্টার হইয়া আসিয়া তাঁহাকে সমাজ ভুক্ত করিয়া লইলেন অর্থাৎ জিমখানার মেম্বর রূপে গ্রহণ করিলেন। অবশ্য মিষ্টার 'ম'য়ের এতটা সমাদরের প্রধান কারণ তাঁহার স্ত্রী। তিনি খাঁটি ইংরাজ, তাহাতে বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা, সকলেই সেজন্য তাঁহার প্রতি মমতাশীল, স্বামীকে জিমখানার মেম্বর না করিলে আসলে তাঁহাকেই নির্ব্বাসন শাস্তি দেওয়া হয় সুতরাং কলেক্টরের

প্রস্তাব সহজেই কার্য্যে পরিণত হইল। কেবল ইহাই নহে, ইহার সহায়তায় একজন গুজরাটি হিন্দু ষ্ট্যাট্যুটরি এসিষ্টেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে এই জিমখানার মেম্বর হইয়াছিলেন। ইহারা সস্ত্রীক প্রায় প্রতিদিনই জিমখানায় আসিতেন, খেলা ধূলা করিতেন, তবে স্ত্রী ইংরাজি জানেন না তাই একটু অসুবিধা হইত। আর একটু এই অসুবিধা যে ইহারা যদিও জাতিভেদ মানেন না, ব্রাহ্ম, কিন্তু নিরামিশ ভোজী, সেইজন্য ইংরাজদের সহিত ডিনারে যোগ দিতে পারিতেন না, এই কারণে মিশিয়াও ইহারা ঠিক তাঁহাদের দলে মিশিতে পারেন নাই, কারণ একত্র ভোজ ইংরাজ সামাজিকতার সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

আমরা ইংরাজদের সমকক্ষতা লাভ করা নিতান্ত দুরূহ বলিয়া মনে করি কিন্তু বাস্তব পক্ষে খানাপিনায় ইংরাজ যেমন বশ এমন কোন জাত নহে। মিষ্টার ক্যান্‌ডি থাকিতে সোলাপুরের ইংরাজসমাজ বেশ একটু আরামে ছিল। তিনি প্রায়ই নিত্য নূতন আমোদের বন্দোবস্ত করিতেন। জিমখানা প্রায়ই বলরুম ও নাট্যশালায় পরিণত হইত; ক্রিকেটম্যাচ্ ব্যাডমিন্‌টন টুর্ণামেণ্ট প্রভৃতিতে সময় সময় বিজাপুরের ইংরাজদলকে পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করা হইত। একবার এইরূপ নিমন্ত্রণে আসিয়া বিজাপুরের ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। সপরিবার বলিতে তিনি, তাঁহার স্ত্রী, এবং তাঁহার স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামী জাত যুবতী কন্যা। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যুবা পুরুষ কিন্তু তাঁহার স্ত্রী অর্দ্ধ বৃদ্ধা। তিনি যে কন্যাকে বিবাহ না করিয়া মাতাকে কেন বিবাহ করিলেন ইহাতে সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিত। কখনো কখনো এমনো ঘটিয়াছে নবাগতেরা তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতে আসিয়া কন্যাকেই গৃহকর্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে, এইরূপ ঘটনায় গৃহিণীর ক্রোধের আর সীমা থাকিত না।

মিষ্টার ক্যান্‌ডি এদেশীয় সম্ভ্রান্তদিগকেও নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সাদর অভ্যর্থনা এবং আমোদ প্রমোদ প্রদান করিতেন। নিম্নপদস্থ লোককে সম্মানিত করা নিজের মানহানিজনক না মনে করিয়া তিনি বরঞ্চ সুখজনক জ্ঞান করিতেন। সেই জন্য সকল শ্রেণীর লোকের নিকটই তিনি প্রিয় ছিলেন। রেলওয়ের লোকেরা তাঁহাকে এত ভাল বাসিত যে একদিন ক্রিকেটম্যাচের পর সহসা তাঁহাকে কাঁধে উঠাইয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়াছিল।

এখনকার কলেক্টার যে মন্দ লোক তাহা নহে, ইনিও দেশীয় লোকদিগকে বেশ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, তবে নিজের লোকের সহিতও তিনি মেশামিশি করেন কিছু কম, জিমখানা-তেত প্রায়ই ইহাদের আসিতে দেখি না। ইহারা বিলতের বেশ সম্ভ্রান্ত লোক, এখানকার ইংরাজেরা ইহাদের সমকক্ষ নহে ইহাই তাঁহাদের মনোগত ভাব। তবে অবশ্য এজন্য ইহারা কাহারো সহিত ভদ্রতার ত্রুটি করেন না, বরঞ্চ বিপরীত; মিসেস ম্যোর ভদ্রতা ও তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। তাহা ছাড়া ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব এখানকার সকল ইংরাজই স্বীকার করিয়া চলে সুতরাং তাঁহাদের মনের ভাবেও তাহারা অসন্তুষ্ট নহে। মিসেস ম্যোর

রং বড় সুন্দর, বিলাতে যে তুষার শুভ্র রংয়ের কথা শুনা যায় এ তাহাই। এরূপ রং না কি সে দেশের সম্ভ্রান্ততারি প্রধান লক্ষণ, এখানে তাঁহার নামটিও ঠিক খাটিয়াছে, 'স্নো' ত স্নোই বটে। ইহাকে দেখিতে নিখুঁৎ সুন্দরী নহে কিন্তু ইহার কথাবার্ত্তা হাবভাব ধরণ ধারণ এত মধুর যে সুন্দরী না হইয়াও ইনি সুন্দর। বাঙ্গালী মেয়ের মত বেশ একটি বিনয় পূর্ণ লজ্জামাধুরী ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি বেশ পিয়ানো বাজাইতে পারেন, কিন্তু নিমন্ত্রণ সমাজে বেশী লোকজনের সাক্ষাতে বাজাইতে ইহার এত লজ্জা করে, যে সে সময় ইহাকে বাজাইতে অনুরোধ করা ইহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ। একবার নাকি নিমন্ত্রণ সভায় বাজাইয়া ইনি মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়াছিলেন।

যদি ইহাকে বল "মিসেস স্নো শুনিলাম তুমি বেশ বাজাইতে পার" ত একজন বাঙ্গালী মেয়ে এরূপস্থলে যেরূপ আধো বাধো করিয়া লজ্জায় আহ্লাদে অবিশ্বাসে আগ্রহে বলিত সেইরূপ ভাবে মিষ্ট মিষ্ট করিয়া সাগ্রহে বলেন "না তুমি ঠাট্টা করিতেছ, কে বলিল কার কাছে শুনিলে তাও নাকি হয়, ইত্যাদি।" তিনি যে ভাল বাজাইতে পারেন এ কথাটা যেন কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। মেয়েলি কুসংস্কারও তাঁহাতে বড় মন্দ দেখা যায় না। ১৩ জন ডিনারে বসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিলে ইহার কম্প উপস্থিত হয়। তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস এই ১৩ জনের একজন নিশ্চয় শীঘ্র মরিবে। একবার নাকি তিনি প্রত্যক্ষ এইরূপ ঘটিতে দেখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম ১৩ জন কেন ১২ জনের ডিনারের পরও ত তাহার মধ্যে কাহাকেও শীঘ্র মরিতে দেখা গিয়াছে, না হয় ১৩ জনের ডিনারেও তাহাই ঘটিয়াছিল ইহাতে ত এমন কিছু বলা যায় না, যে ১৩ জনের ডিনারই সাংঘাতিক। এ যুক্তি তাঁহার নিকট কোন কাজের যুক্তি নহে, তিনি বলেন "হ্যাঁ ঐ সব পুরুষমানুষের অবিশ্বাসের কথা, প্রত্যক্ষ চোখে আঙ্গুল দিয়া যখন তাহাদিগকে ঐ রূপ কোন ঘটনা দেখাও তখনও তাহাদের ঐ রকম উত্তর।" আমাদের মত ইহাদেরো যাত্রার শুভাশুভ দিন আছে। কোন অশুভ বারে কোথাও যাত্রা করিতে ইহার বড় ভয়, বিশ্বাস তাহাতে অমঙ্গল ঘটিবে। এইরূপ সকল বিষয়েই তাঁহার একটা বেশ মেয়েলি ভাব দেখা যায়। মেয়েদের একেবারে কুসংস্কার নাই, পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, নিজের বুদ্ধির দম্ভে তাঁহারা পৃথিবী মাপিয়া মাপিয়া চলিতেছেন এমনটা হইলে কেমন যেন একটা পৌরুষিক কাঠিন্যে তাঁহাদের স্ত্রীশোভন সুকোমল হৃদয়মাধুর্য্যের মুগ্ধকারিতা ঢাকিয়া যায়।

তবে যেখানে সুশিক্ষার অভাব, যেখানে সহৃদয়তা সদ্ভাবের চর্চ্চা নাই, সেখানে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস নিতান্ত অমঙ্গলজনক বীভৎসভাব ধারণ করে; মিসেস স্নোর শিক্ষোৎকর্ষিত উদারতাও স্বাভাবিক সহৃদয়তার সঙ্গে এইরূপ মেয়েলীভাব যেন সুন্দরে মধুরে মিলিয়াছে। মিশনারীরা যে এদেশের ধর্ম্মহানি করিতে সচেষ্ট, ইহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত। তাঁহার মতে তাঁহাদের ধর্ম্মও যেমন মুক্তিপ্রদ, আমাদের ধর্ম্মও তেমনি। তিনি বলেন, একজন অজ্ঞান যখন প্রস্তরে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া ভক্তিভরে পূজা করে, তখন ত সে ঈশ্বরকেই

ডাকে, ইহার পরিবর্ত্তে যীশুকে ডাকিলে সে কিছু আর অধিক ভক্তি ভরে ডাকিতে পারিত না সুতরাং অজ্ঞানের কাছে যীশু ও প্রস্তর খণ্ড একই তবে কেন বিধর্ম্মী করিয়া তাহাদিগকে তাহাদের পরিবার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দুঃখসাগরে নিমগ্ন করা। এই সকল কারণে তাঁহাকে আমার বড়ই ভাল লাগিত। আমাদের দুজনের বেশ একরকম বনিয়া গিয়াছিল। আমি ইঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিতাম তুমি যেন ঠিক বাঙ্গালির মেয়ে; তিনি আমাকে কথাটা ফিরাইয়া বলিতেন তুমি যেন ঠিক একটি ইংরাজের মেয়ে—অবশ্য দুজনেরই উদ্দেশ্য ভাল, প্রশংসা করিবার অভিপ্রায়, কিন্তু দুজনার অভিপ্রায়টাই ব্যর্থ হইয়া কথাটা কেবল উপহাস হইয়া দাঁড়াইত।

এখনকার এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পুরোগোছ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। সোলাপুরের বেহালা বাজিয়ে রেলওয়ে-ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মতে তাহারাই অ্যাংলোইণ্ডিয়ান, যাহারা দিনে ঘুমায় আর মসলাওয়ালা কারি খায়। উক্ত এসিষ্টেণ্টের এ দুই লক্ষণ আছে কিনা জানি না; তবে ইনি নেটিভবিদ্বেষী। যদিও ইঁহাকে নেটিভ বলিলেও একদিকে চলে, অন্ততঃ গালি দেওয়া হয় না। কেন না ইঁহার বাপ পিতামহ পর্য্যন্ত এদেশের খাইয়া মানুষ, এ দেশে বসবাস করিয়াছেন, এখানে জন্মিয়াছেন। "বঙ্গবাসী"কে গভর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া সে দিন তিনি রাগিয়া আগুণ; এ সম্বন্ধে তর্ক ওঠায় জজসাহেব সে দিন তাঁহাকে বেশ দুএক কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার নিজের জাত ভায়ারাও এখানে ইঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়, সকলেই বলে বড় Stuck up, অহঙ্কারী; গৃহিণীর উপরই অবশ্য এ কথাটার প্রয়োগ হইয়া থাকে। তবে সত্যি কথা বলিতে কি, আমরা ইঁহার অহঙ্কারের কোনরূপ পরিচয় পাই নাই, আমাদের সহিত বেশ অসঙ্কোচে মিশিয়া থাকেন।

ইঁহাদের কল্যাণে আপাততঃ মেয়ে মহলের গল্প গুজবে বেশ একটু তাপ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইঁহাদের ঘরে দুইটি অবিবাহিত যুবতী আছেন, একটি কর্ত্তার বোন, একটি গৃহিণীর বোন। জিমখানাতে বা ডিনার পার্টি প্রভৃতি যে কোন নিমন্ত্রণে তাঁহারা উপস্থিত থাকেন, সেই খানেই দেখা যায় সোলাপুরের রহস্যক মিষ্টার বি রুক্মিণী ও সত্যভামার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মত ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পক্ষপাতিত্বহীন সমভাবে উভয়ের প্রতি নিজের শুভ্রদন্তচ্ছটা ও রসাল বাক্যঘটা বর্ষণ করিতেছেন। আমরা এবং আর সকলে তাঁহাদের দিকে আড়নয়নে আনন্দ কটাক্ষপাত করিতেছি আর এই দ্বিমুখী উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া একমুখী প্রেম প্রবাহে কি প্রকারে উৎসারিত হইয়া উঠিবে সেই অত্যদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক পরিণাম রহস্য দেখিবার জন্য আগ্রহ-কৌতূহল-চিত্তে অপেক্ষা করিয়া আছি। তবে সম্ভবতঃ আমাদিগের অদৃষ্টে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছু নাই। অ্যাসিষ্টেণ্ট সাহেব ত ফার্লো লইতেছেন; যুবতী দুইজন শীঘ্রই সোলাপুর পরিত্যাগ করিবেন, অথচ এখনো পর্য্যন্ত ত কোনরূপ হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গি বা চরণ বিলুণ্ঠিত সাশ্রু প্রস্তাবের খবর শুনিতেছি না।

সোলাপুরের আর একটা সাধারণ গল্পের বিষয়—এখানকার সিভিল সার্জ্জনের সহিত ডফরিণ হাঁসপাতালের মহিলা ডাক্তারের ঝগড়া। মহিলাটি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুবংশ, জাতিতে পঞ্জাবী রমণী। ডাক্তার ইহার কাজের ক্রমাগত খুঁৎ ধরেন। সম্প্রতি ইহার নামে একটি এইরূপ অভিযোগ আনয়ন করেন যে ইনি অন্যায়রূপে কয়েকটী স্ত্রীলোককে হাঁসপাতালে স্থান দান করেন নাই। হাঁসপাতালের সভ্যগণ বিচারে ইহাকে দোষ মুক্ত করিয়াছেন দেখা গেল। যাহাদিগকে ইনি স্থান দান করেন নাই, তাহারা এরূপ সংক্রামক পীড়াযুক্ত যে,তাহাদিগের সংস্পর্শে হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীগণও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে।

একজন স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের ঝগড়া হইলে সহজেই অবলা রমণীর পক্ষ সকলে গ্রহণ করে, এখানেও সকলে মিস স—য়ের পক্ষ। তবে তাঁহাকে অবশ্য কিছুতেই অবলা রমণী বলা যায় না। ডাক্তারের অবজ্ঞা তিনি শুধ সমেত ফিরাইয়া দিয়া থাকেন। তাঁহার মত নির্ভীক নিষ্পরোয়া বেথাতির লোক আমি ত' দেখি নাই। ডাক্তার বিলাত হইতে সিভিলসার্জ্জন হইয়া আসেন নাই; পূর্ব্বে অ্যাপথিকারি ছিলেন, এখন সিভিল-সার্জ্জনের পদে উন্নীত হইয়াছেন; সেইজন্য মিস স—কখনো ইহাকে ডাক্তার বলেন না, তাঁহার নামোল্লেখ করিতে হইলেই তীব্র ঘৃণাসূচক স্বরে বলেন "মিষ্টার অমুক"। এবং কাহারো নিকটই তিনি ডাক্তারের সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ করেন না। এই ঝগড়ায় সোলাপুরের ইংরাজ সমাজ নিতান্ত বিরক্ত, সকলেরি ইচ্ছা ইহা মিটিয়া যায়। ডাক্তার এখন এতদূর নরম হইয়া আসিয়াছেন যে মিস স—তাঁহার অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার ত্যাগ করিলে এ ঝগড়া মিটিয়া যাইতেও পারে, কিন্তু তিনি অটল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ১৫ দিনের ছুটি লইয়া মিস্ স—মান্দ্রাজ গমন করেন, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে রেলওয়ে ডাক্তার পিয়ার্স তাঁহার হইয়া হাঁসপাতাল দেখিবার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বদলি হইয়া অন্য স্থানে যাইতে হয়। সিভিল সার্জ্জন সেই সময় সৌজন্য প্রকাশ করিয়া মিস স্—এর রোগীদিগের তত্ত্বাবধান লইতেন। মিস স—আসিয়া সেজন্য তাঁহাকে একবার ধন্যবাদ পর্য্যন্ত দিলেন না। আমরা কিছুতেই তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না, যে তিনি তাঁহার ধন্যবাদের পাত্র। পঞ্জাবী মেয়ে বটে। ইহাদের বিবাদের সূত্রপাতের কারণ কি জান? মিস—স নাকি একজন যুবককে সুপুরুষ বলিয়া ডাক্তার পত্নীর নিকট প্রশংসা করেন। তিনি একলা কেন মহিলাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে সুন্দর বলিয়া থাকেন। সেইজন্য আমাদের মধ্যে ইহার একটি নাম বাঙ্গালায়, জনান্তিকে ছিল কন্দর্প। এখন ডাক্তার পত্নীর মত মেয়ে প্রায় দেখা যায় না, তিনি সেই কথার উপর রং ঢং দিয়া জিমখানা শুদ্ধ লোকের কাছে সেই গল্প করিয়া বেড়ান, মিস স—রোখাল মেয়ে, তিনি ইহা শুনিয়া চুপ চাপে সহিয়া থাকিবার পাত্র নহেন, ডাক্তার পত্নীকে ইহার জন্য বেশ দুদশ কথা শুনিতেও হয়! সেই হইতে দুজনের মনান্তর ঘটে।

যে ডাক্তার পিয়ার্সের কথা উল্লেখ করিলাম ইনি বড় ভাল লোক, তিনি এদেশীয় পর্টুগিজ খৃষ্টান। তিনি মহারাষ্ট্রী যুবকদিগের মঙ্গলের জন্য বিশেষ যত্নবান। কেহ কেহ মনে করেন মিস 'স' য়ের প্রতি ইনি যেন কিছু "মধুভাবাপন্ন", এমনটা মনে করিবার যে বিশেষ কোন কারণ ঘটিয়াছে তাহা অবশ্য নহে। তবে ইনিও দেশী খৃষ্টান উনিও দেশী খৃষ্টান, উভয়ে উভয়ের ফাঁদে পড়িবার বেশ উপযুক্ত, অথচ উভয়েরই হাত পা খোলা, মুক্তাবস্থা, বন্ধনপ্রিয় লোকদিগের প্রাণে ইহা সহ্য হয় না, তাঁহারা তাই নিজের মনোগত অভিপ্রায় হইতে ঐরূপ অনুমান করিয়াই থাকেন ভাল। বাস্তবিক মেয়েরা সব দেশেই সমান। ভালই হোক মন্দই হোক পরের কথা লইয়া থাকিতে পারিলে ইহারা যেমন আরামে থাকেন এমন কিছুতে না। গবর্ণর আসিতে ত ইহাদের সুখের সীমা ছিল না। গবর্ণর ছিলেন এখানে বড় জোর ৩৬ ঘণ্টা; ইহার মধ্যে ত্রিশ ঘণ্টা কাল ত তাঁহাদের অশ্রান্ত আমোদ, মধ্যাহ্ন ভোজ, রাত্রি ভোজ, বৈকালিক ব্যায়াম ক্রীড়া, সায়াহ্নিক আতসবাজি, স্কুল সমিতির অভিনন্দন, সভাসমিতির অভিনন্দন—এইরূপ নিমন্ত্রণের উপর নিমন্ত্রণে, সাজের উপর সাজ পরিবর্ত্তনে তাঁহাদের ত উত্তেজনার বিরাম নাই, ইহার উপর আবার সার্ব্বভৌমিক রহস্যে সমালোচনার ধূম। জজ কালক্টরের বাড়ী গভর্ণরকে যে ভোজ দেওয়া হইতেছে, তাহাতে নিমন্ত্রিত হইবার কাহারা উপযুক্ত, কাহারা না; কাহার কিরূপ পদ মর্য্যাদা, কে যথেষ্ট Lady like, কাহার কিরূপ হাব ভাব, কিরূপ ধরণ ধারণ, এই সব গল্প গুজবে কিছুদিন আগে হইতে মেয়ে মহল বিলক্ষণ সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। জিমখানার মেম্বরদিগের মধ্যে এখানে দুইজন উচ্চপদস্থ সস্ত্রীক রেলওয়ে কর্ম্মচারী আছেন। ইহাদের মধ্যে মিষ্টার এবং মিসেস 'ভ' দম্পতি সর্ব্ববাদীসম্মতি ক্রমে সম্ভ্রান্ততায় অন্য সকলের অসমকক্ষ, প্রমাণ স্বরূপ বেশী কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, মিসেস নিমন্ত্রণ পত্র লিখিতে হইলে লেখেন "Will you give I the pleasure." কিন্তু মিষ্টার ও মিসেস 'র'য়ের নামে আর যতই নিন্দা রটুক তাঁহাদের সম্বন্ধে এ অপবাদ এ পর্য্যন্ত উঠে নাই, এবার কেহ কেহ তাহাতেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মিসেস 'র'য়ের অনেক গুণ আছে, নাচিয়ে, গাইয়ে, কইয়ে, বলিয়ে, লোকের সঙ্গে সহজেই বেশ বনিবনাও করিয়া লইতে পারেন, এমন কি তাঁহার কল্যাণে কেহ কেহ যা' নন তাহাও বনিয়া গিয়াছেন। মিষ্টার ল পূর্ব্বে স্ত্রীলোক দেখিলেই লজ্জায় জড়সড় হইয়া পালাইতেন। জিমখানায় গিয়া দেখিতাম, বিলিয়ার্ড লইয়াই ইনি আছেন; ব্যাড্‌মিণ্টন ঘরে ভুলিয়াও ইনি পা বাড়ান না। তাহার পর মিসেস 'র'য়ের সহিত আলাপ হওয়ায় ইনি যেন সোনার কাটির স্পর্শে সহসা জাগিয়া উঠিলেন, এখন আর জিমখানায় তাঁহার মত স্ত্রীজাতির সেবাপরায়ণ (Lady's man) দ্বিতীয় কেহ নাই, কোন রমণী আসিতে না আসিতে সর্ব্বাগ্রে তিনি চৌকী বাড়াইয়া দেন, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলায় পুরুষ পাওয়া যাইতেছে না, মিসেস র বলিলেন— "Mr.—would you play?"

মিষ্টার ল—কিছু পূর্ব্বে ক্রিকেট খেলিয়া শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন তবুও খেলিতে সম্মত হইলেন। আর আগে তাঁহাকেই বলিতে শুনিয়াছি "I hate badminton"। (এখানে যে যাহাকে দেখিতে পারে না, যে যেটা অপসন্দ করে, অমনি তাহাকে hate করে)। মিশেস র—এইরূপ কারণে মেয়ে মহলের কতকটা ঈর্ষাভাজন, বুঝি বা সেইজন্য তাঁহার প্রতি এরূপ গুপ্ত কটাক্ষ।

যাহা হউক, গভর্ণরের ভোজ উপলক্ষে অন্য সকলের ত মহা আমোদ কিন্তু বেচারা যাঁহারা এই ভোজ দিতেছেন তাঁহাদের কি মুস্কিল! কলেক্টারের বাড়ী সায়াহ্ন ভোজ, আমাদের বাড়ী মধ্যাহ্ন ভোজ—সকলেই নিমন্ত্রণ প্রত্যাশা করিতেছে, যাহাকে না বলা হইবে, সেই দুঃখিত হইবে, অথচ জিমখানা শুদ্ধ সকলকে নিমন্ত্রণ করাও নিতান্ত অসুবিধা, স্থানাভাব, কি করা যায়। কলেক্টরের স্ত্রী আমাদের বাড়ী আসিতেছেন, আমরা তাঁহাদের বাড়ী যাইতেছি। কাহাকে বাদ দিলে মন্দের ভাল হইতে পারে, ভোজের সময়েই বা কোন রমণীর ভার কোন পুরুষের উপর দেওয়া যায়, এই সকল মান অপমানজনক কায়দার মীমাংসাভিপ্রায়ে আমাদের যতটা ভাবিতে হইয়াছিল, ইহাতে যতটা মস্তিষ্কশক্তির অপব্যয় হইয়াছিল, সীমান্ত প্রদেশের যুদ্ধেও ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বোধ করি তত ভাবনা বা অর্থের অপব্যয় হয় নাই।—অবশেষে নানাযুক্তি নানা মন্ত্রণার পর জিমখানা শুদ্ধ সকলের জন্য কোন প্রকারে স্থান সঙ্কুলান করিয়া অনেকটা হৃদয় বেদনা ও তজ্জনিত অভিশাপের হস্ত হইতে আমরা অব্যাহতি পাইলাম। এইরূপে জিমখানার প্রত্যেক মেম্বর এবং তাহার অন্তর্নীতি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি করিয়া বলিতে গেলে এখনো ঢের বলা যায়, কিন্তু আঠার পর্ব্ব মহাভারত লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি ব্যাস অবতার হইয়া জন্ম গ্রহণও করি নাই, সুতরাং সে সব কথায় এই খানেই ইতি দিয়া মেম্বরদিগের দৈনিক আমোদ প্রমোদের একটু বিবরণ বলি শোন।

আমাদের বাড়ী জিমখানা হইতে অনেকটা দূরে, সেখানে যাইতে হইলে উদ্যোগ পর্ব্বের বন্দোবস্তে এই ক্ষুদ্র পরমায়ু যেন ক্ষুদ্রতর হইয়া আসে। তাই বৈকালিক ভ্রমণের পর সন্ধ্যার সময় একবার অমনি জিমখানায় উঁকি দিয়া বা এক আধ বাজি ব্যাডমিণ্টন খেলিয়া আসা ছাড়া অন্য সময় সেখানে যাওয়া হয় না। কিন্তু অন্যান্য মেম্বরেরা সকলেই প্রায় জিমখানার আশেপাশে থাকেন, তাঁহারা সকালে বিকালে দুইবার জিমখানায় সম্মিলিত হইয়া সচিত্র পত্রিকাদি দেখেন, খেলাধূলা গল্প স্বল্প করেন। পুরুষরা সকল খেলাতেই আছেন, ব্যাডমিণ্টন টেনিস প্রভৃতিতে তাঁহারা মেয়েদের সহিত যোগ না দিলে সে খেলা জমে না; আর গল্‌ফ, বিলিয়ার্ড ত তাঁহাদেরি খেলা; তাঁহারা খেলেন, মেয়েরা অনেক সময় নিকটে বসিয়া তাহা দেখেন ও তারিফ্ করেন। সময় সময় পুরুষেরা ক্রিকেটও খেলিয়া থাকেন। এই সব আমোদ ছাড়া রাত্রে মাঝে মাঝে পরস্পরের বাড়ী ভোজ নিমন্ত্রণও

আছে। জজ কলেক্টার প্রভৃতি ষ্টেসনের শীর্ষস্থানীয়গণই বেশী নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণে আহারের পর সাধারণতঃ গান বাজনা হইয়া থাকে, কথনো কথনো নাচও হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিমন্ত্রণ, নৃত্যগীত, যত বেশী, ইহাদের স্ফূর্ত্তিও তত বেশী। আপাততঃ এখানে নবযুবক অপেক্ষা যুবতীর ভাগই অধিক, তাই নাচের তেমন একটা সুবিধা না থাকাতে যুবতীদিগের মধ্যে হাহাকার। ডাক্তারের দুই কন্যা সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। ডাক্তার পত্নীর ভাবনা, এই নির্জীব স্থানে তাহাদিগকে কিরূপে বাঁচাইয়া রাখেন। ইহা হইতে মনে করিও না ইংরাজদিগের আমোদ ছাড়া অন্য কোন কাজ কর্ম্ম নাই। তাহা নহে, ইহাদের 'মটো' কাজের সময় কাজ, আমোদের সময় আমোদ। এই জন্যই ইহারা অধিক কাজও করিতে পারে। তাহা ছাড়া ইংরাজদের যেরূপ বিবাহ পদ্ধতি তাহাতে স্ত্রীপুরুষের এরূপ একত্র সম্মিলন ব্যতীত বিবাহের তেমন সুবিধা নাই। সুতরাং ইহা তাহাদের পক্ষে আমোদ ঔষধ দুইই। স্ত্রীপুরুষের এইরূপ মেলামেশার আর একটি গুণ, পরস্পরের নিকট প্রশংসিত হইবার ইচ্ছায় স্ব স্ব স্বভাবজাত গুণগুলি ফুটাইয়া তুলিবার দিকে অনুরাগ। এইরূপে উভয়ের প্রশংসা উভয়ের উপর কিরূপ কার্য্যকারী এবং ইহার সম্মিলিত ফলে সমাজকে কিরূপ বল প্রদান করে, তাহা ইহাদের সহিত মিশিয়া দেখিলে বুঝা যায়। আর একটা কথা, বাহির হইতে শুনিতে এ সমাজকে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তেমনটা কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের সমাজ নিয়ম এমনই আটে ঘাটে বাঁধা যে এক পা বাড়াইতে হইলেও ইহাদিগকে সেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্য দিয়া যাইতে হয়; নহিলে অমনি নিন্দার তপ্তলৌহ ছাঁক তোমাকে জ্বালাইয়া তোলে। ইহাতে গায়ে ফোস্কা পড়ে না সত্য কিন্তু আগুনের জ্বালা সহে, তবু নিন্দার জ্বালা সহে না।

আমাদের বাড়ীতে প্রতি মঙ্গলবারে একটা করিয়া টেনিসপার্টি হয়। জিমখানার সমস্ত মেম্বরগণই সে দিন এখানে আসেন। টেনিস খেলার নিমন্ত্রণ বলিয়া সে দিন যে কেবল টেনিস খেলাই হয় এমন নহে; টেনিসের পর প্রায়ই গান বাজনা হইয়া থাকে। আর বর্ষা বাদল হইলে যে দিন টেনিস খেলার সুবিধা না হয়, সে দিন গান বাজনা ছাড়া মিউজিক্যাল চেয়ার, তাসখেলা, হেঁয়ালি প্রভৃতি যে সকল খেলা ঘরের মধ্যে বসিয়া হইতে পারে তাহা খেলা হয়। মিউজিক্যাল চেয়ার কিরূপ বলি শোন। যদি ১২ জন এ খেলায় যোগ দিতে চান ত ১১ খানি চৌকী পাশাপাশি সাজাইতে হয়; তাহার পর একজন পিয়ানো বাজাইতে থাকেন আর ১২ জন লোক চৌকীগুলি দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণ করেন, যেই বাজনা থামে তাঁহাদিগকে চৌকীতে বসিয়া পড়িতে হয়। এখন বসিতে হইবে, ১২ জন লোকের, চৌকী আছে ১১ খানি, কাজেই যিনি তাড়াতাড়ি দখল করিতে না পারেন, তাঁহার আর বসা হয় না; তিনিই হারিয়া যান। যিনি হারেন তিনি আর খেলিতে পান না, তখন খেলিবার লোক মোট ১১ জন,

একখানি চৌকী কমাইয়া আবার খেলা আরম্ভ করা হয়। এইরূপে প্রতিবারে একটি করিয়া লোক ও একখানি করিয়া চৌকী কমিতে কমিতে যখন মোট একখানি চৌকী অবশিষ্ট তখন খেলা শেষ।

স্ক্যানড্যাল বলিয়া একরূপ তাসখেলা আছে সে মন্দ নয়। দুই প্যাক তাসের এক প্যাক সম্মুখে রাখিয়া অন্য প্যাকের সমস্ত তাসগুলি যাঁহারা খেলিতেছেন তাঁহাদিগকে বাঁটিয়া দিতে হয়। তাহার পর পালায় পালায় একজন করিয়া কোন একটা প্রশ্ন করেন; যেমন ধর একজন বলিলেন 'কে চোর,' বলিবার পর সম্মুখে রক্ষিত প্যাক হইতে একখানি কাগজ উঠান হইল, সেই তাসের সমান তাস যাহার হাতে থাকিবে তিনিই চোর। ভালরকম প্রশ্ন করিতে পারিলে খেলাটা বেশ জমে। কতকগুলি মেয়ে পুরুষে একদিন খেলিতে খেলিতে একজন পুরুষ প্রশ্ন করিলেন "আমাকে কে চায়?" তাঁহার প্রণয়িনী ও অবশ্য একজন সহক্রীড়ক; প্রশ্নকারীর ইচ্ছা তাঁহার হাত হইতেই কাগজ খানি বাহির হউক, কিন্তু একটি লাজুক বালিকার হাতে সে কাগজখানি ছিল, বালিকা লজ্জায় সারা, সকলে হাসিয়া অস্থির, আর যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনিও নত মুখ। তাঁহার দেখিতে ইচ্ছা শ্রীপঞ্চমী, দেখিলেন কৃষ্ণঠাকুর।

হেঁয়ালি খেলা বোধ হয় তুমি জান। অভিনয়ের মধ্য হইতে দর্শকদিগের হেঁয়ালিটী বাহির করিতে হয়। যেমন ধর, কথাটি পাহাড়; একজন সাজিলেন রোগী—তাঁহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়াছে; ডাক্তার আসিয়া তাঁহার পা টিপিয়া টুপিয়া দেখিতে লাগিলেন, দর্শকেরা বুঝিলেন পাহাড়। আর একরূপ খেলা, যত জন লোক ঘরে আছেন তাহার মধ্যে প্রথমে একজন একটি কবিতার ছত্র রচনা করিয়া তাহার শেষ কথাটি মাত্র আর একজনকে বলিলেন। তিনি আবার আর এক ছত্রে তাহার মিল করিয়া শেষ কথাটি তৃতীয়কে বলিলেন। এইরূপে উপস্থিত সমস্ত লোকের রচনা হইয়া গেলে কাগজগুলি মিলাইয়া দেখা হয়। অনেক সময় সমস্তটা এমন অপরূপ হইয়া দাঁড়ায় যে দেখিতে বড়ই আমোদ হয়। আমরা কয়জনে বহুদিন আগে গঙ্গার ধারে বসিয়া একদিন এইরূপ খেলা করিতেছিলাম, কিরূপ মজার কবিতা হইয়াছিল দেখ।

জোছনা-তরঙ্গ-রঙ্গে উথলিত—দিক
সহকার শাখে বসি ডাকিতেছে—পিক
যুবক দাঁড়ায়ে এক বাহুপাশে—শিক
যুবতী বিস্মিত মুগ্ধ স্তব্ধ—অনিমিখ।
কি ভুলে রয়েছি ভুলে হা ধিক্—হা ধিক্
চাঙ্গা-হিয়া রাঙ্গা পায়ে পেয়ে মাঙ্গা—ফিক্
পাষাণে খোদিত যেন সেই সে—তারিখ
সব সহে সহে নাক প্রেমেতে—সরিক।

ইংরাজদের আর একরূপ আমোদ, বন্ধুবান্ধব আলাপীদিগকে দিয়া নিজের খাতায় কিছু লিখাইয়া লওয়া। নানালোকে নানারূপ লেখেন, কেহ কবিতা, কেহ প্রবাদ, কেহ উক্তি, সবগুলি একত্রে দেখিতে বেশ লাগে ভাল। একবার আমাদের একটি বন্ধু, একটি মহিলাকর্ত্তৃক তাঁহার খাতাতে লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া বড় মজার কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ইংরাজ মহিলার খাতায় ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছিল। আমি তাহাকে বঙ্গভাষায় স্থায়িত্ব প্রদান করিয়াছি তাই তোমার দৃষ্টির জন্য পাঠাইলাম।

একটু লেখো গো তুমি একটুকু যা তা,
পুরাইতে হবে মোর খাতাটির পাতা।
গদ্য হোক পদ্য হোক যাহোক তাহোক,
লেখো শুধু, রাখ কথা, দুচারিটি শ্লোক।
মৃতের কি জীবিতের যাহারি বচন,
কিম্বা যদি থাকে কোন তোমারি রচন;
যাহা ইচ্ছা লেখো তুমি ক্ষতি নাই তাতে,
জঁাকাল—বাঁধান এই পুস্তকের পাতে।
তিক্ত গালাগালি কিম্বা রহস্যচাতুরী,
কঠোর ব্যঙ্গ অথবা তীব্র জারিজুরি;
সুমধুর রঙ্গ ভরা রসাল বিষয়,
অথবা উপজে যাহে ঘোরতর ভয়;
সত্য হোক মিথ্যা হোক পুরান কি নব;
লেখো তুমি যাহা খুসী মনে আসে তব।
হৃদয় বিঁধুনী কথা, কাঁদুনি বিলাপ,
মানে হীন মোদ্দাহীন উন্মত্ত প্রলাপ;
সেলির মতন ভাব; শুধু স্বপ্নময়,
গভীর গম্ভীর কিবা যোগতত্বচয়;
কিম্বা অনুরোধে যদি পারি তোমা দ্বারা
লিখাইতে রসময় লেখা সদ্য গড়া;
সকলি সমান তারা হবে মম পাশে,
লেখো তুমি যা খেয়াল মনে তব আসে।
খাতাটির পাতাখানি পূরাতে বাসনা,
তাই এত অনুরোধ তাকি বুঝিছ না?
ভাল হোক মন্দ হোক ক্ষতি তাহে নাই,
লিখেছ খাতায় তুমি; যথেষ্ট তাহাই।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

মালতীমাধব সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

গতসংখ্যক "ভারতী" পত্রিকায় 'মালতীমাধব' নামক প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যদর্শন ও থিয়সফি সম্বন্ধে যে কয়েকটি মত প্রকটিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম আমি ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। সুযোগ্য প্রবন্ধ লেখক মহাশয় যদি আমার নিম্নলিখিত সন্দেহগুলি ভঞ্জন করিয়া দেন তবে আমার এবং আমার ন্যায় অপর অনেকেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। এরূপ আলোচনা সাধারণেরও নিতান্ত অপ্রীতিকর হইবে না বোধ হয়।

১ম।—১০২ পৃষ্ঠায় সুযোগ্য লেখক মহাশয় বলিতেছেন "কপিলের সাংখ্যদর্শনের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি"। ইতিহাসের পক্ষ হইতে এ বাক্যের কতদূর সার্থকতা আছে বলিতে পারি না, কিন্তু চিন্তাপ্রসূনের পক্ষ হইতে এ কথাটিকে নিতান্ত নিরর্থক বলা যায়

না। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সে পক্ষ হইতেও এ কথাটী সার্থক কি না? আমার মনে হয় প্রথম কথাটি মানিয়া লইলে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, যাঁহার কপিলের দর্শনের উপর বিশেষ আস্থা নাই, তাঁহার নিকট বৌদ্ধধর্ম্মেরও বিশেষ সমাদর হইবার সম্ভাবনা নাই, মূলে ভক্তি না থাকিলে শাখা প্রশাখার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু কার্য্যতঃ পক্ষে কি এই-রূপই দেখা যায়? বৌদ্ধেরা সকলেই কি সাংখ্যদর্শনের প্রতি ভক্তিমান? আমার তো এরূপ জানা নাই; এ সম্বন্ধে আমার যতদূর অভিজ্ঞতা, তাহাতে এই মাত্র মনে হয় যে সাংখ্যদর্শনও বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দর্শন, এতদুভয়ের মধ্যে কতকাংশে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে সাদৃশ্যের বলে কি প্রাসাদ ও ভিত্তি সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইতে পারে? আমার মনে হয় উভয়ই স্বতন্ত্র, তবে উভয়ের উদ্দেশ্য কতকাংশে একবিধ হওয়ায় মানব চিন্তা পদ্ধতির সাম্যবশতঃ সেই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। উভয়েই মানব জীবনের দুঃখ নিরাকরণার্থ যত্নশীল। শাক্য ও কপিল উভয়ে একই উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতে বসিয়াছেন, তাই শিক্ষাতেও কতকাংশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় এই মাত্র, তাহার অধিক যে আর কিছু বলা যায় তাহা আমার বোধ হয় না। য়িহুদী যীশুও মানব জাতির দুঃখ মোচনোদ্দেশে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন; তাহা হইতে কি এরূপ প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধধর্ম্ম সাংখ্যদর্শন ও খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে নিতান্ত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বিদ্যমান?

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে আমাদের দেশীয় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা গ্রন্থ য়িহুদী বাইবেল হইতে সংগৃহীত এবং গীতোক্ত শ্রীকৃষ্ণ, খৃষ্টনামেরই রূপান্তর মাত্র। তাঁহারা প্রমাণ স্বরূপে যুক্তি দেন যে উভয় গ্রন্থের শিক্ষার মধ্যে বহুল পরিমাণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমার মনে হয় লেখকের যুক্তি কতকাংশে এই ধরণের।

[ইতিহাসে কপিল বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং ইতিহাসের এই কথা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বুদ্ধদেব যে কপিলের নিকট কতকাংশে ঋণী তাহাও সপ্রমাণ হয়।

যীশুর দ্বারা ভগবদ্গীতা প্রবর্ত্তিত হওয়া এক, আর কপিলের দ্বারা বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত হওয়া এক। সাতসমুদ্র, তের নদীর পারে ভাষা ও আচারের প্রাচীর ভেদ করিয়াও এক জন আর এক জনকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন ইহা বিশ্বাস করা বহুল প্রমাণ সাপেক্ষ। কপিল ও বুদ্ধের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না, তাঁহাদের দেশ, জাতি, ভাষা, আচার সবই এক, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কপিলের প্রভাব পরবর্ত্তী বুদ্ধ যে কতক পরিমাণে অনুভব করিবেন এ কথাটা এমনই কি অবিশ্বাসজনক? এইখানে একটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অনুমানটী আমার স্বকপোলকল্পিত নহে, ঐতিহাসিকেরাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

কপিলের দর্শনের উপর বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি বলিতে এই বুঝায় যে উভয় মতের অনেকগুলি মূলমন্ত্র এক, তবে দর্শনে ও ধর্ম্মে যা প্রভেদ উভয়ের মধ্যে সে প্রভেদ-

টুকু আছে। সেই প্রভেদটুকুতে করিয়াই উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যও ঘটিয়াছে। দর্শন সকল জিনিষের তত্ত্ব বাহির করিতে রত থাকে; নীতি সম্বন্ধেও সে একটা তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে পারে, কিন্তু ঐ খানেই উহার অধিকারের সীমা। সেই তত্ত্বকে কার্য্যক্ষম করিতে চেষ্টা করিলেই তাহা আর দর্শন রহিল না, ধর্ম্মশাস্ত্রে পরিণত হইল। ধর্ম্মশাস্ত্র কোন বিশেষ নীতিপ্রণালী আয়ত্ত করিয়া তাহাকে নীতিসূত্ররূপে একটী একটী করিয়া তোমার সম্মুখে ধরিয়া বলিবে 'তুমি সত্য কথা বলিও' অথবা 'তুমি চুরি করিও না' ইত্যাদি ইত্যাদি। দর্শন অনেক মাথা ঘামাইয়া একটা তত্ত্ব বাহির করিয়াছিল যে চুরি করা অন্যায়, কারণ চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট তাহা কর্ত্তব্য নয়, অতএব চুরি করা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্ম এই নীতি-বাক্যের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বলিল "তুমি চুরি করিও না"। একটার লট্ বিভক্তিতে রূপ আর একটার লোট বিভক্তিতে রূপ। একটা অন্তর্জগতে তত্ত্বের জাল বুনিতে থাকে, আর একটা বহির্জগতে সেই তত্ত্বকে কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত অনুকূল অবস্থার প্রবর্ত্তনায় সচেষ্ট থাকে, যথা নীতিবাক্যগুলি সূত্রবদ্ধ করা, সঙ্ঘ গঠন করা, সঙ্ঘের প্রত্যেক নরনারী যাহাতে নিয়ম রক্ষা করিয়া চলে তাহারপ্রতি দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি।

এইরূপে কোন বিশেষ দর্শনের বীজ হইতে কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র অঙ্কুরিত হইলেও কাল-ক্রমে উহাদের প্রকৃতিভেদে এতদূর আকৃতিভেদ হয় যে ধর্ম্মশাস্ত্রটী যে তাহার জন্মের জন্য আর কাহারো নিকট ঋণী সে কথা তাহার শিষ্যদের আর মনে থাকে না, তাহাকে স্বয়ম্ভূ বলিয়া তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং সেইরূপে গ্রহণ করাই স্বাভাবিক।

আরো এক কথা; বুদ্ধ যে জ্ঞাতসারে সাংখ্যদর্শনের উপর তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন এমনো নহে। তখনকার বিদ্বৎ সমাজে সাংখ্যদর্শন বহুল প্রচারলাভ করিয়া-ছিল, সাংখ্যমত তখনকার আকাশে ভাসমান ছিল, বুদ্ধ প্রতি চিন্তায়, প্রতি নিশ্বাসে তাহা টানিয়া লইয়াছেন। আমরা অনেক অনুভাব, অনেক প্রভাবের মধ্যে বাস করি, অথচ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকি না। একদিন দৈবাৎ কেমন তাহাকে নিজের করিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করি। সে পুরাতন হইলেও আমার পক্ষে নূতনই বটে, কারণ আমি তাহাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি, আমার জীবন দিয়া মণ্ডিত হইয়া সে নূতন সত্যরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। সেইজন্য বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মকে নূতন ধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাহাকে নূতন ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, কপিলের নিকট তাহারা আপনাদিগকে কোন অংশে ঋণী বোধ করিতেছে না। কিন্তু ঐতিহাসিক, পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা দেখিতে পান, তাঁহার চোখে তাই বুদ্ধ কপিলের নিকট ঋণী বটে। শ্রীলেখক।]

২য়।—লেখক বলিতেছেন সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়েই নিরীশ্বরবাদী, কপিল ও শাক্য উভয়েই ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই সত্য এবং এরূপ কথা অনেকের মুখে

শোনা যায় সত্য। কিন্তু লেখক মহাশয় বিরুদ্ধ পক্ষের নিম্নলিখিত যুক্তির উপযুক্তরূপ উত্তর প্রদান করিয়া আমাদের বাধিত করিবেন কি ?

(ক) যাঁহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন মতই প্রকাশ করেন নাই তাঁহাদের সকলকেই নিরীশ্বরবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করা কি যুক্তিসঙ্গত? কপিল ও শাক্য কেহই ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই বরং উভয়েই পরবর্ত্তীকালে আপন শিষ্যবর্গের নিকট যেরূপভাবে গৃহীত তাহাতে উভয়কেই বিশেষতঃ কপিলকে ঈশ্বরবাদী বলিয়াই মনে হয়।

[বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন এমন বোধ হয় না। তবে তাঁহাকে এই পর্য্যন্ত নিরীশ্বরবাদী বলিতে হইবে যে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্য করেন নাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁহার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ছিল কি না ছিল, তাহা আপাততঃ আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে তিনি ঈশ্বরের কোনই উল্লেখ করেন নাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য তিনি সাধারণকে কখন প্ররোচিত করেন নাই, আমাদের উপস্থিত আলোচনার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কপিল সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে, এবং তাহার অপেক্ষা বেশীও খাটে; প্রতিবাদক মহাশয় কি জানেন না "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ," সাংখ্যবাদীদের ইহা একটী প্রধান বচন। শ্রীলেঃ]

(খ) কপিলের দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন (সম্+খ্যা, যুক্তি) অর্থাৎ যুক্তিমূলক দর্শন শাস্ত্র। এইরূপ শ্রেণীর দর্শনকে ইংরাজীতে বলে Synthetic Philosophy অথবা Philosophy based on synthetic reasoning, এ শ্রেণীর গ্রন্থে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা হয় তাহার বিশেষ উল্লেখ থাকে না। যুক্তি ছাড়াইয়া বিশ্বাসে আসিলেই তাহা আর এ শ্রেণীর গ্রন্থের অন্তর্ভূত থাকে না। অতএব এ গ্রন্থ হইতে কপিলের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় মতামতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মও কতকাংশে এই প্রণালী অনুসারে গঠিত।

[প্রথমতঃ ইংরাজীতে যাহাকে Synthetic Philosophy বলে, সাংখ্যদর্শন তাহার অন্তর্ভূত কিনা তাহা বিচার্য্য। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সে তর্ক নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। প্রতিবাদক মহাশয় বলিতেছেন "এ গ্রন্থ হইতে কপিলের পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় মতামতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মও কতকাংশে এই প্রণালী অনুসারে গঠিত।"

ইহার উত্তরে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। কপিলের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতামতের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না এমন নহে; বুদ্ধ সম্বন্ধে এই বক্তব্য যে কোন বিশেষ ধর্ম্মমত কিম্বা দার্শনিক মতকে বিচার করিতে হইলে সে যে আকার ধরিয়া সাধারণের সম্মুখে আবির্ভাব করিয়াছে তাহাকে সেই আকারসম্পন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্মদাতার হৃদগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের সহিত তাহাকে জড়িত করিলে চলিবে না। হয়ত বা বুদ্ধ নিজে ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু পলিসির

খাতিরে তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলেন নাই সে জন্য তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে আমরা ঈশ্বরপ্রধান ধর্ম্ম বলিতে পারি না, তাহার আকার দেখিয়া তাহাকে নিরীশ্বর ধর্ম্মই বলিতে হইবে। শ্রীলেঃ]

(গ) কপিল নিরীশ্বরবাদী হইলে পাতঞ্জলের ন্যায় ঈশ্বরে বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার পদানুসরণ করিয়া সাংখ্যের শাখারূপে যোগশাস্ত্র রচনা করিতেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

[কপিল নিজে নাস্তিক হউন আর নাই হউন তাঁহার শাস্ত্র নিরীশ্বর শাস্ত্র, অর্থাৎ তাঁহার শাস্ত্রে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। যোগশাস্ত্রের আর এক নামই সেশ্বর সাংখ্য। শ্রীলেঃ]

(ঘ) বর্ত্তমান কালে বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি সম্প্রদায় দেখা যায়—তাহার মধ্যে একদল ঈশ্বরবাদী এবং অপর দল নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু প্রথমোক্ত সম্প্রদায় আপনাকে প্রকৃত (orthodox) বৌদ্ধ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়।

[আমাদের বিনীত বিশ্বাস নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও সমান জোরের সহিত নিজেদের Orthodox বলিয়া থাকেন। শ্রীলেঃ]

(ঙ) শাক্যের একজন শিষ্য তাঁহাকে ঈশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি এই মর্ম্মে তাহাকে প্রত্যুত্তর দিলেন বলিয়া শুনা যায়। "অশেববিধ দুঃখ যন্ত্রণা তোমাদিগকে চতুস্পার্শে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, সে সমস্ত হইতে কি প্রকারে অব্যাহতি পাইতে পারিবে আগে তাহারই উপায় অনুসন্ধান কর। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কূটতর্কে প্রবেশ করিও না। দেখিতেছ ত ঐরূপ তর্কে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়া দেশের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তবে আর কেন ও সকল কথা উত্থাপন কর।" কোন দর্শন বা মতকে ভালরূপে বুঝিতে হইলে যে কালে তাহাদের অভ্যুদয়, সেই কালের সাধারণ অবস্থা পূর্ব্বে জানা আবশ্যক। আর আমার বোধ হয় ভারতের তৎকালীন অবস্থায় ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে শাক্যের ঐরূপ নির্ব্বাক থাকার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্তরূপ কারণ পাওয়া যায়।

[ইহার উত্তর (ক) ও (খ) এর কোটায় দিয়াছি। শ্রীলেঃ]

৩য়।—লেখক এক স্থলে বলিতেছেন নির্ব্বাণ মুক্তির চরমসীমা। নির্ব্বাণ এবং মুক্তি বিভিন্ন অবস্থার নাম ? মুক্তির পথ কি সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে বিভক্ত যে তাহার সর্ব্বোচ্চ ধাপের নাম নির্ব্বাণ ? আমরা যতদূর জানি তাহাতে নির্ব্বাণ ও মুক্তি দুই একার্থবোধক। একটি পদ হিন্দু দার্শনিকেরা ব্যবহার করিতেন, অপরটি বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি এই মাত্র প্রভেদ।

[প্রতিবাদক মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন। নির্ব্বাণ ও মুক্তি স্বতন্ত্র জিনিষ নহে; নির্ব্বাণই মুক্তি। কিন্তু সহজ মানুষ এক লম্ফে ত আর মুক্তিপ্রাপ্ত হয় না, তাহার জন্য সাধনা চাই। সেই সাধনের পথ সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে বিভক্ত; তাহার

সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠিতে পারিলে, কিনা নির্ব্বাণে পৌঁছিতে পারিলে মুক্তি হইল। এস্থলে সেই অর্থে নির্ব্বাণকে মুক্তির চরম সীমা বলা হইয়াছে। তাহাতে সাধারণ পাঠকের অর্থগ্রহণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বোধ হয় না। শ্রীলেঃ]

৪র্থ।—লেখক বলিতেছেন "বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব তাহার নীতি-তন্ত্রে নহে, তাহার গঠন-তন্ত্রে।" গঠন-তন্ত্র পদটির অর্থ কি ? শিষ্যবর্গকে একত্রে সন্নিবদ্ধ রাখিবার পদ্ধতি বা অপর কিছু তাহা ঠিক বুঝা গেল না। আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহাই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয় তবে বুদ্ধদেবকে অবশ্য Practical religionist, বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কপিলের উদ্দেশ্যও তো বিশিষ্ট পক্ষে Practical, অতএব তাঁহাকে যদি Theorist বলিতেই হয় তবে সে নামের সঙ্গে ঐ বিশেষণটিও যোগ করিয়া দিতে হয়। তবে হয়ত এরূপ সংযোগে ন্যায়শাস্ত্রের পদবিরোধ ঘটিতে পারে।

[ইহার উত্তর (১) এর কোটায় দেওয়া হইয়াছে। শ্রীলেঃ]

৫ম।—পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যটির পাঁচ পংক্তি পরেই লেখক বলিতেছেন, "বুদ্ধের হৃদয় একটি নূতন আবিষ্কারের আনন্দেই স্থির থাকিতে পারিল না।" কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার গঠন-তন্ত্র ব্যতীত অপর কিছুতেই নূতনত্ব ছিল না এবং তাঁহার শিক্ষাও যদি সাংখ্যদর্শনের উপর সম্যক্ অবস্থিত এরূপ হয়, তবে লেখক যে এই নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের উল্লেখ করিতেছেন তাহা কি ?

[ইহারও উত্তরে (১) এর কোটায় যাহা বলিয়াছি, তাহাই আর একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাহার উপর আর একটু বক্তব্য এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব তাহার সার্ব্বভৌমিকতায়। বর্ণবিচার না করিয়া বুদ্ধদেব যে হতভাগ্য শূদ্রকেও মুক্তির অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ব। শ্রীলেঃ]

৬ষ্ঠ।—পর পৃষ্ঠায় লেখক বলিতেছেন, "কপিলের দর্শনের সহিত আস্তিকতার সংমিশ্রণ করিতে গিয়া পাতঞ্জল তাহাতে নানাবিধ প্রচলিত কুসংস্কার ও অলৌকিক ক্ষমতালাভের জন্য অদ্ভুত গুপ্ত ক্রিয়াবিধি যোগ করিয়া দিলেন।" পাতঞ্জলের যোগ শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি, এস্থলে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কপিলের দর্শন যুক্তির উপরই গঠিত দেখিয়া পাতঞ্জল সেই যুক্তিমূলক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভূতির জন্য সরল উপায়ে সাধারণে প্রচার করেন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবে কোন মতামত দিতে হইলে তাহার জন্য যোগশিক্ষা করা প্রয়োজন। পাতঞ্জলের উদ্দেশ্য তাঁহার গ্রন্থে কত দূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা পরীক্ষা ব্যতীত বলা যায় না। সেক্‌স্‌পীয়র ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে হ্যামলেটের মুখ দিয়া যাহা বলিয়াছেন, আজও কি তাহা সত্য নহে ? আধুনিক সুসভ্য পাশ্চাত্য দর্শনের আলোক কি সর্ব্বত্র পৌঁছিয়াছে ? স্বর্গমর্ত্ত্যের মধ্যে কি অন্ধকার রহস্যময় গহ্বর আর নাই। যোগবলের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কোন্ দেশে এ "কুসংস্কার" প্রবেশ লাভ করে

নাই তাহা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বিজ্ঞানোপাসক সুসভ্য ইয়ুরোপেও "আত্মতত্ত্বানুসন্ধানী সভা" (Psychical Research Society) কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। লেখক কি তাহাকেও কুসংস্কার বলেন ? যদি না বলেন তবে যে সকল ঘটনাবলীর কথা পূর্ব্বোল্লিখিত সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয় তবে যে সকল শক্তির বলে ঐ ঘটনা সংঘটিত হয় তাহাদের অস্তিত্ব ও সেই সকল ক্ষমতা মানবের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনয়ন করিবার প্রণালীর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা কি এমনই দোষাবহ কথা ? বৈজ্ঞানিক থিওরীও কি কালে ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণ হয় না ? আর সেরূপ ঘটে বলিয়া কি কোন থিওরীতে বিশ্বাস স্থাপন করা কুসংস্কারের ফল।

[যুক্তিমূলক জ্ঞান অজ্ঞ, নিরক্ষর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবার কথা নহে ; সুতরাং বিজ্ঞ লোক তাহাকে সাধারণগ্রাহী করিতে চাহিলে তাহাতে অযৌক্তিক, অলৌকিক, কুসংস্কারপূর্ণ নানারূপ বিধান সংযোগ করিবেনই। পাতঞ্জলও তাহাই করিয়াছেন।

সাংখ্য একটী দর্শন, এবং যোগশাস্ত্র ঐ দর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট। প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ তত্ত্ব কার্য্যতঃ সাধন করিবার নিমিত্ত পাতঞ্জল কতকগুলি অমূলক উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

এমন অনেকগুলি অপ্রামাণ্য বিষয় আছে যাহার সত্যের সহিত দূরান্বয়ে সম্বন্ধ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু যাহার অধিকাংশই মিথ্যা এবং অসম্ভব, এরূপ কোন বিষয়কে সমস্তটাই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াকেই কুসংস্কার বলে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্ ; যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যাহারা অষ্টসিদ্ধির মধ্যে লঘিমায় সিদ্ধিলাভ করে তাহারা সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া উপরে উঠিতে পারে। ইহার মূলে কতকটা সত্য থাকিতে পারে ; সে সত্য হয়ত এইটুকু যে প্রকরণ বিশেষের দ্বারা শরীর খুব হাল্‌কা হয়। কিন্তু সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া উপরে উড্ডীন হওয়া রূপ ব্যাপার কখনো ঘটেও নাই, ঘটিবেও না এবং ঘটিতে পারেও না। শুধু যোগশাস্ত্রে লেখা আছে বলিয়া যদি কেহ ইহা বিশ্বাস করেন তবে তাহা কুসংস্কার। বিলাতের আত্মতত্ত্বানুসন্ধানী সভা এইরূপ নানা সত্যমিথ্যা জড়িত সংস্কার এবং কিম্বদন্তীর মধ্য হইতে সত্যটুকু উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তাহাকে কুসংস্কার বলা যায় না।

বৈজ্ঞানিক থিওরি সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক কোন কালেই বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হয় না ; হয়ত কালক্রমে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া সপ্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু যতদিন লোকে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, ততদিন অকারণে করে নাই ; সেই থিওরি পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছিল, তাহার দ্বারা অনেকগুলি প্রত্যক্ষ ভৌতিক ঘটনার রহস্যোদ্ভেদ হইতেছে। কুসংস্কার বিনা প্রমাণে কোন-কিছুকে মানিয়া লয়। যাহারা কুসংস্কার মানে, তাহারা শাস্ত্রবচন এবং কিম্বদন্তী ব্যতীত আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতা বোধ করে না। শ্রীলেঃ]

৭ম।—থিয়সফি সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন:—"একালের থিয়সফিষ্টেরা যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, Occultism তাহার একটি প্রধান অঙ্গ সুতরাং তাহাকে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম বলা যায় না; তাহা এই যোগধর্ম্ম সংমিশ্রিত একপ্রকার রূপান্তরিত, কলুষিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সাংখ্য মত দিয়া এক এক ধাপ করিয়া কিরূপে তান্ত্রিক ধর্ম্মে নামিয়া আসা যায়, বর্ত্তমান থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ই তাহার প্রমাণ স্থল।" এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর উদ্দেশ্য সম্বলিত গ্রন্থাদি পাঠে এরূপ কোন কথা তো পাওয়া যায় না। হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, পারসী, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ প্রভৃতি পৃথিবীর সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী সভ্যই ঐ সভায় আছেন, অতএব মাদামব্ল্যাভ্যাট্স্কী প্রভৃতি সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাহাতে কিছু আসে যায় না। মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির তত্ত্ব আবিষ্কার করা ঐ সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য বটে এবং ইংলণ্ডীয় আত্মতত্ত্বানুসন্ধানীসভার উদ্দেশ্য ও কতক পরিমাণে ঐরূপ। একারণে যদি থিয়সফিষ্টেরা তান্ত্রিক হন, তবে পাশ্চাত্য স্পিরিটুয়ালিষ্ট ও আত্মতত্ত্বানুসন্ধানী সভার সভ্যেরও ঐ নামে অভিধেয় হইতে হয়। লেখক কি অধ্যাপক মায়ার্স, অধ্যাপক সীজউইক, অধ্যাপক ক্রুক্স্, অধ্যাপক ওয়ালেস, প্রভৃতি অপর অনেক ব্যক্তিকেও তান্ত্রিক বলেন? তিনি যদি এতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হন, তবে অবশ্য আমার আর কিছুই বলিবার থাকে না।

Tantricism ও Occultism যদি একার্থ বিধায়ক হয় তবে লরেন্স অলিফ্যাণ্ট, মেস্মার, ব্যারণ রাইকেনবাক্ প্রভৃতিকেও তান্ত্রিক বলিতে হয়। এবং আজ কালকার পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেককেই কি তান্ত্রিক দলভুক্ত হইতে হয় না।

সকল ধর্ম্মের মূলভাব গ্রহণ করিয়া কুসংস্কার গুলি যত্নে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূল সত্যগুলি সংগ্রহ করাই থিয়সফির উদ্দেশ্য। খ্যাতনামা ডাক্তার আনা কিংসফোর্ড তাঁর Finding of Christ নামক গ্রন্থে খৃষ্টান ধর্ম্মের পঙ্কোদ্ধার করিবার বহুল প্রয়াস করিয়াছেন। লেখক কি তাঁহাকেও তান্ত্রিক বলিবেন?

[থিয়সফিই যে বৌদ্ধধর্ম্ম এমন কথা আমি বলি নাই। "এ কালের থিয়সফিষ্টেরা যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন" এস্থলে থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দল আপনাদের বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই কথা আমি উল্লেখ করিতেছি। মাডাম ব্ল্যাভেট্স্কি, মিসেস বেসাণ্ট, সিংহলের ইয়ুরোপীয় বৌদ্ধমণ্ডলী প্রভৃতি থিয়সফিক্যাল, ইংরাজ বৌদ্ধসম্প্রদায় কখনই স্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নিজেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিতেন না এবং তাহা প্রচারে যত্নবান্ হইতেন না যদি নাকি বৌদ্ধধর্ম্ম তাহার জন্মাবস্থার সরল শুভ্র, নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে আজও শোভমান থাকিত, যদি নাকি তাহার সহিত যোগধর্ম্মের অলৌকিকতা জটিলতা, অন্ধকার গাঢ় রহস্যতার সংমিশ্রণ না হইত। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন তাঁহাদের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের আদর তাহার খাঁটিত্বে নহে, তাহার সহিত যে মিশাল পড়িয়াছে তাহারই চটকে।

তান্ত্রিকেরা থিয়সফিক্যাল ভাষায় ব্ল্যাক্ ম্যাজিশান্স্। থিয়সফিষ্টেরা আত্মোন্নতির নিমিত্ত এবং পৃথিবীর হিতার্থে যে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিতে চাহেন, ব্ল্যাক্ ম্যাজিশান্স্রাও সেই ক্ষমতালোলুপ এবং তাহারই জন্য প্রয়াসী কিন্তু তাহারা তাহাদের ক্ষমতা অসাধু উপায়ে লাভ করে এবং অসৎ প্রণালীতে পরিচালিত করে এই প্রভেদ এবং সে প্রভেদ বড় সামান্যও নহে। যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্ম নেড়া নেড়ির ধর্ম্ম নহে, তেমনি থিয়সফি তান্ত্রিক ধর্ম্ম নহে। কিন্তু কালক্রমে সব ধর্ম্মেরই অপভ্রংশ হয়; সুতরাং থিয়সফি কোন দিন তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব "বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সাংখ্যমত দিয়া এক এক ধাপ করিয়া কিরূপে তান্ত্রিক ধর্ম্মে নামিয়া আসা যায়, বর্ত্তমান থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় তাহার প্রমাণস্থল" একথাটা নিতান্ত নিরর্থক নহে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে মালতীমাধবের বর্ণনায় দার্শনিক তর্ক ফাঁদা আমার অভিপ্রায় নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবনতি হইয়াছে, মালতীমাধবে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে আমার মনে যাহা উদয় হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়াছিলাম। প্রতিবাদক মহাশয়ের যদি তাহা মনঃপূত না হয়, তিনি যদি অন্য কোন সুনিপুণতর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন, আমরা আনন্দের সহিত আমাদের ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার মত গ্রহণ করিব। এবং তাহাতে তিনি জন সাধারণেরও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইবেন। শ্রীলেখক]

শ্রীহেমন্তকুমার রায়।

প্রবাস পত্র।

ভাই,—

তুমি আমাকে এদেশের খবরাখবর লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ। তুমি জান আমার হাতে সময় অতি অল্প তাই তাড়াতাড়ি এই কয়েক ছত্র লিখিয়া পাঠাইতেছি। সম্প্রতি পুণায় যে 'চায়ের পেয়ালায় তুফান' হইয়া গিয়াছে তাহার বিবরণ বলি শুন। সে তুফান আমাদের চক্ষে যদিও যৎসামান্য হাস্যকর ব্যাপার তবুও তাহাতে পড়িয়া অনেক বড় বড় লোকে হাবুডুবু খাইতেছেন। পুণার একদল খৃষ্ট মিসনরি তাঁহাদের বাড়ীতে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে চা কেক বিস্কুটাদি চর্ব্ব্য চোষ্য পেয় জিনিস ছিল; কেহ কেহ তাহা গ্রহণ করেন। এই কথা তাঁহাদের একজন ঘরের শত্রু বাহিরে রটাইয়া দেয়। হিন্দু সমাজে ইহা রাষ্ট্র হইবামাত্র দলপতিগণ ক্ষেপিয়া উঠেন, অবশেষে এই বিষয় লইয়া তাঁহাদের গুরু শঙ্করাচার্য্যের নিকট আবেদন পত্র যায়—"প্রভো! এই সকল অপরাধী দণ্ডিত হউক আমরা বিচার প্রার্থনা করি।" শঙ্করাচার্য্য দুইজন শাস্ত্রী পাঠান; তাঁহাদের বিচারে গুরু লঘু দ্বিবিধ প্রায়শ্চিত্ত বিধান সাব্যস্ত হয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পান ভোজন দোষে দোষী তাঁহাদের কাশীযাত্রা প্রভৃতি গুরুতর দণ্ড আর যাঁহারা ততদূর অপরাধ করেন নাই, "ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন" দোষে তাঁহাদের প্রাণায়াম প্রভৃতি লঘুদণ্ড! এমন পাগলামী কি কখন শুনিয়াছ? মনে হয় যেন আমাদের সেই আদ্যকালের কোন ইতিহাস পাঠ করিতেছি! কলিকালে ত জাতি সম্বন্ধীয় এমন কড়াক্কড় নিয়ম শোনা যায় না—নিদেন বাঙ্গলা দেশে ত নয়।

সে যাহা হউক, এই ষড়চক্রে রাও বাহাদুর মহাদেব গোবিন্দ রাণাদের মত লোক কি করিয়া পা ফেলিলেন, তাহা আসল কথা। তুমি ত জান তিনিই এ দেশের সমাজসংস্কারকদলের নেতা। তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে যোগ দেওয়াতে অনেক কাল এক প্রকার জাতিচ্যুত হইয়া আছেন। কিন্তু এত দিন তিনি সাহসীর ন্যায় কার্য্য করিয়া আসিতেছেন কাহারও ভয়ে কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ হন নাই—নিজের বিশ্বাস ছাপাইয়া সত্যের পথ হইতে এক পাও টলেন নাই। সম্মতিআইনের গোলযোগের সময়েও তাঁহার ধৈর্য্য ও সাহস অক্ষুণ্ণ ছিল। সে সময়ে পুণায় হিন্দু সমাজে হুলস্থূল বাধিয়া যায়। সেই দলাদলির সময় রাণাদের উপর অনেকেরই বিষদৃষ্টি পড়ে। এত দিন ধরিয়া ধূমের মধ্যে যে অগ্নি আচ্ছন্ন ছিল এই চা-পার্টি সূত্রে তাহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল—গোঁড়ার দল ক্ষেপিয়া উঠিল। এই সব রিফর্ম্মার হিন্দুধর্ম্ম নাশ করিতে উদ্যত জাতিভেদ উন্মূলন করিতে চায়—মিশন হৌসে গিয়া প্রকাশ্যে ম্লেচ্ছদের পাত্রে

পান করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অপমান করে—এত বড় আস্পর্দ্ধা—তাহাদের যথোচিত শাস্তি দেওয়া উচিত—তাই শঙ্করাচার্য্যের বিচার প্রার্থনা। আমরা মনে করি নাই রাণাদে এই বিচার—এই দণ্ড ঘাড় পাতিয়া লইবেন, তিনি অনেক বৎসর হইতে ধর্ম্মের জন্য সমাজ হইতে নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিতেছেন। সে দিন শুনিলাম রিফর্ম্মারদের বাড়ী কোন পুরোহিত যায় না বলিয়া নিজে কতকগুলি পুরোহিতকে বেতন দিয়া ঘরে পুষিয়া রাখিয়াছেন। তার পর হঠাৎ শুনিতে পাই তিনি নিজেই শঙ্করা-চার্য্যের শাসনে গ্রীবা অবনত করিলেন। তিনি মনে করিলেন গোঁড়াদের উপর টেক্কা দিতে হইবে—তাহাদের নিজের খড়্গে নিজের মস্তক ছেদ করিতে হইবে। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন—"আচ্ছা তোমরা যা বল্‌ছ তাই সই—শঙ্করাচার্য্যকে মধ্যস্থ মানা হউক" এই বলিয়া নিজেই তিনি হাড়িকাঠে স্কন্ধ বাড়াইয়া দিলেন, তাহার পরিণাম যে প্রায়শ্চিত্ত বিধান তাহা সকলেই জানে। রাণাদে এই চাল চালিয়া চিন্তামণি নারায়ণ ভট্ট, কাণিটকর প্রভৃতি নামাঙ্কিত উন্নতিশীলদিগকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী করিলেন। ইহার ফল এই, একূল ওকূল দু'কূল নষ্ট, হিন্দু সমাজও সন্তুষ্ট নয়— রিফর্ম্মারদের দল ও অস-ন্তুষ্ট। রাণাদের যুক্তি এই—"প্রায়শ্চিত্ত কেবল নাম মাত্র—কিছুই গুরুতর ব্যাপার নয়। ওতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের অর্থ তপো-নিশ্চয়—কতকগুলি ব্রত অনুষ্ঠান—কতকগুলি নিয়ম পালন করা—ধর্ম্ম সাধনের জন্য চিন্তা দৃঢ়তর করিবার উপায় মাত্র। শুদ্ধ ইহলোক নয়—পূর্ব্বজন্মকৃত জ্ঞাতাজ্ঞাত দোষের জন্য শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে। কিন্তু সে সকল নিয়ম এমনি কঠোর যে সাধারণের পক্ষে পালন করা দুষ্কর তাই ক্রমে প্রায়শ্চিত্তের সহজ উপায় সকল আবিষ্কৃত হইল।—যথা ব্রাহ্মণ বিদায়, পইতা পরিবর্ত্তন ইত্যাদি। শাস্ত্রানুযায়ী ষোড়শ সংস্কার সকলের হইয়া উঠে না তাই তাহার পরিবর্ত্তে চতুঃসংস্কার দাঁড়াইল বাকীগুলির বেলায় প্রায়শ্চিত্ত। গৃহস্থের ঘরে নিয়ত অগ্নিরক্ষা দুরূহ বলিয়া তাহার অভাবে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইল। অথর্ব্ব বেদে পঞ্চোদক প্রায়শ্চিত্তের পর বিধবাদের বিবাহ করিবার বিধি দৃষ্ট হয়। এই ক্ষণে হিন্দু সমাজে এই প্রকার কোন মৌখিক প্রায়শ্চিত্তে শোধিত হইয়া জাতিতে উঠিবার নিয়ম দাঁড়াইয়াছে। জাতির লোকদের খাওয়াও ব্রাহ্মণদের দান কর তোমার সর্ব্বপাপ ক্ষয় হইবে। এইরূপ সহজ উপায়ে যদি জাতির লোকদের সন্তুষ্ট করা যায় তাহাতে ক্ষতি কি? ইহাতে আমাদের বিশ্বাস বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় তাহা বলা যায় না। আমরা সকল জাতির সঙ্গে একত্রে পান ভোজন করিব এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই। আমরা সহজ ভদ্রতার হিসাবে মিশনারীদের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম, তাহাদের সঙ্গে চা খাইয়া হিন্দুয়ানি ভাঙ্গিবার মতলবে যাই নাই। আমরা যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান সংশোধন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা অন্যরূপ, বিধবাবিবাহে উৎসাহদান, বাল্যবিবাহনিবারণ, সমুদ্রযাত্রার পথ

পরিষ্কার করা *—এক জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিবাহ বন্ধন করা—এই সকল মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে গুরু পুরোহিতের সাহায্য চাই, এই খানাপিনার হাঙ্গামে যদি সেই সকল কার্য্যে বিঘ্ন ঘটে তবে সে খানা পিনা বর্জ্জনীয়। এই ভাবিয়া আমি এই প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিয়াছি। লাভ এই টুকু যে তোমাদের স্বীকার করিতে হইল ম্লেচ্ছদের সঙ্গে চা খাওয়াতে বিশেষ কোন দোষ নাই সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এ দোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।"

রাণাদের এই কূট তর্কে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই। গোঁড়া হিন্দুরা বলেন— "মিশন হৌসে গিয়ে চা খাওয়া, ইহাতে প্রকাশ্য রকমে হিন্দু ধর্ম্মের অপমান। তোমাদের উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশনরিরা তোমাদের জালে ফেলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। এখন তুমি দায়ে ঠেকিয়া অস্বীকার করিতেছ। আচ্ছা, তুমি যদি প্রায়শ্চিত্ত ক্রিয়াকে এমন লঘু জ্ঞান কর—তবে এমন প্রায়শ্চিত্তের ফল কি? ইহাতে তোমার দোষ স্বীকার করা হয় নাই—বরং উল্টা তোমার জিদ বজায় রাখিয়া অন্যকে কুপথগামী করা তোমার অভিপ্রায়।" তাঁহারা না কি রাণাদেকে জাতিচ্যুত করিবার জন্য জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্যের নিকট পুনরায় দরখাস্ত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন।

এ দিকে রিফর্মার দলও চটিয়া আগুন। তাঁহারা রাণাদেকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে দলপতির পদ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহারা বলেন "এই বুঝি তোমার ২৫ বৎসর তপস্যার চরম ফল? তোমার এই কাজে সমাজসংস্কার অর্দ্ধ শতাব্দী পিছাইয়া পড়িল। তোমার কাজে আমরা লজ্জিত হইয়াছি কোথায় দাঁড়াই তাহার স্থান নাই।" শুনিতে পাই প্রার্থনাসমাজ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব হইতেছে।

ফলে এই দাঁড়ায়, সত্যের জন্য কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধ করিলে কাহারো কোন কথা বলিবার থাকে না, শত্রুপক্ষও তোমাকে সম্মান করিয়া চলে। জগৎকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চলিতে গেলে অনেক সময় একূল ওকূল দু'কূল নষ্ট হয়। রাণাদে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা সামান্য লোকের সম্বন্ধে খাটিতে পারে—উন্নতিশীল দলের দলপতির মুখে শোভা পায় না। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে প্রায়শ্চিত্তের অর্থ পাপের প্রতিক্রিয়া। যদি সত্যই কোন পাপ করিয়া থাক তবে 'এমন কর্ম্ম আর করব না' বলিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত কর। কিন্তু যখন তোমার অন্তরাত্মার প্রতীতি যে কোন পাপকর্ম্ম কৃত হয় নাই তখন তাহার জন্য লোক ভোলানো প্রায়শ্চিত্ত করা ভীরুতার কার্য্য, Cranmer এর চারিদিকে যখন চিতানল জ্বলিয়া উঠে তখন তিনি তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া দক্ষিণ হস্ত অগ্নির মধ্যে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন This hand hath offended; রাণাদে যে প্রায়-

* সমুদ্রযাত্রার সঙ্গে কি বিদেশীয় পান ভোজনের কোন স্পর্শ নাই?

শ্চিত্ত করিয়া ধর্ম্ম ভীরুতা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ঐ রূপ কোন প্রায়শ্চিত্ত বিধান তাঁহার দোষক্ষালনের একমাত্র উপায়।

হিন্দু সমাজে জাতির নিয়ম ভঙ্গ করিলে অনেক সময় যে ঘোরতর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল অপরাধীদের বিচার করিবার পূর্ব্বে তাহাদের অবস্থাটা একবার মনে করা কর্ত্তব্য। মনে কর আত্মীয় স্বজন বন্ধু শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, নিমন্ত্রণে যাওয়া আসা বন্ধ, ছেলে মেয়ের বিবাহ দেওয়া দুর্ঘট, শ্রাদ্ধাদি গৃহকার্য্যে পুরোহিত পাওয়া যায় না মৃত্যুর সময় শব উঠাইবারও লোক নাই। ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ এ অবস্থায় কি ভয়ানক কষ্ট! যদি একটুকু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায় তাহা করিতে কে না ব্যগ্র হইবে? করিলেই বা কি করিয়া তাহার দোষ দেওয়া যায়, বেচারা চিন্তামণি নারায়ণ ভট্ট সবজজের জন্য দুঃখ হয়। তাঁহার বৃদ্ধ মাতা তাঁহার উপর চটিয়া না কি কাশীবাস করিতে যান। তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিবার জন্য তিনি এই অবনতি স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তাঁহাকে ও জন্য তত দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু রাণাদের কোন ওজর নাই। তাঁহার ওরূপ কোন কষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই, যদিও বাহিরের চিমটি কাটার যন্ত্রণা কিছু কিছু ভোগ করিতে হইত, তবে তাহা তাঁহার একপ্রকার সহ্য হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার উপর লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। আর কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিলে এই চায়ের তুফান আপনা হইতে থামিয়া যাইত। তাহা না করিয়া তিনি অতি বুদ্ধির চাল চালিতে গিয়া বিপদে পড়িলেন। হিন্দু সমাজের উপর টেক্কা দিতে গিয়া নিজে অপদস্থ হইলেন। এখন দেখা যাইতেছে সমাজসংস্কারকচূড়ামণি নিজকর্ম্মদোষে সকলকার ধিক্কারের পাত্র হইয়াছেন।

হিন্দু সমাজে আর এক ধরণের সংস্কার দেখা যায়—নীচ জাতকে উচ্চ জাতির অধিকার প্রদান। সোলাপুরে 'সালী' নামক এক জাতীয় তাঁতি আছে, তাহাদের মধ্যে একজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ আসিয়া জাতীয় উন্নতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে মদ্য মাংসে আসক্ত দেখিয়া তিনি উপদেশ দেন 'তোমরা অমুক ঋষির অনুচর ছিলে, (ঋষির নামটা ভুলিয়া যাইতেছি একটা প্রকাণ্ড নাম) তোমাদের এরূপ গর্হিত আচার কেন! এখন হইতে তোমরা মদ্য মাংস পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া শুদ্ধাচার অবলম্বন কর।" শুনিতে পাই গুরুর উপদেশ নাকি ফলিয়াছে। সালীরা ব্রাহ্মণদের ন্যায় নিরামিষ ভোজী হইয়া পইতা পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। নীচু জাত ব্রাহ্মণত্বে চড়িতে খুব মজবুত, কিন্তু আপনাদের অপেক্ষা নীচ জাতিকে আপনাদের অধিকার ও পদবী প্রদান করিতে, আপনাদের সমকক্ষ করিতে সহজে রাজী হয় না। "আমরা উঠিব কিন্তু তোমাদের উঠিতে দেব না" এই তাহাদের 'মটো'।

আর একটা খবর দিই। এখানে একজন মুসলমান ফকীর আসিয়াছে তাহার

শরীরে ৫ মণ লৌহ শৃঙ্খলের ভার। এখানে সে লাহোর হইতে আসিয়াছে। ট্রেনে তাহাকে মালের গাড়ীতে অন্য জিনিসের মত পাঠান হয়। সে অনেক তর্ক করে যে মেয়েদের যখন গহনা শুদ্ধ যাত্রীর গাড়ীতে আসিতে দেওয়া হয় তখন আমি কি দোষ করিলাম। কিন্তু গার্ড কিছুতেই রাজী হইল না। শুনিতে পাই ফকীর বেচারা বড়ই কষ্টে পড়িয়াছিল। গ্রীষ্মের সময় তাহার লৌহ শৃঙ্খল তপ্ত হওয়ায় সেই নির্ব্বাত গাড়ীর মধ্যে সে মূর্চ্ছা যায়, অনেক কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হয়। এই লৌহ ভার লইয়া নড়া চড়া তাহার পক্ষে সহজ নয়। আমি সে দিন তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম! তাহাকে কত বুঝাইলাম সে কোন মতে তাহার শিকলী ছাড়িতে চায় না। সে বলে "আমি খোদার বন্দী—২০ বৎসর ধরিয়া এই বেড়ী পরিয়া আছি—আমার গোরস্থানে আপনাপনি খসিয়া পড়িবে। আমার জন্য একটা মসজিদ বাঁধিয়া দেও আমি সেখানে গিয়া বাস করি।" তাহার দর্শনের জন্য কতলোক ঝুঁকিয়া পড়িতেছে। তাহার সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি নাই। কেহ তাহার পদ সেবা করিতেছে, কেহ তাহার আহার যোগাইতেছে। সে দিন দেখিলাম ফকীর দিব্য আরামে শুইয়া আছে তাহার মুখে একজন আহার তুলিয়া দিতেছে। এ অবস্থায় সে তাহার লৌহ বেড়ী খুলিতে চায় না বিচিত্র কি? বিনা পরিশ্রমে সুখে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। আমরাই কেবল বৃথা খাটিয়া মরি।

সোলাপুরের অনতিদূরে পণ্ডরপুর নামক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান আছে সেখানকার দেবতার নাম বিঠোবা। বিঠোবা কৃষ্ণমূর্ত্তি, তাঁহার শিরোপরি পারসী ধরণের টুপী, কোমরের দুই পার্শ্বে দুই হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। এখন সেখানে আষাঢ়ী মেলা— এই উপলক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের সমাগম হয়। ঐটুকু স্থানে অত লোকের সংকুলান হয় কি করিয়া এই আশ্চর্য্য! বর্ষার উপদ্রব না হইলে ভীমা নদীর তীরে যাত্রীরা দলে দলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। বড়ুয়ারা যাত্রীদের জন্য অনেক বন্দবস্ত করিয়া দেয়। বড়ুয়া সেখানকার প্রধান পুরোহিত, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর আবার অন্যান্য পুরোহিত আছে, তাহাদের নাম সেবাধারী। সেবাধারী সাত প্রকার;—

পূজারী,	
বেনারী	(মন্ত্র পাঠক)
পরিচারক	(জলবাহক)
হরদাস	(গায়ক)
ডিঙ্গরে	(নাপিত)
ডাঙ্গে	(চোপদার)
দিউটে	(মসালজী)

এতগুলি ভৃত্য নিয়ত দেবতার সেবায় নিযুক্ত। কেহ তাঁহার মুখের সামনে আর্শী ধরে, কেহ তাঁহার স্নানের জন্য জল বহিয়া আনে, কেহ তাঁহার শয্যাগৃহে শয্যা প্রস্তত

করে। বিঠোবা বেশ আরামে আছেন। তাঁহার দুগ্ধ, দধি, মধু প্রভৃতি পঞ্চামৃতে স্নান আর আহারের ত কথাই নাই, দিনের মধ্যে যে কত নৈবিদ্য আসিতেছে তাহার সীমা পরিসীমা নাই। এত মণ্ডা মিঠাই খাইয়া তাঁহার যে অজীর্ণ হয় না এই আশ্চর্য্য! তাই বলিয়া মনে করিও না এই দেবতার মন্দিরে নিয়ত শান্তি বিরাজ করিতেছে। মানুষের পদধূলিতে স্বর্গও কলুষিত হয়। বড়ুয়ার ও সেবাধারীদের মধ্যে নিত্যই কলহ বিবাদ। তাহাদের রেষারেষিতে লোকের পূজা বন্ধ। সম্প্রতি এখানকার ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে তাহাদের মকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। তাহার বৃত্তান্ত আর এক সময় বলিব। এখনকার মত বিদায়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবাহ উৎসব।

(গীতি নাট্য।)

(মহিলা শিল্পমেলায় অভিনীত।)

প্রথম দৃশ্য।

সখীদ্বয়।

বেহাগ—কাওয়ালি।

উষা। ধর্‌লো ধর্‌লো ডালা, এই নে কামিনী-ফুল—
ইন্দু। তু সখি আঁচল দিয়ে তাড়া লো ভ্রমরাকুল।
উষা। উঁহু, সখি, মরি জ্বলি
কপালে দংশেছে অলি—
ইন্দু। কপোলে দংশেনি সে তো, ভ্রমরারি একি ভুল!
উষা। মিছে, সই ফুল তুলি, ঝোরে গেল পাপ্‌ড়িগুলি
ভাঙ্গা ভাঙ্গা তারা মত ছেয়েছে গাছেরি মূল।
ইন্দু। তুলি গে নলিনী ওই—
উষা। আমি তো যাব না, সই,
মৃণাল কাঁটার ঘায়ে কে বল' হবে আকুল?
ইন্দু। সে ভয়ে পিছোয় কে বা তুলিতে অমন ফুল?

ঝিঁঝিট—একতালা।

উ। হোথায় একটি গাছের আড়ালে
মালতী ফুটিয়ে রয়েছে, ভাই।
ই। তাই তো, লো সখি, তুই থাক্ হেথা
আমি তবে হোথা ছুটিয়ে যাই।
উ। না, না, ওযে মোর সাধের কুসুম,
কেন দিব, সই, তুলিতে তোরে!
এই দেখ্, দেখ্, যাই তোর আগে;
তুই কি পারিবি ধরিতে মোরে?

(উষার অগ্রে মালতী বৃক্ষের নিকট গমন, ইন্দুর আস্তে আস্তে মল্লিকা চয়ন করিতে করিতে গান।)

খাম্বাজ—একতালা।

ইন্দু। যা, যা, তুল্‌গে লো তোর সাধের কুসুম,
দিব না, লো, তোরে বাধা,
আমি তুলি এই মল্লিকার রাশি
ফুটেছে কেমন আধা!
উষা। এই ঢুলু ঢুলু মালতীর ফুলে,
গাঁথিব মোহন মালা;
মরি কি তাহাতে মধুর মধুর
সাজিবে রূপসী বালা।

কাফি—যৎ।

ইন্দু। এই মল্লিকাটী পরাইব চুলে,
এইটি সাজাব কাণের দুলে।
উষা। গাঁথি মালিকা, বকুল ফুলে
দোলাব' সখীর কবরী মূলে।
ইন্দু। গাঁথ্‌গে মালা, কানন-বালা,
তোর সে সাধের বকুল ফুলে।
ওই কি আমরি, ফুটেছে চামেলি!
যাই, আমি যাই, আনিগে তুলে।

(ফুলে অঞ্চল ভরিয়া ইন্দুর উষার নিকট আগমন।)

পিলু—কাওয়ালি।

উ। মানিনু মানিনু হার তোর কাছে, সখি।
আমার মালতী তোলা, এখনো হোল'না, বালা
ফুলে ফুলে আঁচল ভরা তোর যে লো দেখি,
সারা বাগান লুটে নিয়ে তুই এলি নাকি?

দেশ—খেম্‌টা।

ইন্দু। কেমন, সখি, আমার সাথে, পারিলিনে তো তুই।
হোথায় তুলিব যাতি, হরষ-প্রমোদে মাতি,
সখীর কাছে দিয়ে আসি সেফালিকা যুঁই।

(অন্যান্য সখীগণের সহিত শ্যামাহস্তে নায়িকার প্রবেশ ও সকলে মিলিয়া গান।)

রাগিণী—খাম্বাজ।

নাচ্‌ শ্যামা তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীতস্বর
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি
নাচ শ্যামা নাচ তবে।
নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে।
এমন মধুর গান
এমন মধুর তান
কমল করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস্‌ কবে,
নাচ্‌ শ্যামা নাচ্‌ তবে।

স্বরলিপি।

গীতিনাট্যের একটী গানের অব্যবহিত পরেই তার পরের গানটী ধরা হয়। অনেক সময় পূর্ব্ব গানের তালের মাত্রার সহিত পরের গানের যোগ থাকে। বিবাহ-উৎসবের ''হোথায় একটী গাছের আড়ালে'' এই দ্বিতীয় গানটী শুধু গাহিলে শেষ কলি হইতে প্রথম কলিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "মালতী ফুটিয়ে রয়েছে ভাই" এই খানে শেষ করিতে হয়। কিন্তু অভিনয়ের সময় অত পুনরাবৃত্তি চলে না, উষার কথায় বাধা দিয়া ইন্দু বলিল "যা' যা' তুল্‌গে লো তোর সাধের কুসুম"—সেইজন্য উষা "হোথায় একটী গা—" পর্য্যন্ত বলিতেই ইন্দু ধরিল "যা যা তুল্‌গে"। গা—আর যা যা এই তিন অক্ষরে মিলিয়া তিন মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া একটী ঘর পূর্ণ হইল। যেন একই গান চলিতেছে, কেবল রাগিণী বদল হইয়া গিয়াছে।

বেহাগ—কাওয়ালি।

[ন্২	ন১	স১। স১	স১	গ১	গ১।	গম১	প১
[ধর্	লো	ধর্ —	লো	ডা	লা	এ	ই

ম১	ম১।	গ১	গর১	স২।]	স১	প১
নে	কা	মি	নী	ফুল]	তু	ম
				শেষ		

প১	প১।	প২	প১	ধ১।	নো১	স´১
থি	আঁ	চল	দি	য়ে	তা	ড়া

নো১	নোধ১।	প১	ম১	গ২।	গম১	প১
লো	ভ্র	ম	রা	ফুল	এ	ই

ম১	ম১।	গ১	গর১	স২॥	প১	প১
নে	কা	মি	না	ফুল	উ	হু

ন১	ন১।	স´১	স´১	স´১	স´১।	স´১
স	খি	ম	রি	জ্ব	লি	ক

স´১ নর্সর্´১ স´১ । ন১ নধ১ প১ ন১ ।
পা লে দং শে ছে অ লি

স´১ স´১ স´১ স´প১ । প১ প১ প১
ক পো লে দং শে নি সে

ধ১ । নো১ স´১ নো১ নোধ১ । প১ ম১
ত ভ্র ম রা রি এ কি

গ২ ॥ গ১ গ১ গ২ । গম১ প১ ম১ গ১ ।
ভুল মি ছে সই ফু ল তু লি

ম১ প১ ম১ ম১ । গ১ গর১ সন্১
ঝ রে গে ল পাপ্ ড়ি গু

স১ । স১ প১ প১ প১ । প১ প১ প১
লি ভা ঙ্গা ভা ঙ্গা তা রা ম

ধ১ । নো১ স´১ নো১ নোধ১ । প১
ত ছে য়ে ছে গা ছে

ম১ গ২ ॥ প১ প১ ন১ ন১ ।
রি মূল। তু লি গে ন

স´১ স´১ স´২ । স´১ স´১ . নস´র´১ স´১
লি নী ওই আ মি ত . যা

ন১	নধ১	প১	ন১	।	ন১	স২	র্স১	।	
ব	না	স	ই		মৃ	ণাল	কাঁ		

প২	প১	ধ১	।	নো১	স১	নো১	নোধ১	।	
টার	ঘা	য়ে		কে	ব	ল	হ		

প১	ম১	গ২	।	গ১	গ১	গ১	গ১	।
বে	আ	কুল		সে	ভ	য়ে	পি	

গ২	গ১	গ১	।	ম১	প১	ম১	ম১	।
ছোয়	কে	বা		তু	লি	তে	অ	

গ১	গ-র্১	স২	॥
ম	ন	ফুল।	

(আ—প্র)

ঝিঁঝিট—একতালা।

প১	প২	।	প২	ধপ১	।	ম১	প১	ম১	।
হো	থায়		এক	টী		গা	ছে	র	

গ১	র১	গ১	।	প১	প১	প১	।	ধ১	প১	
আঁ	ড়া	লে		মা	ল	তী		ফু	টি	

ধ১	।	ন১	ন১	ন১	।	ন৩	॥	প১	স১	স১	।
য়ে		র	য়ে	ছে		ভাই।		তা	ই	ত	

স´১ স´১ স´১ । স´২ নস´১ । র´১ স´১
লো স খি তুই থা ক্ হে

স´১ । ন১ ন১ ন১ । ন১ নর্স১ ধ১ ।
থা আ মি ত বে হো থা

ধ১ ধ১ ন১ । স´২ ন১ ॥ ধ১ ন১ প১
ছু টি য়ে যা ই না না ও

প১ প১ ধ১ । ন১ ন২ । ন১ ন২ । স´১
যে মো র সা ধের কু সুম কে

স´১ স´১ । ন১ নস´১ র´১ । স´১ স´১
ন দি ব স ই তু লি

স´১ । ন১ ন২ । প১ স´১ স´১ । স´১ স´২
তে তো রে এ ই দে খ্ দেখ্

স´২ নস´১ । র´১ স´১ স´১ । ন২ ন১
যাই তো র আ গে তুই কি

নস´১ ধ১ ধ১ । ধ১ ধ১ ন১ । স´১
পা রি বি ধ রি তে মো

স´১ ন১ । ধ১ ন১ প১ । প২ প১ ॥ ম১
রে হো থা য় এ ক্ টি। গা

খাম্বাজ—একতালা।

অ

প১ প১ । র্স´২ ন১ । স´১ স´১ র´১ ।
যা যা তুল গে লো তো র

নো১ স´১ নো১ । ধ১ ধ২ । ম১ প১
সা ধে র কু সুম দি ব

প১ । প১ প১ ধ১ । পধপ১ ম২ । গ৩ ।
না লো তো রে বা — ধা

স১ ম১ ম১ । ম১ গ১ ম১ । প১
আ মি তু লি এ ই ম

ধ১ নো১ । স´১ স´১ স´১ । র´১ র´১
ল্লি কা র রা শি ফু টে

গোঁ১ । র´১ স´২ । ধস´১ নো২ । ধ১ প১ ধ১ ।
ছে কে মন আ — ধা যা যা

স´২ ন১ । স´১ স২ ॥ ম১ গ১ ম১
তুল্ গে লো তোর এ ই ঢু
শেষ

ধ১ ধ১ নো১ । নো১ র্স১ স´১
লু ঢ লু মা ল তী

স´১ স´১ স´১ । নো১ নো১
র ফু লে গাঁ থি

র´১ ।	স´১	স´২ ।	ধনোস´১			
ব	মোহ	ন	মা			
নো২ ।	ধ২	পম১ ।	ম১	ম১	ম১ ।	
—	লা	—	ম	রি	কি	
ম১	গ১	ম১ ।	প১	ধ২ ।	নো১	স´২ ।
তা	হা	তে	ম	ধুর	ম	ধুর
র´১	র´১	র্গো১ ।	র´১	স´১	স´১	
সা	জি	বে	রূ	প	সী	
ধনোস´১	নো২ ।	ধ১	প১	ধ১ ।		
বা	—	লা	যা	যা		

(আ—প্র)

ইংলণ্ডে গার্হস্থ্য জীবন।

(গৃহস্থালী ও দাসদাসী)

এক বিপথগামী সন্ন্যাসীর ছুটো একটা কাণ্ড ধরা পড়্লে সে ব্যাচারা বলেছিল "স্ত্রী আর গৃহের জন্যই ত মানুষের জন্মগ্রহণ।"

পঁচিশ বছর আগেও লোকের মনে ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকের জীবনের একমাত্র কাজই হচ্ছে গৃহস্থালী তত্ত্বাবধারণা করা। সেকালে যখন চাকরবাকরেরা দুর্ব্বিনীত বা কার্য্যশিথিল হ'লে তাদের শাস্তি দেওয়া যেতে পার্‌ত, এবং ভোর চারটে পাঁচটার সময় শয্যাত্যাগ করা তারা বড় একটা কঠিন ব্যাপার মনে কর্‌ত না তখন বটে গৃহিণীপনায় সুখ ছিল। কিন্তু এখন!—কি বিপরীত!

সেকালে হাটে বাজারে দাসদাসী পাওয়া যেত, একেবারে এক বৎসরের কড়ারে

তাদের নিযুক্ত করা হত; কখন বা এক মনিবের সংসারেই চাকরের সমস্ত জীবনটা কেটে যেত। কিন্তু এখনকার দিনে এক বৎসর অতি দীর্ঘ মেয়াদ, দাসদাসীরা এক মাসের বেশী মেয়াদে চাকরী করতে রাজী নয়। গৃহিণীদের চাকরাণীর দরকার হলেই (মনে করুন যদি একটা রাঁধুনীর দরকার হলো) রেজেষ্ট্রী আফিসে উপস্থিত হয়ে সামর্থ্যানুসারে একটা আধুলী থেকে আরম্ভ করে একখানা পাঁচ টাকার নোট পর্য্যন্ত দর্শনী দিলে তবে রেজেষ্ট্রী আফিসের কর্ত্তৃঠাকুরাণী উমেদারনীদের নামের তালিকা খুলে দেখে হয়তো বলেন "আপনার পছন্দমত লোক এখন হাতে নেই, শীঘ্রই খোঁজ করে পাঠিয়ে দেব।" তারপর, দিনের পর দিন যায় রাঁধুনী আর জোটে না, শেষে যাকে ছাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল অগত্যা তাকেই আর দুচার দিন থেকে গিয়ে আমাদের বাধিত করবার জন্যে অনুরোধ করতে হয়; সে মহিলাটী—আপনাদের মনে আছে বোধ হয় আজকালকার দিনে সকলেই মহিলা—ভেবে চিন্তে হয় তো উত্তর করেন "তা আপনি আমায় আর দুচার দিন থাক্‌তে বল্‌ছ, তোমার কথা ফেল্‌তে নারি, আচ্ছা তা না হয় আমিই আর কদিন রৈনু।" সে দুচার দিনও চ'লে যায়, মেরি জেনের জায়গায় নতুন রাঁধুনীর এখনো দেখা নেই। যাহোক সেত চলে গেল, আর তুমিই যদি তাকে গোড়ায় জবাব দিয়ে থাক তাহলে সে যাবার সময় মনে মনে ভারি খুসী হয়ে একটুখানি ঠাট্টার স্বরে তোমায় বলে যাবে "তা মা এবার যেন মনের মত রাঁধুনী পাও।" তুমি বাহালবরতরফের কর্ত্রী, কিন্তু এখন বাহাল যে কাকে কোরবে এই ভাবনাতেই বিব্রত। এদিকে চাকরাণী ঠাকরুণরা মুখ অন্ধকার করে বসলেন, আর তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রাঁধা বাড়া সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কোন রকম চুক্তি ছিল না, শুনেই চক্ষু স্থির! মনে কর তারাও যদি ইস্তফানামা দাখিল করে, তাহ'লে তোমার কি বিপদ! আজ কালকার বাজার দরে এরা নিতান্ত মন্দ চাকর নয়, আর এদের পেতেই কত নাকের জলে চোখের জলে হতে হয়েছিল। যাহোক একটাত কিছু করা চাই, কাজেই আবার একটা রেজিষ্ট্রী আফিসে যাও, যথারীতি দর্শনী দাও, শেষে হয়ত একটি "অন্নপূর্ণার" সাক্ষাৎ লাভ হলো; তিনি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগলেন—কি কাজ করীতে হবে, সপ্তাহে কদিন সন্ধ্যে বেলায় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা কর্‌বার ছুটি মিলবে, বন্ধুবান্ধবেরা দেখা কর্‌তে এলে রান্নাঘরে তাদের আড্ডা জম্‌তে পারবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি ভয়ে ভয়ে তার রান্নার পারদর্শিতার সম্বন্ধে দু এক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে অবশ্য বলবে যে সে না জানে এমন রান্নাই নেই, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই হাঁকবে যে বছরে পঁচিশ পাউণ্ড (আড়াইশ টাকা) মাইনে চাই, তা ছাড়া তাঁর বিয়ার যোগান ত আছেই। বলা বাহুল্য তার রীত প্রকৃতিতে তোমার বিলক্ষণ অভক্তির উদয় হয়, কিন্তু নাচার, তাকে ছাড়্‌লে হয়তো কাল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার একেবারে বন্ধ থাকবে, বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত দাসীদ্বয়ের ইস্তফানামার কথা স্মরণপথারূঢ় হওয়ায় অগত্যা তাকে বাহাল

করাই ঠিক কর্ত্তে হয়; তারপর সুবিধে থাক্‌লে তার পূর্ব্ব মনীবঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা ক'রে তার কথা জিজ্ঞাসা করতে, তিনি হয়ত উত্তর দিলেন, যে "তাঁর তাকে তেমন পোষাত না, তবে আজ কালকার চাকর দাসীর দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁর অনেক শিক্ষা হয়েছে তাই তিনি তাকে রাখ্‌তেও রাজী ছিলেন কিন্তু সে ভাল রাঁধ্‌তে পারে না বলে তাঁর স্বামী কোনমতেই রাখ্‌তে দিলেন না।" আবার তখনি তোমার বাড়ীর কাজ কর্ম্মের কথা শুনে তিনি বল্‌লেন "তা তোমার কাজ চালাতে পার্‌বে বোধ হয়।" তুমি যে খুব আশ্বস্ত হলে তা নয়! তোমাকে আবার সেই প্রথম রেজেষ্ট্রী আফিসে গিয়ে খোঁজ করতে হোল, কিন্তু সেখানে এক সত্তোর বছরের বুড়ী ছাড়া আর কোন লোক পাইবার সম্ভাবনা নেই, বুড়ী বছরে ত্রিশ পাউণ্ড না পেলে কোথাও চাকরী করবেন না এই ঠিক দিয়ে বছর খানেক বেকার বসে' আছেন (N. B. এ একটা সত্য ঘটনা); কাজেই তুমি "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" ভেবে সেই পঁচিশ পাউণ্ড প্রার্থীকেই কাজে নিযুক্ত কর্‌লে। সে এসে দেখে শুনে আপনার কাজ গুছিয়ে নিয়ে চেপে বস্‌লো।

এদিকে তোমার কর্ত্তাটী তাঁর মহাপ্রাণীর সন্তোষের জন্য অতিশয় চিন্তাশীল,—তিনি বাড়ীর গতিক মন্দ বুঝে তোমাকে এক স্থানীয় টেলিগ্রাম করে পাঠালেন যে আজ তাঁর আফিস থেকে বাড়ী ফির্‌তে রাত হবে, অর্থাৎ কিনা আজ তিনি ক্লাবে দিব্যরকম আহারের ব্যবস্থা করেছেন। শুনে তুমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে, কেননা রান্না খারাপ হলে বিলাতী রমণীদের স্বামী মহাশয়দের "স্বভাবটা যে নিতান্ত মধুমত্ত মধুকরের মত" হয় তা নয়। সেদিনকার রান্না যদি তোমার মুখে না রোচে, তাহলে এই মনে করে নিজেকে সান্ত্বনা দাও যে এর চেয়েও খারাপ হতে পার্ত্ত। তার পর দিন সকাল বেলার খাবারের তদ্বির কর্ত্তে গিয়ে দেখ যে গতরাত্রে যে মাংসটা বেঁচেছিল সেটা সবই রাঁধুনী ও চাকরাণীঠাকুরুণদের সেবায় লেগেছে। এতে তুমি পষ্টাপষ্টি আপত্তি প্রকাশ কর্‌লে রাঁধুনী বল্‌বে যে মার্থার কাছে সে শুনেছে, যে প্রতি রাত্রেই তারা মাংস খেয়ে থাকে। তার পরে মার্থার তলব পড়তে সে কৈফিয়ৎ দিলে যে নতুন রাঁধুনী ঠাকরুণ তাকে বলেছিলেন যে "তাঁর প্রতিরাত্রেই মাংস খাওয়া অভ্যাস, কাজেই এখানে না খেলে তাঁর চল্‌বে না—তা যাই বল আর যাই কর";—এই রকম পরস্পরবিরোধী কৈফিয়তে উভয় পক্ষেরই মেজাজ গরম হয়ে যায় আর তার ফল টের পাওয়া যায় রান্নায়;—সব রান্নাই এত খারাপ, যে তার চেয়ে খারাপ হওয়া আর অসম্ভব।

তোমর দুটি স্বামী স্ত্রীতে মিলে আহারের মস্কারা সমাপন করে রাঁধুনীকে তলব করলে; এইবার একটা অপ্রীতিকর হাঙ্গাম বাধ্‌ল; তোমরা স্পষ্টই দেখ্‌ছ যে বিয়ারের বোতলের সঙ্গে আর তাঁর অধরের সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় আলাপ হয়েছে, সে খুব বেয়াদব হয়ে উঠে মুখের উপর উত্তর দিতে লাগ্‌ল। শেষে রাগ সামলাতে না পেরে তুমি তাকে তখনি দূর হ'য়ে যেতে বোল্লে, সে এক মাসের মাইনে দাবী ক'রে বসলো, তারপর

অনেক গোলমাল ও বকাবকীর পর মাইনে বুঝে নিয়ে তোমার বাড়ী ছাড়্‌লে। তুমি তখন নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লে বটে কিন্তু কাল যে আবার তার জায়গায় আর একজন লোকের সন্ধান কর্ত্তে হবে, থেকে থেকে এই চিন্তায় মন ভারগ্রস্ত হতে লাগলো। এই রকমে অল্পবিস্তর মন্দ দাসী কত এল আর গেল, অবশেষে যখন তুমি এই গৃহস্থালী ঝঞ্ঝাটে বিরক্ত হয়ে একেবারে এলিয়ে পড়েছ তখন হয়ত তোমার একটা মনের মত দাসী জুট্‌ল।

গৃহিণীপণার গেরো ঢের, কেননা এতে পরের উপরই বেশী নির্ভর কর্ত্তে হয়, বিশেষতঃ চাকরদাসী আর দোকানদারদের উপর,—এই দুয়ের মধ্যে চাকরদাসী নিয়েই বেশী হয়রান্ হতে হয়।

উপরে আমি চাকরাণীর ঝঞ্চাটের যে ছবি দিয়েছি, তাতে সাধারণতঃ গৃহস্থ পরিবারে যে রকম গোলযোগ ঘটে তারই একটা মোটামোটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু অনেকস্থলে এর চেয়েও ঢের বেশী হাঙ্গাম হয়।

একটা আস্তবাড়ী ভাড়া করে থাকার চেয়ে ঘরভাড়া করে থাক্‌লে কম চাকর বাকরের দরকার হয়, সেইজন্যে হাঙ্গামও ঢের কম, আজ কাল তাই লণ্ডনে ঘর ভাড়া করে থাকাটা খুব চলিত হচ্ছে। কিন্তু তারও আবার অসুবিধে আছে, প্রত্যেক বাড়ীতেই এমন অনেক পরিবার আছেন যাঁরা বাড়ীর অন্য লোকের সুবিধা অসুবিধার দিকে অল্পই দৃষ্টিপাত করে থাকেন। সময়ে সময়ে এমনো দেখা যায় যে নীচের তলায় হয়তো একজন লোক মৃত্যু শয্যায় পড়ে রয়েছেন আর তার ঠিক উপরের তলাতেই একদল লোক মহানন্দে নৃত্যগীত করছেন।

সহরে ও পাড়াগেঁয়ে জীবনে অনেক প্রভেদ আছে; পল্লীগ্রামের নির্ম্মল বাতাসে মানবের জীবন ঢের সরল হয়। পল্লীগ্রামে রাত্রি দশটা বাজতে না বাজতেই সকলে শয্যাগ্রহণ করে, আর সহরে ঠিক সেই সময়েই আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হয়। পল্লীগ্রামে গার্হস্থ্য জীবন একঘেয়ে হলেও সুখের বটে; সেখানে স্বামী স্ত্রীতে তেমন ছাড়াছাড়ি নেই, কোন নাচে স্বামী স্ত্রী একত্রে নৃত্য করলে তা একটা রীতি বিরুদ্ধ কাজ বোলে কারো মনে হয় না, কিন্তু লণ্ডনে এরকম একটা কাণ্ড ঘটলে সেটা সকলের কাছে সৃষ্টিছাড়া বো'লে মনে হয়, অধিকন্তু সেই দম্পতীর উপর অজস্র ধারে ঠাট্টাবিদ্রূপ বর্ষিত হ'তে থাকে। শিষ্টাচারের গণ্ডী অতিক্রম না ক'রে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের স্বেচ্ছানুরূপ আমোদে রত থাক্‌তে পার্‌বেন; তাতে কেউ কাউকে বাধা দেবেন না;—এই সহরের সর্ব্ববাদী-সম্মত নিয়ম; আমেরিকাবাসিনী ভগিনীদের দেখাদেখি আমাদের দেশের বর্ত্তমান কালের মহিলাগণ তাঁদের স্বাধীনতার উপর অপরকে হস্তক্ষেপ করতে দিতে নিতান্তই নারাজ। বিধবারাই সবচেয়ে স্বাধীন। খুব অল্প বয়সের বিধবা (তাঁদের সংখ্যা অবশ্য নিতান্ত কম) না হোলে আর পথ চলবার সময় অভিভাবক বা রক্ষকের দরকার

হয় না। স্বামী যদি বেশ টাকাকড়ি দিয়ে থুয়ে সট্‌কান তাহলে তাঁরা দেশ হতে দেশান্তরে, গৃহ হতে গৃহান্তরে ঘুরে ঘুরে সমাজ কুসুমের সমস্ত মধুটুকু আহরণ ক'রে বেড়ান; যখন যেখানে যাবার ইচ্ছা হয় তাতে বাধা দেবার কেউই নেই। বিধবাদের বাড়ীর নিমন্ত্রণই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আদরণীয়; স্বামী বেঁচে থাকবার সময় ভাল রকম আহারের 'ম্যানেজারী' করতে করতে আহার সম্বন্ধে বিধবাদের একটা উঁচু নজর হয়ে যায়, এই জন্যেই তাঁদের বাড়ী নিমন্ত্রণ পাবার আশায় পুরুষেরা হাঁ ক'রে বসে থাকেন; বিধবারা কেহ কেহ পুনর্ব্বার বিবাহ করেন, এবং তাতেও তাঁরা কুমারীদের চেয়ে জেতেন, তাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীটি তাঁদের হাতের মুঠোয়, কারণ কোন্ স্বামী বল নিজেকে তাঁর স্ত্রীর "প্রথম উনিটির" সঙ্গে অসন্তোষজনক তুলনার অবসর দিয়ে সাধ করে নিজের ঘাড়ে অভিমান ডেকে আন্‌বেন?

গৃহস্থালীসম্বন্ধীয় শ্রমবিভাগ সবিশেষ অর্থপূর্ণ। মদের ভাণ্ডার (Wine Cellar) বাগান ও অশ্বশালা স্বামীর কর্তৃত্বাধীনে, আর বাড়ীর ভিতরের যা কিছু সে সবের স্ত্রীই অদ্বিতীয়া অধিশ্বরী—কেবল সেই মদের ভাণ্ডারটা ছাড়া। বিলাসের যা কিছু উপকরণ তা কর্ত্তার হাতে আর দৈনন্দিন নির্জ্জল আবশ্যকীয়টার ভার গৃহিণীর উপর; দ্বিপদ জানোয়ারের শ্রেষ্ঠনমুনারই যোগ্য বিধান বটে! পুরুষ যেদিন নিজেকে তাবৎ সৃষ্টবস্তুর মহাপ্রভুত্বে অধিষ্ঠান করলেন, সেদিন থেকেই এমন সুবন্দোবস্তটি কর্‌লেন যাতে করে সসাগরা ধরণী দ্বিধা হলেও তাঁর পরিচর্য্যার কোন হানি না হয়, আর যদি দৈবাৎ কোন কারণে তাঁর সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় তা হলে অমনি আদিপুরুষ আডামের মত বলে উঠ্‌বেন "মেয়েরাই যত নষ্টের গোড়া।"

মিস্ এ মরিস্। *

ফুলের মালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঘন তরুশ্রেণীর ছায়াপথ দিয়া দুইটি ছোট মেয়ে মহীপাল দীঘির ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দীঘির কাল জলে বকুল গাছের কাল ছায়ার উপর একখানি রজ্জুবদ্ধ ছোট নৌকা বায়ুভরে হেলিতেছিল, দুলিতেছিল, বারবার তীরে আহত প্রতিহত হইয়া অশান্তভাবে নৃত্য করিতেছিল। তাহার যেন ইচ্ছা মনের সাধে সে ভাসিয়া চলে, কিন্তু

* শ্রীদানেন্দ্র কুমার রায় কর্তৃক অনুবাদিত।

অদৃষ্টক্রমে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া অন্তঃপুরিকার গবাক্ষ-কটাক্ষপাতের ন্যায় অল্পপ্রসর ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যেই হিল্লোলিত হইয়া মনের দুঃখ দূর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাই তাহার এই উদ্দাম অশ্রান্ত অশান্তভা।

মেয়ে দু'টী বকুল তলে দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্ণমনে আরোহীহীন নৌকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। একজন আধোআধো ভাষায় বলিয়া উঠিল "লাজকুমার এখনো আসেনি দিদি"। নিরূপমার বয়স আট বৎসর কিন্তু এখনো তাহার সকল কথা ভাল করিয়া ফুটে নাই। তাহার ছোট্ট সুন্দর সরল মুখের এইরূপ মধুর আধো আধো কথা শুনিতে তাহার বয়োজ্যেষ্ঠা বয়স্যাগণ সকলেই বড় ভালবাসে, কেবল শক্তিময়ীর তাহা ভাল লাগে না। নিরূপমা কথা কহিলেই শক্তি হাসে, ভ্যাংচায়, ব্যঙ্গ করে, তাই নিরূপমা তাহার সাক্ষাতে ভয়ে ভয়ে থাকে—তাহার কাছে থাকিতে আদপেই ভালবাসে না। অথচ যেখানে শক্তি সেইখানেই নিরূপমা। আলোক ছায়ার মত তাহারা যেন অবিচ্ছেদ্য, কি যেন কি এক অজ্ঞাত শক্তি বলে শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যেন ফিরিতেই হয়। শক্তি যত বেলা থাকিতে দীঘির বাগানে আসে, এমন অন্য কেহ আসে না, শক্তি যত দেরীতে ঘরে ফিরে এমন অন্য কেহ না, নিরূপমার সেইজন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়, নিরূপমা রাজকুমারকে দেখিতে ভালবাসে। রাজকুমার নিরূপমার বয়স্যাদিগের সহিত খেলিতে প্রতি অপরাহ্নে এখানে আসেন।

আপাততঃ মনের আবেগে কথাটা বলিয়া ফেলিয়া নিরূপমা উপহাসের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু শক্তি তাহার কথায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বলিল "আমরা আয় জলে নামি, পদ্ম তুলি" নিরূপমা বলিল—"না প'লে যাব, আমি বকুল মালা গাঁথি"। শক্তির বয়স নয় বৎসরের মাত্র কিন্তু এই কথায় সে যখন তাহার ঘন ভ্রমর কৃষ্ণ ভ্রূধনু কুঞ্চিত করিয়া দৃঢ় অনুজ্ঞাব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিল "যাবিনে!" তখন নিরূপমা যেরূপ ভীত হইল তাহার ঠাকুরমা বকিলেও সে সেরূপ ভীত হয় না। কিন্তু তবুও তাহার পূর্ব্ব বাক্যের প্রতিধ্বনির স্বরূপ পাষাণ পুত্তলির মুখ হইতে যেন উচ্চারিত হইল—"না যাব না"

"যাবিনে!"

"না"

"যাবিনে! আয় বল্‌ছি" বলিয়া শক্তি তাহার হাত ধরিয়া টানিল, বালিকা "না যাব না" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এই সময় তরুশাখার মধ্য দিয়া আর দুইটি বালিকা সহসা দৈবসহায়রূপে প্রকাশিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "শক্তি, ওকে কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছিস্, কি হয়েছে!" বলিতে বলিতে তাহারা শক্তি ও নিরূপমার নিকটবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল। শক্তি তখন নিরূপমার হাত ছাড়িয়া বলিল "দেখ না! বল্‌ছি জলে চল, পদ্ম তুলে আনি, তা যাবে না!" নিরূপমা কাঁদিয়া বলিল "আমি প'লে যাব।" শক্তি মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "প'লে যাব!" কুসুম বলিল "ও ছেলে মানুষ, আচ্ছা চল আমি তোর সঙ্গে পদ্ম

তুলিগে।" তাহারা জলে নামিল, কামিনী নিরূপমার চোখ মুছাইয়া বলিল, "বকুল পড়ছে আমরা আয় বকুল কুড়াই"। চোখের জল না শুকাইতে শুকাইতে বালিকার অধরে হাসি ফুটিল, সে বাম হাতের মুষ্টি খুলিয়া সহর্ষে বলিল, "আমি সুত এনেছি, মালা গেঁথে লাজকুমারকে দেব"।

ফাল্গুন মাস। নব বসন্তের হিল্লোলে বৃক্ষ পত্র মর্ম্মর করিতেছে, প্রস্ফুটিত আম্র মুকুলের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। কোকিল পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া ঝঙ্কার তুলিতেছে, সেই মলয় হিল্লোলিত, বসন্তপক্ষী কুজনিত, পরিমলাকুল কানন-তল ঢুঁরিয়া ঢুঁরিয়া সদ্যপতিত নব বকুলাবলীতে অঞ্চল ভরিয়া বালিকা দুইটি দীঘির ধারে আসিয়া বসিল, বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। তখনো বেলা অবসান হয় নাই, পশ্চিমদিকে দীঘির জলে তরুশ্রেণীর ঘন কাল ছায়ার উপর সূর্য্যকিরণ ঝক্‌মক্ করিতেছিল, আর পূর্ব্বদিকে পদ্মপত্রাচ্ছন্ন জলরাশির হৃদয় আলোড়িত এবং আলোকিত করিয়া দুইটি ছোট মেয়ে সাঁতার দিয়া পদ্ম তুলিতেছিল। প্রস্ফুটিত শতদলরাজির মধ্যে সেই প্রস্ফুটিত সুন্দর মুখ দুইটি,—উভয়ের মাধুর্য্যে উভয়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল।

কামিনী একবার করিয়া তাহাদের দিকে চাহিতেছিল একবার করিয়া হাতের দিকে চাহিয়া সুঁচের মধ্যে ফুল পরাইতেছিল, কিন্তু নিরূপমা এক মনে মালা গাঁথিতেছিল। খানিক পরে শক্তি ও কুসুম আর্দ্রবসনে, আর্দ্র এলায়িতকেশে, স্নাতসুন্দর দিব্যরূপে তাহাদের নিকট আসিয়া অঞ্চলের শতদলরাশি ভূমির উপর ফেলিল। নিরূপমা সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "আমি একটা নেব, লাজকুমারকে দেব!" শক্তি রাগিয়া বলিল, "ইস্ আমরা তুল্‌ব! আর উনি 'লাজকুমারকে' দেবেন! কক্ষণো না।" নিরূপমার মুখটি চুণ হইয়া গেল। কামিনী বলিল "তা ভাই তোরা এত ফুল তুল্লি, রাণীমার কাল কিন্তু পূজোর ফুল কম পড়বে, তখন দেখবি কি হয়"। শক্তি বলিল "তা কে জানে যে কে তুলেছে"। কুসুম বলিল "আচ্ছা ভাই সত্যি কি একশ ফুলে শিব পূজো কর্‌লে সোয়ামী বশ হয়?"

কুসুম কামিনী দুজনেই বিবাহিত কিন্তু বয়সে এখনো তাহারা নিতান্ত বালিকা, এক-জন একাদশ একজন দ্বাদশ। কামিনী বলিল "মা বলে আগে নাকি রাজা রাণীকে দেখ্‌তে পার্‌ত না, একশ ফুলে শিব পূজো করে এখন মুটোর মধ্যে এনেছে, তা তোর দিদিকে নাকি তার সোয়ামী হেথায় রাখ্‌তে চায় না তা সে পূজো করে না কেন? তাহলেত সোয়ামী কথা শুন্‌বে!

কামিনী বলিল "তা ভাই ১০০শ ফুল রোজ আমরা কোথায় পাব। মা কিন্তু বলছিল তা নয়; রাজকুমারের কি ফাঁড়া আছে তাই রাণীমা পূজো করে, সেই ফাঁড়ার জন্যে রাজকুমারের এখনো বে হয় নি। ফাল্গুন মাসটা গেলেই ফাঁড়া যাবে।

কুসুম আহ্লাদে বলিল, "আমাদের নতুন রাণী হলে কি মজাই হবে, আচ্ছা বল দেখি আমাদের রাণী কেমন হবে?"

কামিনী বলিল, "আমাদের নিরূপমার মত রাণীটী হলে বেশ হয় না ?"

নিরূপমার চোখদুটি সহসা জ্বলিয়া উঠিল, হাতের মালা খসিয়া গেল, সে আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ দিদি আমি রাণী হব—" কামিনী হাসিয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, আচ্ছা তুই রাণী হবি, আমরা আয় রাণী রাণী খেলি। তুই রাণী, আমি রাণীমা, কুসুম সখী, শক্তি,—

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া শক্তি বলিল, "আর আমি" ?

"তুই দাসী !"

তাহার নীল তারার মধ্য দিয়া সহসা অগ্নিকণা নির্গত হইল। বলিল "তাইত ! আমি রাণী. নিরূপমা দাসী।"

নিরূপমা বলিতে যাইতেছিল "না আমি দাসী হব না"—এমন সময় বাঁশিতে গান বাজিল— '

আমি কি করি !
বল সহচরি !
আমার প্রাণে উঠ্‌ছে গানের তুফান
আমি গাহিতে নারি !
আমার মনের বাসনা,
যে রূপের নাইকো তুলনা,
যে রূপে পাগল হৃদয় মন
মুগ্ধ ত্রিভুবন,—
মনের সাধে, দিনে রাতে
সে রূপের স্তুতি গান করি।
গাহিব কি বিন্দে সখি
আমার বাঁশরী অরি !
আমি চাই,
বাঁশির তানে তাহার প্রাণে
করুণা জাগাই,
রাই গো শরণ দাও বলে
সে চরণের তলে পরাণ বিকাই।
বাঁশি আমারে ছলে ;
বাজাতে গেলে,
আর কিছু না বলে

শুধু রাধানামে সাধা সুরে
ডাকে "কিশোরী।"
আমি উপায় কি করি।"

নিরূপমা আহ্লাদে বলিয়া উঠিল "ঐ লাজকুমার" !

কুসুম বলিল "আচ্ছা রাজকুমার যাকে বল্‌বেন সেই রাণী।"

কামিনী বলিল "সেই ভাল"। দেখিতে দেখিতে বাঁশরী ধ্বনি থামিল। চতুর্দ্দশ বৎসরের সুরূপ সুন্দর একটি বালক এইখানে আসিয়া দাঁড়াইল, কুসুম আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "রাজকুমার, তুমি বল কে রাণী? শক্তি না নিরূপমা?"

কামিনী বলিল, "আমরা রাজারাণী খেল্‌ছি। আমি রাণীমা—দিদি সখি, আর নিরূপমা—"

কুসুম। না তুমি বল রাজকুমার, কে রাণী?

রাজকুমার। কার রাণী, রাজা কে?

দুজনে হাসিয়া বলিল, "সে আবার কে? তুমি রাজা।

রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন, আমি রাজা! আর কে রাণী?

নিরূপমা এতক্ষণ ধরিয়া যে ফুলের মালা গাঁথিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, রাজকুমার তাহা উঠাইয়া শক্তির গলায় দিয়া বলিলেন "এই দেখ," গর্ব্বময় আহ্লাদজ্যোতিতে শক্তির বালিকামুখে যুবতীর গাম্ভীর্য্য ঘনীভূত হইল; নিরূপমার চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল, কুসুম কামিনী হাসিয়া দুজনকে একত্র করিয়া হুলু দিয়া বরণ করিল; পাপিয়া ডাঁজে ডাঁজে তাহার প্রতিধ্বনি গাহিয়া উঠিল, বালিকাদের রাজারাণী খেলা শেষ হইল। নিরূপমা যখন দেখিল তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল, সে রাণী নহে শক্তিই রাণী, তখন সাশ্রুনয়নে রাজকুমারের নিকট আসিয়া কহিল—"আচ্ছা আমি তবে লাজকুমারের দাসী"।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশ প্রকৃত প্রস্তাবে দিল্লির অধীনতা ছিন্ন করিল। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা বহরমখাঁর মৃত্যু হইলে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে তদনুচর ফকীরুদ্দিন পূর্ব্ববাঙ্গলায় স্বাধীন পতাকা উড্ডীন করেন, আর লক্ষণাবতীর শাসনকর্ত্তা কদরখাঁকে নিহত করিয়া আলিউদ্দীন আলিসা পশ্চিম বাঙ্গলার অধিপতি হইয়া গৌড় সন্নিহিত পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপিত করেন। অতঃপর আলিউদ্দীনের ধাত্রীপুত্র সামসুদ্দিন

ইলিয়াস সা 'শেষোক্ত' রাজ্য কবলিত করিয়া ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রাম বিজয় করতঃ সমগ্র বাঙ্গলা একাধিপত্যে আনয়ন করিলেন। সম্রাট ফিরোজ সা তখন দিল্লির সম্রাট; তিনি ইহাতে প্রমাদ গণিয়া সসৈন্যে বঙ্গে আগত হইলেন; তৎকর্ত্তৃক পাণ্ডুয়া আক্রান্ত হইল; বঙ্গেশ্বর রাজধানী হইতে ১১শ ক্রোশ দূরে একদলা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্রাট উক্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া যখন দেখিলেন সহজে উহা হস্তগত হইবে না তখন সন্ধি স্থাপন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন এবং কয়েক বৎসর পরে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার স্বাধীনতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। বঙ্গেশ্বর পূর্ণমনোরথ হইয়া, মহোৎসবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিলেন। সেই বিজয় আনন্দ দিনের স্মরণার্থ সেই অবধি প্রতিবৎসর রাজধানীতে একটি করিয়া উৎসব হইয়া থাকে, শস্ত্র ক্রীড়াই এই উৎসবের প্রধান আমোদ। অস্ত্রযুদ্ধে, ব্যায়ামযুদ্ধে যিনি সেদিন জয় লাভ করেন, বঙ্গেশ্বর তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া পুরস্কার প্রদান করেন।

রাজধানীতে আজ অস্ত্রোৎসব। চন্দ্রাতপ আবরিত সুসজ্জিত দুর্গ প্রান্তর লোকে পরিপূর্ণ। বঙ্গেশ্বর আলিয়াস সা এখন জীবিত নাই, তৎপুত্র সুলতান সেকন্দর সাহ উচ্চ মঞ্চোপরি কুসুময় স্তম্ভবেষ্টিত একটি চক্রাকার মণ্ডল মধ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। চতুষ্পার্শ্বে সভাসদগণ এবং পদমর্য্যাদা অনুসারে বঙ্গের নানাস্থান হইতে সমাগত নিমন্ত্রিত রাজা জমিদার সামন্তবর্গ উপবিষ্ট। অদূরে মল্ল যুদ্ধের চাৎকার, তরবারি যুদ্ধের ঝনঝনা, দর্শকবৃন্দের সোৎসুক উল্লাসধ্বনি প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

দুর্গের চতুর্দ্দিকে নানারূপ সুশোভিত বিপণি;—কোথাও খাদ্যের রাশি, কোথায় ফুলের বাহার, কোথায় চারু শিল্প-সৌন্দর্য্য; কোথাও অস্ত্রের চাকচিক্য। অনেক রকমের ব্যবসাদারই আজ লাভের আশায় দুর্গে জড় হইয়াছে, অদৃষ্টের ব্যবসাদারই বা এ সুযোগ ছাড়িবে কেন? তাহারাও দোকানপাট সাজাইয়া বসিয়াছে, অনেকে তাহা-দের কাছে গিয়া ঘরের পয়সা দিয়া দুঃখ কিনিয়া লইয়া যাইতেছেন।

এইরূপ একটি দোকানে কিছু বিশেষ ভিড়। নামের জোরে ক্রেতার উপর ক্রেতা আসিয়া জুটিতেছে, বিক্রেতা একা তাহাদিগের সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাঁহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছে, তিনি লাভের পায়ে গড় করিয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছেন এই সময় একটি সুন্দরী আসিয়া তাঁহার হাতটি দেখিতে অনুরোধ করিলেন। সৌন্দর্য্যের অনুরোধ বড় অনুরোধ; গণকঠাকুর সে অনুরোধ ছাড়াইতে পারিলেন না; সুন্দরীর বাম হাতটি হাতে ধরিয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সেই রাজরাণী যোগ্য পৃথিবী বিপ্লবকারী রূপরাশি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া একজন দর্শক বলিল "ঠাকুর মুখে কি গণা যায় হাত দেখুন।" আর একজন বলিল "গণক ঠাকুর কি তেমনি পাত্র

হাতে কিছু না পেলে কি হাত দেখবেন ?" বালিকা গণকের হাতে কিছু দিতে গেলেন— তিনি অস্বীকার করিয়া বলিলেন ; মা তুমি রাজরাজেশ্বরী হইবে ; তোমার কাছে কিছু লইব না।" একজন অশ্বারোহী এই জনতার নিকট দিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন, বালিকার পার্শ্ববর্ত্তী হইবামাত্র সে সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল ; অশ্বারোহী সহসা বিস্মিত নেত্রে সেইখানে অশ্ব থামাইলেন। সুন্দরী তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ; সেই নয়ন ঝলসিতরূপ তিনি আর কথনো ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। অথচ পূর্ব্ব জন্মের বিস্মৃত স্মৃতির মত সেরূপ যেন চেনা চেনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি মুগ্ধ স্তম্ভিত আত্মবিস্মৃত হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জনতা তাহা হইতে দূরে চলিয়া গেল ; কি স্মৃতিসূত্রে কে জানে সেই অপরিচিত সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি আর সকল ভুলিয়া গেলেন ; কেবল একটি শৈশব ঘটনা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল, বিজন দীঘির ধার, নিস্তব্ধ উপবন, তাঁহার হাতে হাত সংযুক্ত, সিক্ত এলায়িত কেশ, আর্দ্র বসন, বালিকার দিব্য মুর্ত্তি, আর সহচরীদিগের সোল্লাস হুলুধ্বনি, তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সহসা অশ্ব অধীরভাবে গ্রীবা উত্তোলন করিল, রাজকুমার শুনিলেন, তীরলক্ষ্য ভেদ করিবার জন্য নকীব তীরযোদ্ধাদের ডাকিতেছে। অশ্বারোহী আত্মস্থ হইয়া নিজের মুগ্ধতায় মনে মনে হাসিয়া সেইদিকে অশ্বচালনা করিয়া দিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃপাণ যুদ্ধ বর্ষাযুদ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য অস্ত্র খেলা হইয়া গিয়াছে, তীর খেলাই এখন বাকী আছে। অদূরে অশ্ব প্রস্তুত, সুলতান সেকন্দর সাহ সিংহাসন হইতে নামিয়া অশ্বারোহণ করিলেন, আর সভাসদ ও নিমন্ত্রিতগণ তাঁহার উভয় পার্শ্বে এবং পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। দূরে সম্মুখে একটি পক্ষী হস্ত প্রস্তরময়ী রমণীমূর্ত্তি পক্ষীর মুখ চুম্বন করিতেছে সেই পক্ষীর চক্ষু বিদ্ধ করিতে হইবে। পক্ষীটি রমণীর কপোলে এমনি ভাবে স্থিত যে রমণীমূর্ত্তিকে কিছুমাত্র আঘাত না করিয়া তীর দ্বারা কেবল চক্ষুবিদ্ধ করা সুকঠিন। সমস্ত দিন যে সকল খেলা হইয়াছে তাহার মধ্যে এইটি দেখিতেই সকলে সমুৎসুক। বঙ্গেশ্বরের ইঙ্গিতে নকীব একটু অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল "এই লক্ষ্য ভেদ করিয়া যিনি সম্মানিত হইতে চাহেন সুলতান সেকন্দর সাহের অনুজ্ঞায় তিনি এইবার সম্মুখীন হউন"। নকীব উচ্চৈঃস্বরে তিন বার এই কথা বলিল। হ্রেষারব করিয়া সতেজে গ্রীবা উত্তোলন পূর্ব্বক এক তেজস্বী

সুন্দর যুবাপৃষ্ঠে একটি অশ্ব অগ্রসর হইল। সহসা প্রান্তরের ভীষণ কোলাহল নিস্তব্ধতায় পরিণত হইল, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সকলে রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক রাজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে রাজাকে তিনবার অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্তরমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন, অমনি ঘোরতর কোলাহল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি ঘিরিয়া ফেলিল, দেখিল পক্ষী-চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তীর চলিয়া গিয়াছে। আকাশ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া অমনি জয়ধ্বনি উঠিল, দিনাজপুরের রাজকুমার গনেশদেব লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন। দর্শকগণের উল্লাসধ্বনির মধ্য দিয়া সভাসদদিগের পুষ্পবৃষ্টির মধ্য দিয়া রাজকুমার পদব্রজে বঙ্গেশ্বরের সমীপে আনীত হইলেন। সুলতান সাহও অশ্ব হইতে নামিলেন। তিনি স্বহস্তে যুবকের কটিদেশে একখানি বহুমূল্য তরবারি বাঁধিয়া রায়বাহাদুর উপাধি প্রদান করিবেন। চারিদিক হইতে আবার উৎসাহের জয়ধ্বনি উঠিল, অজস্র ফুলমালা তাঁহার কণ্ঠদেশে অর্পিত হইতে লাগিল। একজন রমণী দূর হইতে রাজকুমারের লক্ষ্যভেদ দেখিতেছিল সে এই সময় কণ্ঠদেশ হইতে একগাছি শুষ্ক ফুলমালা উন্মোচন করিয়া তাহা একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডে জড়াইয়া রাজকুমারের উদ্দেশে ছুঁড়িয়া দিল, কিন্তু মালা লক্ষ্যস্থানে না পৌঁছিয়া সুলতানের গাত্রে লাগিয়া নিম্নে পতিত হইল। বঙ্গেশ্বর তরবারি বাঁধিতে বাঁধিতে স্খলিতহস্ত হইয়া বিস্ময়ে এবং বিরক্ত দৃষ্টিতে নতমুখ উন্নত করিলেন, নিকটস্থ সভাসদগণ ফুলবর্ষণে ক্ষান্ত হইয়া সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিল, সুলতান সাহের পুত্র নবাব গায়সুদ্দিন সেই শুষ্কমালাগাছি ভূমিতল হইতে লইয়া তখন হাসিয়া বলিলেন "রাজকুমার শুষ্ক ফুলের মালায় কে তোমাকে সম্ভাষণ করিল?" তখন সকলের গাম্ভীর্য্য দূর হইল, বঙ্গেশ্বর সহাস্য মুখে গনেশদেবের কটিতে আবার তরবারি বাঁধিতে লাগিলেন, আবার জয়ধ্বনি, ফুলবৃষ্টি হইতে লাগিল, এই সময় জনতার মধ্য দিয়া একজন যুবতী দৃঢ়পদক্ষেপে যুবরাজ গায়সুদ্দিনের নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল "আমার ফুলের মালা আমাকে ফিরাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক"। সকলে বিস্ময় দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যুবরাজ তাহার মালা তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। সে মালা হস্তে গণেশদেবের দিকে চাহিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল তাহার পর সুলতান সাহ এবং তাঁহার পুত্রকে অভিবাদন করিয়া যেমন দৃঢ় পদক্ষেপে আসিয়াছিল সেইরূপ নির্ভয় দৃঢ় পদক্ষেপে চলিয়া গেল। *

---

* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফুলের মালা নামক যে উপন্যাস ভারতীতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, এখানি নামে তাহার সহিত এক হইলেও রূপান্তর প্রাপ্ত নূতন গল্প।

ব্রাউনিংয়ের একটী কবিতা।

ব্রাউনিংয়ের My Last Dutchess একটী ক্ষুদ্র কবিতা। ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহা হইতেই ব্রাউনিংয়ের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অধিকাংশ কবিতারই ন্যায় ইহাও ড্র্যামাটিক অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রধান, ভাবপ্রধান নহে; ভাবগুলি ক্রিয়ার অন্তর্গত; কিন্তু তাহাতে ভাবের জোর না কমিয়া বরঞ্চ আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে। ব্রাউনিংয়ের সাধারণ কবিতার ন্যায় ইহাও নিতান্ত সহজ বোধ্য নহে; প্রথমপাঠে বেশ একটু দুর্ব্বোধ্য; ইহার কথাও ভাবের ঘনসন্নিবেশে এবং ক্রিয়াগুলির দ্রুততায় একটী কথা, একটী চরণও বাদ দিয়া পড়িবার যো নাই; তাহা হইলেই খেই হারাইয়া যাইবে; মানে বুঝিয়া উঠা ভার হইবে।

কবিতাটী আগাগোড়া চোস্ত। ইহাতে সংক্ষেপে অথচ অত্যুজ্জ্বল বর্ণে একটী মানব চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ডিউক মধ্যযুগের কালানুরাগী এবং দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইয়ুরোপীয় নবাবের আদর্শ। তাঁহাতে শিল্পোৎকর্ষিত সৌন্দর্য্যরসগ্রাহিতার সহিত যথেচ্ছাচারপরায়ণতা ও সুচিক্কন নিষ্ঠুরতার সংমিশ্রণ হইয়াছে।

তাঁহার হৃদয়হীন নিষেধবাক্যে তাঁহার ডাচেসের নবীনজীবনসুলভ আনন্দ স্তম্ভিত হইয়া, জীবন অবসিত হইল। তিনি প্রীতিময়ী, হাস্যমুখী, স্বভাবমধুর নারী, তাঁহার স্বামীর আদেশ হইল তাঁহার প্রীতি, তাঁহার মাধুর্য্য বিসর্জ্জন দিতে হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোমল প্রাণও বিসর্জ্জিত হইল।

ডিউকই গল্প বলিতেছেন। তাঁহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রস্তাব আসিয়াছে। কন্যাকর্ত্তা যে দূতমুখে সম্বন্ধ পাঠাইয়াছেন তাঁহার সহিত বিবাহের বন্দোবস্ত চলিতেছে; একবার কোন কথা প্রসঙ্গে ডিউক তাঁহাকে আপনার চিত্রশালা দেখাইতে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার প্রথম পত্নীর চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া দূতকে বলিলেন "এই আমার প্রথম ডাচেসের ছবি, ঠিক যেন জীবন্ত মূর্ত্তি! এখানি অতি অপরূপ চিত্র; ফ্রাপ্যাণ্ডল্‌ফ্‌ কেবল মাত্র একটী দিন হাত চালাইয়াছিল, আর দেখুন চিরকালের জন্য ডাচেস এই চিত্রপটে রহিয়া গেলেন। এইখানে একটু বসিয়া ছবিখানা ভাল করিয়া দেখিবেন কি?"

চিত্রার্পিতা রমণীর মধুর উজ্জ্বল হাসি, আর তাঁহার নয়নের গম্ভীর, আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে দূতের কৌতূহল উদ্রেক হইল, তিনি তাঁহার সম্বন্ধে আরো কিছু শ্রবণোন্মুখ হইয়া ডিউকের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনিই যে এই প্রথম এবিষয়ে আগ্রহ দেখাইলেন তাহা নহে; যে সে ছবি দেখিয়াছে সেই বিস্মিত হইয়া, স্পষ্ট করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া মৌনভাবে ডিউকের মুখের পানে চাহিয়াছে। এই সুযোগে, ফ্রাপ্যাণ্ডল্‌ফ্‌ এবং যে-কোন-লোক ডাচেসের সহিত সংস্পর্শে আসিত,

তাহাদের সকলের প্রতি ডিউকের পূর্ব্ববিদ্বেষের ভাব আর একবার ঝালাইয়া লইবার সুবিধা হইল; বিদ্বেষের ধর্ম্মই এই,—সে কোন সূত্রে আপনাকে প্রকাশ করিয়া আরাম পায়; এই বিষ অবসর পাইলেই নিজেকে একবার বাক্যপ্রণালীর দ্বারা উদ্গীরণ করিতে চাহে। ডিউক বলিলেন "মহাশয় আপনি মনে করিবেন না শুধু স্বামীকে দেখিয়াই তাঁর গণ্ডস্থলে ঐ দুইটী আনন্দরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। হয়ত চিত্রকর তাঁহাকে বলিয়াছিল 'যে সুন্দর গোলাপী আভা আপনার কণ্ঠে মিলাইয়া গিয়াছে, কৃত্রিম রঙে তাহা ফোটান অসম্ভব।' চিত্রকরের এই প্রশংসাবাক্যে, আনন্দে ঐ রক্তিমরাগে কপোল উজ্জ্বল হইয়াছে।"

ডাচেসের অপরাধ তিনি গর্ব্বিতা ডিউকপত্নী নহেন, নম্রতাময়ী, সহৃদয়া নারী। অল্পেতেই তিনি প্রীত হয়েন, এবং সেই প্রীতি প্রকাশও করেন। যে কেহ তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলে আনন্দে তাঁহার মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তিনি ডিউক পত্নী, সুতরাং সম্মান ও আদর তাঁহার ন্যায্য অধিকার স্বরূপে গ্রহণ করিবার জিনিষ; যাহা কিছু অপ্রত্যাশিত তাহাতেই বিস্ময়ের, আনন্দের উদ্রেক করে, কিন্তু যাহা তোমার প্রাপ্য তাহা অক্ষুব্ধচিত্তে গ্রহণ করিবে, তাহার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া নিজেকে ইতর বানাইবার আবশ্যক কি? দুর্ভাগিনী ডাচেস তাহা বুঝিতেন না, তাই তাঁহার প্রভুর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ডিউক বলিতেছেন "তাহার স্বভাব কিরূপে বর্ণনা করিব? একটুতেই তাহার আনন্দ হইত; একটুতেই তাহার মন মুগ্ধ হইত; যা' কিছু দেখিত সবই তার ভাল লাগিত।"

এমন যে তুচ্ছ জিনিষ "পশ্চিমাকাশে অস্তমান সূর্য্যের রঙিন্ কিরণ ছটা তাহাতেও তাহার নয়ন উজ্জ্বল হইত; কোন অনুগত মূর্খ যদি একটী স্বহস্ত-চ্যুত চেরিপুষ্প আনিয়া তাহাকে উপহার দিত, তাহাকেও সে মিষ্ট কথায় কৃতজ্ঞতা জানাইত। লোককে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হইবে স্বীকার করি, কেননা তাহা দস্তর. কিন্তু সে এমন ভাবে দয় আ জানাইত যেন আমার বহুমূল্য দুর্লভ উপহার, আর যে সে লোকের সামা তাহার নিকট সমান মূল্যবান।"

অপরাধটা ঐ । কি দুর্ব্বুদ্ধি! তোমার স্বামী প্রবল প্রতাপান্বিত মহা-রাজাধিরাজ ডি সহিত যে সে লোকের তুলনা? তোমার প্রভু তাঁহার সদাশয়তায় ে কটী বহুমূল্য উপহার আনিয়া তোমায় সম্মানিত করিতে-ছেন;—আর মানবঙ্গদয় তোমার জন্য একটী সামান্য উপহার লইয়া আসিয়া তা হইতেছে, তোমার নিকট এ দুই উপহারের সমান আদর? কি ভ্রান্ত স

ডাচেস প্রবাদ আছে মের্য্যাদাজ্ঞানটা আদবেই নাই। কিন্তু ডিউকের গর্ব্বের মাত্রাটা একবা করিলে এ ক তাহার আচরণে আমার প্রতি প্রতিদিন অন্যায় করিতেছে,

কিন্তু তাই বলিয়া আমি তাহাকে সে কথা বলিতে পারি না, তাহাতে আমারই মানের খর্ব্ব হইবে। আমার প্রতি অন্যের কর্ত্তব্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া, হীনতার কাজ; সে স্বেচ্ছায় যদি নিজ কর্ত্তব্য পালন করিল ত ভালই, তা না হইলে গর্ব্বিত হৃদয়ে চুপ করিয়া বেদনা সহিয়া যাও; কিম্বা তাহার প্রতিকারের অন্য কোন উপায় থাকে ত অবলম্বন কর; কিন্তু সেজন্য তাহাকে কৈফিয়ৎতলব করিয়া তাহার সহিত বোঝাপড়া করিতে যাওয়া নিজের অপমান। তাই পত্নীকে ভৎর্সনা করিয়া ডিউক আত্মসম্মানভ্রষ্ট হইতে চাহেন না। আর তিনি স্বীকার করিতেছেন যে তিনি তেমন বাক্‌পটু নহেন; ইচ্ছা করিলেও তাহাকে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে পারিতেন না "তোমার এই এই আচরণ আমার খারাপ লাগে, এইখানে তুমি একটু বেশী দূর গিয়াছিলে, এইখানটা একটু কম হইয়াছিল ইত্যাদি"; যদিবা তাঁহার কথায় ডাচেস নিজের দোষ মানিয়া লইয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলেও সেকথা উত্থাপন করাই ডিউকের পক্ষে মানহানিকর হইত। তাই তিনি স্বেচ্ছাক্রমেই কখন পত্নীকে তাঁহার দোষের জন্য ভৎর্সনা করিয়া নিজের মান খোয়ান নাই। "কিন্তু তার সে প্রীতিপ্রফুল্ল হাসি অসহ্য। আমি তার নিকটে যাইলেও সে হাসিত সত্য কিন্তু কে যাইলে সে না হাসিত?"

ডিউকের ক্ষোভের কারণই এই। ডিউক এবং ডিউকেতর মানবে যে আসমানজমিন্‌, ব্যবধান ডাচেস সেইটে রক্ষা করিয়া চলিতে জানেন না। যাহা ডিউককে দান কর, তাহা অন্যকেও বিলাইয়া তাহার মূল্য হ্রাস করিও না। যাহা অন্যকে দান কর তাহাই আবার ডিউককে নিবেদন করিয়া তাঁহার অপমান করিও না।

অন্যান্য সুখের সম্পত্তির ন্যায় ডিউকের পত্নীও ডিউকের একটী সম্পত্তি, তাহাতে তাঁহারই একমাত্র সত্বাধিকার; তিনি জানেন ডাচেসের ভিতর যে মানবী নিহিত রহিয়াছে তাহারও প্রভু তিনিই; ডাচেসের আত্মার আর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা কি? এই শোকেতাপে হিংসাদ্বেষে জর্জ্জরিত পৃথিবীতে, ঈশ্বরের একটী হাসির কিরণের ন্যায় একখানি সুন্দর প্রেমপরিপূর্ণ মানবীহৃদয় ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমুদয় বিশ্ব তাঁহার প্রীতির ভিখারী, কিন্তু আত্মন্তরী ডিউক জগতের সকল অংশীদারগণকে বঞ্চিত করিয়া একা তাহার সবটা অধিকার করিতে চাহেন। ভালবাসেন বলিয়া প্রেমের টানে কাতরে ভিক্ষা করেন না, শুধু প্রাপ্যজ্ঞানে দাবী করেন। তাঁহার প্রেম নাই, ক্ষমতা গর্ব্ব আছে। কিন্তু তিনি যে ডিউক, তিনি যে অনন্যসাধারণ, তাঁহার পত্নীর বিশ্বপ্রেমে এ আত্মগরিমা চরিতার্থ হইতে পায় না।

এইরূপে দিন যায়। একদিন ভৎর্সনা নয়, কৈফিয়ৎ তলব নয়, একেবারে হুকুম হইল—কিসের হুকুম? প্রাণদণ্ডের? কি আত্মসংরোধের? কবি ব্যাপারখানটা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন, পাঠক নিজের নিজের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করিয়া লইবেন। আমরা বুঝিয়াছি

আত্মসংরোধের আদেশ হইল; ডাচেসের আত্মপ্রকাশ নিষেধ; আনন্দ নিষেধ, প্রীতি নিষেধ, হাসি নিষেধ—"সেই পর্য্যন্ত একেবারে চিরকালের জন্য সব হাসি থামিয়া গেল, এখন সে ঐ চিত্রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ঠিক যেন জীবন্ত মূর্ত্তি।"

স্বামীর আদেশে আত্মসম্বরণচেষ্টায় ডাচেসের হৃদয় নিষ্পেষিত হইল, জীবন ফুরাইল।

কিন্তু পত্নীর মৃত্যুটা ডিউকের পক্ষে তেমন গুরুতর ব্যাপার নহে। ডাচেস চিত্রে আঁকা রহিয়াছেন; শ্রেষ্ঠ শিল্পী তাঁহাকে আঁকিয়াছে; তাঁহার রূপ এখনো ডিউকের হাতে ধরা। কিন্তু আপাততঃ যে কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে যাইতেছেন তাহার পিতা তাহাকে কত টাকা পর্য্যন্ত যৌতুক দিতে স্বীকৃত সেটা স্থির করিয়া জানা আবশ্যক। তাই তাঁহার পূর্ব্বপত্নীর কথায় ক্ষান্ত দিয়া বলিলেন "তবে এখন উঠি চলুন, নীচে লোকজন বসিয়া রহিয়াছে সেখানে যাওয়া যাউক। আপনার প্রভু কাউণ্টের মুক্তহস্ততা সর্ব্বজনবিদিত, আমি তাঁর কন্যার হস্তের সহিত একটু বেশী রকম যৌতুক দাবী করিলেও তিনি আপত্তি করিবেন না বোধ হয়।"

দূতকে তাঁহার পূর্ব্বপত্নীর গল্প বলার একটা উদ্দেশ্যও ছিল। দূতমুখে তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নী জানিয়া রাখুক্, তাঁহার ডাচেস্ হইতে চাহিলে, কতটা পদমর্য্যাদাজ্ঞান আবশ্যক, তাঁহার প্রতি কতটা অনন্যসাধারণ সম্মান আবশ্যক।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ডিউক আর একটী শিল্পবস্তুর প্রতি তাঁহার সঙ্গীর মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—"নেপট্যুনকে, একবার দেখিবেন, একটা সমুদ্রঘোটককে বশ মানাইতেছে; লোকে বলে এ জিনিষটা অতি সরেস; বিখ্যাত কারিকর ক্লস্ ইন্‌সব্রুক আমার জন্য ইহা পিতলের ছাঁচে গড়িয়াছেন।"

এ মূর্ত্তি ডিউকের গৃহে থাকিবার উপযুক্ত বটে।

তিনিও পত্নীকে বশ করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রাণ যে ধাতুতে নির্ম্মিত তাহা রূঢ় নাড়াচাড়া সহে না, তাঁহার কঠিন হাতের স্পর্শ লাগিয়া সে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। শ্রোতার হৃদয় আর্দ্র হইল; কিন্তু শিল্পানুরাগী, ক্ষমতাগর্ব্বিত, হৃদয়হীন ডিউক অবিক্ষুব্ধ।

শ্রীসরলা দেবী।

রুসিয়ার শাসন-প্রণালী।

একটী প্রবাদ আছে যে "উপন্যাস হইতেও সত্য অদ্ভুত" রুসিয়ার বর্ত্তমান ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথাটীর অর্থ বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহা ভিন্ন আরও একটী কারণে

রুসিয়ার ইতিহাস আমাদের নিকট বিশেষ কৌতূহলজনক। যদি আমরা কখন ইংরাজ শাসনচ্যুত হই তবে খুব সম্ভবতঃ রুসিয়া আমাদের শাসন করিবে। আমাদের এখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে যে এখনো অনেক শতাব্দী ধরিয়া বিদেশীয় শাসনে থাকিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত। অন্যান্য য়ুরোপীয় পরাক্রমশালী দেশ অপেক্ষা রুসিয়া আমাদের নিকটে। রুসিয়ার ভয়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট চারিদিকে যেরূপ আঁটঘাট বাঁধিতেছেন, তাহাতে বেশ বোঝা যায় যে রুসিয়ার ভারতবর্ষ অধিকার সম্ভাবনা নিতান্ত কল্পনার মধ্যে গণ্য নয়। যদি রুসিয়া কোনরূপে স্থলপথ অধিকার করিয়া তাহার অসংখ্য সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারে তবে সুদূর ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপের অল্পসংখ্যক সৈন্য এই বহুদীর্ঘ জল-পথ অতিক্রম করিয়া কি ভারতবর্ষ রাখিতে পারে? কিন্তু যদি ভারতের বিশকোটী লোক রুসিয়ার বিপক্ষে হয় তবে রুসিয়ার ভারতে প্রবেশ করিবার সাধ্য কোথায়? যদি কখন সে দিন আসে, যদি ইংরাজে রুসিয়ায় ভারতের অধিকার লইয়া যুদ্ধ বাধে, তবে কোন্ পক্ষে ভারতবাসী দাঁড়াইবে? এখন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেও অনেকে বিদ্রোহভাব মনে করিতে পারেন কিন্তু দেখিতে হইবে মানুষ যথার্থ কিসের দ্বারা চালিত?—স্বার্থের দ্বারা। আজ স্বার্থের ভয়ে কোন কথা না বলিতে পারি আবার রুসিয়ার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া স্বার্থের খাতিরে তাহাদের পক্ষে যোগ দান করিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি রুসিয়ার যথার্থ বিবরণ জানি, যদি ইংরাজ ও রুসিয়ার শাসন-প্রণালীর তুলনা করিতে পারি তবে আমাদের স্বার্থও বুঝিতে পারি। অত্যাচারহীন শাসন কোথাও থাকিতে পারে না। দরিদ্রের উপর ধনীর—দুর্ব্বলের উপর সবলের—পরাজিতের উপর জেতার অত্যাচার হইবেই। তাই বলিয়া একটা অত্যাচারে পীড়িত হইয়া কি শত উপকার আমরা বিস্মৃত হইব? বিশেষতঃ ইংরাজ শাসনের অত্যাচার জাতিগত নহে ব্যক্তিগত। ইংরাজ যদি সূক্ষ্মদর্শী হইতেন, তবে বুঝিতেন যে ঔদার্য্যে আমাদের তাঁহারা বশ করিয়াছেন—অত্যাচারে নহে। সে ঔদার্য্য কি? ইংরাজ আমাদের অজ্ঞ, অশিক্ষিত রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। শিক্ষা দিয়া মনুষ্যত্ব দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই শিক্ষার গুণেই আমরা তাঁহাদের শাসনের উৎকৃষ্টতা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। আজ কাল কন্‌গ্রেস ইত্যাদি দেখিয়া গবর্ণ-মেণ্ট শিক্ষার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তাঁহাদের বিশ্বাস যে শিক্ষা আমাদের অসন্তোষের মূল, শিক্ষিত না হইলে আমরা তাঁহাদের বিরক্ত করিতাম না, চুপচাপ থাকিতাম। কিন্তু ইহা বুঝেন না যে আমরা তাঁহাদের বিশ্বাস করি বলিয়াই বিরক্ত করি। তাঁহাদের শাস-নের উপকার বুঝি তাই তাহা আরও উৎকৃষ্ট ভাবে চাই। শিশু মাতার নিকট আবদার করে, অপরিচিতের নিকট করে না। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তাঁহাদের প্রধান সহায়। তাঁহাদের ভয়ের কারণ অজ্ঞ অশিক্ষিত লোক। যাহারা ভাল মন্দ বুঝে না, কেবল অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট ভাল কি মন্দ কি বোঝে? তাহারা দেখে, তাহা-দের লাট সাহেব সুখের, বিলাসিতার চরম উপভোগ করিতেছেন, আর তাহারা দিনান্তে

একমুঠা অন্ন পাইতেছে না, তখন তাহারা কি করিয়া বুঝিবে ইংরাজ শাসনের ভাল কি ? এই সকল লোক শিক্ষিত হইয়া আপনার বিবেচনায় স্বার্থ বুঝিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপকারিতা বুঝিতে এখনো অনেক দেরী। এক পাশাপাশি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ও রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টের প্রণালী দেখিতে পাইলে তবে তাহারা উভয়ের মধ্যে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে খ্যাতনামা লানিন্ অনেক কষ্টে রুসিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া "রুশিয়ান্ ক্যার‍্যাক্‌টারিষ্টিক্‌স্" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন আমরা তাহা হইতে রুসিয়ার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ইহা হইতে আমরা ইংরাজ শাসন-প্রণালীর উৎকৃষ্টতা আরও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব আর রুসিয়া যেন কখন আমাদের দেশে প্রবেশ লাভ না করে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিব।

রুসিয়ার শাসন-প্রণালী কিরূপ ? এক কথায় বলিতে গেলে দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় প্রজামণ্ডলীর শরীর এবং সুরাপান, অধর্ম্মাচরণ ও অজ্ঞতার দ্বারা মনকে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল করাই রুসিয়া-শাসনপ্রণালীর উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্ট যে ঠিক এই সিদ্ধান্তটি করিয়া তদনুসারে কার্য্যপ্রণালীতে উপনীত হইয়াছেন তাহা বোধ হয় না, তবে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী দ্বারা উপরোক্ত ফল হয়। দস্যু কাহারও প্রাণহানি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে হত্যা করে না বটে, তাহার দ্রব্যলুণ্ঠনার্থে হত্যা করে, কিন্তু তাহাতে হত ব্যক্তির বিশেষ কিছু সান্ত্বনা জন্মে না, তাহার পক্ষে ফল সমান। গবর্ণমেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য সম্ভ্রান্তকুলের প্রতিপত্তি বজায় রাখা, তাহার জন্য কোন কর্ম্মই অকর্ম্মের মধ্যে গণ্য নহে। শরীর ও মনের অধীনতা ও ক্লেশবশতঃ সাধারণতঃ রুসিয়ার প্রজারা নিতান্ত নির্জ্জীব। কিন্তু যদি কখন নিতান্ত অসহ্য কষ্টে একটু মাথা তুলিবার উদ্যোগ করে তবে গবর্ণমেণ্ট-ধাত্রী তখনি তাহাকে মাদক ঔষধ সেবন করাইয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন। সে ঔষধে শরীর কিম্বা মন নষ্ট হইলে কিছুই আসে যায় না। এখন দাস প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রজাদের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা মন্দ। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া এই উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রুসিয়া ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ-কবলে বদ্ধ। এমন কোন বৎসর যায় নাই যে, রুসিয়ার কোন না কোন অংশে দুর্ভিক্ষ দেখা না দিয়াছে। দুর্ভিক্ষ দুই প্রকার। এক আংশিক দুর্ভিক্ষ এক সাধারণ দুর্ভিক্ষ। আংশিক দুর্ভিক্ষ প্রতিবৎসরই হয়। সাধারণ দুর্ভিক্ষ প্রায় প্রত্যেক শতাব্দীতে ৭।৮ বার হয়। চিরক্ষুধা রুসিয়ার স্বাভাবিক অবস্থা, তাহা ভিন্ন ৯৯৬ হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত কত বড় বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে তাহা বলা যায় না। রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট নিজেকে প্রজাদের দয়ালু পিতা বলিয়া পরিচয় দেন ও প্রাণান্তে ঘরের কথা বাহিরে যাইতে দেন না, রুসিয়ার সংবাদপত্র ও লোকের মুখ বন্ধ তথাপি উনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতম দেশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ একেবারে লুকান অসম্ভব—আর লোকে হাজার নির্জ্জীব ভাবে সহ্য করুক, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের হাজার মুখ

বন্ধ করুন, সহ্য করিবারও সীমা আছে। রুসিয়ার প্রথম খৃষ্টান শাসনকর্ত্তা ভাল্‌ডিমিরের রাজত্বকালে একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তাহার পর ১০২৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ হইয়া প্রজারা বিদ্রোহী হয়। রক্তপাতের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারিত হইল। এরূপ অত্যাচার হইল যে গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের জন্য যে খাদ্য দ্রব্য রাখিয়াছিলেন, তাহাও আর প্রজারা চাহিতে সাহস করিল না। ১১২৩ ও ১১২৮ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে প্রজারা ঘোড়ার মাংস, গাছের ছাল, পাতা, কীটদংষ্ট জীর্ণ কাষ্ঠ ও খড় খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। ১১৩৭ খৃষ্টাব্দেও ঐরূপ দুর্ভিক্ষ হয়। ১১৬২, ১১৭১, ১১৭৩, ১১৮৮, ১২১২, ১২১৪ খৃষ্টাব্দে এমন দুর্ভিক্ষ হয় যে লোকদের কষ্টের বর্ণনা অসম্ভব ও তাহা অবিশ্বসনীয় মনে হয়। কুকুর বিড়াল শেয়াল ও মানুষের মৃতদেহ যাহাদের জুটিত তাহারা বিশেষ ভাগ্যবান্। ১২২৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ও তাহা তিন বৎসর কাল স্থায়ী হয়। এই সময় গাছ ঘাস ইত্যাদি ভিন্ন অনেকে মানুষ হত্যা করিয়া খাইয়াছিল। ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষের উৎপীড়নে লোকেরা আপনার সন্তান হত্যা করিয়া উদরসাৎ করে। ১৩০৮, ১৩৯৪, ১৪২২, ১৪৩৬, ১৪৪৫ ১৪৪৮, ১৪৬৮, ১৪৭৮ এইরূপে ক্রমে ক্রমে শত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্তরূপ ভয়ানক ও বীভৎস ব্যাপার হয়। (রুসিয়ার ইতিহাস—সোলোভিক্ কৃত)।

এ শতাব্দীর এখনও আট বৎসর বাকী; ইহার মধ্যে ১৮০১,১৮০৮, ১৮১১, ১৮১২, ১৮৩৩, ১৮৪০, ১৮৬০, ও ১৮৯১।৯২ এই কয়েক খৃষ্টাব্দে ৮টী দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের কথা সকলেই সংবাদ পত্রে দেখিয়াছেন কিন্তু রুসিয়ায় গিয়া না দেখিলে রুসিয়ান দুর্ভিক্ষ যে কি তাহা বুঝা যায় না। রুসিয়ার প্রজাদের সাধারণ খাদ্যই ভূষিমিশ্রিত ময়দার রুটী অমিশ্রিত ময়দার নহে। সুতরাং দুর্ভিক্ষের সময় প্রথমতঃ সরিষা, পরে গাছের ছাল, পাতা, ঘাস, খড় ইত্যাদি ভিন্ন কোন উপায় নাই। ঘোড়া গরুদের প্রথমতঃ ঘরছাওয়া খড় খাইতে দেওয়া হয়,--তাহা নিঃশেষিত হইলে তাহারা প্রাণত্যাগ করে। দুই চারি দিন তাহাদের মাংসে প্রজাদের খাদ্যের সংস্থান হয়। পুরাতন দুর্ভিক্ষের কথা ছাড়িয়া আমরা বর্ত্তমান বৎসরের দুর্ভিক্ষের দুই একটী বিবরণ দিব তাহাতে রুসিয়ার প্রজাগুলীর অবস্থা কতক বোঝা যাইবে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখিতে পাইলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রথম কাজ কি? তাহা নিবারণের উপায় অবলম্বন করা। তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণকে হুকুম পাঠাইলেন যে দুর্ভিক্ষের কোন কথা আলোচনা করা না হয়। ১৮৯২এর অতিরিক্ত শীতের পর ভয়ানক গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। আকাশে জলের চিহ্নমাত্র নাই। সূর্য্যের প্রখর তেজে জলের অভাবে ঘাস ও লতা মৃতপ্রায় হইল। প্রজারা অনেক যাগ যজ্ঞ করিলে কোন ফল হইল না। ময়দা ও আলুর দাম ভয়ানক চড়িয়া উঠিল। যে টাকায় এক মাসের আহার চলিত, এক সপ্তাহের আহারে তাহা ফুরাইয়া গেল। শস্য হয় নাই তথাপি গবর্ণমেণ্ট খাজনা ছাড়িবেন না। ব্যবসায়ী লোকেও

অনেক চাকর ছাড়াইয়া দিলেন। কৃষকেরা ঘটি বাটি কাপড় অবধি বিক্রয় করিয়াও পরিবারের আহার সংস্থান করিতে পারিল না। এই সময় আবার পশুদের মধ্যে একপ্রকার রোগ দেখা দিল। গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেন যে রোগাক্ত পশুদের নষ্ট করা হইবে এবং পশু রোগাক্ত কি না তাহা পরীক্ষার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু যাহারা পরীক্ষা করিতে আসিল তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ, রোগের কিছুই জানে না। রোগাক্ত ও নীরোগ সব পশুই বধ করিল। এই গো অশ্বদের উপর কৃষকদের দুঃসময়ে তবু কিছু নির্ভর; অল্পদামে বিক্রয় করিতে পারে, নয়ত আহারও চলিতে পারে; নির্জ্জীব কৃষকদের মধ্যেও দুই এক জন এই অত্যাচারে আস্তে আস্তে দুই এক কথায় আপত্তি করিল। গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। যাহারা আপত্তি করিয়াছিল, তাহাদের এক জনকে গুলি করিয়া মারা হইল। বিপদের উপর বিপদ, দলে দলে পঙ্গপাল পড়িয়া কৃষকদের একমাত্র খাদ্য গম ও ঘাস আচ্ছন্ন করিল, তাহার উপর অগ্নিদেব দেখা দিলেন। শত শত গ্রাম অগ্নিতে উৎসন্ন হইল, গৃহহীন খাদ্যহীন প্রজাদের মৃত্যু ভিন্ন উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত, তথাপি প্রাপ্য রাজকর এক কপর্দ্দকও ছাড়িলেন না। তাহারা খাজনা দিবে কোথা হইতে? একটী গ্রামের করসংগ্রহক দলকে দল প্রজাদের বেত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। তাহার পর তাহাদের জেলে পাঠাইলেন। ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহককে কি দণ্ড করিলেন? তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া জেলে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি অতিরিক্ত উৎপীড়ন করিয়াছিলেন বলিয়া নহে। প্রজাদের আরও বেশী বেত্রাঘাত করেন নাই, মূর্চ্ছিত হইবার আগে কেবল ক্ষতবিক্ষত করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, প্রজাদের উপযুক্ত শাস্তি দেন নাই এই অপরাধে তাঁহার দণ্ড। এ বেশী দিনের ঘটনা নহে ১৮৯১ এর জুন মাসের ঘটনা। যাঁহারা ইচ্ছা করেন খোঁজ করিয়া প্রমাণ আনাইতে পারেন; লোকেরা কাদা, ছিন্নবস্ত্রখণ্ড, কাগজ, কাঠ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইল তাহাই খাইতে লাগিল। অবশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। মাতা প্রথমে সন্তানদের বধ করিয়া পরে নিজে আত্মহত্যা করিতে লাগিল। পিতা কোনরূপে অন্ন খাবারের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া দিল। স্ত্রী স্বামী ছাড়িয়া অন্যের উপপত্নী হইয়া স্বামী ও সন্তানকে খাবার আনিয়া দিতে লাগিল। রাস্তায় ঘাটে অসংখ্য স্ত্রীলোক ও শিশুর মৃত দেহ। একজন স্ত্রীলোক ভিক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে দুই মুঠা আহার আনিয়া দেখিল তাহার সন্তানেরা মরিয়া রহিয়াছে। অথচ এখনও গবর্ণমেণ্ট বাহিরে স্বীকার করিলেন না যে দেশে এত দুর্ভিক্ষ! জার্ম্মানেরা সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু দুর্ভিক্ষ ক্রমশই বেশী দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়া উঠিতে লাগিল। তখন গবর্ণমেণ্ট আর সাহায্য অস্বীকার করিতে সাহস করিলেন না। এখানে দুর্ভিক্ষের কথা আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই কারণ দুর্ভিক্ষের বর্ণনা করা আমার

উদ্দেশ্য নহে, রুশিয়ার শাসন-প্রণালী বিবৃত করাই উদ্দেশ্য। কিন্তু রুশিয়ার দুর্ভিক্ষ চিরস্থায়ী সুতরাং তাহার কথা কিছু না বলিলে প্রজাদের অবস্থা বোঝান সহজ নহে। এবং গবর্ণমেণ্ট কিরূপে প্রজাদের নিকট এক কপর্দ্দক খাজনাও ছাড়েন না এবং খাজনা না দিতে পারিলে কিরূপ দণ্ড দেন তাহা না বুঝিলে শাসন-প্রণালী বোঝাও অসম্ভব। গবর্ণমেণ্টই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। পুনরায় সুসময় আসিলে তাহারা গবর্ণমেণ্টের ধার শোধ করিতেই সব বিসর্জ্জন দেয় সুতরাং কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। এইরূপে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি হয়। আর এই রক্ত শোষণ-কারী অর্থে গবর্ণমেণ্ট পৃথিবী বিজয় আশায় অগণ্য সৈন্য পোষণ করেন। এই ত খাজনার অত্যাচার,—অন্যান্য বিভাগেও ঠিক এইরূপ অত্যাচার। ন্যায় বিচার কাহাকে বলে তাহা রুশিয়ানেরা জানে না। একটী উদাহরণ দেওয়া যাক ;—একজন লোক এক গাড়ী ঘাস চুরি করিয়া পালায়, তাহার ছোট ভাই তাহাকে সহরে খুঁজিতে আসে। গ্রামের শাসনকর্ত্তা তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর ভাই কোথায় ?" "আমি জানিনে আমি নিজেই খুঁজ্‌ছি।" "মার মার বেত মার—যন্ত্রণা দে" তিনদিন উপরি উপরি কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া তাহাকে বেত্রাঘাত ও যন্ত্রণা দেওয়া হইল। চতুর্থ দিনে সে মরিয়া গেল। এই অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা এখন অনেক টাকা পেনসনে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আরামে দিন কাটাইতেছেন। আর প্রজাদের কখনও এক কড়ি খাজনা ছাড়েন না। একজন গর্ভবতী রমণী আদালতে প্রার্থনা করে যে তাহার ভাবী সন্তানের পিতাকে সন্তানের ভরণপোষণার্থে কিছু অর্থ দান করিতে বলেন—আদালত এই অন্যায় প্রার্থনা শুনিয়া অন্তঃসত্ত্বা রমণীকে বিলক্ষণ বেত্রাঘাত করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের এইরূপভাবে চালাইতে চাহেন যে পশুর ন্যায় তাহাদের যাহা বলিবেন তাহাই করিবে এবং নিজেদের কোন মতামত থাকিবে না। একজন জেনারেল একজন রুশিয়ান সৈন্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সৈন্যের কর্ত্তব্য কি ? সে বলিল "তাহার উচ্চ কর্ম্মচারীর হুকুম শোনা, জারের বিরুদ্ধে ভিন্ন আর যাহা বলিবেন তাই করা"। "আচ্ছা বেশ—টুপী খোলো, তোমার সহচরদের নিকট বিদায় নাও তার পর এই পুকুরে গিয়ে ডুবে মর—দেখো যেন চট্‌পট্ হয়।" অশ্রুজলে সৈনিকের চক্ষু পূর্ণ হইল—একবার কাতর নয়নে জেনারলের দিকে চাহিয়া তাঁহার আজ্ঞামত কাজ করিল। প্রায় ডুবিয়া যায় যায় এমন সময় জেনারেলের আজ্ঞায় অন্য সৈনিকেরা গিয়া তাহাকে উঠাইল। এই সৈনিকের ন্যায় রুশিয়ার প্রত্যেক লোক গবর্ণমেণ্টের আদেশে শরীর ও আত্মা নষ্ট করিতে শিক্ষা পায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজকোষে প্রজারা অর্থ প্রদান করে ততক্ষণ রাজা প্রজার প্রতি কোন রূপ দৃষ্টিপাত করেন না—অর্থ যোগাইতে না পারিলে দয়ালু পিতা বেত্রাঘাতের প্রতি মনোনিবেশ করেন—একবারে দৃষ্টিপাত করেন না যে তাহাও নয়। তাহার অবনতির প্রতি দৃষ্টি আছে। মদের দ্বারা তাহাদের ধ্বংশ করিতে গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত, তাহাতে কিনা রাজকোষে অর্থ আসে। গ্রামে গ্রামে মদের দোকান আছে—বিক্রেতারা ক্রুশ ছুঁইয়া শপথ করে যে তাহারা

ঠিক পরিমাণ বিক্রয় করিবে আর সাধ্যমত বেশী বিক্রয় করিতে চেষ্টা করিবে। এবং তাহারা সাধ্যমত করেও—প্রজাদের মিষ্ট কথায় যদি না পারে তবে মারিয়া এমন কি দুই চারিজনকে খুন করিয়া পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদিগকে মদ অভ্যাস করায়। এই জঘন্য প্রথা রুশিয়ায় সার্ব্বভৌমিক। পুরোহিত, বিখ্যাত শিল্পী এবং বড় হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত মাতাল। পুরোহিত বেদী হইতে পড়িয়া যান—বক্তার কথা বাধিয়া যায়—জজ ঢুলিয়া পড়েন—প্রফেসর ঘুমাইয়া পড়েন। এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রসম্পাদক মাঝে মাঝে আপনার বিপদ তুচ্ছ করিয়াও কাঁদুনী গাহিয়া থাকেন। মদ্যপানের আনুষঙ্গিক অন্যান্য পাপও যে প্রশ্রয় পায় তাহা বলিবার আর আবশ্যক নাই। লোকেরা ক্রমে বুদ্ধিহীন ও নির্জ্জীব হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট বাঁচেন। রুশিয়ায় যদি কেহ মদ না খায় কিম্বা মদ্যনিবারিণী সভায় যোগ দেয় তবে গবর্ণমেণ্টের চক্ষে সে বিদ্রোহী ও তাহার তদনুরূপ শাস্তি হয়। একবার একজন লোক জোর করিয়া তাহার গ্রামের মদের দোকান উঠাইয়া দেয়। গবর্ণমেণ্ট একদল সৈন্যের সঙ্গে পুনরায় দোকানদারকে পাঠাইয়া দেন, তাহারা জোর করিয়া শুধু দোকান বসাইয়া ক্ষান্ত হইল না, জোর করিয়া সকলকে মদ খাওয়াইল।

গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি কিরূপ লক্ষ্য করেন তাহা দেখা গেল, এখন দেখা যাক্ মানসিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য কিরূপ? শিক্ষা উন্নতির প্রধান সহায়। কিন্তু পিতামাতার নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। পিতা যদি সন্তানকে লেখাপড়া শিখাইতে চাহেন তবে তাঁহার অর্থ-সঙ্গতি থাকিলেই যথেষ্ট নহে। পিতার প্রথমে আবেদন করিতে হইবে, তাহাতে পিতামাতা হইতে পরিবারস্থ সমুদয় ব্যক্তির নাম ধাম বয়স আর সে বাটীতে কয়টা ঘর আছে, ক'জন চাকর আছে ইত্যাদি লিখিত হইবে। পিতা যদি নিজে না লেখাপড়া জানেন তাহা হইলে ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পুত্রকে কখনই লেখাপড়া শিখিতে অনুমতি দিবেন না। যদি পিতা শিক্ষিত হয়েন ও অন্যান্য অবস্থা অনুকূল হয় তাহা হইলে পুত্রকে শিক্ষার উপযোগী নির্দ্ধার্য্য করিলেই যে কার্য্যসম্পন্ন হইল তাহা নহে, গবর্ণমেণ্ট স্কুলে যদি স্থান না থাকে তবে এ সমুদয়ই ব্যর্থ। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ৪০০ শত বালক গবর্ণমেণ্টের এই উপযোগিতার দুরূহ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াও বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিল না, কারণ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে স্থান নাই। নূতন স্কুল গবর্ণমেণ্ট প্রাণান্তে খুলিবেন না। বাটীতে কাহারো কাহাকেও বিদ্যাশিক্ষা বা ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিয়ম নাই। মাতা বা পিতা নিজ সন্তানকে ব্যতীত যদি অপর কেহ কাহাকেও অক্ষর শিক্ষা দেন তবে নির্ব্বাসিত হইবেন। একজন কাউণ্ট ও কর্ণেল তাঁহাদের ভৃত্যদের বাইবেল পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন সেই অপরাধে তাঁহারা নির্ব্বাসিত। মহা অপরাধী রাজদ্রোহীর যে দণ্ড আর যিনি ভৃত্যদের ঈশ্বরের নাম শুনান তাঁহারও সেই দণ্ড। রুসিয়ার লেখকদের জীবন পুরাকালের ধর্ম্মবীরগণের জীবনের সহিত তুলনা করা যায়।

তাঁহাদের ন্যায় ইঁহারাও কঠোর যন্ত্রণাপীড়নে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন। সুখের বিষয় এই যে অত্যাচার সত্বেও এক এক জন মহাত্মা এই ব্রত গ্রহণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা যুগযুগান্তরব্যাপী শাসন-প্রণালীর মস্তকে আঘাত করিয়া নিজ বিপদ তুচ্ছ করিয়া রাজ্যের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার হস্তে যে লক্ষ লক্ষ জীবের সুখ দুঃখ অর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের যথার্থ পিতার কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা চেষ্টামাত্রই সার হইল। তাঁহার রাজ্যাধিরোহণের অল্পকাল পরেই তিনি নিহত হইলেন। রুসিয়ার ইতিহাস দেখিলে মনে হয় যেন ঈশ্বর সত্যই এ অভাগা দেশকে অভিশাপ দিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব কালে অনেকগুলি স্কুল স্থাপিত হয় এবং শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। বর্ত্তমান সম্রাট তাঁহার পিতার প্রণোদিত করুন ও মহৎ শাসন-প্রণালী, বন্ধ করিয়া আবার পুরাতন নির্ম্মম কঠোর প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আপাততঃ যে সকল স্কুল আছে তাহাতে কেবল সম্ভ্রান্ত শ্রেণীস্থ সন্তানেরা স্থান পায়। শিক্ষা যাহা পায় তাহা না পাইলেই ভাল হইত—সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিব। গবর্ণমেণ্টের মতে অজ্ঞ অশিক্ষিত প্রজা রাজভক্ত। শিক্ষিত প্রজা রাজদ্রোহী। ইয়ুফা নগরে একজন দরিদ্র বালক অসাধারণ কষ্ট ও যত্নে কাজ কর্ম্ম ও লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং তাহার কার্য্যে তাহার উপরের কর্ম্মচারীগণ সকলেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এই সময় উপরের কর্ত্তা বদল হইয়া আর একজন আসিলেন। আসিয়াই তিনি সেমিনসকে অভ্যর্থনা করিলেন, "এই বদমাইস কি করছিস?" সেমিনস নম্রতাসহকারে বলিল, "মহাশয় ক্ষমা করুন।" "ক্ষমা করুন মানে কি? বেটা আমায় গালগাল দিস্, যা ওকে কয়েদে নিয়ে যা বেটার শিক্ষা হউক, তিন দিন জেল।" পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী আস্তে আস্তে বলিলেন "ও বেশ ভাল লোক লেখা পড়া ও জানে।" বর্ত্তমান গবর্ণর বলিলেন "লেখা পড়া জানে? তিন হপ্তা জেলে দাও। লেখা পড়া জানা লোককে বিলক্ষণ শাস্তি দেওয়া দরকার। ওকে কি রকম ক'রে জব্দ কর্ত্তে হয় দেখাচ্ছি।' সেমিনস কর্ম্মচ্যুত হইয়া একটি নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত হইল, ও প্রতিদিন দুই তিন বার তাহাকে বিলক্ষণ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হইত; এইরূপ ব্যবহারে সে উন্মত্তবৎ হইয়া পলায়ন করিল কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধৃত ও পূর্ব্বোক্ত রূপে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। সে পুনর্ব্বার পলায়ন করিয়া ধৃত হইলে আবার পূর্ব্ববৎ ব্যবহারে যথার্থ উন্মত্ত হইল। কিন্তু হায় শিক্ষাবিরোধী গবর্ণরের তাহাতেও তৃপ্তি হইল না, হতভাগাকে বেত্রাঘাতে নিয়মিত জর্জ্জরিত করা হইত। অন্য দেশে লেখাপড়া শিখিয়া হীনাবস্থা হইত নিজেকে উন্নত করিতে পারিলে সে লোকের মাননীয় হয়, আর রুসিয়ায় এই দশা। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের অন্নকষ্টে, অত্যাচারে পীড়িত, মদ্যাসক্ত, অশিক্ষিত করিয়াও ক্ষান্ত নহেন! তাহাদের একেবারে মনুষ্যত্বহীন করাই উদ্দেশ্য। তাহাদের স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিবার অধিকার নাই! প্রথমতঃ তাহারা ইচ্ছামত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে পারে না।

তাহারা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউক বৎসরে একবার অন্তত: রাজধর্ম্মের বিধানানুসারে তাহাদের পাপ স্বীকার করিয়া মুক্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য। সর্ব্বোচ্চ স্বাধীনতা হইতে সর্ব্বনিম্ন স্বাধীনতা পর্য্যন্ত তাহারা বঞ্চিত। তুমি যদি ঘরে পড়িতে চাও ত পুলিসের হুকুম চাই। কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিতে চাও তবে নিমন্ত্রিতের নাম ধাম জ্ঞাপন করিয়া পুলিসের অনুমতি চাই। রঙ্গালয়ে যাইতে চাও কি বাটীর বাহিরে কোন স্থানে একদিনের জন্যও যাইতে চাও ত হুকুম চাই। রুসিয়ার পুস্তকে যে দুই একটী ঔষধ লিখিত আছে তাহা ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ চাও ত আবেদন করিয়া হুকুম লইতে হইবে। হুকুম পাশ হইতে ছয়মাস কি একবৎসর ততক্ষণে রোগীর মৃত্যুই সম্ভব। একজন তাঁহার পীড়িত কন্যার জন্য পোট্যাসিয়াম্ আনাইবার জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আবেদন নিবেদন করিয়াও সক্ষম হইলেন না।

বৎসর বৎসর প্রত্যেক লোকের পাশপোর্ট লইতে হয়। এই পাশপোর্ট সব সময় সঙ্গে রাখা আবশ্যক। কিন্তু চাহিলেই যে পাশর্পোট পাওয়া যায় তাহা নহে। কোন ব্যক্তি সন্দেহ জনক বলিয়া যে তাহাকে পাশপোর্ট দিতে বিলম্ব হয় তাহা নহে। রাশি রাশি কাগজ পাশ করিতে হয় বলিয়াই বিলম্ব। ইতিমধ্যে পুরাণ পাশের সময় ফুরাইয়া যায় এবং পুলিস তাহাকে চালান দেয়। আবার আবেদন করিয়া খালাস পাইবে বটে কিন্তু সে অনেক বিলম্বের কথা, ততদিন যে কি কষ্ট পায় তাহা বলা যায় না। কেবল সেণ্টপিটর্সবর্গ সহরে এক বৎসরের মধ্যে ১৪৭৯৯ জন লোক এই পাশপোর্টের জন্য আবদ্ধ হয়। তুমি নিজে যাহা কর, পরে তোমার প্রতি যাহা করে এবং ঈশ্বর যে দৈব ঘটনা দেন সকলই পুলিসের আলোচ্য। পুলিস তোমার বাড়ী আসিয়া আলমারি বাক্স দেখিবে, চাকরদের ও তোমাদের প্রশ্ন করিবে, তোমার কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এমন কি কটার সময় শুইতে যাইবে তাহাও বলিয়া দিবে। একদিন নৌকা উল্টাইয়া তিনটী মেয়ে জলে পড়ে—কোন রকমে তাহাদের উঠান হইল কিন্তু তাহারা বাড়ী যাইতে পারিল না, সেই ভিজা কাপড়ে পুলিসের সঙ্গে গিয়া সেই ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ বলিতে হইল। পুলিস তাহা কাগজে লিখিয়া বালিকাদের পড়িয়া শুনাইল তখন তাহারা কাগজে নাম লিখিয়া বাড়ী আসিল। একজন তাহার পর ছয় সপ্তাহ জ্বরে ভুগিল। এইরূপ শিক্ষায় লোকেরা ক্রমে ক্রমে বাস্তবিকই এমন অসহায় হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা আর চিন্তা করিতেও পারে না। গবর্ণমেণ্ট যদি বলে যে তোমাদের মাথা নাই তবে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্রে বাহির হয় যে শীঘ্রই খুব ঝড় হইবে। দলে দলে লোক পুলিস আফিসে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই বিষয়ে রাজার হুকুম আসিয়াছে কি না? কবে ঝড় হইবে? কখন হইবে? যখন শুনিল রাজার কোন হুকুম আসে নাই তখন নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল স্থির জানিল যে ঝড় আসিবে না। রাজাই তাহাদের দেবতা। তাই বলিয়াছিলাম সত্য হইতেও উপন্যাস অদ্ভুত। রাজা শিক্ষা ও সভ্যতার চরম

সীমায় উপবিষ্ট আর এই তাঁহার রাজ্য। এই লক্ষ লক্ষ লোক পশুর অধম, আর তাহাদের চারিপাশে, তাহাদের রাজ্যে সভ্যতার চূড়ান্ত চিহ্ন। এই রাজদেবতার পদানুসারী উপদেবতাগণ কিরূপ, এই শিক্ষা, এই ব্যবহারে প্রজাদের অবস্থা কি—তাহারা কি ভাবে চালিত হয় তাহা পরে দেখাইব।

সতী সুভদ্রা।

একদা রাজা অশোক উপগুপ্ত নামক ভিক্ষুককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, আমি আপনার নিকট একটি সুভাষিত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি নিজগুরুর নিকট উহা যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন আমাকে ঠিক সেইরূপে বলুন"। ভূপতি অশোক উপগুপ্তকে এই কথা বলিলে ভগবানের অংশভূত উপগুপ্ত বলিলেন, "মহারাজ আমি গুরুর নিকট যেরূপ শুনিয়াছি ঠিক সেইরূপে একটি সুভাষিত কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি উহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।"

পুরাকালে যখন ভগবান্ শাক্যমুনি জগতের হিতবিধানার্থ ধর্ম্মপ্রচার করিতে করিতে উপাসিকা ও উপাসকগণের সহিত রাজগৃহ-নগরী-স্থিত বেণুবনাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় উপবেশনপূর্ব্বক দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণকে যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ এরূপ সদ্ধর্ম্মরূপ অমৃত দান করিয়া প্রীত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে শ্রাবস্তী নগরে শুভগ নামক একজন প্রভূত ধনসম্পন্ন বণিক্ বাস করিতেন। ঐ বণিক্ কুলস্থিতির জন্য সুভদ্রা নাম্নী সজাতীয়া কোন মহিলাকে কুলধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রণয়িযুগল স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করিলেন। পরে বণিকের ভোগাভিলাষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি বিষয় কার্য্য নিতান্ত উপেক্ষা করিতে লাগিলেন, অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। সুতরাং গ্রীষ্মকালের হ্রদের ন্যায় তাঁহার সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লগিল।

তখন সুভদ্রা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমার স্বামী ভোগে আসক্ত হইয়া একান্ত উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার অনবরত অর্থব্যয় হইতেছে উপার্জনের তো কিছু মাত্র চেষ্টা নাই। এরূপ ভাবে থাকিলে কতদিন আর সম্পত্তি থাকিবে, শীঘ্র ক্ষীণ হইয়া আসিবে। সুতরাং আমার স্বামীর আর সুখে কালযাপন করা ঘটিয়া উঠিবে না, বৃদ্ধকালে তাঁহাকে দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তখন আর তাঁহার সুখে গৃহে থাকা ঘটিয়া উঠিবে না। ধনবিহীন পুরুষ কখন সুখী

হইতে পারেন না; কারণ যাঁহার ধন নাই তিনি নিজে খাদ্য দ্রব্যাদি পান না, অন্যকে দান করা তো দূরের কথা। আর দান করিতে না পারিলে সংসারেইবা সুখ কি? দানের দ্বারাই লোকে যশ,ধর্ম্ম এবং সুখ লাভ করিয়া থাকে, দানের দ্বারায় চিত্ত শুদ্ধি হয়। শুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তি বিমল জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হয়। জ্ঞানের দ্বারা শীল লাভ করিতে পারা যায়, শীলবান্ ব্যক্তি শুভকর্ম্মা হন এবং সদ্ধর্ম্ম লাভ করিয়া অন্তে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হন। অতএব যাহাতে আমার একমাত্র অবলম্বনভূত স্বামী সদ্ধর্ম্ম ও সুখ প্রাপ্তির জন্য ধনার্জ্জনে উদ্যোগী হন তাহা আমার করা উচিত। কারণ জগতে ধনবান্ ব্যক্তিই সর্ব্বার্থ-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ধনই ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের মূল।

তাঁহারা আরো বলেন যে যাহাতে ভর্ত্তা ত্রিবর্গ সাধন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে যথা-সাধ্য চেষ্টা করাই সতী ভার্য্যার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব আমি ভর্ত্তাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সাধনের জন্য প্রোৎসাহিত করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া সুভদ্রা স্বামীকে আদর পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ সাধনের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, স্বামিন্, আপনি আমার ভর্ত্তা, আপনি আমার নাথ, আপনি আমার দেবতা। অতএব আপনার ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্য কয়েকটি কথা বলিব। ভরসা করি অবধান পূর্ব্বক আপনি তাহা শ্রবণ করিবেন, কোন মতে অন্যথা করিবেন না।

আপনি একজন ধনাঢ্য সার্থবাহ বণিক; সর্ব্বদা ভোগে আসক্ত থাকা আপনার শোভা পায় না। অতএব প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া যশ ধর্ম্ম ও সুখ প্রাপ্তির জন্য সত্য ধর্ম্মানুসারে ধনার্জ্জন করুন।

ধনের দ্বারা ভোগ্য বস্তু লাভ করা যায়, ভোগ্য বস্তু দ্বারা শরীর রক্ষা হয়,শরীরের দ্বারা ধর্ম্ম সাধন হয়, ধর্ম্মের দ্বারা সুখ লাভ হয়। যে গৃহে গৃহস্বামী অর্থোপার্জন বিষয়ে নিরুৎসাহ, তথাকার সমস্ত লোকই উৎসাহহীন; আর যে গৃহে স্বামী অর্থোপার্জনে সর্ব্বদা সচেষ্ট, তথাকার পরিবারবর্গ অর্থোপার্জ্জনে নিতান্ত চেষ্টিত। অর্থাভাবে যে গৃহে দানাদি উৎসব হয় না, সে গৃহ গৃহই নহে,—তাহা নির্জ্জন অরণ্য বা শ্মশানভূমি। যে গৃহে নিত্য দান-মহোৎসব চলিতেছে, সে গৃহ অতি রমণীয় দেবমন্দির তুল্য, এবং স্বর্গের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। যে গৃহস্থ দানে নিরুৎসাহ, কেবল নিজের উপভোগের জন্যই চেষ্টিত, তাহাকে পশু ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। যাঁহারা যশ ধর্ম্ম ও সুখ বিশিষ্ট হইয়া দানোৎসাহে নিরত থাকিয়া সুখী হন, সেই বীর পুরুষগণই ধন্য। যাঁহারা দান করিয়া থাকেন ও নিজে সুখভোগ করিয়া থাকেন, এই সংসারে তাঁহাদের জীবনই শ্রেষ্ঠ। দানের দ্বারাই যশ ধর্ম্ম ও সুখলাভ করা যায়; অন্যথা ঘটিয়া উঠে না। কারণ যে ধন দান করা যায় না, তাহা নিরর্থক। ভোগ-সুখে উন্মত্ত থাকিয়া লোক কত কাল

জীবিত থাকিতে পারে? অবশ্যই তাহাকে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মৃত্যুর পর ধর্ম্মাধিপ যম তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ণয় করিয়া তদনুসারে ফলভোগের জন্য প্রেরণ করিয়া থাকেন। যে সকল লোক দুষ্ট ও পাপী, তাহাদের অনেক দুর্গতি বিধান করেন, যাঁহারা পুণ্যাত্মা ও ভদ্র, তাঁহাদের সদ্‌গতি প্রদান করিয়া থাকেন। জন্তুগণ ইহলোকে ও পরলোকে কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

নাথ, পাপের দ্বারা দুর্গতি হয় ও পুণ্যের দ্বারা সদ্‌গতি হয় জানিয়া যশ, ধর্ম্ম ও সুখ প্রাপ্তির জন্য কুলবৃত্তি অনুসারে ধনার্জ্জন করুন। ধনার্জ্জনের দ্বারা দান-মহোৎসব করিয়া আমরা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারিব এবং সুখে জন সমূহকে পালন করিতে পারিব। এরূপ করিলে আমাদের সর্ব্বদা মঙ্গল হইবে ও মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।

বণিক ভার্য্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। প্রিয়ে সুভদ্রে, তুমি যাহা বলিলে আমি তাহাই করিব, কিন্তু তুমি আমার একান্ত বল্লভা, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থের জন্য কি প্রকারে বিদেশে গমন করি। আমি একজন সম্ভ্রান্ত বণিক, আমার নীচ ব্যবসায় করাও যুক্তিযুক্ত নয়, সুতরাং তোমাকে ছাড়িয়া রত্নার্জ্জনের জন্য আমাকে রত্নাকরে যাইতেই হইবে। তুমি আমার ধর্ম্মানুচারিণী সতী ভার্য্যা। তুমি গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখে বাস কর, যে পর্য্যন্ত আমি না ফিরিয়া আসি সেই পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিও। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, আমাকে স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইও না।

সুভদ্রা স্বামীর এই কথা শুনিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং গলদশ্রু নয়নে বলিলেন হে নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন, আপনি গৃহে না থাকিলে গৃহ আমার বনস্বরূপ হইবে, আমি তথায় কি প্রকারে বাস করিব। আপনার বিরহে আমার কোনও বস্তু দর্শনে বা শ্রবণে প্রবৃত্তি হইবে না, গন্ধ দ্রব্য বা তৈলানুলেপন, স্পর্শন, ভোজন, পান, সুবস্ত্র পরিধান অথবা নিদ্রাভোগ কিছুতেই আমার অভিলাষ হইবে না। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়া অনবরত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিব এবং বিরহানলে সন্তপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইব। আমি মরিলে আপনার গৃহে কে আর ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিবে? আমার মৃত্যু সংবাদ আপনাকে একান্ত ব্যাকুল করিয়া ফেলিবে। তখন আপনি সমুদ্র হইতে রত্ন আনিয়া কি করিবেন। আমাদের পুত্র নাই, যথাসর্ব্বস্ব রাজা আত্মসাৎ করিবেন। অতএব আমাকে কষ্ট দিয়া বিদেশে গমন করিবেন না, গৃহে থাকিয়া আমার সহিত সুখভোগ করুন ও ধনার্জ্জনের চেষ্টা করুন। এখানেও অনেক মহাজন বণিক আছেন। তাঁহাদের সহিত পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া ধনোপার্জ্জন করুন। আমরা আর কত কাল বাঁচিব। আমাদের ত সন্তান নাই, আমরা অনেক রত্ন লইয়া কি করিব। আপনি সমুদ্রযাত্রা করিবেন না। আপনি গৃহে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন পূর্ব্বক সুখভোগ করুন এবং সৎপাত্রে দান করুন। হে নাথ! আপনার বিদেশে

যাইবার আবশ্যক নাই, সমুদ্রে যাইয়া আপনি কি লাভ করিবেন। পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি থাকিলে প্রাণিগণ গৃহে বসিয়াই ধনলাভ করেন। কি মহৎ লোক, কি ক্ষুদ্র লোক সকলেই যে কোন স্থানে থাকিয়া স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। যাঁহারা সদ্‌গুণের আশ্রয়, যাঁহারা সুজন, এইরূপ ব্যক্তিগণও ক্ষণকাল মধ্যে নির্ধন হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। যাঁহারা নীচ, দুর্জ্জন, এবং নির্ধন, নির্গুণ এরূপ ব্যক্তিগণও পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলে জগতে সম্মানিত হইয়া থাকেন এবং সাধুগণ তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন। আর দেখুন, যে সকল ধীরস্বভাব সার্থবাহ বণিক রত্নাভিলাষে সমুদ্রগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যকই নিরাপদে রত্নের সহিত ফিরিয়া আসেন। অনেকেরই সমুদ্রে নৌকাভগ্ন হইয়া যায় এবং তাঁহারা ধনের সহিত সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কেহ কেহ বীর্য্যবলে জলমধ্য হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া প্রাণরক্ষা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত ধনই সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া থাকে এবং তাঁহারা রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরিয়া আসেন। অতএব দেখুন, এইরূপ সমস্ত প্রাণিগণ স্বকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিয়া এই সংসারে ভ্রমণ করেন। অতএব সম্পদ ও বিপদের কর্ম্ম-প্রমাণত্ব জানিয়া আমাকে কষ্টদান করিবেন না। ধর্ম্মকার্য্য করিয়া গৃহে সুখে বাস করুন। এরূপ করিলে সর্ব্বত্রই আমাদের মঙ্গল হইবে, এরূপ করিলে যাবজ্জীবন সুখভোগ করিয়া অন্তে সদ্গতি লাভ করিতে পারিব।

বণিক ভার্য্যার এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! তুমি যে বলিলে স্বকর্ম্মপ্রমাণতাই সম্পদ এবং বিপদের কারণ, একথা সত্য। এই কথানুসারেই আমি সমুদ্রগমনে অভিলাষী হইয়াছি, আর তুমি যে বলিলে যাহা অভাবী তাহা কখনই হইবে না, আর যাহা ভাবী তাহার কখনও অন্যথা হইবে না, এ কথাটীও সত্য, এই জন্যই আমি সমুদ্রগমনে ইচ্ছা করিতেছি। যদি আমার ভাগ্যে থাকে তবে সমুদ্র গমন আমার পক্ষে মঙ্গলময় হইবে, আমি প্রভূত রত্নলাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিব, আর যদি ইহা আমার ভাগ্যে না থাকে তাহা হইলে তথায় আমার বিপদ ঘটিবে। কিন্তু সমুদ্র ত একটী মহৎ তীর্থ, আমি তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া মরিলে স্বর্গে গমন করিব। আর দেখ, প্রধান প্রধান বীরগণ যেরূপ ধন ধর্ম্ম ও সুখলাভের জন্য শত্রুজয়াভিলাষী হইয়া মহোৎসাহে রণভূমিতে প্রবেশ করেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যশ ও ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া যুদ্ধভূমিতে সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ করেন ও তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করেন, আমিও সেইরূপ একজন সার্থবাহ বণিকপুত্র, আমি রত্নাকরে গমন করিব; আমার অদৃষ্টে থাকে রত্নের সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিব, নচেৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নির্ম্মল স্বর্গসুখ ভোগ করিব। হে প্রিয়ে! এই সকল বিবেচনা করিয়া তুমি বিষণ্ণ হইও না, যে পর্য্যন্ত না ফিরিয়া আসি তুমি ইষ্টদেবতার পূজা কর। আমি স্বীয় কুলকীর্ত্তি রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই সমুদ্রগমন করিব, আমি ইহা হইতে কখনই নিবৃত্ত হইব না, তুমি আমাকে নিবারণ করিও না।

সুভদ্রা স্বামীর সমুদ্রগমনে একান্ত নির্ব্বন্ধ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, স্বামিন, আপনি যখন একান্তই সমুদ্র গমনে ইচ্ছা করিতেছেন, আমি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া আপনার আগমনকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, আপনি গমন করুন; পথে আপনার কুশল হউক, আপনার যাত্রা সিদ্ধ হউক, আপনি প্রভুত সম্পত্তির সহিত শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া আসুন।

সুভদ্রা এই কথা বলিলে ঐ সার্থবাহ বণিকসমূহকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আমি কুলবৃত্তি অনুসারে রত্নের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতেছি, তোমরা যদি আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা কর তবে পণ্যদ্রব্য লইয়া আমার সহিত আইস। বণিকগণ এই কথা শুনিয়া শীঘ্র পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক সমুদ্রযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন সার্থপতি শুভগ স্বস্ত্যয়ন বিধি সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বণিকগণের সহিত সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তাঁহারা ক্রমে গ্রাম, জনপদ, ও অরণ্যদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক মহোদধির তীরে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা নৌকা আরোহণ করিলেন এবং প্রত্যেক নৌকাতে ধ্বজা উত্থিত করিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনুকূল বায়ুভরে দ্বীপসমূহ অতিক্রম করিয়া শীঘ্র রত্নাকরে প্রবেশ করিলেন। রত্নাকরে যাইয়া দৈববশতঃ পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহারা রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। গৃহস্থিত স্ত্রী পুত্রগণকে স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইতে লাগিলেন।

এদিকে সার্থবাহ-পত্নী সুভদ্রা স্বামীবিহীনে গৃহ নিরুৎসব ও শূন্য বোধ করিতে লাগিলেন। যে দিন হইতে সার্থবাহ সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন তিনি তদবধি দিবস গণনা করিতে লাগিলেন, স্বামীকে স্মরণ করিয়া বিরহবেদনায় আকুল হইলেন। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীর কৃশ, বর্ণ পাণ্ডু ও কেশপাশ রুক্ষ হইয়া গেল। তিনি অলঙ্কার পরিতে ইচ্ছা করিতেন না, মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতেন। ক্রমে বিরহাতুরা হইয়া পড়িলেন, কোন বিষয় দর্শন অথবা শ্রবণ, গন্ধদ্রব্যানুলেপন, পান, স্পর্শন অথবা কোন মনোরম বা কৌতুকাবহ স্থানে গমন সমস্ত কার্য্যেই তিনি বিরত থাকিতেন। তিনি পীড়িতের ন্যায় বিষণ্ণা হইয়া থাকিতেন, বিরহ দুঃখে অধৈর্য্য ও অচেতন হইতেন। ভর্ত্তার চরণারবিন্দ-স্মরণসুখে ধৈর্য্যলাভ করিতেন, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না, তিনি স্বামীকে ধ্যান করিয়া যোগিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেন।

অনন্তর তাঁহার এক সখী তাঁহাকে নিতান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন, ভদ্রে, পীড়িতা ব্যক্তির ন্যায় তোমাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তোমার কোন কার্য্যে উৎসাহ দেখিতেছি না। তুমি বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া যথাসুখে ভোজন ও অলঙ্কারাদি পরিধান কর।

সখী এই কথা বলিলে, সুভদ্রা বলিলেন—আমি ভোগার্থিণী বা কামাতুরা নহি।

আমি ধর্ম্মকার্য্যে অনুরক্ত, কিন্তু স্বামীবিনা স্ত্রীলোকের কি প্রকারে ধর্ম্ম সাধন হইতে পারে, এই জন্যই আমি অন্যান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্বামীকে চিন্তা করিয়া গৃহে বাস করিতেছি, কোনও ভোগ্য বস্তুতে আমার স্পৃহা নাই। আমার ভর্ত্তা কখন্ গৃহে ফিরিয়া আসিবেন ইহাই ধ্যান করিয়া আমি যোগিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছি। যে পর্য্যন্ত না আমার স্বামী গৃহে ফিরিয়া আসেন সে পর্য্যন্ত আমি সুরম্য ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করিব না। স্বামী বিনা কোন বিষয়েই আমার বাঞ্ছা নাই। আমার চিত্তে অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা নাই, অতএব আমি এইরূপ করিতেছি। আমি যে পর্য্যন্ত না স্বামীকে দেখিতে পাই সে পর্য্যন্ত আমি এইরূপ ভাবে অবস্থান করিব। যদি আমার জীবন যায় তথাপি আমি গৃহের বাহিরে যাইব না। স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা, স্বামী সেবাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। এইজন্য আমি স্বামীকে স্মরণ করিয়া যতিব্রত অবলম্বন করিয়া আছি। গৃহে যখন আমার স্বামী নাই তখন কি প্রকারে ধর্ম্মচর্য্যা করিব। যখন যৌবনে আমার স্বামী বিদেশে রহিলেন তখন আমার জন্ম নিরর্থক। বৃদ্ধকালে স্বামী ও ধন লইয়া কি করিব। আমি স্বামীকে মনে মনে ধ্যান করিয়া জীবিত আছি, যদি তিনি না প্রত্যাগমন করেন তাহা হইলে আমার এই দুঃখময় জীবনে কি ফল। যে সকল স্ত্রী স্বামীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিয়া গৃহে বাস করেন তাঁহারাই ধন্য। হায়! আমার ন্যায় দুর্ভাগিনী যেন জন্মগ্রহণ না করে।

সখী এই সকল কথা শুনিয়া, ইহার কোনও উপায় বিধান করিবার জন্য সতী সুভদ্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে! তুমি সত্য বলিয়াছ পতি স্ত্রীগণের দেবতা। তথাপি তোমার মঙ্গলের জন্য আমি তোমাকে এই উপদেশ দিতেছি। অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

যত দিন স্বামী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া গৃহে বাস করেন ততদিন স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিণী হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবেন। পরে যখন পতি বিদেশে গমন করিবেন তখন যে পর্য্যন্ত না তিনি ফিরিয়া আসেন সেই পর্য্যন্ত স্ত্রী পতির ইষ্টদেবতাকে ভজনা করিবেন। দেখ, তোমার পতির ইষ্টদেবতা নারায়ণ হরি, অতএব তুমি সেই হরিনাম গ্রহণ ও স্মরণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা তাঁহার ভজনা কর। তিনি কামদ, তাঁহার মহিমায় তোমার স্বামী প্রভূত রত্নের সহিত কন্দর্প প্রেরিত হইয়া শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। তাহা হইলে তোমার জন্ম সফল হইবে, সংসার সুখের আগার হইবে, স্বামীর সহিত প্রভূত দান করিয়া যথাসুখে যাবজ্জীবন বাস করিবে।

সখীর এই কথা শুনিয়া সতী সুভদ্রা তাহাই করিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন আমি হরিনাম স্মরণ করিয়া এক্ষণে জীবন যাপন করিব। যদি তাঁহার নামগুণে আমার স্বামী প্রভূত রত্নের সহিত ফিরিয়া আসেন তাহা হইলে ভগবান বিষ্ণুকে একটি সুবর্ণ চক্র প্রদান করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সুভদ্রা বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন হে প্রভো! হে নারায়ণ! ভগবান্ বিষ্ণো! আপনাকে

নমস্কার। আমি স্ত্রীলোক, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমার স্বামীকে শীঘ্র গৃহে আনয়ন করিয়া দিন। যখন আমার স্বামী নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন তখন আপনাকে একটী স্বর্ণচক্র উপঢৌকন করিব।

সখীর সম্মুখে এইরূপ সংকল্প করিয়া সুভদ্রা অনবরত হরিনাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় সার্থবাহ বণিকসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রভূত রত্নের সহিত গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি গৃহে আগমন করিলে সতী সুভদ্রা অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। তাঁহার চরণারবিন্দে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। বলিলেন, স্বামিন্, যদবধি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন সেই অবধি আমি আপনাকে স্মরণ করিয়া যোগিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছিলাম। তৎপরে এই সখী আমাকে একান্ত বিরহাতুরা দেখিয়া আমার কষ্ট নিবারণার্থ ভগবান হরির আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। সেই দিন হইতে আমি আপনার ইষ্টদেবতাকে অনবরত স্মরণ করিয়া আপনার শীঘ্র গৃহাগমন প্রার্থনা করিলাম। আপনি গৃহে ফিরিয়া আসিলে আমি তাঁহাকে একটী সুবর্ণচক্র উপঢৌকন করি, এই মানসিক করিয়াছি। এক্ষণে আমার প্রার্থনা-সিদ্ধ হইয়াছে অতএব দেবতার নিকট যাহা মানসিক করিয়াছি তাহা পূর্ণ করিব। আমি ভগবান হরির পূজার ও মানসিক উপঢৌকনের নিমিত্ত দেবগণের নিকট গমন করিব। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

সার্থবাহ সতী সুভদ্রার এই কথা শুনিয়া ভগবান্ হরির আরাধনার নিমিত্ত চক্র লইয়া যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন সুভদ্রা সখিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া পূজোপকরণ দ্রব্য ও চক্র লইয়া দেবকুলাভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময়ে করুণাময় ভগবান বুদ্ধদেব প্রাণীগণের উদ্ধারের জন্য বুদ্ধচক্ষু দ্বারা চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি সুভদ্রাকে গমন করিতে দেখিয়া স্থির করিলেন, সুভদ্রা প্রত্যেক বুদ্ধত্ব লাভ করিবে এবং ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, ওহে ভিক্ষুগণ! এই নারী সুভদ্রা আমাকে দর্শন করিয়া নিশ্চয়ই বোধিচিত্ত লাভ করিবে এবং প্রত্যেক বোধিত্বে শীঘ্রই ইহার প্রণিধান হইবে। অতএব আমি শীঘ্রই ইহাকে দর্শন দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিব। তোমরা যদি আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা কর পাত্র ও চীবর গ্রহণ করিয়া শীঘ্র আইস। জিতেন্দ্র বুদ্ধদেব এইরূপ আজ্ঞা করিলে ভিক্ষুগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর ভগবান বুদ্ধদেব স্বপ্রভাব প্রদর্শন করিতে করিতে ভিক্ষুগণের সহিত রাজগৃহনগরীতে উপস্থিত হইলেন। রাজগৃহ নগরের পথে সুভদ্রা সখীর সহিত গমন করিতে করিতে প্রভাস্বর বুদ্ধদেবকে দর্শন করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণোপেত ও অশীতিব্যঞ্জনান্বিত। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেবগণের সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও অধিক। তাঁহার মূর্ত্তি কমনীয় ও মনোহর। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তিনি

সাক্ষাৎ পুণ্যের অবতার। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুভদ্রার সুবর্ণ চক্র উপঢৌকন করিতে অভিলাষ হইল। চক্র উপঢৌকন করিতে উদ্যত হইলে সখী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন; ভদ্রে ইনি নারায়ণ নহেন। ইঁহার নাম জিতেন্দ্রিয় ভগবান বুদ্ধদেব। সুবর্ণচক্র হরিকে প্রদান করিব বলিয়া সংকল্প করিয়াছিলে ইঁহাকে প্রদান করিও না। সখী এই প্রকারে নিবারণ করিলে সদ্ধর্ম্মলাভে অভিলাষিণী সুভদ্রা বলিলেন আমি সৌভাগ্যবশতঃ ভগবান্ বুদ্ধদেবের দর্শন পাইলাম। অদ্য আমার জন্ম সফল এবং সংসারে বাঁচিয়া থাকাও সফল। যাঁহার আভায় প্রভাসিত হইয়া প্রাণীগণ ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্বৃতি লাভ করে, যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে অথবা যাঁহার নাম স্মরণ করিলে কন্দর্পের হস্ত হইতে বিনির্মুক্ত হইতে পারা যায়, যাঁহার ধর্ম্ম-শ্রবণে এবং সর্ব্বদা অনুমোদনে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রাণিগণ সদ্গতি লাভ করে, যাঁহার আশ্রিত সংঘগণকে কিছু দান করিলে অনন্ত সুখ ভোগ করিয়া সুখাবতী নগরে গমন করা যায়, যিনি প্রাণিগণকে পালন করেন, এবং সদ্ধর্ম্মে বোধিত করেন এবং নির্বৃতি মার্গ স্থাপিত করেন, যাঁহার ধর্ম্মপ্রভাবে ত্রিভুবনের মঙ্গল হয়, সেই ভগবান, শাস্তা বুদ্ধদেব আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমাকে দর্শনপ্রদান করিলেন। বুদ্ধদেব যখন আমাকে অযাচিত হইয়া দর্শন দিয়াছেন তখন আমি নিশ্চয়ই মঙ্গলময়ী ও ভাগ্যবতী। আমি সেই মুনীন্দ্রকে পূজা করিয়া নির্ব্বাণ লাভের জন্য এই চক্র প্রদান করিব। সর্ব্বদা বুদ্ধদেবকে দর্শন করা দুরূহ। উড়ুম্বর পুষ্পের ন্যায় তাঁহার উৎপত্তি কদাচিৎ হইয়া থাকে। মনুষ্যজন্ম লাভ করা কঠিন। দুর্লভমনুষ্যজন্ম অনেক পুণ্যে লাভ করা যায়। মনুষ্যজন্মলাভ করিয়া দৈবাৎ বুদ্ধদেবের সেবা করিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধের সেবা না করিলে বোধিচিত্ত লাভ করিতে পারা যায় না, বোধিচিত্ত লাভ না করিলে সদ্ধর্ম্মে মতি হয় না। ধর্ম্মে মতি না হইলে বোধিচর্য্যা লাভ করা যায় না। বোধিচর্য্যা লাভ না করিলে কিরূপে লোকের হিতসাধন করিতে পারা যায়? হিতকর কার্য্য না করিতে পারিলে পুণ্য সঞ্চয় হয় না, পুণ্য সঞ্চয় না করিতে পারিলে নির্ব্বাণ লাভ করা যায় না। অতএব ক্লেশ হইতে বিমুক্তি ও নির্ব্বাণপদ লাভের জন্য আমি এই জগন্নাথ বুদ্ধদেবের পূজা করিব। বুদ্ধ এই জগতের নাথ এবং সমস্ত প্রাণিগণের অভিলাষপূরক। তিনি সদ্ধর্ম্মের উপদেষ্টা, শাস্তা এবং বিনায়ক। তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি অন্য কোনও দেবের পূজা করিব না। আমি ইঁহার স্মরণ লইব এবং সর্ব্বদা ভজনা করিব।

সুভদ্রা এই কথা বলিয়া চক্র লইয়া বুদ্ধদেবকে অর্পণ করিবার জন্য পূজা করিতে লাগি-লেন, এবং মনে মনে এইরূপ ধ্যান করিলেন এই সুগত বুদ্ধদেব যেরূপ ক্লেশরহিত ও জিতেন্দ্রিয়, আমিও যেন সেইরূপ শুদ্ধাত্মা হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করি।

এই সময় ভগবান্ বুদ্ধদেব সুভদ্রাকে ধ্যানে মগ্ন দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার মুখপদ্ম হইতে মধুময় হাস্য বিনির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর আনন্দ নামে ভিক্ষু ভগ-

বানকে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান্ বলিলেন—আনন্দ! আমি বিনা কারণে হাস্য করি নাই, দেখ আনন্দ, এই নারী সুভদ্রা আমাকে চক্র প্রদান করিয়াছে, আমাকে পূজা ও পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া বোধিজ্ঞান লাভের জন্য ধ্যান করিয়াছে। এই দানধর্ম্মের দ্বারা সুভদ্রা মঙ্গলবিশিষ্ট হইয়া দিব্যভোগ লাভ করিবে। পঞ্চদশ কল্প-পরিমিত কাল উহার ঐ ভোগের ধ্বংস হইবে না। তৎপরে সে চক্রান্তর নামে জিতে-ন্দ্রিয় সর্ব্বভূতানুকম্পী ন্যায়বান্ ব্রহ্মচারীরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সুভদ্রা যে আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে এই পুণ্যফলে প্রত্যেক বুদ্ধ হইবে। কারণ যে ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি পুণ্যকার্য্য করেন, তাঁহার ঐ পুণ্য ক্ষয় হয় না, ক্রমে তিনি বিশুদ্ধাত্মা হইয়া বোধিজ্ঞান লাভ করেন। দেখ আনন্দ, যাহারা বোধিজ্ঞানে অভিলাষী, তাহারা এই সকল বিবেচনা করিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘ এই ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা করিবে।

বুদ্ধদেবের এই সকল আদেশ শ্রবণ করিয়া তত্রস্থিত জনগণ তাহাই করিব এই কথা বলিয়া ত্রিরত্নের সেবক হইলেন।

অনন্তর বুদ্ধের প্রভাবে সুভদ্রার প্রদত্ত সেই চক্র আকাশে সমুদ্গত হইয়া অতি উজ্জ্বলরূপে শোভা পাইতে লাগিল। উহা সুদর্শন চক্রের ন্যায় উদ্দীপ্তরশ্মিসমূহ বিকিরণ করিতে লাগিল। তখন ভগবান্ বুদ্ধদেব সুভদ্রার শিরোদেশ পাণিদ্বারা স্পর্শ করিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—সুভদ্রে, তোমার মঙ্গল হউক, তোমার যেন বিনিপাত না হয়, তুমি ক্রমে ক্ষান্তি, শীল, বীর্য্য, দান, ধ্যান, প্রজ্ঞা এই ছয়টী চর্য্যার অনুশীলন করিয়া তাহাদের পারগামী হইয়া প্রত্যেক বুদ্ধত্ব লাভ কর। এই প্রকারে সুভদ্রাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মুনীন্দ্র বুদ্ধদেব তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সুভদ্রাও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও স্মরণপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিয়াই সমস্ত বৃত্তান্ত স্বামীকে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। সার্থবাহ বুদ্ধদেবের মহিমা শ্রবণ করিয়া ভার্য্যার সহিত তদবধি ত্রিরত্নের সেবক হইলেন।

উপগুপ্ত কহিলেন, হে মহারাজ অশোক! সুভাষিতটী যেরূপ শুনিয়াছি সেইরূপ বর্ণনা করিলাম। আপনি ইহা শ্রবণ করিয়া ত্রিরত্নের সেবক হউন, আপনার প্রজাগণকেও ত্রিরত্নের ভজনাতে প্রেরিত করুন। এরূপ করিলে আপনার সর্ব্বদা মঙ্গল হইবে, এবং আপনি বোধিজ্ঞান লাভ করিবেন।

উপগুপ্ত কর্ত্তৃক বর্ণিত এই সুভাষিত শ্রবণ করিয়া নরেন্দ্র অশোক এবং তাঁহার পারি-ষদ্‌বর্গ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

লাসাভিলা,
দার্জ্জিলিঙ। } শ্রীশরৎচন্দ্র দাস সি, আই, ই।

সেই !

বাছা, নূতন আনন্দ দিনু নববর্ষে এনে,—
নবীন জীবনে দেখিবারে নবসুখ,
একি ? পলকে কে দিল সেই !—যবনিকা টেনে
—পুরাতন !—পুরাতন—পরিচিত দুঃখ !
ভেবেছিনু বর্ত্তমান আনন্দ সলিলে
ডুবাইব অতীতের শুষ্ক-তপ্ত দেশ ;
নববর্ষে রোপিলাম নব লতাটিরে,
অদৃষ্ট হাসিয়া করে, শোষিয়া নিঃশেষ !
তবে নাও !—শান্ত চিত্তে বরি এ ব্যথায়,
ভাগ্যই প্রশস্তবর্ম্ম বাছারে ধরায় !
তাই, যা দেবে যখন এনে সুখ কিম্বা দুঃখ,
মলিন কখনো তাহে নাহি ক'রো মুখ ।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

লাল বারদোয়ারি ।

ভগবান একলিঙ্গের মন্দিরে আজ পূর্ণ মহোৎসব। "কুমারীব্রত" উদ্‌যাপনাভিলাষিণী যত রাজপুত বালিকা প্রাতঃকাল হইতে মন্দির মধ্যে দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে।

দীন, দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত, মধ্যবিত্ত, রাজা প্রজা সকলেরই কন্যাগণের নিকট আজ মন্দিরের দ্বার সমান ভাবে উন্মুক্ত। সমাজের ও ঐশ্বর্য্যের পার্থক্য যেন সকলে আজ মন্দিরের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছে।

ফল, ফুল, বিল্বপত্র, অর্ঘ চন্দনাদিতে ভগবানের একলিঙ্গের মূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। লিঙ্গ-মূর্ত্তির চারিদিকে সুবর্ণবেষ্টনী আর তাহার চারিপাশে অনাঘ্রাত মল্লিকাকুসুমসদৃশ বালিকাগুলি মুখে সরলতা, ওজস্বিতা ও মধুরিমা মাখিয়া একাগ্রচিত্তে একলিঙ্গের উপাসনা করিতেছে।

ব্রতের উদ্দেশ্য—মনোমত পতিলাভ। যাহার ব্রত সমাপ্ত হইতেছে সে পুরোহিতের দক্ষিণা দিয়া মন্দির হইতে চলিয়া যাইতেছে। যাহার শিবিকা আছে সে গিয়া সওয়ার হইতেছে, যাহার নাই সে পদব্রজে চলিয়াছে। যাহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে তাহারা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ চত্বরে আসিয়া জমিতেছে।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল—সকলেই প্রায় পূজাসাঙ্গ করিয়া মন্দির ত্যাগ করিল কিন্তু একটী রাজপুত বালিকা তখনও পূজায় সন্নিবিষ্টমনা।

বালিকা শিশোদিয়া বংশীয়া। সে তেজোময়ী, তাহার মুখে প্রতিভা, তেজ, ও সরলতা, একাধারে বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে পুষ্পপাত্র, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ। চক্ষু স্থির ও মুদ্রিত। সুগ্রথিত মনোহর নাগকেশর মালা সেই আলুলায়িত ভ্রমর কৃষ্ণ কেশরাজির উপর দিয়া গলদেশ বেষ্টন করিয়াছে। পূজা সমাপ্ত হইলে বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া করপুটমধ্যস্থ শেষ পুষ্পগুলি দেবতার চরণে অর্পণ করিল।

মন্দির রক্ষক এক শৈব সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিতে বালিকার পূজা দেখিতেছিলেন। পূজা সাঙ্গ হইল দেখিয়া তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! ভোগের সময় হইয়াছে মন্দিরতল মার্জ্জনা করিয়া দাও"। বালিকা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেল। সেকালের প্রথা ছিল ভোগের পূর্ব্বে কুমারীগণ মন্দিরতল মার্জ্জনা করিতেন।

বালিকা ত্রস্তপদে মন্দিরের সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল শিবিকা খানি রহিয়াছে কিন্তু বাহকেরা তথায় নাই। বাহকেরা বিলম্ব দেখিয়া নিকটস্থ বাজারে জলযোগ করিতে গিয়াছিল। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া বালিকা ধীরে ধীরে মন্দির সংলগ্ন পলাশ কাননে প্রবিষ্ট হইল।

"পলাশ কানন" একলিঙ্গের মন্দিরসংলগ্ন উদ্যান। উদ্যানে পলাশ বৃক্ষের ভাগ বেশী বলিয়া ইহার নাম "পলাশ কানন" হইয়াছিল! কাননের মধ্যস্থলে কাকচক্ষু নিন্দিত সুবিমল সলিলরাজিপূর্ণ সুবিস্তৃত সরোবর। সরোবরের চারিদিকে দশটী দেব মন্দির। দেবমন্দিরব্যবধানে নানাবিধ ফলপুষ্পপরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি। বালিকা একে একে সেই সরোবর পার্শ্বস্থ দেবমন্দিরগুলি দেখিতে লাগিল।

প্রথমটিতে গণেশমূর্ত্তি, দ্বিতীয়টি মকরবাহিনী শ্বেত মর্ম্মরময়ী গঙ্গামূর্ত্তি, তৃতীয়টি মহেশ্বরের সংহারমূর্ত্তি, বালিকা এই গুলিকে দেখিয়া যেমন চতুর্থটির সম্মুখে আসিবে অমনি বৃক্ষান্তরাল হইতে এক শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত যুবকমূর্ত্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে ভীমকায় বিষধর দেখিতে পাইলে পথিক যেরূপ চমকিত হইয়া উঠে—সহসা সেই নির্জ্জন কানন মধ্যে সেই শুভ্রবসনধারী যুবা পুরুষকে দেখিয়া সেই প্রফুল্লমুখী বালিকাও সেইরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বালিকা দৃঢ়স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দুর্জ্জয় সিংহ! এখানে আসিলে কেন।"

"অনুসূয়ে! আসিলাম কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি যেমন ভাবিতেছ আমি কেন এখানে আসিলাম, আমিও সেইরূপ ভাবিতেছি তোমার কোমল হৃদয়ে এত কঠিনতা কোথা হইতে আসিল!

"দুর্জ্জয় সিংহ কুলকন্যার সহিত এপ্রকার স্থলে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ নিতান্ত নির্দ্দোষ ব্যাপার নয়, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

"অনুসূয়ে তুমি বড় নিষ্ঠুর তাহা না হইলে আমায় চলিয়া যাইতে বলিতে না। আর কতদিন হৃদয়ে কালসর্প পোষণ করিয়া অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিব? আজ কতদিন ধরিয়া তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি কিন্তু কোন সুযোগই পাই নাই। তোমার সুন্দর মুখখানি একবার দেখিলে আমার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, একবার তোমার মুখে দুটি মিষ্ট কথা শুনিলে আমি সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। তোমার বাটীর দ্বার আমার নিকট রুদ্ধ, আজ ভগবান একলিঙ্গের কৃপায় যদি সাক্ষাৎ পাইয়াছি তবে কেন চিরঅপূর্ণ আশা কথঞ্চিৎ পরিপূর্ণ করিব না?

বালিকা আবার কঠোর স্বরে বলিল, "দুর্জ্জয় সিংহ, আমি কুলকন্যা আমার সহিত নির্জ্জনে এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহা তোমার সম্পূর্ণ অনুচিত। তুমি পথ ছাড়িয়া দাও আমি চলিয়া যাই।"

"চলিয়া যাইবে—যাও অনুসূয়ে। যাও দগ্ধ হৃদয়কে আরও দগ্ধিয়া যাও। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিও। আমি তোমার জন্য কি না সহ্য করিয়াছি; দেখ পিতা মাতা ত্যাগ করিয়াছি, দেশ ত্যাগ করিয়াছি, রাঠোরের স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি। অগাধ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তরবারি-বিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি। অনুসূয়ে! এতেও কি তোমায় দয়া হইবে না? আমি কি চিরকালই নিরাশ হৃদয়ের যন্ত্রণা লইয়া নির্জ্জনে দগ্ধ হইব!"

অনুসূয়া স্থির হইয়া কথা গুলি শুনিল, দৃঢ় অথচ কম্পিত স্বরে বলিল—"দুর্জ্জয় সিংহ, সে সব বিবেচনার ইহা উপযুক্ত স্থল নহে। দেখ লোকে যদি এই অবস্থায় আমাদের দেখে কি মনে করিবে বল দেখি!"

দুর্জ্জয় সিংহ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিবে আর কি? সকলে ভাবিবে দুর্জ্জয় সিংহ তাহার ভাবী পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতেছে।"

এ অপমান অনুসূয়ার সহ্য হইল না, তাহার সেই সুন্দর মুখখানি ক্রোধে লৌহিতবর্ণ ধারণ করিল। বালিকা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—"রাঠোরকুলকলঙ্ক দূর হও, তুমি যখন নিজের স্বার্থের মুখে ভগিনীকে যবন হস্তে বলিদান করিয়াছ, তখন পরস্ত্রীকে কাপুরুষের ন্যায় এরূপে অপমানিত করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য কার্য্য। তুমি যদি সহজে এ স্থান হইতে চলিয়া না যাও তবে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।"

এই তীব্র ভর্ৎসনায় দুর্জ্জয়ের মুখ মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় হইয়া উঠিল। বদনে ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা দিল। কঠোর হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন "অনুসূয়ে! নিশ্চয় জানিও রাঠোর কখন নীরবে অপমান সহ্য করে না, ইহার প্রতিশোধ যদি স্ত্রীলোক হইতে আজই পাইতে। কিন্তু নিশ্চয় জানিও এ অপমানের

প্রতিশোধ একদিন নিজহস্তে লইব। তোমায় যদি যবন-হস্তগতা না করিতে পারি তবে দুর্জ্জয়ের নাম এই পৃথিবীর সীমা হইতে অন্তর্হিত হইবে।" দুর্জ্জয়সিংহ ক্রোধ-ভরে আর কিছু না বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

অনুসূয়া দুর্জ্জয় সিংহকে চিনিতেন। সুতরাং এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা বাক্য তাঁহার চিন্তাহীন মনে ভবিষ্যতের অশুভ ছায়া আনিয়া দিল। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে ভাবিতে ভাবিতে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসূয়া ওমরাহ অরিসিংহের এক মাত্র কন্যা; শিশোদিয় বংশের এক শাখা রাজস্থানের গৌরব স্বরূপ প্রতাপের মৃত্যুর পর, কোন কারণে মিবারের পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া আগ্রার অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত নূতন দুর্গাধিপতি যশোসিংহ প্রতাপের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া হলদীঘাটের স্মরণীয় যুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং কুমার সেলিম যশোসিংহের ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি ধারণের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। পিতার নিকট পরে হলদিঘাটের যুদ্ধ বর্ণনা করিবার সময় তিনি প্রতাপ-সহচর যশোসিংহের বীরত্বের কথা উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। উদার হৃদয় আকবর বীরের সম্মান রাখিতে জানিতেন। প্রতাপ সিংহের উপর অত্যাচারের জন্য ইতিহাসকারেরা তাঁহাকে কলঙ্ক-মণ্ডিত করিয়াছেন, কিন্তু যশোসিংহের প্রতি উদারতা দেখাইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

যশোসিংহের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি মহারাজ মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যগণের একাংশের পরিচালন ভার তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, গর্ব্বিত যশোসিংহ বাদসাহের সে অনুগ্রহ সহজেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র অরি সিংহ পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া জাহাঙ্গীর বাদসাহের অধীনে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে যে সমস্ত রাজপুত সামন্ত মন্সবদারী লাভ করিয়াছিলেন অরি সিংহ তাহার মধ্যে একজন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সাহজাহান সম্রাট হইলেন। তিনি বড় একটা হিন্দু ওমরাহদের উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। এই জন্য অরি সিংহকে প্রথম প্রথম বড় অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল; কিন্তু শাহজাহানের প্রিয় ওমরাহ মুক্তিয়ার খাঁর সহায়তায় ক্রমে অরিসিংহের যশ ও প্রতিপত্তি অন্যান্য হিন্দু ওমরাহদিগের অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল।

যবনের সহায়তা উষ্ণ রক্ত শিশোদিয়ের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয় না হইলেও নানা কারণে অবস্থার বৈগুণ্যে অরি সিংহ মুক্তিয়ারের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মুক্তিয়ার অনেক সময় উদয় সিংহের বাটীতে যাইতেন, একদিন এখানে দৈবক্রমে

অনুসূয়াকে দেখিয়া তাহার রূপমুগ্ধ হইয়া পিতার নিকট কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিলেন; বলা বাহুল্য প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল।

রাজপথ নির্জ্জন; রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। পথি পার্শ্বস্থ আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, অদূরে সরাই; সরাই পার হইলেই আগরা সহর।

মুক্তিয়ার বীরপুরুষ ও গর্ব্বিত। পাঠানের উষ্ণ রক্ত তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহমান। তিনি সাহাজানের দক্ষিণ হস্ত। প্রত্যাখ্যাত হইয়া অপমানে ক্রোধে মুক্তিয়ার জ্বলিয়া দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া আপন মনে বলিতেছিলেন "অরি সিংহ! নির্ব্বোধ অরি সিংহ! ক্ষমতায় তুমি মুক্তিয়ার খাঁর তুলনায় ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। মুক্তিয়ার তোমার মত শত শত রাজপুত ওমরাহকে নিজের স্বার্থের মুখে কীট-পতঙ্গের ন্যায় চরণ-দলিত করিতে পারে। তুমি দাম্ভিকতায় ভুলিয়া তাহার অপমান করিয়াছ, তোমার পতন অনিবার্য্য।"

মুক্তিয়ার অস্ফুট স্বরে এই প্রকার বলিতেছেন, এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার পৃষ্ঠ সহসা কোন হস্তের স্পর্শানুভব করিল। পাঠান চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, পরুষ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি?"

"আমি আপনার হিতকারী।"

"তুমি মুসলমান?"

"না—হিন্দু—রাজপুত।"

"রাজপুত! অসম্ভব! তোমার উদ্দেশ্য কি শীঘ্র বল নচেৎ তোমার মুণ্ড এখনি এই তীক্ষ্ণ কৃপাণের শক্তি অনুভব করিবে।"

"আপনাকে অত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আপনি অরিসিংহের বাটী হইতে আসিতেছেন?"

"হাঁ—তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন?"

"আপনি অপমানিত হইয়াছেন—অরিসিংহকে আপনি চিনেন না, তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করা আপনার উচিত হয় নাই।" মুক্তিয়ার যে অরিসিংহের কন্যার হস্ত প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইয়াছেন ইহা কাহারো জানিতে বাকী নাই।

মুক্তিয়ার স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না এই অন্ধকার বেষ্টিত দীর্ঘকায় পুরুষ কে? তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন—

"তুমি এসব সংবাদ কিরূপে জানিলে?"

"কেনা জানে? আমি আপনার সংকল্পে সহায়তা করিতে আসিয়াছি, সব খুলিয়া না বলিলে আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?"

"তোমার নাম?"

"এখন বলিব না—আগে বলুন আমার সহায়তা লইবেন কি না? আমি অরিসিংহের শত্রু।"

"ভাল তাহাই হইবে—পান্থশালায় চল।"

"না—আজ আর আমি বেশীক্ষণ থাকিব না; দুর্গমধ্যে আপনার আবাসে গিয়া কল্য মধ্যরাত্রে দেখা করিব।"

"অত রাত্রে তোমায় দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে কেন?"

"নিদর্শন দিন।"

মুক্তিয়ার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী মোচন করিয়া দিলেন।

"তবে আপনি আমার সহায়তা লইতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার পণ শুনিবেন?"

"আমি তোমার সহস্র দিনার পারিতোষিক দিব।"

"আমি মুদ্রা অতি তুচ্ছ বিবেচনা করি—ইচ্ছা করেন ত উহার দ্বিগুণ মুদ্রা আপনাকে দিতে পারি।"

"তুমি তবে কি চাও?"

মুক্তিয়ারের কানে কানে অপরিচিত ব্যক্তি দুই চারিটী কথা বলিলেন। মুক্তিয়ার ইহাতে চমকিয়া উঠিলেন। পরে ভাবিয়া বলিলেন—"তাহাই হইবে"।

আগন্তককে আবেদন করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া মুক্তিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম?"

"দুর্জ্জয়সিংহ।"

নাম শুনিয়া পাঠান কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যদি সেই সময়ে স্বর্গ হইতে হুরীগণ আসিয়া বেষ্টন করিত তাহা হইলেও মুক্তিয়ার খাঁ অতদূর বিস্মিত হইতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উল্লিখিত ঘটনার পর বাদশাহের সরকারে অরিসিংহের প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। তিনি প্রথম প্রথম প্রায়ই আমখাসে হাজিরা দিতেন—কিন্তু নানা প্রকারে অপমান ও অনাদর ঘটাতে তিনি যাতায়াত এক প্রকার বন্ধ করিলেন। ইহার মধ্যে এক দিন আমখাসের সভা ভঙ্গের পর বাদশাহ তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"রাজপুত ওমরাহ, মুক্তিয়ারের হস্তে তোমার কন্যাকে সমর্পণ করার আপত্তি কি?"

অরিসিংহ নম্রভাবে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা, অন্য কেহ হইলে হয়ত উত্তর দিতে আপত্তি করিতাম। কিন্তু যখন আপনি আদেশ করিতেছেন তখন বলিতে বাধা কি?" এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য সমস্ত খুলিয়া বলিলেন।

সাহজাহান অত্যাচারী ছিলেন বটে কিন্তু একবারে ন্যায়বর্জ্জিত ছিলেন না—সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া তিনি শেষে বলিলেন—"তোমার যাহা বিবেচনায় হয় তাহা করিও। আমি এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিতে চাহি না।"

এই ঘটনার পর আর কেহ কখন অরিসিংহকে আমখাসে দেখে নাই।

অনুস্থয়ার পাত্র পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়াছিল—অরিসিংহ ভাবিলেন বিবাহ দিয়া ফেলিলেই সকল আপদ চুকিয়া যায়—সুতরাং তিনি শুভদিন দেখিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জনরবে যখন দুর্জ্জয় সিংহের কাণে এই কথা উঠিল—তখন সেই উষ্ণমস্তিষ্ক রাঠোর—বিষধর দংশিত জনের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ওষ্ঠাধর দন্তমর্দ্দিত করিয়া তখনই মুক্তিয়ারের আবাসবাটীর দিকে ছুটিলেন। উহাদের মন্ত্রণার শোচনীয় ফল পাঠক পর পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দুই দিন মাত্র বাকী। অরিসিংহের অন্তঃপুর—আত্মীয় কুটুম্বগণের আগমনে কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে; সকলে আনন্দোৎসব করিতে আসিয়াছে। কিন্তু কে জানে ইহার পরিণাম কি হইবে?

যাহার বাটীতে আনন্দ ধরে না সে এক নির্জ্জন কক্ষে একখানি উন্মুক্ত পত্রের দিকে স্থির দৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, তাহার মুখে ঘোর দুশ্চিন্তা—সেই প্রভাতকমলবৎ—সেই প্রাতঃশিশিরমণ্ডিত—শুভ্র মল্লিকা ফুলের ন্যায় সুন্দর মুখ খানি বিষণ্ণতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। পত্র পড়িতে পড়িতে বালিকার চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া দেখা দিল। অনুস্থয়া ভাবিল—'আমিই যত অনর্থের মূল। আমা হইতেই পিতার অবনতি, শত্রুবৃদ্ধি, মনের অশান্তি ও এত নির্যাতন, আমি যদি মরি তাহা হইলে কি এ সব দুর্নিমিত্ত থামিয়া যায় না!"

এমন সময়ে অরিসিংহ কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি অনুস্থয়ার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—"অনু! তুই কাঁদিতেছিস্?"

"না—বাবা—" বলিয়া সেই মুগ্ধা বালিকা পত্র খানি অরিসিংহের হস্তে দিলেন। পত্রখানি পড়িবার সময় রাজপুতবীরের মুখমণ্ডল মলিনভাব ধারণ করিল—তিনি সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অনুস্থয়ে; এ পত্র কোথা পাইলে?"

"এই বিছানার উপর।"

"এই ঘরে! এই বিছানার উপর? কি আশ্চর্য্য! অন্তঃপুর মধ্যে ত শত্রু নিঃশঙ্কভাবে আসিতেছে!"

অরিসিংহ দৃঢ়পদে গৃহত্যাগ করিলেন। পত্র খানিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"ভগিনি! সাবধান—অদ্য মধ্যরাত্রে বড় বিপদ ঘটিবে। তোমার পিতাকে লইয়া সন্ধ্যার সময় দুর্গ ত্যাগ করিও—" আশ্চর্য্যের বিষয় পত্রে স্বাক্ষর নাই!

* * * * * * * *

পত্র যাহার লেখা হউক না কেন—অরিসিংহের মনে দৃঢ় বিশ্বাস্ দাঁড়াইল এসব শত্রুর প্রতারণা ও ভয়প্রদর্শন। তাই তিনি কন্যাকে বলিয়াছিলেন, অন্তঃপুরে শত্রুর যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর একবার তাঁহার নিজের নামে এই প্রকার একখানি পত্র আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর কোন গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও সতর্ক হইলেন না।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে; প্রকৃতি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অরি সিংহের বিস্তৃত প্রাঙ্গন মধ্যে সকলেই সুখনিদ্রায় মগ্ন। নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার পাশাপাশি হইয়া সেই গভীর নিশীথে পূর্ণ রাজত্ব করিতেছিল।

এই অন্ধকারের মধ্যে—প্রচ্ছন্নভাবে শরীর ঢাকিয়া পঞ্চাশৎ যবন সৈন্য নিঃশব্দে অরিসিংহের প্রাসাদ পার্শ্বস্থ আম্রকাননে প্রবেশ করিল। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া এক স্থানে দাঁড়াইল, যেন কাহার আজ্ঞায় অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে একজন তাহাদের মধ্যে অস্ফুট স্বরে বলিল—দুর্জ্জয় সিংহ তুমি এই প্রাচীর নিম্নে অপেক্ষা কর আমি ক্ষুদ্র-দ্বারের চাবি সংগ্রহ করিয়া আনি।" দুর্জ্জয়সিংহ অস্ফুট স্বরে বলিল "চোরের ন্যায় একার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত নই, রাঠোর বীর দস্যু নহে। আপনি থাকুন আমি চলিলাম।"

"এখন রাগ করিলে চলিবে না আচ্ছা তুমি সম্মুখ হইতে আক্রমণ কর আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করি।"

দুর্জ্জয়সিংহ এতক্ষণের পর নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, বৃথা ক্রোধের বশে কার্য্য করিয়া তিনি কতদূর ঘৃণ্য কার্য্য করিয়াছেন এতক্ষণ পরে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। এত অপমানের পরও তিনি অনুসূয়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। সহজে উহার বাসনা পূর্ণ হইবে না ভাবিয়া তিনি যবনের সহিত এই ঘৃণাস্পদ সখ্যতায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনিই আবার অনুসূয়াকে পত্র লিখিয়া সাবধান করেন। প্রথমে ক্রোধের উত্তেজনায় যবনের সহায়তায় সংকল্প করিয়াও অবশেষে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া কৃতজ্ঞতাসূত্রে অনুসূয়া ও তাহার পিতাকে বশ করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না, দেখিলেন তাঁহার পত্র লেখা বৃথা হইয়াছে, অরি সিংহ কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন নাই,—তিনি অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনুসূয়াকে যবন আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই এখন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য দাঁড়াইল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুক্তিয়ার—দুর্জ্জয়সিংহের মনোভাব মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন "ইহাকে বন্দী কর"। দুর্জ্জয়সিংহ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তিনি যবন হস্তে বন্দী হইলেন। মুক্তিয়ার সৈন্য লইয়া ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেন। ত্রিশজন যবন পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

অরিসিংহ সেই গভীর কোলাহলের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন—দেখিলেন তাহার সৈন্যেরা উপরের পথে যবনের প্রবেশ সঞ্চার রহিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তিনি দ্রুতপদে কন্যার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। অনুসূয়াও গোলযোগে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে পিতার স্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। অরিসিংহ কন্যাকে দৃঢ় হস্তে ধরিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। অনুসূয়ার গৃহের পরেই তাঁহার নিজগৃহ, তারপর "লাল বার-দোয়ারি" বা বাহিরের বৈঠকখানা। তখনও সেখানে যবন আসে নাই তিনি কন্যাকে লইয়া বার-দোয়ারির উত্তর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিলেন। অনুসূয়া এতক্ষণ স্থিরভাবে পিতার সঙ্গে আসিতেছিল—কিন্তু সহসা তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তন হইল। বালিকা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—পিতঃ, অপেক্ষা করুন, আমি একটি প্রয়োজনীয় জিনিস আনিতে ভুলিয়াছি। অরিসিংহ উত্তর না করিতে করিতে অনুসূয়া নিজের গৃহে ছুটিল। সে তাহার মৃতাজননীর শ্বেতমর্ম্মরাঙ্কিত ছবিখানি আনিতে ভুলিয়াছিল। অর্দ্ধপথ না যাইতে যাইতে মুক্তিয়ার খাঁ সদলে অনুসূয়ার পথ রোধ করিল। অনুচরদের আদেশ করিল ইহাকে বন্দিনী কর। কিন্তু সাবধান যে ইহার অঙ্গে কেহ হস্ত স্পর্শ না করে। পক্ষিণী পিঞ্জরাবদ্ধ হইল। পিতা কন্যার বিলম্ব দেখিয়া তাহার ঘরের দিকে ছুটিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মুক্তিয়ার অরিসিংহকে দেখিবামাত্র সবেগে তাহার দিকে ধাবমান হইল।

অরিসিংহ দৃঢ় হস্তে তরবারি ধরিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে চারি পাঁচজন যবনকে সেইখানে ধরাশায়ী করিলেন। তাঁহার উন্মত্তভাব ও সিংহের ন্যায় পরাক্রম দেখিয়া যবন সৈন্য পথ ছাড়িয়া দিল। পথ পরিষ্কার পাইয়া অরিসিংহ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন, কন্যা যখন কাতরকণ্ঠে বলিল, "পিতঃ! রক্ষা করুন," তখন মুহূর্ত্তকাল কন্যার দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া সহসা ঘোর উন্মাদের ন্যায় হাস্য করিয়া সেই যবন রুধির প্লাবিত তীক্ষ্ণ খড়্গ—প্রাণসম দুহিতার বক্ষে নিহিত করিয়া বলিলেন, "বৎসে, তাহাই হউক, তোমাকে রক্ষা করি!" কোমলতাময়ী প্রতিমা ভূতলে পড়িয়া গেল।

মুক্তিয়ার এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া দশ হস্ত দূরে পিছাইয়া দাঁড়াইল—তাহার সৈন্যগণ পথ ছাড়িয়া দিল। অরিসিংহ তাহার আহত কন্যাকে কোলে লইয়া দ্রুতপদে লাল বার-দোয়ারীতে পৌঁছিলেন।

মুক্তিয়ার স্থির হইয়া একদৃষ্টে এই ভীষণ কাণ্ড দেখিতেছে—এমন সময়ে সহসা পশ্চাৎদিক হইতে একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল—যবন

ফিরিয়া দেখিল উন্মত্ত দুর্জ্জয়সিংহ একহস্তে তরবারি ও একহস্তে বর্ষা লইয়া যবন নিপাত করিতেছেন।

দুর্জ্জয়সিংহ যবন সৈন্য মথিত করিয়া অনুসূয়ার অনুসন্ধানে ছুটিলেন। বারদোয়ারিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন সেই সদ্যপ্রফুল্ল কুসুমটী ছিন্ন বৃন্ত হইয়া ভূতলে লুটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ এ দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইলেন—কাতর স্বরে ডাকিলেন "অনুসূয়ে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

কেহই উত্তর দিল না—সেই কুসুমললামভূতা কুলকন্যার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণ-পাখী তাহার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ নিশ্চল ও স্থির দৃষ্টিতে সেই রুধির প্লাবিত দেহযষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। একবার সেই রাজপুত-ধর্ম্ম পরায়ণ পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, পরে ধীরস্বরে বলিলেন—"অনুসূয়ে! প্রাণাধিকে! দুর্জ্জয়সিংহ—কঠোর কুলকলঙ্ক—তোমার উপর যে ঘোর অত্যাচার করিয়াছে—মুক্তিয়ারের শোণিতে তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, যদি তোমাকে জীবিত দেখিতে পাইতাম, যদি তোমার মুখে দুটা তিরস্কারের কথাও শুনিতাম তাহা হইলেও বুঝিবা তদপেক্ষা কঠোর প্রায়-শ্চিত্তের দিকে চিত্ত ধাবিত হইত না।" এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণধার শাণিত ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিলেন।

আর অরিসিংহ—হতভাগ্য অরিসিংহ—যাহা করিলেন পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

* * * * *

সন্ধ্যা হইয়াছে—আকাশে দুই চারিটি তারকা অনন্ত নীলবর্ণের মধ্যে উজ্জ্বলতা বিকীরণ করিয়া যমুনার নীলবক্ষে তাহার জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতেছে—এমন সময়ে রাজপথে ঘোরতর বাদ্য উঠিল। চারিদিকে মশালের আলো—বাদ্য ধ্বনি, তাহার মধ্যে জনরব "ঐ বর আসিতেছে।"

বর আসিয়া অরিসিংহের প্রাঙ্গনের কাছে থামিল—আশপাশের লোক যাহারা পথিমধ্যে বরের সঙ্গে জুটিয়াছিল—দুর্গাধিপতির প্রাসাদের দিকে বরকে যাইতে দেখিয়া থামিয়া পড়িল। দ্বারের নিকট আসিয়া সহসা বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল, নহবত থামিল—মসালের আলো নিবিয়া গেল। বর সকলকে বাহিরে রাখিয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে পুরী প্রবেশ করিলেন—পূর্ব্বরাত্রে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তিনি তাহার কিছুই জানেন না। বিবাহ বাড়ীতে আলো নাই—কোলাহল নাই—বাদ্য নাই—বিবাহ সভা নাই দেখিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য হইলেন।

বর স্তম্ভিত হইয়া উপরে উঠিলেন—বাটীর পুরাতন ভৃত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

সহসা অরিসিংহ আসিয়া সেই স্থানে দেখা দিলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় কোটরমগ্ন—

মুখে বিভীষিকা—বদনমণ্ডল শবের ন্যায় মলিন—বরকে দেখিয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় বিকৃত হাস্য করিয়া উঠিলেন—দৃঢ়হস্তে চৌহান রাজকুমারের হস্ত ধরিয়া দ্রুতপদে তাহাকে লাল বার-দোয়ারীতে লইয়া গেলেন্।

চৌহানকুমার দেখিলেন, গৃহটী পূর্ণরূপে উজ্জ্বলিত। দর্পণে দর্পণে ঝাড়ের দলে দলে সেই আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে, চারিদিকে ফুলের মালা—হর্ম্ম্যতলে ফুল—উপরে ফুল—চারিদিকে ফুল। এই ফুলরাশির মধ্যে বহুমূল্য কারুকার্য্যময় মখমল আস্তরণে আবৃত কোন পদার্থ রহিয়াছে। অরিসিংহ বক্রদৃষ্টি করিয়া সেই মখমলের আবরণ ধীরে ধীরে উঠাইলেন। চৌহানকুমার সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া দশহস্ত পিছাইয়া আসিলেন, তাঁহার মুখ শবের ন্যায় মলিন হইয়া গেল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! একি?" অরিসিংহ বলিলেন "বৎস! ইহা রাজপুতের বিবাহ। অনুসূয়া ইহলোকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। পরলোকে তোমার সহিত মিলিবে।" অরিসিংহ গম্ভীরভাবে স্নেহ-উচ্ছ্বলিত হৃদয়ে অনুসূয়ার শবদেহ চুম্বন করিলেন—পরে বিকট হাস্য করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। জনপ্রবাদ উন্মাদ দুর্গাধিপতিকে সেই অবধি এখানে আর কেহ দেখে নাই।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চম অধ্যায়।

শাঙ্করভাষ্য ও শঙ্করের আবির্ভাব কাল।

অনেকগুলি গ্রন্থ ও ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। প্রকৃত-পক্ষে সেই সমস্তই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যে এক শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাকে বিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য হইতে স্বতন্ত্র গণ্য করিতে হইবে। যাহা হউক এ স্থলে তৎসম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অভিলাষ নহে। শারীরক অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, গীতাভাষ্য এবং প্রধান ও প্রামাণ্য ১০ খণ্ড উপনিষদের ভাষ্য যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রণীত তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। উল্লিখিত ভাষ্যসমূহে তিনি যে সকল গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অবশ্যই ভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপমাস্থলে তিনি যে সকল নরপতি এবং নগরসমূহের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল নরপতি এবং নগরসমূহ অবশ্যই তৎকালে বর্ত্তমান ছিল। অতএব এক্ষণে তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে গোবিন্দ যতি বা গোবিন্দ পরমহংস শঙ্করাচার্য্যের গুরু। ইহা স্বয়ং শঙ্করও লিখিয়া গিয়াছেন। এই গোবিন্দ পরমহংস গৌড়পাদের শিষ্য। মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ভাষ্যে ভাষ্যকার গৌড়পাদকে "পরমগুরু" এবং "পূজ্যাভিপূজ্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গৌড়পাদ ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকারভাষ্য প্রণয়ন করেন। চীনভাষায় সুপণ্ডিত ও চৈনিক পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার বিল সাহেব লিখিয়াছেন, "চ'এন বংশীয়দিগের শাসন কালে গৌড়পাদকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। চ'এন বংশের শাসন ৫৫৭ খৃষ্টাব্দে (৪৭৯ শকাব্দে) প্রবর্ত্তিত হইয়া ৫৮৩ খৃষ্টাব্দে (৫০৫ শকাব্দে) বিলুপ্ত হইয়াছিল।" * এই ২৬ বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কাল অর্থাৎ ৫৭০ খৃষ্টাব্দে (৪৯২ শকাব্দ) গৌড়পাদকৃত ভাষ্য চীনভাষায় অনুবাদের সময় গণনা করিয়া তাহার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫২০ খৃষ্টাব্দে (৪৪২ শকাব্দে) গৌড়পাদ জীবিত ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপর শিষ্যানুক্রমে প্রতিজনের গড়ে ৩০ বৎসর গণনা করিলে গৌড়পাদের আবির্ভাবকাল হইতে ৯০ বৎসর ধরিয়া লইলে শঙ্করের তিরোধান কাল ৬১৪ খৃষ্টাব্দে নির্ণীত হয়, যথা—

গৌড়পাদ	৫২০ খৃষ্টাব্দ হইতে	৩০ বৎসর
গোবিন্দ যতি	৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে	৩০ বৎসর
শঙ্করাচার্য্য	৫৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে	৩০ বৎসর
		৬১০ খৃষ্টাব্দ

উল্লিখিত গণনা দ্বারা ইহা একপ্রকার স্থিরভাবে বলা যাইতে পারে যে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠশতাব্দীর অন্তে এবং সপ্তমশতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, ছান্দোগ্যভাষ্য এবং বৃহদারণ্যক ভাষ্যে উপবর্ষ, শবরস্বামী, ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রবিড়াচার্য্য, বৃত্তিকার (বোধায়ন), কুমারিলভট্ট, প্রভাকর, উদ্যোৎকার, প্রশস্তপাদ এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের মত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। উল্লিখিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণমধ্যে কেহই খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠশতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

উপবর্ষ—ইনি জৈমিনিসূত্র এবং বাদরায়ণ সূত্রের ভাষ্যকার। ইহা সর্ব্বসাধারণে অবগত আছেন যে, গুণাঢ্য প্রাকৃত ভাষায় যে "বৃহৎ কথা" রচনা করেন, সেই গ্রন্থের সার সঙ্কলনপূর্ব্বক সোমদেব এবং ক্ষেমেন্দ্র সংস্কৃত ভাষায় "কথাসরিৎসাগর" রচনা করিয়া গিয়াছেন। গুণাঢ্য শতবাহন নরপতির সমসাময়িক। গুণাঢ্যকৃত বৃহৎকথা গ্রন্থে উপবর্ষের উল্লেখ আছে। সুতরাং উপবর্ষ সাতবাহন নরপতির পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। যদিচ আমরা সাতবাহন (শালিবাহন) নরপতিকে শকাব্দপ্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না,

* G. R. A. S. (N. S.) Vol. XII., p. 355.

তত্রাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাতবাহন খৃষ্টাব্দের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। অতএব উপবর্ষ তদপেক্ষা প্রাচীন ইহা নিশ্চিত।

শবরস্বামী—ইনি জৈমিনীকৃত মীমাংসাসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। পণ্ডিত এন ভাষ্যাচার্য্যের মতানুসারে শবরস্বামী খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী।

ভর্তৃপ্রপঞ্চ—পণ্ডিত এন ভাষ্যাচার্য্য ভর্তৃহরি এবং ভর্তৃপ্রপঞ্চকে অভিন্ন অবধারণ করিয়াছেন।

দ্রবিড়াচার্য্য—ইনি বেদান্তসূত্র এবং কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য রচনা করেন। পণ্ডিত এন ভাষ্যাচার্য্য বলেন যে, ইহাকে অবশ্যই খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

প্রভাকর—ইনি শবরস্বামীর মতাবলম্বী, সুতরাং তাঁহার পরবর্ত্তী এবং কুমারিলভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ কুমারিলভট্ট প্রভাকরের মতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

উদ্যোৎকার—কালিদাসের সমসাময়িক দিঙ্‌নাগাচার্য্যের মতের সমালোচনা করিয়া উদ্যোৎকার "ন্যায়বার্ত্তিক" রচনা করেন। পণ্ডিত এন ভাষ্যাচার্য্যের মতে উদ্যোৎকার খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

প্রশস্তপাদ—ইনি উদ্যোৎকারের সমসাময়িক।

ঈশ্বরকৃষ্ণ—ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাংখ্যকারিকার ভাষ্য রচনা করেন। সুতরাং তিনি গৌড়পাদের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কুমারিলভট্ট—তন্ত্রবার্ত্তিকে কুমারিল কালিদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ভট্টপাদ কুমারিল কবিচূড়ামণি কালিদাসের পরবর্ত্তী হইতেছেন। কালিদাসের সময় সম্বন্ধে ডাক্তার ভাউদাজী ও তন্মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা তাঁহাকে কোনমতেই গুপ্তবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কিম্বা তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমের পরবর্ত্তী বলিতে পারি না। প্রয়াগ নগরীর লাট প্রস্তরলিপির ২৭ পংক্তিতে সমুদ্রগুপ্তের বর্ণনায় "বিদ্বজ্জনোপজীব্যানেককাব্যক্রিয়াভিঃ প্রতিষ্ঠিতকবিরাজশব্দস্য" ইত্যাদি পাঠ করিয়া পণ্ডিতপ্রবর লাসেন কবিচূড়ামণি কালিদাসকে সমুদ্রগুপ্তের সভাসদ লিখিয়াছেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য লাসেনের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত সত্য হউক আর নাই হউক কালিদাসকে তৎপরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না।

শকাব্দের ৫০৭ অব্দ হইতে ৫৫৬ শকাব্দের মধ্যবর্ত্তী কারক থাসা খোদিত লিপিতে কালিদাসের নাম খোদিত রহিয়াছে। * বিষ্ণুশর্ম্মার প্রণীত পঞ্চতন্ত্রে কালিদাস

---

* J. Bo. R. A. S. Vol. IX., p. 315. and Indian Antiquary. Vol. V., p. 70; Vol. VIII., p. 243.

কৃত কুমারসম্ভব হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। পারস্যাধিপতি নুসিরবান খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে পঞ্চতন্ত্র পারসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। সুতরাং বিষ্ণুশর্ম্মা ইহার পূর্ব্বে এবং কালিদাস তৎপূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের জীবনচরিতলেখক বাণভট্ট হর্ষচরিতের প্রারম্ভেই কালিদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। * সুতরাং কালিদাস যে শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর বহুকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কুমারিলভট্ট কালিদাসের পরবর্ত্তী হইলেও তিনি নিতান্ত আধুনিক লোক নহেন। আমাদের বিবেচনায় মাধবাচার্য্যের লিখিত বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য প্রয়াগে গমন করতঃ কুমারিল ভট্টের তুষানল দর্শন করিয়াছিলেন।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে শ্রুঘ্ন, পাটলিপুত্র ও মথুরানগরী এবং পূর্ণবর্ম্মণ নামক নরপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যে ভাষ্যকার পূর্ণবর্ম্মণ এবং রাজ্যবর্ম্মণ নরপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন।

"নহি দেবদত্তঃ শ্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানস্তদহরেব পাটলিপুত্রে সন্নিধীয়তে, যুগপদনেকত্র বৃত্তাবানেকত্বপ্রসঙ্গাদ্দেবদত্ত যজ্ঞদত্তয়োরিব শ্রুঘ্নপাটলিপুত্র নিবাসিনোঃ।"

(বেদান্তদর্শনম্, ২ অধ্যায়, ১ পাদ, ১৮ সূত্রভাষ্য।

যেমন, একই দেবদত্ত শ্রুঘ্নদেশে উপস্থিত ও সেই দিবসেই পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইতে ও থাকিতে পারে না, ইহাও সেইরূপ। একসময় উভয় দেশে উপস্থিত থাকা দুই ব্যক্তি ব্যতিত হয় না। (অর্থাৎ ভিন্ন অবয়বী স্বীকার করিতে হইবে, এ অবয়বী (বস্ত্র) ও সে অবয়বী (বস্ত্র) এক নহে, ভিন্ন, এইরূপ বলিতে হইবে। যেমন শ্রুঘ্ন নিবাসী দেবদত্ত ও পাটলিপুত্র নিবাসী যজ্ঞদত্ত, সেইরূপ।) †

শারীরকভাষ্যের স্থানান্তরে উপমাস্থলে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি শ্রুঘ্ন হইতে মথুরা এবং তথা হইতে পাটলিপুত্রে গমন করিয়াছিলেন, তিনি শ্রুঘ্ন হইতে পাটলিপুত্রে গমন করিয়াছিলেন এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে।"

শারীরক ভাষ্যের এই সকল বর্ণনা পাঠে অনুমিত হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের সময়ে শ্রুঘ্ন, পাটলিপুত্র ও মথুরানাম্নী নগরীত্রয় বর্ত্তমান ছিল।

* নির্গত সুরবংশস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু।
প্রীতির্মধুরসার্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥

† এস্থলে ইহা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল ঘোষ প্রকাশিত বেদান্ত দর্শন আমাদের প্রধান অবলম্বন।

শ্রুঘ্ন হস্তিনাপুরের উত্তরদিকে অবস্থিত বলিয়া পাণিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুঘ্ন নগরী তদপেক্ষা প্রাচীন। বরাহ মিহির স্বপ্রণীত বৃহৎসংহিতায় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ফাহিয়াণ এই নগরের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু হিয়াণ সাঙ এই নগরের সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "শ্রুঘ্ন নগরী যমুনানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহার পরিধি ২০ লি (৩-৪ মাইল)। এই নগরী ভগ্নদশা প্রাপ্ত, কিন্তু তাহার ভিত্তিমূল অদ্যাপি সুদৃঢ় অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।* হিয়াণ সাঙ খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রুঘ্নের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্যকে তাহার পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে না।

মথুরা প্রাচীন সুরসেন। মথুরায় বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ইহার ভূগর্ভ হইতে শকাব্দ প্রবর্ত্তক কনিষ্কের ও অন্যান্য প্রাচীন নরপতির নাম সংযুক্ত শিলিলিপি, দেবমূর্ত্তি ও অন্যান্য প্রাচীন দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।† হিয়োণ সাঙের সময়েও ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেন "এই নগরে প্রায় ২০টি সঙ্ঘারাম‡ আছে, তাহাতে প্রায় ২০০০ শ্রমণ বাস করেন।§ তাঁহারা মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। এই নগরে বিধর্ম্মীদিগের (হিন্দুদিগের) পাঁচটি মাত্র দেবমন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে।"¶ প্রাচীনকাল হইতে মথুরা নগরী বাণিজ্য দ্বারা উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সুতরাং ধর্ম্মবিপ্লবে ইহার অবনতি সংসাধিত হয় নাই।

পাটলিপুত্র,—মহাপরিনির্ব্বাণসূত্র (মহাপরিনিব্বাণসুত্ত) পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে

---

* Beal's Si-yu-ki. Vol. I., p. 187.

† গত আষাঢ় মাসের ভারতীতে হরিসাধন বাবু "মথুরায় বৌদ্ধাধিকার" প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে "হিন্দুদিগের প্রাচীন ও প্রধানতম পুন্যতীর্থে বুদ্ধদেব স্বধর্ম্ম প্রচারে অধিকতর যত্নবান হইয়াছিলেন।" কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইহার বিপরীত। হিন্দুগণ বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থগুলি কাড়িয়া লইয়াছেন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধদেব প্রধান প্রধান নগর ও বন্দর সমূহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। সেইকালে ঐ সকল স্থান বৌদ্ধ তীর্থ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল। বুদ্ধের পূর্ব্বে পুরী একটি সমুদ্র বন্দর ও বারাণসী একটি রাজধানী ছিল। মথুরা খাঁটি বৌদ্ধতীর্থ।

‡ সঙ্ঘারামের ইংরেজি অনুবাদ monasteris, হরিসাধন বাবু তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন "বৌদ্ধাশ্রম"।

§ "শ্রমণের ইংরেজি অনুবাদ Priests তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ হইয়াছে সন্ন্যাসী। কিন্তু দুই সহস্রের পরিবর্ত্তে হরিসাধন বাবু যে কিরূপে তিন সহস্র লিখিলেন তাহা বুঝিতে পারি না।

¶ Beal's Si-yu-ki. Vol. I., p. 180.

বৌদ্ধদেব শাক্যসিংহের নির্ব্বাণের অল্পকাল পূর্ব্বে মগধরাজ অজাতশত্রুর মন্ত্রী বিশ্বাকর ও সিন্ধুপাটলি নামক স্থানে, বৈশালী নিবাসী লিচ্ছবি ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উৎপাটিত করিবার অভিপ্রায়ে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। সেই পাটলিদুর্গ হইতে পাটলিপুত্র নগরীর উৎপত্তি। ব্রহ্মদেশে বুদ্ধদেবের যে জীবনচরিত রক্ষিত হইয়াছে, বিশপ্ বাই-গেনডেট্ তাহার ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থ পাঠে অনুমিত হয় যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের আট বৎসর পূর্ব্বে পাটলিদুর্গের ভিত্তিমুল সংস্থাপিত হইয়াছিল। ৫৫৬ পূর্ব্ব শকাব্দে বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ নির্ব্বাণ লাভ করেন। সুতরাং ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধদেব চরিতের গণনা অনুসারে ৫৬৪ পূর্ব্ব শকাব্দে পাটলিপুত্র নগরীর ভিত্তি সংস্থাপিত হয়।

খৃষ্টাব্দের পঞ্চমশতাব্দীর প্রারম্ভে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়াণ পাটলিপুত্র নগরী দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত পাটলিপুত্রের বিচিত্র কারুকার্য্য সমূহ দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। * ইহার সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী অন্তে (খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ) পরিব্রাজক হিয়েণ সাঙ পাটলিপুত্র নগরী দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "গঙ্গার দক্ষিণতীরে (south) প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরী অবস্থিত। ইহার পরিধি ৭০ লি (১২—১৪ মাইল) যদিচ বহুকাল হইল এই নগর পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাচ ইহার ভিত্তিমূলক প্রাচীর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।" †

চীন দেশীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ মাতোঁয়ালীনের লিখিত ভারত বৃত্তান্ত পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়, ৭৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার প্রবল স্রোত প্রবাহে পাটলিপুত্র নগরী গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে ‡ সুতরাং শঙ্করাচার্য্য অবশ্যই ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। কারণ তাঁহার সময়ে পাটলিপুত্র নগরী বর্ত্তমান ছিল।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন বিদ্যমান পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সম্ভব, কিন্তু বিদ্যমানের সহিত অবিদ্যমানের কিম্বা দুইটি অবিদ্যমান পদার্থের সম্বন্ধ অসম্ভব; যথা—

'নহি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণা ঽভিষেকাদিত্যেবঞ্জাতীয়কেন মর্য্যাদা করণেন নিরুপাখ্যোবন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি ভবিষ্যতি ইতিবা বিশেষ্যতে।"

(বেদান্তদর্শন ২য় ১পাঃ ১৮ সূত্র ভাষ্য)

রাজা পূর্ণবর্ম্মণের অভিষেকের পূর্ব্বে জনৈক বন্ধ্যাপুত্র রাজা হইয়াছিলেন বা হইবেন। এ স্থলে রাজা পূর্ণবর্ম্মণ বিদ্যমান পদার্থ এবং বন্ধ্যাপুত্র অবিদ্যমান পদার্থ।

* The wells, doorways and the sculptured designs are no human work.
To-Kwo-Ki. Ch. XXVII.

† Beal's Si yu ki. Vol. II., p. 82.

‡ বর্ত্তমান পাটনা নগরী সেরশাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যের দ্বিতীয় প্রপাঠকের ২৩ খণ্ডে ভগবান ভাষ্যকার পুনর্ব্বার রাজা পূর্ণবর্ম্মণ ও তৎসমসাময়িক অন্য এক নরপতির নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

"যথা পূর্ণবর্ম্মণঃ সেবা ভক্তপরিধানমাত্রফলা, রাজবর্ম্মণস্তুসেবা রাজ্যতুল্য ফলেতি তদ্বৎ—।"

খোদিত লিপি ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্তে দুইজন পূর্ণবর্ম্মা নরপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নরপদ লাঞ্ছিত দুইখানি প্রস্তর লিপি যবদ্বীপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। * পদচিহ্নের পার্শ্বে একখণ্ড প্রস্তরফলকে সংস্কৃত ভাষায় নিম্নলিখিত শ্লোকটী খোদিত রহিয়াছে।

১—বিক্রান্তস্যাবনিপতেঃ

২—শ্রীমৎ পূর্ণবর্ম্মণঃ

৩—...ম নগরেন্দ্রস্য

৪ বিষ্ণুরিব পদদ্বয়ম্।

আর একখানি প্রস্তর লিপিতে লিখিত আছে যে, পূর্ণবর্ম্মা নরপতির অস্ত্রকলাপ শত্রুকুলনির্মূল দ্বারা বিশেষরূপে খ্যাত হইয়াছিল, তাঁহার পদযুগললাঞ্ছিত এই প্রস্তর ফলক শত্রুদিগের নগর সমূহ ধ্বংশ করিতে সক্ষম ইত্যাদি।

এই পূর্ণবর্ম্মা কোন্ দেশের অধিপতি কিম্বা কোন বংশ হইতে উদ্ভূত, খোদিত লিপিতে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।

উল্লিখিত খোদিত লিপিদ্বয়ের অক্ষর সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া ভট্টকর্ণ † বলেন যে, প্রথমোক্ত প্রস্তর লিপির অক্ষর দৃষ্টে ইহাকে খৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর এবং দ্বিতীয় লিপির অক্ষর দৃষ্টে ইহাকে খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর অবধারণ করা যাইতে পারে।

ফোকেস সাহেব "পল্লবরাজগণের বিবরণ' ‡ প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তর ফলকাঙ্কিত পূর্ণবর্ম্মকে পল্লববংশীয় অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ৪৫০ খৃষ্টাব্দ যে পল্লব নরপতি যবদ্বীপ জয় করেন, ইনি সেই পূর্ণবর্ম্মা। ডাক্তার বার্ণেলও এই মত প্রচার করিয়াছেন। § পল্লব বংশীয়গণ দক্ষিণাপথে যেরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন, সেই বংশীয় পূর্ণবর্ম্মা দ্বারা যবদ্বীপ বিজিত হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে।

যবদ্বীপ বিজয়ী পূর্ণবর্ম্মাকে আমরা শঙ্করাচার্য্যের লিখিত পূর্ণবর্ম্মা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ শঙ্করাচার্য্য কখনই খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে

* Indian Antiquary. Vol. IV., p. 355—358.

† Prof. Kern. দেবনাগর অক্ষরে তিনি স্বয়ংই আপনার নাম "ভট্টকর্ণ" লিখিয়াছেন।

‡ I. R. A. S. (N. S.) Vol. XVII.

§ South Indian Paleogaphy. p. 131.

জীবিত ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ শঙ্কর যে সূত্রের ভাষ্যে স্রুঘ্ন ও পাটলিপুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সূত্রের ভাষ্যেই পূর্ণবর্ম্মার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং শঙ্করের লিখিত পূর্ণবর্ম্মা আর্য্যাবর্ত্তের কোন নরপতি হইবেন। শারীরক ভাষ্য (সমগ্র না হইলেও প্রথমাংশ) বারাণসী নগরে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং বারাণসী কিম্বা তৎসন্নিহিত প্রদেশে আমাদিগকে পূর্ণবর্ম্মার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

গুপ্তসম্রাটদিগের অধঃপতন কালে মৌখরী বংশজ "বর্ম্মণ" গণ প্রবল হইয়া উঠেন। ইহারা কান্যকুব্জ, বারাণসী ও মগধদেশের পশ্চিমাংশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। * কনোজপতি গ্রহবর্ম্মার উপাংশু হত্যার পর তাহার শ্যালক স্থাণ্বীশ্বর পতি রাজ্যবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করেন। তৎকালে বারাণসী ও মগধদেশের পশ্চিমাংশে মৌখরী বংশীয় পূর্ণবর্ম্মা নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ বলেন, কিরণ সুবর্ণ (বা করণ সুফরাণের) অধিপতি শশাঙ্ক যৎকালে বৌদ্ধগয়ার বুদ্ধিদ্রুম বিনাশের চেষ্টা করেন, তৎকালে এই পূর্ণবর্ম্মণ সেই জগদ্বিখ্যাত বটবৃক্ষ রক্ষা করিয়াছিলেন। †

---

* কনোজের মৌখরী বর্ম্মণ নরপতিদিগের নিম্নলিখিত তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে।

হরিবর্ম্মণ—৪৭৫ খৃষ্টাব্দ।
আদিত্যবর্ম্মণ - ৫০০ খৃষ্টাব্দ।
ঈশ্বরবর্ম্মণ—৫১৫ খৃষ্টাব্দ।
ঈশানবর্ম্মণ—৫২৫ খৃষ্টাব্দ।
সর্ব্ববর্ম্মণ—৫৪৫ খৃষ্টাব্দ।
সুস্থিতবর্ম্মণ—৫৮০ খৃষ্টাব্দ।
অবন্তি বর্ম্মণ—৫৭০ খৃষ্টাব্দ।
গ্রহবর্ম্মণ—৫৯৫ খৃষ্টাব্দ।

গয়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে মৌখরী বংশীয় যে সকল নরপতি রাজত্ব করিয়াছেন তন্মধ্যে যজ্ঞবর্ম্মণ, শার্দ্দূলবর্ম্মণ, এবং অনন্তবর্ম্মণের নামাঙ্কিত কয়েক খণ্ড খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। (A. R. Vol. I., p. 242 and J. A. S. S. Vol. VI., pp. 647 and 677.) খোদিত অক্ষর সমূহের আকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া ডাক্তার ভগবান লাল ইন্দ্রজী বলেন "Inscriptions, written in characters a little later than those of the Guptas, and hence probably belonging to the 5th Century—Inscriptions from Nepal. p. 53." আমাদের বিবেচনায় পূর্ণবর্ম্মণ উল্লিখিত অনন্তবর্ম্মণের উত্তরপুরুষ।

† Beal's Si-yu-ki. Vol. II., p. 118.

এবং ভবিষ্যতে কেহ এই বুদ্ধিক্রম বিনষ্ট করিতে না পারেন এই অভিপ্রায়ে রাজা পূর্ণবর্ম্মণ তাহার চতুর্দ্দিকে ১৬ হস্ত উচ্চ প্রস্তরের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হিয়োন সাঙ বুদ্ধিক্রম পরিবেষ্টিত সেই উচ্চ প্রাচীর স্বচক্ষে দর্শন করিয়া পূর্ণবর্ম্মার কীর্ত্তি-কলাপ বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।

এই পূর্ণবর্ম্মণ কিরণ সুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের সমসাময়িক নরপতি। এই শশাঙ্ক সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনকে বধ করিয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ণবর্ম্মণ, শশাঙ্ক এবং রাজ্যবর্দ্ধন এক সময়ে জীবিত ছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনের সমালোচন উপলক্ষে ডাক্তার ভুলার ৬০৬ খৃষ্টাব্দে (৫২৮ শকাব্দ) হর্ষবর্দ্ধনের অভি-ষেক কাল নির্ণয় করিয়াছেন সুতরাং সেই বৎসরেই শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের উপাংশু হত্যা সম্পাদিত হইয়াছিল। অতএব আমরা বলিতে পারি যে, শশাঙ্ক, পূর্ণবর্ম্মণ এবং রাজ্যবর্দ্ধন শকাব্দের ষষ্ঠশতাব্দীর প্রথম ভাগে (অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে) জীবিত ছিলেন। এই অধ্যায়ের আরম্ভে আমরা গৌড়-পাদ হইতে শঙ্করের সময় গণনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যু কাল ৬২০ খৃষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছি। এ দিকে শঙ্করাচার্য্যের লিখিত পূর্ণবর্ম্মণ নরপতি ও তৎসাময়িক শশাঙ্ক এবং রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুকাল তাহার দুই চারি বৎসর অগ্রপশ্চাৎ মাত্র হইতেছে। সুতরাং উভয়বিধ গণনা অনুসারে শঙ্করের আবির্ভাবকাল শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ-ভাগে (খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্ত ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগ) নির্ণীত হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে ছান্দোগ্য ভাষ্য হইতে যে দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পূর্ণবর্ম্মণের সহিত রাজ্যবর্ম্মণের নাম গ্রথিত রহিয়াছে। "রাজ্যবর্ম্মণঃ সেবা রাজ্য তুল্যফলেতি" এই বর্ণনা দ্বারা রাজ্যবর্ম্মণ নরপতির মহত্ব বিঘোষিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরাজন্যবর্গের যে সমস্ত তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি আবিস্কৃত হইয়াছে তাহাতে রাজ্যবর্ম্মণ নামে কোন নরপতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে কিম্বা ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এই নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অতএব বোধ হয় ভগবান ভাষ্যকার অশেষ গুণালঙ্কৃত রাজ্যবর্দ্ধন নরপতির নাম ছান্দোগ্য ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী নকলনবিশগণ রাজ্যবর্দ্ধনকে রাজ্যবর্ম্মণ করিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ লিপি-কর ভ্রমপ্রমাদ নিতান্ত স্বাভাবিক। মাধব কৃত সংক্ষেপ শঙ্করজয় গ্রন্থের যে প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহাতে যিনি "ব্রহ্মগুপ্ত", মান্দ্রাজ প্রদেশে রক্ষিত সংক্ষেপ শঙ্করজয় গ্রন্থে তিনি "ধর্ম্মগুপ্ত" হইয়াছেন। এরূপ ভ্রম রাশি রাশি দেখান যাইতে পারে, এজন্যই বলিতেছিলাম পূর্ণবর্ম্মণের সমসাময়িক রাজ্যবর্দ্ধন লিপিকর প্রমাদ বশতঃ রাজ্যবর্ম্মণ হইয়াছেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় অগ্রজ রাজ্যবর্দ্ধনের বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে,

তিনি ভগবান বুদ্ধদেবের ন্যায় পরহিতব্রতপরায়ণ ছিলেন। তিনি একজন অসাধারণ বীর এবং প্রজাপ্রিয় নরপতি ছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় অগ্রজের গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সেই কবিতার শেষ চরণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ॥

সত্যানুরোধে অরাতি ভবনে যিনি প্রাণ দান করিয়াছিলেন। বাণভট্ট এবং হিয়োণ সাঙ এই বাক্যের সত্যতা পোষণ করিতেছেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মহত্ব স্মরণ করিয়াই বোধ হয় ভগবান্ ভাষ্যকার লিখিয়াছেন, "রাজ্যবর্দ্ধনস্ত সেবা রাজ্যতুল্য ফলেতি"। পরবর্ত্তী নকলনবীশগণ রাজ্যবর্দ্ধনস্থলে রাজ্যবর্ম্মণ করিয়াছেন। এস্থলে একটি তর্ক উপস্থিত হইতে পারে যে, পূর্ণবর্ম্মণ এবং রাজ্যবর্দ্ধন উভয়েই বৌদ্ধ নরপতি, ভগবান্ ভাষ্যকার কোন হিন্দুনরপতির নামোল্লেখ না করিয়া ইঁহাদের নামোল্লেখ করিবার কারণ কি? এই তর্কের দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, শঙ্করাচার্য্য যৎকালে বারাণসী নগরে অবস্থান পূর্ব্বক ভাষ্য রচনা করেন, তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিদিগের মধ্যে ইঁহারাই প্রধান ছিলেন। বিশেষতঃ তৎকালে বারাণসী নগরী পূর্ণবর্ম্মার অধীন ছিল। তাহার পার্শ্বেই রাজ্যবর্দ্ধনের অধিকার বিস্তৃত। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, পূর্ণবর্ম্মণ এবং রাজ্যবর্দ্ধন অতি সদাশয় এবং মহৎচরিত্রসম্পন্ন ছিলেন। ইহা যে কেবল বৌদ্ধগণ লিখিয়া গিয়াছেন এমত নহে। ব্রাহ্মণ বাণভট্ট, বৌদ্ধ নরপতি রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী হিন্দুনরপতি "গৌড়েশ্বর" নরেন্দ্রগুপ্ত শশাঙ্ককে "চণ্ডালাধম" লিখিয়াছেন। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভারতের পুরাতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে বৌদ্ধচরিত্রের মহত্ত্ব এবং হিন্দুচরিত্রের নীচাশয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবান্ ভাষ্যকার যে এইরূপ অশেষগুণালঙ্কৃত রাজ্যবর্দ্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া "চণ্ডালাধম" নরেন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লেখ করিবেন ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

মাধবকৃত সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ের মতানুসারে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রণেতা শ্রীহর্ষ শঙ্করের সমসাময়িক। এবং তিনি শঙ্করের দ্বারা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় মাধবাচার্য্য উক্ত শ্রীহর্ষের সহিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের নাম সংযুক্ত করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বোধ হয় উক্ত শ্রীহর্ষ বাণভট্টের আশ্রয়দাতা শ্রীহর্ষ (অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য) হইবেন। কারণ রাজ্যাভিষেক কালে মহারাজ শ্রীহর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ইহা হিয়োণ সাঙ লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় বাল্য-কালে তিনি তাঁহার স্নেহপরায়ণ অগ্রজের যত্নে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজ্যাভিষেকের অল্প কাল পরেই তিনি শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসনে লিখিত আছে:—"পরমমাহেশ্বর মহেশ্বর ইব সর্ব্বসত্ত্বানুকম্পী পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষঃ", রত্নাবলী নাটিকার আরম্ভে তিনি স্বীয় শৈবধর্ম্মের পরিচয়

প্রদান করিয়াছেন। * এই জন্যই বলিতেছিলাম যে, শঙ্করাচার্য্য দ্বারা তিনি শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে শঙ্করের মৃত্যুকাল ৬১০ খৃষ্টাব্দ নির্ণয় করা হইয়াছে ইহা সত্য হইলে মহারাজ শ্রীহর্ষের অভিষেকের পঞ্চম বৎসরে শঙ্করের মৃত্যুকাল অবধারিত হয়। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

কবিকুঞ্জ।

আভীরা।

(১)

দূর শূন্যে নীল ছবি পাহাড়ের তলে
ছেয়ে আছে শ্যামল প্রান্তর!
দূরে দূরে সারি গাঁথা তালরাজিশিরে
কাঁপিতেছে ক্ষীণ রবিকর!

(২)

দিশাহারা ভাসি চলে মেঘপোত গুলি
গগনের নীলিমা সাগরে!
চমকি দেখিছে ধীরে জাগিতেছে দূরে
কনকাদ্রি পাহাড়ের শিরে!

(৩)

আভীরা কিশোরী বসি সপ্তপর্ণ মূলে,
কাছে বসি নওল কিশোর!
বিচরিছে কাছে কাছে গাভী, বৎসগুলি,—
দোঁহে দোঁহা নেহারিতে ভোর!

(৪)

বালিকা মাধুরী নামে, কিশোর রাখাল
প্রতিবাসী কুটুম্বের ছেলে।—
চিরসাথী সখী সখা, শিশুকাল হ'তে—
দিবস কাটিছে হেসে খেলে!

* রাজ্যাভিষেকের পঞ্চবিংশতি বৎসরান্তে মহারাজ শ্রীহর্ষ পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৫)

প্রীতি, সরলতা মাখা মাধুরীর মুখে,
ভাসিতেছে হাসির কিরণ!
মুক্ত অনিলের সখী, বনের ব্রততী—
তেমনি সে ভোলা খোলা মন!

(৬)

চাহি চাহি সে আননে সুখে ভরা বুক
সখা বলে—"সইলো মাধুরী,
প্রভাতে শুনেছি আজি সুখের বারতা,
মাখা তাহে আনন্দ লহরী!"

(৭)

"মাথা খাস্, কি কথাটী বল্‌না রাখাল—"
ঝরে মধু ধীর মৃদুভাষে!
সখা হেরে নবলোভা মাধুরী আননে,
আগ্রহের আলুথালু বেশে!

(৮)

বলে সখা—"শুয়েছিনু কুটীরে যখন,
মা বাপের কথা গেল কাণে,
দোঁহে বলিছেন, হবে সুখপরিণয়
রাখালের মাধুরীর সনে!"

(৯)

পলকে শুকায়ে গেল মধুর মাধুরী,
—মেঘে ছায় সলিল দর্পণ!
আবার ভাসিল হাসি তখনি পলকে
চাহি চাহি সখার আনন!

(১০)

"দাসী তোর পরিণয়ে হব কেন ভাই
তেয়াগিয়া বাপের ভবন?
ঘোমটায় মুখ তবে হবে আবরিতে!—
আমা হতে হবে না তেমন!

(১১)

"এম্‌নি করে দুর্ব্বাদলে, গোঠের বাতাসে
দুজনে কি ছুটিবারে পাব ?
না রাখাল ও সব কথা শুনিস্‌নে ভাই—
মা বলিলে, আমি তা'ই কব !"

(১২)

শ্যাম তরঙ্গের রাজি উঠিছে পড়িছে
শস্য ক্ষেতে অনিল হিল্লোলে !
রাখালে মাধুরী ভোর—অবসর বুঝি
বুধ শনি ধায় কুতূহলে !

(১৩)

তখন চাহিয়া বালা হেরে গোঠ পানে,
অমনি সে লইল পাঁচনী।
নিথর গগন তল কাঁপাইয়ে ডাকে—
"ফিরে আয় ওলো বুধি শনি !"

(১৪)

ছুটি চলে তড়িতের লতিকার মত
আভীরা সে মধুর মাধুরী,
রাখাল চাহিয়ে রহে অনিমেষ আঁখি,
মরমেতে বাসনা লহরী !

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

তুমি।

স্বপনের ছবি তুমি নন্দনের ছায়া,
প্রাণের পরশমণি জীবনের মায়া !
আকুল তনুর তরী ভাসিছে পাথারে,
ভেসে গিয়ে পাবে কূল শ্রী অঙ্গে তোমার ;
শুনিলে তোমার নাম প্রাণের আগারে
আলোক তরঙ্গমালা উঠে অনিবার ;
তোমার মিলন লাগি আকুল পরাণ,
যুগে যুগে ভ্রমিয়াছি তোমার লাগিয়া ;

জন্মান্তরে খুঁজিয়াছি তোমার বয়ান—
নীরবে কালের স্রোত গিয়াছে বহিয়া!
অতৃপ্ত নয়ন লয়ে জগতের পথে
আছিনু চাহিয়ে শুধু তোমার আশায়;—
কোথায় ভ্রমিতে তুমি লাবণ্যের রথে,
পারিজাত বনে কভু মন্দার ছায়ায়!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

দুরন্ত ছেলে।

এখুনি দুরন্ত ছেলে বুঝেছে সকলি;
বুঝেছে সোহাগ বাণী, হৃদয়ের টানাটানি,
বুঝেছে বাহুর ডোর প্রেমের শিকলি;
বুঝেছে মনের কথা, অধরের আকুলতা,
কি করে অধর পানে ধাইছে ব্যাকুলি;
নয়নের অশ্রুজল, ব্যথিছে মরমস্থল,
হাসিতে মনের বাঁধ উঠেছে বিকলি।

এখুনি দুরন্ত ছেলে বুঝে সবি হায়!
সে দিন দেখিল মোরে চুমিতে গো সে অধরে
অমনি হাসিয়া ঢ'লে পড়িবারে যায়,
কভু চায় চুমিবারে কভু যেন বুকে ধ'রে
তেমনি সোহাগ করে তার সাধ যায়।
কি যে সে কাকলী তার বসন্তের কোকিলার
চুরি করে নেছে সুর খেলিতে গো হায়,
এখুনি দুরন্ত ছেলে বুঝেছে সকলি।

সে দিন বুঝিতে তারে, মুখ ঢাকিলাম করে,
ছলনার অশ্রু আঁখে উঠিল উথলি,
কভু হাত ধরি টানি কোলেতে শুইছে আনি
কখনো সোহাগ করে কি জানি কি বলি,
শেষে সে কাঁদিল হায় আমি হাসিলাম তায়
অমনি উঠিল হেসে হরষে বিকলি

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সুরাপাত্র।

ভালবাসা সুধারাশি,আছিল রে ভরা ;
আমার এ কবিদেহ স্ফটিক-আধারে ;
মিটায়ে প্রাণের তৃষা, পিয়াইতে তারে,
আয়াস প্রয়াস তবু বৃথা হ'ল করা !
চুম্বিয়া ঢালিতে যাই অধরের দ্বারে,
ঢলিয়া সে সুধা হয় কলঙ্ক পাসরা ;
আলিঙ্গি ঢালিতে যাই আত্মার মাঝারে,
শিহরি স্ফটিকাধার চুম্বে গিয়া ধরা।
হে মৃত্যু ! এ কাচ পাত্র পাথরে আছাড়ি,
(সুধা ঢালি অন্য পাত্রে) করে ফ্যালো চূর ;
নিশি নিশি শিহরণ শিহরিতে নারি,
করি মোরা তৃষা দূর, পিয়ে ভরপূর !
গড়িল চতুর শিল্পী, কোন্ মতিভ্রমে,
ভঙ্গুর এ নরদেহ স্ফটিক অধমে !

*　　*　　*

সুরা।

চুম্বন ও আলিঙ্গন, দরশপরশে,
প্রাণের সে তীব্রতৃষা মিটিল না তার ;
স্ফটিকের নহে দোষ ; সুধাসোমরসে,
কে যেন কি ঢালি গেছে অজ্ঞাতে আমার !
অহো কি দুর্দৈব ঘোর !—তাই বুঝি হায়
জল জল, শুধু জল, মোর ভালবাসা ?
শূন্যদেহে আলিঙ্গন, শূন্যেতে মিলায় !
আমিও বিধবা আজি বিক্লবা বিবশা !
যৌবনে এ সুধারাশি পিয়ে ভরপূর,
কি অপূর্ব্ব সুরপুরী ভাতিত নয়নে !
ত্রিদশের করতালি, অপ্সরী-নূপুর,
মন্দাকিনী কলকল, বাজিত শ্রবণে
কপালে কঙ্কণ এবে হানিছে কল্পনা
অতৃপ্ত প্রেমের অহো দারুণ ঝঞ্ঝনা।　　শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

নিষ্ফল চেষ্টা।

অনেকগুলি বাঙ্গলা পদ্য, বিশেষতঃ গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমার সর্ব্বদাই কি-যেন কে-যেন কখন-যেন-কেমন-যেন-কি-যেন-কি মগ্ন হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কি-যেন হইয়া যাইব; কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি—মনের কোন যায়গায় কোন রূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোন ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সঙ্গীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চূণ খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যে দিন চাঁদ উঠে সে দিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক্, দেখি তাহাতে কিরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধুভাষায় পরস্পরসম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিতস্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোন প্রকার স্বপ্নই টিঁকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্সিওরেন্সের টাকা, ধোবার কাপড় দিতে বিলম্ব, প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোন বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোন পূর্ব্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া

গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি নীরব চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা, এবং নীরব কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া "কে-যেন" "কি-যেন" আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কি করিব? কি করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানে; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য। আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়—কি করিলে একটি "কে-যেন" একটি "কি-যেন" পাওয়া যায়!—

সফলতার দৃষ্টান্ত।

হরি হরি! আমার কি হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি!

কিছু দিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক অঙ্গুলি এই চাঁপা গুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পারে কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনো

লাগিয়া আছে ? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালবাসা, হরি হরি কত প্রেম !

রোজ মনে করি আজ দেখিব—এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব—এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না !

কেমন করিয়া ধরিব ! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব ! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জ্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ হৃদয় তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া ?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই—অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই—একদিন প্রত্যুষে উঠিলাম।

দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে !"

সে তৎক্ষণাৎ কহিল "বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম !"

আমি কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "প্রবঞ্চনা করিস্‌না রে জগা, সত্য করিয়া বল্‌—এ তোড়া তোকে কে দিল !"

সে কহিল "প্রভু এ আমি নিজে বানাইয়াছি !"

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম—"আমার মাথা খাইস্‌ জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস্‌ না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল্‌ !"

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল-উচ্চারণমিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল—"প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তের রচনা।"

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা—আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদ্গদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন—"এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস্‌, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস্‌ জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস্‌ না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস্‌ না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস্‌ না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক্‌ !"—

জগা ত চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল—বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কি হইল। কি যেন আমাকে কি করিল! কে যেন আমাকে কি বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি। কেবল যেন এই তোড়াটি—এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি—আমার কাছে চিরজীবনের মত কি যেন কি হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনি জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কি যেন কি দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রক্ষণমূলক সাদৃশ্য।

পশু, পক্ষী, পতঙ্গদিগের সাধারণ বর্ণের সহিত তাহাদিগের আবেষ্টনের একটি অতি আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তুষার ধবলিত মেরু প্রদেশেই শ্বেত ভল্লুক, শ্বেত শশক, শ্বেত শ্যেন, শ্বেত শৃগাল প্রভৃতি বিচরণ করে। মরুভূমি ও পার্ব্বত্য প্রদেশের হরিদ্রাভ বা ধূসর বর্ণ সমাবিষ্ট আবেষ্টনের মধ্যেই জেব্রা, জিরেফ, হরিণ, আণ্টিলোপ, সিংহ, উষ্ট্র কাঙ্গেরু মার্জ্জার প্রভৃতি পীত ও ধূসর বর্ণের জন্তু বাস করে। মারব সর্প, গোধিকা গিরগিট প্রভৃতি সরীসৃপ ও পক্ষীরা মৃত্তিকা বা বালুকার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উষ্ণ প্রধান প্রদেশে যেখানে শ্যামল তরুলতা পল্লবের হরিৎ বরণে ভূ-পৃষ্ঠকে নয়নারাম ও সুশোভন করিয়া রাখে সেখানে সমুদয় পক্ষী জাতির আদিম ও প্রধান বর্ণ সবুজ। নিশাচর সন্ধ্যার পাংশু বর্ণের বা রাত্রির আঁধারের সহিত কেমন মিশিয়া থাকে। মূষিক, পেচক, গন্ধমূষিক, বাদুড়, চর্ম্মচটিকা প্রভৃতি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।

সুনীল সাগর গর্ভের জন্তুদিগের মধ্যে যাহারা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত উপরিভাগে চরিয়া বেড়ায়, তাহাদের পৃষ্ঠদেশ নীলাম্বুর ন্যায় সুনীল, আর যাহারা জলের মধ্যেই থাকে, তাহারা অনেকে নির্ম্মল জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও রজত বর্ণের হয়। আবার যে সকল মৎস্য কর্দ্দম বা পাহাড়ের নুড়ি ও কুচির মধ্যে অথবা বালুকার মধ্যে বাস করে, তাহারা প্রায়ই যথাক্রমে স্ব স্ব আবেষ্টনের বর্ণেরই হইয়া থাকে। জন্তুনিচয়ের

এই অত্যাশ্চর্য্য বর্ণসন্নিবেশের সামঞ্জস্য দেখিয়া ইহা যে কেবল আকস্মিক নহে অথবা ইহা যে কোন উদ্দেশ্যবিহীন নহে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে ইহাই স্বভাবতঃ উদিত হয়। আমরা আশা করি আমাদের চিন্তাশীল পাঠক, বর্ত্তমান প্রবন্ধপাঠে দেখিবেন বাস্তবিকই এই সার্ব্বভৌমিক সামঞ্জস্য জীবজগতের প্রধান কল্যাণমূলক এবং ইহা পরিস্ফুট ও সর্ব্বাবয়বপূর্ণ হইতে কত সহস্র বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির সুপ্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অমোঘ ও অপরিহার্য্য প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অনুশাসনে জীব জন্তু পক্ষী পতঙ্গম সরীসৃপ মৎস্য, অহোরহ কার্য্য করিতে করিতে অতি ধীর কিন্তু অচল ও অব্যর্থ পদে শনৈঃ শনৈঃ কত যুগযুগান্তরের অভ্যন্তর দিয়া, কত বিফল প্রয়াস, কত নিশ্চিত বিনাশ, কত জয়, কত পরাজয়ের হস্ত অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের বাহ্য আবেষ্টনের বর্ণগত সামঞ্জস্যে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু এই বাহ্য আবেষ্টনের বর্ণগত সামঞ্জস্যই যথেষ্ট নহে। আমরা দেখিব এই বিশাল জীবজগতে যেখানে বিপুল জীবের সংগ্রাম ক্রমাগত চলিতেছে, যেখানে দুর্ব্বলেরা প্রবলদের অত্যাচার ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত, যেখানে বলের প্রতিরোধে কৌশল অবলম্বন না করিলে দুর্ব্বলের জীবনাশা বিড়ম্বনা মাত্র—সেখানে পক্ষী পতঙ্গম কীট কেমন সুন্দর কৌশল প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে প্রবল নিষ্ঠুর শত্রুর অব্যর্থ হস্ত হইতেও নিরাপদ করিয়া আপন আপন বংশ ধারাবাহিক ক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই অপূর্ব্ব কৌশলশক্তির বিভিন্ন পরিচয়কে আমরা "রক্ষণমূলক সাদৃশ্য" নামে আখ্যাত করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে পাঠক দেখিবেন নিরস্ত্র দুর্ব্বল অসহায় কীটপতঙ্গমেরা পর্য্যন্ত কেমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা বলে কেবল যে আপনাদিগকেই রক্ষা করিয়া আসিয়াছে তাহা নহে, কালের সূক্ষ্ম সূত্র অবলম্বন করিয়া প্রবল জীবনসমরের মহাবিনাশ পথের ভিতর দিয়াও আপন বংশ যথাক্রমে রক্ষা করিয়া বংশশৃঙ্খল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আসিয়াছে।

রক্ষণমূলক সাদৃশ্য আমরা প্রধানতঃ কীট ও পতঙ্গমদিগের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাই। কারণ. ইহাদিগের অপেক্ষা অসহায় জীব খুব অল্পই আছে। চতুষ্পদদিগের মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য কাহারো দ্রুতগামিত্ব আছে, কাহারো প্রচুর শারীরিক বল আছে, কাহারো তীক্ষ্ণ নখ আছে। কাহারো তীক্ষ্ণ ধার দন্ত, কাহারো সুচল শৃঙ্গ, কাহারো শক্ত খুর, কাহারো দুর্ভেদ্য চর্ম্ম আছে। কাহারো বা আপনাদের সতত দলবদ্ধতার উপর নিরাপদ নির্ভর করে। পক্ষীদের অনেকেরই লম্বা চঞ্চু বা তীক্ষ্ণ নখর আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ থাকে। সর্প সরীসৃপ, মৎস্য প্রভৃতির কাহারো বিষ, কাহারো দংশন, কাহারো কণ্টকময় লাঙ্গুল ইত্যাদি এক এক আত্মরক্ষণোপযোগী অস্ত্র আছেই। কিন্তু অধিকাংশ কীট ও পতঙ্গমেরা সম্পূর্ণরূপেই নিরস্ত্র এবং একবারেই কোন রূপ আত্মরক্ষণোপযোগী উপায় শূন্য। অথচ ইহাদিগের শত্রু সংখ্যা অল্প নহে। বলিতে গেলে সমুদয় পক্ষীজাতি কীটভোজী, মর্কট, বানর,

পিপীলিকা, গিরগিটি গৃহগোধিকা, প্রভৃতি সচরাচর পোকা মাকড় ধরিয়াই খাইয়া থাকে, সুতরাং এত অধিক সংখ্যক শত্রুর মুখ এড়াইয়া জীবন ধারণ করিতে হইলে কোনরূপ কৌশল অবলম্বন করা নিতান্তই আবশ্যক। এই জন্যই আমরা এই পতঙ্গ ও প্রজাপতি জগতে ঈদৃশ কৌশলপূর্ণ সাদৃশ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই।

ঈদৃশ সাদৃশ্যের প্রধান উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য প্রথমে একটী দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। দক্ষিণ আমেরিকার দুই স্বতন্ত্র জাতির (Genus) প্রজাপতি দেখিতে পাওয়া যায়, পাপিলিও এবং ডানেইস্। ইহাদের মধ্যে পাপিলিও স্বাদু ও পক্ষীদের ভোজ্য, ডানেইস বিস্বাদ সুতরাং পক্ষীকর্ত্তৃক অভুক্ত থাকে। এরূপ স্থলে যদি স্বাদু প্রজাপতিরা কোন রূপ বাহ্যিকভাবে অর্থাৎ পক্ষ বর্ণ আকার ও গঠনে অভোজ্য অস্বাদু প্রজাপতিদিগের অনুকরণ করিতে পারে তাহা হইলে স্বাদু ভোজ্য হইয়াও অভোজ্যদের ন্যায় সাদৃশ্য উৎপাদন করাতে পতঙ্গভোজী পক্ষীরা ইহাদিগকেও অভোজ্য জ্ঞানে আক্রমণ করে না। সুতরাং এইরূপ বাহ্যিক সাদৃশ্যের অনুকরণ করিয়া স্বাদু জাতি অস্বাদুর ন্যায় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া যায়। পাঠক মনে করিবেন না এইরূপ সাদৃশ্য হয়ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কিম্বা দৈবাৎ কিরূপে হইয়া গিয়াছে। আনুমানিক যে নয়, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কেননা আজও এই দুই স্বতন্ত্র জাতীয় অনুকারক ও অনুকৃত প্রজাপতি দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভোজ্য ও স্বাদু পাপিলিও অভোজ্য ডানেইসদের পোষাক অনুকরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলিয়া ইহাদের সংখ্যা অনেক এবং ইহাদের বাহ্যিক সাদৃশ্য এতই সঠিক যে প্রজাপতি সংগ্রহ কারকেরা এই দুই বিভিন্ন জাতির প্রজাপতিকে এক জাতীয় মনে করিয়া একই শ্রেণীর মধ্যে নিবিষ্ট করেন।

ঈদৃশ অপূর্ব্ব সাদৃশ্য যে বাস্তবিক আকস্মিক নহে ইহারও স্পষ্ট প্রমাণ আছে। কেননা অনুকারক প্রজাপতিরা সাধারণতঃ স্ত্রী-প্রজাপতি, অর্থাৎ স্ত্রী-পাপিলিও ডানেইসের অনুকরণ করে। স্ত্রী-পাপিলিও হইতে পুং-পাপিলিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকারের। কিন্তু এইরূপ আকার ও বর্ণগত বিভিন্নতাযুক্ত স্ত্রী ও পুং পাপিলিও কেবল দক্ষিণ আমেরিকা-তেই দৃষ্ট হয়, কেননা এখানে ডানেইস জাতি অনেক আছে। কিন্তু মাদাগাস্কর দ্বীপে যেখানে বোধ হয় অনুকরণ করিবার কোন আবশ্যক নাই, পাপিলিওর স্ত্রী ও পুরুষ সম বর্ণেরই হয়। সুতরাং যখন স্থানবিশেষে সম আকার ও বর্ণসম্পন্ন স্ত্রী ও পুরুষ জন্মে এবং স্থানবিশেষে স্ত্রী প্রজাপতিরা কোন অভোজ্য জাতি প্রজাপতিদিগের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া আপন আপন পুরুষ-প্রজাপতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া অন্য জাতীয় প্রজাপতির অনুরূপ হইয়া যায়, তখন এইরূপ সাদৃশ্য কখনই বিধাতার খেয়াল নহে এবং তাহা আকস্মিক সামঞ্জস্যও নহে। পরন্তু ইহা প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের অমোঘ বিধানের স্বাভাবিক ফল।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে কিরূপে এইরূপ অপূর্ব্ব সৌসাদৃশ্য সম্ভব হইতে পারে আমরা এক্ষণে তাহাই বিশদ করিবার চেষ্টা করিব। মনে করা যাউক, পূর্ব্বোক্ত জাতীয় দুই প্রজাপতির মধ্যে যাহারা সুখাদ্য ও স্বাদু বলিয়া সচরাচর পক্ষীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় অর্থাৎ পাপিলিওদিগের কোন দূর অতীত বংশধর কোন ঘটনাক্রমে আপনার পক্ষের উপর ঠিক ডানেইসদিগের পক্ষের কতকটা অনুরূপ একটি দাগ করিল। ইহার এই ফল হইতে পারে যে, এই বিশেষ চিহ্নটির জন্য, যে চিহ্ন পাপিলিওদের হইতে স্বতন্ত্র এবং যাহা কতকটা ডানেইসদিগের মত, ঐ বিশেষ পাপিলিওটি স্বজাতীয় অপরাপরের অপেক্ষা শত্রুর আক্রমণ হইতে নিরাপদ হইবে। আমরা বলিলাম ফল হইতে পারে; কেননা না হওয়াও সম্ভব। কিন্তু যদি এইরূপ দু দশটা প্রজাপতি কোনরূপে এরূপ বিশেষ চিহ্ন উদ্ভাবন করিতে পারে, তাহা হইলে সেই দশটির মধ্যে অন্ততঃ একটিরও শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া আমরা খুব সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি। কেননা, সম্ভাবনা বিনাশের দিকেও যেমন খাটিতে পারে রক্ষার দিকেও তেমনি খাটিতে পারে। এখন মনে করা যাক, এইরূপ একটি বিশেষ চিহ্নিত পাপিলিও শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। তারপর ইহা বেশ সম্ভব যে, এই বিশেষ চিহ্নটি উক্ত প্রজাপতি আপন ভাবীবংশকে উত্তরাধিকারী সূত্রে হস্তান্তর করিয়া গেল। পাঠক, ইহা কেবল অনুমান মনে করিবেন না। কারণ বৈজিক নিয়মে পিতামাতার উপকারমূলক বিশেষত্ব অপত্যোই বর্ত্তিয়া থাকে এবং এই নিয়ম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের একটি বিশেষ অঙ্গ। ভাবীবংশ এই বিশেষ চিহ্নটিকে হয়ত আরও পরিস্ফুট-রূপে ডানেইসের চিহ্নের অনুরূপ করিল। ইহার ফল এই হইবে যে, ইহারাও অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা পাইবে। কারণ, পাপিলিও-ভোজী পক্ষীরা এই বিশেষ চিহ্নধারীদিগকে অস্বাদু ডানেইস্ ভ্রমে আক্রমণ করিবে না। তাহা হইলে, এই বংশ পরবংশকে, পরবংশ তৎপরবর্ত্তী বংশকে এইরূপে ধারাবাহিক ক্রমে শতকোটি কোটি বংশের অভ্যন্তর দিয়া সাদৃশ্যকে ক্রমাগত আরও পরিস্ফুট, আরও জীবন্ত, আরও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিয়া লইয়া বর্ত্তমানে ডানেইসের প্রকৃত অনুরূপ পাপিলিও রূপে পরিণত হইয়াছে। অনেক সহস্র সহস্র বৎসর পরে আমরা এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি স্ত্রী-পাপিলিও তিক্ত, বিস্বাদ ডানেইসের কেমন অনুরূপ হইয়া আপনার বংশকে শত্রুর আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে না হউক অনেকাংশে নিরাপদ করিয়াছে। পাঠক! এস্থলে বলা বাহুল্য যে, পাপিলিও এবং ডানেইস সম্পূর্ণরূপে দুই স্বতন্ত্র জাতির প্রজাপতি হইলেও, কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া পাপিলিওর পক্ষে ঈদৃশ অদ্ভুত ও অতি সুন্দর সাদৃশ্য উদ্ভাবন করা ক্ষুদ্র, নিরীহ পতঙ্গম রাজ্যে এক অতি আশ্চর্য্যকর রহস্যপূর্ণ ব্যাপার, এবং ইহার নিগূঢ় মর্ম্মপূর্ণ বিকাশপর্য্যায় একমাত্র বিবর্ত্তনবাদ দ্বারাই বোধগম্য হয়; অন্য কোন মতবাদ এই সুগভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ অতি বিচিত্র জৈবিক দৃশ্যকে বিশদ করিতে পারে না।

উপর্য্যুক্ত সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত এই বিশাল জীবজগতে কেবল একটি নহে। বিভিন্ন জীব-রাজ্যে ঈদৃশ কত সহস্র সহস্র অনুকরণ ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর চতুঃপ্রান্ত হইতে, মহাসাগরের সুগভীর গর্ভ হইতে সহস্র সহস্র রক্ষামূলক সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত বাহির করিতেছেন। আমরা কতিপয় বিশেষ আশ্চর্য্যকর দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

জিওমিটার নামক এক শ্রেণীর প্রজাপতিদিগের পোকা যখন সোজা হইয়া ছোট ডালের উপর বিশ্রাম করে, তখন ইহা দেখিতে ঠিক একটি ছোট শাখা বা উপশাখার মতনই হয়। সাদৃশ্য অতি সুন্দর করিবার জন্য এই পোকারা আপনাদের গাত্রে মধ্যে মধ্যে গুল্মের গ্রন্থির মত উন্নত ও বন্ধুর অংশ উদ্ভাবন করে। ইহারা দেখিতে এমনি অবিকল একটি ক্ষুদ্র শাখা বা উপশাখায় অনুরূপ হয় যে, ইহাদিগকে সাধারণতঃ তন্নিমিত্ত Stick Caterpillars বা খোঁচা পোকা নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। একমাত্র ইংলণ্ডে ইহাদের তিন চারিশত বিভিন্ন বংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ পোকা একটী খোঁচার মতন হইয়া আপনাদের খাদ্যের গাছে বসিয়া থাকে বলিয়া সচরাচর লোকের দৃষ্টিতে পতিত হয় না। আশ্চর্য্য, অনুকরণ জীবন্ত ও প্রকৃত করিবার জন্য, অন্যান্য পোকাদের ন্যায় ইহাদিগের পাঁচ যোড়া পা নাই। ইহাদের কেবল দুই যোড়া পা এবং এই পা গুলি একবারে পশ্চাৎ দিকে। সমস্ত শরীরটি সরু, লম্বা ও গোল। দাঁড়াইবার সময় পশ্চাতের পদচতুষ্টয় দ্বারা গুল্মের কোন শাখাকে দৃঢ় করিয়া ধরে এবং উক্ত শাখার সহিত সূক্ষ্মকোণ করিয়া ঠিক একটি উপ-শাখার মত অচঞ্চল ও ঠিক সমভাবে দণ্ডায়মান থাকে। ইহারা এইরূপ স্থির ভাবে ক্রমাগত অনেক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। ইহাদের এইরূপ দণ্ডায়মান থাকিবার ব্যতি-ক্রম কেবল পত্র ভক্ষণ করিবার সময় ঘটে। কিন্তু রাত্রি বা সন্ধ্যা ভিন্ন অপর কোন সময়ে অর্থাৎ দিবাভাগে ইহারা পত্র ভক্ষণ করে না। সুতরাং দিবার উজ্জ্বল আলোকেও ইহারা যেরূপে ঠিক একটি কাটির মত হইয়া সোজা ও স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, ইহাদিগকে জীবন্ত পোকা বলিয়া চিনিয়া উঠা মানুষের মত সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির পক্ষেই অসম্ভব, পক্ষী কিম্বা অপরাপর জীবের কি কথা। পাঠক, আরো আশ্চর্য্য কৌশল দেখুন। এই খোঁচা পোকা আপনার অস্থিবিহীন কোমল তনুযষ্টিকে ঈদৃশ অচঞ্চল ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারিবে বলিয়া আপনার লালা দ্বারা এক থাই অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করে। এই তন্তু সহযোগে গুল্মের সহিত নিজের মস্তককে বাঁধিয়া রাখে। এইরূপ বাঁধা না থাকিলে ইহার কোমল শরীর যষ্টি খোঁচার মত স্থির ও সোজা রাখা কত কঠিন হইত; ইহা হইতেই সহজেই বোঝা যায় যদি ছুরিকা দ্বারা এই উর্ণা সূত্রটিকে কাটিয়া দেওয়া যায় পোকা তৎক্ষণাৎ নুইয়া পড়িয়া যায়। ইহাদিগের সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ মুখ ও মস্তক এমনি বিশেষরূপে গঠিত যে, দেখিলে সহসা বোধ হয় যেন কোন একটা

শাখার অগ্রভাগ, যেখান হইতে নব মুকুল মুকুলিত হইবার উপক্রম হইতেছে। এই ক্ষুদ্র কীটের পক্ষে এই সাদৃশ্য উদ্ভাবনটিও অতীব আশ্চর্য্যজনক। বস্তুতঃ এই খোঁচা পোকা বা যষ্টিপোকা সর্ব্বাংশে এতই একটি ক্ষুদ্র শাখার অনুরূপ যে অনেক সময়ে আমাদের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দেয়। লেখকের এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিলাতে একটি প্রজাপতি বিক্রেতার দোকানে একবার এই খোঁচা-পোকা কিনিতে গিয়াছিলেন। তিনি মূল্য দিবার পর বিক্রেতা তাঁহাকে যখন তাহার গ্লাসকেস হইতে একটি খোঁচা-পোকার নমুনা বাহির করিয়া দিল, তিনি অস্পষ্ট আলোকে ভালরূপে না দেখিতে পাইয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন বিক্রেতা একটা শুষ্ক কাটি দিয়া তাঁহাকে বুঝি প্রতারণা করিল। তৎ-পরে ভাল করিয়া দেখিয়া যখন উহার পশ্চাৎভাগের পদগুলি দেখিতে পাইলেন তখন তাঁহার সন্দেহ দূর হইল।

আমাদের দেশে খোঁচা-পোকার মত অনুকারক কীট প্রচুর আছে। সচরাচর তাহা-দের ছদ্মবেশের জন্যই তাহারা আমাদের অলক্ষিত থাকে। এক প্রকার কীট অড়র কলাইয়ের পত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা অনুকারক কীটের একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত। শুষ্ক শুঁটির অভ্যন্তর হইতে বীচি বহির্গত হইয়া গেলে গাছে বোঁটার সহিত সংলগ্ন থাকিয়া দুটি বিভক্ত খোসা যেমন কোঁকড়াইয়া এক রকম ভাবে থাকে, এই পোকা যখন বিশ্রাম করে তখন ঠিক তদনুরূপ অবস্থায় অবস্থান করে! ইহার বর্ণও ঠিক শুক্‌নো অড়র সুটির মত কালো কালো, মেটে মেটে। শরীর, পা, মাথা সব ছড়া-ইয়া ঠিক একটি বীচি বেরোনো সুটির খোসার মত গাছে ঝোলে। সাদৃশ্য এত চমৎকার যে, একদিন লেখক এইরূপ অবস্থাপন্ন একটি পোকার, আধ হাত অনুমান তফাতে দাঁড়াইয়াও বুঝিতে পারেন নাই যে উহা একটি জীবন্ত পোকা।

পাঠক, যদি একটু অনুসন্ধায়ী হইয়া সময়ে সময়ে উদ্যানস্থ গোলাপ গাছের পত্রের মধ্যে মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে হয়ত কোন দিন দেখিতে পাই-বেন অপর পাঁচটা শুষ্ক গোলাপ পত্রের মত একটা কি জিনিস রহিয়াছে। সর্ব্বাংশে শুষ্ক গোলাপ পত্র বই ইহাকে আর কিছুই বলিয়া অনুমিত হইবে না। কিন্তু উহা বস্তুতঃ একটি অনুকারক পোকা। গোলাপের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। শত্রুকে প্রতারিত করিবার জন্য অনেক সহস্র সহস্র বৎসরের অধ্যবসায়ের পর এখন ভক্ষ্য বৃক্ষের শুষ্ক পত্রানুরূপ হইয়া অনেক পরিমাণে শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায়। আমরা এই গোলাপ গাছের যে অনুকারক কীটটির কথা বলিতেছি, ইহা গোলাপের অন্যান্য শুষ্ক পত্রের সহিত মিশিয়া এমনি এক হইয়াছিল যে, এক হস্ত দূরে থাকিয়াও উজ্জ্বল দৃষ্টিবিশিষ্ট তিন চারি জন যুবক তাহাকে শুকানো পাতা বলিয়া ঠাহরাইয়াছিলেন।

প্রত্যক্ষ না দেখিলে এই সব জীবন্ত সাদৃশ্যের প্রকৃত অনুরূপতা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বাস্তবিক, পত্র, মুকুল, পুষ্প, বল্কল প্রভৃতির সহিত আপনার সাদৃশ্য মিশাইয়া

কত কোটি কোটি অগণ্য কীট আপনার ক্ষুদ্র জীবনের স্বল্প পরিসরকাল সম্ভোগ করিয়া যায়, আমরা তাহার একটিরও তত্ত্ব রাখি না, তাহাদের একটিও সহসা আমাদের নেত্র-গোচর হয় না। পূর্ব্বোল্লিখিত খোঁচা-পোকা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কীটতত্ত্ববিদ্ Mr. Jenner Weir বলিয়াছেন—"ত্রিশ বৎসর কাল কীটতত্ত্ববিদ্ হইয়াও আমি ভ্রমক্রমে কাঁচি লইয়া একদা একটি খোঁচা-পোকাকে একটা কণ্টক মনে করিয়া কাটিতে গিয়াছিলাম। পরে জানিতে পারিলাম ইহা দুই ইঞ্চ পরিমাণ একটি খোঁচা-পোকা (Geometer moth), আমি আমার পরিবারের সকলকে ইহা দেখাইয়াছিলাম এবং এই চার ইঞ্চ পরিমাণ স্থানের মধ্যে সেই কীটটি আছে বলিলেও কেহ ইহাকে কীট বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারেন নাই।"

জাবা ও লঙ্কা দ্বীপে চলন্ত পত্র (Walking leaf) নামে এক প্রকার পত্রানুকারক কীট আছে। ইহাদের শরীর এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে পত্রবৎ রঞ্জিত ও শিরাবিশিষ্ট, এবং পদ ও বক্ষের উপর পত্রানুরূপ ঈদৃশ প্রশস্ত অংশ থাকে যে, ইহারা যখন আপনাদের খাদ্যগুল্মের উপর বসিয়া থাকে, তখন দশজনের মধ্যে একজন লোকও ইহাদিগেকে চিনিতে পারে কি না সন্দেহ। অন্য এক শ্রেণীর কীটেরা আপনাদের হস্ত পদ অসম-ভাবে ছড়াইয়া একটি শুষ্ক কাটির মত হয়। ইহারা কাটির গাত্রের গ্রন্থি ক্ষুদ্র শাখা, ও শৈবাল পর্য্যন্ত অবিকল অনুকরণ করে। বৃদ্ধ ওয়ালেস পর্য্যন্ত অনেক সময়ে এরূপ শুষ্ক কাটির অনুরূপ শৈবাল ও গ্রন্থিসম্পন্ন, ধূর্ত্ত ও জীবন্ত কীটকে প্রকৃত কীট বলিয়া নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইতেন। তিনি তাঁহার "ডারুইনিস্‌ম্" গ্রন্থে লিখিয়াছেন "আমি অনেক সময়ে একটি প্রকৃত কাটি আর এরূপ অনুকারী কীটের পার্থক্য বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। অবশেষে যখন হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বুঝিতাম যে ইহা জীবন্ত পদার্থ, তখন সন্তুষ্ট হইতাম।" আর এক জাতীয় পোকারা শুষ্ক পত্রের যত প্রকাব বর্ণ ও গঠন হয় তদনুরূপ হইয়া থাকে। অন্য শ্রেণীর কীটেরা, শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড আর্দ্র ভূমিতে পড়িয়া থাকিলে যেরূপ এক প্রকার শৈবাল তাহাদের উপর জন্মে, ঠিক সেইরূপ অর্দ্ধ স্বচ্ছ হরিৎ শৈবাল আপনাদের গাত্রোপরি উৎপন্ন করে। দেখিলে শৈবাল ব্যতীত আর কিছুই বলিয়া প্রতীত হয় না। ঈদৃশ সাদৃশ্য কিরূপে শত্রুদিগকে প্রতারিত করিয়া অনু-কারক কীটদিগকে রক্ষা করে, তৎসম্বন্ধে একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। মিষ্টার বেল্ট্ নিকারাগোয়ার দুর্দ্দান্ত দস্যুসম যে এক শ্রেণীর পিপীলিকাদের কথা বলিয়াছেন ইহারা অতিশয় নিষ্ঠুর এবং যে কোন কীট পতঙ্গ সম্মুখে পায়, তাহারি প্রাণ বধ করে। বেল্ট্ এই পিপীলিকাদের বিষয় বলিতে বলিতে একস্থানে বলিয়াছেন, "আমি একটি হরিৎপত্র সদৃশ পতঙ্গমের ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। সে অচল ভাবে দস্যুপ্রকৃতি পিপীলিকা রাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক পিপী-লিকাই ইহার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল, তথাপি জানিতে পারিল না যে তাহাদের

এত নিকটে খাদ্য রহিয়াছে। অচঞ্চল ভাবে থাকাতেই উহার নিরাপদতা, এই সহজ জ্ঞান ইহাতে এরূপ বদ্ধমূল ছিল যে, আমি যখন হস্তদ্বারা ইহাকে তুলিয়া লইলাম, এবং পরে আবার যথাস্থানে পিপীলিকাদের মধ্যে রাখিয়া দিলাম, ইহা একবারও পলাইবার জন্য একবিন্দুও চেষ্টা করিল না।”

মিষ্টার এ এভারেট্ একটি শৈবাল কীট পাইয়াছিলেন। তাঁহার ভৃত্য উহাকে লইয়া অন্যান্য বস্তুর সহিত রাখিয়া দিয়াছিল। এভেরেট্ সেই কীটকে একটু শৈবাল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে নড়িতে দেখিয়া, ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহার সর্ব্বাবয়ব সূক্ষ্ম কেশাচ্ছাদিত; সাধারণ বর্ণ সবুজ, তাহার উপরে দুটি ছোট লাল চিহ্ন। ইহা অতি ধীরে ধীরে গমন করে এবং যখন ভক্ষণ করে তখন মস্তকটি একটা মাংসল আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। সুতরাং তৎকালে কেহ উহার আহার দেখিতে পায় না। পাহাড়ে যেখানে প্রচুর শৈবাল জন্মে সেইখানেই এরূপ শৈবাল কীট বাস করে। সুতরাং চতুষ্পার্শ্বস্থ শৈবালের সহিত মিশিয়া শত্রুকর্ত্তৃক অনক্রান্ত থাকে।

উপর্য্যুল্লিখিত নানাবিধ অপূর্ব্ব ছদ্মবেশ ব্যতীত, কীটেরা সাধারণতঃ অন্য প্রকারেও আপনাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিয়া থাকে। যে কীটেরা বৃক্ষের ত্বকোপরি বাস করে, তাহারা সেই বৃক্ষের ত্বকানুরূপ বর্ণ আপনাদের ক্ষুদ্র দেহোপরি উদ্ভাবন করিয়া উহার সহিত মিশিয়া থাকে। যাহারা তৃণভোজী, তাহারা তৃণ শষ্পের লম্বালম্বি শিরার অনুরূপ করিয়া আপনাদিগের শরীরের ডোরা ডোরা চিহ্নকে দৈর্ঘিক ভাবে উদ্ভাবন করে। তাহাতে তৃণের শিরার সহিত কীটদের দেহের ডোরাগুলি সমান্তরাল হয়। পত্রভোজীরা পত্রের প্রান্তিক শিরা বিন্যাসের ন্যায় আপনাদের দেহোপরি আড়াআড়ি ভাবে শিরা-চিহ্ন প্রকাশ করে এবং এইরূপ সামঞ্জস্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া আপনাদিগকে অনেক পরিমাণে নিরাপদ করিয়া রাখে। অভিনিবেশ পূর্ব্বক পরিদর্শন করিলে অনেক স্থলে ইহাই দেখা যায় যে, কীটেরা প্রায়ই যে যে লতা, গুল্ম বা বৃক্ষের পত্র অথবা তৃণ ভক্ষণ করে, কিম্বা যাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করে, সে সেই লতা, গুল্ম বৃক্ষ বা তৃণের পত্র, পুষ্প বা ত্বকের বর্ণ বা আকার প্রকারের অনুরূপ সাদৃশ্য উদ্ভাবন করিয়া তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। এই নিমিত্ত অসংখ্য অসংখ্য কীট পতঙ্গ আমাদিগের চতুষ্পার্শ্বে প্রত্যেক গুল্ম, লতা, বৃক্ষ, তৃণের মধ্যে বিচরণ করিলেও আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয় না। আমরা যে এতই তীক্ষ্ণদৃষ্টিধারী জীব, আমাদেরও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে প্রতারিত করিয়া অগণিত কীট অলক্ষিতভাবে আপন আপন অতি স্বল্পস্থায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। বাস্তবিক এই সাধারণ আবেষ্টনের বর্ণ-সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য কিরূপে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল বর্ণবিচিত্রতা-সমন্বিত কীটদিগকে আমাদিগের সহজ দৃষ্টি হইতে লুক্কায়িত করিয়া রাখে, আমরা যখন কোন একটি ঈদৃশ ভাবে সুরক্ষিত কীটকে

তাহার আবেষ্টন হইতে তুলিয়া লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে কিম্বা হস্তোপরি স্থাপন করি, তখনি তাহা কতক পরিমাণে অনুধাবন করিতে পারি। কেননা তখন স্বতঃই এই আশ্চর্য্যের ভাব হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া দেয় যে,; কিরূপে এমন সুন্দর বিচিত্র কীট এতক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকে প্রতারিত করিয়া অলক্ষিত ছিল। একদা লেখক এবং অন্য চার পাঁচ ব্যক্তি একটি পূর্ণায়তন তসর-কীটকে একটি ফুল-ডালে রাখিয়া উহার গুটি-গঠন কার্য্য দেখিবার মানসে উহার গতিবিধি বিশেষ মনোযোগ সহকারে অবলোকন করিতেছিলেন। কার্য্যোপলক্ষে, সকলকেই একবার ক্ষণকাল তরে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল। সকলে ফিরিয়া আসিয়া সেই অত্যুজ্জ্বল হরিৎবর্ণসমন্বিত এবং স্বর্ণচিহ্নবিশিষ্ট নধরকায়, হৃষ্ট পুষ্ট ছয় ইঞ্চ্ দৈর্ঘ্যের পোকাটিকে দেখিতে গেলাম। একটি ক্ষুদ্র ফুল ডালের পত্রের মধ্যে কীটটি বিচরণ করিতেছিল। চার পাঁচ জনের তীক্ষ্ণ চক্ষু দ্বারা দুই মিনিট কাল সেই ক্ষুদ্র ডালটির চতুঃসীমা মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহাকে দেখিতে পাই নাই। অবশেষে পাতা ও ক্ষুদ্র ডাল নাড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেখা গেল একস্থানে তত বড় আর তেমন উজ্জ্বল বর্ণের পোকাটি আপনার মনের সাধে অসতর্কিতভাবে পত্র চর্ব্বণ করিতেছে। আবেষ্টনের সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য অসহায় নিরস্ত্র কীটদিগকে এমনি আশ্চর্য্যরূপে লুকাইয়া রাখে। আমরা পরে দেখিব কেবল এই ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গম, প্রজাপতি নহে, বৃহদায়তন জন্তুরাও এই সাধারণ আবেষ্টনোপযোগী বর্ণসাদৃশ্য অনুকরণ করিয়া অনেক সময়ে শত্রু বা শীকারের দৃষ্টিকে প্রতারিত করে।

ঊর্ণনাভগণ অনেক সময়ে অতি সুন্দর অনুকারকের দৃষ্টান্ত হইয়া থাকে। সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন মাকড়সা নানা আকারের ও নানা বর্ণের হইয়া থাকে। যাহারা সর্ব্বদা শ্যামল লতা পত্রের মধ্যেই বিচরণ করে, তাহারা প্রায়ই সবুজ; যাহারা শুষ্ক পত্র বা বৃক্ষের ত্বকের উপর সচরাচর থাকে, তাহাদিগের বর্ণ ধূসর বা কৃষ্ণ। পরন্তু, লূতাগণ অধিকাংশ সময়েই আপন আপন আবেষ্টনের অনুরূপ বর্ণবিশিষ্ট হয়। কিন্তু সকল জাতীয় ঊর্ণনাভগণ ঈদৃশ সাধারণ ছদ্মতাতে সন্তুষ্ট হয় না। কেহ কেহ স্বকীয় শীকার আক্রমণের সুবিধার জন্য অতি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যপূর্ণ অনুকরণ করিয়া থাকে। ব্রাজিল দেশে এক জাতীয় লূতা শীকার ধরিবার জন্য পুষ্প বা মুকুলের মত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোন দুর্ভাগ্যবান মক্ষিকা বা কীট অথল অমল পুষ্পভ্রমে তদুপরি উপবেশন করিলে, ধূর্ত্ত, নিষ্ঠুর লূতা তাহাকে আক্রমণ করিয়া স্বীয় আহার সম্পন্ন করে। মিষ্টার বেট্‌স্ লিখিয়াছেন এই লূতাগণ উজ্জ্বল লোহিত ও পাটলবর্ণ দ্বারা সুশোভিত কোন একটি পত্রের বৃন্তমূলে গুড়ি মারিয়া পুষ্প-কোরক সদৃশ হইয়া থাকে এবং এইরূপ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়া আপন ভক্ষ্য কীটদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত করে। গ্র্যাণ্ট আলেন্ এই জাতীয় অনুকারক ঊর্ণনাভ সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

"গর্হিত অনুচিকীর্ষাবৃত্তির এই নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বীভৎস। একটী

পুষ্প-কোরক শিশুর মত নির্ম্মল, অকলঙ্ক। হত্যা ও লুণ্ঠনোদ্দেশ্যে তাহার রূপ ধারণ করা লূতাজগতের শঠতার হীনতম বিকাশ।"

আর এক জাতীয় লূতা জাবা দ্বীপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পক্ষীর পরিত্যক্ত মলের অনুকরণ করে। মিষ্টার, এইচ, ও ফর্ব্‌স্‌ যিনি স্বয়ং ঈদৃশ অনুকারক মাকড়সাকে দেখিয়া ইহাদের অদ্ভুত কৌশল বিকাশের কথা বর্ণন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাঁহার কথা অনুবাদ করিয়া দিলাম। তিনি একদা জঙ্গলের মধ্যে একটি বৃহৎ প্রজাপতির অনুসরণ করিতে করিতে একটা প্রকাণ্ড ঝোপের সম্মুখীন হইলেন। তথায় দেখিলেন একটি পাতার উপর একটা প্রজাপতি পক্ষীর মলের উপর বসিয়া রহিয়াছে। ফর্ব্‌স্‌ বলিতেছেন ;—

"আমি অনেক সময়েই দেখিয়াছি এইরূপ নীলবর্ণ প্রজাপতিরা মৃত্তিকার উপর, ঐরূপ চিহ্নের (পরিত্যক্ত মলের) উপর বসিয়া থাকে। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম এরূপ সুন্দর ও মার্জ্জিত প্রজাপতিরা কিরূপে ঈদৃশ অখাদ্য ভক্ষণ করে। বর্ত্তমানে, এই প্রজাপতিটি কি করিতেছিল জানিবার জন্য আমি ধীরে ধীরে আমার জাল বাগাইয়া ইহার নিকটবর্ত্তী হইলাম। আমি ইহার অতি সন্নিকটে গেলাম, এমন কি হস্তদ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিলাম, তথাপি সে নড়িল না। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, তুলিয়া লইবার সময় ইহার শরীরের কিয়ৎ অংশ সেই মলের সহিত সংলগ্ন রহিয়া গেল। আমি উহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম এবং পরে চট্‌চটে কিনা জানিবার জন্য হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলাম। তখন বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ মনে বুঝিতে পারিলাম যে, যাহাকে এতক্ষণ পক্ষীর মল বলিয়া আপন চক্ষুকে প্রতারিত করিয়াছিলাম, তাহা জীবন্ত, রঞ্জিত, মাকড়সা বই আর কিছুই নহে। উহা আপন পৃষ্ঠের উপর শুইয়া রহিয়াছে, পা গুলি গুটাইয়া দেহের উপর সন্ন্যস্ত করিয়াছে।"

তদনন্তর ফর্ব্‌স্‌ এই চতুর ঊর্ণনাভ কেমন করিয়া অতি সম্পূর্ণরূপে মলের অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বিশিষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন মলের অনুরূপ হইবার জন্য কিরূপে মাকড়সার শরীরের ভিন্ন অংশ ভিন্ন বর্ণের হইয়াছে। এমন কি পক্ষীদের মলের সহিত যে জলীয় অংশ থাকে, তাহা যেমন পত্রের উপর গড়াইয়া যায়, শঠ লূতা আপনার তন্তু দ্বারা যখন পত্রের সহিত আপনাকে বদ্ধ করে, তখন সেই তন্তুগুচ্ছকে এমনি করিয়া প্রস্তুত করে যে, উহা অবিকল গড়ান জলের মতই দেখায়!

অস্মদ্দেশে এক প্রকারের পক্ষ বিহীন মক্ষিকা (Mantis) আছে। ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও বর্ণ এমনি যে, যখন কোন বৃক্ষের বা গুল্মের শাখাসীন হইয়া থাকে, তখন ইহারা ঠিক একটি ফুটন্ত অর্কিডের মত প্রতীত হয়। মক্ষিকাটির সর্ব্বাবয়ব উজ্জ্বল গোলাপি বর্ণের। উহার বৃহৎ ডিম্বাকার উদর অর্কিডের ওষ্ঠের (Labellum)

মত। উভয় পার্শ্বে, পশ্চাতের পদ গুলি এবং জঙ্ঘা অত্যধিক পরিমাণে প্রশস্ত ও পরিসর বিশিষ্ট হইয়া অর্কিডের দলের ন্যায় দেখায়। আর, উহার স্কন্ধদেশ ও সম্মুখস্থ পদ উক্ত পুষ্পের বৃতি ও 'স্তম্ভ' সদৃশ হয়। (অর্কিডের বিশেষরূপে সংযুক্ত পুংকেশর ও গর্ভকেসরকে উহার, 'স্তম্ভ' বা Column বলে)। ইহা আপনার ঈদৃশ সৌসাদৃশ্য-পূর্ণ-দেহকে অচঞ্চল ভাবে উজ্জ্বল হরিৎ পত্রপুঞ্জের মধ্যে সন্ন্যস্ত করিয়া রাখে। অবশ্য উহার সুরঞ্জিত দেহই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিকশিত ও আকর্ষণীয়। সে ফুটন্ত রমণীয় পুষ্প সদৃশ হইয়া থাকে বলিয়া অবোধ প্রজাপতি কিম্বা অপর কোন অল্পচতুর কীট তদুপরি উপবেশন করিতে যায়। ধূর্ত্ত মাণ্টিস সেই অবসরে উহাদিগকে আক্রমণ করে। একদা জনৈক উদ্ভিদবেত্তা পেগুর সন্নিকটে ঈদৃশ একটি অনুকারক মাণ্টিস দেখিতে পান। তিনি মুহূর্ত্ত কাল এই জীবন্ত মক্ষিকাকে একটি অর্কিড পুষ্প বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত উর্ণনাভ ও মাণ্টিসের সাদৃশ্য-দৃষ্টান্তকে রক্ষণ-মূলক না বলিয়া প্রকৃতি তত্ত্ববিদেরা আক্রমণাত্মক (aggressive) সাদৃশ্য বলিয়া অভিহিত করেন। কেননা এইরূপ সাদৃশ্যের ভাণ করিয়া ইহারা অপরাপর অল্প চতুর কীট পতঙ্গকে প্রলুব্ধ করতঃ আপনাদের জীবন্ত ফাঁদে নিপাতিত করে এবং পরে উহাদের প্রাণ-সংহার করিয়া স্ব স্ব আহার কার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু জীবজগতে এরূপ আক্রমণাত্মক সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত আজও বড় অধিক পরিমাণে জানা নাই। উর্ণনাভ ও মাণ্টিসের দৃষ্টান্ত ব্যতীত আর কোন আক্রমণাত্মক সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত আমরা জানি না। ওয়ালেস বলেন যদি উষ্ণ প্রধান দেশে মনোযোগ সহকারে অন্বেষণ করা যায়, সম্ভবতঃ আরো অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে।

অনেক চতুর খাদ্যকীট খাদককে ঠকাইবার জন্য তাহার অনুরূপ সাদৃশ্য উদ্ভাবন করিয়া নির্ভয়ে শত্রুর সহিত একত্রে বিচরণ করে। এক প্রকার বোলতা এক শ্রেণীর উইচিংড়া বধ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন কোন উইচিংড়া ঠিক বোলতার ন্যায় আকারগত সাদৃশ্য অনুকরণ করে এবং তখন শত্রু বোলতার সহিত নিরাপদে একত্রে বিচরণ করে। প্রতারিত বোলতা আপন খাদ্য চিনিতে পারে না। ওয়ালেস বোর্ণিও দ্বীপে ঈদৃশ বোলতার মত উইচিংড়া দেখিয়াছেন। অন্যেরা আবার খাদ্য-কীটের মত সাজিয়া স্বচ্ছন্দে উহাদের সহিত মিলিত হয় এবং অবসর ক্রমে আপন উদর পূর্ণ করিয়া চলিয়া যায়। খাদ্য-কীটেরা খাদক কীটকে চিনিতে পারে না। এক জাতীয় শঠ মাণ্টিস (উপরোল্লিখিত অর্কিড-অনুকরণকারী মাণ্টিস নহে।) বল্মীকের অনুরূপ হয় এবং উইপোকার সহিত অপরিজ্ঞাত ভাবে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে উহাদের কোমল শিশু সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিয়া চলিয়া আসে। অবোধ উই ছদ্মবেশী মাণ্টিসের ধূর্ত্ততা ধরিতে পারে না। এক জাতীয় মক্ষিকারা মৌমাছির ন্যায়

দেখিতে হয়। ইহারা সন্ধ্যার আঁধার ছায়ায় চতুর মধুমক্ষিকাদিগকে ঠকাইয়া তস্করের ন্যায় অতি ধীর ও সতর্কিত ভাবে মধুক্রমে প্রবেশ করে এবং সুযোগ বুঝিয়া মধু-মক্ষিকাশাবক ইচ্ছামত ভক্ষণ করিয়া প্রস্থান করে। রক্ষী-মৌমাছিরা চোর ধরিতে পারে না।

বোল্‌তা, ভিমরুল, মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতিদিগের কোন না কোন আত্মরক্ষণো-পযোগী অস্ত্র আছে। সুতরাং ইহারা সহসা কাহারো কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় না। যদি আর কোন কীট ইহাদের কাহারো বাহ্য আকারগত সাদৃশ্য অনুকরণ করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা অনুকৃতের ন্যায় অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইবে। এইজন্য আমরা কোন কোন নিরস্ত্র ও নির্দ্দোষ স্বভাব কীটকে আত্মরক্ষণক্ষম কীটদের অনুকরণ করিতে দেখিতে পাই। এক জাতীয় গুব্‌রে পোকা আপনাদের স্বাভাবিক স্থূল, গোল, কদর্য্য দেহকে এমনি সুন্দররূপে বোলতার সুঠাম, সুন্দর, তিলাকার ও সর্ব্বাবয়বের সামঞ্জস্যপূর্ণ দেহা-নুরূপ করিয়াছে এবং উহার উর্দ্ধ ও অধোদেহের যোজকস্বরূপ অতি চমৎকার ও প্রসিদ্ধ সূক্ষ্ম কোটিদেশটি পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়াছে যে দেখিলে আশ্চর্য্য না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু এই অনুকরণ কেবল আকারেই বদ্ধ নহে। বোলতা যেমন কাহারো কর্ত্তৃক ধৃত হইলে হুল ফুটাইবার জন্য পশ্চাদ্দেশ বক্র করে, এই অনুকারক গুব্‌রেপোকাও যখন হস্তদ্বারা ধৃত হয়, বারম্বার বোলতার মত শরীরের অধোভাগকে নত করিয়া হুল ফুটাইবার ভাণ করে। যেন হুল ফুটাইয়া তোমাকে দংশন করিবে এইরূপ ভয় দেখায়। বোর্ণিও দ্বীপে ওয়ালেস এক জাতীয় কৃষ্ণকায় বৃহৎ বোলতা দেখিয়াছিলেন। উহাদের পক্ষের প্রান্ত ভাগে খানিকটা শুভ্র দাগ আছে। এক প্রকারের গুব্‌রেপোকা এই বোলতার অনুকরণ করিতে যাইয়া আপন পক্ষের উপর ঠিক ঐরূপ শুভ্র চিহ্ন পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিয়াছে। এবং ঐ বোলতা যেমন সর্ব্বদা আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া রাখে ইহাও তদ্রূপ অভ্যাস সাধন করিয়াছে। অন্য আর এক প্রকারের কীট কাঁকড়া বিছার অনুরূপ। ইহারা যদিও প্রকৃত কাঁকড়া-বিছার ন্যায় বিষাক্ত নহে, তথাপি ইহাদিগকে স্পর্শ করিলেই কুঞ্চিত কাঁকড়া-বিছার ন্যায় পশ্চাদ্দিকে লাঙ্গুল গুটাইয়া দংশন করিবার ভাব দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক ইহারা নিতান্তই নিরীহ কীট; তথাপি হাব-ভাব দেখিলে কেবল যে ক্ষুদ্র শিশুরাই ভীত হয় তাহা নহে, কুক্কুট-শাবক, ছোট ছোট পক্ষী ইহাদের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া যায়। আমাদের ভ্রমরেরা নিতান্ত নিরীহ। কিন্তু আরণ্য মধুমক্ষিকার ন্যায় বোঁ বোঁ করিতে পারে। ইহারা সূর্য্যালোকে মৌমাছির ন্যায় শব্দ করিতে করিতে নির্ভয়ে উড়িয়া বেড়ায়। কিন্তু যখন কোনরূপে উত্যক্ত হয়, ইহা ক্রোধের ভাব দেখায় এবং যেন তোমার মুখের উপর ছোঁ মারিয়া দংশন করিবে এইরূপ ভয় প্রদর্শন করে। অনেক গুব্‌রে পোকা শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ঠিক মৃতের ন্যায় নিশ্চল ভাবে পড়িয়া থাকে। এইরূপেই তাহারা সুরক্ষিত।

রক্ষণমূলক সাদৃশ্যের অত্যুৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা প্রজাপতিদিগের মধ্যেই দেখিতে পাই। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই আমরা এক জাতীয় স্বাদু প্রজাপতির উল্লেখ করিয়াছি যাহারা আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন জাতীয় অস্বাদু ও অভোজ্য প্রজাপতির অনুরূপ হয়। ইহাদিগের বাহ্যিক সাদৃশ্য এতই প্রকৃতরূপে সম্পূর্ণ যে বিজ্ঞ বিজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদেরাও অনেক সময়ে ইহাদের সাদৃশ্য-ভেদ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। বাস্তবিক অনুকারক স্ত্রী-পাপিলিও এবং অনুকৃত ডানেইসের বাহ্যিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া কখনই সহজে তাহাদের পার্থক্য বুঝিবার নয়। কেবল মনোযোগ সহকারে অতি নিকটে রাখিয়া উহাদের আকার ও গঠনগত স্বাতন্ত্র্য পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, অনুকারক ও অনুকৃতদের যে জাতিগত ভিন্নতা আছে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। আমরা এস্থলে আর এক জাতীয় প্রজাপতির অদ্ভুত অনুকরণ শক্তির উল্লেখ করিব। ইহারা শুষ্ক পত্রের অনুকরণ করে। ইহাদের বৈজ্ঞানিক নাম কাল্লিমা। সে এই জীবন্ত সাদৃশ্য উদ্ভাবনে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কাল্লিমা দেখিবার জন্য পাঠককে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। যদি একবার শ্রম স্বীকার করিয়া মিউজিয়মে অমেরু দণ্ডক বিভাগে প্রজাপতি সংগ্রহের মধ্যে মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করেন, তাহা হইলে কাল্লিমা দেখিতে পাইবেন এবং পাঠক তখন নিশ্চয়ই মনে করিবেন তাঁর শ্রম সার্থক হইয়াছে। কোন বর্ণনাতেই কাল্লিমার অপূর্ব্ব সাদৃশ্য-বর্ণনা সম্পূর্ণ হইবে না। আমরা তাই আমাদের প্রত্যেক পাঠককে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি অবসর হইলে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে আসিয়া প্রাণীজগতের এই একটি অতি সুন্দর, অতি অপূর্ব্ব, অতি বিচিত্র এবং অতি সুগভীর মর্ম্মপূর্ণ সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত দেখিয়া আপনাদের চক্ষুকে সফল করিবেন, এবং আমাদের এই বিনীত অনুরোধের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবেন। সৌভাগ্য বশতঃ লেখক কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর বিশেষ অনুগ্রহে দুটি কাল্লিমার নমুনা লাভ করিয়াছেন। সেই দুইটি প্রজাপতি এক্ষণে তাঁর সম্মুখে। কাল্লিমা যদিও পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসী, এই দুইটি নমুনা প্রতীচ্য দেশ হইতে প্রেরিত। অবশ্য প্রাচ্য দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াই লণ্ডনের কীটসংগ্রহকারকদের পণ্যদ্রব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া ক্রেয় বিক্রেয় হইয়াছে এবং আমরাও তাই আমাদের কৌতূহলবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছি। কাল্লিমা প্রধানতঃ মালয় দ্বীপে ও ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বিশেষতঃ সিকিমে প্রচুর পাওয়া যায়। ইহারা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও উজ্জ্বলবর্ণসমন্বিত। পক্ষের তুলনায় ইহাদের শরীর অনেক ক্ষুদ্র। বাস্তবিক 'বৃহৎ' বলাতে ইহার শরীরের কথা কেহ মনে করিবেন না। চারিটি পক্ষ সম আয়তনের সম আকারের, আর বৃহৎ বৃহৎ; কিন্তু সমবর্ণের নহে। পক্ষচতুষ্টয়ের উপরিভাগ অতি নয়ন-তৃপ্তিকর, মনোরম কমলালেবুর বর্ণ, ঈষৎ নীলবর্ণ, গাঢ় ধূসরবর্ণ প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম দ্বারা অতি সুন্দররূপে রঞ্জিত। কিন্তু পক্ষের নিম্নদেশ ঠিক শুষ্কপত্রের বর্ণের। শুষ্কপত্র বলিতে যে কেবল এক রকম ফ্যাকাসে বা মেটে মেটে বর্ণ তাহা নহে।

শুষ্কপত্রের যত প্রকার বর্ণ-ক্রম হইতে পারে, সবই অনুকৃত হয়। শুষ্কপাতার গায়ে যেমন কোথাও ছিদ্র থাকে, কোথাও বা শৈবাল জন্মে, কোথাও বা ছাবকা ছাবকা দাগ, কোথাও বা কোন পোকা কৃত উচ্চ উচ্চ অংশ—এ সমুদয়ই অতি সূক্ষ্মভাবে ও অতি পরিস্কাররূপে পক্ষে উদ্ভাবিত হয়। এইজন্য, ইহাদের কোন দুইটি প্রজাপতির সহিত বর্ণগত সামঞ্জস্য ও তুল্যতা পরিদৃষ্ট হয় না। লেখকের সম্মুখস্থ দুইটি নমুনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। উভয়ের মধ্যে এই সামঞ্জস্য যে উভয়েরি পক্ষ-নিম্ন ঠিক শুষ্ক পত্রের সদৃশ, কিন্তু দুইটীর বর্ণের ভিন্ন-ক্রমগত সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে এক বিন্দুও নাই। পক্ষচতুষ্টয়ের গঠন ঠিক পত্রের ন্যায়। অশ্বত্থ পত্রের ডগা যেমন বেশ সরু ও লম্বা, ইহার পক্ষপ্রান্ত তত লম্বা নয় কিন্তু তেমনি সরু হইয়া, পরে একটু বক্র হইয়াই শেষ হইয়াছে। ইহা সচরাচর অতি দ্রুতবেগে অরণ্যের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের অভ্যাস এই যে, যথায় কোন শুষ্ক বা পচা পত্র থাকে, তথায় স্থির হইয়া বসে। ইহাদের বসিবার রীতি, পক্ষের গঠন ও বর্ণ প্রভৃতি শুষ্কপত্রের সহিত সম্পূর্ণরূপে এক হইবার পক্ষে সর্ব্বাংশেই অনুকূল। ইহারা যখন শাখাসীন হয়, তখন প্রায়ই কোন শুষ্ক শাখা প্রশাখা দেখিয়াই উপবেশন করে। বসিবার সময় নিম্নপক্ষের বর্দ্ধিত প্রান্তদ্বয় দিয়া ডালটিকে ছুঁইয়া বসে। ইহাতে এই প্রান্ত ঠিক যেন পত্রের বৃন্তস্বরূপ হয়। এই প্রান্ত হইতে একটি ঘন কাল রেখা বরাবর নিম্নপক্ষ ও উপর পক্ষের মধ্যস্থল দিয়া ঠিক পত্রের মধ্যগত মেরুদণ্ডের ন্যায় উপর-পক্ষের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই কালরেখায় উভয় পার্শ্বে পত্রের প্রাস্থিক শিরার ন্যায় পক্ষশিরাগুলি আড়াআড়ি বিন্যস্ত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর ওয়ালেস এই শিরা-বিন্যাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যকর, কিরূপে স্বাভাবিক পার্শ্বিক ও প্রাস্থিক শিরাগুচ্ছ পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠিক পত্রানুরূপ শিরাবিন্যাসে পরিণত হইয়াছে।" নিম্ন পৃষ্ঠে স্থানে স্থানে এমন ছাবকা দাগ থাকে, যে উহা ঠিক শুষ্ক বা পচাপত্রের জ্বলন্ত অনুরূপ। লেখকের সংগৃহীত একটি নমুনাতে ঐরূপ চিহ্ন অতি চমৎকাররূপে বিকশিত হইয়াছে। এই প্রজাপতি যখন পৃষ্ঠের উপর পক্ষচতুষ্টয় লম্বভাবে গুটাইয়া উপবেশন করে তখন সম্মুখস্থ পক্ষদ্বয়ের বর্দ্ধিত ও বক্রমান কিনারার মধ্যে স্বীয় মস্তক ও শুঁড় গুটাইয়া এবং আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তন্মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া লুক্কায়িত থাকে। আর ইহাদের এমনি আশ্চর্য্য অভ্যাস যে, অপরাপর প্রজাপতির ন্যায়, বসিয়া ইহারা মাথা বা শুঁড় নাড়ে না, নিস্পন্দভাবে স্থির হইয়া থাকে। শুষ্কপত্রবৎ পক্ষগঠনের সহিত এই সুন্দর অভ্যাস মিলিত হইয়া কাল্লিমার ছদ্মতাকে সম্পূর্ণ করিয়াছে। কেননা, যদি বসিয়া মাথা বা শুঁড় নাড়ে, তদ্দারা কোন না কোন শত্রুর সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে এবং তখন এত নিপুণতাপূর্ণ সুন্দর ছদ্মবেশ উদ্ভাবন সত্বেও কাল্লিমা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারিত না।

পচা ও শুষ্ক পত্রের মধ্যে কাল্লিমা স্বীয় গুপ্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আবেষ্টনের সহিত

সম্পূর্ণ মিশিয়া মানবের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকেও যে বিশেষরূপে পরাভূত করে পণ্ডিতপ্রবর ওয়ালেস নিজমুখে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি সুমাত্রা দ্বীপে সচরাচর দেখিতেন, একটি এইরূপ শুষ্কপত্র তুল্য প্রজাপতি তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গিয়া অদূরে কোন ঝোপের মধ্যে ইন্দ্রজালের ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। একদা তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিলেন, প্রজাপতিটি কোথায় বসিল, কিন্তু তথাপি পরমুহূর্ত্তে তাহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার পর তিনি দেখিতে পাইলেন প্রজাপতিটি তাঁহার চক্ষের সমক্ষেই বসিয়া রহিয়াছে, অথচ তিনি এতক্ষণ দেখিতে পাইতেছিলেন না। কালিমা এরূপ সুরক্ষিত বলিয়াই আপন জন্মস্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ও দিবার সুস্পষ্ট আলোকেও স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে বিহার করে।

সাদৃশ্য উদ্ভাবন-প্রথা কেবল কীট পতঙ্গম ও প্রজাপতিদিগের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। অনুকরণে যখন উপকার আছে, তখন নিশ্চয়ই যদি আমরা মৎস্য, সর্প, পক্ষীর মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই, কখনই আশ্চর্য্য হইব না। বাস্তবিক মেরুদণ্ডক জীব জগতেও সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। অনেক স্থলে বিষ-হীন সর্প বিষাক্ত সর্পের অনুরূপ হইয়া থাকে। উহা বিষধরদিগের ন্যায় ফণাধারী হয় এবং উহাদিগের ভীতি-সঞ্চারক বর্ণানুকরণ করে। পাঠক হয় ত মনে করিবেন, এরূপ ফণা ও বর্ণ-অনুকরণে বিষবিহীন সর্পের লাভ কি। লাভ সেই এক—অর্থাৎ আত্মরক্ষা। সর্পদেরও শত্রু আছে, আর সকল সর্পই "Son of Vipers" নহে। অনেকেই নিরীহ ও অহিংস্রক। কাযেই, প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ইহাদিগকে কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। প্রবলের বল, দুর্ব্বলের কৌশল ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কোন কোন পক্ষী সর্পভোজী। কিন্তু ইহারা বিষাক্ত সর্পের নিকটে গমন করে না এবং বিষাক্ত সর্প ইহাদের ভক্ষ্যও নহে। বিষহীনেরাই খাদ্য। এই পক্ষীগণ অনেক শতাব্দীর সঞ্চিত অভিজ্ঞান আপনাদের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল করিয়াছে যে দূর হইতে কেবল বর্ণদ্বারাই খাদ্য অখাদ্য চিনিয়া লইতে পারে। বিষাক্ত সর্পের বর্ণের মধ্যে এমন বিশেষত্ব আছে, যাহা দেখিলেই উহার প্রকৃত স্বভাব আপনাপনিই ধারণা হইয়া যায়। জীব জন্তুর এইরূপ হিংস্র স্বভাবনির্দ্দেশক বর্ণকে সতর্কতা-প্রবর্ত্তক বর্ণ বলে। প্রাণীরাজ্যে অনেক জীবজন্তু এবং কোন কোন কীট পর্য্যন্ত ঈদৃশ ভীতিসঞ্চারক বর্ণ আপন আপন শরীরে প্রকাশ করিয়া যেন আততায়ীকে নিকটে আসিতে সাবধান করিয়া দেয় এবং ইহারা এইরূপ আতঙ্ক উৎপাদক বর্ণের সাহায্যে আপনাদিগকে প্রবলতম শত্রুর হস্ত হইতে নিরাপদ করে। এইজন্য সর্পভোজী পক্ষীগণ বর্ণ দেখিয়াই বুঝিতে পারে, কে খাদ্য, কে অখাদ্য, এবং অখাদ্য হইলে তাহাকে আর আক্রমণ করে না। সুতরাং যদি বিষহীনেরা কোনমতে বিষাক্তদিগের হাবভাব ও বর্ণ অনুকরণ করিতে পারে, তাহা হইলে শত্রুরা উহাদিগকে বিষাক্ত জ্ঞানে পরিত্যাগ করে

এবং উহারাও রক্ষা পাইয়া যায়। সেইজন্যই আমরা দেখি অনেক বিষবিহীন সর্প বিষাক্ত সর্পের অনুরূপ। এক জাতীয় বিষহীন ফণী (ফণা বিষাক্ত-ভানির্দ্দেশক) উত্যক্ত বা আক্রান্ত হইলে, আপনার ফণা-বিহীন মস্তককে চেপ্টা করিয়া ফণার ভাণ করে এবং বিষাক্ত সর্পের ন্যায় হিস্ হিস্ শব্দে গর্জ্জন করিতে থাকে। তুমি যদি পূর্ব্ব হইতে উহার প্রকৃত নিরীহ স্বভাব না জানিয়া থাক, নিশ্চয়ই হাবভাব দেখিয়া ভয়ঙ্কর বিষাক্ত বিষধর জ্ঞানে প্রাণভয়ে উহার নিকট হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিবে।

পক্ষীদের মধ্যে সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ ইহাদিগের সাধারণ জ্ঞান, সতর্কতা, উড্ডীয়ন-শক্তি, চতুরতা কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিকাশসম্পন্ন আর ইহাদিগের আকারগত ও স্বভাবগত প্রচুর বৈষম্য ও বিভিন্নতা অনুকরণ বা সাদৃশ্য উদ্ভাবনের অনুকূল নহে। তথাপি আমরা দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মালয় দ্বীপে ওরিওল নামে এক জাতীয় অতি নিরীহ ও দুর্ব্বল পক্ষী মধুপায়ী নামক অপর জাতীয় বলবান্ পক্ষীর অনুকরণ করিয়া থাকে। মধুপায়ীদিগের লম্বা, বক্র ও তীক্ষ্ণধার চঞ্চু এবং শক্ত, ধারাল নখর আছে। আর ইহারা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে। সুতরাং শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপেই সক্ষম। বাস্তবিক, ইহারা এরূপ পরাক্রান্ত যে অনেক সময়ে বায়স ও বাজপক্ষীদিগকেও তাড়াইয়া দেয়। এই জন্যই ভীরু, দুর্ব্বল, আত্মরক্ষণোপায় বিহীন, অস্ত্রসহায়শূন্য ওরিওল, বলিষ্ঠ, ও রক্ষণোপযোগী অস্ত্রবান্ মধুপায়ীদিগের বাহ্যসাদৃশ্য অনুকরণ করিয়া এই ছদ্মবেশের মধ্যে কোনরূপে আপনাদের অসহায়তা ঢাকিয়া, অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করে।

ওরিওল এবং মধুপায়ীদিগের পুচ্ছ ও বর্ণ এতই অনুরূপ যে সুবিখ্যাত পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার স্ক্লেটার একদা কতকগুলি সংগ্রহের মধ্যে এই দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় পক্ষীকে এক জাতীয় বলিয়া শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অনেক পক্ষীরই বর্ণ উহার আবেষ্টনের সদৃশ, সুতরাং রক্ষণমূলক। যে পক্ষীরা তরু লতার শ্যামল পত্রপূর্ণ শাখা প্রশাখার মধ্যে বাস করে, তাহাদের সাধারণ মৌলিক বর্ণ হরিৎ; যাহারা কৃষ্ণকায়, ভীমদর্শন পর্ব্বতচূড়ায় নীড় বাঁধিয়া বাস করে, তাহারা প্রায়ই পার্ব্বতীয় ধূসরবর্ণে মণ্ডিত হইয়া থাকে। অস্মদ্দেশীয় টিয়া, ময়না, কোকিল, শ্যামা, ঘুঘু, পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষীদের বর্ণ রক্ষণমূলক। ইহারা যখন নিবিড় শ্যামল পত্রকুঞ্জের মধ্যে বসিয়া মনের সুখে সুললিততানে গান গাহিয়া যায়, তখন বিশেষ চেষ্টা করিলেও সে আবেষ্টনের সাম্য মধ্য হইতে সহসা তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায় না। বিবিধ বর্ণে চিত্রিত পক্ষীরাও হরিৎপত্র, শুভ্র বৃক্ষ-ত্বক, উহাদের উপর প্রতিফলিত ও বিশ্লিষ্ট সূর্য্যরশ্মি, পত্রপুঞ্জাভ্যন্তরের 'আধ' আলো আধ' ছায়া দ্বারা সুন্দর রূপে সুরক্ষিত হয়, আবেষ্টনের সহিত মিশিয়া অলক্ষিত থাকে। ফর্বস্ এক

প্রকার ফলভোজী কপোতজাতীয় পক্ষীর বিষয় বলিয়াছেন। ইহাদের গ্রীবা ও মস্তক শুভ্র, পৃষ্ঠ ও পক্ষ কৃষ্ণ, উদর পীত এবং বক্ষের উপর ঘন কাল বক্ররেখা। সুতরাং ইহা অতি সুন্দর সুরঞ্জিত ও বিচিত্র পক্ষী। তথাপি যখন ইহারা প্রখর রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত হইয়া নিস্তব্ধভাবে দলে দলে, শাখাসীন হইয়া বিশ্রাম করে, তখন বিশেষ অনুসন্ধান সহকারে এবং বৃক্ষোপরি উক্ত পক্ষীরা আছে ইহা স্থির জানিয়া অন্বেষণ করিলেও একটি খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অন্ততঃ ফর্ব্স্ সাহেব নিজে এবং তাঁহার তদ্দেশীয় জনৈক ভৃত্য অনেক খুঁজিয়াও একটি বাহির করিতে পারেন নাই।

বৃক্ষের ঈষৎ শুভ্র বা ঈষৎ পীত ত্বকের উপর প্রখর সূর্য্যকিরণ দ্বারা শাখা প্রশাখায় কাল ছায়া পড়িয়া এবং মধ্যে মধ্যে পত্রগুচ্ছাভ্যন্তরে সুনীল. আকাশের নীলাভ মিশাইয়া এক অতি আশ্চর্য্য মিশ্র বর্ণের আবেষ্টন" পক্ষীদের চতুষ্পার্শ্বে রচিত হয় এবং সেই বর্ণ বৈচিত্র্যের মধ্যে বসিয়া পক্ষীগুলি উজ্জ্বল বিচিত্রবর্ণের হইয়াও মনুষ্যের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে পরাভূত করে। কোন কোন পক্ষীর অত্যুজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া প্রথমতঃ মনে হইতে পারে উহার বর্ণ রক্ষণমূলক নহে, কিন্তু উহাকে উহার স্বাভাবিক আবেষ্টনের মধ্যে না দেখিয়া এতাদৃশ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনেক সময়ে ভ্রম-মূলক হইতে পারে।

স্তন্যপায়ীদের মধ্যে এক জাতীয় বাদুড় অতি চমৎকার সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত স্থল। ফরমোসা দ্বীপে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের শরীরের বর্ণ কমলা-লেবুর বর্ণ সদৃশ কিন্তু পক্ষের রং কৃষ্ণ এবং কমলালেবুর পীত মিশ্রিত। ইহারা সচরাচর যে বৃক্ষে অবস্থান করে তাহা—চিরশ্যামল বৃক্ষ। সুতরাং কখন না কখন ইহার কোনদিকের পত্র পাকিয়া ঝরিতেছে। পত্র পাকিলে কতক কালো ও কতক পীত হয়। আর এই বাদুড়ের শরীর এবং পক্ষের বর্ণও পীত ও কৃষ্ণ। সুতরাং যদি উল্লিখিত চিরশ্যামল বৃক্ষের এক পার্শ্বে আপন স্বভাবানুসারে মস্তক নিম্নে করিয়া পদ দ্বারা ঝুলিয়া থাকে তাহা হইলে অনেক সময়ে উহাকে পাকা পাতা বলিয়াই ভ্রম হইতে পারে এবং বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়া থাকে। ইহা এইরূপ সাদৃশ্য দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া সকল ঋতুতেই পক্ক পত্রের ন্যায় হইয়া নিরাপদে উক্ত বৃক্ষে ঝুলিয়া থাকে। শত্রুরা পত্র ভ্রমে উহাকে আক্রমণ করে না।

এমন কতকগুলি জন্তু আছে যাহারা আপন ইচ্ছামত আবেষ্টনের অনুযায়ী বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমাদের কৃকলাস ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত; মেরু প্রদেশের টারমিগান পক্ষী অপর একটি দৃষ্টান্ত এবং একপ্রকার ক্ষুদ্র চিংড়ি মৎস্য অন্যতম দৃষ্টান্ত। কৃকলাসের আশ্চর্য্য বর্ণপরিবর্ত্তনক্ষমতা সকলের বিদিত। টারমিগান গ্রীষ্ম-কালে শুষ্ক শৈবাল ও ধূসর পর্ব্বতের, এবং শীতকালে মেরু প্রদেশের তুষার শুভ্রতার অনুজ্জ্বল বর্ণ আপন পুচ্ছে প্রকাশিত করে। ক্ষুদ্র কৃকলাসচিংড়ি যখন যে কোন

আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থান করে, তদনুরূপ বর্ণ উহার শরীরে প্রকাশিত হয়, বালুকার উপর থাকিলে বালুকার ন্যায় বর্ণে, সামুদ্রিক উদ্ভিজ্জ তৃণপত্রের মধ্যে থাকিলে উহাদের অনুরূপ হরিৎ কিম্বা লোহিত কিম্বা পাটল প্রভৃতি বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈদৃশ আবেষ্টনানুযায়ী বর্ণপরিবর্ত্তনশক্তির মূলে যে আত্মরক্ষণ উদ্দেশ্য নিহিত তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। কেননা যখন যে বর্ণই কেন উদ্ভাবিত হোক না তাহা আবেষ্টনের সদৃশ বই অন্য কোনরূপ হয় না কতকগুলি তরু মণ্ডূক এইরূপ বর্ণসঙ্গতিসম্পন্ন। ইহাদের বর্ণ ঈষৎ লোহিতাভ পীত হইতে গাঢ় ধূসর গোলাপী লাল এবং উজ্জ্বল ঘন লোহিতের ভিন্ন ভিন্ন ক্রমের মধ্যে এত অশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, যে তজ্জন্য ইহাদের প্রকৃত বর্ণ নির্দ্দেশ করা অতীব দুরূহ। তরু মণ্ডূক যখন যে অবস্থার মধ্যে থাকে তৎসদৃশ বর্ণ উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

সামুদ্রিক জীবের মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল সন্নিহিতগর্ভ হইতে অনেক সময়ে অনুসন্ধিৎসুর জালের সহিত একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ উত্তোলিত হয়। ইহারা দেখিতে সর্ব্বাংশেই উদ্ভিদের ন্যায়; কিন্তু যদি কোন জলপূর্ণ পাত্রে ক্ষণকাল রক্ষিত হয় দেখা যায় সেই অনুমিত উদ্ভিজ্জের সহিত এক একটি ক্ষুদ্র একপ্রকার মৎস্য জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা এইরূপে উদ্ভিজ্জের সহিত মিশিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করে। এইরূপ আরও কত নিদর্শন প্রদর্শিত হইতে পারে!

ভূচর, খেচর ও উভচর এবং ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সকল শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেই যাহারা দুর্ব্বল, ভীরু এবং শক্তি দ্বারা বা অন্য কোনরূপ উপায় দ্বারা আত্মরক্ষণে অসমর্থ তাহারাই কোন না কোন সাদৃশ্যের মধ্যে আশ্রয় লইয়া আপনাদিগকে ও আপনার বংশকে রক্ষা করিতেছে। প্রাকৃতিক জড় পদার্থনিচয়ের এক সার্ব্বভৌমিক বর্ণগত সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য দ্বারাই অধিকাংশ জীবজন্তু সুরক্ষিত। কোন বিশেষ প্রকারের সাদৃশ্য বা অনুকরণ উদ্ভাবিত করিয়া অতি অল্প সংখ্যক প্রাণীই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। আবেষ্টনের সহিত বর্ণগত সাদৃশ্য প্রকটিত করিয়া বৃহৎ জন্তুরাও কিরূপ আশ্চর্য্যভাবে তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, আমরা তৎসম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া, আমাদের যে সহিষ্ণু পাঠকের সহিত এই সুদীর্ঘকাল রহস্যময় প্রাণী-জগতে অত্যদ্ভুত নৈপুণ্যসম্পন্ন রক্ষণ-মূলক সাদৃশ্য দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিয়া বেড়াইতে ছিলাম, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব।

সুদীর্ঘায়তন, অসমঞ্জসোন্নতগ্রীব, বিচিত্র-বর্ণ জিরেফ এবং সচিত্রিত, প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট শার্দ্দূল পর্য্যন্ত কিরূপে স্ব স্ব আবেষ্টনের সহিত বর্ণ-গত সামঞ্জস্য মিশাইয়া মানবের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিরও অলক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ওয়ালেসের "ডারবিনিজম্",

গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ওয়ালেসকে একখানি পত্রে জনৈক দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যাঘ্রশিকারী উচ্চ শুষ্ক আরণ্যশরবণ ও ঘাসের মধ্যে ব্যাঘ্রগণ কিরূপ অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে, এবং উক্ত ঘাসবন চিত্রিত শার্দ্দূলকে বর্ণ-সামঞ্জস্য মধ্যে কেমন প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি (শিকারী) লিখিতেছেন "আমি একদা একটা আহত ব্যাঘ্রের পশ্চাদানুসরণ করিতেছিলাম। সে প্রশস্ত জঙ্গলের মধ্যে এক বৃক্ষতলে শুইয়াছিল। আমি অন্ততঃ এক মিনিট ইহা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা দেখিতে পাইয়াছিল। আমি পরে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া গুলি করিলাম বটে, কিন্তু তাহার কোন্ খানটা লক্ষ্য করিয়া করিতেছি, তাহা আমি ঠিক করিতে পারি নাই। নিশ্চয়ই শার্দ্দূলের বর্ণ, প্রখর ও এতাদৃশ শুষ্ক, হরিদ্রাভ পত্রসম্পন্ন শর ও তৃণরাজীর মধ্যে, উহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখে। বাঘ না মরিলে, দূর হইতে উঁহার গাত্রের ডোরা দাগ নজরে পড়ে না।" ঘন উদ্ভিজ্জের কালো ছায়ার সহিত ব্যাঘ্রের কালো ডোরা এক হইয়া থাকে। তাই দূর হইতে উহা দৃষ্ট হয় না। বাঘ মরিয়া গেলে অবশ্য, নিকটে গিয়া উহার কালো ডোরা দেখা যায়।

জিরেফ এমন প্রকাণ্ডায়তন জন্তু হইলেও যখন অরণ্যের প্রান্তে মৃত ও ভগ্ন বৃক্ষের মধ্যে চরিয়া বেড়ায়, তখন ইহার ছাবকা দাগযুক্ত দেহ, উচ্চ, অদ্ভুত আকারের মস্তক ও শৃঙ্গ, বৃক্ষের ভগ্ন শাখার মত হইয়া, ইহাকে ঈদৃশ আশ্চর্য্যরূপে প্রচ্ছন্ন করে যে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থানীয় লোকেরাও অনেক সময়ে জীবন্ত জিরেফকে, মুড়ো গাছ, এবং মুড়ো গাছকে জীবন্ত জিরেফ মনে করিয়া ভ্রান্ত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

নূতন ধরণের উপন্যাস।

ভারতীর পাঠকপাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে গত বৎসরের অগ্রহায়ন মাসের ভারতীতে ইংলণ্ড হইতে মিস্ মরিস্ "বিলাতের সচিত্র সংবাদপত্র ও তাহাদের কার্য্য প্রণালী" নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে জেণ্টলউম্যান্ নামক পত্রিকায় সম্প্রতি যে একটী নূতন বিষয় পরীক্ষিত হইয়াছে তাহার বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহা এই—

"এক সংখ্যা পত্রিকায় একটী উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় প্রকাশিত হয় এবং সম্পাদক বিজ্ঞাপন দেন যে যাঁহারা ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া পাঠাইবেন তাহার মধ্যে যাঁহার লেখা সম্পাদক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করিবেন তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া যাইবে। কয়েক সপ্তাহ ক্রমাগত এই প্রকারে কার্য্য হইয়া এ উপন্যাসটী সম্পূর্ণ

হয়। পরে প্রথম উপন্যাসলেখকের উপন্যাসের সহিত বিভিন্ন লেখকগণের উপন্যাস মিলাইয়া দেখা যায় যে প্রথম খানির অপেক্ষা দ্বিতীয় খানি ভাল হইয়াছে। এই প্রথম বোধ হয় একটী উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন লোক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।"

আমরা ইচ্ছা করিয়াছি ভারতীতে একটী উপন্যাসের প্রত্যেক অধ্যায় ঐরূপে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব কিরূপ দাঁড়ায়। "নববর্ষের স্বপ্ন" নামক একটী উপন্যাসের প্রথম অধ্যায় এবারে প্রকাশিত হইল। আগামী ২০ শে আশ্বিনের মধ্যে যাঁহারা ইহার দ্বিতীয় অধ্যায় লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার লেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাকে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর চারিখানি গ্রন্থ উপহার দেওয়া যাইবে—দীপনির্ব্বাণ, হুগলীর ইমামবাড়ী, গাথা ও বসন্ত-উৎসব। উপন্যাস লেখক পাঁচ অধ্যায়ে তাঁহার উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া আমাদের নিকট রাখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় উপন্যাসখানিও পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইলেই ভাল হয়, প্রত্যেক অধ্যায়ের লেখকগণ তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। এইরূপে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত উপন্যাসখানি শেষ হইলে আমরা প্রথম উপন্যাসখানি সমস্তটা একেবারে এক সংখ্যায় প্রকাশ করিব।

নববর্ষের স্বপ্ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজকালকার কালেজের নব্য বাঙ্গালী আমি। আর্য্যামিবর্জ্জিত নহি, অথচ ব্যবহারে অনেকগুলি অনার্য্য ভাব। বাল্যবিবাহ ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে কোন "থিওরি" নাই, "প্র্যাক্‌টিসে" এই ঘটিয়াছে যে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণের উদ্যোগে ভগিনীর বিবাহ খুব সকাল সকাল সমাধা হইয়াছে—তাহাতে আমি কোন বাধা দিই নাই, কিন্তু নিজেকে এ পর্য্যন্ত বহুযত্নে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ হইতে দূরে দূরে রাখিয়া আসিয়াছি, এটী আমার কালেজী অনার্য্য শিক্ষার ফল হইবে বোধ হয়। আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রম্ভালাপে তাঁহার প্রণয়িনীর অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে বিবাহিতজীবনের সুখই শ্রেষ্ঠসুখ, উদাহরণস্বরূপ তাঁহার নিজের দাম্পত্যজীবনের কতকগুলি চিত্র উজ্জ্বলবর্ণে আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। যথাযোগ্য গাম্ভীর্য্য সহকারে তাঁহার বিশ্রব্ধালাপে মনোনিবেশ করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহার পন্থানুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। এমনো দেখিয়াছি কোন কোন সুহৃদ্বর চাঁদের আলোতে অদৃষ্টপূর্ব্বা প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে কবিতা আওড়াইয়া হাহুতাশ করিয়া শেলি বাইরণের অন্ন মারার উপক্রম করিতেছেন—তাঁহাদের দলে ভিড়িতেও কখন সাধ

যায় নাই। কবিতা পড়িয়াছি ঢের, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জীবনে কাব্যরসের চর্চ্চাটা আমার দ্বারা হইয়া উঠিল না। আমার কোন সুরসিকা আত্মীয়া একদিন প্রেম ও প্রেমিকাখ্য মূর্খাগ্রগণ্য সম্বন্ধে আমার দুর্ব্বল রসিকতার প্রয়াসে হাড়ে চটিয়া উঠিয়া প্রতিশোধস্পৃহাদীপ্ত ডাগর উজ্জ্বল নয়ন উজ্জ্বলতর করিয়া বলিলেন "হে বিদ্রূপবাগীশ! দর্পহারী কন্দর্প আছেন, আছেন; তোমার ঐ বিদ্রূপের শোধ তিনি একদিন তুলিবেন; এখন তুমি নিরাময় রহিয়াছ কিন্তু তোমার পাকা হাড়ে যখন রোগ ধরিবে তখন আর কিছুতেই সে বিষ ঝাড়িতে পারিবে না। মা দুর্গা করুণ আমি যেন সে দিন দেখিয়া মরিতে পারি।"

আমি বলিলাম "তা হবে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। কবি ভবভূতি বলেছে

'ভ্রমতিভুবনে কন্দর্পাজ্ঞা বিকারি চ যৌবনং
ললিতমধুরাস্তেতে ভাবাঃ ক্ষিপন্তি চ ধীরতাং'

মায়াকুমারীরাও গেয়েছে

'গরব সব হায়, কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে'

তা আমার কপালেও একদিন নাকের জলে চোখের জলে চোবানি আছে বোধ হয়, মনসিজ হে! কেউ বাদ যাবে না। (Sotto voice—শর্ম্মা ছাড়া!)

আশা করিয়াছিলাম এমন সবিনয় সম্মতিবাক্যে ঠাকুরাণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি অনেকটা শীতল হইয়া আসিবে, কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তিনি শুধু একটী ভাবব্যঞ্জক গ্রীবাভঙ্গী করিয়া ঈষৎ চাপাহাসির স্বরে বলিলেন "যাও যাও আর চালাকী কর্ত্তে হবে না"।

আমার ন্যায় অপ্রেমিকেরা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, কারণ সেই নাস্তিক আমি কিছু দিন পরেই স্বচ্ছন্দে অপ্রেমগর্ব্বে জলাঞ্জলি দিয়া, একটা কাঁচা রোম্যাণ্টিক ষোড়শ বর্ষীয় বালকের ন্যায় নববর্ষের প্রভাতে স্বপ্নে দেখিলাম আমার একটী প্রণয়িণী; উভয়ের মন জানিয়া উভয়ের বিস্মিত সলাজ ভাব, মৌনভাবে পরস্পরের হাতে হাত রাখিয়া হৃদয়ে অননুভূতপূর্ব্ব প্রশান্ত আনন্দের সঞ্চার। অনুভবে বুঝিলাম প্রেমে পড়া জিনিষটা ভারি সহজ, সরল, অবাধ; এবং একটী বহু পুরাতন সত্য আজ সহসা নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম,—সেটী এই, যে ব্যক্ত প্রেমের প্রথম মুহূর্ত্ত নিরতিশয় মধুর,—মনোরাজ্যে আমার এই আবিষ্কার জড়রাজ্যে কলম্বসের আবিষ্কারের অপেক্ষাও গুরুতর।

বিছানা হইতে উঠিয়া বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, নির্ম্মল শুভ্র আকাশ। দেখিলাম পুষ্করিণীর ঘাটে একজন যুবক দ্বারবান্ স্নানান্তে সিক্তবসনে গায়ত্রী পাঠ করিতেছে। পূর্ব্বেও তাহার গায়ত্রী পাঠ শুনিয়াছি কিন্তু আর কখন তাহা এমন ভাবে মন স্পর্শ করে নাই। আজ নববর্ষের প্রভাতে

তাহার বন্দনা গানে মম প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। একবার আকাশে চাহিয়া দেখিলাম —আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাতেই ঈশ্বরকে ভালবাসি তাই আমার আকাশের দেবতা ও সবেমাত্র স্বপ্নানুভূতা হৃদয়ের দেবীকে এক মনে হইল, উভয়ের সমান প্রসন্ন, প্রশান্ত সুন্দর মুখচ্ছবি। বেড়াইতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ বেড়াইতে, বেড়াইতে বাগানের প্রান্তে উদ্যানপালকের কুটীরের নিকট আসিয়া পড়িলাম। তাহার সন্তানহীনা পত্নী গৃহপোষ্য জীবের উপর দিয়া তাহার ক্ষুধিত মাতৃস্নেহের চর্চ্চা করে। কুটীরের নিকটস্থ হইবা মাত্র দুইটী কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, একটি বিড়াল বহু কষ্টে আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া, আমার পায়ে দুই একবার মাথা ঘসিল, আমার আর দুইটি বন্ধু—দুটি অনুদ্ভিন্নশৃঙ্গ গোবৎস তাঁহাদের অনতিদীর্ঘ দড়ির বন্ধন ছিঁড়িয়া আমার নিকট আসিবার চেষ্টা করিলেন। আমি পার্শ্বস্থ ডুমুর বৃক্ষের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া তাহাদের দিলাম, অদূরে দুই ক্রীড়াশীল ছাগশিশু তাহাদের মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া কচি কচি দাঁত দিয়া সেই ডালের উপর দুই একবার আক্রমণ করিল।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উদ্যানপালিকা ভগবতী পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। পূজার উপকরণ সব প্রস্তুত কেবল পুরোহিত আসিলেই হয়। কুটীরের ভিতর পাড়ার অনেকগুলি অপগোণ্ড বালককে সমবেত দেখিলাম। স্মরণ হইল আজ বর্ষারম্ভে মালীবধূর নূতন পাত্রে পায়সান্ন রাঁধিবার কথা, বুঝিলাম তাই এতগুলি অনাহূত অতিথি সমাগম। আজ প্রত্যূষে তাহার গৃহে দাদাবাবুর পদধূলিলাভে মালীবধূর আনন্দাতিশয্য ও সাষ্টাঙ্গপ্রণাম, এবং উক্ত দাদাবাবুর অপ্রতিভ ভাবের কথা বলাই বাহুল্য। আজ পৃথিবী বেশ। এই উদারহৃদয়া উদ্যানপালিকা, এই স্নেহশীল পশুগণ, সেই স্বপ্নদৃষ্টা বালিকা, আর এই অসীম আকাশব্যাপী দেবতা সকলেই আজ আমার নিতান্ত আপনার।

মধ্যাহ্নে আহারের সময় ব্যজন করিতে করিতে ভগিনী বলিল "দাদা বিয়ে কর না ভাই, এমন ফাঁকা ঘর দুয়োর, ঘরে বৌ নেই, কচি ছেলে নেই, মা কত কাঁদাকাটা করে, লক্ষ্মী ভাই বিয়ে কর।" মনে মনে বলিলাম "করিব," প্রকাশ্যে বলিলাম "পাত্রী কোথায়?" "পাত্রী ঢের আছে, তোমার পছন্দ হলেই হয়।"

আমি কিছু বলিলাম না, নীরবে আহার ও চিন্তা করিতে লাগিলাম। "এতদিন পরে আজ সহসা বিবাহে মানস কেন? স্বপ্নে প্রণয়িনী দেখিয়াছি বলিয়া? মানিলাম আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে একদিন আমার প্রতি প্রণয়বতী হইবে। এক-দিন উভয়ের প্রেম জানিয়া উভয়ে স্বর্গ সুখ পাইব—সব সই। কিন্তু তারপর? তারপর প্রেমের সে মধুর বন্ধন জাবনের কঠোর বন্ধনে পরিণত হইতে কত দিন? ফুল অতি সুন্দর, অতি সুগন্ধি, তাহাকে মালা করিয়া গলায় পর, কিছুক্ষণের জন্য অতুল প্রীতি পাইবে। কিন্তু সে মাহেন্দ্রক্ষণ কি ক্ষীণপরমায়ু, তাহার ভীষণ

উত্তরাধিকারী নিশ্চয়ই সেই ফুলে মলিনতা ও গন্ধহীনতা এবং সেই ফুলের প্রতি বিরাগ লইয়া আসিবে। স্বপ্নে প্রণয়িনী ভাল, জীবনে প্রণয়িনী হয়ত আরও ভাল, যদি নাকি সে জীবন স্বপ্নেরই মত সংক্ষেপ ও সুমধুর হয়। প্রেমিকবর! প্রেমের লোভে বিবাহ করিবে, প্রেম পালাইবে, বাকী থাকিবে কি? দীর্ঘ জীবন ধরিয়া ঘরকন্না; ঝগড়া ও ভাব, অশ্রুজল ও মানভঞ্জন; বঁটিনা বাঁটিতে গিয়া গৃহিণীর আঙ্গুলছ্যাঁচা এবং মৎকর্তৃক তাহাতে আর্ণিকালেপন; স্বামীদেবের কালো আল-পাকার চাপকানে বোতামসংযোজনরূপ আর্য্যনারীব্রতে তাঁহাকে নিষ্ফল ব্রতী-করণ প্রয়াস এবং আফিসের বেলাবেলি একটুখানি উদরান্নের জন্য অনেকখানি বৃথা হাহুতাশ। না বাপু বিবাহ করা আমার কাজ নয়।" চিন্তা ফুরাইল, আহারও শেষ হইল। প্রভা ভারি বুদ্ধিমতী, বোধ হয় আমার চিন্তার প্রণালীটা কতকটা আঁচিয়াছিল, আমার মুখের পানে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল আর কিছু বলিল না। অন্তঃপুরে আসিলেই বিবাহের জন্য আমার উপর অন্যান্য আত্মীয়দের পীড়ন চলিত, প্রভাই শুধু আমার মন জানিয়া মাঝে মাঝে মৃদু আবদারের ভাবে মাত্র সে কথা পাড়িত।

আহারান্তে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দক্ষিণমুখীকক্ষে চালা বিছানায় আশ্রয় লইলাম। খোলা জানালা দিয়া ঈষৎ তপ্ত বায়ু আসিয়া গায়ে লাগিতেছে। আমি অর্দ্ধশয়নাবস্থায় বাটীর সম্মুখস্থ ছোট্ট রাস্তা দিয়া মানুষের গতিবিধি দেখিতেছি। দেখিতেছি প্রাচীরের বাহিরে বৃহৎ দীর্ঘিকায় বালকদের অবিরাম দাপাদাপি, বধূবর্গের সমান যত্নের সহিত গাত্র ও বাসন মার্জ্জন, এবং পুরুষদের বালক ও বধূবর্গে অলক্ষিত স্নান সম্বন্ধে একরূপ গম্ভীর প্র্যাক্টিক্যাল ভাব। আমার হাতে একখানা ফরাসীস্ কবিতাপুস্তক খোলা রহিয়াছে, মাঝে মাঝে তাহাতেও মনোনিবেশ করিতেছি। বিবাহ নাই করিলাম, প্রেমের স্বাদ জানিতে ক্ষতি কি? উহার জমাট জটিল রহস্যের মধ্যে একবার বুদ্ধি ছুরিখানা প্রেরণ করিয়া, সবটা ঘাঁটিয়া, নাড়িয়া চাড়িয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া জিনিষটাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত মস্তিষ্ক লালায়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্কের সাধ্য নয় ও অতলস্পর্শের তল পাওয়া, হৃদয় বলিয়া কোন পদার্থের সন্ধান থাকে ত তাহাকে পাঠাও—সেটাই কিছু শক্ত কথা।

এমনি ভাবে পাঠে, চিন্তায় ও দিবাস্বপ্নে বেলাটা একরকম কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে উঠিলাম। প্রবল বেগে বাতাস বহিতেছে, বাতাসে চতুর্দ্দিক হইতে গানের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। প্রাচীরের বাহিরেই একদল চাষা গাহিতেছে,—

সই তোরে বল্‌ব কি, রসের গৌর হেরেছি,
হেরে পাগল হয়েছি।
আবার সুরধুনীর তীরে গৌর দাঁইড়ে পেলাম দেকা
কূল যায় না রাখা, গৌর বাঁকা, রসে মাখা মাখা।

রাধিকা ঠাকুরাণী সুরধুনীর তীরে গৌরের দর্শন পাইয়া পাগল হইয়াছিলেন, গানের ভাবখানা এতদুর বেশ পরিষ্কার; কিন্তু তাই বলিয়া কলিকাতা সহরের গোটাকত চাষা ভাঙ্গা গলায় সপ্তমে চেঁচাইতে চেষ্টা করিয়া পাড়াপড়শীকে কেন পাগল করিয়া তুলিবে গানের এ অংশের অর্থটা ততটা পরিষ্কার নয়।

আর একদল গাহিতেছে—

মদনমোহন বাঁধা দিয়ে তালুক মুলুক যায়
হায়! হায়!
এম্‌নি দলপতি ইনি আমাদের রামপ্রসাদ ঠাকুর
হায়! হায়রে মজা! হায়রে হায়!!!

আর কিছু না হউক, মদনমোহন বাঁধা রাখিয়া তালুক মুলুক ঘুরিতে যাওয়ায় রামপ্রসাদ ঠাকুরের আইডিয়ার ওরিজিন্যালিটি প্রকাশ পাইতেছে বটে। আবার ঐ শোন! দীঘির ধারে বসিয়া বেণীসোমের বংশধরটী ক্ল্যারিওনেটে তাঁহার সমস্ত হৃদয়াবেগ ঢালিয়া দিতেছেন। বেসুরো সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাতাসে ভাসিয়া না জানি কোন্ বিরহিণীর কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিতেছে। আর একটু বেশী রাত্রে যখন আমার প্রতিবেশীদের ঐকতান সঙ্গীতের বিরাম হইল, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আরাম-চেয়ারে উপবেশন করিলাম; আমরা চারিটী সঙ্গী পরস্পরকে সঙ্গদান করিতেছিলাম, আমি, আমার চিন্তা, আমার গলার বেলফুলের মালা ও সপ্তমীর চাঁদ।

এইরূপে ত নববর্ষ কাটিল। প্রভাতে যে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়াছিলাম তাহার রেশ রাত্রি পর্য্যন্ত চলিল। কিন্তু তাহার পর দিন উঠিয়া পূর্ব্বদিনের গদ্গদভাব স্মরণ করিয়া আপনার নিকট আপনি লজ্জিত হইলাম। আর দুই একদিনে অনভ্যস্ত সেন্টিমেণ্ট্যালিটি ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পুনরায় নীরস গদ্য অবলম্বন পূর্ব্বক সুস্থ, খাড়া হইয়া উঠিলাম। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করিতে হইল, আমার বিশ্বাস নববর্ষের স্বপ্ন আমার বিদ্রূপশীল স্বভাবকে বেশ একটুখানি ঝাঁকা দিয়া, আমায় খানিকটা কাহিল করিয়া গিয়াছিল, জমি কতক নরম হইয়া অঙ্কুরের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা না হইলে আমার ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিবার আর ত কোন কারণ দেখিতে পাই না।

প্রত্যুত্তর।

আষাঢ় মাসের ভারতীতে দেখিলাম আমার প্রশ্নগুলি লেখক মহাশয়ের উত্তরসহ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার উত্তর পড়িতে পড়িতে আমার পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতে লাগিল। জ্যামিতির পরীক্ষক মহাশয়ের একজন বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুক ছাত্রটি কিরূপ পরীক্ষা দিয়াছে? পরীক্ষক মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ, ছোকরাটী বেশ ওরিজিন্যাল বটে, অধিকাংশ প্রশ্নগুলিরই নূতন ধরণের উত্তর পাইয়াছি। Enunciation গুলি প্রশ্নলিপি হইতে উদ্ধৃত করিতে অথবা Wherefore it is proved হইতে Q. E. D. পর্য্যন্ত লিখিতে কোন ভুল হয় নাই, আর ইঁহাদের মাঝে সংজ্ঞা, স্বতঃসিদ্ধ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে তাহাও ঠিক লেখা হইয়াছে; তবে দুঃখের বিষয় এই যে যুক্তিপ্রমাণের সঙ্গতি অভাবে আমায় শূন্য নম্বর দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে।"

লেখক মহাশয় আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া ঝোপের আশেপাশে বাড়ী মারিয়াই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য নিরঙ্কুষ করিয়াছেন ভাবিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বহুল পরিমাণ অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপন করিয়া স্থির করিয়া লইয়াছেন যে আমার প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু আসলে বাজে কথার চাপে পড়িয়া আসল কথাগুলি পর্য্যন্ত মারা পড়িয়াছে। এতদ্ব্যতীত বোধ করি দ্বন্দ্বযুদ্ধের উত্তেজনায় শোণিতের কথঞ্চিৎ উত্তাপাধিক্য ঘটাবশতঃ লেখক মহাশয় সর্ব্বত্র ভাষা অথবা ভাবের সংযম রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার মনোভাব এক কিন্তু ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার কোন কোন স্থলে এমনও ঘটিয়াছে যে দুইটী সম্পূর্ণ বিরোধী ভাবকেও একই নিশ্বাসে সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন যে ঐতিহাসিকেরা—"যাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখিতে পান"—তাঁহারা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা সম্বন্ধ "সৃষ্টি" করেন না, কতকটা বৈজ্ঞানিকের মতই উহা আবিষ্কার করিয়া থাকেন মাত্র। ধর্ম্ম ও দর্শনের নিখুঁত পার্থক্য দেখাইতে গিয়া ব্যাকরণের বিধিলিঙ্‌ বিভক্তি পর্য্যন্ত লেখক মহাশয়ের বিস্মরণ ঘটিয়াছে।

লেখক মহাশয়ের রচনা হইতে তাঁহার একটি বিশেষত্ব এই পাওয়া যায় যে, যে কথা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন, সে কথা তাঁহার নিকট প্রমাণ ও বিচার-সাপেক্ষ; আর যে বিষয়ে শিক্ষিত মণ্ডলীর মধ্যে বিশিষ্টভাবে মতভেদ রহিয়াছে অথবা তাঁহারা একবাক্যে ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ে লেখকমহাশয় সম্পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্ত—সন্দেহের ছায়ামাত্র তাঁহার মনের উপর পতিত হয় না। সকলেই একবাক্যে বলিয়া আসিতেছেন যে সাংখ্যদর্শন Synthetic যুক্তিমূলক, কিন্তু লেখক

মহাশয়ের নিকট উহা "বিচার্য্য"। দুঃখের বিষয় তিনি কোনরূপ প্রমাণ অথবা যুক্তি প্রদর্শন করেন নাই। সকলেই প্রায় বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব অপর কিছুতে না হৌক তাঁহার নীতিতন্ত্রে; কিন্তু লেখক মহাশয়ের নিকট সে কথা অমূলক।

১ম প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সম্বন্ধে লেখক মহাশয় কোন সরল উত্তর না দিয়া ঐতিহাসিকের সৃজন শক্তি এবং দর্শন ও ধর্ম্মের জাতিগত পার্থক্যের উপর বরাত দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। প্রশ্নটি দুইভাগে বিভক্ত:—(১ম) ভিত্তিপ্রাসাদ সম্বন্ধ নিরূপণের প্রকৃষ্টবিধি কি? (২য়) এই সম্বন্ধ সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে অবস্থিত কি না?

সুখের বিষয় এস্থলে আমাদের লেখক মহাশয়ের যুক্ত্যরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হইবে না; কেবল মাত্র তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় রচনা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলেই আমাদের কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা। লেখক মহাশয়ের সাহিত্য দেহ নিতান্ত মসৃণ, সহজে ধরা যায় না, চাপিয়া ধরিতে গেলেই অমনি লেখক মহাশয় কথাটি সরাইয়া লন। প্রথম প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া লেখক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "তাঁহার (বুদ্ধের) পূর্ব্ববর্ত্তী কপিলের সাংখ্যদর্শনের উপরই সে (বৌদ্ধ) ধর্ম্মের ভিত্তি।" দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি কি বলিতেছেন দেখুন, "বুদ্ধদেব জ্ঞাতসারে সাংখ্যদর্শনের উপর তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এমনো নহে।" লেখক মহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করি এ কথাটি তাঁহার After-thought কি না? যখন সহজ উপায় রহিয়াছে তখন এত কষ্টকল্পনা করিয়া তাঁহার অজ্ঞানকৃত কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করিবার কি প্রয়োজন ছিল তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না। শাক্যের মত কৃতবিদ্য ব্যক্তি যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্র সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বলা কি যুক্তিসঙ্গত? ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কখনই দর্শনের উপর ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করেন না, কেননা তাহা হইলে ধর্ম্মমত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িত। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ এক প্রকার অমানুষিক তেজ ও বিশ্বাসের বলে সত্য প্রচার করেন। তাহার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে অপরাপর ধর্ম্মমত অথবা দর্শনের সহিত তাহার মিল থাকিতে পারে কিন্তু সে মিল ধার করা মিল নহে, মানব অন্তরে সত্য প্রকাশের সাধারণপদ্ধতিঘটিত মিল, মানব চিন্তা পদ্ধতির সাম্যের মিল। আমরা তাই পূর্ব্ববারে বলিয়াছিলাম "আমার মনে হয় উভয়ই স্বতন্ত্র, তবে উভয়ের উদ্দেশ্য কতকাংশে একবিধ হওয়ায় মানবচিন্তাপদ্ধতির সাম্যবশতঃ সেই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।" লেখক মহাশয়ের যদি এ কথা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় তবে তাহার প্রমাণ দিলে বাধিত হইব। লেখক মহাশয়ের যুক্তির প্রণালী অনুসরণ করিতে গেলে বাইবেল গ্রন্থ হইতে ভগবদ্গীতার জন্ম প্রমাণ হইতে পারে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যদি ভারতবর্ষীয় পরজন্মবাদ গ্রীসে Metempsychosis রূপ ধারণ করিতে পারে এবং যদি পীথাগোরাস তাঁহার সংখ্যাসম্বন্ধীয় মত ভারতবর্ষ হইতে পাইয়া থাকিতে পারেন তবে ভগবদ্গীতা প্রণেতা যে তাহা করেন নাই তাহাই বা বলা যায় কি প্রকারে?

তবে লেখক মহাশয় এ বটিকাটিও গলাধঃকরণ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে প্রস্তুত নই।

২য় প্রশ্ন। শাক্যমুনি ও গৌতম, উভয়েই নিরীশ্বরবাদী কি না?

প্রথম প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বলিয়াছিলেন, "উভয়েই নিরীশ্বরবাদী।" দ্বিতীয় প্রবন্ধে কিন্তু তিনি বলিতেছেন, "বুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন এমন বোধ হয় না।" লেখকমহাশয়ের সাহিত্যদেহের মসৃণতার এই আর একটি উদাহরণ পাওয়া গেল। তিনি কিরূপে আপন কথা বজায় রাখিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি বলিতেছেন, "তবে তাঁহাকে এই পর্য্যন্ত নিরীশ্বরবাদী বলিতে হইবে যে তিনি ঈশ্বরসম্বন্ধে কোন উচ্চ বাচ্য করেন নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য তিনি সাধারণকে কখন প্ররোচিত করেন নাই," ইহাই তাঁহার মতে বুদ্ধের নিরীশ্বরবাদীত্বের যথেষ্ট কারণ। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস লেখকমহাশয় ব্যতীত অপর কেহই এরূপ অবস্থায় বুদ্ধকে নিরীশ্বরবাদী বলিতেন না। নিরীশ্বর শাস্ত্র ও শাস্ত্রপ্রণেতা নিরীশ্বরবাদী, এতদুভয়ের মধ্যে কি লেখক মহাশয়ের নিকট কোনই প্রভেদ নাই? এই কারণেই নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্য হইতে কপিলের নিরীশ্বরবাদীত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না। আর তিনি যে সূত্রটির উপর নির্ভর করিয়া বরাত চিঠি কাটিয়াছেন, দুঃখের বিষয় সূত্রকারের প্রধান কর্ম্মচারী ভাষ্যকার বিজ্ঞান ভিক্ষু সে চিঠি গ্রহণ করিতেছেন না। তিনি বলেন, ঈশ্বরাপলাপ করা কপিলের উদ্দেশ্য নহে, বাদীর মুখবন্ধ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। যদি ঈশ্বর নিষেধ করাই তাঁহার অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে তিনি কি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" না বলিয়া "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ স্পষ্ট উক্তি করিতেন না?

কপিলের মতে প্রমাণ সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না এইমাত্র। অনেক ঈশ্বরবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকও ত এই কথাই বলিয়াছেন যে ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হওয়া সম্ভবপর নহে, অতএব কি লেখক মহাশয়ের মতে তাহাদের সকলেরি ঈশ্বরবাদীত্ব পচিয়া গেল।

৩য় প্রশ্ন। লেখক মহাশয় প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন, উভয়েই (কপিল ও বুদ্ধ) নির্জ্জনচিন্তা ও জ্ঞানালোককে মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া নির্ব্বাণকে মোক্ষের চরমসীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।" দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি নির্ব্বাণ ও মোক্ষ বা মুক্তি একই বলিয়া স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, "কিন্তু সহজ মানুষ এক লম্ফে ত আর মুক্তি প্রাপ্ত হয় না, তাহার জন্য সাধনা চাই। সেই সাধনের পথ সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে বিভক্ত, তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠিতে পারিলে মুক্তি হইল। এস্থলে সেই অর্থে নির্ব্বাণকে মুক্তির চরম সীমা বলা হইয়াছে। তাহাতে সাধারণ পাঠকের অর্থগ্রহণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বোধ হয় না।" লেখক মহাশয় যে অর্থে মুক্তির চরম সীমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মর্ম্মগ্রহণে সাধারণ পাঠকের কোন ব্যাঘাত ঘটিয়াছে কি না

জানি না; কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমার কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, লেখক মহাশয়ের ভাব তাঁহারা পূর্ব্বেও বোঝেন নাই এবং এখনও তাঁহার স্বকীয় টীকার আলোক সত্ত্বেও তাহার প্রসঙ্গ বুঝিতে পারিলেন না। আমিও মুক্তকণ্ঠে আমার অক্ষমতা স্বীকার করিতেছি ইহাতে সাধারণে যদি আমার হীনবুদ্ধির পরিচয় পান, তাহাতে নিতান্ত ক্ষোভের বিষয় কিছুই নাই, কেননা দাঁড়কাকের দাঁড়কাক বলিয়া পরিচয় দিতেই বা এত লজ্জা কি—ধার করা অথবা ভিক্ষোপার্জ্জিত ময়ূরপুচ্ছে শোভিত হওয়া অপেক্ষা স্বাভাবিক জাতি হিসাবে পরিচয় দেওয়াই তো সর্ব্বতোপ্রকারে সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

৪র্থ প্রশ্ন। লেখক মহাশয় এ প্রশ্নটির যে কি উত্তর দিয়াছেন তাহা ঠিক বোধগম্য হইল না। যে স্থানে বরাত দিয়াছেন তাহাও দুই একবার পড়িয়া দেখিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার প্রশ্নের কোনই সদুত্তর পাইলাম না।

৫ম প্রশ্ন। লেখক মহাশয় প্রথম প্রবন্ধে বুদ্ধের একটি নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের উল্লেখ করেন। তত্ত্বটি কি জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিয়াছেন, সার্ব্বভৌমিকতা। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এইমাত্র যে কি অর্থে উহাকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? আর কি করিয়াই বা উহাকে বুদ্ধের নূতন আবিষ্কার বলিয়া উল্লেখ করা যায় যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতিতে বর্ণনির্ব্বিভেদে মোক্ষলাভের উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে লেখক মহাশয় আপন কথা বজায় রাখিতে গিয়া অনেকগুলি অদ্ভুত কথা যুক্তি ও প্রমাণ একত্রে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

(১) লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "যুক্তিমূলক জ্ঞান সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবার কথা নহে; সুতরাং বিজ্ঞলোক তাহাকে হৃদয়গ্রাহী করিতে চাহিলে তাহাতে অযৌক্তিক, অলৌকিক কুসংস্কারপূর্ণ নানারূপ বিধান সংযোগ করিবেনই। পাতঞ্জলও তাহাই করিয়াছেন।" আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে লেখক মহাশয়ের উক্তি সত্ত্বেও বিনা প্রমাণে আমরা এ দুইটির মধ্যে একটি কথাও মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। তবে বোধ করি লেখক মহাশয় এ স্থলে আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিবার অভিপ্রায়ে "বিজ্ঞ" জনোপযোগী সনাতন প্রথাবলম্বন করিয়াছেন। বিজ্ঞজনেরা যে এরূপ "করিবেনই" তাহার কারণ কি বুঝিতে পারিলাম না আর পাতঞ্জলও যে তাহাই করিয়াছেন তাহারই বা প্রমাণ কোথায়? লেখক মহাশয়ের প্রথম কথাটি যদি সত্য হয়, তবে সমস্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণই জানিয়া শুনিয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পাশববৃত্তিতে পরিণত করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়া ছিলেন বলিয়া মানিয়া লইতে হয়; আর তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই যে সংসারের কোন প্রকার হিতসাধন না করিয়া বরং ঘোরতর অহিতসাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কিন্তু সুখের বিষয় কোন সরলমনা বিমল

শুভ্রপ্রকৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক অথবা প্রচারকই এবম্বিধরূপে অসত্যাচরণ করিয়া আপনাদিগকে, সত্যকে, ভগবান্‌কে কলঙ্কিত করেন নাই। লেখক মহাশয়ের সাধারণ সত্যটি কোন ভাবেই কোন ধর্ম্মবিশ্বাসীহৃদয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না সন্দেহ নাই। তবে লেখক মহাশয়ের মত গুটিকয়েক যুক্তিউপাসকের নিকট যদি তাহা সত্য বলিয়া পূজিত হয় তবে বলিতে পারি না। ধর্ম্ম দর্শন নহে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য আবদ্ধ থাকিবে। ধর্ম্ম দর্শনের ন্যায় শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত নহে, উহার সমগ্র মানবের অন্তর লইয়া কারবার। ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাদের বুদ্ধি হৃদয় ও আত্মা সমস্ত বৃত্তিগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করিয়া মানবজীবনের পরমোদ্দেশ্য সফল করিতে শিক্ষা দেয়। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই কোনকালে দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া অভ্যুত্থিত হয় নাই। আর কালেও যে কখন সেরূপ ঘটিবে তাহার সম্ভাবনাও অতি বিরল। কেননা, ধর্ম্মশাস্ত্র দর্শনের ন্যায় শুদ্ধ এ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া উপদেশ দেয় না, তদ্ব্যতিরেকে ইহাও বলেন যে, তুমি যদি এই বিধানবিহিত কার্য্য না কর, তবে এই এই রূপ শাস্তি পাইবে—তোমার চরমোদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই এইরূপ প্রতিবন্ধক ঘটিবে। ধর্ম্মনীতির এই sanction দর্শনে পাওয়া অসম্ভব। সাধারণের উপর প্রভাবশালী দর্শন এই কারণে প্রায়ই কোন না কোন ধর্ম্মমতের উপর গঠিত হইয়া আসিতেছে।

আমরা নিজ নিজ মনোবৃত্তি ও প্রবণতা অনুসারে ধর্ম্মমতের মর্ম্ম বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। তাই কালসহকারে কোন ধর্ম্মমত যখন সাধারণের মধ্যে অধিক বিস্তৃতি-লাভ করে তখন কাজে কাজেই আপনা হইতে ধর্ম্মমতের অবনতি ঘটিতে থাকে। এই কারণে কোন সত্যানুরাগী ব্যক্তিই সাধারণে গৃহীত মতকে সেই ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব বলিয়া গ্রহণ করেন না। এইরূপ ভাবে কোন ধর্ম্মমতের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তৎ-সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হয় না। কিন্তু লেখক মহাশয়ের নিকট সমস্তই উল্টা।

পাতঞ্জল যে সাংখ্যদর্শনের সহিত নানাবিধ কুসংস্কারপূর্ণ বিধান সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, লেখক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত ত তাহার কোনই প্রমাণ পাওয়া গেল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লেখক মহাশয় কিম্বা অপর কাহারও নিজের পরীক্ষার ফল ব্যতীত অপর কথায় আমরা কিছুই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই, এখনও তাহাই বলিতেছি।

(২) লেখক মহাশয় কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় নূতনত্বপ্রিয়, তাই নূতন ধরণের ভাষা প্রয়োগের প্রলোভন সহসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইতিপূর্ব্বে আমরা গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত দিয়াছি এখানে আবার একটি দেখুন। তিনি বলিতেছেন, "সাংখ্য একটী দর্শন, এবং যোগশাস্ত্র ঐ দর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট। প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদতত্ত্ব (?) কার্য্যতঃ সাধন করিবার নিমিত্ত পাতঞ্জল কতকগুলি অমূলক উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।" বিচ্ছেদতত্ত্ব কি বস্তু এবং সেই তত্ত্বকে কার্য্যতঃ সাধন করার অর্থ কি তাহা সহসা বোঝা যায় না। লেখক মহাশয় এরূপ ভাষার অপব্যহার করিলে সহজেই হয় কে নয় নয় কে

হয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন সে বিষয় আর আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত যোগশাস্ত্রকে যে কোন অর্থে সাংখ্যদর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট বলা যায় তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য মানবকে মোক্ষপদলাভ করিবার একটি বিশেষ উপায় বিধান করা। কপিলের মতে জ্ঞানের দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহার উপায় বিধান আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উহা কাহারও উপর নির্ভর করে না। পাতঞ্জলেরও উদ্দেশ্য তাহাই। উভয়েরই উদ্দেশ্য একই তবে কার্য্য-সিদ্ধির পক্ষে উপায় বিধান স্বতন্ত্র এই মাত্র প্রভেদ। একজন বলেন জ্ঞানের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিবে এবং সে জ্ঞানলাভের উপায় শাস্ত্রপাঠ ও নির্জ্জন চিন্তা, অপর ব্যক্তি এতৎসত্ত্বেও অপর একটি উপায় বিধান করিতেছেন, তিনি বলেন, বিশেষ প্রক্রিয়ার সাধনে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে যোগশাস্ত্রকে সাংখ্যদর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট বলা যায় তাহাত বুঝিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যটিতেও লেখক মহাশয় গায়ের জোরেই পাতঞ্জলের উপায়কে 'অমূলক' বলিয়াছেন। সাহিত্যে এরূপ গা জোরী কথা খাটে না। যোগশাস্ত্র বিশেষরূপে অধ্যয়ন ও তাহার প্রণালীমত কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া এ কথা বলা কোনক্রমেই শোভা পায় না। যোগবলের প্রভাব বিভিন্ন নামে বিভিন্ন আকারে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই উল্লেখ আছে দেখা যায়; এমন কি লেখক মহাশয়ের "বিশুদ্ধ" বৌদ্ধধর্ম্ম পর্য্যন্ত এ বিষয়ে ভিন্ন পথাবলম্বী নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের "অরহত" কাহাদের বলে লেখক মহাশয় তাহা জানেন না কি? লেখক মহাশয় যদি অদ্ভুত অলৌকিক ক্ষমতার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারেন তাহা হইলে শুদ্ধ আমার কেন সমগ্র মানবজাতির একান্ত কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এতকাল ধরিয়া যে সকল ক্ষমতার দোহাই দিয়া নানান্ কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকদেরই ধর্ম্মোচ্ছেদ করিয়া সত্যের পথে লইয়া গিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিবেন। আর তাহা যদি না পারেন তবে এ সকল কথা তাঁহার পক্ষে না বলাই ত সর্ব্বতোভাবে ভাল ছিল।

(৩) লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "এমন অনেকগুলি অপ্রামাণ্য বিষয় আছে যাহার সত্যের সহিত দূরান্বয়ে সম্বন্ধ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু যাহার অধিকাংশই মিথ্যা এবং অসম্ভব, এরূপ কোন বিষয়কে সমস্তটাই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়াকেই কুসংস্কার বলে।" কথাটি আমরা অতি সহজেই মানিয়া লইতে পারিতাম যদি প্রকৃত পক্ষে বিষয়গুলি "অপ্রামাণ্য," ও "মিথ্যা এবং অসম্ভব" হইত। লেখক মহাশয় সেইটুকু প্রমাণ করিয়া দিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম; কিন্তু লেখক মহাশয় সে দিক দিয়াই ঘেঁসেন নাই। তিনি তাঁহার কথাই যথেষ্ট প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে বলেন; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় সম্যক্ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা তাহা পারিলাম না। লেখক মহাশয়ের কথার ধরণ হইতে গ্রাধিয়ানোর উক্তিটি মনে পড়ে,—"আমার কথা

দৈববাণী, আমি যখন কথা বলিতে আরম্ভ করি তখন কুকুরেরা যেন ঘেউ ঘেউ না করে।" লেখক মহাশয় পাতঞ্জলের কুসংস্কারের একটি উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "যোগশাস্ত্রে উল্লেখ আছে যাহারা অষ্টসিদ্ধির মধ্যে লঘিমায় সিদ্ধিলাভ করে তাহারা সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া উপরে উঠিতে পারে।" লেখক মহাশয় স্বীকার করিতেছেন যে "ইহার মূলে কতকটা সত্য থাকিতে পারে।" কিন্তু কথা হইতেছে এই যে কতটুকু সত্য আছে, সত্যমিথ্যার ব্যবধানকারী রেখা লইয়াই যত মারামারি কি না, অতএব "কতকটা" বলিলে চলিবে না। তিনি পরে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর ভাবে বলিতেছেন, "সে সত্য হয়ত এইটুকু যে প্রকরণ বিশেষের দ্বারা শরীর খুব হাল্‌কা হয়।" কিন্তু কতদূর হাল্‌কা হয় তাহা কি উপায়ে জানিব? কুম্ভকের দ্বারা যোগীরা যে আসন ত্যাগ করিয়া শূন্যে অবস্থান করিতে পারেন তাহা কি লেখক মহাশয় দেখা দূরে থাকুক বিশ্বস্ত সূত্রে শুনেনও নাই? পরিশেষে লেখক মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, "কিন্তু সূর্য্যরশ্মি ধরিয়া উপরে উড্ডীন হওয়ারূপ ব্যাপার কখনো ঘটেও নাই, ঘটিবেও না এবং ঘটিতে পারেও না।" লেখক মহাশয় কি সংসারের সমস্ত ব্যাপার যাহা ঘটিয়াছে, ঘটিবে, এবং ঘটিতে পারা সম্ভব তাহার পূর্ণ তালিকা লইয়া বসিয়া এ কথা বলিতেছেন—তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার কথা নতশিরে মানিয়া লইতে হয়। মেস্‌মেরিজম ও অ্যানিম্যাল ম্যাগ্‌নেটিস্‌ম বিগত দশবৎসর পূর্ব্বে কয়জন লোকে ঘটিয়াছে, ঘটিবে এবং ঘটিতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন? মেসমারের কথায় কতজনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল তাহার বৃত্তান্ত লেখক মহাশয় কিছু জানেন কি? প্রমাণ ব্যতিরেকে যাহা তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবণতাও যেমন একপক্ষে কুসংস্কার তেমনি আবার উপযুক্তরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে যাহা তাহাকে হট্‌ করিয়া মিথ্যা বলিবার প্রবণতাকেও কুসংস্কার বলা যায়। লেখক মহাশয় কি সমাধির কথা কখন শুনেন নাই? যোগশাস্ত্রোক্ত প্রকরণের সাহায্যে সমাধির অবস্থা আসিলে যোগীরা বলেন আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া সজ্ঞানে যথা তথা এমন কি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া সূর্য্যলোকেও প্রয়াণ করিতে পারে। এ কথার সত্য-মিথ্যা বিচার করিতে হইলে স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয় অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির পরীক্ষার ফল গ্রহণ করিতে হয়, তদ্ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। দেহত্যাগ করিয়া আত্মার দূরে গমন বিলাতের আত্মতত্ত্বানুসন্ধানী সভার বিবরণীর মধ্যে অনেক স্থলে পাওয়া যায়। পূর্ব্ব হইতেই যদি আমাদের অজ্ঞাত বিষয়গুলি সমস্তই কুসংস্কার বলিয়া নিশ্চিন্ত-মনা হইয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানরাজ্যের সীমানা বিস্তারের কোন উপায় থাকে না ত, মানবউন্নতির পথে চিরকালের মত কাঁটা পড়িয়া যায়।

(৪) লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "বৈজ্ঞানিক থিওরি সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক কোন কালেই বিনা প্রমাণে মানিয়া লওয়া হয় না; হয়ত কালক্রমে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া সপ্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু যত দিন লোকে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াছিল, ততদিন অকারণে করে নাই।" কিন্তু যদি উহা মিথ্যাই হইল তবে আর সে প্রমাণের বল কোথায় রহিল! সত্যমিথ্যার ত আর কিছু পরিমাণ ভেদ নাই যে একটি দশ আনা মিথ্যা আর অপরটি তিন আনা পরিমাণ মিথ্যা! তবে আর ঐরূপ কথা বলিয়া লাভ কি! উপযুক্তরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করা এক কথা আর সেই "উপযুক্তরূপ" প্রমাণের কার্য্যতপক্ষে পরিমাণ নির্দ্দেশ করা অন্য কথা। শেষোক্ত কার্য্যটি অতিশয় সাবধানতা সহকারে না করিলে আমরা সহজেই ভ্রমে পতিত হই। কিম্বদন্তী ও শাস্ত্রবচনে আস্থা স্থাপন করা যদি কুসংস্কার হয়, তবে মানবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাও কি কুসংস্কারের মধ্যে পড়ে না? কেননা ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে অপর জাতীয় প্রমাণ বড় বেশী ত পাওয়া যায় না! প্রমাণ, বিশ্বাস, এবং সম্ভাব্য যুক্তি এই তিনটি একত্রে মিশাইয়া ফেলিয়া বুঝি লেখক মহাশয় এই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়াছেন?

৭ম প্রশ্ন। "একালের থিয়সফিষ্টেরা যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন" বলিতে থিয়সফিক্যাল সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রচারিত Esoteric Buddhism অথবা গুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মকেই বুঝায়। সিনেট-কৃত পূর্ব্বোক্ত নামধেয় পুস্তক খানির নূতন সংস্করণের উপক্রমণিকায় দেখিবেন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা Buddhismপদটির অর্থ কি। তিনি বলেন বুদ্ধ অথবা প্রাজ্ঞচক্ষু ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ মহাত্মাগণোপদিষ্ট ধর্ম্ম। লেখক মহাশয় জানেন নাকি বুদ্ধ একটি নাম নহে, উহা বিশেষার্থ-বোধক পদবী মাত্র? লেখক মহাশয় তাঁহার মত সমর্থনের জন্য মাদাম ব্লাভাট্‌সকী, মিশেস বেসাণ্ট প্রভৃতির উপর বরাত দিয়াছেন। কিন্তু মাদামের নিকট হইতে মীমাংসা প্রার্থনা করা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইতেছে না, লেখক মহাশয়ের বাসনা থাকে তিনি করিতে পারেন। তবে তাঁহার গ্রন্থাদি পড়িয়া যেরূপ মনে হয় তাহাই বলিতে পারি। তদ্বিরচিত Secret Doctrine নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় সিনেটের কথাই সমর্থন করিয়াছেন, লেখক মহাশয় ইচ্ছা করিলেই উহা দেখিতে পারেন। মিসেস বেসাণ্টের রচনাদি পড়িয়া আমার ঐরূপই মনে হইয়াছে তবে এখন আমার হাতে তাঁহার রচনা কিছু নাই, তাই উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিলাম না। আমি যতদূর জানি থিয়সফী সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ হইতেই পাওয়া যায় না যে, "যোগধর্ম্মের জটিলতা, অন্ধকার গাঢ়রহস্যতার সংমিশ্রণ বশতই থিয়সফিষ্টেরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।" লেখক মহাশয় যদি কোন পুস্তক হইতে তাঁহার মতের সাপক্ষে কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারেন তবে অবশ্য আমরা নিজমত প্রত্যাখ্যান করিয়া লেখক মহাশয়ের মত সাদরে গ্রহণ করিব, নচেৎ ঐরূপ উক্তি সম্পূর্ণ নিরর্থক।

লেখক মহাশয় যখন প্রফেটের আসন গ্রহণ করিয়াছেন তখন আর আমরা ক্ষুদ্র মানব তৎসম্বন্ধে কি বলিতে পারি! কালক্রমে থিয়সফী যে তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে তাহা আমরা বিনা কারণে তাঁহার কথায় কি করিয়া মানিয়া লই। লেখক মহাশয় কি কখন

শুনেন নাই যে প্রফেট স্বদেশে সমাদৃত হন না! তিনি এই প্রবচনটীর সাহায্যে আপনাকে আশ্বস্ত করিতে পারেন তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষোভের কারণ নাই।

তিনি স্বয়ং স্বীকার করিতেছেন যে, "থিয়সফিষ্টেরা আত্মোন্নতির নিমিত্ত এবং পৃথিবীর হিতার্থে যে অলৌকিক ক্ষমতালাভ করিতে চাহেন তান্ত্রিকেরাও সেই ক্ষমতালোলুপ এবং তাহারই জন্য প্রয়াসী কিন্তু তাহারা তাহাদের ক্ষমতা অসাধু উপায়ে লাভ করে এবং অসৎ প্রণালীতে পরিচালিত করে এই প্রভেদ এবং সে প্রভেদ বড় সামান্যও নহে।" এ কথা সম্পূর্ণ আমাদের মতানুযায়ী হোক বা নাই হোক তথাপি ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তি কিরূপে সঙ্গত হয় তাহা বুঝিতে পারিলাম না! "অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সাংখ্যমত দিয়া এক এক ধাপ করিয়া কিরূপে তান্ত্রিক ধর্ম্মে নামিয়া আসা যায়, বর্ত্তমান থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায় তাহার প্রমাণ স্থল" এ কথাটা নিতান্ত নিরর্থক নহে।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবনতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ মালতীমাধবে পাওয়া যায় তাহারি কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহার মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহাই বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে লেখক মহাশয় যেন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে যাহা মনে উদয় হয় তাহাই না লিখিয়া বসেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রচলিত মতামত পরিপাক করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

উপসংহারে আমার এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে মালতীমাধব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। কবি ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজে বৌদ্ধদের ঘৃণাস্পদ করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ ভাবে তাহাদের প্রদর্শিত করিয়াছেন। লেখক মহাশয়ের নিকট আশ্বাস পাইয়াই আমরা এই মত দিতে সাহসী হইলাম।

শ্রীহেমন্তকুমার রায়।

তদুত্তর।

হেমন্ত বাবু নিতান্ত চটিয়াছেন, এবং আমাদের প্রতি ও শোণিতের উত্তাপাধিক্য আরোপ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতির কারণ হওয়াতে দুঃখিত হইলাম, কিন্তু যতদূর স্মরণ হইতেছে আমরা অতিশয় ঠাণ্ডা মেজাজেই তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর লিখিতে বসিয়াছিলাম। তাহার প্রধান কারণ, শ্রমস্বীকার করিয়া কাহারো এই আলোচনার যোগ দিতে যে প্রবৃত্তি হইয়াছে ইহাতেই যথেষ্ট

আনন্দিত হইয়াছিলাম। কিন্তু হেমন্তবাবুর এবারকার লেখার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছে তিনি যাহার সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাকে নিতান্ত অযোগ্য বিবেচনা করেন। তাহাতে আমাদের দুঃখ নাই, দুঃখ এই যে তিনি কবিবচন বিস্মৃত হইয়া আত্মমর্য্যাদাহানি করিতে অগ্রসর হইলেন কেন ?

নীচ যদি উচ্চ ভাষে
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে,

তাহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু যখন তিনি সে বচন লঙ্ঘন করিয়া, তর্ক-ক্ষেত্রে নামিয়া আমাদের সম্মানিত করিয়াছেন তখন আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না,—হেমন্তবাবু আমাদের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

(১) আমি বলিয়াছি :—

"অনুমানটী" আমার স্বকপোলকল্পিত নহে, ঐতিহাসিকেরাই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

আর এক স্থলে বলিয়াছি :—

"ঐতিহাসিক পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা দেখিতে পান তাঁহার চোখে তাই বুদ্ধ কপিলের নিকট ঋণী বটে।"

এই দুইটী বাক্যে বিরোধাভাস থাকিলেও তাহাদের সংযোগ এইরূপ :—

ঐতিহাসিক জানেন পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে, ধারাবাহিকতা কিনা একটীর পর আর একটীর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সূত্রে আবির্ভাব। সাংখ্যদর্শন বৌদ্ধধর্ম্মের অগ্রজ, তাই সেই ধারাবাহিকতা-আইনজ্ঞ ঐতিহাসিক অনুমান করিতেছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মও সাংখ্যদর্শনে কিছু সম্বন্ধ আছে, হয়ত একটী আর একটীর দ্বারা প্ররোচিত। এই অনুমানের তাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা। ঐতিহাসিক কোন 'সম্বন্ধ' "সৃষ্টি" করেন না সত্য, প্রথমে 'অনুমান' করেন যে সম্বন্ধ আছে, তাহার পর সে সম্বন্ধ কোথায় কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহা 'আবিষ্কার' করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। তাই বলিয়াছি পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের উপর পূর্ব্ববর্ত্তী সাংখ্যদর্শনের কতকটা প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে এই অনুমানের সৃষ্টিকর্ত্তা ঐতিহাসিক।

(২) আত্মবিস্মরণই যে বিধিলিঙ বিভক্তির উল্লেখ না করিবার কারণ তাহা নহে ; ঐ শব্দটা ব্যবহার না করিবার অন্য উপযুক্ত কারণ ছিল। লট্ এবং লোট্ বলাই আমার অভিপ্রায়, দর্শনকে লট্ বলিতে চাহি অর্থাৎ Indicative—Present এবং ধর্ম্মকে লোট বলিতে চাহি অর্থাৎ Imperative (আশা করি ইংরাজী প্রতিশব্দে জিনিষটার অর্থ সরল হইবে !) দর্শন যুক্তির সাহায্যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে "পরপীড়ন করিলে অন্যায় ব্যবহার হয়" ; ধর্ম্ম বলিতেছে, "পরপীড়ন করিও না।" তাই বলিয়াছিলাম একটার রূপ লট্ বিভক্তিতে আর একটার রূপ লোট্ বিভক্তিতে। হেমন্তবাবু বলিতেছেন আমার মনোভাব এক কিন্তু ভাষায় প্রকাশ পাইতেছে তাহার সম্পূর্ণ

বিপরীত। তিনি আমাতে যে মনোভাব আরোপ করিয়াছেন, ভাষায় তাহার বিপরীত প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কারণ ভাষা আমার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে।

(৩) হেমন্তবাবু তাঁহার প্রথম প্রতিবাদে বলিয়াছিলেন "কপিলের দর্শনের নাম সাংখ্যদর্শন অর্থাৎ যুক্তিমূলক দর্শনশাস্ত্র। এইরূপ শ্রেণীর দর্শনকে ইংরাজীতে বলে Synthetic Philosophy অথবা Philosophy based on synthetic reasoning, এ শ্রেণীর গ্রন্থে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা হয়, তাহার বিশেষ উল্লেখ থাকে না।"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম "ইংরাজীতে যাহাকে Synthetic Philosophy বলে, সাংখ্যদর্শন তাহার অন্তর্ভূ‍ক্ত কিনা তাহা বিচার্য্য। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে এ তর্ক নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া আমরা নিবৃত্ত হইলাম।"

অপ্রাসঙ্গিকতা ভয়ে আমরা সে তর্ক হইতে নিবৃত্ত হইবার অভিপ্রায়ে শুধু বলিয়াছিলাম "বিচার্য্য"। তাহা না হইলে স্পষ্টই বলিতে পারিতাম ইংরাজীতে যাহাকে Synthetic Philosophy বলে সাংখ্যদর্শন তাহার অন্তর্ভূ‍ক্ত নহে, কারণ সাধারণ অর্থে Synthetic Philosophy বলিয়া কোন পদার্থ নাই। তিনি যদি বলিতেন Psychology based on synthetic reasoning তাহা হইলে আমরা আপত্তি না করিলেও করিতে পারিতাম।

যদি বলা যায় কোন-কিছু "is based on synthetic reasoning", তাহা হইলে সেই কোন-কিছুকে বিজ্ঞান বুঝায়।

যদি বলা যায় Philosophy based on synthetic reasoning, তাহা হইলে হার্বার্ট-স্পেন্সার্ যে অর্থে ঐ কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাই বুঝায়, অর্থাৎ এমন একটা Philosophy যাহা দুই ভাগে বিভক্ত—(১) Science of Sciences, i, e, Philosophy of the Knowable, অর্থাৎ সমস্ত বিজ্ঞান মন্থন করিয়া যে সারতত্ত্ব পাওয়া যায়, এবং (২) Science of Intuitive beliefs, i, e, Philosophy of the Unknowable, অর্থাৎ সমস্ত Intuitive beliefs এর Facts জড় করিয়া generalize করিয়া যে সারতত্ত্ব পাওয়া যায়। (এই বিভাগের অস্তিত্বে, হেমন্ত বাবুর শেষ কথাটাও ভ্রান্তি দাঁড়াইতেছে যে "এ শ্রেণীর গ্রন্থে বিশ্বাসমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করা হয়, তাহার বিশেষ উল্লেখ থাকে না।") Mental Facts এর উপর synthetic reasoning খাটাইয়া যেটা খাড়া করা যায় তাহাকে Mental Science বা Psychology বলে, সেটা দর্শন বা Metaphysics নহে। Mental Facts ও জ্ঞানের "বিষয়"; কিন্তু সেই "বিষয়ের" অতীত "বিষয়ী" যে আত্মা তাহার সম্বন্ধে আলোচনা এবং সেই আত্মা, পরমাত্মা ও মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধীয়—synthetic যুক্তির অতীত তত্ত্বকেই দর্শন বা Metaphysics বলা যায়।

দর্শনকে synthetic reasoning এর উপর based বলিলে তাহার কোন অর্থ হয় না,

কারণ সকলের গোড়ার তত্ত্ব যা কিছু দর্শনের বিশেষ আলোচ্য বিষয় তাহাকে যে স্পেন্সার "Unknowable" এর বিভাগে ফেলিয়া দিয়াছেন, তাহার মানেই এই যে synthetic reasoning ওখানে হালে পাণি পায় না।

আবার সাংখ্য-দর্শনকে দর্শন বলিব কি মনোবিজ্ঞান বলিব তাহাও ভাবিবার বিষয়। এত যেখানে গোলযোগ রহিয়াছে সেখানে যে আমরা "বিচার্য্য" বলিয়াছি, তাহাতে আমাদের কিছু অপরাধ হয় নাই। এরূপ জটিল, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার এ স্থানও নয়, সময়ও নয়।

(৪) হেমন্ত বাবু বলিতেছেন "সকলেই প্রায় বলে যে বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব অপর কিছুতে না হৌক তাঁহার নীতিতন্ত্রে" কিন্তু লেখক মহাশয়ের নিকট সে কথাটা অমূলক। "সকলেই" যে উহা বলেন না তাহা জানি, কেহ কেহ বলেন কি না বলিতে পারি না, হেমন্ত বাবু তাঁর "সকলের" ভিতর দুই একজনের নাম করিলে ভাল করিতেন। অনেকেই যে বলেন না তাহার প্রমাণস্বরূপ, আমরা হেমন্ত বাবুকে Dr. Rhys Davids এর Buddhism, রমেশ বাবুর Ancient India, এবং Weber সাহেবের History of Indian Literature পড়িতে অনুরোধ করি।

(৫) আমি বলিয়াছি "বুদ্ধ যে জ্ঞাতসারে সাংখ্যদর্শনের উপর তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন এমন নহে।" এখানে 'জ্ঞাতসারে' কথাটী হেমন্তবাবু এই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন যেন তাহাতে বুঝাইতেছে যে বুদ্ধ সাংখ্যদর্শনে অনভিজ্ঞ ছিলেন। আমার অভিপ্রায় তাহা নহে, জ্ঞাতসারে ভিত্তি স্থাপন করেন নাই ইহাই বলা আমার অভিপ্রায়। হেমন্তবাবুই বলিতেছেন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ কথনই দর্শনের উপর ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করেন না, তাঁহারা এক প্রকার অমানুষিক তেজ ও বিশ্বাসের বলে সত্য প্রচার করেন। আমাদেরও সেই মত। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ জ্ঞাতসারে কথন কোন বিশেষ দর্শনের উপর ধর্ম্ম অধিষ্ঠান করেন না, কিন্তু কোন কোন বিশেষ দর্শন বা মত তাঁহাদের পাইয়া বসে, তাই এক অমানুষিক তেজ ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন।

(৬) হেমন্তবাবুও মানিতেছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্নিহিত দর্শন এবং সাংখ্যদর্শনে কতক মিল আছে। এখন কথা হইতেছে সে মিল 'মানবচিন্তাপদ্ধতির সাম্যের মিল' কি 'ধার করা মিল'। অবশ্য উভয়ই। আমরা ধার করা মিল কাহাকে বলি? যথন পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মতের সহিত তাহার পরবর্ত্তী মতের (বিশেষতঃ এস্থলে যেরূপ ঘটিয়াছে প্রায় অব্যবহিত পরবর্ত্তী মতের এবং একই প্রদেশের) মিল থাকে তথন ঐতিহাসিকের প্রথমটীর সহিত দ্বিতীয়টীর মিলকে ধার করা মিল বলিবার অধিকার হয়। এবং মানবচিন্তাপদ্ধতির সাম্যবশতঃই একজন আর একজনের মত ধার করিয়াছেন কারণ সাম্য না থাকিলে একজনের মত আর একজনের মনে লইত না।

(৭) বাইবেল হইতে ভগবদ্গীতার জন্ম সপ্রমাণ হইতে পারে না আমি বলি নাই।

আমি বলিয়াছি বাইবেল হইতে যে ভগবদ্গীতার জন্ম, ইহা বিশ্বাস করা বহুল প্রমাণ সাপেক্ষ। সাংখ্যদর্শন হইতে যে বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম তাহা বিশ্বাস করিতে খুব বেশী প্রমাণের আবশ্যক করে না, উহাদের গোটাকতক মোট মিল দেখাইতে পারিলেই উহাদের জন্মদাতাগণের দেশ, জাতি ও আচারগত মিল স্মরণ করিয়া সহজেই বিশ্বাস হয় যে একটী আর একটীর নিকট ঋণী।

(৮) হেমন্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, নিরীশ্বর শাস্ত্র ও শাস্ত্রপ্রণেতা নিরীশ্বরবাদী, এতদুভয়ের মধ্যে আমাদের নিকট কোন প্রভেদ আছে কি না। বিলক্ষণ আছে, তাই আমরা বারবার বলিতেছি "কোন বিশেষ ধর্ম্মমত কিম্বা দার্শনিক মতকে বিচার করিতে হইলে সে যে আকার ধরিয়া সাধারণের সম্মুখে আবির্ভাব করিয়াছে তাহাকে সেই আকারসম্পন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্মদাতার হৃদ্গত বিশ্বাস অবিশ্বাসের সহিত তাহাকে জড়িত করিলে চলিবে না। হয় ত বা বুদ্ধ নিজে ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু পলিসির খাতিরে তাঁহার ধর্ম্মে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলেন নাই, সেজন্য তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে আমরা ঈশ্বরপ্রধান ধর্ম্ম বলিতে পারি না, তাহার আকার দেখিয়া তাহাকে নিরীশ্বর ধর্ম্মই বলিতে হইবে।"

আমরা যে স্থলে বলিয়াছিলাম "উভয়েই নিরীশ্বরবাদী" সেস্থলে উভয়ের শাস্ত্রের আলোচনা চলিতেছিল, হৃদ্গত বিশ্বাসাবিশ্বাসের আলোচনা নহে, সেই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম উভয়েই নিরীশ্বরবাদী অর্থাৎ তাঁহাদের শাস্ত্রে নিরীশ্বরবাদী। প্রসঙ্গের সহিত সংযোগে কথার মানে একরূপ দাঁড়ায়, প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহার অর্থ অন্যরূপ হয়। হেমন্ত বাবু এই শেষ পথে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

(৯) আমি বলিয়াছি, "সাধনের পথ সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে বিভক্ত, তাহার সর্ব্বোচ্চ ধাপে উঠিতে পারিলে কি না, নির্ব্বাণে পৌঁছিলে মুক্তি হইল। কেননা নির্ব্বাণই মুক্তি।"

এখানে হেমন্তবাবুর কোথায় গোল ঠেকিয়াছে, বুঝিতেছি। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন আমি বলিতেছি নির্ব্বাণ মুক্তির প্রতিশব্দ। তাহা হইলে আমার কথাটা দাঁড়ায় এইরূপ— "মুক্তিতে পৌঁছিলে মুক্তি হইল"—ইহার কোনই অর্থ হয় না। "নির্ব্বাণই মুক্তি" এই পদে নির্ব্বাণ ও মুক্তি এই দুইটি শব্দকে বিশেষ্য ও প্রতিপাদ্যরূপে বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধদের মুক্তির "আইডিয়া" নির্ব্বাণ। কোন কোন হিন্দুর মুক্তির আইডিয়া 'সালোক্যং' অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা; কাহারও বা আইডিয়া "সাযুজ্যং" অর্থাৎ তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়া; কাহারও বা আইডিয়া "সামীপ্যং" অর্থাৎ তাঁহার নিকটে থাকা। এইরূপ বিভিন্নমতাবলম্বীর মুক্তির আইডিয়াও বিভিন্ন প্রকারের।

(১০) আমার প্রবন্ধে বুদ্ধের একটী নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের কথা উল্লেখ করি। প্রতিবাদক মহাশয় তত্ত্বটী কি জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করি বৌদ্ধধর্ম্মনিহিত দর্শন। আমি বলিয়াছিলাম, ঐতিহাসিক হিসাবে এ তত্ত্বের অধিকাংশ তাঁহার নবাবিষ্কার নহে কারণ কপিল তাঁহার আগেই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাব হইতে তাঁহার

পক্ষে এ তাঁহারই স্বাবিষ্কৃত বটে ; কারণ তাঁহার জীবন দিয়া মণ্ডিত হইয়া তাঁহার নিকট ইহা নূতন সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

হেমন্তবাবু বলিতেছেন "লেখক মহাশয় প্রথম প্রবন্ধে বুদ্ধের একটী নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের উল্লেখ করেন। তত্বটি কি জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিয়াছেন, 'সার্ব্বভৌমিকতা'।" স্পষ্টই বলিতে হইল ইহা misrepresentation of facts ; আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ তাঁহাকে আমার (১) চিহ্নিত উত্তর পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। (তাহার সারমর্ম্ম উপরে লিখিয়াছি) এবং বলিয়াছিলাম "তাহার উপর আর একটু বক্তব্য এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব তাহার সার্ব্বভৌমিকতায়। বর্ণ বিচার না করিয়া বুদ্ধদেব যে হতভাগ্য শূদ্রকেও মুক্তির অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ব।" ইহা হইতে আমাদের বিবেচনায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না :—

"এখন আমার (প্রতিবাদকের) জিজ্ঞাস্য এইমাত্র যে কি অর্থে উহাকে (সার্ব্বভৌমিকতাকে) তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।"

হেমন্তবাবুর ছলনাময়ী কল্পনা আবার তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে ; একবার সে তাঁহাকে সম্বাদ দিয়াছিল আমাদের যে প্রকৃত মনোভাব ভাষায় প্রকাশ পাইয়াছে, সেটা অপ্রকৃত, এবং যেটা সে ভ্রান্তভাবে কল্পনা করিতেছে সেইটেই প্রকৃত। আবার এ স্থলে যে কথাটা আমরা আদৌ বলি নাই সেইটেই আমরা বলিয়াছি বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়া তিনি সেই অস্তিত্বহীন কথার প্রতিবাদ করিতে বসিলেন। অতএব কোন অর্থে সার্ব্বভৌমিকতাকে তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কি না সে বিচার আপাততঃ আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার এতৎসংক্রান্ত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। সে প্রশ্ন এই :—

"কি করিয়াই বা বুদ্ধের উহাকে নূতন আবিষ্কার বলা যায়, যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাংখ্যদর্শন প্রভৃতিতে বর্ণনির্ব্বিভেদে মোক্ষলাভের উপায় বিধান করা হইয়াছে।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বৌদ্ধধর্ম্মের কনিষ্ঠ, অতএব উহার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।

সাংখ্যদর্শন ধর্ম্মগ্রন্থ নহে শুধু দর্শন। উহাতে মোক্ষ কি, তাহাকে কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে এই সকল দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হয়। বর্ণনির্ব্বিভেদে সকলেই মোক্ষলাভে অধিকারী কি না তাহা বিচারিত হয় না, অতএব উহার নামোল্লেখও বৃথা।

হিন্দুশাস্ত্র এ বিষয়ে কি বলে তাহাই দেখা আবশ্যক। এবং তাহার যে এ সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। শূদ্র শম্বুক ভগবানের তপস্যা করিয়া পাপাচরণ (?) করিতেছিল বলিয়া পৃথিবীতে অকালমৃত্যু উপস্থিত হইল, দুষ্টশাসন রামচন্দ্র তাহাকে নিহত করিয়া পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে প্রয়াসী হইলেন, এই কি বর্ণনির্ব্বিভেদে মোক্ষলাভের অধিকার ?

(১১) দুঃখের বিষয় এই যে সেকালের "ধর্ম্মবিশ্বাসীহৃদয়", পৌত্তলিকতা এবং নানাবিধ বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের অসত্যতা জানিয়াও, অজ্ঞলোকের সুবিধার্থে সেই সকল বিধি অনুমোদন করিয়া "আপনাদিগকে, সত্যকে, ভগবান্‌কে কলঙ্কিত করিয়াছেন।"

তাঁহারা বলিতেছেন —

"উপাসকানাং হিতার্থে ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"

যে পৌত্তলিকতা সাধারণের হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়া হৃদয়ের ঔদার্য্য, জ্ঞানের উন্নতি ও বিস্তৃতি রোধ করিয়া রাখিতেছিল, তাহা দূর করিবার জন্য নিরলস ভাবে যত্নশীল না হইয়া, প্রকারান্তরে তাহাতে সম্মতি দিয়া সংসারের অনেকটা অহিত সাধন করিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

"ধর্ম্ম দর্শন নহে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য আবদ্ধ থাকিবে &c." এখানে এতখানি অপ্রাসঙ্গিক কথার সার্থকতা বোঝা গেল না।

(১২) "সাংখ্য একটী দর্শন, এবং যোগশাস্ত্র ঐ দর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট ; কারণ "as a system of philosophy yoga is valueless ; all its fundamental maxims about the soul and intellect and sensations, about the transmigration of souls, and their eternity and final emancipation by knowledge are those of the Sankhya Philosophy." *

পাতঞ্জলেরও উদ্দেশ্য প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদ, কিন্তু কপিল যে বলিয়াছিলেন শুধু জ্ঞানের দ্বারাই তাহা হওয়া সম্ভব পাতঞ্জল তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। তিনি কপিলের philosophy গ্রহণ করিয়া তাহা সাধন করিবার জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, বিধান করিলেন। তাই উহাকে বলা যাইতে পারে কপিলের দর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট। পুরুষ হইতে প্রকৃতির বিচ্ছেদ প্রার্থনীয় তিনি মানিলেন এবং তাহা কার্য্যতঃ সাধন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি ব্যায়াম নির্দ্দেশ করিলেন।

(১৩) "বিশুদ্ধ" বৌদ্ধধর্ম্মের অর্হত সম্বন্ধে হেমন্ত বাবুর ভ্রান্ত ধারণা আছে দেখিতেছি, তাহারা কোন কিস্তূতকিমাকার পদার্থ নহে, নিতান্ত নিরীহ প্রাণী।

বৌদ্ধসাধুর সাধনের পথ চারিটী সোপানে বিভক্ত। প্রথম সোপান—দীক্ষা ; (১) সাধুসঙ্গ, (২) সদ্ধর্ম্মশ্রবণ, (৩) সচ্চিন্তা, কিম্বা (৪) সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ লোকে দীক্ষিত হইয়া থাকে। এই দীক্ষার অবস্থায় লোকে (১) অহংজ্ঞান, (২) বুদ্ধ এবং তাঁহার ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস, এবং (৩) বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের সার্থকতার প্রতি বিশ্বাস, এই তিনটী দোষ হইতে মুক্ত হয়েন।

দ্বিতীয় সোপান—যাঁহারা এই সোপানে আরোহণ করেন তাঁহারা কেবল আর একবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। অবিশ্বাস, ভ্রান্ত আত্মজ্ঞান ও আনুষ্ঠানিকতা-

* R. C. Dutt's "Ancient India."

বর্জ্জিত দীক্ষিত ব্যক্তি এই অবস্থায় কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে যথাসাধ্য দমন করেন।

তৃতীয় সোপান—যাঁহারা এই সোপানে আরোহণ করেন তাঁহাদের আর এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। দ্বিতীয় সোপানে তাঁহাদের রিপুদমনের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল এখানে তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ করেন ; এতটুকুও নীচ, জঘন্য প্রবৃত্তি আর বাকী থাকে না, কিম্বা পরের প্রতি মন্দভাব ও হৃদয়ে উদয় হয় না।

চতুর্থ সোপান—এই সর্ব্বোচ্চ সোপানে যাঁহারা উঠিতে পারেন, তাঁহারা অর্হত। এই অবস্থায় সাধু, শরীরী অশরীরী সর্ব্বপ্রকার জীবনেচ্ছাশূন্য হয়েন ; অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা হইতে মুক্ত হয়েন। তিনি এখন সর্ব্বপাপ মুক্ত, সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এখন তাঁহার মনে শুধু নিজের জন্য পুণ্য বাসনা, পরের জন্য স্নেহ, প্রেম করুণা জাগিতেছে—ইহাই নির্ব্বাণ। যাঁহারা দৃঢ়চিত্তে পাপকে বিসর্জ্জন দিয়া, গৌতমের শিক্ষাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা এই চতুর্থ অবস্থার ফল প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বানানন্দ উপভোগ করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মফল অবসিত হইয়াছে, কোন নূতন কর্ম্ম আর উদ্ভাবিত হইতেছে না ; তাঁহাদের হৃদয় পুনর্জন্মের স্পৃহা-শূন্য ; তাঁহাদের জন্মের কারণ অবসিত হওয়ায়, তাঁহাদের চিত্তে কোন নূতন আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় না ; এই বুদ্ধগণ প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছেন।

বুদ্ধের উপদেশে ইদ্ধি বলিয়া একটা কথা আছে। ইদ্ধিলাভের নিমিত্ত চারিটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "In later Buddhism Iddhi means supenatural powers, but what Gautama meant was probably the influence and power which the mind by long traning and exercise can acquire over the body." *

অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মে যে ইদ্ধির অর্থ অলৌকিক ক্ষমতা দাঁড়াইয়াছে ঐতিহাসিকগণের তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ এই যে কেহ যে কখন ইদ্ধিপদলাভ করিয়া অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছে কোন বৌদ্ধগ্রন্থে এমন কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মে যে প্রকার ধ্যানের নামোল্লেখ আছে সে ধ্যানের অর্থ এই :—

The first Dhyan is a state of joy and gladness born of seclustion full of reflection and investigation, the mendicant having separated himself from all sensuality and sin.

The second Dhyan is a state of joy and gladness born of deep tranquillty without reflection or investigation, these being suppressed ; it is the tranquillization of thought, the predominance of intuition.

In the third Dhyan the mendicant is patient by gladness and the destruction of passion, joyful and conscious, aware in his body of that delight which the Arhats annonuce, patient, recollecting, glad.

* R. C. Dutt's Ancient India.

The fourth Dhyan is purity of equanimity and recollection without sorrow and without joy, by the destruction of previous gladness and grief by the rejection of joy and the rejection of sorrw. *

(১৪) হেমন্ত বাবুর সমস্ত প্রবন্ধের বিদ্বেষহলাহল মন্থন করিয়া এতক্ষণে একটা সার কথা পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলিতেছেন "প্রমাণ ব্যতিরেকে যাহা তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রবণতাও যেমন একপক্ষে কুসংস্কার তেমনি আবার উপযুক্তরূপ প্রমাণ ব্যতিরেকে যাহা তাহাকে হট্ করিয়া মিথ্যা বলিবার প্রবণতাকেও কুসংস্কার বলা যায়।" কথাটা ঠিক; তাইত কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করিয়াছেন যে কোন একটা লোকে দুই আর দুইয়ে পাঁচ হওয়া অসম্ভব নহে।

সে হিসাবে সূর্য্যরশ্মি বাহিয়া উপরে উঠা অসম্ভব নহে বলিতে হইবে। কিন্তু হেমন্ত বাবু যে আমাদের ইহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহার সত্যাসত্যতা বিচার করিতে অনুযোগ করিয়াছেন, আমরা তাহাতে কিছু চিন্তিত হইয়াছি; তিনি আমাদের অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাপ করিবেন, আমরা মর্ত্তালোকে বেশ একরকম আছি, সূর্য্যলোকে প্রয়াণ করিবার সাধও নাই, সুবিধাও নাই, সাবকাশও নাই। তাঁহার এ সম্বন্ধে অনেক জানাশুনা আছে দেখিতেছি, তিনি এই সামনের পূজার ছুটীটা অবলম্বন করিয়া একবার সূর্য্যলোকটা ঘুরিয়া আসিয়া তাঁহার পরীক্ষার ফলাফল জ্ঞাপন করিলে আমরা বিশ্বস্তচিত্তে তাহা গ্রহণ করি রাজী আছি।

(১৫) পৃথিবীতে "Absolute truth" কিছু নাই। তাই আজ যাহা সত্য কাল তাহা মিথ্যা দাঁড়াইতে পারে। তাই বলিয়া আজ যাহা সত্য তাহা আংশিক পরিমাণে সত্য নহে, আমাদের পক্ষে তাহা পুরোপুরি ষোলআনা পরিমাণেই সত্য। বৈজ্ঞানিক থিওরির সত্যাসত্যতা কিরূপে নির্ণীত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। এ পর্য্যন্ত ঈথরের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া তাহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভৌতিক ক্রিয়ার রহস্যোদ্ভেদ হইতেছে। সুতরাং ঈথরের অস্তিত্ব সত্য, ষোলআনা সত্য। যদি এমন একটা কোন ভৌতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়—ঈথরের থিওরির সাহায্যে যাহার কোনই কূলকিনারা করিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না, তখন ঈথরের থিওরির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, তখন আর একটা নূতন থিওরি উদ্ভাবিত হইবে, তখন পূর্ব্ব থিওরি মিথ্যা, ষোলআনা মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

শাস্ত্রবচন এবং কিম্বদন্তী ব্যতীত আর কোন প্রমাণের আবশ্যকতাকে বাহুল্য জ্ঞান করাকেই কুসংস্কার বলে। অন্যান্য প্রমাণ, শাস্ত্রবচন এবং কিম্বদন্তীর সাপক্ষতা করিলে উহাদের প্রতি আস্থা কুসংস্কার নহে। মানবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ

* Rhys Davids' Buddhism.

আছে কি না আছে সে ত একটা গুরুতর তর্কের বিষয়। আমরা বলিতেছি শাস্ত্রবচন ও কিম্বদন্তী ব্যতীত ও মানবাত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের অন্য প্রমাণ আছে। হেমন্ত বাবু বলিতেছেন শাস্ত্রবচন ও কিম্বদন্তী ব্যতীত উহাদের অন্য প্রমাণ নাই। ইহা আর একটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন তর্কের বিষয়।

(১৬) সিনেটের "Esoteric Buddhism" কি? উহা আগাগোড়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যে Exoteric Buddhism এর অন্তরালে একটী Esoteric Buddhism নিহিত রহিয়াছে। তিনি সেই Esoteric Buddhism এর একটা মস্ত অট্টালিকা গড়িয়া তুলিয়াছেন; কিন্তু উহার মালমশলা যে কেবলমাত্র "Later Buddhism" হইতে সংগৃহীত নয়, মৌলিক Buddhism এর ভাণ্ডার হইতেও সাহায্য পাইয়াছেন, তাহার কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারেন নাই।

Esoteric Buddhism আপাদমস্তক "যোগধর্ম্মের জটিলতা, অন্ধকার গাঢ়রহস্যতার সহিত সংমিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম্মের" সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। Exoteric কে নিম্নস্থান দিয়া Esoteric কে উচ্চস্থান দেওয়াই বুদ্ধের উপদেশের বিরুদ্ধ। থিয়সফিষ্ট বৌদ্ধেরা তাহাই করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা গৌতমের মৌলিক বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে বিকৃত করিয়াছেন বলিতেই হইবে।

থিয়সফিষ্টগণকে যে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তান্ত্রিক ধর্ম্মে নামিয়া আসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল বলিয়াছি তাহার কারণ এই। আজকালকার দিনে মার্জ্জিতবুদ্ধি ইংরাজেরা যখন এত সহজেই মাদাম ব্লাভাট্‌স্‌কির ফাঁদে ধরা পড়িলেন, ক্রিস্‌চ্যানিটি হইতে একটা বড় রকম লাফ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে Esotericism টানিয়া বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা হইলে সেকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয় ভারতবাসী দুদিনেই যে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সাংখ্যমত, সাংখ্যের সহিত যোগ, যোগের সহিত তান্ত্রিকতা মিশাইয়া ফেলিবে তাহা সহজেই বোধগম্য হয়।

(১৭) হেমন্ত বাবু বলিতেছেন "আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে লেখক মহাশয় যেন দার্শনিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে যাহা মনে উদয় হয় তাহাই না লিখিয়া বসেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রচলিত মতামত পরিপাক করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।"

হেমন্তবাবুর দাম্ভিকতা বিস্ময়জনক। সাহিত্যসংগ্রামে বিপক্ষের প্রতি অশিষ্টভাষা প্রয়োগ না করিলে লোকে যে তাঁহার পাণ্ডিত্যে সন্দেহ প্রকাশ করিবে এই সংস্কারটী হেমন্ত বাবুর হৃদয়ে বদ্ধমূল দেখিতেছি। এ ভ্রান্ত সংস্কার তাঁহার হৃদয় হইতে যত শীঘ্র উৎপাটিত করিতে পারেন, তাঁহার সুনামের পক্ষে ততই মঙ্গল।

হেমন্ত বাবু বলিতেছেন "মালতী মাধব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। কবি ব্রাহ্মণদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজে বৌদ্ধদের ঘৃণাস্পদ

করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ ভাবে তাহাদের প্রদর্শিত করিয়াছেন।” এখানে তিনি আমাদের পূর্ব্ব প্যারাগ্রাফে যে উপদেশ দিয়াছেন, সেটা অনুসরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন।

এই সংখ্যা ভারতীতে শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহের "শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালের" একস্থলে রহিয়াছে "পূর্ণবর্দ্ধন এবং রাজ্যবর্দ্ধন অতি সদাশয় এবং মহৎচরিত্র সম্পন্ন ছিলেন। ইহা যে কেবল বৌদ্ধগণ লিখিয়া গিয়াছেন এমত নহে। ব্রাহ্মণ বাণভট্ট, বৌদ্ধনরপতি রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী হিন্দুনরপতি "গৌড়েশ্বর" নরেন্দ্র গুপ্ত শশাঙ্ককে "চণ্ডালাধম" লিখিয়াছেন ! ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ভারতের পুরাতত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে বৌদ্ধচরিত্রের মহত্ত্ব এবং হিন্দু চরিত্রের নীচাশয়তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

হেমন্ত বাবু ভবভূতির প্রতি যে হীন উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিলে ভবভূতির প্রতি, কবি-সাধারণের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়। যে প্রশংসার্হ নিতান্ত নীচমনা না হইলে কেহ কখন তাহাকে নিন্দার্হ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে না। কৈলাশ বাবুর পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য হইতে দেখা যাইতেছে, হিন্দুরাও প্রশংসার্হ বৌদ্ধকে বরাবর প্রশংসা করিয়াছেন। ভবভূতিই শুধু সে উদারতাবর্জ্জিত হইবেন? তাহার অপেক্ষা আর একটী সহজ যুক্তি পড়িয়া রহিয়াছে এই যে বাস্তবিকই তখন বৌদ্ধর্ম্মের যে অবনতি হইয়াছিল, কবি তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। ইতিহাসও ইহা সমর্থন করিতেছে। তিব্বতের লামাগণের নানা প্রকার বুজ্‌রুগি তাহার প্রধান প্রমাণ।

আর কামন্দকীকে ঘৃণাস্পদ করা কবির অভিপ্রায় হইতে পারে না—তাহা সাহিত্য-কলাবিরুদ্ধ।

ভবভূতি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় প্রদান করিবার সময় বলিয়াছিলেন তাঁহারা যোগে কৃতী ছিলেন। ভবভূতির যোগের প্রতি, যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতালাভের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর যোগাভ্যাস করাকে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির লক্ষণ স্বরূপে দেখিতেছেন না। তাহা যদি দেখিতেন কামন্দকীর মুখে প্রশংসার ভাবে বলাইতেন না "সৌদামিনীর পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে।"

এই সকল নানা কারণে আমরা হেমন্তবাবুর মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

আপাততঃ আমাদের কর্ম্মফল অবসিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নির্ব্বাণ প্রাপ্তির স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তবে "কম্ব্‌লি" আমাদের ছাড়িবেন কি না বলিতে পারি না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

লালা গোলকচাঁদ। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত। এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত।

নাটকখানি "পারিবারিক" কিন্তু ইহার গল্প আষাঢ়ে। পুলিনবিহারী ভ্রাতার চক্রান্তে দ্বীপান্তরিত হইলেন। সেখান হইতে কৌশলে পলায়ন পূর্ব্বক সিংহপুরের রাজপুত্র লছমী নারায়ণের প্রভূত গুপ্তধনের অধিকারী হইয়া লালা গোলকচাঁদ-রূপে দেশে আসিয়া দেখা দিলেন। ইহাতে খ্যাতনামা ফরাসীস উপন্যাসলেখক আলেকজাণ্ডার ডুমার রচিত কাউণ্ট্ মণ্টিক্রুষ্টর ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহাহউক নাটকখানি পড়িতে লাগে ভাল। বইখানি ঘটনাবহুল, ঘটনা লোমহর্ষক ও করুণরসাত্মক, অভিনয়ে লোকরঞ্জনের উপযোগী। তবে ইহাতে সম্যকরূপে দেশ কাল পাত্র ও ঘটনার সঙ্গতি রক্ষা হয় নাই।

যুগল চিত্র। ঐ। পুস্তকখানি নববধূদিগকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহাতে দুইটি বঙ্গবধূর স্বভাব চিত্রিত। একজনের নাম শান্তি, একজনের নাম লীলা। শান্তি "পরশমণি" লীলা "কালকূট"। শান্তির স্বামী মাতাল, দুশ্চরিত্র, বিনা কারণে সে যখন তখন শান্তিকে পদাঘাত করে। শান্তি সমস্ত সহ্য করিয়া দেবতা-জ্ঞানে তাহাকে পূজা করে; প্রতিদিন তাহার চরণামৃত পান করিয়া সে পবিত্রতা লাভ করে। আর লীলা—স্নেহময়, গুণবান্ স্বামীর সোহাগিনী হইয়াও সর্ব্বদা স্বামীর নিন্দা করে; স্বামী ও শাশুড়ী কিছুতেই তাহার মন যোগাইয়া উঠিতে পারেন না। অবশেষে সে দুশ্চরিত্রা হইল, স্বামী মনোকষ্টে গৃহত্যাগ করিলেন, সে কুলত্যাগ করিয়া নানারূপ দুর্গতি ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে অনুতপ্ত স্বামীদর্শনলোলুপ পাপিয়সী লীলা তাহার স্বামীর দর্শন পাইল। সন্ন্যাসীবেশী স্বামী শিশিরকুমার লীলার সেই রুক্ষ, কর্দ্দমময় মস্তকে আপন দক্ষিণ চরণ তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "অভাগিনি! আজ তোমার সকল পাপের ক্ষয় হোলো! আজ আমার আশীর্ব্বাদে অবশ্যই তোমার মোক্ষলাভ হবে!"

আমাদের বিবেচনায়, স্বামী যদি সেই অনুতপ্ত মুমূর্ষু হতভাগিনীর মস্তকে চরণ না তুলিয়া দিয়া তাহাকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়া অশ্রুপাত করিতেন, তবে তাঁহার মানবোচিত ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত। তবে হয়ত ব্রহ্মণ্যতেজ-মহিমান্বিত পুরাতন স্বামীর বর্ত্তমান "আর্য্যাভিমানী" বংশধরগণের পক্ষে ইহাই মহত্ত্ব ইহাই উপযুক্ত আদর্শ! আর পশুবদাচারী স্বামীর চরণামৃতপান ব্যবস্থাই তাঁহাদের অভিমত আদর্শ স্ত্রীশিক্ষা। নহিলে এ দেশেরই বা এমন ঘোর দুর্দ্দশা হইবে কেন!

এই বইখানি উপহার পাইয়া নববধূগণ যে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন এমন বোধ হয়

না। লীলার চরিত্র নিতান্ত হীন কলুষিত, এরূপ পৈশাচিক চরিত্র ভদ্রসমাজে লাখের মধ্যে দুই একটি মেলে কি না সন্দেহ; এই চরিত্র দৃষ্টান্তে সাবধান করিবার জন্য যদি নববধূদিগকে ইহা উপহার দেওয়া হইয়া থাকে ত এরূপ উপহার তাঁহাদের সম্মানের বিষয় নহে, বরঞ্চ তাহার বিপরীত।

আর বঙ্গসমাজে শান্তির ন্যায় আদর্শনীয়া রমণীর অভাব নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের এইরূপ কুক্কুরবৃত্তিপরায়ণতাতেই, যে সমাজের পুরুষেরা স্ত্রীলোকোচিত মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পান, সে সমাজের আদর্শ যে বিশেষ উচ্চ নহে ইহা স্বীকার করিতেই হয়। আমাদের রমণীগণের চরিত্রে নৈতিক বলের অভাব বশতই আমাদের সন্তানবর্গও হীন-বীর্য্য তোষামোদকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে! সমাজে নারীর প্রভাবের মাহাত্ম্য কি তাহা যদি আমরা কিছু মাত্র বুঝিতাম তাহা হইলে আমাদের সমাজের, আমাদের জাতীয় চরিত্রের এ দশা ঘটিত না। রমণী যদি নৈতিক মহত্ত্বে আস্থাবতী ও হীন পশুবদাচরণে ঘোর ঘৃণাবতী হন তবে এই গুণ মাতৃদুগ্ধের সহিত সন্তানে, প্রেমালাপনে স্বামীতে, শ্রদ্ধা কার্য্যে পিতৃস্থানীয়গণে, প্রীতি কর্ম্মে বন্ধু বান্ধবে সঞ্চারিত হয়।

স্বামীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা ভাল, কিন্তু সেই সঙ্গে স্বামীকৃত জঘন্য অন্যায়াচরণের প্রতিও কি শ্রদ্ধাবতী হওয়া ভাল? তাহাতে কার মঙ্গল? স্বামীর, স্ত্রীর না সমাজের? প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজের এরূপ হীনাবস্থা হইত না, যদি রমণীগণ তাঁহাদের সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যায়ের প্রতি, অমানুষোচিত আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধাবতী, ন্যায়ানুরাগী, ওজস্বিনী হইয়া পুরুষদিগের হীনকর্ম্মের বাধা দিতে সক্ষম হইতেন। সেই রমণীই আদর্শ রমণী, যিনি পুরুষকে মনুষ্যত্বে হাত ধরিয়া উঠাইতে সর্ব্বদা সচেষ্ট সক্ষম। স্ত্রীলোক-দিগকে যদি আদর্শ শিক্ষা দিতে হয় ত ভ্রমরের ন্যায় চিত্রে। ভ্রমর কি স্বামীকে ভাল বাসিত না বা ভক্তি করিত না, কিন্তু স্বামী যখন পাপাচরণে রত হইয়া তাহাকে মর্ম্মাহত করিলেন, সে অক্ষুণ্ণ-কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বনে তাঁহারই চরণে আপনাকে পাতিত ও লুণ্ঠিত করিল না, তাহাতেই সতীর তেজ সাধ্বীর মহত্ত্ব প্রকাশিত।

মণিপুর প্রহেলিকা অর্থাৎ (মণিপুর রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পৌরাণিক ও প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, আধুনিক রীতিপদ্ধতি, বিগত বিপ্লব বিবরণ, হত্যাকাণ্ড এবং বিচার ঘটিত অশ্রুতপূর্ব্ব রহস্য। শ্রীজানকীনাথ বসাক প্রণীত।

মণিপুরের বিগত দুর্দ্দশার বিবরণ কেনা জানে? তবু এই পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। সেখানকার হত্যাকাণ্ড, রাজকুমারদিগের প্রতি অবিচার, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড, নির্ব্বাসন প্রভৃতি রাজকাহিনীই উক্ত কষ্টের এক মাত্র কারণ নহে; ইংরাজদিগের স্বার্থসর্ব্বস্ব ঘৃণ্যআচরণ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যরহিত পাশব প্রভুত্ব, নিরুপায় দুর্ব্বলের প্রতি কঠোর অকুণ্ঠিত পীড়নের ইহাতে যে সকল চিত্র পাওয়া যায় তাহা পড়িয়া শরীর মন কণ্টকিত হইয়া উঠে, মনে হয় এই ইংরাজ কি সত্যই সেই ইংরাজের একজাতি

যাহারা ক্লাইবের, হেষ্টিংসের অত্যাচার পূর্ণ স্বার্থময় অপকীর্ত্তি-কাহিনী মুক্তকণ্ঠে গাহিয়া তাঁহাদের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছেন, সত্য, ন্যায়, উদারতার বেদীতে দাঁড়াইয়া মনুষ্যত্বের আদর্শ শিক্ষা দিতেছেন? সেই উদার মহৎ জাতিই কি এখানে আসিয়া এইরূপ নরাধম পাষণ্ডাগ্রগণ্য রূপে পরিবর্ত্তিত! আমরা অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না কিন্তু ইহার মত আশ্চর্য্য ঘটনা আর কি আছে? ভগবানই জানেন, কি অভিপ্রায়ে তিনি এইরূপ মিরাক্ল্ ঘটাইতেছেন! ইহার পরিণাম কি!

বইখানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া ইংরাজের কীর্ত্তিদর্পণ স্বরূপ ইংরাজের সম্মুখে ধরিলে ভাল হয়।

পঞ্চামৃত।—বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টক, শঙ্করাচার্য্যকৃত মোহমুদ্গর, যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক এবং নানা শাস্ত্রোদ্ধৃত ভক্তগীতা শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, তৎকৃত অনুবাদ প্রভৃতির সহিত।

বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। ভাবমাধুর্য্য ও ভাষায় লালিত্য অনুবাদে বেশ সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। লেখক একজন ভাবুক-ভক্ত। এই ভাদ্র মাসের নব্যভারতে ইহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে আমরা পাঠকদিগকে তাহা পড়িতে বলি।

শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কাল।

ইতিপূর্ব্বে * শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যানুশিষ্য সংক্ষেপ শারীরক প্রণেতা সর্ব্বজ্ঞ মুনির সময়াবধারণ উপলক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তিনি (সর্ব্বজ্ঞ মুনি) চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর (পরমেশ্বর সত্যাশ্রয় পৃথিবীবল্লভ মহারাজের) তৃতীয় পুত্র আদিত্য মহারাজের সমসাময়িক। উক্ত দ্বিতীয় পুলকেশী মহারাজ শ্রীহর্ষবর্দ্ধনকে জয় করিয়া "পরমেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে গণনা করিলে শঙ্করাচার্য্য দ্বিতীয় পুলকেশীর পিতা ও পিতৃব্যের সমসাময়িক হইতে পারেন।

যথা,—

কীর্ত্তিবর্ম্মণ বল্লভ ৪৮৯ শকঃ।......} শঙ্করাচার্য্য।
| —মঙ্গলীশ ৫১৩ শকঃ ......} |
পুলকেশী ৫৩২ শকঃ.............................———(শিষ্য)
| |
আদিত্যবর্ম্মণ.................................সর্ব্বজ্ঞ মুনি।

কীর্ত্তিবর্ম্মণ বল্লভ মহারাজার মৃত্যুকালে পুলকেশী নিতান্ত শিশু ছিলেন। এজন্য কীর্ত্তিবর্ম্মণের ভ্রাতা মঙ্গলীশ বল্লভ মহারাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতৃহীন শিশু রাজপুত্রদিগের পিতৃব্যগণ সচরাচর যে নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, মঙ্গলীশও সেই পাপমার্গ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি কীর্ত্তিবল্লভের পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র পিতৃব্যকে সংগ্রাম ক্ষেত্রে আহ্বান করিলেন। মঙ্গলীশের রুধিরধারা দ্বারা সেই সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। পিতৃব্যের প্রাণবধ করিয়া দ্বিতীয় পুলকেশী সিংহাসন আরোহণ করেন। এই সকল ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া বোধ হয় কীর্ত্তিবল্লভের শাসনকালে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর অভিষেকের পর কিম্বা অভিষেক কালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। আমাদের পূর্ব্বলিখিত গণনা অনুসারে ঠিক এইরূপ হইতেছে, অর্থাৎ কীর্ত্তিবল্লভের অভিষেকের ১১।১২ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ৫০১ শকাব্দে শঙ্কর ভূমিষ্ঠ হন এবং দ্বিতীয় পুলকেশীর অভিষেক অব্দে (৫৩২ শকাব্দ ৬১০ খৃষ্টাব্দে) তিনি নরলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমরা "লিচ্ছবি রাজগণ" প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, "নেপালাধিপতিগণের খোদিত লিপিসমূহ পর্য্যালোচনা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে নেপাল রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব্বভাগের রাজধানী মানগৃহ লিচ্ছবিদিগের দণ্ডাধীন ছিল।

---

* জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতী ৭৯, ৮০, ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পশ্চিমাংশ "ঠাকুরী" বংশের করায়ত্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজধানী "কৈলাসকুট ভবন"। ঠাকুরী বংশের স্থাপনকর্ত্তা "অংশু (জ্যোতি) বর্ম্মণ"।

চীন পরিব্রাজক হিয়োণসাঙ নেপাল রাজ্যের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "কিছুকাল পূর্ব্বে তথায় (জ্যোতিবর্ম্মণ বা) অংশুবর্ম্মণ * নামে এক নরপতি ছিলেন। ইনি বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। তিনি শব্দবিদ্যা সম্বন্ধীয় একখানা গ্রন্থ রচন করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী এবং ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন। তাঁহার যশ দিগন্ত ব্যাপী।" †

হিয়োণসাঙের বর্ণনা দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হইতেছে যে, কৈলাসকুটভবনাধিপতি অংশুবর্ম্মণ (বা জ্যোতিবর্ম্মণ) পূর্ণবর্ম্মার সমসাময়িক নরপতি। কারণ ইঁহারা উভয়েই হিয়োণসাঙের ভারত ভ্রমণের অল্পকাল পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য কৈলাসকুটভবনাধিপতি অংশুবর্ম্মণ (বা জ্যোতিবর্ম্মণের) সমসাময়িক হইতেছেন।

তিব্বত দেশীয় ইতিহাসের মতানুসারে তিব্বতাধিপতি শ্রোংজান-গামবু বা শ্রাং-সান-গামপু ৬০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ৬০৯ খৃষ্টাব্দে নেপালাধিপতি জ্যোতিবর্ম্মার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ‡ ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তারানাথের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্য শ্রাং-সান-গামপুর সমসাময়িক। সুতরাং ইহা স্থিরভাবে নির্ণীত হইতেছে যে, শ্রাং-সান-গামপু, অংশুবর্ম্মণ (জ্যোতিবর্ম্মণ), পূর্ণবর্ম্মণ এবং রাজ্যবর্দ্ধন প্রভৃতি নরপতিগণ খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্তে এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে (শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে) জীবিত ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদের সমসাময়িক। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ৬১০ খৃষ্টাব্দ (৫৩২ শকাব্দ) শঙ্করাচার্য্যের মৃত্যুকাল প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং ইহা যে সত্যের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিজ্ঞবর ক্লিট সাহেব নেপালের প্রাচীন রাজন্যবর্গের যে তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে লিচ্ছবিবংশীয় মালগৃহাধিপতি বৃষদেব, কৈলাসকুটভবনাধিপতি অংশুবর্ম্মণের সমসাময়িক। প্রথম অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নেপাল দেশীয় ইতিহাসের মতানুসারে বৃষদেবের রাজ্যশাসন কালে শঙ্করাচার্য্য নেপাল গমন করত বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে নেপালে শৈবধর্ম্মের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বৃষদেবের

---

* খোদিত লিপি সমূহে ইহার নাম অংশুবর্ম্মণ এবং ভিন্নদেশীয় গ্রন্থাদিতে ইহাকে জ্যোতিবর্ম্মণও লেখা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে চীন ও তিব্বত দেশের প্রচলিত ভাষায় নামের অনুবাদ করা হইয়াছিল বলিয়াই অংশুবর্ম্মণ জ্যোতিবর্ম্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

† Beal's Si-yu-ki. Vol. II., P. 81.

‡ Rockhill's Life of The Buddha. P. 213 and Sarat chandra Das's Contributions on Tibet (J. A. S. B. Vol. L. part I., P. 220.

পুত্রের নাম শঙ্কর দেব। বোধ হয় মহারাজ বৃষদেব শঙ্করাচার্য্যের নামানুসারে স্বীয় পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ৫নং প্রবাদ বাক্য সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

বিজ্ঞবর ফ্লিট সাহেব বৃষদেবের রাজ্যকাল ৬৩০ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দ এবং অংশুবর্ম্মণের রাজ্যকাল ৬৩৫ হইতে ৬৫০ খৃষ্টাব্দ অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা ফ্লিট সাহেবের উক্ত মত অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ হিয়োণসাঙের মতানুসারে তাঁহার আর্য্যাবর্ত্ত ভ্রমণের কিছুকাল পূর্ব্বে অংশুবর্ম্মণ জীবিত ছিলেন। তিব্বত দেশীয় ইতিহাস অনুসারে শ্রাং-সান-গামপু ৬০০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া ৬০৯ খৃষ্টাব্দে অংশু বা জ্যোতিবর্ম্মণের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুতরাং অংশুবর্ম্মণ এবং তাঁহার সমসাময়িক বৃষদেব অবশ্যই খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভে জীবিত ছিলেন।

বৃষদেব এবং অংশুবর্ম্মণের সময়াবধারণ জন্য ফ্লিট সাহেব যে সকল খোদিত লিপির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা সেই সকল খোদিত লিপি দর্শন করিয়াছি। * তল্লিখিত অব্দ সমূহ সম্বন্ধে আমাদের নানা প্রকার বক্তব্য আছে, এস্থলে তৎসম্বন্ধীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ফ্লিট সাহেব অংশুবর্ম্মণের যে সময়াবধারণ করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে হিয়োণসাঙ তাঁহাকে মৃত ব্যক্তি বলিয়া লিখিতেন না। ফ্লিট সাহেবের মতের বিরুদ্ধে ইহাই প্রচুর প্রমাণ।

সংক্ষেপ শঙ্করজয় গ্রন্থের লিখিত দন্তী, ময়ূর, বাণ, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ আমাদের মতানুসারে শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক হইতেছেন। তদ্ব্যতীত নীলকণ্ঠ, হরদত্ত, ভট্টভাস্কর, অভিনব গুপ্ত, মুরারি মিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য কোন রূপেই শঙ্করের সমসাময়িক হইতে পারেন না। বিষ্ণু শর্ম্মার সময় সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আপাততঃ কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

প্রস্তাবের এতদূর লিখিত হওয়ার পর বল্লভিপতি তৃতীয় ধ্রুবসেনের ৩৩৪ বল্লভি সম্বতের (৬৫৩ খৃঃ অঃ) একখণ্ড তাম্রশাসন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উক্ত তাম্রশাসনে লিখিত আছে উক্ত নরপতি ভট্টিভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পট্টপদ্রক নামক এক খানা গ্রাম দান করেন। উক্ত দানপত্রে ভট্টির পিতার নাম বপ্প লেখা হইয়াছে। কিন্তু জয়মঙ্গলের টীকায় ভট্টির পিতার নাম শ্রীস্বামী এবং ভক্তমালগ্রন্থে ভট্টির পিতার নাম শ্রীধর স্বামী লেখা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত টীকা কিম্বা ভক্তমালের প্রতি আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় বপ্পের পুত্র ভট্টিভট্টই ভট্টিকাব্য প্রণেতা। দ্বিতীয় শ্রীধর সেনের শাসনকালে তিনি (৫৭১ হইতে ৫৮৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) জন্মগ্রহণ করেন। তৃতীয় ধ্রুবসেনের শাসনকালে তিনি বার্দ্ধক্যে

* Bhagavanlal Indraji's Inscriptions from Nepal.

উপনীত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভট্টিভট্ট খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। উক্ত গণনা অনুসারে শঙ্করাচার্য্য ভট্টির সমসাময়িক হইতেছেন।

শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক নরপতি ও বিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকারগণের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

যথা,

নরপতি।

বারাণসীর অধিপতি পূর্ণবর্ম্মণ।

মগধ (পূর্ব্বভাগের) অধিপতি
মাধবগুপ্ত।

গৌড়াধিপতি (করণ সুবর্ণ)
শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত।

কান্যকুব্জাধিপতি
গ্রহবর্ম্মণ।

স্থাণ্বীশ্বর ও কান্যকুব্জাধিপতি
রাজ্যবর্দ্ধন।
হর্ষবর্দ্ধন।

নেপালাধিপতি
বৃষদেব (মানগৃহ)
অংশুবর্ম্মণ (কৈলাসকুটভবন)

তিব্বতাধিপতি
শ্রাংসান্ গাম্‌পু।

মালবাধিপতি
দেবগুপ্ত।

বাকটকাধিপতি
প্রবরসেন।
রুদ্রসেন।

বল্লভিপতি
শ্রীধরসেন (দ্বিতীয়)
শিলাদিত্য (প্রথম)
খরগ্রহ (প্রথম)

রাষ্ট্রকুটাধিপতি
দাণ্ডিবর্ম্মণ
ইন্দ্ররাজ (প্রথম)

পাশ্চাত্য চালুক্য
কীর্ত্তিবল্লভ
মঙ্গলীশ
পুলকেশী (দ্বিতীয়) *

প্রাচ্যচালুক্য।
কুব্জ বিষ্ণুবর্দ্ধন।

পল্লব।
মহেন্দ্রবর্ম্মণ।
নরসিংহবর্ম্মণ। *

বিখ্যাত গ্রন্থকার ও পণ্ডিতবর্গ।

কুমারিলভট্ট।
মণ্ডণমিশ্র।
ভট্টিভট্ট।
ব্রহ্মগুপ্ত।
ময়ূরভট্ট।
বাণভট্ট।
দণ্ডী।
শীলভদ্র।

---

* হর্ষবর্দ্ধনকে জয় করিয়া পুলকেশী "পরমেশ্বর" উপাধি গ্রহণ করেন, আর এই নরসিংহ বর্ম্মণ সেই পুলকেশীকে জয় করিয়া চালুক্য রাজধানী বাতাপিনগর বিনষ্ট করেন।

শঙ্করাচার্য্য ৫৭০ খৃষ্টাব্দের পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহাই আমাদের মত। এই ৫০ বৎসর মধ্যে ৩২ বৎসর মাত্র শঙ্করের জীবন কাল। তাঁহার জন্ম মৃত্যুর অব্দ স্থির রূপে নির্ণয় হইতে পারে না বলিয়াই আমাদের পূর্ব্ব প্রদর্শিত অব্দের অগ্র পশ্চাৎ কয়েক বৎসর অতিরিক্ত নির্দ্দেশ করা হইল। উল্লিখিত সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পূর্ব্বোক্ত নরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও গ্রন্থকারগণও এই সময়ে জীবিত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কুমারিল, মণ্ডণ, ভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ময়ূর, বাণ এবং দণ্ডী বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সুপরিচিত। শীলভদ্র চীন পরিব্রাজক হিয়োণসাঙের গুরু। তিনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। ইহা আমাদিগকে বিশেষ গৌরবের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শীলভদ্র একজন খাঁটি বাঙ্গালি। বঙ্গের রাজধানী সমতট নগরী তাঁহার জন্মস্থান। তিব্বতের পুরাতত্ত্বে সুপণ্ডিত বাবু শরচ্চন্দ্র দাস শীলভদ্রের বিবরণ জ্ঞাত নহেন বলিয়াই বোধ হয় তিনি যুবরাজ অতীশকে (দীপঙ্কর) বঙ্গের আদি গৌরব লিখিয়াছেন, যাহা হউক সেই সকল কথা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বলিব।　　সমাপ্ত।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

বানরের ভাষা।

[এই প্রবন্ধটী La Nature নামক ফরাসীস্ পত্রিকার গত ফেব্রুয়ারী মাসের এক সংখ্যায় প্রকাশিত ডাক্তার বোদিয়েরর প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে।]

"বানরের ভাষা" এই প্রস্তাব শুনিয়া হয়ত আমাদের কোন কোন পাঠক যাঁহাদের মনুষ্যত্ব-মর্য্যাদা-জ্ঞান অতি তীক্ষ্ণ, আমাদের প্রতি বিদ্রূপবিজৃম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিতেছেন। মানুষেরইত ভাষা, বানরের আবার ভাষা কি? আমরাই শব্দ বিন্যাস করিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হই। সলাঙ্গুল বা লাঙ্গুলহীন বানর, যাহারা অরণ্যচারী, বৃক্ষে বৃক্ষে লম্ফ ঝম্ফ দিয়া বেড়ায়, ফলমূল দ্বারাই উদরপূর্ত্তি করে, মানুষ দেখিলেই কিচিমিচি ও দন্ত-পংক্তি প্রদর্শন করে, তাহাদের আবার ভাষা কি? অতিরিক্ত মানব-শ্রেষ্ঠতাজ্ঞানোদ্দীপ্ত পাঠক আমাদের ক্ষমা করিবেন। সত্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য হইলাম, যেমন আপনি আপনার কোন আত্মীয়, পরিজন বা বন্ধুর সহিত শব্দ প্রয়োগে মনের ভাব বিনিময় করেন, আপনার চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থ নিচয়ের একটিকে অপরটি হইতে চিহ্নিত

করিবার জন্য বিভিন্ন সংজ্ঞা ব্যবহার করেন, আনন্দ, শোক, প্রেম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ প্রভৃতি হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজনাকে প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, বানরও সেইরূপ হৃদয়ের কোন উত্তেজিত ভাব পরিজ্ঞাপন করিবার জন্য আপনাদের মধ্যে বিশেষ প্রকারের ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করে। আমাদের মধ্যে যেমন দেশভেদে ও জাতি-ভেদে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত, বানরদের মধ্যেও জাতিগত পার্থক্যানুসারে ভাষাগত ভেদ আছে। কেবল বানর কেন, অনেক পশু পক্ষী এইরূপ বিশেষ প্রকারের শব্দ প্রয়োগ করিয়া আপনাদের মনোভাব বিনিময় করে। নিশ্চয়ই আমাদের অনেক পাঠক বাল্যকালে বৃদ্ধা পিতামহীর নিকট বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর রূপকথায় তাহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তার গল্প শুনিয়াছেন। অবশ্য তাহারা আমাদের মানব ভাষায় কথা কহিত না, আপনাদের ভাষাতেই কথা কহিত। তথাপি (পাঠকের মনে থাকিতে পারে) রাজপুত্র সেই বৃক্ষমূলে নিশা-যাপন করিতে আসিয়া কুলায়ারূঢ় পক্ষীদম্পতির কথোপ-কথনের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহা সত্য না হইলেও পক্ষীগণ আপনাদিগের মধ্যে যে মনোভাব বিনিময় করে; ভয়, দুঃখ, আনন্দ প্রভৃতি ভাব পর-স্পরকে বিদিত করে, ইহা রূপকথা নহে—প্রকৃত সত্যকথা। হয়ত, আমাদের সেই পাঠক, যিনি "বানরের ভাষা" এই নাম দেখিয়াই আমাদের উপর চটিয়াছেন, বলিতেছেন, যে পশু পক্ষীরা ওরূপ চ্যাঁ ভ্যাঁ চকর বকর করিয়া ত আপনাদের মধ্যে কথা কহিয়াই থাকে, তা বলিয়া কি বানরের কিচিমিচিকে আবার "ভাষা" বলিতে হয়, এবং শ্রেষ্ঠ জীব মানবের এমন সুন্দর ভাষার সহিত পাশাপাশি করিয়া তাহার তুলনা করিতে হয়? তবে পাঠক ভাষা কাহাকে বলে প্রথমে বিচার করা যাউক।

মনুষ্যেরা কেন কথা কয় এবং কত কাল হইতে মানবজাতি ভাষা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ইত্যাদি প্রশ্ন গভীর অনুসন্ধান ও চিন্তার বিষয় বটে। আমরা সকলেই মনে করি আমরা ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী স্ফুটবাক্ শব্দ ব্যবহার করিতে পারে না এবং এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য আমরা অপর প্রাণী হইতে আপনাদের পার্থক্যের সীমা নিরূপণ করি। কিন্তু আমাদের এই সীমানির্দ্দেশ কি নিতান্ত স্বেচ্ছাচার প্রণো-দিত নয় এবং ইহা কি অবিসম্বাদিত? বাস্তবিকই কি অপর জীব ও মানবের ভাষার মধ্যে একটা অনতিক্রমনীয় ব্যবধান আছে? নিকৃষ্ট প্রাণীর অস্ফুটবাক্ রব (inarticulate sound) এবং মানব কবি বা বাগ্মীর গভীর চিন্তা ও ভাবপূর্ণ, সুললিত বর্ণনার ভাষা, এই দুই প্রান্তের মধ্যে এমন কি ক্রমবিকাশময় উন্নতির ক্রম-সূত্র নাই, যদ্দ্বারা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে ভাষা, পশু পক্ষীর শব্দ হইতেই আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মানব শব্দশাস্ত্রে বর্ত্তমানের এই চরমোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে?

এই সকল প্রশ্ন বিচার করিবার পূর্ব্বে ভাষাটা কি, আমরা তাহাই ভাল করিয়া বুঝি-বার চেষ্টা করি। খুব সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে, ভাষা কোন জন্তুর ভাববাঞ্জক ভঙ্গীর

(Gestures) সমষ্টি ; ভঙ্গী স্বারিকই (Vocal) হৌক বা আবয়বিকই হৌক, কোন মানসিক ভাবের উত্তেজনায় প্রসূত। তাহা সর্ব্বথা একটি মনোভাব পরিজ্ঞাপক অর্থাৎ একই চিন্তা প্রকাশের জন্য সকল সময়ে সেই এক প্রকারের ভঙ্গী বিকাশ আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে। সেই ভঙ্গী দ্বারা যেন সমজাতীয় দ্বিতীয় কোন জন্তুর মনে প্রথম জন্তুর ন্যায় সেই একই প্রকারের চিন্তার উদয় হয়। যেমন মনে করুন যদি একটি শশক আপন গহ্বরে বসিয়া, পদ দ্বারা মৃত্তিকাকে বারম্বার আঘাত করিয়া অপর শশকের মনে বিপদের কথা পরিজ্ঞাপন করে এবং ইহারা তদনুসারে সম্ভাবিত বিপদভয়ে পলায়নপর হয়, তাহা হইলে শশকের পক্ষে এইরূপ বিপদ-পরিজ্ঞাপক সঙ্কেতই অর্থাৎ পদ দ্বারা মৃত্তিকা আঘাত করা, এক প্রকার ভাষা। যদি কোন চতুর শিকারী শশকদিগের ঈদৃশ বিপদ-সঙ্কেত প্রকৃতরূপে অনুকরণ করিয়া তদ্দ্বারা গহ্বরস্থ শশকদিগের মনে বিপদের ভাব পরিজ্ঞাপন করিতে পারে, আমরা অনায়াসে বলিতে পারি শিকারী শশকের ভাষা ব্যবহার করিয়াছে।

অনেক জন্তু চক্ষু দ্বারা পরস্পরের সহিত মনোভাব বিনিময় করে। অপরেরা অন্যোপায়ে করিয়া থাকে। যেমন, পিপীলিকারা শুঁড় বা পদ দ্বারা পরস্পরের মনোভাব ব্যক্ত ও বোধগম্য করে। কতকগুলি কীট আপনাদের পক্ষাবরণ (Elytra) দ্বারা শব্দ করিয়া আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে। কিন্তু এবম্বিধ উপায়ে অধিক মনোভাব বিনিময় করা সম্ভব হয় না।

কোন প্রবল মনোভাবের উত্তেজনায় অনেক জন্তু শব্দনিঃসারণ করে। শব্দ অর্থ বায়ুর বিশেষ বিকম্পন। শব্দনিঃসারণকালে বায়ু ফুসফুস হইতে তাড়িত হইয়া কণ্ঠনালী, তালু ও মুখ-গহ্বর দিয়া আসিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠের সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণ দ্বারা নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া নির্গত হয়। খরগস প্রভৃতি মূক জন্তুও প্রবল অনুভাবের উত্তেজনায় ডাকিয়া থাকে। কতকগুলি জন্তুর পক্ষে এইরূপ শব্দনিঃসারণ করা অভ্যাস স্বরূপ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ যাহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে, এবং যাহাদের মধ্যে এইরূপে মনোভাব পরিজ্ঞাপন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহাদেরই ঈদৃশ শব্দনিঃসারণ অভ্যাস হইয়া যায়। যেমন অশ্ব, গো, মেষ, ছাগ ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দের দ্বারা মনোভাব প্রকাশ করা জানোয়ারের পক্ষে অতিরিক্ত ক্রিয়া। কেননা ইহারা সাধারণতঃ আরণ্যাবস্থায় আবয়বিক ভঙ্গী দ্বারাই যৎসামান্যরূপে মনোভাব পরিজ্ঞাপন করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ শব্দনিঃসারণ মস্তিষ্কের উত্তেজনা বা কার্য্য ব্যতীত একেবারেই হইবার নয়। এই জন্যই আরণ্য কুকুর শব্দ করে না। কিন্তু যখন লোকালয়ে আনীত হয়, ইহা তখন আবয়িক ভঙ্গীর সহিত শব্দের ভঙ্গী (অর্থাৎ শব্দ) যোজনা করিয়া, দুইয়ের সাহায্যে, আরো স্পষ্ট করিয়া যেন, মনোভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পায়। কিন্তু পুনরায় অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইয়া বন্য স্বভাব বিশিষ্ট হইলে

ইহা আপনার শব্দনিঃসারণ অভ্যাস হারায়। বন্য মূক কুকুর জনপদের উচ্চতর জ্ঞান বিকাশসম্পন্ন অবস্থাতে আসিয়াই, ভাব বিকাশের উচ্চতর পন্থা অর্থাৎ শব্দ বিকাশ ক্ষমতা উপার্জ্জন করে এবং আবয়বিক ও শাব্দিক উভয়বিধ ভঙ্গী সাহায্যে অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতররূপে মনোভাব ব্যক্ত করিতে অভ্যস্ত হয়।

শাব্দিক ভঙ্গী (অর্থাৎ শব্দনিঃসারণ) অপরাপর ভঙ্গী বিকাশের ন্যায় পৈশীক কার্য্যের ফল বই আর কিছুই নয়। আবার, এই মাংসপেশীক্রিয়া মস্তিষ্কের উত্তেজনার অধীন। দর্শনবিশারদ হার্বার্ট স্পেন্সার স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন সকল প্রকার মনোভাব পৈশীক ক্রিয়ার উত্তেজক। এই জন্যই ঘৃণা, ক্রোধ, শোক, আনন্দ প্রভৃতি প্রবল অনুভাবের সহিত আবয়বিক ভঙ্গী অছেদ্য সূত্রে সংস্পৃষ্ট। শোকাতুরা জননীর বক্ষে করাঘাত, উল্লসিত শিশুর সুমধুর হাস্য, উদ্দীপনাপূর্ণ বাগ্মীর হস্তসঞ্চালন, ধর্ম্মোন্মত্তের বাহ্যিক হাব ভাব—প্রত্যেক বাহ্য দৈহিক ভঙ্গী আভ্যন্তরীণ প্রবল অনুভাবজনিত। বানরের মধ্যেও শাব্দিক ভঙ্গী পরিদৃষ্ট হয়। উহা যখনি কোন প্রকারের প্রবল অনুভাবে উত্তেজিত হয়, তখনি তাহা বাহ্যভাবে পৈশীক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ শব্দোচ্চারণ দ্বারা প্রকাশ করে।

যে সমুদয় পেশী ও স্নায়ুর সমবেত (যুগপৎ বা ক্রমান্বয়িক) ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার জন্য কোন মনোভাব আমরা আকার প্রকারে বা স্ফুটস্বর নিঃসারণ দ্বারা প্রকাশ করি, তাহারা সকলেই পরস্পরের সহিত কার্য্য-সূত্রে সংবদ্ধ। স্বর নির্গমন জন্য ফুসফুস্ স্বর-যন্ত্র, জিহ্বা, ওষ্ঠ ও বদনের স্নায়ু ও পেশী এক সূত্রে বদ্ধ; কোন একটি কার্য্যের জন্য ইহারা পরস্পরের উপর নির্ভর করে, একটি অপরটির সহায়তা করে, তদ্ব্যতিরেকে কোনরূপ কার্য্য সংঘটিত হইবার নয়। মনুষ্য ও বানরের এইরূপ স্নায়ু ও পেশী সন্নিবেশ (একটু আধটু সামান্য বিভিন্নতা ব্যতীত) প্রায়ই এক, শব্দনিঃসারণ জন্য মানুষের যতগুলি স্নায়ু ও পেশী আছে, বানরেরও তাহাই আছে। মানব দেহে শ্বাস প্রশ্বাস ও স্বরযন্ত্রের গঠন ও অবস্থান এবং উহাদের সংস্পৃষ্ট পেশী ও স্নায়ুর সন্নিবেশ এবং সংখ্যা যেমন, বানর শরীরেরও অবিকল সেইরূপ। ভিন্নতা যাহা কিছু আছে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর ও অনাবশ্যকীয়। সুতরাং মুখমণ্ডল হইতে কণ্ঠস্বরের যত প্রকার ক্রমান্বয়িক ভঙ্গী ও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব তাহা বানর এবং মানব উভয়েরি সমতুল্য ও এক হওয়া উচিত।

অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যদি কোন শিম্পাঞ্জির কুক্ষিপুটে শুড়শুড়ি দেওয়া যায়, উহা এক প্রকার হাস্যের ভাব দেখায় এবং আনন্দ সূচক শব্দ উচ্চারণ করে। উরাংউটাংকেও এরূপ অবস্থায় ঐরূপ করিতে দেখা গিয়া থাকে। একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর হনুমান এবং বেবুন সমাবস্থায়, মনুষ্যের অনুরূপ আবয়বিক ভঙ্গী প্রদর্শন করে। গরিল্লা ক্রোধের সময় মনুষ্যের ন্যায় ভ্রূ সঙ্কুচিত করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শব্দনিঃসারণ আমাদিগের শরীর কিম্বা বদনের পেশীনিচয়ের তৎসাম-

য়িক ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। বানরের শ্বাস প্রশ্বাস ও স্বর-যন্ত্র ও মুখ ; এবং উহাদের সংস্পৃষ্ট স্নায়ু-পেশীর সংখ্যা, অবস্থান, গঠন আমাদের সম্পূর্ণ সমতুল। ভয়, দুঃখ, ক্রোধ, আনন্দ, ঘৃণা প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক অনুভাব (Primary emotions) আমাদেরও যেরূপ বানর কিম্বা বন-মানুষেরও সেইরূপ। ঐ সকল ভাব আমরা যেরূপ মুখের আকার প্রকার দ্বারা প্রকাশ করি, উহারাও ঠিক তদনুরূপ মুখভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ করে। কেননা, বানরের মুখমণ্ডলের স্নায়ু ও পেশীসন্নিবেশ এবং তাহাদের সংখ্যা, মনুষ্যের সম্পূর্ণ অনুরূপ। অতএব, আমরা কোন মৌলিক অনুভাব প্রকাশ করিবার সময় (মুখের আকার প্রকারের সহিত) যেরূপ স্বর উচ্চারণ বা শব্দ করি, বানরেরা বিশেষতঃ বনমানুষেরা সেই ভাব সেইরূপ স্বর বা শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিবে না কেন—বিশেষতঃ যখন ঐ ভাবটির সহিত সংযুক্ত মুখভঙ্গী আমাদেরও যেরূপ উহাদেরও সেইরূপ ?

যদি এক একটি ভাব প্রকাশের জন্য কোন জন্তুর এক এক প্রকারের শাব্দিক ভঙ্গী থাকে, এবং তদ্দ্বারা সমজাতীয় অপর জন্তুদের মনে ঠিক নিজের মনে উদিত ভাব-টির সঞ্চার করিতে পারে, তাহা হইলে উহাই উহার ভাষা। ইহা মনুষ্যের ভাষার সহিত সহজেই উপমিত হইতে পারে। পার্থক্য এই যে জন্তুর ভাষা অপেক্ষাকৃত অল্প পরি-স্ফুট। অনেকেই সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন অধিকাংশ পক্ষীর স্বর উহাদের ভাব ও অভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। একজন ফরাসী প্রকৃতি তত্ত্ববিদ বলেন ফিঞ্চপক্ষী আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় কেবল একটিবার "ফ্যাঁক' করে ; ক্রোধের সময় ক্রমান্বয়ে তিনবার "ফ্যাঁক ফ্যাঁক ফ্যাঁক করে ; আবার ইহারা ভাল বাসা বা উত্ত্যক্ততা প্রকাশ কালীন "ত্রিক্-ত্রিক্" করে। হুজো নামক অন্যতম ফরাসী প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ গৃহপালিত কুক্কুটদিগের দশ বারো প্রকারের বিভিন্ন শব্দ লক্ষ্য করিয়াছেন। আর এই সকল বিভিন্ন প্রকারের স্বরার্থ অপর কুক্কুটগণও বুঝিতে পারে। অন্যান্য জীব জন্তু অপেক্ষা বানর জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে নানাবিধ পরীক্ষার মধ্যে আনীত হইয়াছে। পারাগোয়ার একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন একজাতীয় হনুমানেরা (Cebus Azarae) বিস্ময় প্রকাশ করিবার সময় হিস্ হিস্ ও গঁ গঁ এই দুয়ের মাঝামাঝি এক প্রকার শব্দ করে, অধীরতা প্রকাশকালে "হু হু" করে ; ভয় বা দুঃখ প্রকা-শের সময় অন্যরূপ শব্দ করে। ডারউইন বলিয়াছেন এই জাতীয় হনুমানেরা উত্তেজিত হইলে ছয় প্রকারের বিভিন্ন শব্দ নিঃসারণ করে এবং এই শব্দ শুনিয়া সমজাতীয় অন্য হনু-মানের মনে তদ্রূপ ভাবের সঞ্চার হয়। ব্রেম বলেন এক প্রকার বানর (Cercopitheus) কোন বিশেষরূপ শব্দ করিয়া আপন বন্ধুদিগকে বিপদ বার্ত্তা জ্ঞাপন করে।

মার্কিন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ গার্ণার কিছুদিন হইল একটী সম্পূর্ণ অভিনব এবং সুন্দর কৌশলপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করিয়া বানরভাষা অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি নবাবিষ্কৃত ফনোগ্রাফ নামক স্বরলিপিবদ্ধকারী যন্ত্রের সাহায্যে বানর ভাষা অধ্যয়ন

করিতেছেন। ফনোগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তাও হয়ত কখন অনুমান করিতে পারেন নাই যে, এক দিন তাঁহার এই যন্ত্র নিকৃষ্ট প্রাণীর ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হইবে, এবং তদুদ্দেশ্য সাধনে ইহা এত মূল্যবান্ সাহায্যরূপে পরিগণিত হইবে। গার্ণার এই নূতন পন্থা উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান জগতে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ফনোগ্রাফে পশু পক্ষীর বিভিন্ন ভাবপ্রণোদিত বিভিন্ন শব্দ লিপিবদ্ধ করিয়া, ইচ্ছামত অবসর ক্রমে উহাকে আবৃত্তি করাইয়া অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। কোন জন্তু বা পক্ষীর কোন শব্দ একটিবার শুনিয়াই অভ্যাস করা যায় না। অনেক শব্দই আমরা শুনি কিন্তু তার কয়টি আমাদের কর্ণ ধারণ করিয়া রাখে। কোন বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিবার জন্য যেমন তাহাকে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে হয়, বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া দেখিতে হয়, সেইরূপ কোন একটি শব্দ কর্ণ দ্বারা আয়ত্ত করিবার জন্য বারম্বার ও বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতে হয়। তাহার উচ্চতা ও অনুচ্চতার বিভিন্ন ক্রম অভ্যাস করিতে হইলে ধীর ও শান্ত ভাবে এবং মনোযোগ সহকারে বারম্বার তাহা শ্রবণ করা আবশ্যক এবং তাহা অনুকরণ করা বিশেষ চেষ্টাসাপেক্ষ। ফনোগ্রাফ, সেইজন্য পশ্বাদির শব্দ বা ভাষা ধীর ও শান্ত ভাবে অনুশীলন করিবার সম্যক সহায়তা করে। কোন পশু বা পক্ষীর স্বর ফনোগ্রাফে একবার লিপিবদ্ধ হইলে, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ আপন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া স্বেচ্ছামত ঐ শব্দ আবৃত্তি করাইতে পারেন এবং তদ্দ্বারা উহার বিভিন্ন ক্রম (যাহা সহসা ও সহজে আমাদের কর্ণে লাগে না) বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে পারেন। অধ্যাপক গার্ণার কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছেন। ফনোগ্রাফ সাহায্যে বানরের বিভিন্ন স্বর লিপিবদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভূত অধ্যবসায় বলে উহাদিগকে অভ্যাস করিয়াছেন। তিনি কেবল যে উক্ত শব্দগুলি নিজ কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে পারেন এমত নহে উহাদের অর্থও শিক্ষা করিয়াছেন।

স্বর লিপিবদ্ধ হইলে ফনোগ্রাফ কেমন সুন্দররূপে উহা অবিকল আবৃত্তি করিতে পারে, এবং যন্ত্র-কৃত স্বর জীবন্ত জন্তুর স্বরের কেমন প্রকৃত অনুরূপ, ইহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যখন দেখি যে জন্তুরা পর্য্যন্ত ফনোগ্রাফ উচ্চারিত স্বরে আপনাদের স্বর জানিতে পারে। অধ্যাপক গার্ণার একদা পরীক্ষার জন্য একটি ফনোগ্রাফ কোন বানরের পিঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া উহার নানা প্রকার মনোভাবপরিজ্ঞাপক বিভিন্ন স্বর লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন। পরে উক্ত যন্ত্র অপর একটি বানরের (অবশ্য, ইহা প্রথমোক্তটির সমজাতীয়) পিঞ্জরে স্থাপন করিয়া স্বর আবৃত্তি করাইলে, পিঞ্জরাবদ্ধ বানর স্বীয় স্বর ও ভাষা শুনিয়া এবং তথায় অন্য কোন বানর না দেখিয়া আরো যেন অধিকতর আশ্চর্য্য ও বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে ফনোগ্রাফটি নাড়িতে লাগিল। পরপৃষ্ঠায় ইহার একটি ছবি দেওয়া হইল। গার্ণারই এই ছবিটি তুলিয়াছিলেন।



গার্ণার স্বয়ং অনেক সময়ে আপনার অধীত নব ভাষার পরীক্ষা দেখাইয়াছেন। তিনি আগেই আপনার বন্ধুদিগকে বানর ভাষার কোন্ শব্দ উচ্চারণ করিবেন এবং তাঁহার নিজের পূর্ব্ব পরীক্ষা মতে উহার কি অর্থ তিনি নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বিদিত করিয়া আপনি একটি বানরের পিঞ্জরে প্রবেশ করিলেন এবং দুগ্ধ পরিজ্ঞাপক একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন। গার্ণার এ সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিতেছেন—"আমার প্রথম উচ্চারণেই বানরের কর্ণ আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে মস্তক ফিরাইয়া আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল। আমি সেই শব্দটি তিন বার আবৃত্তি করিলাম। সে সুস্পষ্টরূপে উহা প্রত্যুচ্চারণ করিয়া আমার কথার উত্তর দিল এবং তাহার পান করিবার পাত্রটির দিকে ফিরিল। আমি শব্দটি আবার উচ্চারণ করিলাম। তখন সে পিঞ্জরের লৌহদণ্ডের নিকট পাত্রটি স্থাপন করিয়া অতি নিকটে আসিয়া সেই শব্দটি উচ্চারণ করিল। রক্ষক খানিকটা দুগ্ধ আনিয়া দিল। বানর সাগ্রহে পান করিল। সে পুনরায় শূন্য পাত্র বাড়াইয়া ধরিয়া উক্ত শব্দ তিন বার উচ্চারণ করিল। আমি তাহাকে অনেকবার খানিকটা করিয়া দুগ্ধ দিলাম। সে প্রতিবার যখন একটু দুগ্ধ চাহিয়াছিল সেই শব্দটি উচ্চারণ করিয়াছিল। আমি আমার বন্ধুদিগকে আর একটি শব্দ (বানরের অসাক্ষাতে) নিজে উচ্চারণ করিয়া আগে শুনাইয়াছিলাম। ইহার অর্থ খাওয়া। আমি একটি কলা লইয়া বানরটিকে দিলাম। উহা তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটি করিয়া উঠিল। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা আমি জানিয়াছি যে একই শব্দ কলা বা রুটির জন্য উহারা উচ্চারণ করিয়া থাকে। আমি তাই ঠিক করিয়াছি, ঐ শব্দটির অর্থ খাদ্য, ক্ষুধা বা খাওয়া।"

সিনসিনাটীতে গার্ণার আর এক দিবস অন্য একটি বানরের পিঞ্জরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন "আমি যে শব্দটীর অর্থ দুগ্ধ স্থির করিয়াছিলাম, সেই শব্দটি উচ্চারণ করিলাম। বানরটি উঠিয়া প্রত্যুচ্চারণ করিয়া উত্তর দিল এবং আমার প্রতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যেন সে নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। আমি শব্দটী আবার উচ্চারণ করিলাম। সেও সেইরূপ করিল, পরে পান পাত্রের দিকে ফিরিয়া, পাত্রটি তুলিয়া লইল এবং আমার সম্মুখে ফিরিয়া পাত্রটি বাড়াইয়া ধরিয়া সেই শব্দটি উচ্চারণ করিল। রক্ষক একটু জল দিল, বানর সন্তুষ্ট মনে জল পান করিল এবং পুনরায় জলের জন্য সেই শব্দ উচ্চারণ করিল।" গার্ণার বলেন এই শব্দটি 'জল', 'দুগ্ধ,' 'পানীয়' এবং 'তৃষ্ণা' পরিজ্ঞাপক। তিনি আরো একটি শব্দ জানেন ইহা ভীতিউদ্দীপক ইহা শুনিলেই বানরেরা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক এক্ষণে প্রায় কুড়িটি শব্দ আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি প্রত্যেকটিকে বানর ভাষায় এক একটি পদ বলিয়া বিবেচনা করেন। এমন কি তাঁহার মতে প্রত্যেকটি স্ফুটবাক্ পদ (Articulate Word)। কারণ তিনি এই শব্দগুলি স্বর ও ব্যঞ্জন সহকারে এবং পদ (Syllables) বিভাগ করিয়া লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু কেবল স্ফুটবাক্ শব্দ নিঃসারণ ক্ষমতাই সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা নহে। আমরা অনেক সময়ে মনে করি বটে যে, আমাদেরই কেবল ঈদৃশ সুস্পষ্ট শব্দোচ্চারণ করিবার ক্ষমতা আছে, অপর জীবের নাই, সুতরাং আমরা, মনুষ্যগণ, শ্রেষ্ঠতম জীব। ইহাপেক্ষা বিষম ভ্রান্তি আর নাই। কেন না, একদিকে যেমন কতক মনুষ্যজাতি আছে যাহাদের ভাষা আদবে স্ফুটবাক্ ভাষা নহে, যেমন আফ্রিকার বুশমেন জাতি,—এই অসভ্য জাতির স্বারিক বিকাশ এতই প্রাথমিক অবস্থায় রহিয়াছে, এতই অবিকাশিত এবং এতই অসম্পূর্ণরূপে উহাদের মনোভাব প্রকাশ করে, যে পরস্পরকে মনোভাব বিদিত করিবার জন্য মুখ-হস্ত ভঙ্গী না করিলে উহাদের চলে না। ভাষার ঈদৃশ অসম্পূর্ণতা ও বিকাশাভাব নিবন্ধন উহাদের পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন দুরূহ হইয়া পড়ে। অপর দিকে এমন নিকৃষ্ট শ্রেণীর জন্তু আছে, যাহাদের স্বর স্পষ্ট উচ্চারিত। কাক, কোকিল, বৌ-কথা-কও, একপ্রকার ওরিওল পক্ষী ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। বৌ-কথা-কও পাখীর সুস্পষ্ট উচ্চারণ সকলেরি পরিচিত। ওরিওল অতি সুস্পষ্টরূপে লো-রি-ও বলিয়া ডাকিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া, সালিক প্রভৃতি পক্ষীগণ যেমন শিক্ষিত হয়, সেইরূপ অতি আশ্চর্য্যরূপে অবিকল মানুষের ভাষা উচ্চারণ করে। ময়না ঠিক মানুষের মত স্বরে ময়না, ময়না বলিয়া ডাকিয়া থাকে। কাকাতুয়ারাও ঐরূপ করে। ইহারা এতই অবিকল মনুষ্যের ন্যায় সুস্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারে যে, বাস্তবিকই শুনিলে মনে বিস্ময় উপস্থিত হয়। তবে, এই তোতা পাখীরা যাহা উচ্চারণ করে, তাহার মর্ম্মবোধ করিতে পারে না। কিন্তু ইহারা যে স্পষ্টভাবে স্বর-ব্যঞ্জন যুক্ত পদবিভাগসমন্বিত মানব ভাষাকে, মনুষ্যের অনুরূপ উচ্চারণ করিতে পারে, ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনুষ্য ব্যতীত অপর জন্তুও আছে, যাহাদের স্পষ্ট শব্দোচ্চারণ জন্য যে যে শারীর যন্ত্র আবশ্যক, তাহা আছে।

বর্ত্তমানে, ইহা নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে মানব মস্তিষ্কের কোন বিশেষ অংশে ঈদৃশ সুস্পষ্ট রূপে শব্দোচ্চারণ ক্ষমতা নিহিত। বিশেষতঃ বামদিকের তৃতীয় সাম্মুখিক স্তরেই এই ক্ষমতা ন্যস্ত। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীরা কখন কখন বাক্‌শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। রোগের তারতম্যানুসারে কাহারো বা শব্দ উচ্চারণে অল্প বৈলক্ষণ্য ঘটে, কেহ বা একবারেই বাক্‌শক্তি রহিত হয়। ইহার কারণ, মস্তিষ্কের উল্লিখিত স্তরের অল্পাধিক ক্ষতিগ্রস্ততা। স্তরটি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেলে মনুষ্য একেবারেই বাক্‌শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে। এ তথ্যটি বর্ত্তমান শারীরবিজ্ঞানের একটি মীমাংসিত ও স্থিরীকৃত তথ্য। কোন কোন প্রকৃতি তত্ত্ববিদ্ স্বীকার করেন যে বানরের মস্তিষ্কেও এইরূপ একটি প্রাথমিক অবিকশিত স্তরের সূত্রপাত আছে। সুবিখ্যাত ফরাসী প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ব্রোকা—যাঁহার অক্লান্ত অনুসন্ধান দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে মানব-মস্তিষ্কের তৃতীয় সাম্মুখিক স্তরে বাক্-শক্তি নিহিত, ইহা

নির্ণীত হইয়েছে, (এইজন্য এই স্তরকে ব্রোকার নামানুসারে Broca's convolution বলা হয়),—বানরের মস্তিষ্কেও ঐরূপ স্তরের অবস্থান স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অপর এক প্রখ্যাত প্রকৃতি তত্ত্ববিদ্ (M Herde) বানরদের মস্তিষ্কেও এরূপ স্তরের বিদ্যমানতা স্বীকার করেন না। ইঁহার মতে মানবাকৃতি বানর অর্থাৎ বনমানুষ (Anthropoids) হইতে আরম্ভ করিয়া মানব মস্তিষ্কে এই স্তর পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছে। মানবাকৃতি বানরের মধ্যে গোরিল্লা, শিম্পাঞ্জি, উরাং এবং গিবণ প্রধান। গার্ণার যে সমুদয় বানর লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কেবল দুটী শিম্পাঞ্জী ছিল, অবশিষ্ট অধিকাংশই মার্কিন বানর। কারণ, আমেরিকায় বন-মানুষ পাওয়া যায় না। কিন্তু মানবাকৃতি বানরদিগের সম্বন্ধে (যাহাদের মস্তিষ্কে বাক্-শক্তিমূলক স্তরের অস্তিত্ব সর্ব্ববাদীসম্মত) বানর ভাষার যাথার্থ্য প্রমাণীকৃত না হইলে, গার্ণারের আবিষ্কৃত তথ্যটির কোন মূল্য নাই। তন্নিমিত্ত অপরিশ্রান্ত অধ্যাপক গার্ণার বন-মানুষের ভাষা অধ্যয়ন করিবার জন্য গরিল্লাবাস নিবিড় জঙ্গলময় আফ্রিকায় গমন করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

কোন আমেরিকান সংবাদপত্র, গার্ণারের আফ্রিকা প্রবাসকালীন অনুসন্ধানপদ্ধতির এইরূপ বর্ণনা দিয়াছে।

"অধ্যয়নের সুবিধার জন্য তিনি একটি ৬৩ ফুট দীর্ঘ চতুষ্কোণ পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়াছেন। পিঞ্জরটি ইস্পাতনির্ম্মিত তারের জালদ্বারা চারিদিকে ঘেরা। ইহা তিনটা লৌহ শৃঙ্খলদ্বারা মৃত্তিকার সহিত সুদৃঢ় তারে আবদ্ধ থাকিবে। কেননা, গরিল্লাদের যেরূপ অসাধারণ বলের কথা জানা আছে, উহারা অনায়াসে পিঞ্জর উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে। পিঞ্জরের লৌহ-দণ্ডগুলি খুব ঘন ঘন; মধ্যের ব্যবধান অতি অল্প; গরিল্লারা উহাদের মধ্যদিয়া হস্ত প্রবিষ্ট করিতে পারিবেক না। গার্ণার আপন সহভ্রমণকারীগণ হইতে বহুদূরে একাকী এই পিঞ্জর মধ্যে বসিয়া থাকিবেন। কিন্তু টেলিফোন ও তাড়িত ঘণ্টা সহযোগে দূরস্থ লোকদিগের সহিত কথোপকথন চলিবে। গার্ণার সঙ্গে ফনোগ্রাফ ও ফটোগ্রাফ-যন্ত্র লইবেন। ফনোগ্রাফ দ্বারা বন-মানুষের বিভিন্ন স্বর লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ফটোগ্রাফ দ্বারা উহাদিগের প্রতিকৃতি তুলিবেন।"

অধ্যবসায়ী অধ্যাপক আফ্রিকা যাইবার জন্য সম্প্রতি (অগষ্ট) লণ্ডনে আসিয়াছেন। তাঁহার বহুদিনের সহিষ্ণু পরিদর্শন ও অনুসন্ধান ফল এক্ষণে পুস্তকাকারে সম্বদ্ধ হইয়াছে। অতি অল্পদিন হইল (অগষ্টের শেষাশেষি) তাঁহার "বানরের ভাষা" প্রকাশিত হইয়াছে। লণ্ডনে অবস্থান কালে, কোন সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাতে কথোপকথনের মধ্যে গার্ণার বলিয়াছেন——

"আফ্রিকায় গরিল্লা, শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি বনমানুষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা আছে। যদি বাস্তবিকই আফ্রিকায় এমন একজাতীয় বনমানুষ থাকে, যাহারা আপনা

দের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের অধীনে ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করে আমি তাহার যাথার্থ্য অনুসন্ধান করিতে চাই। * * * কিন্তু আমার ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য গভীর ভাষা-সমস্যার মীমাংসা করা। ইহা সংসাধন জন্য বানর-ভাষা ও মানব-ভাষার মধ্যে যে বিস্তীর্ণ গহ্বর আছে, তাহা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিব। এই জন্য আমাকে বনমানুষের রাজ্যে যাইতে হইবে। কেন না যতদূর আমাদের জানা আছে, ইহারা মানসিক ও দৈহিক ভাবে অপরাপর জীবাপেক্ষা মানবের অতি নিকটতম। আমি সেইজন্য ইহাদের আবাস জঙ্গলে গিয়া ইহাদের বন্য জীবনের রীতিপদ্ধতি অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমি ফনোগ্রাফ দ্বারা ইহাদের উচ্চারিত শব্দ লিপিবদ্ধ করিব এবং তাহার কি অর্থ তাহাও নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইব। শব্দার্থ স্থির করিয়া, এবং ফনোগ্রাফ সাহায্যে উচ্চারণ অভ্যাস করিয়া, যতদিন না সম্পূর্ণ তাহাদিগকে আমার কথা পরিজ্ঞাত করিতে পারি এবং আমি উহাদের কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, ততদিন নিবৃত্ত হইব না। আমি উহাদের মধ্যে কোন উচ্চ ধরণের ভাষা প্রত্যাশা করি না। কেবল এমন কতকগুলি অল্প শব্দ বা সংজ্ঞা, যদ্দ্বারা উহারা আপনাদের সরল জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পরস্পরকে পরিজ্ঞাপন করিতে পারে! ইহাই আমি প্রত্যাশা করি। আমি আরো তৎ-স্থানীয় অসভ্য, বন্য অধিবাসীদের কাহারো কাহারো স্বর লিপিবদ্ধ করিয়া লইব।”

অধ্যাপক গার্ণারের পক্ষে বন-মানুষের ভাষা অধ্যয়ন জন্য সুদূর আমেরিকা হইতে আরণ্য আফ্রিকায় গমন করা বাস্তবিকই নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন জন্য নিঃস্বার্থ হৃদয়ে, সত্যসত্যই কত যে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, ইহা তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। গার্ণারের অনুসন্ধান ও পরিদর্শন সুদূর ভবিষ্যতে যে ভাষাবিজ্ঞানে সুমহৎ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে, এখনো তৎসম্বন্ধে কোন নিশ্চিত আশা করা যায় না। তবে, ইহা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, গার্ণারের স্বকপোলাদ্ভাবিত ফনোগ্রাফের সাহায্যে নিকৃষ্ট জন্তুর ভাষা অধ্যয়নপদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়নার্থ এক নূতন পন্থা আবিষ্কৃত করিয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র যেমন ভ্রূণতত্ত্ব অধ্যয়নে, Instantaneous photography যেমন সুদূরস্থ তারকা জগতের রহস্য নির্ণয়নে, স্পেক্‌ট্রস্‌কোপ যেমন এক সময়ে সূর্য্যমণ্ডলের তত্ত্ব আবিষ্কারে বিজ্ঞানের প্রভূত সহায়তা করিয়া বিভিন্ন বিভাগে এক এক নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছে, ফনোগ্রাফও তদ্রূপ ভাষা তত্ত্বানুসন্ধানের সমূহ সাহায্য করিয়া এক নূতন যুগের সূত্রপাত করিবে আশা করা যাইতে পারে। ভাষাতত্ত্ব নির্ণয়ে ফনোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহারের মূল্য গার্ণারের কুশলবুদ্ধির জন্যই আমরা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক, এইজন্য, যদি অন্য কিছুর জন্যও না হয়, তিনি সমুদয় বৈজ্ঞানিক জগতের মহাকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সত্য সত্যই কোন সুবিজ্ঞ ব্যক্তি

বলিয়াছিলেন যাঁহারা প্রচলিত পন্থা অবলম্বন করিয়া কোন বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান জন্য কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞানের অধিকতর উপকার বিধান করেন। আর, যদি গার্ণারের এই অপরিশ্রান্ত উদ্যম সফল হয়, তাহা হইলে পশু পক্ষী ও মনুষ্যের উচ্চারিত ভাষার মধ্যে যে এক সুবিস্তীর্ণ ও গভীর ব্যবধান দৃষ্ট হইতেছে তাহা বিদূরিত হইবে, এবং ভাষারহস্যের মূল নির্ণীত হইবে। যে সুদৃঢ় অভিব্যক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক সহস্র সহস্র অনুসন্ধান, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবিষ্কার দ্বারা প্রতিনিয়ত অচল হইতে অচলতর ভিত্তির উপর সন্ন্যস্ত হইতেছে, যাহার সুগভীর সত্যতা বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের আবিষ্কার ও অনুসন্ধান দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, সেই অভিব্যক্তিবাদ ভাষা বিজ্ঞানের মধ্যেও আপন সত্যতার অব্যর্থ পরিচয় প্রদান করিবে। আমরা তাই সর্ব্বান্তঃকরণে অধ্যাপক গার্ণারের মঙ্গল কামনা করি। তিনি যেন অস্বাস্থ্যকর নিবিড় অরণ্য মধ্যেও সুস্থ দেহ মন লইয়া, স্বীয় যত্ন ও অধ্যবসায় বলে সিদ্ধমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

রুসিয়ার শাসন-প্রণালী।

সকল দেশেই রাজকর্ম্মচারীরা রাজার যেরূপ ইচ্ছা বুঝে সেইরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহাকে প্রীত করিতে চেষ্টা করে। হেন্‌রী কাহাকেও বলেন নাই যে তুমি যাইয়া টমাস বেকেটের মস্তকচ্ছেদন কর। কিন্তু বেকেট তাঁহার পথের কণ্টক—বেকেটকে সরাইতে পারিলে হেন্‌রী সন্তুষ্ট হইবেন বুঝিয়া তাঁহার অনুচরেরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বেকেটকে হত্যা করিল। ইতিহাস দেখ দেখিতে পাইবে রাজকার্য্য বরাবরই এইরূপ ভাবেই সাধিত হইয়া আসিতেছে। সুখের বিষয় স্থলে স্থলে ইহার ব্যত্যয়ও দেখা যায়। রাজকর্ম্মজীবী মাত্রেই ঈশ্বরানুগ্রহাপেক্ষা রাজানুগ্রহকে অধিক সম্মানকর ও লাভজনক মনে করেন না। ধার্ম্মিক ন্যায়পরায়ণ বিদ্বান সজ্জনব্যক্তিকে রাজা ভয় করেন। তাঁহারা অনুগ্রহপ্রার্থী নহেন। ভীরু কাপুরুষ অধার্ম্মিকেরাই রাজানুগ্রহলাভেচ্ছায় তাঁহার ইচ্ছামত জঘন্য কার্য্য করিতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইহা বুঝিয়া রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট যেরূপ লোকদ্বারা তাহার কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা সেইরূপ লোককেই রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করেন। বিস্তৃত রুসিয়া সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশে একজন গবর্ণর বা সেক্রেটরী শাসনকর্ত্তারূপে

আধিপত্য করেন। এই গবর্ণরেরা কিরূপ লোক? সলটিকফ বলেন যে যাহারা জারকে সন্তুষ্ট করিতে বা রাজভক্তি দেখাইয়া উচ্চপদলাভ করিতে ইচ্ছা করে—দুইবার বিবাহ—জাল জুয়াচুরী মিথ্যা সাক্ষ্য ইত্যাদি অপরাধ করা তাহাদের প্রধান উপায়। মিষ্টর লানিন একজন পুলিসের অধ্যক্ষকে জানিতেন। এই অধ্যক্ষ একজন হত্যাকারী এবং এই বিষয় লইয়া তাহার সহচর কর্ম্মচারীরা তাহার সহিত ব্যঙ্গ কৌতুক করিত। অবশেষে এই ব্যক্তির স্ত্রী তাহার নামে এমন ভয়ানক জঘন্য এক অভিযোগ করে যে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সাইবিরিয়ায় প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। এক প্রদেশের গবর্ণর ঘোর মদ্যপায়ী। দুই জন লোক ১৮৮২ ও ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গৃহহীন ভিক্ষুক অপরাধে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, এখন তাহারা দুই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। একজন সেক্রেটরী নির্দ্দোষী ব্যক্তির নামে মিথ্যাপবাদ আনয়ন করায় এবং মদ্যপান ইত্যাদি অপরাধে একবার পদচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়া পুনরায় তদপেক্ষা উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এখনও তাঁহার স্বভাব পূর্ব্বমতই আছে। আদালতে দোষীসাব্যস্ত এক ব্যক্তি একজন সেক্রেটরী। একটী বিবাহিতা ললনাকে হত্যাপরাধে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসনদণ্ড-প্রাপ্ত একটী লোক আর এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। অধিকাংশ শাসনকর্ত্তাই লেখা পড়া জানেন না। ট্যাঁরা চিহ্ন দ্বারা নাম স্বাক্ষর করেন। একজন বিচারকর্ত্তা তাঁহার আইনের পুস্তকগুলি আসন করিয়া তদুপরি উপবেশন করিতেন। একদিন একখানি পুস্তকের দরকার হওয়ায় অনেক খুঁজিয়াও পাওয়া গেল না।

ভিটেবেস্কের গবর্ণর জেনারেল একবারে উন্মাদরোগগ্রস্ত ছিলেন। মজিলেফের শাসনকর্ত্তাও উন্মাদ। দেওয়ানী আদালতের প্রেসিডেণ্ট একজন সুপরিচিত চোর, তিনি একটী মহিলার বহুমূল্য অলঙ্কার চুরী করিয়াছেন। ফৌজদারী আদালতের প্রেসিডেণ্ট একজন হত্যাকারী। তাঁহার বিচারও চলিতেছিল তিনিও অন্যদের বিচার করিতেছিলেন। যিনি রক্ষক তিনিই ভক্ষক। যিনি যে কার্য্য নিবারণ করিবার জন্য নিযুক্ত তিনিই তাহা করিতেছেন কিন্তু তাহারা যে রাজভক্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই সুতরাং তাহাদের পুরস্কার ভিন্ন দণ্ড নাই। রাজভক্তির অভাবই রুসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ। শিক্ষা এবং উচ্চভাব রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য। মূর্খতা ও অসচ্চরিত্রতা রাজভক্তির লক্ষণ। রুসিয়ার স্কুল এবং কলেজ সমুদয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রজা সাধারণের এখানে প্রবেশাধিকার নাই। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর যুবকেরা মাত্র এখানে স্থান পায়। এই বালকদের শিক্ষার্থে নিয়োজিত অধ্যাপকেরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত। এখানে শিক্ষার মূল মর্ম্ম এই যে গবর্ণমেণ্টের বিদ্রোহী কোনও ভাব লক্ষিত হইলে তাহা বিশেষরূপে দণ্ডনীয় হয়। কিন্তু তুমি বিদ্যাশিক্ষা কর আর না কর, মদ্য পান কর, মিথ্যা বল, চুরী কর, অভিনেত্রী বা বারনারীর সঙ্গে সহরের মধ্যে ভ্রমণ কর, তাহাতে কোন বাধা নাই। ছাত্রদের মধ্যে কয়েক জনকে অন্য ছাত্রদের

উপর চররূপে নিযুক্ত করা হয়। বাল্যকাল হইতে তাহাদের উত্তম শিক্ষা হয়। স্কুল মাষ্টার ও অধ্যাপকেরাও ছাত্রেরই উপযুক্ত গুরু। তাঁহারাও নিজ নিজ স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্য রমণীর সহিত প্রকাশ্যভাবে তাঁহাদের ছাত্রদের সম্মুখে সদর রাস্তায় বাহির হ'ন। ছাত্রেরাও তাহাই করে। এখানে বলা আবশ্যক রুসিয়ার অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীগণের মধ্যে মন্দলোকের সংখ্যা যত অধিক প্রফেসরদের মধ্যে তদপেক্ষা কম। প্রফেসরগণ দেশের প্রথা ও আচার অনুসারে অনেকে স্বভাবতঃ মন্দ পথাবলম্বী কিন্তু শিক্ষা দ্বারা উন্নতিলাভে অনেকে সুচরিত্রও হইয়া থাকেন। সুচরিত্র প্রফেসরগণ ব্যবহার ও উপদেশে ছাত্রগণের উন্নতি সাধনে চেষ্টা করিতেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। এমন এক নিয়ম বাহির করিলেন যে সুচরিত্র ব্যক্তিগণ কলেজ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রফেসরদের উন্নতভাব হইতে ছাত্রগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কয়েক বৎসর গত হইল প্রতি কলেজে ছাত্রদের উপর কয়েকজন করিয়া তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহারা ছাত্রদের সর্ব্বদা পদানুসরণ করে, তাহাদের কাজকর্ম্ম চিঠি পত্র সব দেখে, ইহাদের উৎপাতে ছাত্রেরা মহা জ্বালাতন অথচ গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কিছু বলিতে পারে না। এই চরেরা অতিশয় দুশ্চরিত্র লোক। তাহারা সাধ্যমত ছাত্রদের কুপথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। একজন তত্ত্বাবধারককে একজন প্রফেসর জিজ্ঞাসা করেন "তুমি ইতিপূর্ব্বে কি কাজ করিতে?" উত্তর "আমি অমুক নৃত্যশালার অধ্যক্ষ ছিলাম, সহরের দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা এখানে রাত্রে আসিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত।" প্রফেসর আর একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তুমি?" "আমিও একটী বেশ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলাম। তাহা উঠিয়া যাওয়াতে এখানে আসিয়াছি"। হায়! ইহারাই রুসিয়ার যুবকগণের রক্ষক। এই গল্পের আনুসঙ্গিক অনেক কথা যাহা লজ্জার খাতিরে আমাদের পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহা একজন লোক রাজ্যের শিক্ষা-বিষয়ক প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট বলেন। তাহা শুনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী হাসিয়া অস্থির।

এই ত কলেজের নীতিশিক্ষা। বিদ্যাশিক্ষাও তদ্রূপ! উৎকোচ দান ভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি যোগ্যতা বলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও, হইয়া উৎকোচ না দাও তবে উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে স্থান পাইবে না। যদি উৎকোচ দাও তবে পরীক্ষা দিবার আবশ্যক নাই রুসিয়ার সৈন্যগণ কার্য্যতৎপর,দক্ষ ও নানা বিষয়ে রুসিয়ার গৌরবস্বরূপ। কিন্তু এখানেও পরীক্ষাতে উৎকোচ প্রদান এক প্রকার রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের ধরা দাম আছে।

বিষয়	দাম	বিষয়	দাম
Artillery	৩০০৲	Russian Language History	এই তিন বিষয়ের পরীক্ষক সৈন্যবিভাগের অন্তর্ভূত নহেন। স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আবশ্যক।
Fortification	২০০৲	Foreign Languages	

বিষয়	দাম	বিষয়	দাম
Tactics	২০০৲	Trigonometrical Survey	২৫৲
Topography	১৫০৲	Christian Doctrine (?)	৬০৲
Administration	২৫৲	Statistics=ইহার জন্য অর্থ বা জ্ঞান কিছুই আবশ্যক নাই।	
Military Law	২৫০৲	Chemistry (আশ্চর্য্য! যে এই বিষয়ে কেবল মাত্র পরীক্ষক উৎকোচ গ্রহণ করেন না এ বিষয়ের পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন।)	

মিষ্টর লানিনের একজন বন্ধু সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বেশ বুদ্ধিমান কিন্তু তাঁহার অর্থ সম্বল কম তাই তিনি আবেদন করিলেন যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে উৎকোচটা বাদ দিয়া জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে দেওয়া হউক। উত্তর হইল—অসম্ভব। বড় জোর দাম কিছু কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে মাত্র।

রাজকর্ম্মচারী ও শিক্ষক ব্যতিরেকে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আর একটী অস্ত্র আছে। ইহা পুরোহিত সম্প্রদায়। রুসিয়ার পুরোহিতগণের ন্যায় দীনহীন ভণ্ডতপস্বী হয়ত আর কোন দেশে নাই। প্রজাদের কুসংস্কার বৃদ্ধি করাই ইহাদের কার্য্য। প্রায় অধিকাংশ পুরোহিতই মদ্যপায়ী। ইহারা সামান্য দু পয়সার জন্য জঘন্য হেয় কার্য্য আনন্দ-চিত্তে করে। যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস শত অত্যাচারের সান্ত্বনাস্বরূপ, দুর্ব্বলের বল, অন্ধকারে আলোক! রুসিয়ার ধর্ম্মবিশ্বাস রাজপ্রসাদলাভের আর একটী সোপান মাত্র। যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস প্রায় নাই—রুসিয়ার যেরূপ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আইন তাহাতে সত্য বিশ্বাস থাকিবার সম্ভাবনাও অতি অল্প—যাহা আছে তাহা কুসংস্কার, আর ধর্ম্মবিশ্বাসের ভাণ মাত্র। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে নানা সম্প্রদায় আছে—রুসিয়ার রাজগণ orthodox বা প্রাচীন মতাবলম্বী। রাজকর্ম্মচারীগণ অন্যমতাবলম্বীদিগকে এই সম্প্রদায় ভুক্ত করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাহার ফলস্বরূপ মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে দেখা যায় অমুক গ্রামবাসীরা কাল প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে কত কথা গুপ্ত আছে তাহা কে বলিবে? সময়ে সময়ে উৎপীড়নে অগত্যা তাহারা মতান্তর স্বীকার করে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই তাহাদিগকে ভিন্নমতভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। আজ তাহারা এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল কাল শুনিল তাহারা অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত! "না" বলিতে সাহস নাই, বলিলেই অমনি সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন। গতকল্য একজন রাজচর "রাজার জন্মদিন উপলক্ষে প্রজাবর্গের শুভ কামনা জ্ঞাপক বলিয়া তাহাদের নিকট একখানি কাগজ সই করাইয়া লইয়াছিল কিন্তু আসলে তাহাতে লেখা ছিল "আমরা আমাদের সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলাম।" একবার হাঁ বলিয়াছে সুতরাং না বলিবার আর যো নাই। কখন বা পুরোহিত পরিবর্ত্তন দ্বারা ঐরূপ ফল হয়। বর্ত্তমান পুরোহিত বদল হইয়া একজন নূতন যাজক আসিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম্মের গোঁড়া, কিছুদিন তাঁহার গির্জ্জায় যোগ দিলে উপাসকেরা

তাঁহার সমধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া গণ্য হইল। অনেক সময়ে ইহারা পোষাকের ন্যায় বার বার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে। একজন উচ্চপদস্থ ক্যাথলিক আর একটী উচ্চতর কর্ম্ম পাইবার জন্য লুথরের সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেন আবার দুই দিন বাদে তাহা হইতেও উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্তির জন্য ক্যাথলিক হইলেন। এইখানেই শেষ হইল না। আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম প্রাপ্তির আশায় প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। কখন কখন এক একটী গ্রাম ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে—বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন বশত নহে, রাজাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। শেষবার যখন জার নিহিলিষ্টদিগের হস্তে মৃত্যু হইতে উদ্ধার লাভ করেন তখন তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনেকে অনেক প্রকার উপহার ও পত্রাদি প্রেরণ করে। একটী ক্যাথলিক গ্রাম তাহাদের আনন্দ প্রকাশার্থে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিল, জার আনন্দপ্রকাশ পূর্ব্বক ধন্যবাদ প্রেরণ করিলেন। এইরূপ মনে এক ও প্রকাশ্যে অপর ধর্ম্ম গ্রহণ করায় কেবল যে তাহাদের চরিত্র হীন হয় এমন নহে। অনেক সময়ে এই নিমিত্ত বিচারআইন ভঙ্গ দোষে স্ত্রী অবিবাহিতা ও সন্তান জারজ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ ধর্ম্মশিক্ষা নাই দ্বিতীয়তঃ যাহা বিশ্বাস করে তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পারিবে না, তৃতীয়তঃ প্রকাশ্যে অন্যরূপ আচরণ করিতে হইবে—এই জটীল সমস্যার মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি প্রজাগণ যে ধর্ম্মবিশ্বাসহীন হইয়া কুসংস্কারের আশ্রয় লইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? রুসিয়াবাসীদের কুসংস্কার কিরূপ বদ্ধমূল তাহা একটী গল্প বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। গত জুলাই মাসে একজন লোক কোন হাঁসপাতালের ডাক্তারের নিকট আসিয়া প্রার্থনা করে যে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার এই মর্ম্মে একখানি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিন যে "তাহার লাঙ্গুল নাই।" সে বলিল যে সার্টিফিকেট লওয়া ভিন্ন অপর কোন উপায় নাই কারণ গ্রামে যখন কোন কিছু দুর্ঘটনা হয় তখন সকলে তাহাকে যাদুকর ও দুর্ঘটনার মূল বলিয়া তাহার উপর নানারূপ উপদ্রব করে। সুতরাং তাহার দেখাইতে হইবে, তাহার লাঙ্গুল নাই—তাহাদের বিশ্বাস যাদুকরগণ লাঙ্গুলবিশিষ্ট। সর্ব্বদাই সকলকে এই প্রমাণ দেওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক সেইজন্য ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকিলেই সুবিধা। পুরোহিতগণ এই কুসংস্কারের প্রধান প্রশ্রয় দাতা!

রুসিয়ার প্রজাদের কিরূপ দুরবস্থা এখন পাঠক তাহা বোধ হয় কতক পরিমাণে বুঝিয়াছেন, শিক্ষাভাব, ধর্ম্মাভাব আহারাভাব, এবং কঠোর নির্য্যাতন। এই শিক্ষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য না করুন, কিন্তু অনাহার ও নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিলে ক্ষতি কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষ যখন রুসিয়ায় এক রকম চিরস্থায়ী, তখন গবর্ণমেণ্টের তাহাতে দোষ কি আছে? গবর্ণমেণ্টের দোষেই এই দুর্ভিক্ষ, সুতরাং গবর্ণমেণ্টই ইহার জন্য অপরাধী। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আইন দেখিলে স্পষ্টই বুঝা

যায় যে, দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিছু দিন পূর্ব্বে রুসিয়ার ধন ভাণ্ডারের উপর বিদেশীয়েরা প্রায় বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। মিষ্টার ডিষণেগ্রেড্‌ষ্‌বি এই হতপ্রায় বিশ্বাসকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে কঠোর কষ্টের সৃজন করিয়াছেন। প্রথমতঃ রুসিয়া বিদেশে বিশেষতঃ ফ্রান্সের নিকট অনেক টাকার জন্য ঋণী। তাহা প্রথম যে সুদে ও যত বৎসরে শোধ দিবার কথা ছিল এখন নূতন বন্দোবস্তে তাহার পরিবর্ত্তে,অধিক সুদ ও অধিক সময়ে পরিশোধ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃআমদানির উপর শুল্ক ধার্য্য ও রপ্তানির উপর শুল্ক রহিত হওয়াতে মহাজনেরা ধনবান্ হইতেছেন আর প্রজাদের কষ্ট বর্দ্ধিত হইতেছে। একটী উদাহরণ দিই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রথম এই আইন স্থাপিত হইবার সময় ইংরাজ বণিকেরা পূর্ব্বে রুসিয়ায় যে কয়লা প্রেরণ করিতেন, তাহা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত শুল্ক তাঁহারা দিতে সম্মত হইলেন না কারণ তাহাতে লোকসান যায়। ইংলণ্ডের কয়লা ঘাটে জাহাজে পূর্ণ রহিল। দেশে কয়লা কম হইল। বণিকেরা কয়লার দাম চড়াইয়া দিলেন, কিন্তু অধিক-কয়লার কোন সংস্থান করিলেন না। এইরূপে প্রত্যেক বিভাগে এই আইনজনিত কষ্ট কৃষকদের উপর পড়িল। কৃষকদের আর এক কষ্ট তাহাদের কৃষি উপযোগী কোন অস্ত্র নাই। অস্ত্র এরূপ দুর্ম্মূল্য যে তাহারা তাহা কিনিতে পারে না। শস্য হউক আর নাই হউক গবর্ণমেণ্ট খাজনা ছাড়িবেন না। যতক্ষণ পারে তাহারা ধার করিয়া বীজ সংগ্রহ করে এবং খাজনা দেয়। টাকার সুদ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেহ যদি শতকরা ১০০ হারে ধার দেয়, তবে কৃষকেরা তাহাকে দাতা ও পরম হিতৈষী বলিয়া মনে করে। শতকরা ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত সুদের হার। কখন কখন ১২০০ পর্য্যন্ত শতকরা সুদের হার। এই ধার শোধ করা কি তাহাদের সাধ্য? মহাজনেরা তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া লন ও যত দিন ধার না পরিশোধ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষক তাহার পরিশ্রম মহাজনকে দান করিতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আহারের উপায় কি? মহাজন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেন। স্ত্রী ও সন্তানদের মহাজন তাড়াইয়া দেন। আইনানুসারে দাস বিক্রয় বন্ধ বটে, কিন্তু এই ঋণশোধের ছদ্মবেশে দাস প্রথা প্রচলিত। প্রতিদিন অসংখ্য কৃষক গৃহহীন হইয়া দাসত্ব গ্রহণ করিতেছে প্রতিদিন তাহার স্ত্রী সন্তান কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনাহারে রাজপথে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে? যতদিন গবর্ণমেণ্ট কৃষক-দের শিক্ষা প্রদান না করেন, তাহাদের ভাল মন্দ বুঝাইতে না চেষ্টা করেন, ততদিন এ অবস্থা হইতে তাহাদের মুক্ত হইবার কোন উপায় নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহস করিয়া তাঁহা করিতে পারেন না। কৃষকেরা যাহা পায় এই কষ্ট ভুলিবার নিমিত্ত তাহাই মদে ব্যয় করে। গবর্ণমেণ্টের তৃতীয়াংশের দুই অংশের অধিক রাজকর সুরা হইতে উদ্ভূত। শত শত বৎসর কাল প্রজারা এই অবস্থায় থাকিয়া এমন নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে এই অবস্থাই তাহাদের একরকম স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারা কখন

কথাটি বলে না। অদৃষ্টের উপর তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যেরূপ অদৃষ্টে ছিল সেই ভাবে যে কদিন সম্ভব বাঁচিয়া অদৃষ্টে যেরূপ মৃত্যু ছিল সেইরূপে অনাহারে পথপ্রান্তে প্রাণত্যাগ করে কাহাকেও দোষী ভাবে না। যেমন অদৃষ্ট! রুসিয়া গবর্ণমেণ্ট সগর্ব্বে বলেন, দেখিতেছ ইহারা কি সহিষ্ণু? রুসিয়ার ন্যায় রাজভক্ত প্রজা আর কোথায়? ইহাদের চরিত্রে ঈশ্বর অনেক ভাল ভাব দিয়াছেন, দয়া সরলতা সহিষ্ণুতা ও আতিথেয়তা ইহাদের প্রধান গুণ। কিন্তু ঘটনা চক্রে গবর্ণমেণ্টের হস্তে এই সৎগুণও বিকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অদৃষ্টের উপর স্থির বিশ্বাস বশতঃ ভবিষ্যতের প্রতি ইহাদের কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই সঞ্চয়ের ভাব নাই। অনাহার ও অতিরিক্ত মদ্যপানে সকলেই নানাপ্রকার কুৎসিৎ রোগ-গ্রস্ত, অনেকে নাসিকাচ্যুত। আশা ভয় ভালবাসা ঘৃণা তাহাও প্রায় নাই। অসত্য ও অধর্ম্মকে ইহারা অন্যায় বলিয়া মনে করে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে আমাদের ন্যায়ান্যায়জ্ঞান ও তাহাদের ন্যায়ান্যায়জ্ঞান একই পদার্থ নহে। শিক্ষানুসারে ন্যায়ান্যায় বিবেচিত। পশুদের কার্য্যের সহিত আমরা নিজেদের কার্য্যের তুলনা করি না। সর্পকে আমরা হত্যাকারীর ন্যায় পাপী জ্ঞান করি না। রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টের প্রজাকেও তাহার কার্য্যের জন্য সেইরূপ আমরা দায়ী করিতে পারি না। জারও তাঁহার কর্ম্মচারীগণই প্রজাদের দেবতা এবং তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যকেই তাহারা দেবতা স্বরূপে মানিয়া চলে, তদ্ভিন্ন ন্যায়ান্যায় বুঝে না।

একজন লোক অনাহার কষ্ট হইতে উদ্ধারার্থে আত্মহত্যা করে। পুলিস তদন্তে যে কয়জন লোক সাক্ষ্য দিতে আসে তাহাদের মধ্যে একজন সাক্ষ্য দিল, "আমি যখন প্রথম এলুম তখন ও ঝুলছিল—গা গরম ছিল—আর পা নড়াচ্ছিল—এখন একবারে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে"। প্রশ্ন—"যদি তখনও বেঁচেছিল, তবে দড়ি কেটে ফাঁস খুলে বাঁচাতে চেষ্টা করলে না কেন?" উত্তর—"একবার ভেবেছিলুম করি, কিন্তু আবার ভাবলুম যে হয় ত কি গেরোতে পড়ব—আমি যদি ওকে বাঁচাই, আমার পুলিসের-ফেরে পড়তে হবে—যাক যেখানে যেতে চায় ও যাক্"। এই গল্পটী থেকে কি বুঝা যায় না পুলিসের ভয়ে তারা কি রকম অস্থির? একজন ভদ্রলোক একটি গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন এবং গ্রামসম্বন্ধে দুই একটি বিষয় মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করেন। মণ্ডল তাঁহার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল, আমাদের কিছু নাই। ক্ষুধায় মারা যাইতেছি, আপনি খোঁজ করিয়া দেখুন কিছু নাই। আমাদের ক্ষমা করুন—অনুগ্রহ করুন। ভদ্রলোকটি অনেক কষ্টে পা ছাড়াইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি রাজ-কর্ম্মে আইসেন নাই। রুসিয়ার একজন খ্যাতনামা নাটক ও প্রহসন লেখকের একখানি নাটকের একস্থানে নিম্নলিখিত কথোপকথন দেখা যায়—

একজন পুলিস কর্ম্মচারী দুইজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কি মত"?

"এ কথার উত্তর দেবার পূর্ব্বে বস্তুর উৎপত্তিস্থল বিবেচনা করা উচিত অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আইনে কিছু বলে কি না। যদি আইনে কিছু থাকে, তবে তাই ঠিক বলে জানতে হবে, আর না থাকে তবে যতদিন আইন না হয় মত স্থির করবার পূর্ব্বে ততদিন আমাদের অপেক্ষা করা উচিত"।

এটি কাল্পনিক ঘটনা, কিন্তু রুসিয়ার প্রকৃত অবস্থা কতকটা এইরূপ তাহা নিতান্ত কাল্পনিক নহে। সত্যভাব ইহাদের মোটে নাই। সিদ্ধান্ত বলিয়া একটা জিনিষও ইহাদের মনে স্থান পায় না। জাভা দ্বীপ কোথায় এই লইয়া দুইঘণ্টা মহা তর্ক চলিবে, কেহ বলিবে ইংলণ্ডের কাছে, কেহ বলিবে আমেরিকার কাছে, জাভার যে একটা সর্ব্বজনসম্মত যথার্থ স্থান ও অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা তর্কের পক্ষে কোনরূপ ব্যাঘাতজনক নয়। একজন বৃদ্ধ শাসনকর্ত্তা, যিনি ৫০ বৎসর একটি প্রদেশ দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছেন, তিনি একজনের সঙ্গে তর্ক করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে যে কারোলাইন দ্বীপপুঞ্জ ভারতসাগরের মধ্যে স্থিত নহে"?

একজন লোক আর একজনকে বলে "ওটা মিথ্যা বলছ"। ইহাতে রাগ করিবার কিছু নাই,কারণ উহা অপমানের কথা নহে। উত্তর হয় ত হইবে 'হাঁ মিথ্যা বলছি,ওরকম হয়নি; আর এক রকম হয়েছিল।' মিথ্যাটা অলঙ্কারমাত্র। রুসিয়ার প্রবাদবাক্য "শষ্য দ্বারা ক্ষেত্র অলঙ্কৃত হয়। মিথ্যা দ্বারা বাক্য অলঙ্কৃত হয়।" "পৃথিবীর সঙ্গে মিথ্যার সৃষ্টি" "কঠোর সত্যাপেক্ষা মধুর মিথ্যা ভাল" ইত্যাদি। অলঙ্কার ভিন্ন ইহারা কথা কহিতে জানে না এক একজনের এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি আছে—তিনি অন্যের ঈর্ষাভাজন। রুসিয়ার দুই শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্তকুল ও প্রজাকুল,এবং দুইপ্রকার দারিদ্র্য,শারীরিক ও মানসিক। প্রথম প্রকার দারিদ্র্য সম্ভ্রান্তকুলে নাই, দ্বিতীয় প্রকার দারিদ্র্য সার্ব্বভৌমিক। উচ্চনীচ কেহই সত্য ও ন্যায়পথে চলিতে সমর্থ নহে। বড় বড় লোকেরা অবাধে সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলিতেছেন। রুসিয়ার কবি Tiutscheeff বলেন "যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে।" অন্য লেখক Tugheiff শিক্ষিত রুসিয়ানদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য লোক। নানাপ্রকার সৎগুণ ভূষিত কিন্তু দেশের হীন নৈতিক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি একজন বিখ্যাত উপন্যাস লেখক। এবং রুসিয়ার Contemporary নামক মাসিক পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। একবার টাকার দরকার হওয়ায় তিনি সম্পাদকের নিকট অগ্রিম ২০০৲ টাকা চাহেন। সম্পাদক প্রথমতঃ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। T— বলিলেন আমার এখন টাকার দরকার যদি তুমি না দাও ত আমি তোমার অমুক প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গিয়া বন্দোবস্ত করিব। তুমি আমার লেখা আর পাইবে না। এই ভয়ে এবং Tর একজন বন্ধু জামিন হওয়ায় সম্পাদক টাকা দিলেন। একসপ্তাহ মধ্যে গল্প দিবার কথা। সপ্তাহকাল T—রোজই কাগজের আফিসে আসিয়া চা

থাইতেন ও গল্প করিতেন, কিন্তু যখন দেবার সময় হইল তখন সপ্তাহের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিরুদ্দেশ হইলেন। সম্পাদক রোজ তাঁহার বাটীতে যাইতেন কিন্তু সেখানেও দেখা পাইতেন না। অবশেষে একদিন T আফিসে আসিয়া বলিলেন, "মশাই, আমাকে যত গালাগালি দিন যা খুসী বলুন কিন্তু এবার আমি লেখা দিতে পারিব না। আসছে বারে দিব।" প্রথমতঃ সম্পাদক ও ম্যানেজার বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন অবশেষে Tকে অনেক করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে এবং কারণ শুনিয়া কিছু বলিবেন না কথা দেওয়াতে T—বলিলেন—"আমার উপর নির্ভর করে তোমরা কাগজ বাহির করিতে দেরী করিতেছ তাই আমি বল্‌তে এলুম যে দিতে পারব না—আমার এমন দুর্ব্বল স্বভাবের জন্য তোমরা আমাকে যা ইচ্ছে বলতে অধিকারী, কিন্তু কথা হচ্ছে আমি যে গল্পটা তোমাদের দিতে চেয়ে ছিলুম সেটা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পাদককে ৫০০৲ তে বিক্রী করেছি। তোমাদের কাছে ২০০৲ নিয়ে এখনও তার জন্যে কিছু না করে আবার টাকা চাওয়াটা ঠিক ভদ্র ব্যবহার মনে হ'ল না।" সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার লেখা কি অন্য সম্পাদককে দেওয়া হয়ে গেছে?" T—না এখনও হয়নি।" সম্পাদক বাক্স খুলিয়া ৫০০৲ মুদ্রা Tর হাতে দিয়া বলিলেন "এই নেও! এখন অন্য সম্পাদককে লেখো যে গল্প তাদের দিতে পারবেনা। T—কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা ম্যানেজারকে বল চিঠি লিখতে, আমি সই করে পাঠিয়ে দেব। Tর আর এক অভ্যাস ছিল যে লোকদিগকে আহারে নিমন্ত্রণ করিতেন অথচ আহারের কোন বন্দোবস্ত করিতেন না। ঠাট্টা করিবার অভিপ্রায়ে যে এইরূপ করিতেন তাহা নহে কিন্তু তাঁহার নিজের কথা রক্ষা করিবার ভাব এত কম ছিল যে যাহা বলিতেন তাহা মনে রাখা দরকার মনে করিতেন না। একবার তিনি বিখ্যাত সমালোচক Belinsky ও অপর পাঁচ জন লোককে আপনার বাগানবাটীতে নিমন্ত্রণ করেন। বাগানবাটীতে যে রাঁধুনী ছিল সে অসাধারণ সুপাচক বলিয়া T—গর্ব্ব করিতেন। তিনি দিন ঠিক করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় এসো—এমন খাবার দেব যে কখন অমন রান্না খাও নি। এক এক করিয়া ছয় জনকে আসিতে অঙ্গীকৃত করাইলেন। Belinsky বলিলেন আমাদের জন্যে ভাবনা নেই কিন্তু তুমি যেমন আরবারে আমাদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ী ছিলে না এবারও যেন সে রকম ফাঁকি দিও না। বরং নিমন্ত্রণের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তোমাকে মনে করিয়া দেবার জন্য আমি একটা খবর দেব।" নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন পরে গল্প বলিলেন "সে দিন বড় গরম, খোলাগাড়ীতে ছয়জন রোদে ও ধূলায় অত পথ গিয়ে শ্রান্ত হয়ে Tর বাড়ী পৌছুলুম। T আমাদের অভ্যর্থনা করতে না আসায় মনটা একটু দমে গেল। উৎসুক চিত্তে দরজায় ঘা দিলুম। আবার ত T—আর বছরের মত ফাঁকি দিবেনা? কাল Belinsky লিখে পাঠিয়েছে একটার সময় আজ আমরা আসব। অথচ তার দেখা নাই এর মানে কি? এখন ঘরে গিয়ে বসতে পারলেও হয়। এখানে রোদে

জ্বলে যেতে হচ্ছে। অবশেষে একটা ছোকরা বাড়ী হতে বার হ'ল, তাকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বল্লে, T—বাড়ী নেই।

"রাঁধুনী কোথায় ?"

"পাড়ায় মদ খেতে গেছে।"

আমরা তাকে কিছু পয়সা দিয়ে বল্লুম, রাঁধুনীকে খুঁজে ডেকে আন।' ঘরের চাবি রাঁধুনীর কাছে—আমরা ততক্ষণ বাইরে সিঁড়িতে বসে রইলুম।

ভাবিয়া দেখ শ্রান্ত ক্ষুধিত নিমন্ত্রিতবর্গের কি রকম অবস্থা। একজন দেখিতে গেলেন যে দোকানে খাবার পাওয়া যায় কি না। কিছুই পাওয়া গেল না। অবশেষে পাচক আসিয়া উপস্থিত হইল। তাকে জিজ্ঞাসা করলেম 'তোমার মনিব কোথায় ?' উত্তর, জানিনে।

তার পর জিজ্ঞাসা কর্লেম, আমাদের খাবার কথা কিছু তোমাকে বলে দেন নি ?—উত্তর "না, কিছুই বলেন নি।"

প্রবঞ্চনা করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হওয়া বুদ্ধির লক্ষণ, তাহাতে দোষের বিষয় কিছুই নাই। সম্প্রতি আদালতের একটী বিচার সম্বন্ধে দুই বন্ধুতে বসিয়া এইরূপ আলাপন হইতেছিল। "শুনেছ কারিন্ হেরে গেছে ?" "বল কি ?"

"হুঁ, সে মকদ্দমায় হেরে গেছে—যে বোকা তা হারবে না ?"

"কি রকম ?"

'সবাই জানে যে অমুক মরবার আগে তার হাত অক্ষম হয়ে গিয়েছিল সে লিখতে পারত না। আরও সবাই জানে যে পুরোহিত উইল লেখে আর মার্গারেট তাতে জাল স্বাক্ষর করে। পুরোহিত ত নিজেই গল্প করে বেড়ায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্গারেট লক্ষ টাকার অধিকারিণী আর কারিন্ পথের ভিক্ষুক। আর কারিনের গাধামিই তার কারণ। মার্গারেট বল্লে, দুজনে ভাগাভাগি করে নিই। কারিন্ তাতে রাজী হল না। বিশেষ যখন জানে যে সে নিজে গাধা তখন রাজী হ'ল না কেন ? তার পর মকদ্দমা হতেও পুরোহিত বল্লে আমার দশ হাজার টাকা দাও আমি সাক্ষী দেব যে জাল উইল। না, তাও দেবে না। মার্গারেট তখনি পুরোহিতকে টাকা দিলে। তা ছাড়া পুরোহিত কারিনের কাছে নগদ টাকাও চায়নি। বল্লে মকদ্দমা হয়ে গেলে দিও তাতে "হাঁ" বল্লে ক্ষতি কি ? পরে না দিলেই ত হ'ত। এমন বোকা আর দেখিনি ! আস্ত গাধা !'

আর এক জায়গায় গল্প চলিতেছিল "সে দিন ভাই অমুক যে একটা জার্ম্মাণকে জব্দ করেছিল ! জার্ম্মাণের কাছে সে ১২০০৲ টাকার কাঠ কেনে। জার্ম্মাণ সে দিন টাকা চাওয়ায় সে বল্লে, আচ্ছা রসিদটা তুমি লেখো আমি টাকা দিচ্ছি। জার্ম্মাণ রসিদ লিখতেই সে সেইটে নিয়ে বল্লে 'এই ত তুমি রসিদ দিয়েছ যে টাকা পেয়েছি আর তোমায় টাকা দেবার দরকার নাই।' প্রথমে জার্ম্মাণ বেটা মনে করেছিল

ঠাট্টা, তার পর যখন বুঝ্‌লে সত্যি তখন যদি তার মুখখানা দেখতে ?—হাঃ হাঃ !" চারিদিক হইতে হাস্যধ্বনি বক্তার হাসির সহিত মিলিত হইতে লাগিল। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক নাই, এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায়ান্যায় জ্ঞান, আদপেই নাই। কিন্তু তাহারা যে ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্যায় করে তাহা নহে, তাই তাহাদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহাদের কার্য্যে রাগ বা ঘৃণা উৎপন্ন হয় না, তাহাদের এই হীন অবস্থা, জ্ঞানহীন পশুভাব দেখিয়া মমতার উদ্রেক হয়। তাহাদের চরিত্রের আর একটি কথা সম্বন্ধে আমরা এখানে উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। অনেকেই রুসিয়ার নাটক ও নভেলে সতীত্বভাবের অভাব দেখিয়া বিস্মিত হন ও অসম্ভব মনে করেন কিন্তু ইহাতেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। স্বামী স্ত্রী-উভয়েই ইচ্ছামত অন্যের সহবাস করিতে পারেন, তাহাতে বাধা নাই। স্বামী অনেক সময় স্ত্রীকে ভাড়া দেন, আবার ফিরাইয়া লন। অথচ দুইজনে বিবাদ নাই, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা আছে। পিতা বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া বেশ্যালয়ে গমন করেন, তাহা নিন্দনীয় নহে। এ সম্বন্ধে সত্য ঘটনা হইতে শত শত উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায় কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা করিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। একটু উল্লেখ না করিলে রুসিয়ার প্রজাচরিত্র অসম্পূর্ণ থাকে, ইতিহাস শৃঙ্খল ভঙ্গ হয়, সেইজন্য বাধ্য হইয়া উল্লেখ মাত্র করিলাম এবং এই স্থানে বলিয়া রাখি যে সম্ভ্রান্ত কুলের মধ্যেই সতীত্বভাবের অধিক অভাব। এই সকল ঘটনা হইতে আমরা কি রুসিয়ার দীন হীন জঘন্য অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না? এই অত্যাচার-পীড়িত পশুর অধম মানবগণের জন্য কষ্ট অনুভব করি না ?

রুসিয়ার ইতিহাস এমন দুঃখপূর্ণ যে ইহার সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। যদি রুসিয়ার বড় বড় লেখক ও লোকেরা চাক্ষুষ ঘটনা বলিয়া ও গবর্ণমেণ্টের কাগজ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণ না করিতেন, তবে আমরা কখন ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম না। রুসিয়ান গবর্ণমেণ্ট দেশকে যত অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করুন মধ্যে মধ্যে এক একটি ঈশ্বরপ্রেরিত আলোকরশ্মি অন্ধকারের মধ্যেও আপনার মহিমা বিকীর্ণ করিবে। এই হতভাগ্য দেশে এই হতভাগ্য লোকের মধ্য হইতেও এক একজন দেবতুল্য মানবের অভ্যুদয় দেখা যায়। তাঁহারা প্রাণপণে এ অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করেন। এই দেশেই বড় বড় লেখক, কবি, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা, বিজ্ঞানবিৎ ও দার্শনিক জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণপণে স্বদেশের কার্য্য করিয়াছেন। ইহারা রাজানুগ্রহ প্রার্থী নহেন। ইহাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহার সামান্য কথা সুদৃঢ় পর্ব্বতভিত্তি,—যাঁহারা সামান্য প্রতারণা অপেক্ষা প্রাণদান শ্রেয় জ্ঞান করেন। এমন পুরুষ আছেন যিনি পরস্ত্রীর মুখ দর্শন করে না। আদর্শ সতী রমণীও আছেন। এককথায় ইহাদের যে কেবল ন্যায়ান্যায় জ্ঞান আছে তাহা নহে, প্রাণপণে সেই জ্ঞানানুসারে কার্য্য

করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যেমন কাউণ্ট টল্‌ষ্টোয়া। যদি রুসিয়া কোন দিন শরীর ও মনের স্বাধীনতা লাভ করে, সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করে, তবে ইহাদের অনুগ্রহে। যদি কেন, একরূপ বলা যায়, নিশ্চয়ই, রুসিয়ার এ দুর্দ্দিন চিরদিন রহিবে না। ঈশ্বরের রাজ্যে এত অত্যাচার এত অমঙ্গল থাকিবে না। কিন্তু সে দিন কবে—কিরূপে আসিবে? এই স্বদেশ-ভক্ত বীরগণের চেষ্টায় রুসিয়ার অন্ধকার ধীরে ঘুচিয়া ক্রমশঃ আলোক ফুটিবে, কিম্বা শত শত অত্যাচার পীড়িত জর্জ্জরিত প্রজারা ফ্রান্সের ন্যায় রুসিয়াকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করিবে? ভবিষ্যৎই তাহা বলিতে পারে!

গল্পলেখার বিড়ম্বনা। *

(গল্প)

কুলধর্ম্মে আমি বাণিজ্যব্যবসায়ী, কিন্তু কালধর্ম্মে আমার দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহিত্য চর্চ্চাও হইয়া থাকে। বাল্যকাল হইতেই আমার একটু আধটু গল্প লেখার সখ্ আছে, কিন্তু কাজের চাপে বড় একটা সময় পাইয়া উঠিনা। ব্যবসায় উপলক্ষে আমাকে প্রায়ই দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, রেলপথের সুদীর্ঘ সময় আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। ঐ সময়টা আমি মাঝে মাঝে তাই কিছু লিখিয়া কিম্বা পড়িয়া কাজে লাগাইয়া লই। কিছুদিন পূর্ব্বে একবার কার্য্যোপলক্ষে কুষ্টিয়া হইতে কলিকাতা যাত্রা করিতেছিলাম। পথে একটা ষ্টেসন হইতে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র কিনিয়া লইলাম। সেই কাগজখানা পড়িতে পড়িতে একটী বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। সে বিজ্ঞাপনের সার মর্ম্ম এই,—"অভিনব ভাবপূর্ণ কোন গল্প বা প্রবন্ধ উক্ত পত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে লেখককে ১৫ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে।" খবরের কাগজ পড়া শেষ হইল; আর কিছু করিবার নাই। কোন লেখাও আপাততঃ মাথায় নাই, সঙ্গে কোন বইও নাই, প্যাসেঞ্জার ট্রেণ গজেন্দ্রগমনে ঢিকোতে ঢিকোতে চলিয়াছে। ভারি বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। সংবাদপত্রের সেই বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম, চুপ করিয়া বসিয়া না থাকিয়া ঐ কাগজখানার জন্যই কিছু লিখি না কেন? পঞ্চদশ মুদ্রা অবহেলা করিবার সামগ্রী নহে স্বীকার করি, কিন্তু তবু পাঠককে বোধ হয় বলা বাহুল্য যে ঠিক যে ঐ পঞ্চদশটী রজত চক্রের প্রলোভনেই কল্পনাদেবীর শরণ লইলাম তাহা নহে।

কয়েক মাইল যাইতে যাইতেই একটা গল্প লিখিবার বিষয় ঠিক করিয়া লইলাম।

---

* কোন ইংরাজী গল্পের ভাব লইয়া রচিত।

বুঝিতে পারিলাম গল্পটী বেশ জমাট হইবে, খুব উৎসাহের সহিত পোর্টম্যাণ্টো হইতে একতাড়া শ্রীরামপুরের কাগজ বাহির করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। লেখা প্রায় শেষ হইলে দেখিলাম সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল, আমি কাগজগুলি গুছাইয়া কামিজের পকেটে রাখিয়া গাড়ীর জানালায় মুখ বাহির করিয়া বসিলাম। সুন্দর সন্ধ্যাকাল, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, দূরে দূরে অন্ধকারে ঘেরা বাঁশবন ও বৃক্ষশ্রেণী, রেলের রাস্তার দুই পার্শ্বে লম্বা লম্বা ঘাসের মৃদু কম্পন; এই সব দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক ভাবে আমার সেই গল্পের কথা চিন্তা করিতে করিতে স্থানকাল সব ভুলিয়া গেলাম; সহসা শত শত লোক সমাগম, চতুর্দ্দিকের বিবিধশব্দ ও উজ্জ্বল আলোকে চেতনা হইল যে শিয়ালদহ ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অবিলম্বে গ্যাসালোকিত প্লাটফর্ম্মে নামিলাম। আমার সঙ্গে একটী পোর্টম্যাণ্টো ছাড়া অন্য কোন জিনিষপত্র ছিল না। ষ্টেসনের এক পরিচিত কর্ম্মচারীর আপিসে পোর্টম্যাণ্টো রাখিয়া আমি অল্প ভাড়ায় একটা গাড়ীর সন্ধানে ষ্টেসনের বাহিরে আসিলাম। ভবানীপুরে আমার একজন আত্মীয় থাকেন। কলিকাতায় আসিলে আমি তাঁহার বাড়ীতে গিয়াই উঠি। কিন্তু আজ একটা ভুল করিয়াছিলাম, কলিকাতায় রওনা হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহাকে টেলিগ্রাম পাঠাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাই মনে মনে একটু খট্‌কা ছিল যে আজ এত রাত্রে তাঁহার বাড়ী গিয়া তাঁহাকে কত অসুবিধায় ফেলিব। এই ভাবিতে ভাবিতে গাড়ীর সন্ধানে বাহিরে আসিয়া রাস্তার ওধারে একটা নূতন সাইনবোর্ড দেখিলাম, তাহাতে লেখা রহিয়াছে "প্রবাসাশ্রম।" ভাবিলাম এটাত তবে একটা হিন্দুহোটেল হইবে, তাহা হইলে আজ রাত্রে এখানে থাকিয়া কাল সকালে আত্মীয়ের বাড়ী যাইলে হয়। আমি ভিতরে প্রবেশ করিতেই দরোয়ান আমাকে উপরের পথ দেখাইয়া দিল। হোটেলের স্বত্বাধিকারী মুখুর্য্যেমহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে তিনি যত্ন করিয়া আমাকে হোটেলের ঘর দ্বার সব দেখাইলেন, দেখিলাম ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবং জানিতে পারিলাম আহারাদির খরচ ও বাসাভাড়াও অধিক নহে। কিন্তু আমার সহিত কোন জিনিষপত্র না দেখিয়া বোধ হয় মুখুর্য্যে মহাশয়ের মনে কেমন একটু সন্দেহের উদয় হইল। তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের সঙ্গে কোন জিনিষপত্র নেই?"

আমি বলিলাম "আছে, শুধু একটী পোর্টম্যাণ্টো, সেটা ষ্টেসনের আপিসে রেখে এসেছি, এখনি আনিয়ে নেব। সে যাক্ এখন মহাশয় একটু চা খাওয়াতে পারেন কি, সন্ধ্যার সময় আমার চা খাওয়া অভ্যাস আছে।" তিনি বলিলেন "হ্যাঁ সরঞ্জাম সবই আছে, তবে যোগাড় কর্ত্তে যা দেরী হবে, দেখি আমি ঝিকে চা তোয়ের কর্ত্তে বলি।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমার মাথায় তখনও সেই গল্পটা জাগিতেছে;

যতদূর লিখিয়াছি কি রকম হইয়াছে পড়িয়া দেখিবার জন্য কামিজের পকেট হইতে কাগজগুলা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছুক্ষণপরে মুখুর্য্যে মহাশয় আবার গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়ের নামটী জানতে পারি কি ?

আমার মাথায় কি রকম খেয়াল চাপিল, আমি একটু হাসিয়া আমার গল্পের নায়কের নাম করিয়া বলিলাম "ধনঞ্জয়-মিশ্র"

তখন স্বপ্নেও মনে করি নাই এই নভেলী ছদ্মনাম ধারণ করায় আমাকে কি ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে।

চা খাইয়া আমি নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম, ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকদূরে নদীকূলে আসিয়া পড়িলাম, সেখানে শুনিলাম ম্যাকেঞ্জি কোম্পানার জাহাজ আরোহী লইয়া সপ্তাহে দুইবার উড়িষ্যা যায়, আমি এপর্য্যন্ত কখন সমুদ্র দেখি নাই, অনেক দিন হইতে সমুদ্র দেখিবার ইচ্ছা ছিল, ভাবিলাম, এই মঙ্গলবারের জাহাজেই চাঁদবালী পর্য্যন্ত গিয়া একবার সমুদ্র দেখিয়া আসিব। হোটেলের বন্দোবস্তে আমি বেশ প্রীত হইয়া ছিলাম, তাই ভাবিলাম এই ক'দিনের জন্য আর আত্মীয়ের বাসায় নড়চড় না করিয়া এখানেই থাকিব।

ইতিমধ্যে আমার হাতের কাজ কর্ম্ম সারিয়া রাখিলাম ; গল্পটি পূর্ব্বোক্ত সংবাদ পত্রের সম্পাদকের নিকট পাঠাইবার জন্য কয়েকখানি ডাকের কাগজে তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিলাম।

মঙ্গলবার আসিল, আমি যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম ; কাজকর্ম্ম পূর্ব্বেই শেষ করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম রাত্রি প্রায় ৯টার সময় জাহাজে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য নৌকা ছাড়িবে সুতরাং ধীরে ধীরে ইডেন গার্ডেনে চলিয়া গেলাম, সেখানে এক বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত শ্যামলকুঞ্জে কাষ্ঠাসনে দেহভার ন্যস্ত করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল হোটেলে মুখুয্যে মহাশয়কে ত যাওয়া সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই, বিশেষ গল্পটা লিখিয়া বাসাতেই ফেলিয়া আসিয়াছি, ঘড়ি খুলিয়া দেখি রাত প্রায় সাড়ে আটটা, তখনি ট্রাম গাড়ীতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, কাগজপত্র গুলি বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ান ছিল, সেগুলি কুড়াইয়া পকেটে পূরিলাম, একবার মুখুয্যে মহাশয়ের খোঁজ করিলাম শুনিলাম তিনি বাহিরে গিয়াছেন, আর অপেক্ষা করা ঠিক নহে বুঝিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিলাম, বহির্দ্বারে তাঁহার সহিত দেখা হইল—তাঁহাকে বলিলাম "চাঁদবালী যাচ্ছি, দুইচার দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বো, এখন বিদায় হই।" নদীতীরে পৌঁছিয়া দেখি নৌকা ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই, তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম, 'সিগল' জাহাজের একটি উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ কক্ষে আমার স্থান হইল ; সমস্ত দিন বড় পরিশ্রম হইয়াছিল শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অতি প্রত্যুষে শত শত ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উষার কনককান্তি পূর্ব্বাকাশে ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই জাহাজ ছাড়িয়া দিল, কৃষ্ণধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে ষ্টীমার সবেগে সশব্দে ছুটিয়া চলিল, কলিকাতা ক্রমেই দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং তাহার উন্নতশীর্ষ প্রাসাদ শিখর ও কলের চিমনি গুলি মুক্ত প্রভাতালোকে চিত্রবৎ চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

তাড়াতাড়িতে পূর্ব্ব দিন কোন কাজ ভুল করিয়াছি কিনা একটা চেয়ারে বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, মনে পড়িল একটা কাজ বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে, মুখুয্যে মহাশয়কে যাওয়ার খবরটাত দিলাম কিন্তু তাঁহার প্রাপ্যের মধ্যেত এক পয়সাও দিয়া আসি নাই! ভদ্রলোক একেই সেদিন আমার প্রতি অবিশ্বাসের ভাব দেখাইতে ছিলেন, এই ব্যাপারের পর কি আর তাঁহার আমার প্রতি বিশ্বাস থাকিবে? কিন্তু এখন ভাবিয়া আর কোন ফল নাই, ঠিক করিলাম ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার সমস্ত টাকাকড়ি মিটাইয়া দিব।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার পর আমাদিগকে চাঁদবালী নামাইয়া দিল, এখান হইতে একটা ষ্টীমার যাত্রী লইয়া কটক যায়, যাহারা কটক বা পুরী যাইবে বলিয়া আসিয়াছে তাহারা কটকষ্টীমারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, আমার ত কটক যাইবার দরকার নাই, সুতরাং একটা হোটেলের সন্ধানে বাহির হইলাম। অল্প চেষ্টাতে একটা হোটেলও পাইলাম, সেখানে আড্ডা লওয়া গেল, একটু বেলা পড়িলে ভ্রমণে বাহির হইলাম, দেখিবার বিশেষ কিছু নাই তথাপি অনেক ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিলাম। একটি কক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় হোটেলের একজন উড়িয়া চাকর আসিয়া আমাকে বলিল "দুইজন বঙ্গাড়ি আসিয়াছন্তি আপনক সঙ্গে দেখা কড়িবে।" আমি অবশ্য তাঁহাদিগকে ভিতরে আনিতে বলিলাম, কিন্তু চাকরটার কথায় আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল, আমি নূতন এখানে আসিয়াছি কাহারো সহিত আলাপ নাই, আমার পরিচিত কোন ব্যক্তিই বা যদি থাকেন তাহা হইলে তিনি যে আমার এখানে আসার সংবাদ পাইয়াছেন তাহা মনে হইল না, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চিন্তা করিতেছি এমন সময় দুইজন গৌরবর্ণ বাঙ্গালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এক-জনের বয়স প্রায় ৪০ বৎসর অপর ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক। বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিটি তাঁহার তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার বোধ হয় আপনিই ধনঞ্জয় মিশ্র।"

তাঁহাদিগকে বসিতে বলিব কি আমি নিজেই হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম, কিন্তু সহসা আমার গল্প মনে পড়ায় উত্তর করিলাম "আজ্ঞে হাঁ আমি এই নামেই পরিচিত বটে কিন্তু জানিতে ইচ্ছা করি আপনাদের সাক্ষাতের কি প্রয়োজন।"

কোন উত্তর না দিয়া তিনি আমার হাতে একখানি কার্ড দিলেন দেখিলাম তাহাতে ইংরাজীতে ছাপা আছে— আর, বানার্জি ;

ডিটেক্টিভ, বালেশ্বর ।

আমি আরো আশ্চর্য্য হইলাম, বলিলাম, "আপনারা কে তাহাত বুঝিলাম কিন্তু আপনারা যে এখানে কেন তাহা এখনো বুঝিতে পারিলাম না।" উত্তর পাইলাম "হ্যাঁ আপনি এ রকম বল্‌বেন তা আমরা অনেকক্ষণ জানি, কিন্তু মশায় আমাদের কাছে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া কিছু কঠিন।" স্বর গম্ভীর কিন্তু শ্লেষপূর্ণ।

আমি বলিলাম "ব্যাপার কি খুলিয়া বলিতে বাধা আছে ?"

উত্তর। "কিছু না, কিন্তু আমি দুই একটি প্রশ্ন আগে জিজ্ঞাসা করিব।"

আমি বলিলাম "স্বচ্ছন্দে।"

প্রশ্ন। "আপনি স্বীকার কচ্ছেন আপনার নাম ধনঞ্জয় মিশ্র।"

উত্তর। "না ঠিক তা নয় তবে কিনা কলিকাতায় আমি একদিন ঐ নামটা ব্যবহার করেছিলাম"।

প্রশ্ন। "মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় আপনি কলিকাতা ছেড়ে এসেছেন।"

উত্তর। "হাঁ"।

প্রশ্ন। "কলিকাতায় আপনি শিবু মুখুয্যের হোটেলে ছিলেন।"

উত্তর। "নিশ্চয়ই"।

প্রশ্ন। "হোটেলের প্রাপ্য আপনি সমস্ত চুকাইয়া দিয়া আসিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম "আমি তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি, ফিরিয়া গিয়া—"

আমাকে বাধা দিয়া সেই ভদ্রলোকটী বলিলেন "বাস্, আমি আর কিছু শুনিতে চাই না, আপনাকেই আমরা খোঁজ কর্‌ছি। আপনার অপরাধ কি তা বলিবার পূর্ব্বেই আপনাকে সাবধান কচ্চি যে আপনি বুঝে সুজে উত্তর দেবেন কারণ আপনার কথাই আমরা আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপে ব্যবহার করবো।"

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। ক্রোধ ও ঘৃণাভরে চীৎকার করিয়া বলিলাম, "কেন আপনারা এরকম প্রলাপ বকচেন, আপনাদের একি বিষম ভ্রম ? আমার অনুসন্ধান ! আমাকে সতর্ক করে দেওয়া ! আমার অপরাধ,—এ সমস্ত কি কথা ?"

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি উত্তর করিলেন "দেখুন মশায়, বেশী গোলমাল করিবেন না, আপনার অপরাধ আপনাকে বলিলে আশা করি আপনি শান্তভাবে আমাদের সঙ্গে আসিবেন। আপনার অপরাধ এই যে আপনি খুন করিয়াছেন এবং প্রকারান্তরে তাহা আপনি স্বীকারও করিয়াছেন, এর অধিক আর আপনাকে বলার প্রয়োজন দেখিনা, আপনাকে গ্রেপ্তার করা আমার কর্ত্তব্য, আমার সঙ্গে এখনি থানায় যাইতে হইবে।"

আমি তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে তাঁহারা কোন গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমি হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে বিন্দু বিসর্গও অবগত নহি, কিন্তু সে কথা গ্রাহ্য করে কে? যাহা হউক যখন মন একটু স্থির হইল, তখন তাঁহাদের সহিত থানায় যাওয়াই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। অবিলম্বেই একখানি গাড়ী আনান হইল আমি চলিতে চলিতে আবার চিন্তামগ্ন হইলাম, ভাবিলাম, বুঝি বা স্বপ্ন দেখিতেছি, কিন্তু স্বপ্ন কি কখন এ রকম হয়? ব্যাপারটা যে কি তাহাতো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তবে ইহা নিশ্চয় যে ইহার ভিতর কোন গূঢ় রহস্য আছে, আমার স্বদেশে এমন লোক কেহ আছেন কিনা জানিনা যিনি আমার চরিত্রে দোষারোপ করিতে পারেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না কিন্তু ডিটেক্টিভের কণ্ঠস্বরে শীঘ্র আমার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল, তিনি বলিলেন আমাদের এখানেই নামিতে হইবে। আমরা গাড়ী হইতে নামিলে পাহারা-ওয়ালারা আমাকে একটা ছোট খাট ঘরে লইয়া গেল, এইটিই থানা, এখানে আমার মোটামুটী জবানবন্দী শেষ হইলে একটি ক্ষুদ্র অন্ধকারময় কক্ষে আমি আবদ্ধ হইলাম, বলা বাহুল্য আমার সমস্ত আপত্তি বৃথা হইল।

সেই গারদঘরে আমাকে অনেকক্ষণ থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু আমি তখনো গল্পের কথা ভুলি নাই, পকেট হইতে ধীরে ধীরে কাগজগুলি বাহির করিলাম, ঘর অন্ধকার বলিয়া তাহা পড়িতে পারিলাম না; কাগজগুলি ঠিক আছে কিনা জানিবার জন্য তাহা গুণিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৬ খানির পরিবর্ত্তে ১৫ খানির বেশী কাগজ পাইলাম না, পুনর্ব্বার গুণিলাম তথাপি ১৫ খানি হইল, বড়ই বিরক্তি বোধ করিলাম, কলিকাতা ছাড়িবার পূর্ব্বেই তাহা সম্পাদকের কাছে পাঠান উচিত ছিল, তাড়াতাড়িতে তাহা হয় নাই, এখন আবার তাহার একখানি হারা-ইল কোথায় পড়িয়াছে তাহারো ঠিক নাই।

ইহার পরই আমার মনে হইল গল্পের কোন্ কাগজ খানি হারাইয়াছে দেখিতে হইবে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঘর অন্ধকার সুতরাং সে বিষয়েও কিছু সুবিধা করিতে পারিলাম না।

একবার দুইবার নহে, দশবারোবার পকেটে হাত দিয়া খুঁজিলাম, সে কাগজ আর পাইলাম না, পকেটে থাকিলেত পাইব। তখন মনে হইল হয়ত সেখানি কলিকাতার হোটেলেই তাড়াতাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি; অনেকক্ষণ পরে একজন চাপরাসি আসিয়া একটা আলো জ্বালিয়া দিল, আমি আর একবার পকেট হইতে কাগজগুলি বাহির করিলাম, বিশেষ আগ্রহের সহিত ক্ষীণ দীপালোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম গল্পের সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর অংশ যে কাগজ খানিতে ছিল সেই খানিই হারাইয়া ফেলি-য়াছি, সেই কাগজ খানিতে দুরাচার ধনঞ্জয় মিশ্রের (আমার গল্পের নায়ক) আত্মদোষ স্বীকারের কথা বর্ণিত হইয়াছিল।

হঠাৎ আমার মাথার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, "এতক্ষণ পরে ব্যাপারটা কতক কতক বুঝতে পারচি" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম "চাপরাসী!"

"এৎনা গোল মৎ করো" বলিয়া চাপরাসী জানালার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিল; তাহার দীর্ঘ গোঁফশোভিত মুখখানি দেখিলে দুর্গাঠাকুরাণীর চালে অঙ্কিত শুম্ভ নিশুম্ভুর চেহারা মনে পড়ে, কিন্তু তখন মনে মনে তাহার চেহারা সমালোচনার সময় ছিল না, সাগ্রহে তাহাকে বলিলাম "দেখ বাপু যে দুইজন ভদ্র লোক আমাকে গ্রেপ্তার করে এনেছেন তাঁদের সঙ্গে আমার এখনি একবার দেখা করা দরকার।"

অবিলম্বে পূর্ব্বকথিত ডিটেক্টিভ দ্বয় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "তাহলে তুমি দোষ স্বীকার কর্চ্চো?

আমি বলিলাম "তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমার দোষ স্বীকারের কোন লিখিত প্রমাণ এই রকম একটা কাগজে পাইয়াছেন কিনা অনুগ্রহ করে বলুন।" আমি পকেট হইতে কাগজগুলি বাহির করিলাম। পূর্ব্বে যাঁহার সহিত আমার কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল, তিনি উত্তর করিলেন "এ সমস্ত সংবাদ আমরা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই, শুদ্ধ খুন অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য টেলিগ্রামে সংবাদ পাইয়াছিলাম।"

অতিকষ্টে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিলাম, অল্পক্ষণ পরে সংবাদ পাইলাম টেলিগ্রাম আসিয়াছে কলিকাতা হইতে একজন পুলিস কর্ম্মচারী আমার বিষয় তদন্তের জন্য আসিতেছেন, আগামী কল্যই চাঁদবালি পৌছিবেন।

কি যন্ত্রণায় যে সেদিন ও তৎপর দিবস সমস্ত প্রভাত অতিবাহিত করিলাম তাহা আর বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। বেলা ১২টার সময় কলিকাতার পুলিস আসিয়া পৌছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে আমি একটি গল্প লিখিতেছিলাম, লিখিত খোলা কাগজ গুলি আনিবার সময় ঘটনাক্রমে একখানি কাগজ বাসায় ফেলিয়া আসিয়াছি, এই বলিয়া সেই ১৫ খানি কাগজ তাঁহার হাতে দিলাম, তিনি সেগুলি লইয়া চলিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আপনি এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলেন, কলিকাতায় আপনার কথা নিয়ে ভারি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে, আপনাকে গ্রেপ্তারের জন্য অনেক যায়গাতেই টেলিগ্রাম হয়েছে, সে কথা যাক্ কিন্তু আপনি আপনার গল্পের নায়কের নাম কেন যে নিজের নাম বলে ব্যবহার কল্লেন তাত বুঝ্‌তে পারি নে।"

আমি বলিলাম "আমার নামটি সুদীর্ঘ আর হোটেলের মুখুর্য্যে মশায় যে সময় আমার নাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠিক সেই সময় আমি ধনঞ্জয় মিশ্রের কাহিনী লিখ্‌ছিলাম, সুতরাং নিজের নাম না ব'লে কি কিছুমাত্র চিন্তা না ক'রে বল্লেম 'আমার নাম ধনঞ্জয় মিশ্র।' তখন কি আর জানি যে এর জন্যে এত ভুগতে হবে?"

পুলিশ কর্ম্মচারীটি বলিলেন "বুধবারের বেলা দুইপ্রহরের সময় হোটেলের সেই ব্রাহ্মণ আমাদের আপিসে এসে চুপে চুপে বলে যে একজন খুনী এসে আমার হোটেলে ছিল, এক পয়সাও দিয়ে যায়নি, কাল রাত্রে পালিয়েছে, ব'লে গেল 'চাঁদবালি যাচ্ছি' কোথায় যে গিয়েছে তা জানিনে, সে কাকে একটা পত্র লিখেছিল তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে। এই বলিয়া একখানি ডাকের কাগজে লেখা পত্র আমাদের দিয়ে গেল, আমরা সেই পত্র দেখেই চারদিকে টেলিগ্রাম করেছি, খবরের কাগজওয়ালারাও খুব লিখ্‌ছে, এমন ভুলও মানুসের হয়, কি বিপদ্।"

হাসিতে হাসিতে তিনি আমার সেই সমস্ত বিপদের কারণ গল্পের পাতাখানি আমার হাতে দিলেন, তাহাতে কি লেখা ছিল জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হইলেন। পত্র খানিতে যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম্ম এই :—

"—আমার নাম ধনঞ্জয় মিশ্র নয়, যে লোকের এই নাম ছিল, তাহার বাড়ী এলাহাবাদে, ঢাকায় তাহার একখানি অলঙ্কারের দোকান ছিল, আমি তাহার দোকানের মুহুরী, একদিন লোভে পড়িয়া রাত্রে তাহাকে হত্যা করি ও মাটিতে পুঁতিয়া রাখি, নানা কৌশলে প্রথমে আমি পুলিশকে আমার প্রতি সন্দেহ করিতে দিই নাই, আন্দোলন একটু কমিলে ইতিপূর্ব্বে যে টাকাকড়ি লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা লইয়া চম্পট দিই। কিন্তু পাপীর মনে শান্তি কোথা, অশান্তভাবে দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ সংবাদ পাইলাম পুলিশে আমার প্রতি সন্দেহ করিয়া আমার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে সুতরাং আবার পলায়ন করিলাম, কোথায় যাইব জানি না, বাঁচিবার আর আগ্রহ নাই, কিন্তু তুমি আমার আর অন্বেষণ করিও না, এ জগতে বোধ হয় আর দেখা হইবে না, ইতি—"

পাঠ হইলে আমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম, উপস্থিত কর্ম্মচারী ও অন্যান্য দর্শকগণও হাসিয়া অস্থির। সেখানে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম, কলিকাতায় পৌছিয়া থানায় আসিলাম, আমার সঙ্গের কর্ম্মচারী সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, বন্ধুবান্ধবগণও উৎকণ্ঠিত চিত্তে থানায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিদায় দিয়া মুখুয্যে মশায়ের হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। মুখুয্যে মহাশয় তাড়াতাড়ি আমার জন্য জলখাবার আনিতে দিলেন এবং অনুতপ্তস্বরে বলিলেন "তাইত "আপনার মত ভদ্রলোকের দ্বারা এরকম কাজ হবে না তা আমি আগেই জানি, তবে কিনা পুলিসের লোক বড় খারাপ, একটুতেই তোলপাড় করে তোলে।"

সেই পর্য্যন্ত আমার গল্প লেখার উৎসাহ অনেকটা শীতল হইয়া আসিয়াছে।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি ।

গত মাসের ভারতীতে বিবাহোৎসবের প্রথম দৃশ্যের সমস্ত গানগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে যে গুলির স্বরলিপি বাকী ছিল, নিম্নে তাহাদের স্বরলিপি দেওয়া হইল।

কাফি—ষৎ ।

[স২ র১ । র১ র১ র১ । রম১ র১ র১ ।
এই ম ল্লি কা টী প রা ই

গ১ ম১ প১ । পধ১ নোস১ নো১ । ধ১' প১ ধপ১ ।
ব চু লে এ —ই টী সা জা ব

ম১ গ২ । গপ১ ম২] ॥ প১ ন১ ন১ । র্স১ নর্স১ র্র১ ।
কা নের দু লে] গাঁ থি মা লি কা —
শেষ ।

র্স১ ধর্স১ নো১ । ধ১ পমগ১ ম১ । প১ পনো১ নো১ ।
ব কু ল ফু লে — দো লা ব

ধ১ প১ ধপ১ । ম১ ম১ গ১ । প১ ম২ ॥ প২ প১ ।
স খি র ক ব রী মু লে গাঁথ্ গে

প১ প১ ধ১ । ন১ ন২ । র্স১ র্স২ । প১ ন১ ন১ ।
মা লা — কা নন বা লা তো র সে

র্স১ নর্স১ র্র১ । র্স১ নো১ ধ১ । প১ মগ১ ম১ ।
সা ধে র ব কু ল ফু লে —

প১ ন১ ন১ । র্স১ র্স১ নর্সর্র১ । র্স১ র্স১ নো১ ।
ও ই কি আ ম রি ফু টে ছে

ধ১ পমগ১ ম১। প১ পধ১ নো১। ধ১ প১ ধপ১।
চা মে লী যা —ই আ মি যা ই

ম১ ম১ গ১। প১ ম১ মস১ ॥
আ নি গে তু লে —

(আ-প্র)

পিলু—কাওয়ালী।

[ম১ ম১ গ১ গর১। সন্১ স২ গ১। গম১ প৩।
মা নি নু মা — নি নু হা র

মপম১ গো১ র১ স১। রস১ ন্১ স২। স৪ ॥]
তো র কা ছে — স খি —

শেষ

র১ র১ ম১ ম১। প১ পধো১ পধোনো১ ধো১।
আ মা র মা ল তী — তো

প৪। ম১ ম১ প১ প১। প১ পধোপ১ মপ১ প১
লা এ খ ন হ ল না — বা

পম১ গোর১ স১। ম১ ম১ গ১ রসন্১। স১ গ২ ম১।
লা — — ফু লে ফু লে আঁ চল ভ

গম১ প৩। মপম১ গো১ র১ স১। রস১ ন্১ স২। স৪ ॥
রা — তো র যে লো — দে খি —

র১ র১ ম১ ম১। প১ পধো১ পধোনো১ ধো১। প৪।
সা রা বা গান লু টে — নি য়ে

মপম১ গো১ র১ স১। রস১ ন্১ স২। স৪ ॥
তু ই এ লি — না কি —

(আ-প্র)

দেশ—খেমটা।

[স´১ নো১ ধ১ প১ । ধ১ ধপ১ ম১ গ১ । স১ স১
কে মন স , থি আ মার সা থে পার লি

গ১ ম১ । প৪ ‖] ন১ ন২ ন১ । স´১ স´১ স´১ স´১
নে ত তুই হো থায় তু লি ব যা থি
শেষ

স´১ র´১ স´১ ন১ । স´১ র´১ র´১ র´১ । ন১ ন১ ন১ ন১ ।
হ র ষ প্র মো দে মা তি স থির কা ছে

স´১ স´১ স´১ স´১ । ন১ স´র´১ স´১ নোধ১ । প৪ ‖
দি য়ে আ সি শে ফা লি কা যুঁই
(আ-প্র)

থাম্বাজ—খেমটা।

[প১ ধ১ ধস´১ নো১ । ধ২ ম১ প১ । পধপ১ ম১ গ২ ।
না চ শ্যা — মা তা লে তা — লে
শেষ।

গম১ প১ মপ১ ধ১ । পধ১ নো১ নোধ১ প১ ‖ —২ প১ ধ১ ।
তা — — — — — লে — — তা লে
(আ-প্র)

ন২ স´২ । স´২ প১ ধ১ । পধপ১ ম১ গ২ । —২ প১ ধ১ ।
তা লে — তা লে তা — লে — তা লে

ন২ স´১ গ১ । গম১ প১ মপ১ ধ১ । পধ১ নো১ নো১ ধ১ প১ ।]
তা লে — তা — — — — — লে — —
(আ-প্র)

ম১ ম১ ম১ ধ১ । ধ১ নো১ নো১ স´১ ।
রু নু রু নু ঝু নু বা জি

স´১ ন১ স´২। নো১ নো১ নো১ র´১। স´১ স´১ নো১ স´১।
ছে নু পূর মৃ দু মৃ দু ম ধু উ ঠে

নো১ ধ১ প২। প১ র্গ১ র্গ১ র্গ১। র্গ১ র্গ১
গী ত সুর ব ল য়ে ব ল য়ে

র্গ১ ম´১। র্গর´১ স´১ র্গর´১ স´১। ন১ স´১ ন১ র´১।
বা জে ঝি নি ঝি নি তা লে তা লে

স´১ স´১ নো১ স´১। নো১ ধ১ নোধ১ প১। প১ ধ১
উ ঠে ক র তা লি ধ্ব নি না চ

ধস´১ নো১। ধ২ ম১ প১। পধপ১ ম১ গ২। গম১ প১ মপ১ ধ১।
শ্যা — মা না চ ত — বে তা — — —

পধ১ নো১ নোধ১ প১ ॥ [স১ স১ স১ র১। র২ র১ র১
— — লে — [নি রা ল য় তোর ব নে
(আ-প্র)

গ১ ম১ প২। প১ ধ১ গ১ ম১। নো১ নোধ১ প১ গম১।
র মা ঝে সে থা কি এ ম ন নূ পূ

প১ ম১ গ২।]ম১ ধ২ ধ১। পধ১ নো১ নো২।
র বা জে]এ মন ম ধু র গা

নো৩ নো১। নো১ নো২ নো১। ধনো১ স´১ স´২।
— ন এ মন ম ধু র তা

স´৩ স´১। স´১ র্গ১ র্গ১ র্গ১। র্গ১ র্গ১ র্গ১ ম´১। র্গ১ র´১
— ন ক ম ল ক রে র ক র তা লি

র্সন১ র্স১ । ন১ র্স১ র্ন১ র্র১। র্স২ ধর্স১ নোধ১ । প২ প১ ধ১ ।
হে ন দে খি তে পে তিস্ ক বে — না চ

ধর্স১ নো১ ধ২ । ম১ প১ পধপ১ ম১ । গ৪ । গম১ প১ মপ১ ধ১ ।
শ্যা — মা না চ ত ক বে তা — — —

পধ১ নো১ নোধ১ প১ ।
— — লে —

(আ-প্র)

বিশ্ব।

উঠে রবি, উঠে শশি, উঠেরে নক্ষত্র,
ফুল ফুটে, ফুল ঝরে যায়।
সাগর তটিনী বহে, নির্ঝরিণী ছুটে,
মেঘ খেলে আকাশের গায়,
বিহঙ্গ-সঙ্গীত ঝরে, বহে সমীরণ,
লতা পাতা মৃদু গান গায়।
জন্মমৃত্যু ভাঙ্গে গড়ে বিশ্বের মাঝারে,
হাসে কাঁদে মানবের প্রাণ;
শৈশব জীবনে মোর প্রভাত-নয়নে,
ছবিগুলি সম তারা ছিল ভাসমান।

২

তার পরে দেখিলাম রবির কিরণে
তার সেই আঁখি প্রেমোৎসুক;
তার পরে দেখিলাম চাঁদের মাঝেতে
একটী সে হাসিমাখা মুখ;
সমীরণ, পাখী, গিরি, নদী, উপবন,
সব যেন তারি কথা কয়,

ব্যাপিয়া রয়েছে যেন ধরণী হৃদয়
মোর যত আনন্দ নিচয়,
তখন উঠিল ফুটে প্রকৃতির মাঝে
কিবা মধু সৌন্দর্য্যের ভার!
ভরে গেল পরাণ আমার।

৩

তা পরে দেখিনু সব অশ্রুময় ছবি,
সে উজ্জ্বল আঁখি নাই আর!
চন্দ্র সূর্য্য তারা জ্যোতিহীন,
হাসিখানি মলিন তাহার।
নিষ্ঠুর প্রকৃতি মাঝে রয়েছে মিলিয়া
কি যেন সে মহাশোক গাথা,
কি যেন মলিন ছায়ে ধরণী আঁধার,
বিলাপ গাইছে লতা পাতা।
চলে গেল পরাণের আনন্দ কোথায়!
অশ্রুজলে ভেসে গেল মুখ,
দুখ ভারে ভরে গেল বুক।

৪

অশ্রু জলে দেখি চেয়ে রবির মাঝেতে
কার আঁখি প্রতিচ্ছায়া ভাসে?
শুভ্র শান্ত ব্যথাহীন কার মুখখানি
চাঁদের জ্যোতির তলে হাসে?
শুনিনু প্রকৃতি মাঝে উঠে উথলিয়া
কার চির সান্ত্বনার গান।
বিশাল এ বিশ্বে ওতপ্রোত
শান্তিময় অমৃতের তান!
ক্ষুদ্র এ হৃদয় খানি ডুবে গেলে মোর
সৌন্দর্য্যের প্রশান্তি মাঝারে!
রহস্যের মহা পারাবারে!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ফুলের মালা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে, তাহার হেমাভ রশ্মিগুলি নদীর উর্ম্মিলস্রোত চমকিয়া পরপারের বৃক্ষ শিখরে খেলিতে খেলিতে ক্রমে সরিয়া যাইতেছে। কুমার গণেশদেব অশ্বারোহণে তীর পথ দিয়া এই সময় ধীরে ধীরে বাসস্থানাভিমুখে ফিরিতে ছিলেন। কিন্তু অপরাহ্নের দৃশ্যশোভায় কুমার মুগ্ধ নহেন, কিম্বা মধ্যাহ্নের বিজয় সম্মানের কথাও এখন তাঁহার মনে নাই, তিনি কেবল ভাবিতেছেন সেই দীনবেশা যুবতীর কথা। তাহার জ্যোতির্ম্ময়ী আত্মন্তরী সৌন্দর্য্য, তাঁহার ন্যায় অপরিচিতের প্রতি সেই পরিচিত সহাস্যদৃষ্টি, রাজসভায় শুষ্ক ফুলমালা নিক্ষেপ এবং তাহা ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া—এই সকল রহস্যময় চিন্তাতেই তিনি অনন্যমন। অপরিচিতার সম্বন্ধে সমস্তই অপরূপ, বিস্ময়জনক প্রহেলিকা! তাহার বেশভূষা, ব্যবহার, ভাবভঙ্গী এমন কি একটি কটাক্ষ প্রত্যেক পদক্ষেপ পর্য্যন্ত; তাহার পরিধান গেরুয়া বসন অথচ সে সন্ন্যাসিনী নহে কেননা সন্ন্যাসিনীর ত্রিশূল জটাজুট বিভূতি রুদ্রাক্ষমালা তাহার নাই, মস্তক অনাবরিত নহে; গেরুয়া রংয়ের সূক্ষ্ম ওড়নার মধ্য দিয়া গ্রীবাদেশের অযত্নবদ্ধ অর্দ্ধ মুক্ত লোল কবরী লক্ষিত হইতেছে। সম্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্ত মস্তকে তরঙ্গায়িত সুচিকণ কেশশোভা, দু-একটী কুঞ্চিত শিথিল অলকদাম ভালে কপোলে খসিয়া পড়িয়া তাহার কমলাননের কমনীয় কান্তি অতি মধুর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছে।

"সুন্দরী কি কোন বিধবা তীর্থযাত্রী? কিন্তু বিধবা যদি ত হাতে দুই গাছি স্বর্ণবলয় কেন? বুঝিবা বালবিধবা বশতঃ পিতা মাতা তাহাকে একেবারে অলঙ্কার হীন করেন নাই। তাহাই সম্ভব; কেননা সধবারমণী হইলে পরিব্রাজিকা হইয়া বেড়াইবে কেন!" সুন্দরী যে কুমারীও হইতে পারে এ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কুমারের মনে উদয় হইল না। ওরূপ যৌবনপ্রাপ্তা হিন্দুকন্যা যে অবিবাহিত থাকিবে; ইহা সহজে কাহার মনে আসে! রাজকুমার অনুমান করিলেন, "তাহাই ঠিক, সুন্দরী তীর্থযাত্রী বিধবা, এবং উচ্চবংশীয়া পুরবালা তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহার প্রতি পদক্ষেপে আত্মমর্য্যাদা প্রত্যেক কটাক্ষে সাধ্বীর তেজগর্ব্ব প্রকাশিত! অথচ তাঁহার প্রতি যখনি সে চাহিয়াছে সে দৃষ্টিতে অতি মধুর প্রেমময় পরিচিত ভাব প্রকাশ করিয়াছে? তিনি তাহাকে কখনো দেখেন নাই, চেনেন না, তবে এ দৃষ্টির অর্থ কি! সুন্দরীর সকলি রহস্য! সকলি প্রহেলিকা!" এইরূপ চিন্তা মগ্ন হইয়া লোলরাশ হস্তে রাজকুমার অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতেছেন—সহসা তাঁহার

গতিরোধ হইল, আবার সেই বিস্ময়! সেই অপরিচিত সুন্দরীমূর্ত্তি তাঁহার দিকে হাস্যমুখে চাহিয়া ঐ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে!

রাজকুমারের স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সমস্তদিন ধরিয়া কি তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন নাকি! কিন্তু অধিকক্ষণ এই বিস্ময় ভোগ করিবার তিনি অবসর পাইলেন না। অশ্বকে থামিতে দেখিয়া রমণী নিকটে আগমন করিল, আসিয়া মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, "রাজকুমার চিনিতে গোল বাধিয়াছে নাকি?"

রাজকুমারের কোন কথা ফুটিল না! শক্তিময়ী আবার বলিল, সেই দীঘির ধারের খেলা মনে পড়ে না?"

রাজকুমার ধীরে ধীরে সুষুপ্তের মত বলিলেন "বাল্যসখী শক্তিময়ী!"

শক্তি হাসিয়া বলিল, তাহাও বুঝি মনে করাইয়া দিতে হয়, আমিত দেখিবামাত্র চিনিয়াছি।" একটা আবেগ তরঙ্গ রাজকুমারের হৃদয় আলোড়িত করিয়া তুলিয়া সহসা আবার প্রশমিত হইয়া পড়িল। সেই তিনি, সেই শক্তি, অথচ মধ্যে এখন ভাবের অনন্ত ব্যবধান! সে দিন যে তাঁহার নিতান্ত আপনার ছিল, যাহার সহিত একদিন অসঙ্কোচে খেলা করিয়াছেন, গল্প করিয়াছেন, সে এখন বিবাহিতা যুবতী, তাঁহার বহু সম্মানিয়া পরস্ত্রী। একদিকে বালবন্ধুত্বের স্বাভাবিকোচ্ছ্বাস অন্য দিকে সংস্কারগত পর পুরুষোচিত সম্মান সঙ্কোচভাব যুগপৎ তাঁহাকে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় করিয়া তুলিল, তিনি শক্তিকে কিরূপে সম্ভাষণ করিবেন তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না।

শক্তি যখন আবার অসঙ্কোচ আত্মীয়তা ভাবে বলিল—"বলি, ঘোড়া হইতে একবার নামিলে হয় না! সবাই তোমাকে বিজয় সম্মান দিয়াছে, আর আমার বাসীমালা বলিয়া কি গলায় পরিতে এতই ভয়?"

রাজকুমার তখন তাঁহার সঙ্কোচ ভুলিয়া আশ্বস্ত হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "সেই শুকনো মালা গাছি বুঝি আমার সম্মানের জন্যই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল?" শক্তি বলিল, "অভিপ্রায়টা তাই ছিল বটে; মালা যে তোমার কাছে নাও পৌঁছিতে পারে মনের আবেগে সে বুদ্ধিটুক তখন যোগায় নাই, লাভে হইতে আমার মালার দলগুলি ছিঁড়িয়া গেছে।" রাজকুমার এই কথায় একটু হাসিয়া অশ্ব হইতে নামিতে নামিতে বলিলেন, শক্তি শুকান মালার উপহার! এ কি সম্মান না উপহাস!" "শক্তি সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল, "ঘোড়া লইয়া আমার সঙ্গে এস, ঐ দিকে বসিবার জায়গা আছে, সেই খানে গিয়া অশ্ব বাঁধিও।" বলিয়া শক্তি পথ দেখাইয়া চলিল। রাজকুমার ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তীর দেশের ঘন সংলগ্ন বৃক্ষরাজি-সঙ্কুল বনকুঞ্জ তলে সদ্য-কুঠার ছিন্ন যে তিন্তিড়ি তরু অর্দ্ধস্থল অর্দ্ধজল অধিকার করিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল শক্তি সেইখানে আসিয়া তাহার উপর বসিল।

রাজকুমারও একটি তরুমূলে অশ্ব বাঁধিয়া শক্তির নিকটবর্ত্তী তরুশাখা ধরিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্য অস্তে গিয়াছে, কিন্তু তখনো সন্ধ্যায় ধূম্রবরণে পৃথিবী আচ্ছাদিত নহে। পশ্চিম গগণে উজ্জ্বল লাল মেঘের স্তর জমিয়াছে, তাহার আভায় জলস্থল লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শক্তির সুরূপ সুন্দর মুখে তাহা যেমন শোভিত হইয়াছে এমন আর কোথায় নহে।

শক্তি গৌরী ; কিন্তু সাধারণ বঙ্গবালার ন্যায় চম্পক বা কোমল পাণ্ডুবরণী নহে, তাহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় তেজোময়ী, প্রফুল্ল, প্রদীপ্ত, সুবর্ণাভ। কেবল বর্ণে নহে ; তাহার সুঠাম সুদীর্ঘ নাসায়, বক্র রেখাযুক্ত নিমীলিতপ্রান্ত ওষ্ঠাধরে, মধ্যবিভক্ত ক্ষুদ্র চিবুকে, কৃষ্ণ ভ্রূধনু-নিম্নস্থ ঘনপত্রশালী নীলনয়নের দৃষ্টিতে আত্মগরিমাময় গর্ব্বিত দীপ্তসৌন্দর্য্য প্রকটিত। তাহার আননের এই তেজ, এই দীপ্তি, ম্লানস্নিগ্ধ গৈরিক পরিচ্ছদে, কুঞ্চিত অলক গুচ্ছের সংস্পর্শে, নয়নের প্রেমময় আবেগ চাঞ্চল্যে, এবং অধরপুটের আনন্দবিস্ফুরিত ভাবে আপাততঃ অতি মধুর কোমল কমনীয়তা লাভ করিয়াছিল। রাজকুমারের তাহাকে দেখিয়া শকুন্তলাকে মনে পড়িতেছিল, দুষ্মন্ত ঠিক বলিয়াছেন!

"সরসিজমনুবিদ্ধ শৈবলেনাপিরম্যং
মলিনমপি হিমাংশো র্লক্ষ লক্ষ্মীং তনোতি
ইয়মধিক মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিবহি মধুরাণাং মণ্ডনাং আকৃতিনাং।"

সেই রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে তাঁহার সমস্তই ভুল হইয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নদীকূলের এই বনানীতল যেন সরসীতটের সেই উপবন, আর তিনি যেন সেই চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, শক্তি তাঁহার বালিকা সখী,তাঁহার রাণী। মোহপরায়ণ হইয়া তিনি যে কখন ধীরে ধীরে শক্তির পার্শ্বে, পতিত বৃক্ষের উপর আসিয়া বসিলেন, জানিতেও পারিলেন না। শক্তি যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "রাজকুমার আগের মত এখনো বাঁশি বাজাও?" তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি একটু দূরে সরিয়া বসিলেন, কিন্তু একেবারে আর উঠিয়া দাঁড়ান হইল না। শক্তি আবার বলিল "রাজকুমার তোমার বাঁশি কই?" "আগের মত বাঁশি বাজাও না?"

রাজকুমার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আগের মত? আগের দিন কি পরে থাকে? রাত পোহাইলেই স্বপ্ন ভাঙ্গে!"

শক্তি। কিন্তু আবার ত রাত আসে?

রাজ। ঠিক পূর্ব্বরাত্রের সে স্বপ্নটিত আর লইয়া আসে না।

রাজকুমারের কথায় শক্তির হৃদয় আনন্দস্ফীত হইল. রাধা বিহনেই যে বৃন্দাবন অন্ধকার, শ্যামের বাঁশরী বন্ধ তাহা বুঝিতে সে ভুল করিল না। কেনই বা করিবে, সে যেমন রাজকুমারের বিরহকষ্ট সহিয়াছে রাজকুমারেরও ত তাহার অদর্শনে সেইরূপ কষ্ট হইবে, সে হাসিয়া বলিল—"তেমন সাধ থাকিলে পুরাণ স্বপ্ন কি আর ফেরে না! এর মধ্যে তোমার সব সাধ ফুরাইয়াছে নাকি? রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন "সব না হউক, কতকটা ত বটে, আর বুড় হইতে চলিলাম, রাজ্যভার আমার হাতে, প্রজার সুখ দুঃখ দেখিব, না ছেলেবেলার মত কেবলি খেলা ধূলা লইয়া বাঁশি বাজাইয়া দিন কাটাইব!"

রাজকুমার বিংশতি অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র, বালক সুলভভাবে এখনো তাঁহার হৃদয় ভরপূর, তাই তিনি কথায় কথায় আপনার বৃদ্ধত্ব প্রকাশ করিয়া সুখ অনুভব করেন। শক্তি বলিল. "তোমার যেন বাঁশি বাজাবার সাধ মিটিয়াছে কিন্তু আমার ত শুনিবার সাধ মেটে নাই! ছি রাজকুমার; যে বাঁশি ছাড়া তুমি আগে একদণ্ড থাকিতে পারিতে না, এখন তাহাকে ছাড়িলে কি করে! গণেশকে শুণ্ডহীন কল্পনা করাও সহজ কিন্তু আমাদের গণেশদেবকে বাঁশি ছাড়া মনে করিতে হইলে অন্তর বাহিরের সমস্তই ওলট পালট হয়ে যায়!"

রাজকুমার হাসিয়া বলিলেন; "তা যদি তবে আর বাঁশি ছাড়া হোল না" বলিয়া তাঁহার রাজপরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে ক্ষুদ্র দুইখণ্ড কাষ্ঠনল বাহির করিয়া জুড়িতে লাগিলেন। শক্তি আহ্লাদে বলিল "সেই বাঁশের বাঁশি?

রাজ। হ্যাঁ তোমার সেই বাঁশিটি।

বাজাইতে শিখিবে বলিয়া ছেলেবেলা শক্তি এই বাঁশিটি রাজকুমারের নিকট লইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু দুদিন বাঁশিতে ফুঁক পাড়িয়াই তাহার শিখিবার সাধ মিটিয়া গেল লাভে হইতে বাঁশিটি রাজকুমার দখল করিয়া লইলেন। যদিও সামান্য বাঁশের বাঁশি কিন্তু তাঁহার স্বর্ণমণ্ডিত বাঁশীর অপেক্ষা ইহা বাজে ভাল।

শক্তি বলিল, "এখন রাজা হইয়াছ এখন এ সামান্য বাঁশের বাঁশি কি তোমার হাতে শোভা পায় মহারাজ! আমার ইচ্ছা হইতেছে তোমার ঐ খেলিবার বাঁশিটি কাড়িয়া জলে ফেলিয়া দিই? ছি রাজহস্তে উহা যেন ঠাট্টা!"

রাজকুমার তাঁহার সদ্যোপহার প্রাপ্ত মহামূল্য তরবারীতে হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "শক্তি এই বহুমূল্য তরবারি হইতে এই সামান্য বাঁশিটি আমার নিকট অধিক মূল্যবান, বরঞ্চ এই তরবারিখানি আমি জলে ফেলিয়া দিতে পারি, তবু ইহা ফেলিতে পারি না। পুরাতন স্মৃতির এইটুকু মাত্র আমার বলিয়া অবশিষ্ট!

রাজকুমারের কথায় শক্তির আরক্তকপোল আরো আরক্ত হইয়া উঠিল সে হাসিয়া

মাথার কাপড় খুলিয়া কণ্ঠস্থিত ফুলের হারে হাত দিয়া বলিল "রাজকুমার তোমার যেমন বাঁশি, আমার তেমনি এই শুকনো ফুলের মালা। ইহা তোমারি হাতের উপহার। ইহার মত মহামূল্য জিনিষ আমার আর কিছু নাই, তাই ইহাতেই তোমাকে সম্মান দিতে গিয়াছিলাম। এখন তুমিই বল, শুকনো মালার এই উপহার, সম্মান না উপহাস!" একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ রাজকুমারের হৃদয় কম্পিত করিয়া অবসিত হইল। তাহা সুখের কি দুঃখের তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার প্রফুল্ল মুখ বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তিনি শক্তিকে ভুলিতে পারেন নাই সত্য কিন্তু তাহাতে অন্যের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, যা কিছু ক্ষতি তা তাঁহার নিজেরই। কিন্তু তিনি পুরুষ, শত বিবাহও তাঁহার পক্ষে যখন শাস্ত্রসম্মত, তখন একাধিক রমণীর চিন্তাও তাঁহার পক্ষে সেরূপ দোষজনক নহে, বিশেষ শক্তি পরস্ত্রী হইবার পূর্ব্বে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সুতরাং যাহার স্মৃতিতে তাহার স্মৃতিপূর্ণ সে এ শক্তি নহে; সে তাঁহার বাল্যসখী, কুমারী শক্তিময়ী। কিন্তু শক্তি যে রমণী হইয়া, অন্যের পত্নী হইয়া এখনো তাঁহার স্মৃতি ধরিয়া আছে ইহাতে তাহার ইহকাল পরকালের ক্ষতি!

কুমারের ম্লান দৃষ্টি, বিষণ্ণভাব দেখিয়া শক্তি সহসা স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, সে গলা হইতে মালা খুলিয়া রাজকুমারকে পরাইতে যাইতেছিল, হাতের মালা হাতেই রহিয়া গেল, আর পরান হইল না।

কুমার বলিলেন—"শক্তি সেই খেলার মালা! সে খেলা এখনো ভোল নাই, সে যে বালকের খেলা! তাহা তোমার ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিল।"

শক্তি মর্ম্মাহত হইয়া বলিল "তুমি ভুলিয়াছ?"

"ভুলি নাই। কিন্তু ভোলা উচিত ছিল। শক্তি তুমি কেন হঠাৎ দেশ হইতে চলিয়া গেলে, তোমাকে কত খুঁজিয়াছি ঠিক নাই।"

রাজকুমার কঠোর কর্ত্তব্যযুক্তি প্রদান করিতে গিয়া নিজের অনুরাগই ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। শক্তি ইহাতে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের আঘাত বেদনা ভুলিয়া আত্মস্থ হইয়া বলিল, "রাজকুমার, কেন চলিয়া আসিলাম জানি না। একদিন প্রাতঃকালে পিতা বলিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব এখনি নৌকায় উঠিতে হইবে, এস আমার সঙ্গে। আমি অনেক চেষ্টা করিলাম, যদি রাজবাড়ীতে গিয়া একবার তোমাকে বলিয়া আসিতে পারি, বাবা তাহার অবকাশ দিলেন না, তখনি তাঁহার সঙ্গে নৌকায় উঠিতে হইল। এই ছয় বৎসর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছি প্রতি দিন জিজ্ঞাসা করি—কবে বাড়ী ফিরিব, তাঁহার উত্তর, আগে তীর্থ করা সাঙ্গ হউক। এ ছয় বৎসর যে কি কষ্টে দিন কাটাইয়াছি ভগবানই জানেন, এই শুকনো ফুলের মালা গাছি,——"

তাহার কথা শেষ না হইতেই রাজকুমার বিস্ময়ে বলিলেন "আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি বিবাহিত; তোমার তবে এখনো বিবাহ হয় নাই?"

সে হাসিয়া বলিল, স্ত্রীলোকের কি কখনো দুইবার বিবাহ হয় ?” রাজকুমার মস্তক অবনত করিলেন, অনুতাপের তীব্র জ্বালায় তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন। শক্তি তাহাকে স্বামী ভাবিয়া এতদিন কুমারী আছে, আর তিনি বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন-যাপন করিতেছেন! তবে এই অনুতাপের মধ্যেও তিনি সুখ অনুভব করিলেন,—শক্তি পরস্ত্রী নহে।

শক্তি জিজ্ঞাসা করিল “রাজকুমারের অবশ্য বিবাহ হইয়াছে ?” রাজকুমার ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া সাশ্রু নয়নে বলিলেন “শক্তি কেন তুমি চলিয়া গেলে ?”

“তাই মনে ছিল না ?”

“তা নয়। মায়ের মুখে শুনিলাম, বিবাহ দিতেই তোমার পিতা তোমাকে দেশে লইয়া গিয়াছেন। আমি জানিলাম তুমি পরস্ত্রী।”

শক্তির পিতার বাড়ী ঠিক দিনাজপুরে নহে; দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী দেবকোটে, তিনি রাজসরকারে কাজ করিতে আসিয়া ১০ বৎসরকাল দিনাজপুরেই বাস করিতে-ছিলেন।

শক্তি কষ্টে উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া বলিল “কে রাণী ?”

“নিরূপমা”

শক্তির সুন্দর মুখ সহসা ঈর্ষা বিকৃত হইল! শক্তি রাজকুমারের স্মৃতি ধরিয়া কষ্টে দিন যাপন করিতেছে; আর তিনি দু দিন না যাইতে অন্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন! ভগবান পৃথিবীতে তুমি পুরুষ ও নারীকে এতই অসমান করিয়া জন্ম দিয়াছ ? একজন কাঁদিয়া মরিবে আর সেই অশ্রু জলে অন্য জনের হাসি ফুটিয়া উঠিবে ? একজনকে শোণিত দিয়াছ কি কেবল অন্যের পিপাসা মিটাইবার জন্য !

শক্তির সেই ঈর্ষা বিকৃত কুটিল রেখাঙ্কিত ভ্রূকুটি দেখিয়া রাজকুমার শিহরিয়া উঠি-লেন। তাঁহার হৃদয়ে শক্তি যে ভাবে অধিষ্টিত, তাহার যে মূর্ত্তি তিনি ভুলিতে পারেন নাই, ইহা ত সে ভাব সে মূর্ত্তি নহে। সেই মোহিনী সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে এরূপ সংহারিণী ভীষণ মূর্ত্তি লুক্কায়িত থাকিতে পারে রাজকুমার তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না!

রাজকুমারকে স্তব্ধ দেখিয়া শক্তি হলাহলপূর্ণ স্বরে বলিল—“তোমাদেরি সাজে! সত্যই ত; আমরা বিশ্বাস করিব,—তোমরা ছলনা করিবে! আমরা তোমাদের ধ্যানে জীবন পাত করিব,—তোমরা ফুলে ফুলে মধু লুটিয়া বেড়াইবে! আমরা তোমাদের পদতলে পড়িয়া থাকিব; তোমরা দলিয়া দলিয়া চলিয়া যাইবে,—তোমাদের খেলা; আর আমা-দের মৃত্যু!

রাজকুমারের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না, প্রফুল্ল কুসুমে সর্প মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিস্ময়-স্তম্ভিত! শক্তির সেই ভ্রুকুটিভরা বিষময় ভাব সম্মুখে করিয়া তাঁহার সেই ভক্তি-মতী, নির্ভর পরায়ণা, ক্ষমাশীলা নিরূপমার কোমল করুণ মুখশ্রী মনে জাগিয়া উঠিল,

এতক্ষণ তিনি তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি দেখিলেন সেই সুকুমার সুকোমল কুসুমলতিকা তাঁহার আলিঙ্গনবিচ্ছিন্ন, দলিত শুষ্ক, ভূমিতলে লুণ্ঠিত, তিনিই তাহার এই দশা করিয়াছেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি যদিও নিরূপমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভাল বাসিতে পারেন নাই, কেননা বাল্যপ্রেম এখনও তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক, কিন্তু সে প্রেম এমন অন্তঃশীলারূপে এমন স্বপ্নময় স্মৃতিরূপে তাঁহার হৃদয় ব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে তাহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার দাম্পত্য প্রেমের কোন ব্যাঘাৎ জন্মে নাই। ভক্তের আরাধ্য দেবতার মত শক্তি তাঁহার স্মৃতিগত কল্পনা মাত্র, রক্ত মাংস বিশিষ্ট দোষ গুণ সম্পন্ন মানুষ নহে, মানস পূজার গুণ রাশি সমূহ ; বাসনা কামনা প্রবৃত্তির অগম্য অপ্রাপ্য ধ্যান ধারণার বিষয়,—আত্মার অনুভাব মাত্র ;—আর নিরূপমা তাঁহার বিবাহিতা রমণী তাঁহার সন্তানের মাতা, তাঁহার সুখ দুঃখের অধিকারী ; সুতরাং তাহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি করুণা স্নেহের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। অভাব যাহা ছিল, তাহা অন্য কিছু ; সেই আত্মপরিপূর্ণকারী প্রেমের অভাব। কিন্তু নিরুপমার কোমল গুণরাশি, তাহার পরিপূর্ণ আত্মদান তাঁহাকে এতদিন সে অভাব জ্ঞাতসারে অনুভব করিতে দেয় নাই। আজ যখন তাঁহার মানসীদেবী মূর্ত্তিমতী রূপে তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল, যখন তাঁহার আত্মার অনুভাব ইন্দ্রিয়গম্য সত্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি বুঝিলেন, তিনি এতদিন কি অভাবসমুদ্রে মগ্ন ছিলেন। তিনি তখন আপনাকে ভুলিলেন, জগত ভুলিলেন, নিরূপমাকে পর্য্যন্ত ভুলিলেন, সেই দেবীরূপা মানুষীর মধ্যে তাহার অমৃতময় সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার সমগ্র বিলুপ্ত হইল। কিন্তু আবার যখন সে মোহ ভাঙ্গিল, যখন দেখিলেন তিনি ভুল করিয়াছেন, সে শক্তি তাঁহার ধ্যান ধারণার দেবী নহে, তাঁহার অন্তরের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-কল্পনা নহে, অসুন্দর লুক্কায়িত হলাহলকালিমা সে মূর্ত্তিতে পরিব্যাপ্ত, তখন নিরাশ-চেতন হইয়া তাঁহার আবার নিরূপমাকে মনে পড়িল, তাঁহার কর্ত্তব্য বোধ জন্মিল, সেই সরল বিশ্বস্ত হৃদয়ের অসীম ভালবাসা, পরিপূর্ণ নির্ভরতার প্রতিদানে তিনি কি না স্বহস্তে তাহাকে সপত্নীর অনলে নিক্ষেপ করিতে যাইতেছিলেন! নিরূপমার বেদনাজ্বালা তিনি নিজের সর্ব্বাঙ্গে যেন অনুভব করিতে লাগিলেন।

শক্তির কষ্টে, তাহার কঠোর তিরস্কার বাক্যে রাজকুমারকে এইরূপ অটল নিস্তব্ধ দেখিয়া তাহার উদ্ধত গর্ব্ব, ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি নীরব অশ্রুস্নিগ্ধ হইয়া মিলাইয়া গেল। ইহা একটি আশ্চর্য্য সত্য, 'আমি বড়'-ভাব পূর্ণ দাম্ভিক উদ্ধত লোকের গর্ব্ব প্রতিকূল অবস্থায় সহিষ্ণু নম্র প্রকৃতিদিগের অপেক্ষা সহজে খর্ব্ব হয়। শক্তি মর্ম্মাহত ক্ষুব্ধ হইয়া কাঁদিয়া সকাতরে কহিল, "রাজকুমার আমাকে ত্যাগ করিও না। তুমি পুরুষ ইচ্ছা করিলে শত বিবাহ করিতে পার—তবে কেন এই অভাগিনীকে পরিত্যাগ করিবে! তুমিই ধর্ম্মতঃ আমার স্বামী, আমাকে অকূলে ভাসাইয়ো না। তুমি যদি আমাকে ত্যাগ

কর, আমার যদি আবার বিবাহ করিতে হয়, ত মনে রাখিও সে বিবাহ ধর্ম্ম বিবাহ হইবে না, আর তুমিই সে অধর্ম্মের ভাগী হইবে।”

শক্তি থামিল, রাজকুমারের নয়নে শক্তির যন্ত্রণা কাতর অশ্রুসিক্ত ম্লান-জ্যোৎস্না-দীপ্ত মুখখানি, আর তাঁহার কর্ণে তাহার সেই করুণ কণ্ঠস্বর, তাঁহার পূর্ব্বের বীতরাগ আর কতক্ষণ থাকে? শক্তির ইতিপূর্ব্বের সেই অসুন্দর ভাব তিনি ভুলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিরূপমাকেও ভুলিলেন। এখন তাঁহার আর কেন নাই, আর কিছু নাই, জ্যোৎস্না-দীপ্ত সুন্দর কাননতলে তিনি আর তাঁহার প্রিয়তমা এবং তাহাকে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া একটা অনুতাপ বেদনা, ইহাতেই মাত্র তিনি সচেতন। রাজকুমার ব্যথিত চিত্তে শক্তির নিকট সরিয়া বসিলেন, হৃদয়ের করুণ-প্রেম নয়নে পূর্ণ করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া তাহার হাত খানি ধরিয়া অর্দ্ধস্ফুরিত স্বরে কি বলিতে যাইতেছেন—আর বলা হইল না, সহসা দুইটি প্রেমিক হৃদয় কম্পিত করিয়া সেই নিস্তব্ধ নদীতীরে ধ্বনিত হইল “কুলাঙ্গার পরস্ত্রী স্পর্শ করিতেছিস!” রাজকুমার ফিরিয়া চাহিলেন,—তাঁহার মাতার ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে প্রতিবিম্বিত হইল। রাজকুমার ত্রস্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু শক্তি নির্ভীক-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অটল স্বরে বলিল “মাতঃ আমি পরস্ত্রী নহি, আমি যুবরাজের ধর্ম্ম-পত্নী, ঈশ্বর সমক্ষে আমাদের বিবাহ হইয়াছে।” মাতা ক্রোধে কম্পিত হইয়া বলিলেন “গণেশ, এ বনোয়ারলালের কন্যা না? ইনি তোমার ধর্ম্মপত্নী যে দিন হইবেন, সে দিন প্রতাপরায় দেবের বংশ চণ্ডালবংশের অধম হইবে। বনোয়ারীলালের ভগিনী কুল-কলঙ্কিনী, সেই লজ্জায় সে দেশ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার কন্যা আমার পুত্রবধূ? দিনাজ-পুরের রাজরাণী! আমি জীবিত থাকিতে তাহা হইবে না, তোমার ইচ্ছা হয় তুমি ইহাকে উপপত্নী রাখিতে পার।”

শক্তির সমস্ত প্রকৃতি অপমানে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, “মহারাণি, আপনার মহৎবংশের উপযুক্ত কথাই আপনি বলিয়াছেন! কিন্তু ভগবান, ধনীর পক্ষে দরিদ্রের পক্ষে দুই নিয়ম করেন নাই, যদি ভগবান থাকেন যদি আমি আপনার পুত্রকে সত্যই একমনে ভালবাসিয়া থাকি, ত একদিন ইহার বিচার হইবে, আজ যাহাকে ঘৃণা করিয়া অকূল সাগরে ভাসাইলেন, আপনার শ্রেষ্ঠবংশ সেই হীন বনোয়ারীলালের বংশের পদানত হইয়াই সম্মান আনন্দ অনুভব করিবে। তাহা যদি না হয় ত ভগবান নাই।”

শক্তি এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একখানি ছায়ার মত সেই বনমধ্যে মিলাইয়া গেল, রাজকুমার ও তাঁহার মাতার কর্ণে তাহার অভিশাপ ভীষণ বজ্র ধ্বনির মত বাজিতে লাগিল।

শেষ।

লেখক মহাশয়ের প্রণালী অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মূল বিষয়ের প্রসঙ্গ বিচ্ছেদ আশঙ্কায় প্রথমেই তৎসম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা হইতেছে।

প্রথম কথা—ভিত্তি প্রাসাদ সম্বন্ধ নিরূপণের প্রকৃষ্ট বিধি কি এবং সে সম্বন্ধ সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে অবস্থিত কি না?

যেমন প্রাসাদের অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থানের হেতু তাহার ভিত্তি, তেমনি যদি কোন শাস্ত্রের অবস্থানের হেতু অপর কোনও শাস্ত্র হয় তবেই আমার বিবেচনায় দ্বিতীয় শাস্ত্রকে প্রথমের ভিত্তি স্বরূপে নির্দ্দেশ সঙ্গত, নচেৎ নহে। একই ভিত্তির উপরে যেমন বিভিন্ন কার্য্যোপযোগী বিবিধ প্রকারের প্রাসাদ নির্ম্মাণ সম্ভবপর তেমনি কোন বিশেষ জাতীয় শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া তদুপরি ভিন্ন জাতীয় কোন শাস্ত্র গঠনও অসম্ভব নহে,—বলা বাহুল্য এস্থলে শাস্ত্র অর্থে ধর্ম্মশাস্ত্র বা Scriptures নহে বিদ্যাসাধারণ বা a System of knowledge মাত্র। কিন্তু যেমন অল্প পরিসর ভিত্তির উপর অতি বৃহৎ পরিসর প্রাসাদ অধিষ্ঠান নিষ্ফল হয় তেমনি প্রাসাদশাস্ত্র অপেক্ষা ভিত্তিশাস্ত্র অল্প পরিসর হইলেও উহা টিঁকে না। তবে সেই ভিত্তিবিহীন অংশের উপর শিল্পের সাহায্যে বারান্দাদি নির্ম্মাণে ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে কিন্তু তাহার উপর দ্বি অথবা ত্র-তল প্রকোষ্ঠাদি প্রস্তুত করা চলে না, তেমনি প্রাসাদশাস্ত্রের ভিত্তিবিহীন অংশের উপর অমৌলিক (non-essential) তত্ত্বাদি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিন্তু তাহার বৈশিষ্ট্যবিধায়ী মূলতত্ত্ব গুলি নহে। অতএব যদি প্রাসাদ শাস্ত্রের মূল কথাগুলি প্রাসাদের মূল স্তম্ভগুলির ন্যায় ভিত্তি শাস্ত্রের উপর সম্যক অবস্থিত হয় তবেই উহার ভিত্তি আখ্যা দেওয়া আমার বিবেচনায় সঙ্গত, নচেৎ নহে।

এখন দেখা যাউক বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে এ সম্বন্ধ অবস্থানের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না। দর্শন অপেক্ষা ধর্ম্মের পরিসর অনেক অধিক, তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি দর্শনের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি সম্ভবে না। অতএব এক্ষণে আমাদের দেখা আবশ্যক বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত দর্শন সাংখ্যদর্শনের উপর অবস্থিত কি না, কেননা যদি তাহা হয় তাহা হইলেও লেখক মহাশয়ের উক্তির কতক পরিমাণে সার্থকতা আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এবিষয়ের মীমাংসার জন্য কপিল ও শাক্যের মতামত (doctrines) তৎপরবর্ত্তী সাংখ্য ও বৌদ্ধমত হইতে বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক; কেননা বুদ্ধ কপিলের নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে উভয়ের মতামত সুস্পষ্ট ভাবে জানা আবশ্যক। তাহা বর্ত্তমান কালে এক প্রকার অসম্ভব কার্য্য। বুদ্ধ অথবা কপিলের

স্বকৃত গ্রন্থাদি কিছু আমরা পাই নাই *। খুব সম্ভব বুদ্ধ স্বয়ং কোনও গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং কপিল যদিই বা কিছু রচনা করিয়া থাকেন তবে বহুকাল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। শিষ্যদের প্রতি উপদেশ বিরুদ্ধমতাবলম্বীগণের সহিত বিচার এবং সাধারণের প্রতি উপদেশ বাক্যই বুদ্ধের স্বকীয় মতামতের বহিঃপ্রকাশের সীমানা। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যিনি যেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি তাঁহার সেই সেই বিষয়ের বিবরণ অপরাপর শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দেন। শিষ্যপরম্পরায় সেই শিক্ষা মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। শাক্যের মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে রাজা অশোকের রাজত্ব কালে সেই গুলি লিপিবদ্ধ হয়। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার মতামতের সহিত আনন্দ প্রভৃতি প্রধান শিষ্যদের আপন মতামত মিশিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। এতদ্ব্যতীত শাক্যের মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে এবং অশোকের রাজসিংহাসনারোহণের শত বর্ষ পূর্ব্বেই বৌদ্ধগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ইহা সত্ত্বেও যদি আনন্দ উপালী প্রভৃতি প্রধান শিষ্যবর্গের ধারণা ও স্মৃতি শক্তি অক্ষুণ্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় তথাপি আবার অপর পক্ষ হইতে প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে। কপিল কোন্ সময়ের লোক এবং তৎপ্রবর্ত্তিত দর্শন কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানি না। কপিল নামের উল্লেখ অনেকস্থলে পাওয়া যায় কিন্তু সে সমস্তই এক ব্যক্তি সম্বন্ধে উক্ত কিনা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই বরং একাধিক ব্যক্তি এ নামের ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। এমন কি কপিলবস্তু যে দর্শনকার কপিলের নাম হইতে আপন নাম লাভ করিয়াছে তাহাও নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত কারিকা এবং বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যসার উভয়ই শাক্যের বহুপরবর্ত্তী কালের রচনা তাহাতে আর বিশেষ সন্দেহ নাই।

এখন যদি উভয় শাস্ত্রের মূলগত সাদৃশ্যাধিক্যবশত পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্ধতি অনুসারে ও উহাদের মধ্যে ভিত্তি প্রাসাদ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর না থাকে তবেই এক একথা সার্থক হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলেও আমার বিবেচনায় কোন্ শাস্ত্র কাহার নিকট ঋণী তাহা নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত করা অতিশয় সুকঠিন। কারণ, সে কালে ভারতে আধুনিক ইউরোপের ন্যায় গ্রন্থ অথবা মতের সহিত গ্রন্থকার অথবা মতপ্রবর্ত্তকের নিজত্ব অবিচ্ছিন্নভাবে একসূত্রে গ্রথিত থাকিত না। হিন্দুদের নিকট জ্ঞানই মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ ছিল, গ্রন্থকার অথবা মতপ্রবর্ত্তকের নিজত্ব রক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বিবেচিত হইত। পূর্ব্বতন মতের যে অংশটুকু শিষ্যের নিকট ভ্রমাত্মক অথবা সম্যক্ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত নহে, সে অংশগুলি

* "সাংখ্যপ্রবচন" নামক গ্রন্থ কপিলের রচনা বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করেন কিন্তু আধুনিক বিদ্বজ্জন মণ্ডলী সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এবং তাহাও যদি হয় তথাপি আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা সম্বন্ধে তদ্দ্বারা কিছু সুবিধা হইবার নহে, কেননা এ গ্রন্থে দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা কিছুই নাই বলিলেই হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যসার এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যমতের দুই স্তম্ভ স্বরূপ।

একেবারে পরিত্যক্ত অথবা কালোপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া সাধারণে প্রচারিত হইত। * এই কারণেই ভারতে ইউরোপের ন্যায় চিন্তাপ্রসূনের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আবিষ্কার করা এত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে যদি সাংখ্যসার ও সাংখ্যকারিকাই কপিলের দার্শনিক মতের প্রকৃত সংক্ষিপ্তসার হয়, তাহাতে যদি ঈশ্বর কৃষ্ণ অথবা অপর কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক মূল ভাব চিন্তাপদ্ধতি এমন কি রচনার সাধারণ ভাষা পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও আমার বিবেচনায় সাংখ্য মতকে বৌদ্ধমতের ভিত্তিরূপে উল্লেখ সঙ্গত হয় না। কেননা মায়া, কর্ম্মফল, প্রভৃতি কতকগুলি মূলগত বৌদ্ধমতের উল্লেখ সাংখ্যসার ও কারিকায় দৃষ্ট হয় না। যেমন বৌদ্ধমতের সহিত সাংখ্য মতের কতক বিষয়ে মিল দেখা যায় তেমনি আবার অপর কতকগুলি বিষয়ে বৈশেষিক এবং বিশেষতঃ বেদান্তমতের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

এ দুই দর্শনই আমরা আধুনিক কালে যে আকারে দেখিতে পাই তাহা যে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক পরবর্ত্তী কালে প্রবর্ত্তিত তাহাতে বিশেষ সন্দেহের কারণ নাই। তবে পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের বিবেচনায় এ সকল নূতন মত নহে, শাক্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এ সকল দার্শনিক মত কোন না কোন আকারে প্রচলিত ছিল, পরে বিশিষ্টাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। সম্ভবতঃ বহু পুরাতন উপনিষৎ কয়েকটীর সঙ্গে সঙ্গে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই দর্শনমতগুলির আবির্ভাব হয়। ইহার বহু পরে যখন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের নিম্নজাতীয় লোকসাধারণের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটাবশতঃ তাহাদের পরম অতুষ্টির কারণ জন্মে, তখন শাক্যের আবির্ভাব হয়। শাক্য জাতি শিক্ষা এবং জ্ঞান ধর্ম্মেও হিন্দু হইলেও লোকসাধারণের এই দুরবস্থায় তাঁহার বিশ্বপ্রসারিত হৃদয়ে সহানুভূতি উদ্দীপ্ত হইল এবং এই সহানুভূতির উত্তেজনারবলে তিনি পূর্ব্বতন হিন্দু ধর্ম্ম ও উদারভাবের পুনঃ স্থাপনা করিবার উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদানে যত্নশীল হইলেন। Letter killeth and spirit giveth life এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি পুরাতন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতই উহা নূতন ধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিল, নচেৎ পক্ষে উহা বিশাল হিন্দুধর্ম্মতরুর শাখারূপেই সম্ভবতঃ আমাদের নিকট পরিচিত হইত। তাই ঐতিহাসিক বিধি অনুসারে হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়; বিশেষরূপে সাংখ্যমতকে উহার জন্মদাতা বলা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

লেখক মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটী হইতে তাঁহার মত গঠিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন. "Certain it is that he (Gautama Buddha)

* সে কালে ভারতে বৌদ্ধমত এতদূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে তাহার প্রভাবে স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণের অথবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কোন সাংখ্যবাদীর নিকট হইতে প্রাপ্ত মত তদনুযায়ীরূপে কিঞ্চিত পরিবর্ত্তিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

was well versed in the philosophy of Kapila and obtained his principal tenets from that source." উপরোক্ত বাক্যটী ভিত্তিপ্রাসাদ সম্বন্ধ নির্দ্ধারের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া আমার মনে হয় না। আর' তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপ কারণবশতঃ আমরা সে কথা স্বীকার করিতে অক্ষম। এমন কি কপিলের নিকট হইতে যে শাক্য তাঁহার মৌলিকমত কতকগুলি পাইয়াছিলেন তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। আর একটী কথা, কপিলের দর্শনের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের মিল তাহা শাক্যের মত ব্যক্তির পক্ষে তিনি যে ভাবে বিশ্বসংসার দেখিতেন তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। তবে ভাব প্রকাশ ও গঠনের পদ্ধতি অবশ্য চতুষ্পার্শ্বস্থ অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। হিন্দু দার্শনিকভাব তাঁহার জানা ছিল, যখন তাঁহার আত্মভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন তখন সে ভাব অবশ্য পূর্ব্বগত ভাব ও ভাষা দ্বারা যে কিছু পরিমাণে গঠিত তাহাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু সে গঠন সহায়তা দ্বারা ধারকরা মিল প্রকাশ পায় না। তাহা হইলে Originalityর রাজ্য একেবারে লোপ পাইয়া যায়, কেননা মানুষ বর্ত্তমান ও অতীত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাব ও ভাষা সৃষ্টি করিলে (যদি এরূপ ক্ষমতা মানুষের থাকে) তাহা অপরের নিকট চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়।

শাক্য যদি কপিলের নিকট হইতে ভাব ঋণস্বরূপে লইতেন তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধত্বেরই বা মর্য্যাদা কোথায়? তিনি ধার করা মতামত লইয়া তাহা আত্মজীবন দ্বারা মণ্ডিত করিয়া নূতন করেন নাই। তিনি বুদ্ধপদ লাভ করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন তাহাই সকলে যাহাতে সহজে চিনিতে পারে এরূপ পরিচ্ছদে আবরিত করিয়াছিলেন মাত্র। আর শাক্যের বুদ্ধত্ব যদি ভুয়া হয় তবে অবশ্য এযুক্তি খাটে না।

দ্বিতীয় কথা—সাংখ্যশাস্ত্র ও বৌদ্ধশাস্ত্র নিরীশ্বরবাদ প্রচার করে কি না। এসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তদ্ব্যতীত একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে।

But the Sankhya cannot even in his logic, be called atheistic. On the contrary as Bunsen has noticed, "God regarded as the undivided Unity therefore the eternal essence of minds when perfected is an assumption or postulate running through the whole system like that of the existence of light in a treatise on colours"; and fairly inferrible as "a Divine Order of the Universe" from the "recognition of reason, knowledge, righteousness as common attributes of these individual minds." And the latest translator of the Bhagabadgita in an elaborate review of Hindu philosophy asserts from a point of view quite different from Bunsen's that the Sankhya not only does not deny the existence of a Supreme Being but even hints at it in referring to the emanation of individual souls to a spirital essence gifted with volition."

It is curious to note how similar in many respects is Patanjal's description in his theistic yoga system of an "Iswara" or Lord to that which Kapila gives of "Soul" —untouched by troubles works fruits or deserts." Were not both seeking each in his own way the spiritual idea in its independence of limit or change? Kapila could not have admitted an Iswara like that of the Yoga who is in one sense distinct from

all actual souls; yet his misconception of soul itself afforded ample basis in the idea of Infinite Mind.

Theistic Scholiasts on Kapila's aphorisms affirm that his denial of an Iswara is but hypothetical not absolute. It would have been more correct to say that it did not deny central and immanent deity. *

বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বরবাদ সম্বন্ধে বোধ করি বিশেষ কিছুই উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ লেখক মহাশয়ও সম্ভবতঃ আমার সঙ্গে এক মত।

তৃতীয় কথা—নির্ব্বাণকে মুক্তির চরম সীমারূপে আখ্যায়িত করা সঙ্গত কি না?

আমার বিবেচনায় উহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ, সকলই একই অবস্থার বিভিন্ন নাম। তবে মনের গতি ও প্রবণতা এবং বিশ্বাস ভেদে বিভিন্ন ভাবে মানবের নিকট বিভাসিত বলিয়া উহাদের অর্থের কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া কি মুক্তাবস্থাকে ক্রমোন্নতির অবস্থারূপে উল্লেখ করা সঙ্গত হয়? অবস্থা দ্বিবিধ, মুক্ত ও অমুক্ত। অমুক্তাবস্থার ক্রমোন্নতি আছে, উচ্চ নীচ গ্রাম আছে; কিন্তু মুক্তাবস্থা সোপান বিবর্জ্জিত তাহার মধ্যে আর শ্রেণী বিভাগ থাকা সম্ভব নহে। বিভিন্ন ধর্ম্মের মুক্তাবস্থার ভাব স্বতন্ত্র হইলেও কোন বিশেষ ধর্ম্মের মুক্তাবস্থার ভাবের সহিত অপর কোন ধর্ম্মের মুক্তাবস্থার ভাবের সহিত সংযোজিত করিয়া পরস্পরে মিশাইয়া সোপান শ্রেণী প্রস্তুত করা কি সঙ্গত?

এখানে হয়ত একটী কথা বলিলে বিষয়টী সরল হইয়া আসিবে। লেখক মহাশয় প্রথমবারে (অর্থাৎ গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতীতে) বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সাংখ্য দর্শনের সাদৃশ্য সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহার সার Ancient Indiaর ৫০১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কিন্তু ইংরাজীতে আছে "They have both declared knowledge and meditation to be the means of salvation লেখক মহাশয় সেস্থলে বলিয়াছেন, "উভয়েই নির্জ্জন চিন্তা ও জ্ঞানালোককে মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া নির্ব্বাণকে মোক্ষের চরম সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।" শেষাংশটুকু লেখক মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত, উহার জন্য রমেশ বাবুকে দায়ী করা যায় না।

অবশিষ্ট বিষয় চারিটীর সম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপে এস্থলে বলিবার কিছু প্রয়োজন করে না। লেখক মহাশয়ের শেষ উত্তর আলোচনার স্থলে উহাদের উল্লেখেই আমার মতামত যথেষ্ট ব্যক্ত হইবে।

এখন বিগত সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত লেখক মহাশয়ের উত্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

(১°) এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার নাই, আমার বক্তব্য এইটুকুমাত্র যে ঐতিহাসিকেরা "অনুমান"টাও "সৃষ্টি" করেন না। ঘটনাবলীর আলোচনা করিতে গিয়া আমাদেরই মত ঐতিহাসিকেরও মনে বিশেষ কোন দুইটী অথবা তদধিক ঘটনার মধ্যে

* Thomson's Bhag gita, Introd. P. lviec.

বিশেষ সম্বন্ধাভাব উৎপন্ন হয়। উহা একটা আকাশ ফোঁড়া আজগুবী কথা নহে, সম্ভাব্য-যুক্তির অধীন এক জাতীয় Inference মাত্র। Inference যে ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক অথবা অপর কেহ "সৃষ্টি" করিয়া থাকেন এইরূপ ত আমার জানা নাই; তবে যদি ভাষায় এইরূপ ব্যবহারের প্রচলন থাকে তবে অবশ্য আমার ভ্রমস্বীকার করিতেই হইবে।

(২) লেখক মহাশয় স্বয়ং যখন বলিতেছেন যে আত্মবিস্মরণ বিধিলিঙ বিভক্তির উল্লেখ না করার কারণ নহে তখন আমার পূর্ব্বোল্লিখিত অনুমানটী যে ভ্রমাত্মক তদ্বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তাঁহার ঐ বিভক্তি অনুল্লেখের কারণ কতদূর 'উপযুক্ত' তাহা পাঠক মহাশয়গণ বিচার করিবেন। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারই দর্শনের নৈতিকভাগের উদ্দেশ্য বিষয়। এই কর্ত্তব্য বিধানকে সংস্কৃত বিভক্তির দ্বারা নির্দ্দেশিত করিতে হইলে বিধিলিঙ বিভক্তিরই উল্লেখ সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কেননা বিধিনির্দ্দেশ করাই উহার বিশিষ্ট কার্য্য। পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের কর্ত্তব্য বিধায়ক Ought শব্দকে Indicative present বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু উহাকে লট বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত হয় না; কেননা indicative present এর সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিশব্দ লট নহে। Indicative present এর রাজ্য লট হইতে কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত; এবং ভাষাদ্বয়ের ক্রিয়ার ভাববৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার সাধারণ পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। এই কারণে ইংরাজী ব্যাকরণানুসারে ought বা কর্ত্তব্য Indicative present এর দ্বারা নির্দ্দেশিত হইলেও উহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের লট বিভক্তি রূপে উল্লেখ সঙ্গত নহে। সংস্কৃতের নানৃতং ব্রূয়াৎ ইংরাজীতে A lie is (অথবা ought) not to be told এইরূপ হইয়া যায়। দর্শন শুধু "পর পীড়ন করিলে অন্যায় ব্যবহার করা হয়" এই টুকু বলিয়া ক্ষান্ত নহে; সেই সঙ্গে ইহাও বলে যে; অতএব পরপীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে।

(৩) এ প্রসঙ্গে লেখক মহাশয়ের কথার সার মর্ম্ম আমার বোধ হয় একটী বাক্যে বলা যাইতে পারে যে, Philosophy শব্দটীর পরিবর্ত্তে যদি আমি Psychology পদটি ব্যবহার করিতাম তবে হয়ত এতটা গোলযোগ হইত না। সে জন্য, শুধু সে জন্য কেন, এই সমস্ত কাণ্ডটার জন্যও অবশ্য আমিই একমাত্র অপরাধী, কেননা আমি না উত্থাপন করিলে তো আর কিছু ব্যাপারটা এত মহামারীভাবে দাঁড়াইত না। তবে পণ্ডিতেরা নাকি বলেন, গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা করা বৃথা অতএব তাঁহাদের অনুজ্ঞাই শিরোধার্য্য করা যাক।

লেখক মহাশয়ের কথা মত Philosopyর পরিবর্ত্তে Psychology পদটী ব্যবহারের পক্ষে আমার অপর কোনও আপত্তি ছিল না কেবল এইমাত্র কথা যে সাংখ্য মানসতত্ত্ব নহে দর্শন। মানসতত্ত্বোপযোগী শুদ্ধ মনোবৃত্তি গুলির (operation of the mind) বৃত্তান্ত উহাতে বর্ণিত আছে এমন নহে, আত্মা প্রভৃতি দর্শনোপযোগী নানান বিষয়ের আলোচনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে অতএব রামকে শ্যাম বলি কি করিয়া? সাংখ্যকে

Synthetic philosophy আখ্যা প্রদান সঙ্গত কি না, তৎসম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত অংশটী বোধ করি যথেষ্ট হইবে :—

The word (Sankhya) comes from Sankhya," (sam, together khya reasoning) indicating that it is philosophy based on synthetic reasoning. The Nyaya however takes the other course and gives philosophy founded on analytical reasoning. And thus whilst the Sankhya builds up a system of the universe, the Nyaya dissects it into categories and enters into its component parts." *

Philosophy, Psychology এবং Metaphysics শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং পরস্পরের প্রভেদ কি তাহা আলোচনার কোন আবশ্যক দেখিতেছি না ; যে কোন ইংরাজী দার্শনিক গ্রন্থ হইতে উহাদের ভেদাভেদ কি জানা যাইবে আর কিছু না হউক কোন একখানি ভাল ইংরাজীভাষার অভিধান খুলিয়া দেখিলেও যথেষ্ট হইবে।

Synthetic reasoning Unknowable-এর বিভাগে "হালে পাণি পায় না"—একথা হয়ত কেহ কেহ স্বীকার করিবেন, বিশেষতঃ যাঁহাদের নিকট স্পেন্সরের দার্শনিক প্রণালীর (method) কোনই মূল্য নাই কিন্তু স্পেন্সর যে একথা আদপেই স্বীকার করেন না তাহার প্রমাণ তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থগুলি বিশেষতঃ তাঁহার First Principles.

(২) বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব নীতিতত্ত্বে কি না?

Dr. Rhys Davids বলিতেছেন, Such originality as can be claimed for him (Gautama) arises more from the importance which he attached to moral training above ritual, or metaphysics or penance."

পূর্ব্বোদ্ধৃত গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে Dr. Rhys Davids বৌদ্ধ নীতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম্ম'পথ' সম্বন্ধে বলিতেছেন :—Never in the whole history of the world has the bare and barren tree of metaphysical inquiry put forth where one would least expect it, a more lovely flower—the flower that grew into the fruit which gave the nectar of Nirvana."

যে ধর্ম্মপথ ও নীতিতন্ত্র হইতে এইরূপ ফল প্রসূত হইয়াছে তাহাকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা আমাদের পক্ষে কি এতই দূষ্য কার্য্য হইয়াছে? আমরাত কোথাও বলি নাই ইহা ব্যতীত অপর কিছুতেই বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এ সম্বন্ধে কি বলেন দেখা যাউক :—

Buddhism is in its essence a system of self culture and self restraint. Doctrines and beliefs were of secondary importance" অপর এক স্থলে তিনি বলিতেছেন, "A religion the great aim of which is the teaching of a holy living in this world must necessarily be rich in moral precepts and such precepts are the peculiar beauty of Buddhism for which the religion is still held in honour all over the civilised world."—Weber কৃত History of Indian Literature হইতে তাঁহার মত উদ্ধারের কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই কারণ তাহা হইলে পুঁথি বড়ই বাড়িয়া যায়। লেখক মহাশয়

* Mrs. Mannings Ancient and Mediæval India Vol. I., P. 152.

ইহার বিরুদ্ধ মত যদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার কথা আমরা মানিয়া লইব।

(৫) এবং (৬) এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রথমেই বলিয়াছি এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

(৭) লেখক মহাশয় কেন বলিবেন আমিই বলিতেছি যে বাইবেল হইতে ভগবদ্গীতার জন্ম একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। উহা মানব চিন্তা পদ্ধতির সাম্যের মিল। এ সম্বন্ধে ম্যাক্স্মূলার কৃত Natural Religion নামক গ্রন্থের ৯৭-৯৯ পৃষ্ঠা দেখিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইবে।

(৮) হয়ত লেখক মহাশয় এবং আমি উভয়েই একই শব্দ ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অর্থে। তাই আমার কথার অর্থ সুস্পষ্টতরভাবে প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। "নিরীশ্বর শাস্ত্র" অর্থে এরূপ শাস্ত্র যাহাতে ঈশ্বর প্রসঙ্গের অভাব মাত্র লক্ষিত হয়; এবং "নিরীশ্বরবাদী" গ্রন্থকার অথবা শাস্ত্র অর্থে সেই জাতীয় শাস্ত্র ও গ্রন্থকারকে বুঝায় যাহারা জগৎ সংসারের নিয়ন্তা বা পালকের অনস্তিত্ব প্রচার করে যেমন আধুনিক atheist এবং materialist।

(৯) এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য তৃতীয় কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছি বিস্তারিত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(১০) এ প্রসঙ্গে লেখক মহাশয় আমার উপর "misrepresentation of fact"এর চার্জ্জ আনিয়াছেন। কথাটা সত্য হইলে যে নিতান্ত দোষের বিষয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমার প্রতি এই দোষারোপ কতদূর সঙ্গত পাঠক দেখুন।

আমি বলিয়াছিলাম, "লেখক মহাশয় প্রথম প্রবন্ধে বুদ্ধের একটী নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের উল্লেখ করেন। তত্ত্বটি কি জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিয়াছেন সার্ব্বভৌমিকতা।" ইহার উত্তরে লেখক মহাশয় বলিতেছেন, "স্পষ্টই বলিতে হইল ইহা misrepresentation of facts"—ইহার প্রমাণ স্বরূপে বলিতেছেন, "আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ তাঁহাকে আমার (১) চিহ্নিত উত্তর পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।' তাহার সার মর্ম্ম উপরে লিখিয়াছি ইত্যাদি ইত্যাদি।" লেখক মহাশয়ের উপরে লিখিত সার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

আমার প্রবন্ধে বুদ্ধের একটী নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের কথা উল্লেখ করি। প্রতিবাদক মহাশয় তত্ত্বটী কি জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করি বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত দর্শন। আমি বলিয়াছিলাম ঐতিহাসিক হিসাবে এ তত্ত্বের অধিকাংশ তাঁহার নবাবিষ্কার নহে কারণ কপিল তাঁহার আগেই আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাব হইতে তাঁহার পক্ষে এ তাঁহারই আবিষ্কৃত বটে; কারণ তাঁহার জীবন দিয়া মণ্ডিত হইয়া তাঁহার নিকট ইহা নূতন সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

এখন আমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে বাধ্য হইতে হইতেছে যে লেখক মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত (১) চিহ্নিত স্থানে কেন অপর কোথাও ইতিপূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত দর্শন পদটী ব্যবহার করেন নাই এবং আমিও তাঁহার ঐ অংশ হইতে এ ভাব বুঝিতে পারি নাই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম, অপর কেহ পারিয়াছেন কিনা

তাহাও বলিতে পারিতেছি না। এরূপ অবস্থায় উহা আমার বুঝিবার অক্ষমতার ফল হইতে পারে এ সম্ভাবনাটী পর্য্যন্ত যে লেখক মহাশয়ের মনে উদয় নাই কেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

এখন দেখা যাক প্রকৃত প্রস্তাবে কি ঘটিয়াছিল। প্রথম প্রস্তাবে আমি বলিয়াছিলাম :—

লেখক বলিতেছেন বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব তাঁহার নীতিতন্ত্রে নহে তাঁহার গঠনতন্ত্রে। গঠনতন্ত্র পদটির অর্থ কি? শিষ্যবর্গকে একত্রে সন্নিবদ্ধ রাখিবার পদ্ধতি বা অপর কিছু তাহা ঠিক বোঝা গেল না।

লেখক মহাশয় ইহার উত্তরে (১) চিহ্নিত অংশ দেখিতে বলেন। কিন্তু আমি যে সে উত্তরের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারি নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে দ্বিতীয় প্রস্তাবে স্বীকার করিয়াছি। তাহার উত্তরেও লেখক মহাশয় কিছু বলেন নাই। *

তাহার পরে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যটির পাঁচ পংক্তি পরেই লেখক বলিতেছেন "বুদ্ধের হৃদয় একটি নূতন আবিষ্কারের † আনন্দেই স্থির থাকিতে পারিল না। কিন্তু পূর্ব্বে যেরূপ আভাষ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে তাঁহার গঠনতন্ত্র ব্যতীত অপর কিছুতেই নূতনত্ব ছিল না এবং তাঁহার শিক্ষাও যদি সাংখ্যদর্শনের উপর সম্যক অবস্থিত এরূপ হয় তবে লেখক যে এই নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের উল্লেখ করিতেছেন তাহা কি?"

উত্তরে লেখক মহাশয় বলেন ইহারও উত্তরে (১) এর কোটায় যাহা বলিয়াছি তাহাই আর এক বার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাহার উপর আর একটু বক্তব্য এই যে বৌদ্ধধর্ম্মের নূতনত্ব তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতায়। বর্ণবিচার না করিয়া বুদ্ধদেব যে হতভাগ্য শূদ্রকেও মুক্তির অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতেই তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ব।

এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে যদি গৌতমের নূতন তত্ত্বাবিষ্কার তাঁহার ধর্ম্মনিহিত দর্শনই হয় তবে সার্ব্বভৌমিতার কথা উত্থাপন করিবার প্রসঙ্গ কি ছিল?

এইবার দেখা যাউক লেখক মহাশয়ের (১) চিহ্নিত অংশটাই বা কি। উহা দেখিতেছি তাঁহার সখের নান্‌থাতাই, জল ব্যতীত অপর সমস্ত দ্রব্যই উহাতে আছে। সমগ্র অংশটী উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, যে অংশ টুকুর সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত সার মর্ম্মের সাদৃশ্যাভাব লক্ষিত হয় সেই অংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত করা গেল :—

বুদ্ধ যে জ্ঞাতসারে সাংখ্যদর্শনের উপর তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন এমনো নহে। তখনকার বিদ্বৎ সমাজে সাংখ্যদর্শন বহুল প্রচারলাভ করিয়াছিল, সাংখ্যমত তথনকার আকাশে ভাসমান ছিল, বুদ্ধ প্রতি চিন্তায় প্রতি নিশ্বাসে তাহা টানিয়া লইয়াছেন। আমরা অনেক অনুভাব অনেক প্রভাবের

* তবে হয়ত বা Dr. Rhys Davids যাহাকে বলিতেছেন The systematized form in which he (Gautama) presented ideas derived from those of previous systems— তাহাই লেখক মহাশয়ের "গঠন-তন্ত্র"।

† আষাঢ়ের ভারতীতে তত্ত্ব শব্দ মুদ্রিত হয় নাই। কিন্তু া স্থানে আ বসা কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর হইলেও মুদ্রাযন্ত্রের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

মধ্যে বাস করি অথচ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা সচেতন থাকি না। একদিন দৈবাৎ কেমন তাহাকে নিজের করিয়া হৃদয়ে উপলব্ধি করি। সে পুরাতন হইলেও আমার পক্ষে নূতনই বটে, কারণ আমি তাহাকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছি, আমার জীবন দিয়া মণ্ডিত হইয়া সে নূতন সত্যরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। সেইজন্য বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মকে নূতন ধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্যেরা তাহাকে নূতন ধর্ম্ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে, কপিলের নিকট তাহারা আপনাদিগকে কোন অংশে ঋণী বোধ করিতেছে না। কিন্তু ঐতিহাসিক পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা দেখিতে পান তাঁহার চোখে তাই বুদ্ধ কপিলের নিকট ঋণী বটে।"

উপরোদ্ধৃত অংশ হইতে যে কেহ বুঝিবেন যে লেখক মহাশয় বুদ্ধের নূতন তত্ত্বাবিষ্কারের কথা বলিতেছেন, তাহা আমি বিশ্বাস করিতে অক্ষম। প্রথমতঃ, প্রথম প্রশ্নের সহিত এ কথার কিছুমাত্র প্রাসঙ্গিকতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, লেখক মহাশয় তো পঞ্চম প্রশ্নের নীচে "বৌদ্ধধর্ম্মনিহিত দর্শন পদটী" সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারিতেন তাহাতে ভারতীর যে খুব বেশী স্থান অধিকার করিত তাহাত মনে হয় না। তৃতীয়তঃ, উনি সার্ব্বভৌমিতা যে বুদ্ধের নূতনাবিষ্কার তাহা কোথায় পাইলেন দেখা যাউক। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিতেছেন, "Self culture and Universal Love,—this was his discovery? this is the essence of Buddhism.

তত্ত্বাবিষ্কারের কথা রমেশ বাবু অথবা Rhys Davidsএর গ্রন্থের কোথাও পাই নাই, আর ইঁহারাই—বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে ইঁহাদের রচিত Ancient India ও Buddhism লেখক মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বেদ চতুষ্টয়! এখন তত্ত্ব কথাটী উঠাইয়া দিলে সমস্ত সঙ্গতি রক্ষা হয় এবং(১)চিহ্নিত অংশ হইতেও বৌদ্ধধর্ম্ম নিহিত দর্শন টানিয়া বাহির করিতে হয় না এরূপ অবস্থায় পাঠক বিবেচনা করিবেন আমার ছলনাময়ী কল্পনা অমূলক ঘটনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাকে অসত্য পথে লইয়া গিয়াছে কিম্বা লেখক মহাশয়ের লেখনী অনবধান বশতঃ একটা অযথা শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। আর পূর্ব্বে যে তিনি কখনও এরূপ করেন নাই; তাহাও নহে। "তত্ত্ব" শব্দটী আরও একটী স্থলে তিনি অযথারূপে ব্যবহৃত করেন। তাহাতে তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া দেওয়ায় তিনি পরে তাহা শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। এখন পাঠক বিচার করুন। এ প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম কি করিয়াই বা উহাকে বুদ্ধের নূতন আবিষ্কার বলা যায় যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাংখ্যদর্শন প্রভৃতিতে বর্ণনির্ব্বিভেদে মোক্ষলাভের উপায় বিধান করা হইয়াছে।" তদুত্তরে লেখক মহাশয় বলিতেছেন "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বৌদ্ধধর্ম্মের কনিষ্ঠ অতএব উহার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আর মহাভারত যে বুদ্ধের অতি জ্যেষ্ঠ সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই তবে উহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে কিন্তু উহা যে বৌদ্ধধর্ম্মের কনিষ্ঠ তাঁহাতো কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন শ্রুতির সার উহাতে আছে তবে বর্ণনির্ব্বিভেদে মোক্ষলাভ যদি শ্রুতিতে না থাকে তবে সে কথা গীতায় আসে কি করিয়া?

দ্বিতীয়তঃ লেখক মহাশয় বলিতেছেন সাংখ্যদর্শন ধর্ম্মগ্রন্থ নহে শুধু দর্শন। উহাতে মোক্ষ কি, তাহাকে কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে এই সকল দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা হয়। বর্ণনির্ব্বিভেদে সকলেই মোক্ষলাভে অধিকারী কিনা তাহা বিচারিত হয় না, অতএব উহার নামোল্লেখও বৃথা। হিন্দুদর্শন মোক্ষলাভের উপায় বিধান করে—উহার উদ্দেশ্য ঐ। পাশ্চাত্য ফিলজফি এবং থিয়লজিকে একত্রে মিশ্রিত করিলে তবে আমাদের দর্শনের ভাব পাওয়া যায়। অতএব সাংখ্যকে দর্শন বলিয়া ছাড়িয়া দিলে চলে না। জ্ঞানের দ্বারা যখন মোক্ষপদ লাভ হয় এরূপ উক্তি থাকে, তখন শূদ্রের জ্ঞানোদয় হইলে যে মুক্তিলাভ হইবে না ইহা কিরূপে নির্দ্দেশিত হয় বুঝা গেল না। আর হিন্দু গ্রন্থাদিতে অনেক ব্রাহ্মণেতর বর্ণোৎপন্ন ব্যক্তির মুক্তিলাভের উল্লেখ দেখা যায়। তবে কোন কোন কালে যে সামাজিক প্রথানুসারে শূদ্রদের তপশ্চরণ ইত্যাদি দূষিত কার্য্য বলিয়া গৃহীত হইত তাহার জন্য হিন্দুশাস্ত্র দায়ী নহে সেই সেই কালের সমাজমাত্র দায়ী। "হিন্দু শাস্ত্র" সম্বন্ধে বোধ করি লেখক মহাশয়ের কিঞ্চিৎ অদ্ভুত ভাব আছে যেন আচারাদিই হিন্দুশাস্ত্র এবং তৎসম্বন্ধে কালাকাল ভেদ নাই। নচেৎ পক্ষে শম্বুকের উদাহরণ আনিলেন কি প্রসঙ্গে তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

সাধবকর্গের হিতার্থে ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়া থাকে একথা হইতে কি বুঝায় না যে ব্রহ্ম প্রকৃত পক্ষে নিরবয়ব? তবে ইহাতে যে হিন্দু ঋষিগণের এমন কি ঘোরতর দুরাচরণ হইয়াছে যে উহাতে তাঁহারা সত্যকে কলঙ্কিত * করিয়াছেন তাহা বুঝা গেল না।

লেখক মহাশয়ের এ সম্বন্ধে একটী ভ্রমাত্মক ধারণা আছে দেখিতেছি। যাঁহারা লেখক মহাশয়োদ্ধৃত সূত্রটী রচনা করেন তাঁহারা পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করেন নাই। তার বহুপরে দেশে পৌত্তলিকতার প্রচার হয়।

"ধর্ম্ম দর্শন নহে যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মাহাত্ম্য আবদ্ধ থাকিবে" ইত্যাদি অংশের প্রাসঙ্গিকতা ও সার্থকতা যদি লেখক মহাশয় বুঝিতে পারিতেন তবে হয়ত অনেক গোলযোগ মিটিয়া যাইত। উহা লেখক মহাশয়ের সেই (১) চিহ্নিত অংশের যেটুকু আমি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলাম তাহারই উত্তর।

(১২) যোগশাস্ত্রকে "সাংখ্যদর্শনাধিষ্ঠিত আর্ট" বলা যে অসঙ্গত নহে তাহার কারণস্বরূপ রমেশ বাবুর গ্রন্থ হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার কথা কিরূপে সঙ্গত হইল বুঝিতে পারিলাম না। দর্শন হিসাবে কোন শাস্ত্রের মূল্য যদি কিছুই না থাকে এবং তাহা যদি বা আর কোন দর্শন হইতে গৃহীত হয় তথাপি উহা যে কি করিয়া দর্শন শ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইয়া আর্ট শ্রেণীভুক্ত হয় তাহা বোঝা গেল না।

* লেখক মহাশয় এ অংশটী আমার রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন; এস্থলে আর একটী শব্দ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহার সন্নিবেশ নিষ্প্রয়োজন।

এতদ্ব্যতীত কপিলের দর্শনেও সাধনোপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তিনি বলেন জ্ঞানই মুক্তি-লাভের উপায় এবং সে জ্ঞান এই এইরূপে লাভ হইতে পারে। পাতঞ্জল না হয় অপর একটী উপায় বিধান করিয়াছেন ইহার জন্য যদি যোগশাস্ত্র আর্ট পদবাচ্য হইতে পারে তবে আমার বিনীত নিবেদন সেই একই কারণে সাংখ্যদর্শনকেও আর্ট বলা অসঙ্গত হইতে পারে না।

(১৩) লেখক মহাশয় "বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের" অর্হত সম্বন্ধে আমার ভ্রান্ত ধারণা দেখিতেছেন। পাঠক দেখুন ভ্রান্ত ধারণাটী কাহার, আমার না অপর কাহারও। Dr. Rhys Davids তাঁহার Buddhism নামক গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় কি বলিতেছেন দেখা যাউক।

There remains to be copsidered one very obscure but very instructive side of Buddhist teaching, viz., the belief that it was possible by intense self absorption and mystic meditation to attain two conditions of trance in which the ordinary conditions of material existence were suspended and by which ten certain specific supernatural powers, called Iddhi were acquired. A Buddha always possessed them. Whether Arahats as such could work the particular miracles in question and whether of mendicants, only Arahats or only Asekhas could do so is at present not clear."

Hodgson বলিতেছেন বুদ্ধদের সঙ্গে অর্হতদের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই উভয়ের জ্ঞান এবং ক্ষমতা একবিধ। আবার ১৭৬ পৃষ্ঠায় যে স্থান হইতে লেখক মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্মানু-মোদিত চতুঃপ্রকার ধ্যানের বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অব্যবহিত পরেই Dr. Rhys Davids কি বলিতেছেন দেখুন:—

"In the first Jhana * the mendicant holy pure and alone applies his mind to some deep subject of religious thought reasoning upon it investigating it. Gradually his mind becomes clear, reasoning vanishes, intuition has been reached—this is the second jhana. Then the consciousness of the subject thought of vanishes and a state of trance, but conscious trance is reached, wherein the whole body is lifted up with ecstasy. This is the third Jhana. This felt ecstasy, however soon passes away and there is only left a kind of dream a memory, without ecstasy or joy or sorrow. So at best I understand this difficult and very ancient passage, which seems to me to be describing a state which has actually been reached not a mere imaginary thing but a matter of fact a condition possible then and possible now a kind of self in-duced mesmeric trance."

বোধ করি, ইহাতেই যথেষ্ট হইবে। থিয়সফিষ্টেরা যদি এই কথা বলিতেন তবে অবশ্য তাহা কুসংস্কার হইত কিন্তু লেখক মহাশয়ের আপন authorityই যখন এমন কথা বলিতেছেন তখন কি দাঁড়াইবে বলিতে পারি না।

(১৪) লেখক মহাশয়ের রসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইহাতে পাওয়া গিয়াছে। তবে ভরসা করি এস্থলে লেখক মহাশয় আইন ব্যবসায়ীদিগের পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই।

* সংস্কৃত ধ্যান শব্দ পালী ভাষায় ঝান হইয়া গিয়াছে।

এটর্ণীরা নাকি কৌন্সিলীকে instructions দেন there is no case, abuse the other side.

(১৫) লেখক মহাশয় বলিতেছেন Absolute truth কিছুই নাই। এ কথা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে। কারণ অনেকে পরমেশ্বর এবং ধর্ম্মনীতি (morality) ইত্যাদি বিষয়কে অনাপেক্ষিক সত্য আখ্যা প্রদান করেন। আর যাঁহারা একথা মানেন না তাঁহারাও সত্যকে কাল সম্বন্ধে আপেক্ষিকরূপে দেখেন না আত্ম সম্বন্ধেই অর্থাৎ মানব জ্ঞান সম্বন্ধে আপেক্ষিক বলিয়া থাকেন। আজ যাহা সত্য ছিল কাল যদি তাহা সত্য না থাকে তবে মানব জ্ঞানের ধারাবাহিকতা একেবারেই লোপ পাইয়া যায়, বিজ্ঞান, ন্যায় শাস্ত্র প্রভৃতি পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। সোডা এবং অ্যাসিড একত্রে জলে মিশ্রিত করিলে যদি আজ ফোঁস ফোঁস করিয়া উঠিয়াছে বলিয়া গত বা আগামী কল্য সত্য ছিল বা থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস না করা যায় তবে প্রকৃতিকে খামখেয়ালী বলিয়া মানিতে হয় এবং বিজ্ঞানও ন্যায় শাস্ত্রাদির ভিত্তি Uniformity of Nature অপহৃত হইয়া যায়। তখন ঐ সকল শাস্ত্রাদি দাঁড়ায় কোথায়?

প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান আনুমানিক সত্য শিক্ষা দেয় এবং তাহাকে hypotheses অপেক্ষা অধিকতর সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে না। ঈথর অথবা রসায়ন শাস্ত্রের পরমাণু প্রভৃতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষা দেয় না উহারা convenient hypothesis মাত্র। আমরা যদি উহাদের প্রকৃত সত্য বলিয়া তাহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করি তবে সে আপন ইচ্ছায়, বিজ্ঞান তাহা আমাদের করিতে অনুরোধ করে না এবং সে জন্য সে দায়ীও নহে।

এস্থলে এইটুকু বলা আবশ্যক যে আমাদের বলিবার অভিপ্রায় এইমাত্র ছিল যে শাস্ত্রবচন ও কিম্বদন্তী অর্থাৎ Scriptures ও tradition ব্যতীত মানবাত্মা ও ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে আর অপর কোন তাদৃশ বলবৎ যুক্তি প্রমাণ পাওয়া দুর্লভ।

(১৬) আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সিনেটের Esoteric Buddhism গৌতম বুদ্ধের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা নহে কিন্তু লেখক মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিয়া আমাদের অনুগৃহীত করেন নাই। উহা বুদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ মহাত্মাগণোপদিষ্ট ধর্ম্ম অর্থাৎ Religion of the Buddhas (the wise) or Wisdom Religion.—অতএব আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিতে পারি যে উহা (অর্থাৎ সিনেটের Esoteric Buddhism) আগাগোড়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা যে Exoteric Buddhism এর অন্তরালে একটী Esoteric Buddhism নিহিত রহিয়াছে।" এবং এই কারণেই সিনেট সাহেবের প্রমাণ করিবার কোনই আবশ্যক হয় নাই সে গ্রন্থের মাল মশলা সংগ্রহ করিতে মৌলিক অথবা Later বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইয়াছেন। কর্ণেল অলকট সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত এবং তাঁহার রচিত বৌদ্ধধর্ম্মের Catechism বৌদ্ধধর্ম্মের যথার্থ মতামত

প্রকাশ করিতেছে বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত। অতএব কি করিয়া আমরা লেখক মহাশয়ের কথায় আস্থা প্রদান করিতে পারি যে যোগধর্ম্মের জটিলতা, অন্ধকার গাঢ় রহস্ততার সংমিশ্রণ বশতই থিয়সফিষ্টেরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।"

(১৭) লেখক মহাশয় আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতে কিয়ৎ অংশ উদ্ধৃত করিয়া সাধারণ্যে আমার দাম্ভিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার পূর্ব্বগত বাক্যটিও যদি উদ্ধৃত করিয়া দিতেন তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার পক্ষে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। সেটী এইঃ—দ্বিতীয় প্রবন্ধের শেষাংশে লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের যে অবনতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ মালতীমাধবে পাওয়া যায় তাহারি কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাঁহার মনে যাহা উদয় হইয়াছে তাহাই বলিয়াছিলেন।" এই পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশটুকুর সমাবেশে কি দাম্ভিকতার কিছু মাত্র ইতর বিশেষ হয় না? তাহা যদি না হয় তাহা হইলে অবশ্য আত্মদোষ স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

লেখক মহাশয় বলিতেছেন হেমন্তবাবু ভবভূতির প্রতি যে হীন উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস করিলে ভবভূতির প্রতি কবিসাধারণের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করা হয়।"

মানুষ কবিই হন বা নাই হন তিনি মানুষ তো বটে, কাজেই মানব প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতার অধীন অতএব তিনি যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রকৃত ঘটনাকে আপন সংস্কারানুসারে কথঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া ফেলিবেন তাহাতে আর এত বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আর একটী কথা, জ্ঞাতসারে যিনি একার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে "নীচ" বিশেষণটী সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য বটে কিন্তু অপরের পক্ষে নহে। অতএব ভবভূতির প্রতি আমি যে হীন উদ্দেশ্য আরোপ করিলাম কি করিয়া তাহা ঠিক বুঝিলাম না। এতদ্ব্যতীত আমার জিজ্ঞাস্য আছে যে কবিসাধারণ কি কখনও জ্ঞাতসারে এই হীন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন নাই। এ সম্বন্ধে বোধ করি তালিকা দিবার প্রয়োজন করে না। কৈলাশ বাবুর বাক্যটী যে আমার বিরুদ্ধ এবং লেখক মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিতেছে তাহা আমার ঠিক বোধগম্য হইল না। যদি সে কালের পুরাতত্ত্বালোচনায় পদে পদে হিন্দু চরিত্রের নীচাশয়তার পরিচয় পাওয়া যায়—তবে সে কথা অধিক মাত্রায় যদি বা না হয় তবে সম মাত্রায় আমারও পক্ষ সমর্থন করিতেছে বলা যাইতে পারে।

মালতীমাধবে কবির কি উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইতেছে তৎ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিবার জন্য আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। খুব সম্ভবতঃ আমার মত ঐ সম্বন্ধে নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কিন্তু বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর মুখে জীব হিংসা অসত্যাচরণ কিরূপে শোভন তাহা ঠিক বোঝা গেল না।

লেখক মহাশয় অনুযোগ করিয়াছেন যে আমি অকারণে তাঁহার প্রতি শোণিতের উত্তাপাধিক্য আরোপ করিয়াছি। আমাদের এরূপ অনুমানের নিম্ন লিখিত কারণ ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহার নিম্নোদ্ধৃতরূপ ভাষা ব্যবহার—(১) তাহাতে "সাধারণ পাঠকের অর্থ গ্রহ-

ণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটিয়াছে বোধ হয় না। (২) মালতীমাধবের বর্ণনায় দার্শনিক তর্ক ফাঁদা আমার অভিপ্রায় নহে।" সহজাবস্থায় কেহ এরূপ ভাব। ব্যবহার করেন তাহা আমার মনে হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার উত্তর রচনার ধরণ। তবে তিনি বলিতেছেন, "যতদূর স্মরণ হইতেছে আমরা অতিশয় ঠাণ্ডা মেজাজেই তাঁহার প্রতিবাদের উত্তর লিখিতে বসিয়াছিলাম।" এ কথা বলার পর এ বিষয়ে তিন প্রকার মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর। প্রথম, আমারই সর্ব্বতোভাবে ভ্রম ঘটা; দ্বিতীয়, লেখক মহাশয়ের বিস্মৃতি ঘটা; এবং তৃতীয়, অস্বাভাবিকরূপ উত্তাপাধিক্যই তাঁহার শোণিতের প্রাকৃতিক অবস্থা হওয়া। আমরা অবশ্য প্রথম অনুমানটাই গ্রহণ করিতেছি।

লেখক মহাশয় আমাদের উপর রুচিগত চার্জ্জ আনিয়াছেন। কিন্তু কথা হইতেছে, রুচি বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রূপই হইয়া থাকে। তবে আমি ন্যায্য সমালোচনার সীমানা অতিক্রম করিয়া গিয়াছি কি না তাহা ভারতীর পাঠকবর্গ ও বঙ্গবাসাসাধারণের বিচারের বিষয়।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে লেখক মহাশয় আমায় সুবুদ্ধির হাসিয়া উড়ান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—সহস্র উপদেশ বাক্যাপেক্ষা একটী দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ—বিজ্ঞ জনের এই কথা অনুসরণ করিয়া তাহা কার্য্যত যেরূপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বলা বাহুল্য লেখক মহাশয়ের উপদেশটী আমাদের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। *

শ্রীহেমন্তকুমার রায়।

ক্ষ্যাপার প্রতি।

(বাউলের সুর)। †

ক্ষ্যাপা তুই
আছিস্ আপন খেয়াল ধরে'!
যে আসে তোমার পাশে
সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে
দিবানিশি

* হেমন্ত বাবুর অনুরোধে আমরা তাঁহার এই প্রবন্ধ এইবারেই প্রকাশিত করিলাম। নিতান্ত স্থানাভাববশতঃ মালতীমাধব লেখকের শেষ বক্তব্য এই সঙ্গে প্রকাশিত হইতে পারিল না। ভাং সং।

† আগামী বারে ইহার স্বরলিপি প্রকাশিত হইবে।

তারা পায় না বুঝে তুই কি খুঁজে
ক্ষেপে বেড়াস জনম ভোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে!

তোর নাই অবসর নাইকো দোসর
ভবের মাঝে
তোরে চিন্‌তে যে চাই সময় না পাই
নানান্ কাজে!
ওরে তুই, কি শুনাতে এত প্রাতে
মরিস্ ডেকে!
এ যে বিষম জ্বালা, ঝালাপালা
দিবি সবায় পাগল ক'রে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে!

ওরে তুই কি এনেছিস্, কি টেনেছিস্
ভাবের জালে!
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে
কোন কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে
ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া,
রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে!

এ জগৎ আপন মতে আপন পথে
চলে যাবে
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে
নিজের ভাবে।
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন
হবে কবে!
মিছে তুই আছিস্ জাগি তারি লাগি
না জানি কোন্ আশার জোরে!
ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধ'রে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রহের নামকরণ।

প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুজাতি নবগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছে; হিন্দু জ্যোতিষ মতে ইহাদের নাম যথাক্রমে—চন্দ্র, বুধ, শুক্র, রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, রাহু, এবং কেতু। কথিত জ্যোতিষ ছাড়িয়া গণিত জ্যোতিষমতে গ্রহবিচার করিলে দেখা যায় যে, রাহু ও কেতুর কোন ভৌতিক অস্তিত্ব নাই; রাহু ছায়ারূপে এবং কেতু কেবলমাত্র একটী গণিতাশ্রিত বিন্দুরূপে গগণে বিরাজ করিতেছে। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানমতে চন্দ্র এবং রবিও গ্রহ নামে বাচ্য হইতে পারে না; চন্দ্রকে উপগ্রহ বলা যায় এবং রবি নক্ষত্র জাতীয় বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে! রবি যে স্থলে গ্রহস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল এক্ষণে ঐ স্থলে পৃথিবী গ্রহশ্রেণীভুক্ত হইয়া রবির স্থানাধিকার করিয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুগণ গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন; একশ্রেণী সদা গতিশীল, অর্থাৎ পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্ত্তনবশতঃ সমস্ত গগনমার্গের যে আবর্ত্তন লক্ষিত হয় তদ্ভিন্ন গগনমার্গে ইহাদের প্রত্যেকের একটী স্বকীয় গতি আছে; অপরশ্রেণী গগনমার্গে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে গ্রহ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে নক্ষত্র বলা যায়। প্রত্যেক গ্রহ স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্টকালে একবার করিয়া কক্ষাবর্ত্তন করিয়া পরিভ্রমণ করে। রাহু এবং কেতু যদিও জ্যোতিষ্ক নহে কিন্তু গণিতবলে তাহাদের কার্য্যদৃষ্টে অস্তিত্ব সপ্রমাণ হওয়াতে এবং ঐ অস্তিত্বের স্থিতি নির্দ্দেশানন্তর তাহাদের উপরোক্তরূপ কক্ষাবর্ত্তন লক্ষিত হওয়াতে, প্রাচীন জ্যোতিষীবর্গ কোন দেবাশ্রিত আধিভৌতিক জীব মনে করিয়া ইহাদিগকে গ্রহশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি যে রবির চারিদিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছে; এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত আছি বলিয়া আমাদের নিকট তাহার গতি অনুভূত হয় না। প্রাচীন জ্যোতিষীগণ এই ভ্রম বশতঃই পৃথিবীকে রবির গ্রহ মনে না করিয়া রবিকে পৃথিবীর গ্রহ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন; এবং পৃথিবীকে নিশ্চল ভাবাতে অপর গ্রহদিগকেও পৃথিবীরই গ্রহরূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন। চন্দ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে বলিয়া তাহাও গ্রহশ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে নবগ্রহ গণনা পূর্ব্বক প্রাচীন হিন্দুগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ঐ নবগ্রহের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানমতে প্রাচীন নবগ্রহের মধ্যে কেবল পাঁচটীমাত্র গ্রহ-নামে বাচ্য হইতে পারে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত গ্রহ সংখ্যা আমাদের জ্ঞানগোচর হইয়াছে তাহাতে আমরা জ্ঞাত আছি যে বর্ত্তমান সময়ে প্রধান গ্রহ সংখ্যা আটটী; ইহাদের মধ্যে উপরোক্ত পাঁচটী ভিন্ন অপর তিনটী গ্রহের মধ্যে পৃথিবী একটী,

অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী গ্রহ বিদ্যমান যাহাদের নাম আমরা হিন্দু জ্যোতিষে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন, অপর যে দুইটী গ্রহ অবশিষ্ট থাকে তাহারা গত এক শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক কাল মধ্যে ইউরোপে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এই গ্রহদ্বয়ের নাম হিন্দু জ্যোতিষে নাই কারণ প্রাচীন হিন্দুগণ ইহাদের অস্তিত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, এই অনভিজ্ঞতা দ্বারা হিন্দু জ্যোতিষের গৌরবের খর্ব্বতা প্রতিপন্ন হইতেছে; উক্ত গ্রহদ্বয় দূরবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে নেত্রগোচর হয় না; এবং হিন্দুগণ কোন কালে জ্যোতিষের আলোচনার্থে দূরবীক্ষণ ব্যবহার করেন নাই, এই কারণেই উপরোক্ত অনভিজ্ঞতা। হিন্দু জ্যোতিষের এই অভাব বিদূরণ এবং হিন্দুমতে গ্রহদ্বয়ের নামকরণ প্রস্তাব করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

উপরে যে দুইটী গ্রহের কথা বলা হইল তাহাদের একের নাম ইউরেণস্ (Uranus) এবং অপরের নাম নেপ্‌চ্যুন্ (Neptune)। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ সার উইলিয়ম্ হার্শেল প্রথম ইউরেণস্ গ্রহ আবিষ্কার করেন; এই আবিষ্ক্রিয়ার পর গ্রহের নামকরণ নিয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। ইয়ুরোপের কোন কোন জাতি ইহাকে নেপ্‌চ্যুন্ নাম প্রদানের প্রস্তাব করে; কিন্তু হর্শেল স্বয়ং তাহাকে স্বীয় প্রতিষ্ঠাতা এবং পরমহিতৈষী রাজা জর্জ্জের নামে "জর্জ্জীয়গ্রহ" (Georgian Planet) বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন এবং আপন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কখনও ঐ গ্রহকে অন্য কোন নামে ব্যক্ত করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে যে সকল গ্রহ মনুষ্যজ্ঞানগোচর ছিল তাহারা কাহার দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল জগতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অতএব এই গ্রহই প্রথম মনুষ্যাবিষ্কৃত বিবেচনা করিয়া জনসাধারণ তাহাকে তদীয় আবিষ্কর্ত্তার নামে নামাঙ্কিত করিতে সঙ্কল্প করে; এই হেতু উক্ত গ্রহ সাধারণের নিকট কখন কখন "হর্শেল" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্যোতির্বীমণ্ডলীর নিকট উপরোক্ত নামদ্বয়ের কোনটাই আদরণীয় হইল না: গগণবিহারী জ্যোতিষ্ককে কোন মনুষ্য নামে নামাঙ্কিত করিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহারা উহাকে দেবনাম প্রদানে সচেষ্ট হইলেন।

ইহাদের মধ্যে একদল মনে করিলেন যে গ্রীকদেবদেবীদিগের মধ্যে অনেকেই গ্রহদিগকে স্বীয় নামে নামাঙ্কিত করিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, কেবল জলাধিপ নেপ্‌চ্যুন্ ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন; অতএব তাঁহারা উক্ত গ্রহকে নেপ্‌চ্যুন্ নাম দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু অপর একদল মনে করিলেন যে জগতে "সাত" এই সংখ্যাটী দেবাশ্রিত সংখ্যা, অতএব যখন সাতটীগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তখন আর কোন গ্রহ বিদ্যমান নাই। এই কারণে তাঁহারা ইহাকে সৌরমণ্ডলের শেষ সীমায় অবস্থিত মনে করিয়া "সৌরমণ্ডলাধিপতি" বা "স্বর্গাধিপতি" নাম প্রদানে সঙ্কল্প করিলেন, বিচারে শেষোক্ত দলেরই জয় হইল; লাটিনে (Urania) অর্থ "স্বর্গ" এবং Uranus অর্থ "স্বর্গপতি" অতএব গ্রহের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে "Uranus" রাখা হইল। কিন্তু

জ্যোতিষীবর্গের এত বাদানুবাদ ব্যর্থ হইল, "সাতের" উপর হইতে দেবাশ্রয় খণ্ডিত হইল, গ্রহ সংখ্যা "সাত" অতিক্রম করিয়া চলিল, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৩ সেপ্টেম্বর ইউরেণসের কক্ষ-বহির্ভাগে অপর একটী গ্রহ ধরা পড়িল। এই গ্রহাবিষ্কারের পাঁচ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বহুলোক ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান্ হন, এবং সন্দিগ্ধচিত্তে দুই বৎসর অবস্থানের পর দুইটীমাত্র লোক ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া তাহার আকার প্রকার এবং স্থিতিগতি নির্ণয়ার্থে গণনা আরম্ভ করিয়া তিন বৎসরে ঐ গণনা শেষ করেন। পরিশেষে দূরবীক্ষণের সাহায্যে উপরোক্ত জ্যোতিষীদ্বয়ের গণিত-স্থানে ঐ গ্রহ ধরা পড়ে। * জ্যোতিষীবর্গ একবার গ্রহনামকরণ বিষয়ে স্বীয় বাক্‌বিতণ্ডা দ্বারা জয়লাভ করিলেও প্রকৃতির নিয়তি দ্বারা পরাভূত হওয়াতে এক্ষণে আর নামকরণার্থ বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতি ক্রমে ঐ গ্রহের নাম নেপ্‌চ্যুন্ রাখিলেন।

এক্ষণে দেখা যাউক হিন্দু জ্যোতিষে উক্ত গ্রহদ্বয়ের নামকরণ কি প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে। লাটিনে স্বর্গাধিপতিকে Uranus, এবং গ্রীকে জলাধিপতিকে Neptune বলা হয়; আবার এ দিকে হিন্দু দেবদেবীদিগের মধ্যে "ইন্দ্র" স্বর্গাধিপতি এবং "বরুণ" জলাধিপতি। অতএব আমরা নামকরণ বিষয়ে অধিক আড়ম্বর না করিয়া উক্ত গ্রহদ্বয়কে অনায়াসে "ইন্দ্র" ও 'বরুণ' নাম প্রদান করিতে পারি। ইহাতে এক ফল এই হইবে ঐ দেবতাদ্বয় একান্তই যবনিকার অন্তরালে না থাকিয়া এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিস্তৃতিহেতু কালবশে কালগ্রাসে পতিত না হইয়া গগণে চিরস্থায়ীরূপে (অন্ততঃ সৌরমণ্ডল যতদিন অবস্থিতি করে) বিরাজ করিবেন; এবং ইয়ুরোপীয় নাম সমূহকে ভারতীয় ভাষা সমূহে ভাষান্তরিত করাতে তাহাদের উচ্চারণের যে অনর্থ সংঘটন হয় তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে। এই কথাটী আমাকে এই জন্য বলিতে হইল যে পাছে কেহ বা মনে করেন যে আমরা গ্রহদ্বয়ের ইউরোপীয় নামই ত ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতে পারি তজ্জন্য স্বতন্ত্র নাম করণের প্রয়োজন কি? যাঁহারা ইংরাজি নাম ভাষান্তরিত করিয়া কোন ইংরাজিভাষানভিজ্ঞ ভারতবাসী দ্বারা তাহা উচ্চারণ করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহারা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন আমার এই নামকরণ প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত কি না! যদি এই নামকরণে কাহারও আপত্তি না থাকে তবে ভবিষ্যতে যখন গ্রহদ্বয়ের নামোল্লেখ প্রয়োজন হইবে তখন আমি Uranus কে "ইন্দ্র" এবং Neptune কে "বরুণ" নামে আখ্যাত করিব।

দেরাদুন।　　শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

---

* গ্রহাবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ সময়ান্তরে লিখিবার বাসনা রহিল।

রুসিয়ার কারাগার।

কবি সুইনবর্ণ্ একটি কবিতায় লিখিয়াছেন—রুসিয়ার নরককুণ্ড হইতে একটী ধ্বনি উত্থিত হইতেছে—সেই ধ্বনি অদৃষ্টের মত মহা অন্ধকার, অগ্নির ন্যায় ভয়ঙ্কর, সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বিষময়! ঘোরপাপীগণ মৃত্যুর পর ভয়ঙ্কর নরকে যে যন্ত্রণা ভোগ করে রুসিয়ার নরকে নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ তাহাপেক্ষা শত গুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। কর্ণ কখন সেরূপ যন্ত্রণার কথা শুনে নাই, রসনা কখন সেরূপ যন্ত্রণার বর্ণনা করে নাই—তাহা কল্পনার অতীত। ডাণ্টে প্রেম ও ঘৃণার মোহন মন্ত্রবলে মহা বিভীষিকাময় নরকে প্রবেশ করিয়াছিলেন; রক্তময় সমুদ্র, অগ্নিময়বৃষ্টি ও নানাপ্রকার হৃদয় বিদীর্ণকারী যন্ত্রণাময় স্থান দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তবুও এরূপ ভয়ঙ্কর স্থান দেখেন নাই যেখানকার দানবগণকে রুসিয়দৈত্যগণের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই জীবন্ত সত্য নরকের তুলনায় তাঁহার কল্পনার অতিভয়ঙ্কর দৃশ্যও পবিত্রমনা কুমারীর নির্ম্মল শুভ্র সুখময় স্বপ্নের ন্যায়। এখানে অবিবাহিতা বালিকা ও সতীপত্নীর মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা সহিতে হয়। কারণ হায়! লজ্জার ত মৃত্যু হয় না।

রুসিয়ার নারীগণ উলঙ্গ উন্মত্ত অনাহারপীড়িত, নির্য্যাতনিত, হেয়মান, শীতার্ত্ত ও পতিত। ইহাদের দেহ এবং আত্মা উভয়ই দৈত্যগণের করাল গ্রাসে কবলিত। * * কি বার্দ্ধক্যগ্রস্থ কি যৌবনপ্রাপ্ত কি বালক কি বালিকা কাহারও এখানে নিস্তার নাই। এইরূপে হে রুসিয়া তোমার শাসন প্রচার করিতেছে। হে জার তোমার করুণাকে ধন্য!

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা কবি চার্লস সুইনবর্ণের উক্ত কবিতাটী আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে রুসিয়ার কারাগার কিরূপ। আমরা কেবল স্থানাভাবে ১০।১২ লাইনের ভাবার্থ অনুবাদ করিয়া দিলাম। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে কবির বর্ণনা অত্যুক্তিদোষরঞ্জিত। কিন্তু রুসিয়ার কারাগারের বিবরণ পাঠ করিলে আর সে কথা বোধ হয় কেহ বলিতে সাহস করিবেন না।

অল্পদিন হইল সেণ্টপিটার্সবর্গে কারাগার সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য একটী অন্তর্জাতিক কনগ্রেস হয়। ইহাতে রুসিয়ার একজন প্রধান কর্ম্মচারী রুসিয়ার কারাগার সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠ করেন তাহার একস্থানে বলেন "আমাদের কারাগার ও নির্ব্বাসন স্থান ইত্যাদির বন্দোবস্ত এখন তাহার ক্রমোন্নতির তৃতীয় সোপানে উঠিয়াছে।". রুসিয়ার অপবাদ আছে যে তাঁহারা কয়েদীগণকে দাস করেন, এবং নাসিকাকর্ত্তন; তপ্ত লৌহ ও প্লেটীর আঘাত আঘাতে তাহাদিগের শাস্তিবিধান করেন। প্লেটী চাবুকের ন্যায় দুই ফুট পরিমাণ অনেকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাকান চামড়ার রজ্জু। ইহার আগায় প্রত্যেক সূক্ষ্ম চামড়ায় একটী দস্তার গোলা দেওয়া থাকে। অনেক সময়েই ইহার দ্বারা মৃত্যু

ঘটে। ইহার আঘাত যন্ত্রণা ভয়ানক কিন্তু যাহারা একার্য্যে বিশেষ দক্ষ তাহাদের আঘাতে রক্ত পড়ে না। রক্ত পড়িলে যন্ত্রণা লাঘব হয় সুতরাং রক্ত না পড়িতে পারে, এই উদ্দেশ্যে অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া সজোরে আঘাত করিতে থাকে। কয়েদীর সমস্ত শরীরে কালশিরা দেখা যায় ও পরে প্রায়ই মৃত্যু হয়। তবে আইনে সম্প্রতি উক্ত রূপ দণ্ড ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ এ আইন কত দূর মানিয়া চলা হয়, তাহা বলা যায় না,ইহা ছাড়া এত অল্প দিন মাত্র উক্তরূপ শাস্তি ব্যবস্থা সকল রহিত হইয়াছে যে তাহা সম্পূর্ণ- রূপে আধুনিকের মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। এখনও অনেক লোক বাঁচিয়া আছেন যাঁহারা নিম্নলিখিত ঘটনাটী জানেন। চীনের কর্ম্মচারীরা চীনের সীমান্ত প্রদেশে কয়েক জন লোককে গ্রাম লুণ্ঠন অপরাধে ধৃত করে এবং ইহাদের সম্বন্ধে এই বলিয়া রিপোর্ট করে "ইহারা একরূপ অসাধারণ, বিশেষজাতীয়, নূতন প্রকারের জীব, ঈশ্বর ইহাদের নাসিকা গঠন করেন নাই।" অনুসন্ধান দ্বারা জানা গেল যে ইহারা রুসিয়ার ওকহটস্ক নগরস্থ পলাতক কয়েদী। তখন হইতে এখনকার দণ্ডনিয়মের যদিও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে তথাপি এ পরিবর্ত্তন ও যে কয়েদিদিগের বিশেষ কষ্টনাশক তাহা নহে।

রুসিয়ার আইনানুসারে কয়েদীগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। ১। যাহারা কোনরূপ দোষের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছে কিন্তু নির্দ্দোষী হইতেও পারে। ২। রাজেচ্ছায় আবদ্ধ। ইহারা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (ক) রাজনৈতিক অপরাধী, ইহারা কোনরূপ বিচারালয়ে অভিযুক্ত নহে। কিন্তু রাজা তাহাদের রাজভক্তির উপর কারণে অকারণে কোনরকমে সন্দেহযুক্ত হইবামাত্র কয়েদ করিয়াছেন।

(খ) কোন প্রজার উপর প্রজারা অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাহাকে তাহারা নির্ব্বাসিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার নামে কোন দোষের অভিযোগ নাই।

(গ) যাহারা কোনরূপ দোষ করে নাই কিন্তু তাহাদের আত্মীয়গণের আবেদনানুসারে তাহাদিগকে নির্ব্বাসনে পাঠান হইবে।

৩। কয়েদী ;—যাহারা বাস্তবিক অপরাধী ও বিচারালয়ের আজ্ঞানুসারে সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত কিম্বা অপরাধী সেনাদল মধ্যে নিযুক্ত।

৪। যে কয়েদীগণ অপরাধী ও বিচারে কারাগারে প্রেরিত।

নামে রুসিয়ায় এই চারিশ্রেণীর লোককে স্বতন্ত্র রাখিবার কথা এবং ব্যক্তিবিশেষের দোষানুসারে তাহাকে দণ্ড দিবার নিয়ম কিন্তু কাজে যে যত ঘোর অপরাধী ও অপরাধ দ্বারা কঠোরপ্রকৃতি লাভ করিয়াছে কারারক্ষক তাহাদের তত ভয় করে ও স্বাধীনতা দেয় এবং তাহাদের তত দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুবিধা বেশী। প্রত্যেক কারাগার এইরূপ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর, তাহার মধ্যে প্রত্যেক শ্রেণী আবার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের

জন্য দুই স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত থাকিবার কথা, কিন্তু কারাগারগুলি এত ছোট যে তাহাতে কোন ভাগ করা অসম্ভব। ভাগ করিতে গেলে এক এক কুঠরীতে একজন দুইজন লোক ধরিতে পারে কিন্তু ইহার এক একটীতে এত লোক থাকে যে ভাগ না করিয়াই অত্যন্ত ঠাসাঠাসি হয়। মফঃস্বল সহরে এক একটী ক্ষুদ্র কারাগার। বিচারের জন্য যাহারা অপেক্ষা করিতেছে তাহারা এখানে আবদ্ধ থাকে এবং এক কারাগার হইতে অন্য কারাগারে কি অন্য স্থানে যাহারা যাইতেছে তাহারাও পথে এইখানে বিশ্রাম করে। এই জন্য স্থানের অত্যন্ত অভাব হয়। এই সকল কারাগারের অর্থবলও অত্যন্ত কম। কত কয়েদী যে এইরূপে যাতায়াত করে তাহা একটী বৎসরের রিপোর্ট দেখিলেই বুঝা যায়। গত বৎসরের ৯৪৪৮৮ জন কয়েদী ভিন্ন ৭২৭৫০৬ জন কয়েদী এই বৎসর নূতন আসে। ইহার মধ্যে কতক সাইবিরিয়া হইতে এদিকে আসে, কতক এদিক হইতে সাইবিরিয়ায় যায়। এইরূপে প্রতি বৎসর ৫০৬৩৪০ জন কয়েদী মফঃস্বলের কারাগারগুলিতে বিশ্রাম করিতে করিতে যায়। রুসিয়ায় এমন কোন কারাগার নাই যেখানে যত কয়েদী থাকা উচিত তাহার চতুর্গুণ কয়েদী না থাকে। ইহারা যে সকলেই অপরাধী তাহা নহে, সামান্য অপরাধী হইতে ঘোর অপরাধী ও সুবিদিত নির্দ্দোষী স্ত্রীপুরুষও একত্রে এই খানে থাকে। ইহার ফলে যে কিরূপ অমঙ্গল হইবার সম্ভব তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

কর্ম্মচারীরা নামে কারাগারের শাসনকর্ত্তা কিন্তু কয়েদীদের মধ্যে যাহারা বদমাইস ও গোঁয়ার তাহারাই আসল কর্ত্তা। ইহারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লয়। ইহারা জানালা ও মেজের কাঠ উঠাইয়া তাহার মধ্যে তামাক, মদ, তাস ইত্যাদি রাখে। নানা প্রকার ষড়যন্ত্র দ্বারা এই সকল জিনিস আনয়ন করে। এই সকল বিষয়ে তাহারা এরূপ কুশল যে, তাহার বর্ণনায় একখানি পুস্তক পূর্ণ হইতে পারে, সেই জন্য আমরা তাহার উল্লেখে ক্ষান্ত হইলাম। সমুদয় কয়েদীদের নিকট ইহারা চাঁদা আদায় করে ও নিরীহ লোকদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে। মিষ্ট কথায় কিম্বা তাহাতে না হইলে বলে রমণীমাত্রেরই ধর্ম্ম হরণ করে। যে স্ত্রীলোক একবার এ পিশাচালয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহার আর সতীত্ব লইয়া ফিরিবার উপায় নাই। এই দুর্দ্ধর্ষ পিশাচগণ একরূপ গুপ্তসভা স্থাপন করিয়াছে; ইউরোপে মধ্যযুগে যে সকল গুপ্তসভার বর্ণনা দেখা যায় ইহাদের সভাও অনেকটা সেই রূপ। প্রত্যেক কয়েদীর জীবন ইহাদের হস্তে। কেহ ইহাদের নামে কর্ম্মচারীগণের নিকট নালিশ করিতে সাহস করে না। একবার একটী যুবক নালিশ করে। তাহার পরদিন তাহার মৃত্যু হইল, কারণ তদন্তে অবশ্য কিছুই প্রকাশিত হইল না। এক কথায় এই প্রেতগণ কয়েদী ও কর্ম্মচারী উভয়কেই হস্তগত করিয়াছে এবং সংসারে যত পাপ যত নিষ্ঠুরতা আছে সবই তাহারা অকাতরে প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিতেছে!

আহারের বিষয়েও হতভাগ্যগণের এইরূপ যন্ত্রণা। দালালেরা গবর্ণমেণ্টের কাছে কয়েদীদের আহার যোগাইবার ভার নেয়। তাহারা আবার নিম্নতর দালালকে ভার

দেয়। এইরূপে ক্রমেই অধিকতর কম টাকায় খাবার যোগাইবার বন্দোবস্ত হওয়ায় কয়েদীরা যে খাদ্য পায় তাহাতে কোনরূপে তাহাদের শরীর রক্ষা হয় মাত্র, ক্ষুধা যায় না। হতভাগ্যগণের এই আহার হইতে আবার নেতা কয়েদীগণকে ভাগ দিতে হয়। তাহারা আহার করিয়া সন্তুষ্ট হইবার পর যাহা থাকে তাহাই খাইয়া অন্য কয়েদীরা প্রাণধারণ করে। যখন কয়েদীগণ একস্থান হইতে অন্যত্র যায় তখন গবর্ণমেণ্ট তাহাদের কোনরূপ খাদ্য দেন না। প্রত্যেক গ্রামে প্রজারা তাহাদের খাবার যোগাইতে বাধ্য। প্রজাদের অবস্থা যে কিরূপ তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহারা নিজে আহার পায় না অন্যকে আহার দিবে কিরূপে। দয়া ও আতিথেয়তা তাহাদের প্রধান গুণ। আহার্য্য থাকিলে তাহারা খুব আনন্দে চিত্তে দিত কিন্তু না থাকিলে কি করিবে? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন না, প্রত্যেক প্রজার একজন কয়েদী নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয় ও যাহা আছে তাহাই তাহাকে দিতে হয়। প্রজারা, না কয়েদীগণ কে যে অধিক মমতার পাত্র বলা কঠিন। গবর্ণমেণ্টের কাছে কর্ম্মচারীরা কয়েদীদের কাপড়ের জন্য যে টাকা লয়, তাহা কর্ম্মচারীরা আত্মসাৎ করে। কয়েদীদের নিজের কাপড় অনেক কয়েদী দুচারি পয়সায় ক্ষুধার জ্বালায় অন্য কয়েদীর নিকট বিক্রয় করে। রুসিয়ার প্রচণ্ড শীতে এবং অনাহারে ও বিবসনে ইহারা কি কষ্ট পায়! অনেকেই মৃত্যুকোলে শান্তিলাভ করে। এই বসনহীন কয়েদীগণ প্রজাগণের একটী যন্ত্রণার কারণ। যে প্রজার উপর এইরূপ কয়েদীর ভার পড়ে সে অন্য গ্রামে পৌঁছান অবধি ঐ প্রজা সেই কয়েদীর জীবনের জন্য দায়ী থাকে। মৃতবৎ ব্যক্তি কখন মরিয়া যাইবে এই ভয়ে কৃষক তাহাকে খাওয়াইয়া ও খড়ে আচ্ছাদন করিয়া কাহারও গাড়ী চাহিয়া পাইলে গাড়ীতে নহিলে বন্ধুর সাহায্যে স্কন্ধে করিয়া অন্য গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। সেখানে পৌঁছিয়া সে আপনার খড়গুলি ফিরাইয়া লয়। অন্য গ্রামে আবার অন্য কৃষক তাহার জন্য দায়ী হইবে। প্রথম কৃষক কয়েদীকে অন্য গ্রামে পৌঁছাইয়া খড় লইয়া চলিয়া গেলে আবার অন্য গ্রামে কয়েদী-গণকে প্রত্যেক কৃষকের মধ্যে ভাগ করিয়া বিলি করিতে কিছু দেরী হয়। ইতি-মধ্যে বস্ত্র ও খড় কিছুই না থাকায় হিমে পড়িয়া বন্দী যদি মরিয়া যায় তবে তাহার জন্য কেহ দায়ী নহে। যদি কৃষকের হাতে ভার ন্যস্ত হইবার পরে মরে তাহা হইলেই কৃষক বেচারীর জবাবদিহি করিতে প্রাণ অস্থির। যে সকল কয়েদীগণের আত্মীয়গণ সঙ্গতিপন্ন তাহারা কারাগারে রাজসুখে থাকে। মদ ইত্যাদি দ্বারা কর্ম্মচারী ও নেতাকয়েদী উভয়কে সে বশ করে ও ইচ্ছামত কার্য্য করে। কিন্তু এই সকল বিষয় যতই ভয়ানক হউক একটী প্রথার নিকট ইহা কিছুই নহে,—তাহা নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে এই জঘন্য দুরাচারদের সঙ্গে একত্রে রাখা এবং তাহার আত্মা ও দেহ বিনাশ করা। এখানে দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। একটী বালিকা ডাক্তারী পড়িতে ইচ্ছা করে। পিতা মাতার মত না হওয়ায় লুকাইয়া ডাক্তারী পড়িতে চলিয়া যায়।

পিতা পুলিশকে তাঁহার কন্যার সন্ধান করিতে বলেন। কন্যাকে ধরিয়া পুলিশ এই কয়েদীগণের সঙ্গে পিতার কাছে চালান দিল। বাড়ী হইতে যে সুন্দর শুভ্র নির্ম্মল ফুলটী গিয়াছিল তাহার বদলে প্রপীড়িত পতিত মলিন শ্রীহীন কন্যা পিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একজন সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে তথায় পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রী স্বামীর নিকট পৌঁছিয়া সেই দিনই আত্মহত্যা করিলেন। স্বামীর নিকট সে কলঙ্কিত লজ্জার কথা বলা কি বাঁচিয়া থাকা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। অনেক স্ত্রী পথেই সুবিধা পাইলে আত্মহত্যা করেন।

তিনজন নির্দ্দোষী ব্যক্তিকে পাসর্পোট নাই বলিয়া পুলিস চালান দিলেন। ইহারা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু কর্ম্মচারীগণেরই শৈথিল্য বশতঃ সময় মত পান নাই। বৃদ্ধ পিতা, যুবক পুত্র, বালক পৌত্র। নয়মাস এই জঘন্য দলে থাকিয়া তাঁহারা খালাস পাইলেন। বৃদ্ধের শীঘ্রই মৃত্যু হইল। যুবকের কত ক্ষতি কত কষ্ট আর বালকের প্রতি কত অকথ্য পাপময় অত্যাচার। পরে মুক্তি পাইয়া ইহারা অভিযোগ করেন। অবশ্য গবর্ণর সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বালকের প্রতি অত্যাচারক একজন ধনী কয়েদী। গবর্ণর তাহার সুরাপান ও অর্থে বশীভূত। আর এ সকল কথা বর্ণনা করিবার আবশ্যক নাই। যাহা বলিয়াছি তাহাতে বুঝা যাইবে যে রুসিয়ার কারাগারে কি ঘোর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার। পূর্ব্বে সকল দেশেই কারাগারে নিষ্ঠুরতা হইত কিন্তু রুসিয়ার যে এখনও এইরূপ অবস্থা তাহাই আশ্চর্য্য! অন্য কোন দেশে কয়েদীগণের উপর অত্যাচার হইলেও নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণকে এরূপে একেবারে পাপসাগরে মগ্ন করা হয় না। রুসিয়ার রাজা যথেচ্ছাচারী, নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন, সুতরাং এই অধর্ম্মের জন্য তিনি দায়ী।

ইংলণ্ডে এক সময়ে কয়েদীদের খুব দুর্দ্দশা ছিল, মহাত্মা হাওয়ার্ড তাহাদের উদ্ধার করেন। রুসিয়-হাওয়ার্ডের এখনও জন্মগ্রহণ করিবার সময় হয় নাই। যথেচ্ছাচারের রাজ্যে হাওয়ার্ড কি করিবেন? হাওয়ার্ডের পূর্ব্বে ক্রমওয়েল আবশ্যক। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ন্যায় রুসিয়াতেও এক দিন বিপ্লব বাধিবে। এ অধর্ম্মের জন্য জারের দণ্ড পাইতে হইবে। রাজরক্তে যদি রুসিয়া প্লাবিত হয় কে বলিতে সাহস করিবে যে ইহা ঈশ্বরের তরবারি প্রসূত নহে? রুসিয়ায় যদি প্রজাবিপ্লব একদিন না হয় তবে ইতিহাস মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা।

কেন ডাকি ?

১

ওকে সখা হেথা কেন ডাকি ?
ওই কথা বার বার
কত শুধাইবে আর !
ওকে কেন এ আবাসে রাখি ?
হেথায় সুখের মেলা
হেথায় প্রেমের খেলা
হেথা ওই বাজিতেছে বাঁশি,
নূপুর রুণুঝু তানে
স্বপন জাগায় প্রাণে
উথলিছে সোহাগের হাসি।
দীন হীন ম্লান বেশে,
ও হেথা দাঁড়ালে এসে,
উৎসবেতে পড়িবে যে ছায়া !
যেথা ছিল থাক পড়ে
কেন গো উহার তরে,
ম্লান হবে উৎসবেব কায়া !

২

ওকে সখা কেন হেথা ডাকি ?
ফেলে ছিল দীন হীন
আমা তরে এক দিন
সকরুণ ধারা ওই আঁখি !
অমনি মলিন সাজে
পড়েছিনু পথমাঝে
অবসন্ন ব্যথা ভরা প্রাণে !
তখন ত আর কেহ
করে নাই মোরে স্নেহ,
মুখ তুলে চাহেনি এ পানে !

৩

মধ্যাহ্ন তপন তলে,
সারাদিন জ্বলে জ্বলে,
কুসুমটী ঝলসিয়া যায় !
সন্ধ্যা আসি ধীরে ধীরে
ফেলিয়া শিশির নীরে,
জিয়ায় সে মুমূর্ষু কায়ায়।
আঁধার যামিনী তলে,
আরবার পলে পলে,
লাভ করে নবীন জীবন।
প্রভাত তপন আসি,
হেরি তার রূপরাশি,
কর ধারা করে বরিষণ !
ছুটে আসে কত পাখী,
গায় গান কাছে থাকি,
অলি করে মৃদু গুঞ্জরণ !
খেলা করে পাতাগুলি,
মর মর রব তুলি,
আশে পাশে নাচে সমীরণ !
আজিকে আমার পর,
ঢালিতেছে রবি কর,
প্রেম ভরে সখা তব আঁখি।
সেদিন ও আঁখি তারা,
ঢেলেছিল অশ্রু ধারা,
রেখেছিল স্নেহ-কোলে ঢাকি।
তাই আজ কাছে ওরে ডাকি !

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

ভারতে বিলাতি সভ্যতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিশরাজ্যের প্রধান গৌরব। তাহাতে আমাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। শাক্যসিংহের সময় হইতে চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের প্রচারে যে ফল ফলে নাই, এক শত বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় সে ফল ফলিয়াছে; বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাত লাগিয়াছে। পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল; এক্ষণে উহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্র সকলেরই সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের ভিতরে উচ্চ নীচ সকল জাতি-কেই একত্রে একই বিষয় পড়িতে হয়; পরীক্ষায়, পুরস্কারে উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। বিদ্যা-লয়ের বাহিরে, চাকরি, মান, সম্ভ্রম উচ্চ নীচ সকলেরই সমান প্রাপ্য। তেলি, তামুলি, চাসাধোপা প্রভৃতি যে সকল জাতি সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের নেতৃদলে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যেরই যে মনুষ্যত্বে অধিকার, পাশ্চাত্য শিক্ষা সেই সাম্যভাবটি বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার প্রভাবে অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। কোন সময়ে কোন পদার্থ কোন ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষ দ্বারা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তাহা উদরস্থ বা এমন কি স্পর্শ করিলে তুমি সমাজ হইতে বহিস্কৃত হইবে। জাহাজে চড়িলে পাপ হইবে। নীচ-বর্ণের সহিত খাইলে জাতি হারাইবে। বিধবাবিবাহ করিলে একঘরে হইবে। এই প্রকার যে সকল কুসংস্কার আমাদের সমাজকে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, তাহার বন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সংসারে অমিশ্রিত ভাল জিনিস প্রায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষারও আনুষঙ্গিক কুফল আছে। বহুকাল বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়া সহসা স্বাধীনতা পাইলে সে স্বাধীনতার কুব্যবহার অসম্ভব নহে। হিন্দুসমাজে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকেরা দেখিলেন, সুরাপানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদের যাঁহারা আদর্শ স্থল সেই ইংরাজেরা সুরাপান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হিন্দু সমাজের মত মানেন না; বৃদ্ধ হিন্দুরা "ওল্ড ফুল", তাহারা কি জানে? তাহারা ত সেক্সপিয়র মিল্‌টন পড়ে নাই। ইংরাজসমাজে পানাহার স্ত্রীপুরুষে একত্রে হইয়া থাকে, পানের মাত্রাধিক্য কতকটা ঘৃণিত। হিন্দুসমাজে "মাৎলামীর" এ প্রতিবন্ধকটুকুও নাই; শ্রাদ্ধ বেশী দূর গড়াইল। অনেক কৃতবিদ্য লোক সুরামত্ত হইয়া পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চশিক্ষায় কোথায় উন্নতি হইবে, না অনেকের প্রকৃতপক্ষে অধোগতি হইল!

হিন্দুসমাজে অখাদ্য সম্বন্ধে বড়ই কষাকষি ছিল। অখাদ্যের মধ্যে কোনও জিনিস এদেশে বাস্তবিক খাওয়া উচিত কি না, ইংরাজিশিক্ষিত যুবকেরা তাহার বিচার করিলেন

না। নিজের ধর্ম্ম, নিজের মত যাহাই হউক, অন্যে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, অন্যে যে মত অবলম্বন করে তাহার প্রতি কতকটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন মনুষ্যোচিত কার্য্য। ইংরাজিশিক্ষিত যুবকেরা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া গরুর হাড় হিন্দুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন! দিন কত তাঁহাদের অত্যাচারের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে আমাদের কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলা গিয়াছে। কিন্তু যতটা উন্নতির আশা করা যায় বা বাঞ্ছনীয়, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে অতি অল্পই হইয়াছে। তাহার একটি কারণ, গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে উচ্চ উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করেন না, অতএব ভারতবাসীর মনোবৃত্তির সম্যক্ প্রস্ফুটন হয় না। মুসলমান-সময়ে অনেক অত্যাচার ছিল; কিন্তু উচ্চ পদ সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সম্রাটপ্রবর আক্বরের সময়ে ভগবানদাস, মানসিংহ, টোডরমল্ল, রায়সিংহ, বীরবল্ল প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। সম্রাট ফিরোজ সাহের সময় রতনচাঁদের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। একজন মুসলমান ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন, যে হিন্দু রতনচাঁদের সম্মতিব্যতীত কোন মুসলমান কাজি হইতে পারিত না। রায় আলমচাঁদ এবং জগৎশেট সুজাখাঁর দুই জন সচিব ছিলেন। জানকী রায় আলিবর্দ্দি খাঁর মুখ্য সচিব ছিলেন। জগদেব গোলকণ্ডের রাজা ইব্রাহিম খাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ সার সময়ে সাম্রাজ্যের ভার হেমু নামক জনৈক হিন্দুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল; হেমু একজন সামান্য দোকানদার হইতে এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ ইতিহাস লেখক এলফিনষ্টোন হেমুর ক্ষমতার অতি তারিফ করিয়াছেন। মোহনলাল, দুর্ল্লভরায় এবং রাম নারায়ণ, সিরাজদ্দৌলার তিনজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট বাবর তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন, যে তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন, রাজস্ব সম্বন্ধে ছোট বড় সকল কার্য্যেই হিন্দুরা নিযুক্ত ছিল, মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস হইতে ভারতবাসীর উচ্চ উচ্চ পদে নিয়োগের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে সামরিক বিভাগের ত কথাই নাই, অন্যান্য বিভাগেও যেখানে ভারতবাসীর উচ্চপদে থাকিলে স্বপ্নেও কোন হানির কল্পনা করা যায় না, সেখানেও কোন অত্যুচ্চ পদে তাঁহাকে দেখা যায় না। যাহাকে শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা যায়, সে চিরকালই অনেকটা শিশুবৎ থাকে, মানবোচিত উন্নতি তাহার সম্ভবে না! যাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে দিবে না, সে কখনও ঘোড়ায় চড়িতে শিখিবে না। যাহাকে দুরূহ কায করিতে দিবে না; সে দুরূহ কায করিতে যে উন্নত হয় তাহাও কখন পাইবে না। কেবল কেরানিগিরি করিয়া জীবন ধারণ করিলে উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। শিক্ষিত যুবকদিগের একশত জনের মধ্যে প্রায় নিরেনব্বই জন কেরানিগিরি করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন। তাহাতেও উমেদারি চাই; "লাথিটা আস্টা"ও আছে। অতএব অধিকাংশ যুবক যে "মুসড়াইয়া" যায় তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বিলাতী সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি প্রকৃতি-বিজ্ঞান। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নতিতেই পাশ্চাত্য খণ্ডের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান দু হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে অবস্থায় ছিল, আজও অনেকটা সেই অবস্থায় আছে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য মহাত্মারা ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্যেরা প্রাচীন প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। নানাবিধ কলকারখানা ঐ বিজ্ঞানোন্নতির ফল। পূর্ব্বে যাহা হাতে হইত, এখন তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে কলে হইয়া থাকে। তাই হস্ত-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্য কল-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিঁকিতে পারিতেছে না। ভারতীয় শিল্পের মৃত্যুর ইহাই একটি প্রধান কারণ; উহার পুনর্জীবনের প্রধান আশা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান।

কিন্তু বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার ভারতবর্ষে অতি কমই হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বস্তুটি আজও আমরা পাই নাই। যাহা পাইয়াছি তাহার অধিকাংশ "মেকি"! ভারতবর্ষের অধিকাংশ কল কারখানা ইউরোপীয়দিগের; খনিকার্য্যও প্রায় তাঁহাদের একচেটিয়া। যতদিন এরূপ অবস্থা চলিবে, ততদিন আমাদের বিশেষ উন্নতি হইবে না, ততদিন আমাদের দারিদ্র্যের লাঘব হইবে না। দারিদ্র্য না ঘুচিলে আমাদের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যাহারা উদরের ভাবনায় জ্বালাতন, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দুইবেলা উদর ভরিয়া খাইতে পায় না, কেরানিগিরি বা কুলিগিরি করিয়া কত অপমান, কত কষ্ট সহ্য করিয়া কোনমতে জীবন ধারণ করে তাঁহাদের পক্ষে সভ্যতা বিড়ম্বনা মাত্র।

অতি আহ্লাদের বিষয় বিজ্ঞান-শিক্ষার উপর ক্রমে আমাদের দেশের লোকের চোখ পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কলকারখানাও স্থাপিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতার প্রধান ভিত্তি কি, ক্রমে আমরা দেখিতে পাইতেছি; ক্রমে আমাদের চোখ খুলিতেছে, কিন্তু একটু শীঘ্র শীঘ্র চোখ খুলিলে ভাল হয়। নহিলে যখন চোখ খুলিবে, তখন অনেক দিকেই উন্নতির পথ বন্ধ হইয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে দেশীয় সাহিত্যের অনেক উপকার হইয়াছে। অনেক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে; অনেক ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাব বা সাহায্য লইয়া দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচিত হইয়াছে। অনুবাদে তত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু শেষোক্ত পুস্তক রচনাতে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। উহাতে উদ্ভাবনী এবং চিন্তাশক্তির আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা বিরল, এবং আরও দুঃখের বিষয় বড় বাড়িতেছে না। পনর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতিপথে যেরূপ অগ্রগামী হইতেছিল, এখন সেরূপ হইতেছে না। সম্ভবত, একটি কারণ দেশীয় ভাষার তত আদর নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উহার প্রবেশ হইলে উন্নতির সম্ভা-

বনা। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।

কোন কোন স্থানের অসভ্য জাতিরা প্রভূত পরাক্রমশালী ইউরোপীয়দিগকে দেবতা মনে করিয়াছিল। শক্তিপূজা মনুষ্যের প্রকৃতি। ক্ষমতাবান পুরুষ, বড়লোক, দেবতাবৎ পূজিত হন; জনসাধারণে তাঁহার সবই ভাল দেখেন, মন্দবিষয় অল্প। যে জাতি বুদ্ধি এবং বীর্য্যবলে এত বড় একটা দেশকে শাসনে রাখিয়াছে; যে জাতির কীর্ত্তি বসুন্ধরাব্যাপী, যাহার সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না, সেই জাতিকে আমাদের মত হীনবল, বিজিত, বর্ত্তমানে অনেক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি যে ভয়, মান্য এবং "পূজা" করিবে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেক শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট ইংরাজসমাজ আদর্শসমাজ। অনেক সময়ে ইহা অজানত; প্রকাশ্যে অনেক ইহা স্বীকার করিবেন না; তথাপি, জানত হউক আর আর অজানত হউক, ইংরাজের রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনেকেই অনুসরণ করিয়া থাকেন। চোখ খুলিয়া অনুসরণ করাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগের নিকট হইতে শিখিবার আমাদের অনেক বিষয় আছে। তবে, আমাদের সমাজের কোন্ রীতিগুলি বাস্তবিক মন্দ, ইংরাজ সমাজের কোন্ রীতিগুলি বাস্তবিক ভাল, এবং আমাদের অবলম্বনীয়, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা বিধেয়। অন্ধ অনুকরণ অতিশয় দূষ্য।

ইংরাজ সমাজের সংযোগ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে, হিন্দুসমাজের কয়েকটি কুনিয়মে বিশেষরূপে আঘাত লাগিয়াছে। ঐ সকল কুনিয়ম হিন্দুসমাজকে এরূপ ভাবে জড়াইয়াছে, এরূপ করিয়া "আঁকড়াইয়া" ধরিয়া রহিয়াছে, যে উহাকে বাড়িতে দিতেছে না। উহাদের সমূলে উচ্ছেদ অনেক দিনের কথা। এখন উহাদের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে মাত্র—তাহাও কম লাভ নহে। বর্ণভেদে আমাদের কতকটা উপকার হইয়াছে, সত্য; কিন্তু অনুপকার হইয়াছে অনেক। বর্ণভেদ হিন্দু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। এক্ষণে, বর্ণভেদের আঁটাআঁটি কিছু কমিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধেও নিয়মরক্ষা করিতে বিরত হইয়াছেন। ব্রিটিসরাজ্যে সতীদাহ বন্ধ হইয়াছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের উদ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথাগুলি যে মন্দ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। ইংরাজ সমাজের সংযোগে হিন্দুসমাজের এই প্রকার অনেক উপকার হইতেছে।

অনুপকারও হইয়াছে, অন্ধানুকরণ দোষে; যথা, সুরাপানের প্রাদুর্ভাব। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা বুঝি মনে করিলেন, ইংরাজেরা পান করেন, হয়ত পানেই তাঁহাদের বীর্য্য।

ভারতবাসী প্রধানত নিরামিষভোজী, মৎস্য মাংস অতি কমই খাইয়া থাকে। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ খাটনি বাড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মৎস্যমাংস ভক্ষণ বিধেয়। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। উদ্ভিদে যথেষ্ট পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এবং মাংসে শরীরের হানি হয়, অনেকের এইরূপ মত। সে যাহা হউক, অপরিমিত মাংসভোজনে যে নানা পীড়া জন্মে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অতিরিক্ত মাংস ভক্ষণ দূষণীয়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে। ইউরোপীয়েরাও, যাঁহারা বহুকাল হইতে মাংসভোজী, ক্রমে ইহা বুঝিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুর দুই একটি অখাদ্য খান না। মাংসভোজনের অত্যাচারে হিন্দুসন্তানের স্বাস্থ্যের হানিজনক হইবার সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে, পরে মুন্‌সেফি, মাষ্টারি, ওকালতি, কেরানিগিরি বা অন্যান্য চাকরি করিতে বিশেষরূপে মানসিক পরিশ্রম হয়; কিন্তু তদনুযায়ী শরীর-পরিচালনা হয় না। বহুমূত্রাদি যে সকল নূতন রোগের আজকাল এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে উহাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ব্যায়াম চর্চ্চার বিশেষ আদর।

পূর্ব্বকালের লোকদিগের দান এবং অতিথিসৎকার বিশেষ গুণ ছিল। নব্য-সম্প্রদায়ে ঐ সকল গুণ তত দেখা যায় না, স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে। তাহার একটি কারণ, যেরূপ আয় তাহার তুলনায় ব্যয় অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহার কিছু টাকা হয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেককে প্রতিপালন করিতে হয়; কারণ আমদের সমাজ অতি দরিদ্র। পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে এখনকার মত কাপড় চোপড়, জুতা, খেল্‌না, এবং অন্যান্য বিলাতী জিনিসের প্রচলন ছিল না। এখন পরিবারস্থ সকলের এ সকল জিনিস অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যে সকল দূষণীয় প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তাহার নিরাকরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও, অতি সতর্কতার সহিত আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। ঐ সকল প্রথা অতি প্রাচীন, উহাদের পক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। আইনের সাহায্যে, ভয় দেখাইয়া, বলপ্রয়োগ করিয়া উহাদের বিনাশ করিতে চেষ্টা করা বিধেয় নহে। অনেক সমাজ আছে যেখানে বাল্য-বিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত, অথচ উহারা অসভ্য। লেপ্‌চা প্রভৃতি বহুতর অসভ্য জাতিরা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে; বিধবাবিবাহেও তাহাদের এবং অনেক শূদ্রজাতির কোন আপত্তি নাই। যে সকল সমাজ সংস্কারকেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রাচীন সামাজিক প্রথা সকল উঠাইয়া দিতে চান তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলেও আকাঙ্ক্ষিত ফললাভের আশা বড়ই কম। যে সংস্কার, যে

উন্নতি, আমরা আপনারা শিক্ষার প্রভাবে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া করিতে পারিব তাহাই স্থায়ী এবং স্বাস্থ্যজনক উন্নতি হইবে।

শ্রীপ্রমথনাথ বসু B. SC. (London)

পত্র।

ইতিমধ্যে আমরা পাণ্ডারপুর ও আকেলকোট ঘুরিয়া আসিয়াছি। পরিষ্কার প্রাতঃকাল, ঝকঝকে রৌদ্র, অন্তর বাহির স্ফূর্ত্তিময়; বাড়ীর বাহির হইয়া ভাবিলাম, কি শুভক্ষণেই যাত্রা করিতেছি। এটা যে অন্য যুগ নহে, কলিযুগ, লক্ষণ অলক্ষণ, যাত্রা অযাত্রা এ যুগে যে কেবল একটা কথার মাত্রায় মাত্র পরিণত হইয়াছে তাহা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ভালই হইয়াছিল, আগে হইতে ভয়ে ভয়ে মরার চেয়ে বিপদে পড়িয়া একেবারে মরাও ভাল, ইহাই জ্ঞানী প্রবচন! আজ আমি যে নূতন কথা বলিয়া তোমার এবং পৃথিবী শুদ্ধ লোকের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করতঃ নিজের ভবিষ্যৎ কীর্ত্তি স্তম্ভ রচনা করিয়া রাখিতেছি, সেদিন বিপদের ভয়ে যাত্রা রহিত করিয়া উক্তবাক্য লঙ্ঘন করিলে তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বলিয়া গিয়াছেন বটে, স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কেশ দেখিয়াই সাপিনী তাপিনী হইয়া বিবরে লুকাইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ ললনার স্বল্পকেশ সত্ত্বেও সাপিনী যখন সে দেশে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায় তখন তাহার কারণ যে স্ত্রীলোকের দীর্ঘ কেশ নহে অনেক দিন যাবৎ তাহা প্রমাণ হইয়াছে। সুখের বিষয় রায়গুণাকর ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন না; তাহা হইলে তাঁহার নিজের মতকে নিজের হাতেই খণ্ড বিখণ্ড করিতে হইত। এখন কথা এই, সাপিনীর কেন তবে এ লজ্জা ভয়! সে দিন রেলের গাড়ীতে বসিয়া আমি সে গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছি। উক্ত কারণ সুন্দরীর দীর্ঘকেশ রাশি নহে তাহার শক্তিরূপা জিহ্বা।

ষ্টেসনে সেদিন মহা ভিড়, ফার্ষ্ট ক্লাশেও এমন একটি খালি কামরা পাওয়া গেল না যেটি আমরা চারিজনে নির্ব্বিবাদে অধিকার করিয়া বসি। কাজেই আমাদের দুজনকে একটি মহিলা কক্ষে আশ্রয় লইতে হইল; আর আমাদিগের সঙ্গী পুরুষ দুই জন স্বতন্ত্র গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া দেখিলাম একজন ইংরাজললনা তখনো রাত্রি-বেশ পরিধৃত অবস্থায়, একটি বেঞ্চে অর্দ্ধ লীন হইয়া আয়েসে চা পান করিতেছেন, আর একটি স্থূলকায় ফিরিঙ্গি-রমণী অন্য বেঞ্চে বসিয়া আছেন। আমরা গাড়ীতে উঠিয়া যথোচিত ভদ্রভাবে তাঁহাদের অধিকৃত দুইটী বেঞ্চের যৎকিঞ্চিৎ করিয়া স্থান অধিকার করিয়া বসিলাম। তাহাতে আমরা অনধিকার চর্চ্চা বা কাহারো কিছু

ক্ষতি করিতেছি না বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক স্বাধীনাধিকারবাদী ইংরাজ ললনাটির মেজাজ ইহাতে নিতান্তই বিগড়িয়া গেল, তিনি চায়ের পেয়ালা পিরিচ সশব্দে পোর্টম্যাণ্টের উপর রাখিয়া সহচরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক আমাদের আগমন সম্বন্ধে সক্রোধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভদ্রলোকের মেয়ে এমন রূঢ় হইতে পারে আমি ত আগে তাহা জানিতাম না। (ফার্ষ্ট ক্লাশের আরোহী কাজেই ভদ্র-মহিলা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়; তাহা ছাড়া দেখিতেও মন্দ নহে)। যাহা হোক তাঁহার মন্তব্যের মোদ্দাখানা এই, তিনি যখন গাড়ীতে ওঠেন, তখন ষ্টেসন মাষ্টারের কথায় বুঝিয়াছিলেন, এ গাড়ীতে আর কেহ উঠিবে না। এ কথার অন্যথা করিয়া রেলওয়ের লোকে তাঁহার প্রতি যে অন্যায় অবিচার করিল, হায়দ্রাবাদ পৌঁছিয়াই তিনি খবরের কাগজে তাহা রিপোর্ট করিবেন; আর এজন্য পরের ষ্টেসনের ষ্টেসন-মাষ্টারকেও তাঁহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে। এইরূপে প্রকাশ্যে রেলওয়ের কর্তৃ-পক্ষগণের উপর এবং অপ্রকাশ্যে বেচারা আমাদের উপর শব্দভেদী বাণ প্রয়োগেও সন্তোষ লাভ না করিয়া অবশেষে ষ্টেসনের যে খানসামা তাঁহাকে চা দিয়া গিয়াছিল, তাহার উপর ক্রোধ বজ্র নিক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার অপরাধ, সে বিশ্বাস করিয়া এতক্ষণ তাঁহার নিকট পেয়ালা পিরিচ রাখিয়া গিয়াছে, এখনো তাহা লইতে আসে নাই।

তাঁহার এইরূপ অকারণ ক্রোধ দেখিয়া প্রথমটা আমরা ভারী অবাক হইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার পর নির্ব্বিকার দার্শনিকের মত শান্তভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মনোভাবের সহিত মুখ সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধালোচনা করিতে করিতে একটা নূতন জ্ঞান এবং বেশ একটু আনন্দলাভ করিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় যে কি, এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমার নিজের কোন একটা স্থির মতামত ছিল না। ছেলে-বেলায় জানিতাম, খাদ্যের অনাদরই চূড়ান্ত বিস্ময়জনক; কেননা পড়িবার সময় বেণে-দিয়া (আমাদের পুরাতন দাসী) আমাকে খাইতে পীড়াপীড়ি করিলে যদি বিরক্ত হইয়া বলিতাম যে খাওয়ার চেয়ে আমার পড়তে বেশী ভাল লাগে; তাহা হইলে তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকিত না। বড় হইয়া দেখিলাম এ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ; এমন কি সারা কনফেসন অ্যালবম্ খুঁজিয়া একরকম দুটো মত মেলে না; এবং অধিকাংশ মতই এমন স্ব স্ব প্রধান যে, মামার সম্বন্ধী, এবং পিসার ভাই অপেক্ষাও পরস্পরে অধিক সম্বন্ধ বিহীন। দেখ না আমাদের বন্ধুবর চা-বাবু বলিতেছেন বাঙ্গালী ঘরের আঁতুরে ছেলে বাঁচিয়া থাকার মত বিস্ময়জনক ব্যাপার আর কিছু নাই; আবার তোমার মতে সুন্দর মুখই জগতের মধ্যে আশ্চর্য্য বস্তু! আমার তখন সামান্য বিষয়ে এইরূপ মতবৈচিত্র্যই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হইত; কিন্তু সেদিন সুন্দরীর ক্রোধ-বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া জ্ঞানোদয় হইল যে, সুন্দর মুখে উগ্র বিকৃত ভাবের মত বীভৎস এবং আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য সংসারে আর কিছু নাই। সুন্দরীগণ

এই কথাটি মনে রাখিলে সংসারের অনেকটা উপকার সাধন করিতে পারেন! আমার তখন এমনটা ইচ্ছা করিতেছিল একখানা আয়না লইয়া তাঁহার মুখের সামনে ধরি। কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তাঁহাতে আর অবসর দিলেন না; উপদেশ দান আর উপদেশ পালন যে এক নহে তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম। ইংরাজসুন্দরী চায়ের পেয়ালার উপর পেয়ালা চাপাইয়া খানসামার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে যেমন হাত বাড়াইয়া তাহাকে পেয়ালা পিরিচ দিতে যাইবেন, অমনি অভিপ্রায়ে বা অনভিপ্রায়ে জানি না পিরিচের খানিকটা উচ্ছিষ্ট চা স—য়ের কাপড়ে পড়িয়া গেল। রাগটা তখন কিরকম হইল বুঝিতেই পার। কিন্তু ইংরাজের ভদ্রতাকে সাবাস! যেমনি এই ঘটনা অমনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তিনি অসঙ্কোচ-দুঃখ প্রকাশে তৎপর হইলেন, কেবল তাহাই নহে; কাপড়খানি ধৌত হইয়া উদ্ধার লাভ করিবে এরূপ আশ্বাস প্রদানেও ত্রুটি করিলেন না। তবে তাহাতে যে আমরা কতদূর সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলাম বলা অনাবশ্যক! যাহা হউক নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই মহৎবাক্যটির অনুসরণে আপনাদিগকে মহত্ব প্রদান করাই তখন শ্রেয় বিবেচনায় তৎকৃত ক্ষতির জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণকেও মৌখিক শিষ্ট প্রয়োগে সম্পূর্ণ নাস্তিত্ব প্রদান করিয়া ভাবিলাম, অতঃপর এইখানেই তাঁহার ক্রোধ পর্ব্বের শেষ। কিন্তু দেখিলাম তাহা নহে। একটা বড় ষ্টেসনে গাড়ী থামিবামাত্র সুন্দরী বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নামিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের চক্ষের উপর ষ্টেসন মাষ্টারের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। কি কথা তাহা অবশ্য জানি না; তবে অনুমানে বুঝিলাম আমাদের সম্বন্ধেই কথা চলিতেছে। তিনি সম্ভবতঃ আমাদের তাড়াইবার ফন্দীতে আছেন আর ষ্টেসন-মাষ্টার তাঁহাকে হতাশ্বাস করিতেছে, সম্ভবতঃ তাঁহার নিকট আমাদের পরিচয়ও প্রকাশ করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শেষ না হইতে হইতেই ট্রেণ ছাড়ার ঘণ্টা পড়ায় তাঁহার তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে হইল, লাভের মধ্যে সে ষ্টেসনে তাঁহার খাওয়াই হইল না। তিনি যখন মনের দুঃখে গাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন আমারও দুঃখ হইতে লাগিল। গাড়ীতে আসিয়া নিরাশভাবে শুইয়া পড়িয়া ক্রুদ্ধস্বরে সহচরীকে বলিলেন "আমার কিছুই খাওয়া হইল না, বাড়ী গিয়া দেখিতেছি অসুখে পড়িব"। কথাটা এইরূপ ভাবে বলিলেন তিনি যদি অসুখে পড়েন ত যেন রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুতাপে আত্মহত্যা করিবে। শ্রীরাম মেথরকে আমার মনে পড়িল, মদখাইলেই সে অভিমান পূর্ণ হৃদয়ে বেসুরে চীৎকার করিয়া গাহিত "মারবে তুমি মরব আমি অপ্‌চ হবে কার"।

দুঃখের বিষয় তাঁহার এত মানাভিমান, তর্জ্জন গর্জ্জন সমস্তই চাদানির বিপ্লব-আলোড়নের মত অল্পক্ষণেই শেষ হইয়া গেল। আমাদের ইচ্ছা করিতেছিল আরো কিছুক্ষণ তিনি তাঁহার এ সুখস্বপ্ন উপভোগ করুন; কিন্তু জীবন ও রেলগাড়ী কাহারো

জন্য দাঁড়াইতে চাহে না, কাহারো সাধ পূর্ণ করিতে অবকাশ দেয় না। আমাদের মনের বাসনা মনেই রহিল, ট্রেণ হুস্ হুস্ করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ষ্টেসনে থামিল। আমরা আমাদিগের আনন্দসঙ্গ হইতে সুন্দরীকে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অগত্যা নামিয়া পড়িলাম। ষ্টেসনে রাজরথ আমাদের জন্য প্রস্তুত ছিল আমরা উঠিতেই সারথি নল-গৌরবে অশ্ব চালনা করিয়া আঠার মাইল পথ অবিলম্বে অতিক্রম করিয়া আকেলকোট আসিয়া পৌছিল।

বাঙ্গলায় যেমন বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, তেমনি আকেলকোট এ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র জেলা। কিন্তু রাজ্য ক্ষুদ্র বলিয়া রাজা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহেন; না পদমর্য্যাদায় না আকৃতিগৌরবে। সম্মানে তিনি প্রায় আমাদের কুচবেহারেরই সমকক্ষ হইবেন; প্রকৃত রাজক্ষমতা তাঁহার হস্তে, প্রজাদিগকে তিনি ফাঁসিও দিতে পারেন; আর আকৃতিতে তিনি বেশ একটু হৃষ্ট-পুষ্ট; বিধাতাপুরুষ তাঁহার শত্রুদিগের মুখে মধু দিতে দিতে যে তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে এমন ভ্রম কাহারো হইবার সম্ভাবনা নাই। আকেলকোটে দর্শনীয় বড় কিছু নাই। গ্রাম্যদৃশ্য, সোলাপুরের মত ধুধুকারী শুষ্কমাঠ, শস্যশ্যামল বিরল ক্ষেত্র, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তরুপুঞ্জ, আর তাহার প্রাণের মধ্যে ক্ষুদ্র লোকালয়, অধিকাংশই কুটীর, মাঝে মাঝে দু একটি অট্টালিকা, এক স্থানে রাজদুর্গ অভ্রভেদী রূপে দণ্ডায়-মান। রাজপ্রাসাদ নবনির্ম্মিত, প্রাসাদ সংলগ্ন বাগান বড় সুন্দর; প্রাসাদের অভ্যর্থনালয় অর্থাৎ ড্রইং রুম ইংরাজি ফ্যাশানে বেশ জমকালো করিয়া সাজানো; তবে অসামান্য সাজসজ্জা নহে; আমাদের দেশের ধনী লোকের অনেকের গৃহ ইহা হইতেও জমকালো রকমে সুসজ্জিত।

আমরা ভাবিয়াছিলাম, রাণীর গভর্ণেস মিস্ মক্‌সন গৃহটি সাজাইয়াছেন—কিন্তু শুনিলাম তাহা নহে, রাণীসাহেবের নিজেরি সুরুচিশৃঙ্খলা এবং কলাকৌশল ইহাতে প্রকাশিত। রাজা আমাদের সঙ্গে লইয়া যাহা কিছু দেখাইবার সব দেখাইয়া বেড়াইলেন। স্কুলবাড়ী, বিচারালয়, রাজবাজার, দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, এমন কি প্রাসাদের প্রত্যেক গৃহটী—সুসজ্জিত ড্রইং রুম হইতে আর জওয়ারি গম পূর্ণ ভাণ্ডারগৃহ ও মহামূল্য হস্তী-সিংহাসন যেখানে থাকে সেই হাওদাখানা পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম। আমাদের সম্মানে চিত্রবিচিত্রদেহ, মাহুতপৃষ্ঠ, মহাদন্তী রাজহস্তী দুইটিও উদ্যানে দাঁড়াইয়া শুণ্ডাগ্রভাগ তুলিয়া সেলাম করিতে লাগিল। এই সকলের মধ্যে ছোট ছোট মৃণ্ময় গমপ্রকোষ্ঠগুলি দেখিয়া স—য়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না; তদ্দর্শনে আকেল-কোটে আসাটা তাঁহার সার্থক বলিয়া মনে হইল। তবে মুনিদিগের দ্বারাই যে মতভেদ জিনিষটা এক তরফা দখলীভূত নহে তাহার পরিচয় দৈনিক জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই পাইতেছি। ক্ষুদ্র সাংসারিকদিগের মধ্যেও মতের অমিলটা এমনতর প্রবলবেগে দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিলে এতগুলো মাসিক পত্রিকার কিরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইত বল!

আমাদের ভাগ্য যেমনই হউক, মাসিকপত্রের সৌভাগ্যবশতই বোধ হয়, আমাদের দুজনের প্রতিপদেই প্রায় মতের অমিল হইয়া থাকে, এবারো হইল, আমিত গমকুঠরির মধ্যে কোনই সৌন্দর্য্য দেখিলাম না। রাজার সাদর অভ্যর্থনায় প্রীতি লাভ করিয়া যখন রাণীর দরবারে উপস্থিত হইলাম, তখন মনে হইল এতক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি, আকেল-কোটের মধ্যে যাহা দর্শনীয়, রাজার যাহা শ্রেষ্ঠ রত্ন তাহা এই খানে বিরাজিত। বাস্তবিক রাণীর সেই মিষ্ট মুখের মিষ্টহাসি অমায়িক সৌজন্য-সরলতা অতি মনোহারী।

মিস্ মক্সন রাণীর এবং রাজারো সেক্রেটারী। উভয়েরি অত্যন্ত প্রিয়। বস্তুত পক্ষে ইনিই রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তা। ইনিও কিন্তু বেশ লোক ভাল, রাজারাণী যেমন ইঁহাকে ভাল বাসেন ইনিও তেমনি তাঁহাদের শুভকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। ইঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেও বেশ আরাম আছে। লোকটা বেশ সাহিত্যানুরাগী পড়াশুনা লইয়াই এক রকম আছেন।

রাজা এতদিন পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন নাই। আমরা সেখান হইতে আসিবার পর তিনি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মহা ঘটায় রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হইল, কিন্তু তাহার মধ্যে গরীব দুঃখীদের দান ৫০০০হাজার মাত্র, আর সব খরচ ইংরাজ পূজার আয়োজনে। ইংরাজগণ এই উপলক্ষে আকেল-কোটে নিমন্ত্রিত হইয়া তিন চার দিন ধরিয়া নৃত্যগীত ভোজোৎসবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার সীমা ছিল না। আর রাজার অতি অল্পই আত্মীয়বন্ধু এই শুভ উৎসব পর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ছেলেবেলা হইতে রাজাকে ইংরাজভক্ত করিতে সচেষ্ট, সে অভিপ্রায় তাঁহাদের সুসিদ্ধ। রাজা আত্মীয়দিগকে সম্মান করেন না, ইংরাজদের সন্তুষ্ট করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট। আত্মীয়গণও সেইজন্য তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট নহেন। রাজা রাণী ও মিস্ মক্সনের বিশ্বাস তাহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বিষভাণ্ড লইয়া বসিয়া আছে। রাজার এ পর্য্যন্ত পুত্র সন্তান হয় নাই, রাজা রাণী উভয়েই সে জন্য ক্ষুণ্ণ। তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ কন্যাটির বয়স ৬।৭ বৎসর হইবে, সুন্দর মুখখানি!

ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়।

গত দুই শত বৎসর ধরিয়া ভারতমাতার অগণ্য হতভাগ্য বৈধ সন্তানদিগের সহিত একত্রে পাশাপাশি একপাল অবৈধ রক্তবীজের ঝাড় গজাইয়া উঠিয়াছে। ইহারা আমাদের অপেক্ষাও হতভাগ্য; যে ভারতের ক্রোড়ে ইহারা মানুষ, যে ভারতের অন্নে ইহারা আজন্ম পালিত ও পরিবর্দ্ধিত সে ভারতকে ইহারা নিতান্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখে এবং যে ইংলণ্ডের

সহিত ইহাদের সম্বন্ধ অতি অল্পই, যেখানে বহুপুরুষেও কাহারো যাইবার সম্ভাবনা অতিশয় বিরল তাহাই ইহাদের "হোম"। এমন হতভাগ্য করুণার পাত্র আর কে আছে? লম্পট ইয়ুরোপীয় বণিকের ক্ষণিক ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার ফল ইহারা। ইহারা পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, পিতৃঐশ্বর্য্য পিতৃগৌরব হইতে বঞ্চিত। ইহারা চোখের সম্মুখে দেখিতেছে ইংলণ্ডের বৈধ সন্তানেরা উত্তরাধিকারিত্বে কি প্রবল শারীরিক নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ান্, কি অপূর্ব্ব তেজোমহিমায় জ্যোতিষ্মান্, কি সর্ব্বজনসমাদৃত। সেই এক পিতার সন্তান ইহারাও, তাই ভারতের উপকূলে দাঁড়াইয়া সুদূর ইংলণ্ডের প্রতি নয়ন প্রসারিত করিয়া ইহারা কাতর, ক্ষুব্ধ, পীড়িত হৃদয়ে বলিতেছে "আমাদেরও গৃহ ঐ উজ্জ্বল লোকে, ঐ জ্যোতির্ম্ময় আনন্দধামে"—বাহু প্রসারিত করিয়া ভাই বলিয়া ঐ লোকবাসীগণের প্রেমালিঙ্গন ভিক্ষা করিতেছে কিন্তু তাহারা ইহাদের দেখিয়া ঘৃণাভরে আত্মীয়তা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছে এবং সে ঘৃণা ও লজ্জা যে নিতান্ত অকারণও নহে তাহা ক্রমশঃ বিবৃত করিব। এদিকে ইহারা নিজদোষে মাতৃভূমির বৈধসন্তানগণেরও ঘৃণ্য। আমরা ফিরিঙ্গীগণের জন্মকলঙ্ক ভুলিতে পারিতাম, উহাদের চরিত্রের হীনতা ভুলিয়া উহাদের শত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ভাই বলিয়া আলিঙ্গন দিতে পারিতাম যদি নাকি উহারা আমাদের মাতার প্রতি প্রেমবান হইত, ভারতবর্ষকে অবজ্ঞার চক্ষে না দেখিত, ভারতবাসীকে নিতান্ত হেয় মনে করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত না করিত। উহাদের পিতৃভক্তির, অতিমাত্র প্রাবল্য এবং মাতৃভক্তির ঐকান্তিক অভাবে দাঁড়াইয়াছে এই যে আমাদের সহিত উহাদের সর্ব্বপ্রকার স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাই আমাদের কষ্টলব্ধ অন্নে উহাদের ভাগীদার দেখিলে এত ক্ষোভের এত দ্বেষের উদ্রেক হয়। মনে হয় হে ইংরাজ-রাজ! আমাদের যথা সর্ব্বস্ব তোমরা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ তাহার উপর আবার তোমাদের এই পাপের বোঝা আমরা বহন করিব?

ফিরিঙ্গী সংস্কার সমিতির সভাপতি মৃত মহাত্মা হোয়াইট সাহেব ফিরিঙ্গী সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে যে দুই একটী প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে ফিরিঙ্গী-দের সহিত আমাদের সদ্ভাববর্দ্ধনের পথ কতকটা উন্মুক্ত হয়।

তিনি বলেন ইউরোপ ও এসিয়া এই উভয় দেশের লোক হইতে উৎপত্তি বলিয়া ফিরিঙ্গীগণ ইউরেসিয়ান, অতএব সুধু ইউরোপ ধরিয়া থাকিলেই চলিবে না, এসিয়াও ধরা চাই, নতুবা উন্নতি লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। ধর্ম্ম, শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষা, উদ্যম-শীলতা ও কার্য্যদক্ষতা বিষয়ে ইউরোপের পদানুবর্ত্তী হইতে হইবে, আর পরিমিতাচার মিতব্যয়িতা; আড়ম্বরহীনতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বিষয়ে মাতৃভূমির দৃষ্টান্ত অনুকরণ করা প্রয়োজন। উভয় দেশের যাহা কিছু দোষ তাহা ত্যাগ করিয়া গুণভাগ গ্রহণ করিলে ফিরিঙ্গীগণ অতি মহৎজাতি হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। পরিচ্ছদ ইংরেজের মত না হইয়া মাঝামাঝি একরকম হওয়ার দরকার। নাম ইউরোপীয়ান নামের অনুকরণেই

হইবে তবে তাঁহারা যে এদেশীয় লোকেরও সন্তান, ভারতবাসীর শোণিতও যে তাঁহাদের ধমনীতে আছে একথা মনে রাখিবার জন্য তাঁহাদের নামের এক অংশ এদেশীয় হওয়া উচিত। হোয়াইট সাহেব নিজেকে হোয়াইট খাঁ বলিয়া পরিচয় দিতেন। মনে করুণ এক জনের নাম স্যামুয়েল বার্নার্ড, হোয়াইট সাহেবের মতে তাহার নাম স্যামুয়েল বার্নার্ড বীরেন্দ্র সিংহ রাখিলে ক্ষতি কি? আর কিছু না হউক ইহাতে এদেশের ও এদেশীয় লোকের প্রতি তাহাদের এবং তাহাদের প্রতি এদেশীয় লোকের বিজাতীয় ঘৃণার ভাব কমিয়া যায়। স্ত্রীলোকের পোষাক সম্বন্ধে তিনি গাউন প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে সাড়ী পরিধানের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে পরামর্শ দেন।

আমাদের সহিত কোন সম্প্রদায়ের নামের ও পরিচ্ছদের কতক মিল দেখিলে তাহাদের অনেকটা আত্মীয় বোধ হয়, তাহাদের ভারগ্রহণে ততটা আপত্তি হয় না, বরঞ্চ একটুখানি স্নেহের টানে তাহার কর্ত্তব্য বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক আপাততঃ ফিরিঙ্গীরা আমাদের আত্মীয়দলভুক্ত হউক আর না হউক, তাহাদের ভার আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে। বহুবাজার, ধর্ম্মতলা, চুনাগলি এবং ইংরাজপল্লীর অপেক্ষাকৃত ফ্যাশানেব্‌ল্ বিভাগেও আমরা যে মসী-বিনিন্দিত বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া, সাহেবনিন্দিত বর্ণীয় হরেক প্রকারের ফিরিঙ্গী মূর্ত্তি প্রতিদিন সন্দর্শন করি তাহাদের জীবনসম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি, বা জানিতে কৌতুহল হয়। তাহারা আমাদের জীবনের এতই বাহিরে যে শুধু স্বপ্নদৃষ্ট ছবির ন্যায় তাহারা আমাদের চোখের উপর দিয়া যায় আসে। বরঞ্চ পুস্তকের পাতে, নভেলের পাতে খাঁটি ইংরাজের জীবনের সহিত আমাদের ঢের বেশী পরিচয় হয়। সকলেই আমার মত আনাড়ী না হইতেও পারেন, তবে কেহ কেহ হয়ত ফিরিঙ্গীদের জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেকটা অনভিজ্ঞ এবং সম্ভবতঃ বিনাপরিশ্রমে সে অজ্ঞতা দূর করিতে নারাজ নহেন, তাঁহাদের জন্য আমার এই ফিরিঙ্গীসম্বাদসঙ্কলন।

তিন শ্রেণীর ফিরিঙ্গী আছে। এক যাহারা বেশ ভদ্র সভ্র ভাল চাকুরিওয়ালা। তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তাহাদের আহার ব্যবহার জীবন নির্ব্বাহন প্রণালী অনেকটা খাঁটি ইংরাজদেরই মতন, তাহারা চেষ্টাচরিত্র করিয়া খাঁটি ইংরাজসমাজে প্রবেশ লাভও করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

নিম্নশ্রেণীর ফিরিঙ্গীরা দুই ভাগে বিভক্ত, তাহাদের মধ্যে একদল লোক অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে থাকে কিন্তু তাহারা একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না; ক্রমাগত দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং যে সকল নগরে ইংরাজাধিবাস অধিক সেই সকল স্থানেই তাহাদের বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা, বোম্বে বা সুদূর করাচী পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ঘুরিতে দেখা যায়। এইরূপ ভাবে ভ্রমণের তাহাদের অল্পবিস্তর অভিপ্রায় আছে, কিন্তু তাহারা পদব্রজে ভ্রমণ করে না, পথখরচ না থাকিলে ভিক্ষা করিয়া খরচ সংগ্রহ করে; এই সমস্ত লোকের সাহায্যের জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের

অনেক প্রধান স্থানে Loafer's Fund নামক সাহায্যভাণ্ডার আছে, এই সকল ধন-ভাণ্ডার সাধারণতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের চেষ্টাতেই স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত পরিব্রাজকগণ এই সকল স্থানে উপস্থিত হইলে কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসন পর্য্যন্ত ভ্রমণের জন্য একখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ও কিঞ্চিৎ আহার্য্য পায়। এই সমস্ত উদ্দেশ্যহীন পর্য্যটককে নগদ টাকা দিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেহ সমস্ত টাকা রেলের টিকিট কিনিতে ব্যয় করিয়া আহারাদি সংগ্রহের জন্য স্থানান্তরে ভিক্ষা করে, আবার কেহ সমস্ত পাথেয় শৌণ্ডিকালয়ে খরচ করিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিত এবং তাহারা এক সময় চাকরী করিত কিন্তু কোন কারণে চাকরী যাওয়ায় অবশেষে এই নীচ ভিক্ষা বৃত্তির আশ্রয়ে উদ্দেশ্যহীন জীবন পরিচালিত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কথঞ্চিৎ উন্নতমনোবৃত্তিসম্পন্ন, তাহারা সুরাদেবীকেই জীবনের একমাত্র উপাস্য বলিয়া মনে করে না, তাহারা সময়ে সময়ে রেলভাড়ার জন্য প্রাপ্ত টাকা খানাপিনায় বা ঋণশোধে ব্যয় করিয়া নূতন ছল ধরিয়া দাতার নিকট পুনর্ব্বার হস্ত প্রসারণ করিয়া থাকে। অনেক সময় কোন সদাশয় ব্যক্তি তাহাদিগকে নগদ টাকা না দিয়া টিকিটের বরাত দিলে তাহারা সেই বরাত অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করে। নিতান্ত দরিদ্র এবং অবলম্বন শূন্য হইয়াও এই সকল পর্য্যটকগণ যে কিরূপে জীবনযাত্রার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আহরণ করে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। রেলোয়ের গার্ডগণ প্রায়ই ফিরিঙ্গী, সুতরাং তাহারা স্বজাতিবাৎসল্যবশতঃ তাহাদের স্বজাতীয় আরোহীদিগকে বিদায় দিবার সময় কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য ও অর্থাদি সাহায্য করিয়া থাকে, এবং আবশ্যক হইলে কখন কখন টিকিটনির্দ্দিষ্টস্থান অপেক্ষা দূরতর ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে ব্রেকভ্যানেও তুলিয়া লয়। ফিরিঙ্গীদিগের মধ্যে অনেকে পল্লীগ্রামস্থ কোন শান্ত শিষ্ট দেশী ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হয় এবং ভয় প্রদর্শন বা অনুনয় বিনয়ের দ্বারা দুই এক সপ্তাহের জন্য তাঁহার অনিচ্ছাসম্মত আতিথ্য গ্রহণ করে।

যাহাহউক যদিও বহু সংখ্যক ফিরিঙ্গী এইরূপ অলস, ভিক্ষাপালিত জীবন বহন করিতেছে, তথাপি অনেককে চাকরী করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক দেখা যায়। তবে যে সমস্ত কর্ম্মে শারীরিক পরিশ্রম অধিক ইহারা সে সকল কর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। যখন তাহারা স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া চাকরী স্থলে উপস্থিত হয় তখন তাহাদের মনে দুদিন কাজ করিয়াই যে পলায়ন করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা বোধ হয় না, তথাপি প্রায় অনেক সময় দেখা যায় যে তাহারা তিন চারি মাস কাজ করিতে করিতে সহসা পীড়িত হইয়া পড়িলে কিম্বা বেতনে না পোষাইলে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যায়; একজন হিতৈষীর চেষ্টায় এই শ্রেণীর এক ফিরিঙ্গী মাসিক আশি টাকা বেতনে এক কল পরিচালকের পদে নিযুক্ত হয়, তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির ও যথেষ্ট আশা ছিল কিন্তু তিন মাসের মধ্যে সে চাকরী ছাড়িয়া পুনর্ব্বার উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে; কারণ একঘেয়ে চাকরী তাহার পোষাইয়া উঠিল না।

ধর্ম্মপ্রচারকদিগের উপরই ইহাদের লক্ষ্য কিছু বেশী ; একজন প্রচারক হয়ত নিজের কাজ শেষ করিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন, ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখেন বারান্দায় থামের আড়ালে শীর্ণকায়, মলিন বদন, ধুলিধূসরিতবস্ত্রপরিহিত একটি ফিরিঙ্গী যুবক দাঁড়াইয়া আছে। সে দিকে লক্ষ্যপাত না করিয়া পাদ্রী সাহেব ভিতরে প্রবেশ করিলেন ; অনতিবিলম্বে একজন ভৃত্য একখানি অপরিষ্কার কার্ড আনিয়া সসম্মানে তাঁহার হস্তে প্রদান করিল, তাহাতে গোল গোল অক্ষরে লেখা আছে "জোসেফ ডিক্রুজ্" ; সাহেব তাহার দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে পদার্পণ করিবামাত্র সেই অপরিচিত ফিরিঙ্গী যুবক অতি বিনীতভাবে এবং সম্মান সহকারে সেলাম করিয়া একতাড়া কাগজ খুলিয়া দেখাইল যে বর্ম্মা বা বেলুচিস্থানে রেলোয়ে বিভাগে তাহার এক চাকরী পাওয়ার কথঞ্চিৎ সম্ভাবনা আছে অতএব পাদ্রী সাহেব যদি তাঁহার অলৌকিক ঔদার্য্যগুণে তাহাকে কিছু পাথেয় সাহায্য করেন তাহা হইলে তাহার অত্যন্ত উপকার করা হয়। তাহার পর সে নিশ্চয়ই চাকরী পাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যাইবে মাসখানেক আগে সেখানে তিন চারিটা কাজ খালি ছিল সুতরাং একটা পাওয়া যাইতে পারে ; পুনর্ব্বার প্রশ্ন করুন "আচ্ছা, তুমি আগে যে কাজ করিতে তা ছাড়িলে কেন ?" তাহার উত্তরে সে বলিবে "আমার ব্যারাম হইয়াছিল, ছুটি লইয়াছিলাম, চাকরী গিয়াছে," তাহার পরিবার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারা যাইবে তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যাদি চারি পাঁচটি, তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সঙ্গেই যাইবে, পূর্ব্ব রাত্রে তাহারা দিনাপুর হইতে আসিয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি ; তাহার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, কোথায় চাকরী কোথায় কি তার ঠিক নাই, অথচ তাহার আশায় ভিক্ষা করিতে করিতে সূর্য্যি মামার দেশে চলিল, তা আবার একা নয়—সপরিবারে। যদি চাকরী না পায় কোথায় দাঁড়াইবে, কি করিবে, পরিবারবর্গের কি দুর্দ্দশা হইবে তাহার চিন্তা নাই। যাহাহউক মনে করুন দয়ালু পাদ্রীসাহেব তাহাকে দশটাকা দান করিলেন, তখন সে ষ্টেসন পর্য্যন্ত যাইবার জন্য ঘোড়াগাড়ী ভাড়া দেড়টাকা চাহিয়া বসিল, না দিলে কিছুতেই উঠিবে না, কারণ এই রৌদ্রে সপরিবারে ষ্টেসন পর্য্যন্ত প্রায় একক্রোশ হাঁটিয়া যাওয়া অত্যন্ত অপমান জনক।

এইত গেল 'ভবঘুরে' ফিরিঙ্গীদিগের কথা। ইহারা ছাড়া কতকগুলি ফিরিঙ্গী ভারতের প্রধান প্রধান নগরে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করে এবং তাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানর পক্ষপাতী নহে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাদের মধ্যে হইতেই নিতান্ত কাতর ক্ষুধিত ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয় ; তাহাদের দারিদ্র্য এতই বর্ণনাতীত, তাহাদের উদ্যম ও উৎসাহ এতই ক্ষীণ, তাহাদের নৈতিক বল এতই অবনত যে তাহারা বাস্তবিকই মানব-সমাজের অত্যন্ত হীন ও অযোগ্যতম স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সেই জন্যই এদেশের ইংরাজ সমাজসংস্কারকগণ তাহাদের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের চিন্তায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িয়াছেন।

এই সকল ফিরিঙ্গীদিগের বাসস্থান ও আচারব্যবহারসম্বন্ধে দুই এককথা বলা যাউক; ইহাতে আমাদের দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত তাহাদের প্রভেদ বেশ অনুমান করা যাইবে। কলিকাতায় যাহারা চুণাগলি বা তন্নিকটস্থ স্থানের আকা বাঁকা গলির ভিতর কখন প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা এই সকল ফিরিঙ্গীদিগের বাসস্থানের সহিত সুপরিচিত। আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই উচ্চ:শ্রেণীর ফিরিঙ্গীদিগের সহিত ইহাদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা কিছু ভাল তাহারা ইষ্টকালয়ে বাস করে, তদ্ভিন্ন সকলেই কুটীরে বাস করিয়া থাকে। অনেকগুলি পরিবারের বাসস্থান একত্র-সম্বদ্ধ এবং তাহাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ বিসম্বাদ হয় না। অর্থাভাব বশতঃ তাহারা গৃহে কোন প্রকার বিলাসের দ্রব্য রাখিতে পারে না, যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাই তাহাদের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যসম্বন্ধে ইহাদের কিছুমাত্র মনোযোগ নাই বলিয়া ইহাদের গৃহ অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে! নর্দ্দমা কূপ প্রভৃতি স্থান যে বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন তাহা ইহাদের জ্ঞানের অতীত। বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে দুর্গন্ধময় দ্রব্য সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে; স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্ববিধ নিয়ম লঙ্ঘন করায় ইহারা দুর্ব্বল, রুগ্ন, ও অল্পায়ু হইয়া পড়ে, এবং ইহাদের সন্তান সন্ততিগণের স্বাস্থ্যও অতি অল্প বয়সেই নষ্ট হইয়া যায়। এই ফিরিঙ্গীদিগের মধ্য হইতে অতি অল্পসংখ্যক লোক বাদ দিলে দেখা যায় যে অবশিষ্টেরা প্রায় সকলেই অলস ও উৎসাহহীন। তাহারা যে চাকরী যুটাইয়া উঠিতে পারে না বলিয়া অলস ভাবে থাকে তাহা বোধ হয় না, আলস্য তাহাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ দোষ। সত্যবটে আজকাল বিশেষ উপযুক্ত না হইলে বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে না পারিলে চাকরী পাওয়া দুর্ঘট, কিন্তু একজন লোক চিরজীবন চেষ্টা করিয়াও যে একটি চাকরী যুটাইতে পারিবে না ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। পৃথিবীতে উচ্চ হইতে নিম্ন সকল শ্রেণীর লোকেরই উপযুক্ত চাকরী আছে, সুতরাং বিশেষ চেষ্টা করিলে ইহাদেরও চাকরী মিলিতে পারে, কিন্তু ইহাদের চেষ্টার সম্পূর্ণ অভাব, তাহার উপর সামান্য চাকরী সম্মান-হানিকর বলিয়া ইহারা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয় না, সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরিশ্রম করা অপেক্ষা ঘরে চুপচাপ করিয়া অলস ভাবে পড়িয়া থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করে। যাহাদের পিতামাতা জীবিত আছে তাহারা মনে করে তাহাদিগকে প্রতিপালন করা পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং ফিরিঙ্গীদিগের পরবর্ত্তী বংশপরম্পরা পূর্ব্ববর্ত্তী বংশীয়দিগের অপেক্ষা ক্রমেই শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক অধোগতির দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। বাল্যবিবাহ ইহাদের অধঃপতনের আর একটি সুস্পষ্ট কারণ। নিম্ন শ্রেণীর ফিরিঙ্গীদিগের ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক বালকগণ ১৪।১৫ বৎসরের বালিকাদিগকে বিবাহ করে। বালিকাদিগের পিতামাতা যত শীঘ্র তাহাদের খোরাক পোষাকের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে ততই আপনাকে নিষ্কণ্টক মনে করে সুতরাং কোন বালক আসিয়া বালিকার হস্তপ্রার্থী হইবামাত্র বালিকার পিতামাতা বরের

অবস্থা বা উপযুক্ততা সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া ফেলে। কিন্তু নানাকারণে অতি অল্পদিনেই নবদম্পতির মধ্যে মনোবিবাদের সূত্রপাত হয় এবং তাহারা "তাড়াতাড়ি কোরো বিয়ে—পস্তিও ফিরে বাড়ী গিয়ে" এই ইংরাজি প্রবচনের যাথার্থ্য অতি তীব্রভাবে অনুভব করে। এদিকে একটি পয়সা উপার্জ্জন নাই কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে পুত্রকন্যাদি জন্মিয়া সংসারের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে লাগিল। কোন না কোন রকমে তাহাদিগকে খাইতে পরিতে দেওয়া ত চাই; কিন্তু কোথা হইতে তাহা জুটিবে? সুতরাং অগত্যা তাহাদিগকে হয় নীচ ভিক্ষাবৃত্তি না হয় চুরিবিদ্যা অবলম্বন করিতে হয়, এবং এইরূপে তাহারা অধঃপাতের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পানভোজন সম্বন্ধে অমিতব্যয়িতা ইহাদের দুরবস্থার অন্যতম কারণ। একজন দেশীয় মজুর প্রত্যহ দুই তিন আনা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই তাহার 'মোটা ভাত মোটা কাপড়' একরকমে যুটিয়া যায়। কিন্তু উপার্জ্জন সম্বন্ধে একে ত এই ফিরিঙ্গীদিগের "অদ্যভক্ষ ধনুর্গুণ" অথচ নিয়মিতরূপে মদ্য, মাংস, মটন ইত্যাদি খাওয়া চাই। পরিচ্ছদের উপর ইহাদের লক্ষ্য আরো একটু বেশী। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ফিরিঙ্গীই রোমান ক্যাথলিক, অতি অল্পসংখ্যক লোক প্রটেষ্টাণ্ট বা অন্যমতাবলম্বী। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকদিগের কঠোর অধ্যবসায় ও অশ্রান্ত চেষ্টায় এই সকল দুর্নীতিপরায়ণ, হীনচেতা ফিরিঙ্গীদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের কোমল ভাব ও পবিত্র আলোক বিকীর্ণ হইতেছে।

কিন্তু কথা এই যে এই ফিরিঙ্গীদিগের এরূপ শোচনীয় দারিদ্র্যের কারণ কি? হিন্দুকুলী যদি কাজ পায়, ইহারা পায় না কেন? তাহার কারণ, প্রথমতঃ, ইহাদের মধ্যে উৎসাহের একান্ত অভাব, ইহারা পুরুষানুক্রমে অলস; দ্বিতীয়তঃ এতদ্দেশীয় শ্রমজীবীদিগের ন্যায় ইহারা রৌদ্রোত্তাপে অক্লান্তভাবে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে পারে না; তৃতীয়তঃ এ দেশীয় শ্রমজীবীগণ যে হারে প্রত্যহ উপার্জ্জন করে তাহা ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহাদের যুক্তি এই যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াও যদি উদর পূর্ণ না হইল তবে পরিশ্রম করা কেন? চতুর্থতঃ ইহারা সর্ব্বদাই ঋণজালে জড়িত থাকে, সুতরাং এ দেশীয় শ্রমজীবীর ন্যায় সামান্য উপার্জ্জনে ইহাদের কোন অভাবই বিমোচিত হইতে পারে না। বিলাসী বড়মানুষের দাসীপুত্রেরা যেমন অধিকাংশ স্থলে চরিত্রহীন, অলস, বিলাসী হয় ইহারাও সেইরূপ। অতুল্য উদ্যমশালী ইংরাজের সন্তান হইয়াও ইহারা ভারতবাসী অপেক্ষা অকর্ম্মণ্য। ইংলণ্ড পিতার বৈধসন্তানেরা তাঁহার সৎগুণ সমূহের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, আর তাঁহার যত কিছু অসৎগুণ তাহাই এই সন্তানগণে বর্ত্তিয়াছে। পরিশ্রম করিতে ইহারা যৎপরোনাস্তি পরান্মুখ, কাজ করাকে অপমানজনক জ্ঞান করে। একজন অর্দ্ধশিক্ষিত ফিরিঙ্গী যুবক কোন ভদ্র ইংরাজের নিকট কিছু কিছু মাসিক সাহায্য পাইতেন, একবার তিনি সাহায্য গ্রহণ করিতে যাইতে নিজের আয় ব্যয়ের যে হিসাব দেন তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় ফিরিঙ্গীগণ "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"

মতের কিরূপ পক্ষপাতী। কথিত ফিরিঙ্গী যুবকের মাসিক আয় সাতাইশ টাকা মাত্র। তিনি ও উহাঁর স্ত্রী ভিন্ন সংসারে অন্য পরিবার ছিল না সুতরাং এই আয়েই তাঁহার সাংসারিক খরচ বেশ চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু তিনি এই সামান্য আয় হইতে মাসে মাসে পাচককে ৬৲ টাকা, ধোপাকে ২৲ টাকা, ঝাড়ুদারকে ২৲ টাকা, ও ভিস্তিকে ১৲ টাকা বেতন দিতেন, এবং অবশিষ্ট ১৬৲ টাকায় বাড়ীভাড়া ও অন্নবস্ত্রাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু ইহাতে কুলাইত না বলিয়া তাঁহাকে ঋণ করিতে হইত। ভদ্র ইংরাজমহোদয় এই ফিরিঙ্গী যুবককে বলেন যে, যদি তাঁহার স্ত্রী পাচিকার কার্য্য করেন, তবে তাঁহার মাসিক ৬৲ টাকা খরচ বাঁচিয়া যাইতে পারে। তাহাতে যুবকটি ঘৃণার সহিত উত্তর করিলেন "তা কেমন ক'রে হবে? তাঁর রাঁধা অভ্যাস নেই!" এই কথায় সাহেব বলিলেন "কেন সে কাজটা আর এমনি কি গর্হিত? আমার যদি মাসিক আয় ২৭৲ টাকা হোত, আমি কখনো ৬৲ টাকা মাইনে দিয়ে পাচক রাখ্‌তাম না, যে রকম ক'রেই হোক ঘরে ঘরেই রান্নাবাড়ার কাজ শেষ কর্‌তাম।" কিন্তু এই ফিরিঙ্গী যুবক তাঁহার স্ত্রীর দ্বারা দুটি খাবার তৈয়ারী করিয়া লওয়া বা দুখানি ময়লা কাপড় কাচান যৎপরোনাস্তি ঘৃণিত কাজ ভাবিয়া সাহেবের কথায় ঈষৎ হাস্যে দন্ত বিকাশ করিলেন, যেন লোকের কাছে ভিক্ষা করাটা অপেক্ষাকৃত সম্মানের কাজ!

শুধু কলিকাতায় নয়, মান্দ্রাজ, বোম্বে প্রভৃতি প্রদেশেও এই সকল ফিরিঙ্গীদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে তাহাদের উন্নতিবিষয়ক আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় ২১০০০ ফিরিঙ্গীর বাস। তাহার মধ্যে সাত হাজারের অবস্থা নিতান্ত মন্দ; ১৪০০০ ফিরিঙ্গীর অবস্থা অতি দীন হীন ভিক্ষুক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল। এতদ্ভিন্ন ৫৬০০ লোক ভিক্ষা বা সাধারণের দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ইহাতে অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে আমাদের স্বজাতীয় শত শত দীন দরিদ্র ব্যক্তিই যখন কত কষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করে তখন এই ভীষণ জীবনসংগ্রামে ফিরিঙ্গীদরিদ্র ও ফিরিঙ্গী ভিক্ষুকদিগের উপায় কি হয়? ফিরিঙ্গী ভিক্ষুক ও দেশীয় ভিক্ষুকের জীবিকার প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে অন্ততঃ পল্লী সমূহে ভিখারীকে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে অতি অল্প গৃহস্থই কাতর হন, সুতরাং ভিখারীগণও অনাহারে থাকে না। আমরা অনেক ভিখারী দেখিয়াছি যাহারা ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বাজারে বিক্রয় পর্য্যন্ত করে। বৈষ্ণব ভিখারীদিগের মধ্যে এমন লোক কদাচিৎ দেখা যায় যাহার শরীর দিব্য 'গোবর গণেশের' মত নধর নহে, বঙ্গের লোক অনাহারে কষ্ট পায় ইহাঁদের দেখিলে এ কথা কেহ শপথ করিয়াও বলিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশে একান্নভুক্তপরিবারপ্রথা প্রচলিত থাকায় অনেক নিরুপায় ব্যক্তি নির্ব্বিবাদে আহার পায়,—সেরূপ লোকের সংখ্যা কিছু অল্প নহে। তাহার পর নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীগণ স্ত্রী পুত্র ও

অন্যান্য পরিবার লইয়া গৃহে বাস করে, তাহাদের স্বাবলম্বন আছে, পরিশ্রম করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে; যাহার যে কাজ তাহাতেই লিপ্ত থাকিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাতেই তাহাদের বেশ চলিয়া যায়। ইহাদের আর একটা সুবিধা এই যে পরিবারস্থ কেহই বসিয়া থাকে না, সকলেই সাধ্যমত কাজ করে; আমরা যদি পল্লীগ্রামের কোন শ্রমজীবীর পারিবারিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? বাড়ীর 'কর্ত্তা' হয় ত জন খাটিতে গিয়াছে, তাহার স্ত্রী গৃহকার্য্য শেষ করিয়া হয় পাট কাটিয়া দড়ি প্রস্তুত করিতেছে না হয় ক্ষার দিয়া ময়লা বস্ত্র ধৌত করিতেছে, ছোট ছোট মেয়েরা কাপড় ছাঁকা দিয়া ডোবায় মাছ ধরিতেছে, ছেলেটি পাড়ার লোকের গোরু লইয়া মাঠে চরাইতে গিয়াছে, এইরূপে সকলেই কাজে ব্যস্ত। ফিরিঙ্গী দিগের দ্বারা এরূপভাবে সংসার প্রতিপালন আশা করা যায় না। তাহাদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের অধিকাংশকেই বদান্যব্যক্তির মাসহারা ও সাধারণ দানভাণ্ডারের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং ব্রিটিশ্ মার্চেণ্টগণ পরোপকার ও অন্যান্য সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাসে মাসে যথেষ্ট অর্থদান করিয়া থাকেন। কতিপয় উচ্চপদস্থ সিভিলিয়ান ও বণিক ধর্ম্মপ্রচার এবং পরদুঃখমোচনোদ্দেশ্যে বাৎসরিক প্রায় ১২০০৲ টাকা হিসাবে দান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন যাঁহাদের আয় অপেক্ষাকৃত অনেক কম তাঁহারও প্রায় মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে দান করেন, এই সকল অর্থের অধিকাংশই কলিকাতার ফিরিঙ্গীসম্প্রদায়ের ভরণ পোষণে ব্যয়িত হয়।

যাহা হউক এই বর্দ্ধনশীল ফিরিঙ্গীদিগের ভরণ পোষণের জন্য পূর্ব্বাপর যথেষ্ট অর্থ সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে। এই দানের প্রধান কার্য্যস্থল কলিকাতাস্থ ডিস্‌ট্রিক্ট্ চ্যারিটেবল্ সোসাইটী। প্রধানতঃ অনেকগুলি সহৃদয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের দাতব্যে এবং কিয়ৎ পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই সোসাইটীর কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। সম্প্রতি ইহার মূলধন প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা; ইহা হইতে যে আয় হয় তাহা সহস্র সহস্র ফিরিঙ্গীকে মাসিক দুই তিন টাকা হিসাবে সাহায্য দান করা হয়। ইহার ব্যয়ে একটি কুষ্ঠাশ্রমও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কার্য্যে এই সোসাইটী দ্বারা বার্ষিক প্রায় আশি হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতায় রোমান ক্যাথলিক সোসাইটীর অন্তর্গত একটি দাতব্যালয় আছে, তাহার আয়ও নিতান্ত সামান্য নহে, তাহার কার্য্যপ্রণালী সাধারণে অপ্রকাশিত থাকে; অনেক ফিরিঙ্গী এই উভয় স্থানেই মাসিক সাহায্য পায়। কিন্তু এইরূপ ভিক্ষাদানের দ্বারা একটি জাতির অভাব মোচন করা যায় না কিম্বা তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তোলা যায় না। মাসিক দুই পাঁচ টাকা সাহায্য দ্বারা এই নিরন্ন এবং পতিত সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইলেও এই দানে ইহাদের কোন স্থায়ী মঙ্গলের আশা নাই। তবে সুখের বিষয় এই যে ফিরিঙ্গী বালক বালিকাদিগের শিক্ষা দানের নিমিত্ত তিনটি সুবৃহৎ বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে এবং তাহা দ্বারাই

ফিরিঙ্গী সমাজের প্রকৃত উপকার সাধিত হইতেছে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের মধ্যে ফ্রী স্কুলই সর্ব্ব প্রধান। এখানে চারিশতের ও অধিক ফিরিঙ্গী বালক বালিকা যে রীতিমত শিক্ষা পায় তাহাই সুধু নহে, তাহারা আহা/ পরিচ্ছদাদি পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে, এবং এই গুরুতর কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক প্রায় ৭১০০০৲ টাকা খরচ হইয়া থাকে। শ্রীমতী এল্, পি, পিউনাম্নী কোন দয়াবতী সম্ভ্রান্ত মহিলার অবিশ্রান্ত চেষ্টায় ও অন্যান্য হিতৈষীদিগের যত্নে ফিরিঙ্গী রমণীদিগের জন্য একটি শ্রমাগার স্থাপিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গী রমণীগণ এখানে নানাবিধ কাজ করে এবং তজ্জন্য তাহারা যে বেতন পায় তাহাতেই তাহাদের জীবিকার সংস্থান হয়।

ফিরিঙ্গীদিগের জন্য চাকরীর অনেকগুলি দ্বার উন্মুক্ত আছে। রুড়কীর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হইতে অনেক ছাত্র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হইয়া পূর্ত্তবিভাগের উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অনেকে টেলিগ্রাম বিভাগে ও কাষ্টম্ সর্ভিসে প্রবেশ করে। নিম্নশ্রেণীর চিকিৎসা বিভাগেও তাহাদের প্রবেশাধিকার আছে, ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সৈনিক চিকিৎসালয়ে অনেক ফিরিঙ্গীযুবককে চিকিৎসকের কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন রেলওয়ে সংক্রান্ত অধিকাংশ পদই ফিরিঙ্গীদিগের অধিকৃত। পোষ্টাল বিভাগেও ইহাদের চাকরী করিতে দেখা যাইত, কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, অল্প দিন হইতে তাহাদের এই বিভাগে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। কলিকাতায় বণিকসম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কর্ম্মের ভার ইংরেজ বা স্কচ কর্ম্মচারীদিগের উপরই ন্যস্ত থাকে, এবং এই সকল কর্ম্মচারীগণ কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য প্রায়ই বিলাত হইতে নিযুক্ত হইয়া আসেন; এতদ্ভিন্ন তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্ত কাজ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত আফিসে বাঙ্গালী ক্লার্কের স্থানে ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের প্রবেশ একপ্রকার অসম্ভব,—মার্চেণ্ট আফিসের বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী এবং কার্য্যদক্ষ, বাঙ্গালী হেডবাবু এবং তাঁহার অধীনস্থ বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণের পরিবর্ত্তে ফিরিঙ্গীকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে, আফিসের হেডসাহেবের নিকট ইহাপেক্ষা হাস্যকর প্রস্তাব আর কিছু হইতে পারে না,—ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে এমন একটা বদ্ধসংস্কার দাঁড়াইয়া গিয়াছে!

যাহা হউক এ পর্য্যন্ত যাহা করা হইয়াছে তদ্দ্বারা ফিরিঙ্গীকুলের অতি অল্পই উপকার হইয়াছে। তাহাদের দারিদ্র্য নিরাকরণের জন্য এখনো কোন সদুপায় অবলম্বিত হয় নাই, এবং যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন ফিরিঙ্গী সমাজের উন্নতির কিছুমাত্র আশা নাই। বংশপরম্পরায় ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ইহাদের জীবনই যে সুধু দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হইবে তাহা নহে, ইহারা মানব সমাজের উন্নতির পক্ষে কণ্টক স্বরূপ হইবে। পরের অনুগ্রহের উপর চিরকালের জন্য নির্ভর করাই যদি ইহাদের একমাত্র অবলম্বন হয় তাহা হইলে ইহাদিগের মধ্যে এত অর্থব্যয় করিয়া শিক্ষাবিস্তার ও ইহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য সমাজসংস্কারকদিগের গভীর চিন্তা

সম্পূর্ণ নিরর্থক। শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা উদ্যমশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও আত্মসম্মানজ্ঞ হইলে ইঁহাদের অবস্থাগত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জন্মিতে পারে, কিন্তু কেবলমাত্র চাকরীর উপর নির্ভর করিলে বিশেষ আশা আছে বলিয়া মনে হয় না। চাকরী বাকরীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে শুধু তাহার পথ চাহিয়া থাকিলে ফিরিঙ্গীসমাজের বড় লাভ নাই। ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অবস্থার উন্নতি করাও তাহাদের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। যাহার কিছু সঙ্গতি আছে তাহার ব্যবসা করা পোষায়, ঋণ করিয়া ব্যবসা করার বিপদ অনেক, আর ফিরিঙ্গীদিগের ন্যায় অনভিজ্ঞ জাতির পক্ষে বিপদের সম্ভাবনা বেশী! বিশেষ কে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ব্যবসা করিবার জন্য বহু মুদ্রা ধার দিবে? ভারতের বিভিন্নপ্রদেশ হইতে ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেক ফিরিঙ্গী উপনিবেশ স্থাপন করিতেছে। আপাততঃ সিঙ্গাপুর দ্বীপের অধিবাসী ফিরিঙ্গীগণ এজন্য কাতর চীৎকার ধ্বনি তুলিয়াছে, তাহাদের বক্তব্য এই যে তাহারা নিজেই যখন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না তখন সেখানে অন্য বিদেশী লোকের স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং সিঙ্গাপুর ও পিনাং দ্বীপে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ফিরিঙ্গীদিগের মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছে। অনেকেই কার্য্যাভাবে বেকার বসিয়া আছে, কিন্তু দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার ত বন্ধ হইবার নহে সুতরাং তাহাদেব জীবনরক্ষা দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। তত্রত্য হাঁসপাতাল ও অন্যান্যস্থানে ফিরিঙ্গীগণ মাসিক বারো তের ডলার বেতনে কাজ করিতেছে কিন্তু তাহাও শীঘ্র দুস্প্রাপ্য হইয়া পড়িবে। উদরান্নের জন্য দেশ ছাড়িয়াও যদি অনাহারে মরিতে হয় তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু নাই। প্রজাসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা গবর্ণমেণ্টের রাজ্যশাসনের যে একটি উদ্দেশ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই সুতরাং বেশী কিছু না করিয়া গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাদের জন্য সামান্য একটা কাজ করেন তাহা হইলে ফিরিঙ্গী সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচুর অরণ্যময় ভূমি পড়িয়া আছে, ভারতসাগরীয় ইংরেজাধিকৃত দ্বীপপুঞ্জেও এরূপ জমীর অভাব নাই, ফিরিঙ্গীগণ যদি এই সকল জমী চাষ করিতে পায় তাহা হইলে অনেকের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইতে পারে। একজন ইংরেজ-কৃষক এক কাঠা জমী পাইলে কত যত্নের সহিত সেই জমী চাষ করে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদনের জন্য কত উপায় অবলম্বন করে তাহার অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, আর সুবৃহৎ ভূখণ্ড পাইয়া ফিরিঙ্গীগণ কি শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত কিছুমাত্র চেষ্টা করিবে না? অন্ততঃ জঠরানল ইহাদিগকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন ফিরিঙ্গীগণ এই কঠিন ও নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্, ক্যানেডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে শস্যোৎপাদনের জন্য পতিত জমী দান করেন বলিয়াই সেই সকল স্থানের প্রজার অবস্থা অতি উন্নত। ভারতে যে সকল জমী পতিত আছে তাহাতে ধান, গম, পাট, নীল এবং মসিনা

প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে পারে ; ভারত অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়ায়—বিশেষতঃ কুইন্সল্যাণ্ড-প্রদেশে অনেক ভাল জমী পতিত আছে, যে সকল ফিরিঙ্গী ভারত ছাড়িয়া অন্য দেশে যাইতে প্রস্তুত আছে তাহাদিগের অষ্ট্রেলিয়াতে যাওয়াই ভাল। জমী দান ছাড়া ইহা-দিগকে আসলসুদে কিছু টাকা ধার দেওয়া দরকার, লাঙ্গলগরু কিনিতে ও শস্যের বীজ সংগ্রহ করিতে ইহাদের এই অর্থের প্রয়োজন হইবে ; কোম্পানীর কাগজে গবর্ণমেণ্ট যে সুদে টাকা কর্জ্জ লইয়া থাকেন, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী সুদে ইহাদিগকে টাকা ধার দিলে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ শস্য উৎপন্ন হইলে গবর্ণমেণ্ট অনায়াসেই এই টাকা পাইতে পারিবেন ; বঙ্গের কৃষকেরা মহাজনের শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও সুজন্মার বছরে অনাহারে থাকে না, সুতরাং ফিরিঙ্গীদিগের প্রতি এইটুকু অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহারা যে বেশ স্বচ্ছন্দে সংসার পালন করিতে পারিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আর গবর্ণমেণ্টেরও ইহাতে ভবিষ্যতে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে ; পতিত ভূখণ্ডগুলিকে আবাদোপযোগী করিলে সেসকল স্থানে কালে নিশ্চয়ই প্রজাপত্তন হইবে, সুতরাং ভবিষ্যতে সেখানে নূতন নূতন নগর স্থাপনের আশা করা যায়। কিন্তু কৃষিকর্ম্মের সহিত শিল্পেরও বিস্তৃতি চাই, রাজমিস্ত্রী, সূত্রধর, কামার, ঘরামী ইত্যাদি ফিরিঙ্গীদিগের মধ্যে নাই বলিলেই হয়, এ সমস্ত কাজ কিছু ঘৃণার কাজ নহে, ইউরোপ বা আমেরিকায় কামার বা ছুতরেরা নীচ বলিয়া লোকের ধারণা নাই। মৃত মহাত্মা ব্রাড্‌ল সামান্য শ্রবজীবীর সন্তান ছিলেন, ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মহাত্মা গারফীল্ড জীবনের অনেক দিন সূত্রধরের কার্য্যে অতিবাহিত করেন ; হীন বলিয়া ফিরিঙ্গীগণ এই সমস্ত কাজ করিতে অসম্মত হইলে তাহাদের উন্নতির আশা নাই। অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডে প্রত্যহ আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া প্রত্যেক শ্রমজীবী পাঁচ ডলার হিসাবে উপার্জ্জন করে, সেখানে খাদ্যদ্রব্য যেরূপ সুলভ তাহাতে ইহা নিতান্ত অল্প উপার্জ্জন নহে, সেখানে ফিরিঙ্গীগণও এরূপ কাজ ঘৃণিত বলিয়া মনে করে না। শুধু ভারতের ফিরিঙ্গীদিগের নিকট কি তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় থাকিবে ?

ইহাদের সদ্‌গতির আর এক উপায় আছে,— সৈন্য শ্রেণীতে যদি ইহারা প্রবেশাধিকার পায় ত অনেক লোকের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। আমরা উপরে ফিরিঙ্গীদিগের যে সকল চাকরীর বিভাগে অধিকারের কথা বলিয়াছি তাহাতে এত অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ফিরিঙ্গী প্রবেশ করিতেছে যে তাহার উপর সমগ্র সমাজের শুভাশুভ অতি অল্পই নির্ভর করিতেছে ; পক্ষান্তরে সৈন্যবিভাগে প্রবেশাধিকার পাইলে সম্ভবতঃ অনেক লোক প্রবেশ করিতে পারিবে এবং তাহাতে ইহাদের সমাজেরও অনেকটা মঙ্গল আশা করা যায়। ফিরিঙ্গীগণ যাহাতে সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারে সেজন্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ এবং ইউরেশিয়ান্ সভা হইতে খুব চেষ্টা হইতেছে। এই সভার ইচ্ছা যে প্রস্তাবিত ফিরিঙ্গী সৈন্যদল যেন বেতন পরিচ্ছদ ও

আহারাদি সমস্ত বিষয়ে ইংরাজ সৈন্যের সমান অধিকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু এ প্রস্তাব কতদূর সঙ্গত তাহাতে অনেক ইংরেজেরই সন্দেহ আছে। তাঁহারা বলেন "ফিরিঙ্গীদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করাইবার একটা মাত্র যুক্তি আছে, তাহা এই যে যাঁহাদের বল ও কৌশলে ভারতসাম্রাজ্য বিজীত হইয়াছে, তাঁহাদের বংশধরগণ যে পূর্ব্বপুরুষের এই অধিকার পাইবেন না ইহা অন্যায়। কৃষ্ণকায়, বিজীত ভারতবাসী যদি সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পারে ত ফিরঙ্গীগণ কি অপরাধ করিল ?—এতদ্ভিন্ন ফিরিঙ্গীদিগের সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার কোন অধিকার নাই, ইহাদের মত অলস, ভীরু, পরিশ্রমে অপারগ, উচ্ছৃঙ্খল জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই, ইহারা এতই দুর্ব্বল যে বন্দুকের ভারে ইহাদের দেহ অবনত হইয়া পড়ে, সুতরাং এরূপ অপদার্থ লোক সৈন্যদলে প্রবেশ করাইলে অনেক নিরন্ন উপায়হীন ফিরিঙ্গীর গতি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যশ্রেণীরও বৃদ্ধি হইতে পারে বটে কিন্তু তাহাতে বৃটীশ সৈন্যের গৌরব নষ্ট এবং তাঁহাদের উজ্জ্বল যশোরশ্মি ম্লান হইয়া যায়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁহারা বলেন যে "ডাচ ফিরিঙ্গী সৈন্যের দুর্ব্বলতাই সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপে বিদ্রোহ প্রশমিত না হইবার একমাত্র কারণ। ইহারা কিরূপ অনুপযুক্ত তাহা গোয়ার পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী সৈন্যশ্রেণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।" ইংরেজ সৈন্যের সহিত সমান বেতন ও আহারাদি দিয়া গবর্ণমেণ্ট যে ফিরিঙ্গীদিগকে গ্রহণ করিবেন ইহা অতি অল্পই আশা করা যায়, অথবা ইংরেজ সৈন্য কমাইয়া বা শিখ, গুর্খা প্রভৃতি পরাক্রান্ত ভারতীয় সৈন্য বাদ দিয়া ফিরিঙ্গী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে ইহা কখনো সম্ভবপর নহে, তবে ফিরিঙ্গীগণ উপযুক্ত হইলে এদিকে ভবিষ্যতে তাঁহাদের যে কিছু মাত্র আশা নাই তাহাও বোধ হয় না। ফিরিঙ্গীদিগের মধ্য হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইয়া সৈন্যদলে প্রবেশ করান উচিত। উপযুক্ত লোক পাইলে গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি নাই, অথচ তাহারা যদি সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে পায় তাহা হইলে ফিরিঙ্গীদিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করা হয়। ফিরিঙ্গীদিগের মধ্যে উপযুক্ত লোকও যে পাওয়া যাইতে পারে তাহা কোন কোন উচ্চ সৈনিক কর্ম্মচারীর বিশ্বাস। কিছুদিন পূর্ব্বে রয়াল আর্টিলারির লেফটেনাণ্ট জেনারাল মিঃ ম্যাক্লিয়ড্ ফিরিঙ্গীদিগকে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের উপযুক্ততার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

ফুলের মালা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উল্কাপিণ্ড যেমন অতিবেগে গতি হারায়, শক্তিও তেমনি উত্তেজিত হৃদয়াবেগে চলিয়া কিছুদূর গিয়াই অবসন্ন নিস্তেজ হইয়া পড়িল। সহসা তাহার নয়নান্ধকারের মধ্যে ঘূর্ণমান দিকবিদিক হারাইয়া গেল, পদতলে কঠিন ধরণীকেন্দ্র পর্য্যন্ত শূন্য হইয়া পড়িল, শক্তি প্রাণপণে বল সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে গিয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। শক্তিকে এ পর্য্যন্ত কেহ যন্ত্রণাকাতর, মূর্চ্ছিত হইতে দেখে নাই; আজ নিশীথ বিশ্ব শক্তির শক্তিহীন অসহায় মূর্ত্তির দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিছুপরে শক্তি চেতনালাভ করিল;—তাহার চতুষ্পার্শ্বে বনতলে ঘনীভূত ভীষণ ছায়াপুঞ্জ, মাথার উপর চন্দ্রশূন্য আকাশে প্রজ্জলিত তারকারাশি;—সে নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল, সকলি তাহার নেত্রতারকায় প্রতিবিম্বিত হইল, অথচ সে কিছুই দেখিল না; বাহিরের আলোক অন্ধকার, সৌন্দর্য্য ভীষণতা, তাহার অন্তরের জ্বলন্ত যন্ত্রণান্তর ভেদ করিয়া ইন্দ্রিয়বোধ জন্মাইতে অপারক হইল। শক্তি কেবল তাহার হৃদয়ালোড়নে মাত্র সচেতন হইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, দেহভার বৃক্ষ মূলে ন্যস্ত করিয়া অশ্রুপ্লাবিত নয়নে দক্ষিণ হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। রাজকুমারকে পরাইবার জন্য নিজের গলার ফুলমালা খুলিয়া সে যেমন হাতে ধরিয়াছিল, এখনো তেমনি হাতে আছে। মালার দিকে চাহিয়া আজ আর শক্তির হৃদয় জুড়াইল না, শক্তির বড় যত্নের, বড় আদরের সেই অমূল্য ধন মালা গাছি আর সে মালা নহে! যে আশা বিশ্বাস সূত্রে গ্রথিত ছিল বলিয়া ইহার অমূল্যত্ব, এখন সে আশা বিশ্বাস ছিন্ন, সুতরাং এখন ইহা আর কিছুই নহে, শুধু অবহেয় শুষ্ক ছিন্ন ফুলদল মাত্র। মালার দিকে চাহিয়া আজ শক্তির জ্বলন্ত বেদনা আরো জ্বলিয়া উঠিল, অশ্রু শুকাইয়া গেল, সন্ধ্যার তীব্র অপমান স্মৃতিতে তাহার নির্জ্জীব প্রাণ সহসা অস্বাভাবিকরূপে চেতনালাভ করিল, শক্তি দন্তে অধর দংশন করিয়া সেই একত্র গ্রথিত শুষ্ক ফুলগুলি সূত্রনির্গত, হস্তপেষিত, মর্দ্দিত করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল, তাহার সাধের ফুলদল অণুপরমাণুতে পরিণত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইল, বালিকা তাহার উপর চরণ রক্ষা করিয়া গর্ব্বিত নির্ণিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার রোষরক্ত নয়নে আবার অশ্রুলহরী বহিল, অপমানমুদ্রিত ওষ্ঠাধরে নৈরাশ্যবেদনা স্ফুরিত হইতে লাগিল, শক্তি সেই ছিন্ন-ফুলকণিকার উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল "কুমার কুমার এই তোমার প্রেমের স্মৃতি!" আবার উত্তেজিত ক্রোধে তাহার করুণ-দুঃখ বিরূপ হইয়া উঠিল, সে মুষ্টি-বদ্ধ হস্তে হৃদয় চাপিয়া তীব্র স্বরে বলিল "কোথায় স্মৃতি! স্মৃতি এখন প্রতিশোধ! ভগবান

প্রতিশোধ, প্রতিশোধ!" নিস্তব্ধ নিশায় সেই ক্রুদ্ধ স্বর ধ্বনিত হইয়া কানন প্রান্তে মিলাইয়া পড়িল। নিজের স্বরে নিজেই শিহরিয়া উঠিয়া শক্তি নির্ব্বাক, নির্জীব স্পন্দহীন হইয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শক্তি সহসা কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিল। চমকিয়া মুখ উঠাইয়া বলিল—"কে তুই!"

উত্তর হইল "আমি মুসলমান!"

অন্য কোন বালিকা হইলে এ অবস্থায় নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িত, কিন্তু শক্তি একে স্বভাবতই সাহসী, তাহাতে অবস্থাচক্রে পড়িয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরনিপুণ হইয়াছে; সুতরাং অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া ভয় পাইল না, কেবল যবনের স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ ও স্পর্শে ঘৃণাবোধ করিয়া সতেজে উঠিয়া বসিল, এবং রূঢ়স্বরে ক্রুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিল "কোথাকার তুই হতভাগা! আমাকে ছুঁইলি যে!"

মুসলমান আস্তে আস্তে বলিল "আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছ।"

শক্তি পূর্ব্বের মতই কঠোরস্বরে বলিল "আমি অজ্ঞান হই বা না হই, তোর তাতে কি? তুই মুসলমান হইয়া আমাকে স্পর্শ করিবি!"

যবন বৃক্ষতলে মাথার পাগড়িটা খুলিয়া আবার ভাল করিয়া মাথায় বাঁধিতেছিল, বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল "তাহাতে দোষ কি? তোমাকে যে বিধাতা যে পদার্থে গড়িয়াছেন আমাকেও সেই বিধাতা সেই একই পদার্থে গড়িয়াছেন। তুমিও যে আমিও সে, ছুঁইলে দোষ কি?"

শক্তি। মূর্খ! তুই পুরুষ আমি স্ত্রী, তুই মুসলমান আমি হিন্দু, তোর নীচবংশ নীচধর্ম্ম, আমার শ্রেষ্ঠবংশ, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম! ভগবান আমাদের দুজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এক করিয়া ত আর গড়েন নাই, তুই স্বতন্ত্র লোক আমি স্বতন্ত্র লোক!"

মুসলমান হাসিল, অন্ধকারে তাহার মুখের বিদ্রূপ-ভ্রুকুটিরেখা দেখা গেল না, কিন্তু স্বরে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল "হ্যাঁ ভগবান সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছেন সত্য কিন্তু স্বতন্ত্র নিয়মে গড়েন নাই। একই চেতনা হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্রের মধ্যে সঞ্চারিত, একই ন্যায় ধর্ম্মে তাহারা প্রতিপালিত, বিধাতার নিকট সকলেই সমান।"

গনেশদেবের মাতার নিকট অপমানিত হইয়া শক্তি কিছুপূর্ব্বে এই ভাব মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিল! মুসলমানের মুখে তাঁহারি অভিশাপবাক্যের যেন এ উপহাস-প্রতিধ্বনি! শক্তি স্তম্ভিত হইয়া গেল; বুঝিল মুসলমান সামান্য লোক নহেন, তাহার মনের কথা তাঁহার নিকট অবিদিত নাই। কিছু পরে সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল।

"তা যদি,—যদি সবাই সংসারে সমান,—তবে এ ভেদজ্ঞান কেন ?"

উত্তর হইল "অজ্ঞানতা, মায়া।"

শক্তি। এ মায়ার আবশ্যকতা কি ? এই মায়াই যখন সমস্ত কষ্টের কারণ তখন ভগবান এই মায়া এই অজ্ঞানতা জগৎ হইতে দূর করেন না কেন ?"

"দূর করিলে সৃষ্টি থাকে না। তাঁহার সৃষ্টিরক্ষার জন্য, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই এই মায়ার আবশ্যক।"

"আমাদের কষ্ট দিয়াই তাহা হইলে ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি! বিধাতা দয়াময় নহেন! তিনি নিষ্ঠুর নির্ম্মম ?"

"তিনি নিষ্ঠুরও বটেন, দয়াময়ও বটেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ করিয়া চলে তিনি তাহাকে সুখ দেন, তাঁহার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ করিতে চাহে না তিনি তাহাকে কষ্ট দেন।"

সমস্ত কথা শক্তির মাথায় ভাল করিয়া প্রবেশ করিল না। সে যন্ত্রণাউত্তেজিত হৃদয়ে বলিল "ভগবানও প্রতিশোধ চাহেন! কোথাও তবে মার্জ্জনা নাই! তবে এই ক্ষুদ্র মানুষের প্রতিশোধস্পৃহাও দোষের নহে ?

উত্তর হইল "দোষের যদি হইবে তবে ভগবান এ প্রবৃত্তি দিলেন কেন ? অন্যায়ের যদি প্রতিফল না থাকিত ত ভগবান ন্যায়বান হইতেন না। ন্যায়ই প্রতিশোধ!"

শক্তি। আমি তাহাই চাই। প্রতিশোধ! ভগবান প্রতিশোধ! কিন্তু সে বিশ্বাসঘাতকতার, এ যন্ত্রণার প্রতিশোধ কি আছে ?"

মুসলমান গম্ভীর স্বরে দৈববাণীর মত বলিল "শোনিত-পাত, শোণিত-পাত! কেবল তাহার নিপাতে নহে, তাহার বংশের নিপাতে তাহার কার্য্যের প্রতিশোধ! ভগবান তোমাকে—"

শক্তি আর শুনিতে পারিল না। ফকিরের অঙ্কিত প্রতিশোধ চিত্রে ক্রুদ্ধ অপমানিত বালিকা-হৃদয়ও শিহরিয়া উঠিল, সে বলিল "না আমি তাহার মৃত্যু চাহি না, তাহার বংশলোপও চাহি না। তাহাতে আমার প্রতিশোধস্পৃহা নিবৃত্তি হইবে না; আমি তাহাকে চাই। যেদিন দেখিব গণেশদেব আমার প্রেমোন্মত্ত হইয়া মাতা পরিবার রাজ্য সম্পদ সমস্তই বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত,—যে দিন দেখিব আমার একটি অনুগ্রহ বাক্য পাইবার জন্য নরকে যাইতেও সে কুণ্ঠিত নহে, সেই দিন এ হৃদয়ের আশা পূর্ণ হইবে, তাহাতেই আমার প্রতিশোধ-স্পৃহা পরিতৃপ্ত হইবে, অন্য কিছুতে নহে।"

মুসলমান শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল "ইচ্ছা করিলে যে শত শত রাজা মহারাজার হৃদয় দলিত করিতে পারে, সে আজ সামান্য অনুগ্রহের ভিখারিণী! ইহাই তাহার প্রতিশোধ!"

সেই পুরাতন কথা! গণকেরা সকলে এক বাক্যে এই কথা বলিয়া আসিতেছে। এমন কি তাহার পিতা যে এখনো তাহার বিবাহ দেন নাই, তাহার কারণও এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী। কোষ্টির গণনায় পঞ্চদশ বৎসরে শক্তি স্বয়ম্বরা হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইবে,

পিতা সেই জন্য তাহার বিবাহে নিশ্চেষ্ট, তিনি জানেন ঠিক সময়ে কোষ্টির কথা সফল হইবেই। শক্তিরও এতদিন পর্য্যন্ত ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজ সে জানিয়াছে, সমস্ত মিথ্যা, তাহার রূপ মিথ্যা, কোষ্ঠি মিথ্যা, আশা কল্পনা সমস্ত মিথ্যা। সুতরাং আহ্লাদের পরিবর্ত্তে মুসলমানের এই কথায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "অনেক শুনিয়াছি আর না। সাধুজনের মুখে এরূপ উপহাস শোভা পায় না। একজনের হৃদয় চাহিয়া যে পায় নাই, শত শত রাজা মহারাজার হৃদয় চাহিয়া সে পাইবে কি করিয়া!"

মুস। উপহাস নহে। সুখ দুঃখ মাপিতেই বিধাতা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন, ক্ষমতা তোমার দাসস্বরূপ,—তুমি রাজরাজেশ্বরী—"

শক্তি একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিল, তাহার মধ্য দিয়া নৈরাশ্যাপমানের তীব্রজ্বালা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে বলিল "বিধাতা আমাকে ক্ষমতাশালিনী করিবেন, এক দিন আমিও এইরূপ মনে করিতাম! কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা বামনের দুরাশা মাত্র। দরিদ্র কন্যা শক্তিময়ী রাজরাণী হইবে কিরূপে?"

মুসল। মৎস্যগন্ধা রাজরাণী, রাজমাতা হইল কি করিয়া? আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এই সুবিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত তোমারি ক্ষমতা প্রভাবে চালিত হইতেছে, শক্তিময়ী রাজরাজেশ্বরী বঙ্গেশ্বরী।"

শক্তি স্তম্ভিত হইল, মুসলমানের স্বরে সত্য প্রতিভাত। মুহূর্ত্তের জন্য সে তাহার অপমানবেদনা, নৈরাশ্যকষ্ট ভুলিয়া কৌতূহলোদ্দীপ্ত হৃদয়ে বলিল—"আমি বঙ্গের ভাগ্য পরিচালনা করিব! আমি বঙ্গেশ্বরী! ফকিরজি! অত আশা আমার নাই, কখনো ছিল না; যাহা ছিল তাহা অত উচ্চ নহে, তাহাও ভাঙ্গিয়াছে।"

মুসলমান কহিল—"তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন তাই ভাঙ্গিয়াছে। সামান্য প্রেমের দাসত্ব করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে,—সুলতান পুত্র তোমার প্রেমে উন্মাদ; তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহেন,—আমি তাঁহার দূতস্বরূপ তোমার নিকট আসিয়াছি।"

শক্তি এতক্ষণ মুসলমানের কথা ঠিক ধরিতে পারে নাই—তাহার মনের দেবতাকেই সে মুসলমানের কথার লক্ষ্য ভাবিতেছিল,—সে মনে করিতেছিল,—মুসলমান বলিতেছে, এখনো তাহার আশা নিভে নাই, সে এখনো গণেশদেবের পত্নী হইবে, তাই সে তাহার কথায় বিশ্বাস করিতে ভরসা পায় নাই; কিন্তু যখন বুঝিল, মুসলমান অন্য কথা বলিতেছে—সুলতানপুত্র তাহার হস্তপ্রার্থী,—তখন আর সে কথায় শক্তি বিস্মিত হইল না; বা অবিশ্বাস করিল না; শক্তি দেখিল তাহার চরণ তলে বিপুল সাম্রাজ্য লুণ্ঠিত; আর কি দেখিল? দেখিল—রাজকুমারের নিকট তাঁহার মাতার নিকট এখন সে আর নিতান্তই দীন হীন নহে; সে এখন তাঁহাদেরও ভাগ্যনিয়ন্তা; ইহাতে সে যেমন গর্ব্বময় আহ্লাদ অনুভব করিল, এমন রাজরাজেশ্বরী হইয়াছে বলিয়া নহে।

বাল্যকাল হইতে শক্তির হৃদয়ে দুই প্রবৃত্তি বলবতী, রাজকুমারের প্রতি ভালবাসা

এবং বড় হইবার ইচ্ছা। এই দুই ভাবকে এতদিন ধরিয়া একত্রে তাহার হৃদয় শোণিতে শক্তি পোষণ করিয়া আসিতেছিল, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একটি আশা তাহার ভাঙ্গিয়াছে, রাজকুমার আর তাঁহার নহেন; কিন্তু ঐশ্বর্য্যের হস্ত তাহার প্রতি এখন প্রসারিত; সে তাহাকে বরণ করিবে না উপেক্ষা করিয়া ফিরিবে? শক্তি খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল—"কিন্তু তিনি যে মুসলমান; আমি যে হিন্দু।"

মুসল। উহা মনের ভ্রান্তি মাত্র। ভগবান ত একই। সকলেই ত তাঁহাকে ডাকিতেছি—নামভেদে কি আসে যায়!

শক্তি তাহার কথা মন দিয়া শুনিতেছিল না; সে ততক্ষণ মনের ভিতর মন দিয়া দেখিল, ঐশ্বর্য্যের আলিঙ্গনে তাহার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি নাই, রাজকুমার নহিলে তাহার সমস্ত বৃথা। সে বলিল "কিন্তু আমি তাহাকে চাই।"

উত্তর হইল—"পাইবে না।"

"কখনো না?"

"কখনো না।"

"ঠিক বলিতেছ?"

ঠিক বলিতেছি—। সে তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না। এখন বল সুলতানী —হইবে——না——"

তাহার কথা শেষ না হইতেই শক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আমি চলিলাম; কাল উত্তর দিব।"

সম্পাদকের চিত্রচয়ন।

একটী মেয়েলী পুরুষ।

ফ্রান্সের একটী প্রসিদ্ধ লেখিকা—জর্জ্জ স্যাণ্ড, পুরুষের পরিচ্ছদে মেয়েলী লজ্জা, সংকোচ আবৃত করিয়া, পৌরুষিক স্বাধীন বিহার অবলম্বন করিয়া মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রকৃতি তাঁহাতে রমণী গড়িতে গিয়া কতকপরিমাণে পুরুষ গড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আর এক স্থলে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছিল। সেই ফরাসীস্‌দের গৃহেই আবার পৌরুষিক মেয়ের পরিবর্ত্তে একটী বিচিত্র মেয়েলী পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। লাবে ডি শোয়াসী একজন পুরোহিত, মিশনারী, চর্চ্চসম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত ইতিহাস লেখক এবং ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমির বর্ষীয়ান্ সভ্য। কিন্তু হইলে কি হয়,

তাঁহার জীবনটা আগাগোড়াই মস্কারা। অতি শিশুকাল হইতে পৌরহিত্যের জন্ত অভিপ্রেত হইয়া তাঁহার কেশের শিরোভাগ মুণ্ডিত হইয়াছিল। অথচ তিনি শৈশবে পুরোহিতোপযোগী কোনরূপ শিক্ষা পান নাই। তাঁহার তরলহৃদয়া মাতার শিক্ষার দোষে কোনরূপ গম্ভীর ভাব তাঁহার হৃদয়ে ঠাঁই পাইবার যো ছিল না। তিনি রমণীর ন্তায় সুন্দর কোমল মুখশ্রী এবং বেশবিন্তাস ও দর্পনের প্রতি অতিমাত্র আসক্তি লইয়া জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহার এই স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে যথাসাধ্য প্রশ্রয় দিয়া তাহার বৃদ্ধির সবিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। শোয়াসী বৃদ্ধবয়সেও তাঁহার মাতার এই শিক্ষার কোন দোষ দেখিতে পান নাই, বরঞ্চ তারিফ করিয়া লিখিয়াছেন "আমার মা আমাকে এমন ভালবাসিতেন যে আমাকে দিনরাত সুন্দর সুন্দর কাপড় পরাইয়া সাজাইয়া রাখিতেন। তাঁহার ভারি ইচ্ছা ছিল যে লোকে তাঁহাকে অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী মনে করে। আমি তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সে জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু একটী ৮।৯ বৎসরের ছোট ছেলে সঙ্গে দেখিলে লোকে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অল্পবয়স্কা ভাবিবে এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহার সহিত আমাকে সব জায়গায় লইয়া যাইতেন। চতুর্দ্দশ লুইর বালক ভ্রাতা সপ্তাহে দুই তিন দিন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মা আমাকে সেই সময় বালিকার বেশে সাজাইতেন, আমার কাণ বিঁধাইয়া কাণে হীরকালঙ্কার পরাইয়া দিতেন, গালে কৃত্রিম তিল রচনা করিয়া দিতেন; এক কথায় আমাকে নানারূপ বেশবিন্তাসকৌশল ও মেয়েলী হাবভাব অভ্যাস করাইতেন, যে গুলি চট্ করিয়া দখল হয় কিন্তু অতি কষ্টে ছাড়া যায়।"

শোয়াসী ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গৃহে তাঁহার মাতার নিকট ছিলেন, এবং ততদিন প্রায়ই বালিকার বেশ পরিধান করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ২৩ বৎসর তখন তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার মাতার ধন সম্পত্তি বিভাগ কালে শোয়াসীর স্বভাবের একটী বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের পর যুদ্ধলব্ধ ধনাদি বিভাগকালে এখিলিস্ যেমন প্রথমেই অস্ত্রগুলিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন শোয়াসী সেইরূপ তাঁহার মাতার অলঙ্কারগুলি আপনার ভাগে গ্রহণ করিলেন। শোয়াসী বলিতেছেন "আমরা তিনজনেই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ইতিপূর্ব্বে দুই চারিটা আংটী ও ইয়ারিং ছাড়া আর কিছু ভাল গহনা পাই নাই, তাহাদের মোট-দাম হয়ত দুইশত টাকা, আর এখন যে গহনা পাইলাম তাহার এক একটীর দাম পাঁচহাজার দশহাজার। আহা এই সব গহনা পরিয়া আমি কেমন চমৎকার রূপসী রমণী সাজিতে পারিব।" ইহার পরের কয় বৎসর শোয়াসী স্বাধীনতা লাভ করিয়া মনের সাধে আপনার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ছেলেবেলায় সকলে তাঁহাকে বলিত আহা ছেলেটী কি সুন্দর, মেয়ে সেজে কি সুন্দর দেখাচ্ছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই কথাগুলি শোয়াসীর মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং এখনও যাহাতে লোকে এইরূপ বলে ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। তাঁহার লেখাতে এবং কথাবার্ত্তায় তাঁহার সাজসজ্জার বর্ণনা করিতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন, এবং তাহার

প্রত্যেক খুঁটীনাটীটি পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ আগ্রহের সহিত বর্ণনা করিতেন তাহাতেই তাঁহার অন্তর্নিহিত প্রবল বেশবিন্যাস-অনুরাগ স্পষ্ট ব্যক্ত হয়। অনেক সময় লোকে কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সুবিধার জন্য স্ত্রীবেশ গ্রহণ করে। শোয়াসীরও যে সে দোষ ছিল না তাহা নহে কিন্তু তিনি তাহার জন্য স্ত্রীবেশ গ্রহণ করিতেন না। মুকুর ও স্ত্রীলোকের রমণীয় পরিচ্ছদই তাঁহার বাঞ্ছিত বস্তু। তাঁহার সুখের চরম আদর্শ এই যে তিনি সুন্দর বসনে ভূষিত হইয়া আয়নার কাছে বসিয়া মুখ দেখিবেন, কোথাও বা কপালের চুল একটা সরাইয়া দিবেন কোথাও বা একটী অলকগুচ্ছ কপালে টানিয়া দিবেন এবং তাঁহার চারিপার্শ্বে তাঁহার রূপমুগ্ধ বন্ধুবর্গ বাহবা দিবে, তাঁহাকে স্বর্গের অপ্সরার সহিত তুলনা করিবে।

পূর্ব্বের সহিত এখনকার সময়ের তুলনা করিলে এখনকার নীতিভাবের অভাব সম্বন্ধে আমাদের নিন্দা করিবার কিছু থাকে না। রমণীর বেশে কাউন্টেস্ ডি সাঁসী এই নাম ধারণ করিয়া শোয়াসী কয়েক বৎসর ধরিয়া Faubourg Saint-Marceau তে একটী বাটী ভাড়া করিয়া বাস করিতেন। সেখানে গাড়ী ঘোড়া রাখিয়াছিলেন, গির্জ্জায় আসন নিযুক্ত করিয়াছিলেন—এমন কি উৎসবের দিনে গির্জ্জার দানাধার তিনিই লোকের কাছে লইয়া যাইতেন অথচ সকলেই জানিত তিনি বাস্তবিক কে। কিছুদিন পরে তাঁহাকে এইরূপ ব্যবহারের জন্য শাসিত করিয়া দেওয়ায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন কিন্তু তাঁহার প্রিয় বেশ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। একদিন তিনি এই বেশে থিয়েটারে ডফিনের বক্সে বসিয়া আছেন এমন সময় M. de Montausier বক্সে আসিয়া তাঁহাকে উপহাস ও অবজ্ঞাসূচক স্বরে বলিলেন "মহাশয় বা মহাশয়া আপনাকে কি বলিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি স্বীকার করিতেছি আপনাকে অতি সুন্দর দেখাইতেছে কিন্তু যখন দৈবক্রমে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার দুর্ভাগ্য আপনার ঘটে নাই তখন কি আপনি তাহাদের বেশগ্রহণ করিতে লজ্জিত নহেন? যা'ন আপনি অন্যত্র গিয়া লুকাইয়া থাকুন। ডফিন এরূপ বেশ মোটেই পছন্দ করেন না।" শেষ কথাটা ঠিক নহে, কারণ বালক ডফিন যে বেশটা অপছন্দ করিতেন তাহা নহে কিন্তু এই শেষ কথাই শোয়াসীর মনে লাগিল। রাজানুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা অধিকতর দুর্ভাগ্য শোয়াসী আর কল্পনা করিতে পারেন না—ইহাও তাঁহার মাতার শিক্ষার ফল,—সুতরাং রাজধানী ত্যাগ করাই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। তাহার পর তিনি বেরী প্রদেশে একটী প্রাসাদ ক্রয় করিয়া কাউন্টেস্ ডে বারে নাম গ্রহণ করিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। তাঁহার এই তিন বৎসরের জীবন একখানি পূর্ণ প্রহসন। দেশের বড় বড় লোক, বিশপ, ভিকার, লেফনাণ্ট-পত্নী প্রভৃতির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, দিনের ভিতর পাঁচ সাত বার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ও মুগ্ধ হৃদয়ে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া করিয়া তাঁহার সময় কাটিত। এখানে কেহই তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া সন্দেহ করে নাই। এই সকল নিরীহ লোকদিগের সরলতার অপব্যবহার করিয়া তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন,

এখনকার দিন হইলে তিনি তাঁহার জন্ম আইনে বিশেষ দণ্ডনীয় হইতেন। অধিক বয়সে যখন তাঁহার মতিগতি প্রায় অনেকটা ফিরিয়াছে তখনও তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি বন্ধুদের নিকট এই সব গল্প বলিতে অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতেন। বন্ধুরা অবাক হইয়া শুনিতেন, এমন কি মাডাম লাম্বার্ট প্রভৃতি দার্শনিক রমণীগণও তাঁহাকে এই সব গল্প বলিতে প্রশ্রয় দিতেন। তিনি ৩৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপ অপদার্থ জীবন অতিবাহিত করিলেন। এখন পর্য্যন্ত একরূপ ঔষধলেপন দ্বারা দাড়ি গোঁফ উঠিতে দেন নাই। কিন্তু তাঁহার মুখশ্রী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই সময় আর একটী ব্যসন তাঁহাকে পাইয়া বসিল। শোয়াসী নিজেই বলেন, একটা প্রবল প্রবৃত্তিতে আর একটা প্রবল প্রবৃত্তির অবসান হয়। তিনি জুয়াখেলা শিখিলেন। ইটালীতে যাইয়া জুয়াখেলা আরম্ভ করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

এই সময় তিনি হঠাৎ অত্যন্ত পীড়াক্রান্ত হইলেন। জানিলেন মৃত্যু সন্নিকট, শুনিতে পাইলেন ডাক্তারেরা বলিতেছে আর দুই ঘণ্টার অধিক বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তখন তাঁহার গতজীবনের সম্পূর্ণ চিত্রখানি অরঞ্জিতরূপে মানশ্চক্ষে উদয় হইল, তিনি তাহার একান্ত হীনতা উপলব্ধি করিয়া দেবতার বিচার ভয়ে ভীত হইলেন। কিছুদিন পরে আরোগ্য লাভ করিলে তিনি অবিলম্বে কলেজ অফ্ ফরেন্ মিসনে যোগদান করিলেন। তাঁহার জীবন্ত কল্পনা বলে তিনি মধ্যবর্ত্তী সোপানগুলি অতিক্রম করিয়া অবিশ্বাস হইতে একেবারে প্রগাঢ় বিশ্বাসে উপনীত হইলেন। তাঁহার গুরু এবং বন্ধু ডাঁগো বলেন হায়! আমি এই লঘুচেতাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রতীত করাইতে না করাইতে সে একবারে মন্দিরের ঘণ্টা গুলির মধ্যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রভাব বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। এই সময় শ্যামদেশ হইতে চতুর্দ্দশ লুইর নিকট সংবাদ আসিল যে, শ্যামদেশে কতিপয় মিসিনারি প্রেরণ করিলেই সেখানকার রাজা ও প্রজাগণের খৃষ্টানধর্ম্ম পরিগ্রহণ সুনিশ্চিত। শোয়াসী তাহা শুনিয়া অমনি ইহাই তাঁহার ব্রত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি এতদিন তাঁহার শরীরে পুরোহিতের কতকগুলি চিহ্ন ধারণ করিতেন মাত্র, তখনও পৌরোহিত্যে একেবারে দীক্ষিত হন নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু বাধা দেখিতে পাইলেন না। সেখানে পৌঁছিয়া দীক্ষিত হইয়া লইলেই চলিবে। তিনি এই কর্ম্মের অধ্যক্ষতাভার প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই আর একজনকে সে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার সহায়ক নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর।

শোয়াসীর পুরোহিতের আকৃতির অন্তরালে প্রাচীন ফরাসীদিগের প্রকৃতি নিহিত ছিল। তাহারা কখন কোন কর্ম্মে ইতস্তত করিত না, বিপদকে ভয় করিত না, সমুদয় অজ্ঞাতকে বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া ঈশ্বর বা অদৃষ্ট নক্ষত্রের উপর নির্ভর করিয়া কিম্বা মুহূর্ত্তের বলবতী উদ্দীপনায় গৃহত্যাগ করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনার্থে প্রস্তুত ছিল। শোয়াজী তাঁহার ডায়ারীর এক স্থানে বলিয়াছেন

যে তাঁহারা ফরাসীধরণে যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন। উপমাটী ঠিক হইয়াছিল অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। জাহাজে তিনি যে ডায়ারী লিখিতেন তাহাতে তাঁহার আত্মবিবরণ অতিশয় কৌতুকপ্রদ। শোয়াসীর ন্যায় মধুর-স্বভাব যাত্রী কল্পনা করা যায় না। কখন বিরক্তি নাই, কখন এই কর্ম্মে আসিয়াছেন বলিয়া অনুতপ্ত নহেন, কখনও কোন জিনিসের ভালদিক দেখিতে অক্ষম নহেন, কিছু-দিনের মধ্যেই জাহাজে নাবিকদের কথাবার্ত্তায় সুপটু। "এখানে নাবিকী কথা না ব্যবহার করে পারা যায় না, আমি আমার চাকরকে বলি আমার গলায় কলারটা নোঙ্গর করে দাও।" তিনি জাহাজের বিবরণের একস্থানে বলিতেছেন, "ফাদার ভিড্‌লুর সহিত আমি পর্টুগীজ ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করি। বাসে আমাকে পবিত্র আজ্ঞার অর্থ বুঝাইয়া দেন, ফাদার ডেফঁতনীর সহিত আমি দূরবীক্ষণের সাহায্যে চন্দ্র দর্শন করি। জাহাজের এন্‌-সাইনের সহিত সামুদ্রিকপথের বিষয় কথা কহি, তাহার এ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। এ সমুদয় বিষয়েই আমি বিনা আয়াসে ডেকে বেড়াইতে বেড়াইতে সকলের সঙ্গে আলাপ করি। যদি কখন বিশেষ সুখের জন্য লালায়িত হই তবে মানুয়ে নামক মিস-নারিকে ডাকিয়া তাঁহার গান শুনি। তাঁর চমৎকার গলা এবং লুলির ন্যায় সঙ্গীত শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। তুমতি জান আমি সঙ্গীত কিরূপ ভালবাসি, আর এই মনোহর কলাবিদ্যার চর্চ্চা আমাদের মন্দিরে নিষিদ্ধও নহে। স্বর্গ আর কি কেবল অনন্ত সঙ্গীত।"

তাঁহার স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে তাঁহার কার্য্যগুলি অন্যায়ের প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন নহে তাঁহার চঞ্চল প্রকৃতিই যত অনর্থের মূল।

তাঁহার চরিত্র তাঁহার চতুপার্শ্বস্থ ঘটনার একটী প্রতিবিম্ব। এই রূপ চরিত্রের লেখ-কের লেখা হইতে সাময়িক চলিত ভাষার অনেকটা আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা হইতে বোঝা যায় যে, তিনি মানুষ ও ঘটনার সত্যপ্রকৃতি বেশ বুঝিতে পারি-তেন কিন্তু চঞ্চলতা বশতঃ কষ্ট করিয়া গভীরে প্রবেশ না করিয়া উপরের ভাবটুকু গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন।

শোয়াসী বিনয়ী, তিনি অন্য লোকের মনে আপনার মহত্ব অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিতেন না এবং বাস্তবিক যে গুণের তিনি অধিকারী তাহাপেক্ষা অধিক গুণে আধিপত্য স্থাপন করিতেন না। তাঁহার কথোপকথন সম্বন্ধে তিনি বলেন "যে বিষয়ে কথা হইতেছে সে বিষয় যদি বেশ ভাল জানি তবে নম্রকথায় ও মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে সে সম্বন্ধে আলাপন করি তাতে লোকের মনে কথাগুলি খুব লাগে, আর যদি চুপ করিয়া থাকি তবে লোকে মনে করে যে এ বিষয়ে আমার কথা কহিবার কোন ইচ্ছা নাই বলিয়া চুপ করিয়া আছি কিন্তু আসলে যে এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না বলিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছি তাহা কখন সন্দেহও করে না।"

যাঁহারা দীর্ঘকাল ব্যাপী সমুদ্র যাত্রা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন

যে ইহার ন্যায় ক্লান্তিজনক ব্যাপার আর কিছুই নাই। অল্পদিনের মধ্যেই আপনার ও সহযাত্রীবর্গের সঙ্গ বিরক্তিকর মনে হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট অসহ্য হইয়া পড়েন, প্রত্যেকের তিল দোষ তালরূপে অপরের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। ইহার পর পুনরায় সাক্ষাতের পূর্ব্বে দীর্ঘকাল ব্যবধান না থাকিলে পরস্পরে আর পরস্পরকে দেখিয়া সুখলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু শোয়াজী এই বিধি হইতে বর্জ্জিত। তিন মাস সমুদ্র যাত্রার পরেও তিনি বলিয়াছিলেন "আমরা যদি শীঘ্র শ্যামে না পৌঁছিতে পারি তবে সুরাটে শীতকাল যাপন করিব। আমাদের পরস্পরকে এত ভাল লাগে যে যত দিন একসঙ্গে থাকিতে পারি ততই ভাল।" পাঁচ মাস পরেও আবার ঐ কথা বলিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহাদের শ্যামে প্রচারোদ্দেশ্যে যাত্রা সব ফাঁকিজুঁকিতে দাঁড়াইল। কিন্তু শোয়াসী সেখানে ডাঙ্গায় নামিয়াই দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এখন হইতে তাঁহার জীবনের শেষ ৩৭ বৎসর কাল তিনি ক্রমাগত নানাবিধ বিষয়ে লিখিয়া কাটাইয়াছিলেন। ডুক্লো বলেন তাঁহার সুখপাঠ্য লেখায় রমণীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যভাব লক্ষিত হয়, আর তাহার সহিত তাঁহার জলন্ত বাক্যবিন্যাস ক্ষমতাও মিশ্রিত ছিল। তাঁহার লেখায় বৃথা বাগাড়ম্বর বা পাণ্ডিত্যের ভাণ লক্ষিত হইত না যদিও যে বিষয়ে লিখিতেছেন, সে বিষয়ে যে কতকটা অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা বুঝা যাইত। তাঁহার সময়ে বইগুলি খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রধানতঃ মহিলাগণের টেবিলের উপরই তাঁহার বই দেখা যাইত। মহিলাদের জন্যই বইগুলি বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছিল। তিনি যে বিষয়ই লিখুন না কেন, এমন একটা ঘোরো রকম অসঙ্কোচ জলদগতিতে লিখিয়া যাইতেন, যে তাহা অত্যন্ত মনোহারী হইত। খুব গম্ভীর বিষয় ও খুব লঘু বিষয় উভয়তেই তাঁহার সমান চটুল শ্রী লক্ষিত হয়। তাঁহার চর্চ্চ সম্বন্ধীয় ইতিহাসের শেষ কথা এই "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার ইতিহাস লেখা শেষ হইল, এখন আমি ইহা শিখিতে আরম্ভ করিব।" তিনি একটা কথা লিখিতে তাহার মধ্যে আর দশটা কথা আনিয়া ফেলিতেন। রাজার কথা লিখিতে লিখিতে নিজের কথা অনেক বার বলিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে লিখিতেছেন "তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ যে রাজার বিষয় বলতে বলতে আমি অসঙ্কোচে নিজের কথা অনেক বলে যাচ্ছি—আমার সেটা আদপে অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু হাতে কলম থাক্‌লে আমি একটু বকর বকর না করে থাক্‌তে পারি নে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে অধিকাংশ সময় রাজার কথাই বলব তবে মাঝে মাঝে আমাকে যদি এক কোণে দেখ্‌তে পাও ত পাশ কাটিয়ে যেও।"

শোয়াসী অন্য লোকের নিকট হইতে কথা আদায় করিতে খুব মজবুত ছিলেন। তিনি যে লোকের জীবন আখ্যায়িকা লিখিতেছেন সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে জানিত তিনি শুধু চর্চ্চ সম্বন্ধীয় ইতিহাস লিখিতেছেন সুতরাং বিশেষ সাবধানী লোকেরাও তাঁহার নিকট অবাধে সমস্ত মতামত ব্যক্ত করিত। তিনি লিখিতেছেন

"আমি একটুও ঔৎসুক্য না দেখিয়ে অমনি সামান্য কৌতূহলের ভাবে প্রশ্ন করি। এই রকম করে রোজকে মাজার্‌যাঁর সময়কার গল্প বলাই, ব্রিয়েনের সঙ্গে আলাপ করি; সেই বিখ্যাত গোল্পে ডুপ্লেসি বেলিয়েরকে মনের সাধে গল্প করে যেতে দিই; কখন বা বুড়ো বঁতঁর কাছ থেকে একটা কথা আদায় করি, জয়োসের কাছ থেকে বারোটা আদায় করি, আর শামরঁতের কাছ থেকে বিশটা আদায় করা যায়, কেননা সে কারো সঙ্গে কথা কইতে পেলে বেঁচে যায়, যেহেতু হাতেপায়ে বাতে ধর্‌লে যেমন মুখ খুলে যায় এমন আর কিছুতে নয়"। এইরূপ কথোপকথনের অল্পক্ষণ পরেই যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় তাহা মোটামুটি সঠিক হইবারই সম্ভাবনা। তাই শোয়াসীর এই বর্ণনাগুলি তৎসাময়িক ইতিহাসের পক্ষে খুব মূল্যবান।

তাঁহার সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের ন্যায় শোয়াসীও লোকের চিত্রাঙ্কণে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাজার্‌যাঁর মৃত্যুর পর যে চারিজন লোকের পদোন্নতি হইয়াছিল সেই চারিজনের চিত্রই তিনি উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। লিখিবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন সুতরাং দৃঢ় হস্তে চিত্রগুলি অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। মাজার্‌যাঁর জীবনকালে যাহারা তাঁহার শাসনে নিজের নিজের প্রকৃতি দমন করিয়া রাখিয়া স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছদ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা আর আত্মগোপন অনাবশ্যক মনে করিয়া প্রত্যেকেই নিজের যথার্থ মূর্ত্তি প্রকটিত করিল। "উচ্চাভিলাষী ফুকে নানারূপ চক্রান্ত করিতে লাগিল এবং দর্প করিয়া কহিল "কোন্ উচ্চ শৃঙ্গে আমি আরোহণ করিতে না পারি?" কৃপণ টেলিয়ে অর্থের স্তূপ জমাইতে লাগিল। অহঙ্কারী কলবেয়ার কপাল কুঞ্চিত করিল। ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র লিওন তাহার দুষ্ক্রিয়াসমূহ আর গোপন রাখিবার আবশ্যক দেখিল না"। তাহার পরেই চারিজনের বিস্তারিত ছবি। কলবেয়ারের বর্ণনার একাংশ উদ্ধৃত করিব:—"জ্যাঁ বাপ্টিষ্ট কলবেয়ারের মুখে একটি স্বাভাবিক অপ্রসন্নতা বিরাজ করিত। তাঁহার কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুদ্বয় ও ঘন কৃষ্ণ ভ্রূদ্বয়ে মিলিয়া তাঁহাতে একটা কাঠিন্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছিল এবং প্রথম দর্শনে তাঁহাকে নিতান্ত অসামাজিক ও বিপরীত প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু পরে একটু ভাল রকম আলাপ হইলে দেখা যাইত লোকটা শিষ্টাচারী, মানুষের অনুরোধ রাখে এবং তাঁহার কথার উপর নির্ভর করা যায়। তাঁহার ঘোর অধ্যবসায়ও জ্ঞানলালসা তাঁহার জ্ঞানের একান্ত অভাবকে পূর্ণ করিত। তিনি যে পরিমাণে অজ্ঞ ছিলেন সেই পরিমাণে পাণ্ডিত্যের ভাণ করিতেন এবং বরাবর ঠিক যে সময়ের যেটা যোগ্য নয়, উপমাস্বরূপ সেই সময় সেই ল্যাটিন বচনটী আওড়াইতেন—— এগুলি তাঁহার মুখস্থ করা ছিল, এবং তাঁহার মাহিনাকরা পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সেইগুলির অর্থ করিয়া দিয়াছিল।"

শোয়াসী রমণীর চিত্রে আরও পটুতা দেখাইয়াছেন। তিনি মাডাম ডে লা ভালিয়েরের

যে চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কলবেয়ায়ের চিত্রের পাশে রাখিবার উপযুক্ত।

"তাঁহার চমৎকার বর্ণ, কমনীয় কেশ, মধুর হাসি, সুনীল নয়ন আর সেই সঙ্গে এমন একটী কোমল ও নম্রভাব ছিল যে তাঁহাকে দেখিবামাত্র যুগপৎ ভক্তি ও স্নেহের উদয় হইত। বাদ বাকী তাঁহার একরত্তি মন ছিল, তাহাকে তিনি সর্ব্বদা পড়াশুনার দ্বারা উন্নত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, বা কোন বিষয়ে একটা বিশেষ মতামত ছিল না, যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টাপেক্ষা তাহার বিষয় ভাবিতে বেশী তৎপর ছিলেন। আপনাতে ও আপনার একমাত্র ভালবাসায় মগ্ন থাকিয়াও তিনি আপনার সুনামকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়াছিলেন, এবং পাছে তাঁহার কিছু মাত্র দুর্ব্বলতা বাহিরে প্রকাশ পায় এই ভয়ে অনেক বার মৃত্যুকে বরণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ও শান্ত। তিনি যে অন্যায় করিতেছেন ইহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত না হইয়া বরাবর আশা করিতেন যে ন্যায় পথে ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার এই সাধু ভাবের জন্য তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন ঈশ্বরের করুণাশীষ বর্ষিত হইয়াছিল, এবং তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সানন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।"

শোয়াসী অনেকটা ক্ষমার্হ। তাঁহার প্রকৃতি চপল কিন্তু কলুষিত নহে, আর সকল অবস্থাতেই তাঁর একটা স্বাভাবিক হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর কাল তিনি প্রাণপণে গম্ভীর হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যদিও তিনি কখনই অমায়িক ভিন্ন আর কিছু হইতে সক্ষম হন নাই। নিতান্ত শৈশবকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত কিন্তু শতাধিক বৎসর বাঁচিলেও কেহ তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিত না। যাহা হউক তিনি চমৎকার ভাষায় লিখিতেন ও কথা কহিতেন এবং তাঁহার লেখার মধ্যে অন্ততঃ একখানি গ্রন্থ ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্থান পাইবার যোগ্য।

স্বরলিপি।

কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে "ক্ষ্যাপার প্রতি" শীর্ষক যে গান প্রকাশিত হইয়াছিল নিম্নে তাহার স্বরলিপি প্রদত্ত হইল। তাহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকের অন্তরার একইরূপ সুর এবং চতুর্থ শ্লোকের সুর, তৃতীয় শ্লোকের অনুরূপ, সেই জন্য উহাদের স্বতন্ত্র স্বরলিপি করা হয় নাই।

বাউলের সুর—একতালা।

আ
র১ [গ১ র১ গর১ । স১ স২ । স১ স২ । স১ সর১ গ১ ।
ক্ষ্যা [পা তু ই আ ছিস্ আ পন খে য়া ল

গ১ গ২ ॥ {গ১ মগ১ র১}] গ২ গ১ । গ১ গ২ । ম১ ম২ ।
ধ রে {— — ক্ষ্যা}] — যে আ সে তো মার
(শেষ)

ম১ গম১ পম১ । গ৩ । গ৩ । প১ প২ । ম১ ম১ পম১ ।
পা শে — — — স বাই হা সে —

গম১ গ২ । র১ স২ । স২ র১ ॥ —২ প১ । ধ১ ধ১ র্স১ ।
দে খে তো রে — ক্ষ্যা — জ গ তে —
(আ-প্র)

র্স১ র্স২ । র্স১ র্স২ । র্স১ র্সর্র১ র্গ১ । র্র১ র্স১ ন১ ।
যে যার আ ছে আ প ন কা জে —

ধ১ ধ১ র্স১ । ন১ ধ১ নোধ১ । প৩ । প১ স১ স১ ।
দি বা — নি শি — — — তা রা

র১ ম১ ম১ । প১ প২ । নো২ ধ১ । প১ প১ ধ১ ।
পা য় না বু ঝে তুই কি খুঁ জে —

প১ প২ ম১ । গ১ গ২ । গ৩ । ম২ প১ । মপ১ ম২ । গ৩ । গ২ র১ ॥
ক্ষে পে — বে ড়াস্ জ ন ম ভো — রে — ক্ষ্যা
(আ-প্র)

[—৩। —১ স২। স২ রো১। রো১ রো২। স২ রো১। রো১ স২। স১
[— — তোর নাই অ ব সর নাই ক দো সর ভ

সরো২ গো১। রো১ স২।]—৩। —১ গ১ গ১। ম২ ম১।
বে র মা ঝে]— — তো রে চিন্ তে

ম১ প১ ম১। গ১ গম১ প১। ম১ গস১ র১। গ১ গ৩।
যে চা ই স ম য় না পা ই না নান্

র১ স২। —২ প১। ধ১ ধ১ স´১। র´১ স´১ স´১। স´১ স´১ র১।
কা জে ও রে তু ই কি — শো না তে —

স´১ স´র´ গ´১। র´১ র্গ´র´১ স´১। ন১ ধ´১ স´১। ন১ ধ১ নোধ১।
এ ত — প্রা তে — ম রি স্ ডে কে —

প৩। প১ স১ স১। র১ ম২। প১ নো১ নোধ১। পম১ গর১ স১।
— — এ যে বি ষম জ্বা লা — — — —

স১ স১ স১। র১ ম২। প১ প২। নো১ নো১ ধ১।
এ যে বি ষম জ্বা লা ঝা লা —

প১ প১ ধ১। প১ প১ ম১। গ১ গ২। গ৩। ম২ প১। মপ১
ফা লা — দি বি — স বায় পা গ ল ক

ম২। গ৩। গ২ র১॥ —২ স১। স১ র১ ম১। গম১ প১
— রে — ক্ষ্যা — ও রে তু কি ই —

(আ-প্র)   (আ-প্র)

প১ । প১ প২ । পধ১ নো২ ধ১ । প১ প১ ধপ১ । ম১ গম১
এ নে ছিস্ কি — টে নে ছি স্ ভা বে

প১ । ম১ গ২ । গ২ গ১ । গ১ গ২ । গ২ গ১ । ম১ প২ ।
র জা লে — তা র কি মূ ল্য আ ছে

গপ১ ম২ । গ১ স১ র১ । গ১ গ২ । র১ স২ ।
কা রো কা ছে — কো ন কা লে ।

শ্রীসরলা দেবী।

মৃত্যু সঙ্গীত।

নববধূ।

কেন রে নীরব হল এ গৃহে সহসা
তোর নূপুর শিঞ্জিত রব মৃদু রুণ্‌রুণি,
কেন না জাগিল আর এ গৃহে তোমার,
নাসাগ্রেতে মুক্তাফল দোছুলা মুখানি!
যেন, নীরব নিশীথে মৃদু বাঁশরীর রব,
বারেক উঠিয়া গেল, সহসা থামিয়া,
যেন, গোধূলিতে চারুতার কনক মুহূর্ত্ত!
উজলি ক্ষণিক; গেল নিমেষে সরিয়া।
হায়! এক রাত্রে দুটী ফুল উঠেছিল ফুটে;
শুভ্রনিশি পৌর্ণমাসী আনন্দ বাসরে,
এক দিনে দুটী ফুল, ঝরে গেল টুটে,
কাঁদে দুটী শূন্যবৃন্ত গলাগলি করে!
কি আছে রহস্য গূঢ় ইহাতে নিহিত?
মরণ ছাড়াতে নারে, এমন সুহৃদ!

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সমাধি।

এই ঘন তরুলতা ঘন চারুবন,
কোন্ পাদপের তলে শীতল মৃত্তিকা কোলে
ঘুমায় এখনো মোর হৃদয়ের ধন।
নিবিড় পল্লব দিয়া হুহুস্বরে কাঁপাইয়া
পথিকেরো পথভ্রান্তি করে সমীরণ.
এমন গহিন স্থানে আছে শুয়ে নিরজনে,
বুঝি তার হৃদিতন্ত্রী কাঁপিছে সঘন
কে জানিবে সেথা শুয়ে কি করে এখন ?

চারিদিকে গিরিশৃঙ্গ জমায় তুষার,
উন্নত সুশ্যাম কায় দেখে সবে ভয় পায়
এক বছরের শিশু—পাবে না সে আর !
গ্রাম্য কোলাহল-ধ্বনি কভু হেথা নাহি শুনি
প্রকৃতির মনোমত গেহ আপনার।
যে শিশু বোঝে না ভাষা মার মুখ পর আশা
মার বক্ষ ভয়হীন শুধু কাছে যার
সে কি বুঝে প্রকৃতির ভূষণ শোভার !

কি বুঝিব বিধাতার লীলাময় মন
ক্ষুদ্র বনলতা কোলে বন ফুল সুখে দোলে
তাহারে ধূলাতে ফেলে কি হল আপন।
লতার বাড়ায়ে মান নিজে ফুল কর দান
নিমেষে কাড়িয়ে লবে ভুলায়ে নয়ন
হৃদয়ের মর্ম্মটুটে যে আকুল ধ্বনি উঠে
তাহাতে টলে না তব হৃদয় আসন,
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা হউক পূরণ।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

মালতীমাধব ।

(৩)

মাধব বলিয়াছিলেন "কেবলমাত্র মহাদুঃখভোগের জন্য আমার এই অনিমিত্তক আসক্তি।"

মকরন্দ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন "তুমি নিরাশ হইও না, আমার বিশ্বাস মালতী তোমারই প্রতি অনুরক্ত, সেই যে পাণ্ডু কপোল প্রভৃতি প্রণয়লক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়াছিলে সে তোমারই জন্য।"

মাধব যদি রমণী হইতেন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করিতেন। যে স্থলে তাহার নিজের হৃদয়ে কোন আঁচ লাগে নাই, সে স্থলে রমণী তাহার প্রেমোন্মত্ত হতভাগ্য পুরুষের মানসিক উত্তাপের মাত্রাটা মনে মনে ঠিক দিয়া লইতে বিলক্ষণ সক্ষম, বরঞ্চ কথন কথন আত্মগরিমাপ্রযুক্ত ঠিকে ভুল হয়, কল্পনায় আঁকের পিঠে দুটো একটা শূন্যি বাড়িয়াও যায়, যে প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়ে নাই তাহাকেও শীকার বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু যেখানে তাহার নিজের সর্ব্বস্ব পণ সেখানে তাহার আত্মগরিমা পরাজিত হয়, কিছুতেই আর আত্মপ্রত্যয় হয় না, তাহার প্রিয়জনের নিকট হইতে প্রণয়ের প্রতিদান একান্ত প্রার্থনীয় বলিয়াই তাহা একান্ত দুর্লভ বোধ হয়। পুরুষের ঠিক বিপরীত ভাব। যে রমণীর প্রতি তাহার কোন আকর্ষণ নাই, সে রমণী যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট ইহা সে সহজে কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু তাহার নিজের অনুরাগস্থলে সে অল্পেতেই বিশ্বাস করে যে আকর্ষণটা উভয়তঃ; এই খানেই তাহার আত্মগরিমার বিচরণক্ষেত্র, অন্যত্র তাহার বিকাশ প্রায়ই নাই। তাই মাধব মকরন্দের আশ্বাসবাক্যের প্রতিবাদ করেন নাই, তাঁহার কথায় তিনি কতকটা প্রতীত হইলেন। তাহার পর যখন কলহংস আসিয়া তাঁহার ছবি দেখাইয়া বলিল মালতীই ইহা চিত্রিত করিয়াছেন, তখন আর মাধবের সংশয়মাত্র রহিল না, তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্বস্তচিত্তে বলিয়া উঠিলেন "সখা তোমার অনুমান তবে সত্য হইল।" ইহাই পুরুষ প্রকৃতি, এইরূপ সরল উদার বিশ্বাস পরায়ণ। পুরুষেরা প্র্যাক্‌টিক্যাল জীব, তাই নিজেকে অকারণ ক্লেশ দিতে নিতান্ত নারাজ। যখন বিশ্বাসের হাতে আত্মসমর্পন করিলে সুখী হওয়া যায়, তখন কেন সন্দেহকণ্টকে নিজেকে জর্জ্জরিত করা? কিন্তু নারীর মন তাহা বুঝে না। তাহার পদে পদে সন্দেহ, অবিশ্বাস। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই আপনার প্রতি স্বীয় প্রণয় পাত্রের সম্মানে আত্মসম্মান বলিষ্ঠ হয়, এবং তাহার অসম্মানে আত্মসম্মান ক্ষীণ হয়। কিন্তু পুরুষ বাস্তবিক যতক্ষণ প্রত্যক্ষতঃ অনাদৃত না হয় ততক্ষণ নিজের প্রতি হতাদর হয় না, আর নারী অনাদর-সম্ভাবনা কল্পনা করিয়াই আগেভাগে নিজেকে হতাদর করিয়া বসে। কিন্তু এ হতাদর সহজ বিনয়প্রসূত নহে, শুধু চর্চ্চাজনিত, কৃত্রিম।

কারণ তুমি যাহার প্রণয়াভিলাষী, তুমি তাহার শ্রেষ্ঠ সম্মান ভিখারী, এবং যে যাহা ভিক্ষা করে সে নিজেকে সেই দানের যোগ্যপাত্র জ্ঞানেই ভিক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং যোগ্যা অযোগ্যা প্রত্যেক রমণীরই যখন প্রণয়ের প্রতিদান বাঞ্ছনীয়, তখন কেহই বাস্তবিক নিজেকে অযোগ্যা মনে করে না, সকলেই নিজেকে তাহার প্রণয়ীর শ্রেষ্ঠ সম্মানার্হা বলিয়া বিশ্বাস করে ;—কিন্তু সেই বিশ্বাস পুরুষের হৃদয়েও ত সঞ্চালিত করা চাই, কিন্তু যদি তাহা না হয়,—যদি সে তাহার প্রেমার্হতা না দেখিতে পায়, সেই ভয়ে ভয়েই, সেই কাল্পনিক সম্ভাব্যঅনাদরের আঘাতেই রমণী আত্মপ্রসাদ হারায়, তখন সে অবিরত নিজের অযোগ্যতা মনে পোষণ করিয়া করিয়া, নিজের প্রতি ক্রমশঃ বাস্তবিকই নিতান্ত শিথিলশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে।

স্ত্রীপুরুষের চরিত্রের এই পার্থক্য মালতী ও মাধবে বেশ সুন্দররূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

মকরন্দোদ্যানে বকুলবীথীতে মালতীর ধাত্রী লবঙ্গিকার সহিত মাধবের যে কথোপকথন হইয়াছিল, মাধব তাহা প্রথমাঙ্কে বন্ধুর নিকট বিবৃত করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কে আমরা দেখিতে পাই, মালতীও সাগ্রহে, সোৎকণ্ঠে লবঙ্গিকার নিকট সেই আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতেছেন। মাধবের নিকট লবঙ্গিকা যে বকুলের মালা উপহার পাইয়াছিল, তাহা মালতীকে দেখাইল। মালতী তাহা হাতে লইয়া, ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া বলিলেন "ইহার এক পাশের রচনা এরূপ বিকল হইল কিরূপে ?"

"তোমারই দোষে।"

"কেন ?"

"তোমাকে দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হওয়াতে এমন হইয়াছে।"

মালতী অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন "মিথ্যা—তুমি আমাকে ভালবাস তাই এইরূপ আশ্বাস দিতেছ।"

লবঙ্গিকা মাধবের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে অনেকগুলি টীকা করিয়া আসিয়াছিল। সখীর নিকট বিবরণে তাহার বিস্তারিত ভাষ্য করিতেও ত্রুটি করিতেছে না। কিন্তু মালতী কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না, যে তিনি মাধবের জন্য যেরূপ ব্যাকুল, মাধবেরও তাঁহার প্রতি তদনুরূপ ভাব। লবঙ্গিকাও তাঁহাকে ক্রমাগত তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছে।

লবঙ্গিকা বলিল "তিনি তোমার প্রতি কিরূপ প্রেমপূর্ণ নেত্রে চাহিতেছিলেন দেখনি ?"

"কেমন করিয়া জানিলে প্রেমপূর্ণ, তাঁহার স্বাভাবিক চোখের ভাবই বোধ হয় ঐরূপ।"

লবঙ্গিকা হাস ছাড়িয়া দিয়া বলিল "তা বটে ; তুমিও বোধ হয় তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রতি চেয়েছিলে ?"

মাধব যে মালতীর-আঁকা স্বীয় ছবির পার্শ্বে তাঁহাকে আঁকিয়াছেন, লবঙ্গিকা তাহা এখনও সখীকে দেখায় নাই। এইবার দেখাইল এবং সে চিত্রাঙ্কন সম্বন্ধে মন্দারিকার নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল, বিবৃত করিল। মালতী ছবি দেখিলেন, তাহার নীচে মাধব যে দুইচরণ শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলেন, তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিল;—কিন্তু তবু তাঁহার আশ্বাস কোথায়? মুহূর্ত্ত পরেই কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন "হে মহার্ঘ! যে নারী তোমাকে কখন দেখে নাই, কিম্বা দেখিয়াও তোমার আকর্ষণ সম্বরণ করিতে পারিয়াছে সেই ধন্য।" ধন্য ভবভূতি! প্রতিদিন ঘরে ঘরে শত শত প্রেমিকের হৃদয় হইতে যে বাণী উত্থিত হইতেছে এ তাহারই ধ্বনি। শুধু একটী লোকই একটী বিশেষ লোকের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, এবং সে কহে—

"তোমা' ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভাল কি বাসিতে পারে?"

যখন তাহার পক্ষে ইহা হৃদয় দিয়া বুঝা অসম্ভব অথচ প্রত্যক্ষ দেখিতেছে সে ছাড়া পৃথিবীর বাকী সমস্ত লোকই তাহার প্রিয়জনের আকর্ষণ হেলায় ঠেলিয়া যাইতে পারিতেছে, তাহাকে না ভালবাসিয়াও অক্লেশে দিন কাটাইতেছে, তাহার মায়া বন্ধনে তিলমাত্র জড়িত হইতেছে না, আর তাহারই সুধু এই দশা! তখন আর সকলের ঔদাস্যে অসীম বিস্ময়ের উদ্রেক হয় এবং সেই ঔদাস্যকে অনেকটা বীরত্ব বলিয়া মনে হয়। তখন নিজের দৌর্ব্বল্যে, সেই-ব্যক্তিবিশেষের মায়াপাশ-ছিন্নকরিবার-অক্ষমতায় নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মে। অর্থাৎ যেন ভাল বাসাই মুখ্য উদ্দেশ্য, পাত্রবিশেষ উপলক্ষ্য মাত্র; সুতরাং ভালবাসাকে পাত্রান্তরে ন্যস্ত করিবার অক্ষমতা যেন দুর্ব্বলতা, তাই মনে হয় "যে তোমার আকর্ষণ সম্বরণ করিতে পারিয়াছে সেই ধন্য।"

লবঙ্গিকার রাগ হইল, সে বলিল "তোমার এত নিরাশ্বাস বাড়াবাড়ি, তুমি যার জন্য এমন ম্রিয়মান সে'ও যখন তোমার প্রাপ্তি আশায় দুঃসহ কষ্টভোগ করিতেছে তখন আর তোমার কেন এত কষ্ট এত হতাশা?"

মালতী বলিল "সখি তিনি সুখে থাকুন, তাঁর কষ্ট আমি চাহি না, কিন্তু আমার দুর্লভাশ্বাস। বিশেষতঃ আজ

মনোরাগস্তীব্রং বিষমিব বিসর্পত্যবিরতং
প্রমাথী নির্ধূমো জ্বলতি বিধুতঃ পাবকইব
হিনস্তি প্রত্যঙ্গং জ্বর ইব গরীয়ানিতো ইতঃ
ন মাং ত্রাতুং তাতঃ প্রভবতি ন চাম্বা ন ভবতী"।

মনোরাগ তীব্র বিষের ন্যায় শরীরে সঞ্চরণ করিতেছে, কখন সর্ব্বগ্রাসী, নির্ধূম অগ্নির ন্যায় জ্বলিতেছে, কখন প্রচণ্ড জ্বরের ন্যায় প্রতি অঙ্গ পীড়ন করিতেছে। আমাকে এ ভীষণ দুঃখপাথার হইতে মাতা, পিতা, তুমি, কেহই উদ্ধার করিতে সমর্থ নহ।"

এ বিলাপের কি ভবভৌতিক জোর।

রত্নাবলীর নায়িকা বলিতেছে।

দুল্লহজণাণুরাও, লজ্জা গুরই, পরবসো আপ্পা
পিঅসহি বিসমং পিম্মং মরণং সরণং ন বরমিক্কম্॥

এ যেন নৃত্যের ছন্দে, সৌখীন দুঃখপ্রকাশ, আমাদের বাঙ্গালীর মৃদুস্বভাবে ইহার একটা খুব চটক আছে তাই আমাদের দেশে রত্নাবলীর এত আদর, এই শ্লোকটী মেয়েলী দুঃখব্যক্তির আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ যখন তখন সকলের দ্বারা উচ্চারিত হয়। কিন্তু ভবভূতির এমন মৃদু রকম বিলাপে পোষাইয়া উঠে না, তিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই অগাধ ভাবসাগরে নিমজ্জন করাইয়া তাহাদের দ্বারা জ্বলন্ত বাড়বাগ্নি তুল্য ভাষা মন্থন করান। কিন্তু এইখানে মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইতে পারে। মালতী এখন যে ভাব ব্যক্ত করিলেন, ইহাত মাধব ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন তাহারই পুনরাবৃত্তি।

"বয়স্য মম হি সম্প্রতি
প্রসরতি পরিমাথী কোপ্যয়ং দেহদাহ।
স্তিরয়তি করণানাং গ্রাহকত্বং প্রমোহঃ॥
রণরণকবিবৃদ্ধিং বিভ্রদাবর্ত্তমানং!
জ্বলতি হৃদয় মন্তস্তন্ময়ত্বং চ ধত্তে॥"

যে ভাব পুরুষে সাজে, তাহা কি মেয়েতেও সাজে? মেয়েরা কি তাহাদের মনোরাগের স্বরূপ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বর্ণনা করিতে বসে—না শুধু, যে হৃদয়ে একটা ভারি ব্যথা রহিয়াছে তাহাই মোটামুটি অনুভব করে? মেয়েদের একটা মানসিক অবসাদের ভাব হয়,—যাহা রত্নাবলীতে ব্যক্ত হইয়াছে—এরূপ জ্বরীর উত্তেজনার ভাব কি হয়? তাহা যে হয় না তাহা নহে। আকাঙ্ক্ষার প্রথমাবস্থায় যে প্রখরতা থাকে তাহার উত্তেজনী-শক্তি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই সমান, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার উত্তরাবস্থা পুরুষে উত্তেজনার ভাব দীপ্ত রাখিলেও রাখিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকে সাধারণতঃ অবসাদ আনয়ন করে, রত্নাবলীর কবি নায়িকার সেই অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। মালতীর সে অবস্থা নহে, তাঁহার আজ প্রখরতা বৃদ্ধির অবস্থা। তিনি বাতায়ন হইতে মাধবকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু মাধব তাঁহাকে এতদিন দেখেন নাই, সুতরাং এতদিন তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদানের সম্ভাবনা অসম্ভাবনার কথা মনে উদয় হইবার অবসর হয় নাই। আজ এই প্রথম প্রকাশ্যে অন্যোন্যদর্শন ঘটিল, আজই সে কথা ভাবিবার সময়; আজিকার দিনের বিবিধ ঘটনায়,—আশায় নিরাশায়, আনন্দে ভয়ে, মনোরাগ শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই মাধব তাঁহাকে ভালবাসেন কি না বাসেন তাহা বিচার করিবার শক্তি নাই, আজ

মালতী শুধু এই জানেন যে আজ মাধবকে পাইবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, উদ্দাম আবেগে হৃদয়ে তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে।

এমন প্রবল ভাব যেন প্রাকৃত ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, প্রাকৃতে ব্যক্ত করিলে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাই ভবভূতি অন্যত্রপ্রাকৃতবাদিনী মালতীকে এইখানে সংস্কৃত বলাইয়াছেন।

লবঙ্গিকা বলিল "তোমার এ দুঃখের একমাত্র প্রতিকার মাধবের সহিত গোপনে মিলন!"

মাধবের প্রণয়াভিলাষিণী, তাঁহার দর্শনাভিলাষিণী মালতী এইমাত্র আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত হইতেছিলেন। কিন্তু লবঙ্গিকার কথায় তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, সরলা, গর্ব্বিতা কুমারী ধাত্রীর এই হীন প্রস্তাবে অপমানিত হইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন "অসমসাহসিকে তুমি এখান হইতে দূর হও," তাহার পর তাঁহার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিলেন লবঙ্গিকা যে এ প্রস্তাব করিতে সাহস পাইয়াছে সে তাঁহারই দোষে। তিনি বারবার মাধবকে বাতায়ন হইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রযুক্ত ধৈর্য্য হারাইয়া নিজেকে সখীগণের সমক্ষে লঘু বানাইয়াছেন, তাই লবঙ্গিকার এ দুঃসাহস, তিনি বলিলেন "প্রিয়সখি দোষ তোমার নহে, দোষ আমারই। কিন্তু তুমি ইহা স্থির জানিও, প্রিয়তম পিতা, অমলন্বয়া জননী, ইঁহারা মাধব অপেক্ষাও আমার শ্লাঘ্য। মাধবের জন্য আমি ইঁহাদের নির্ম্মলকুলে কালিমা দিতে অগ্রসর হইব না। আর আমার এই অপরিতৃপ্ত, দুঃসহ প্রণয়বেদনার কথা বলিতেছ? এ আর আমাকে কতইবা পীড়া দিবে, মৃত্যুর পর আর আমার কি করিতে পারে? আমি মৃত্যুতে কাতর নহি।"

অন্যান্য সংস্কৃত নাটক হইতে মালতীমাধবের এই আর একটী পার্থক্য!

শকুন্তলা কণ্বের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করেন নাই ইহা বেন পৌরাণিক কথা, কিন্তু কবিগণের অন্যান্য স্বকপোলপ্রসূতা নায়িকাগণেরও সে সংযম দেখা যায় না। কামন্দকী গোড়াই বলিয়াছিলেন "মালতী অতি উদাত্ত-প্রকৃতির, তাঁহাকে পিতার বিনা অনুমতিতে মাধবের সহিত চোরিকা বিবাহে প্রবৃত্ত করান কঠিন হইবে, তাহার জন্য কৌশল আবশ্যক।"

তিনি কৌশল ঠাহরাইয়াছিলেন যে সেকালের কথা পাড়িয়া মালতীর মনে শকুন্তলাদির কাহিনী মুদ্রিত করিয়া দিয়া অলক্ষ্যে তাহার মনকে সেই দিকে পরিচালিত করিবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কালিদাস ও ভবভূতির কালের মধ্যেও একটা বৃহৎ ব্যবধান রহিয়াছে। ভবভূতির সময়ে সমাজবন্ধন বিশেষ আঁট, সমাজের নৈতিক আদর্শ সমুচ্চ, মালতী তাহার মূর্ত্তিমতী দৃষ্টান্ত। এমন আত্মসম্ভ্রমসম্পন্না, সংযমশীলা, তেজস্বিনী বালিকা উন্নত সামাজিক অবস্থারই ফল।

মালতীর উত্তরে লবঙ্গিকা বিপদ গণিল, এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে ভগবতী কামন্দকী আসিলেন। তিনি দুঃসম্বাদ লইয়া আসিয়াছেন। রাজা অমাত্য ভূরিবসুর নিকট তাঁহার প্রিয়মিত্র, দুর্দ্দর্শন, অতিক্রান্তযৌবন নন্দনের সহিত বিবাহ দিবার অভিলাষে মালতীকে প্রার্থনা করিয়াছেন; অমাত্য তাহাতে উত্তর করিয়াছেন "মহারাজের তাঁহার কন্যার উপর সকল ক্ষমতাই আছে।" ভূরিবসুর এই সম্মতি বাক্যে তিনি রাজ্যস্থ সকল লোকের নিন্দার পাত্র হইয়াছেন।

ভগবতী আরও বলিলেন "কুটিলনীতিবিশারদের হৃদয়ে অপত্যস্নেহ কিরূপেই বা আশা করা যায়।"

দুর্ভাগিনী, পিতৃবৎসলা মালতী এই সব শুনিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিল "হায়, পিত! তোমা কর্ত্তৃক উপহারীকৃত হইয়াছি, রাজ-আরাধনই তোমার প্রিয়, মালতী তোমার প্রিয় নহে?"

লবঙ্গিকা বলিল "ভগবতি আপনি মালতীকে এই জীবন্ত মৃত্যু হইতে উদ্ধারের উপায় করুন।"

ভগবতী বলিলেন "আমি আর কি করিতে পারি? কুমারীগণের পিতা এবং দৈব এই দুই ভাগ্যনিয়ন্তা! তবে যে শকুন্তলা পিতার অপেক্ষা না করিয়া দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছিলেন, এবং বাসবদত্তা পিতৃনির্ব্বাচিত বর রাজা সঞ্জয়কে বরণ না করিয়া স্বীয় মনোমত বর উদয়নের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাবৃত্তে শোনা যায়, সে সকল সাহসিক কার্য্যপদবীর অনুসরণ করিতে পরামর্শ দেওয়া আমার উচিত হয় না। সুতরাং কি আর উপায় আছে? মালতীর পিতার স্বার্থসিদ্ধি হউক, সেই দুর্দ্দর্শনের সহিত মালতীর বিবাহ সম্পন্ন হউক, নির্ম্মল শশীকে রাহুতে গ্রাস করুক।"

মালতীর উত্তরোত্তর পিতার স্নেহে সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এমন সময় কামন্দকীর পরিচারিকা অবলোকিতা বলিল "ভগবতী বেলা হইয়া যাইতেছে, মাধব পীড়িত আপনি তাঁহাকে দেখিতে যাইবেন না?"

মাধবের নামোল্লেখে লবঙ্গিকার মনে হইল এই বেলা ভগবতীর নিকট মাধবের কুলশীল জানিয়া লইলে হয়, মালতীকে গোপনে তাহার মত জিজ্ঞাসা করিলে সেও সম্মতি জানাইল। তখন লবঙ্গিকা প্রকাশ্যে বলিল "ভগবতি আপনি যে মাধবের প্রতি এত স্নেহশীল তিনি কে?"

ভগবতী প্রথমটা বেলাতিক্রমহেতু সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে অনিচ্ছা দেখাইয়া পরে সবিস্তারে মাধবের উচ্চকুলশীল এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণসমূহের বর্ণনা করিলেন।

মালতী তাহা শুনিয়া উপস্থিত দুঃখের কারণ ভুলিয়া একবার সানন্দে, সগর্ব্বে জনান্তিকে বলিলেন "সখি শুন্‌লি?"

সখিও হাসিয়া বলিল "তা ত হবেই, তুমি যখন তাকে ভালবাস সেত বড় লোক হবেই, মহোদধি ভিন্ন কি আর কোথাও পারিজাত ফুটে।"

কামন্দকীর গল্প শেষ হইল। মালতীর আবার পূর্ব্ব নিদারুণ বৃত্তান্ত স্মরণ হইল, সেই সকল কথা মনের মধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে তিনি নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কামন্দকী নিজেকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন, তিনি আজ অতি সুকৌশলে কার্য্য সিদ্ধি করিয়াছেন, মালতীর বরের প্রতি বিদ্বেষ ও পিতার প্রতি সন্দেহ উদ্রেক করাইয়া দিয়াছেন, শকুন্তলাদির আখ্যায়িকা কথনে তাহার কার্য্য পদবীও দেখাইয়া দিয়াছেন, এবং মাধবের গুণকীর্ত্তনে তাঁহার প্রতি অনুরাগ আরও বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছেন।

দ্বিতীয়াঙ্ক শেষ হইল।

শ্রীসরলা দেবী।

নরনারী।

খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচাটিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখী বলে, খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।
খাঁচার পাখী বলে, বনের পাখী আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে—না
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব
খাঁচার পাখী বলে হায়
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।

বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত।
খাঁচার পাখী গাহে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।

বনের পাখী গাহে, খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি।
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী ভাই
খাঁচার গান লহ শিখি।
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই,
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বন-গান গাই

বনের পাখী বলে আকাশ ঘন নীল
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাটী
কেমন ঢাকা চারিধার।
বনের পাখী বলে—আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী বলে নিরালা কোণে বসে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে।

বনের পাখী বলে—না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই !
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই !

এমনি দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়।
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।

দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়।
দুজনে একা একা ঝাপটি মরে পাখা
কাতরে কহে কাছে আয়!
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচায় রুধি দিবে দ্বার।
খাঁচার পাখী বলে, হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন ধরণের উপন্যাস।

চারিজন পাঠক নূতন ধরণের উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত অ——র লেখা প্রকাশ যোগ্য হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার রচনা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আমাদের হস্তগত হওয়াতে তিনি পুরস্কার পাইলেন না। অন্য তিনজনের মধ্যে ধুবড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত য—র লেখা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তাঁহাকে প্রতিশ্রুত পুস্তকখণ্ড প্রেরণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অ—র রচনা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আগামী ৩০ শে পৌষের মধ্যে যিনি ইহার সর্ব্বোত্তম তৃতীয় পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন তাঁহাকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত রূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

নববর্ষের স্বপ্ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার জীবনের ইতিহাস তোমাদের কত দূর বলিয়াছি? বলিয়াছি বুঝি সেই নববর্ষের স্বপ্ন আমাকে কাহিল করিয়া গিয়াছিল, জমিকে কতক নরম করিয়া অঙ্কুরের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল? তাই বটে, সেই নববর্ষের স্বপ্নই আমাকে মাটি করিল।

একদিন সকালে ঘরে বসিয়া পড়িতেছি এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে বাহিরে একজন ভদ্রলোক আমার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। সেখানে গিয়া আমাদের পরিচিত বৃদ্ধ রাম বাবুকে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার মুখে ব্যস্ত সমস্ত ভাব।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "কি হয়েছে রাম বাবু?" তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন "ভারি বিপদ, শীঘ্র এস, এই গলির মোড়ে একটা বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে, একটা ভাড়াটে গাড়ী উল্টে গেছে, তাতে একটী বার তের বৎসরের মেয়ে ছিল, আর ঝির কোলে একটি চার পাঁচ বৎসরের ছেলে। ঝি আর ছোট ছেলে রক্ষা পেয়েছে, কিন্তু মেয়েটী বড় আঘাত পেয়ে রাস্তায় মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। শুনছি আরো দুটো তিনটে গলি পেরিয়ে তাদের বাড়ী, তাই তোমাকে ডাকতে এলুম, তুমি সেখানে দাঁড়াবে চল, আমি তাড়াতাড়ি একটা পাল্কী ডেকে আনি।"

আমি তাঁহার সহিত চলিলাম। কথিত স্থানে আসিয়া দেখিলাম একখানা গাড়ী কতক ফুটপাথ কতক রাস্তার উপর পড়িয়া রহিয়াছে, গাড়োয়ান এই সবে ঘোড়াদের দড়াদড়ি খুলিয়া তাহাদের গাড়ী হইতে ছাড়াইতে সক্ষম হইয়াছে, স্থানটী নির্জ্জন তাই শুধু দুই চারিটী লোক জমিয়াছে, তাহাদের মাঝে একটী অচেতন বালিকা রাস্তার উপর ঝির কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ তাহার মুখে জলের ছিটা দিতেছে, কিন্তু চেতনার কোন লক্ষণ নাই। মনে হইল এ যেন চেনা মুখ। হঠাৎ মনে পড়িল দুই বৎসর আগে একবার আমার পিতৃব্যের বন্ধু নরেন্দ্র বাবুর গৃহে আহারের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। সেইখানে তাঁহার কন্যা এই বালিকাটী আমাদের পরিবেশন করিয়াছিল। তখন বালিকার সরল সুন্দর চঞ্চল ভাব বেশ মিষ্ট লাগিয়াছিল। সে দুই বৎসরের কথা, এখন আর সে বালিকা নহে, এখন তাহার সর্ব্বাঙ্গীন নবীন যৌবন-আভাস। আর সে উজ্জ্বল নয়ন এখন নিমীলিত, তাহার সুন্দর মুখে বালিকা সুলভ চপলতা নাই, তাহা এক্ষণে গম্ভীর, করুণ প্রশান্ত শ্রী ধারণ করিয়াছে, একটী বৃন্তচ্যুত কমলের ন্যায় সে পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে পড়িল তাহার মা নাই, তাহার প্রতি মমতায়, স্নেহে এবং তাহার সেই মুদিত আঁখিপল্লবের গাম্ভীর্য্যশোভায় কতকটা ভক্তিতে হৃদয় ভরিয়া গেল। এ সময় ঠিক সে স্বপ্নের কথা মনে করিবার সময় নয়, কিন্তু তবু তাহা মনে পড়িল, সে স্বপ্নদৃষ্ট বালিকার মুখের সহিত ইহার মুখের কোন সাদৃশ্য থাকুক আর না থাকুক আমার মনে হইল এ যেন সেই মুখ, কেবল ভাবের কি প্রভেদ! সে ব্যক্তপ্রেমের লজ্জায় আনন্দে শোভমান, আর এ মৃত্যুর পাংশু ছায়ায় লীন; আমাদের মিলন এইরূপে হইবে কে জানিত?

রাম বাবু পাল্কী লইয়া আসিলেন, আমার চিন্তাস্রোত বন্ধ হইল। আমরা বালিকাকে সন্তর্পণে পাল্কীতে উঠাইয়া তাহাদের গৃহাভিমুখে চলিলাম। গৃহে তাহার পিতা নাই, মফঃস্বলে গিয়াছেন। দুই একদিনে ফিরিবার কথা, আমরা তখনই তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনাইলাম। সেদিন আমার কলেজে যাওয়া হইল না, কেবল একবার মাত্র বাড়ীতে গিয়া সত্বর আহার করিয়া আসিয়া রাম বাবুতে আমাতে সমস্ত দিন রোগীর পার্শ্বে রহিলাম। রোগীর চেতনা নাই। সন্ধ্যাবেলায় তাহার পিতা

আসিলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ডাক্তার সাহেব ডাকিতে পাঠাইলেন। আমার আর সেখানে থাকা অনধিকার চর্চ্চা জানিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রেমের জয়।—জন হাউয়ার্ডের জীবনচরিত প্রণেতা শ্রী শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। বইখানি মুক্তিফৌজের ইতিহাস; ঈশ্বর নির্ভরতার বলে মানুষ কতদূর করিতে পারে জেনারেল বুথ তাহার একটি দৃষ্টান্ত। পুস্তক হইতে আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মুক্তিফৌজের অভ্যুদয় উনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ ঘটনা। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গভীর প্রশ্নের মীমংসা করিতে অসমর্থ হইয়া হতাশ হইয়াছেন—জ্ঞান ও শিক্ষার উজ্জ্বল আলো বিকীর্ণ করিয়া পাপভারাক্রান্ত দারিদ্র্যনিপীড়িত হতভাগ্য নরনারীগণের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য হার্বার্ট স্পেন্সার, ম্যাথু আর্ণল্ড, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্ প্রভৃতি জ্ঞানিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও যে লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে পারেন নাই, মুক্তিফৌজের প্রবর্ত্তক মহাত্মা জেনারেল বুথ কার্য্যগত জীবনের বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতে চলিতে সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে ও সেই লক্ষ্য স্থানে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনয়ন করা অসম্ভব জ্ঞান করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ "সবলের জয়, দুর্ব্বলের পরাজয়" এই যে নীতি প্রচার করিয়াছেন, জেনারেল বুথ সেই নীতির অসারতা হাতে কলমে প্রমাণ করিয়াছেন। "মুক্তিফৌজ" ও ইহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিলে তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিফৌজের কার্য্য বিবরণ একবার পাঠ করিলে আর এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

"মুক্তিফৌজ" এই নাম শুনিলেই অনেকের হাস্য ও অবজ্ঞার উদয় হইয়া থাকে, আমরা জানি। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার বাহ্য চাক্‌চিক্যে যাহাদের দৃষ্টি বিকৃত হইয়াছে, তাহাদের মনে এইরূপ অবজ্ঞার ভাব হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীতে যখনই কোন ধর্ম্মের প্লাবন উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সতর্ক বিষয়ী লোকেরা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে বাতিকগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করিয়াছে, এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে পাগলের পাগ্‌লামি মাত্র বলিয়া মনে করিয়াছে। কিন্তু মহৎভাবের নিকট আত্মবিসর্জ্জন করিয়া যে সকল মহা পুরুষগণ সংসারের লোকের দ্বারা পাগল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছেন, অজ্ঞলোকের দ্বারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল সাধু মহাজনের অটল বিশ্বাসের কার্য্য দেখিয়াই ভবিষ্যতে

জ্ঞানিগণ অবাক্ হইয়াছেন, এবং সংসারাসক্ত সন্দিগ্ধচিত্ত নরনারীগণ মহত্ত্বের সম্মাননা করিতে ও মহৎকার্য্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।

মুক্তিফৌজ জিনিসটা কি? ইহা কি বর্ত্তমান যুগের একটী অলৌকিক ক্রিয়া নয়? মুক্তিফৌজ এই পরিদৃশ্যমান জগতে সেই অব্যক্ত অদৃশ্য ঐশীশক্তির প্রকাশ। মুক্তিফৌজ জড়ের মধ্যে চৈতন্যের একটী লীলামাত্র। পঁচিশ বৎসর অতীত হইল, অর্থহীন সহায়হীন বুথ একমাত্র সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে মিলিত হইয়া "মুক্তিফৌজের" সৃষ্টি করেন। যেরূপ আয়োজন থাকিলে মহৎকার্য্যে হাত দিয়া মনুষ্য কৃতকার্য্য হইতে পারে, বুথের তাহা কিছুই ছিল না। অধিক কি বুথের একটী উপাসনালয় পর্য্যন্তও ছিল না। কিন্তু আজ সংসারের অতি দরিদ্র, হীন ও অকর্ম্মণ্য নরনারী সকল কুড়াইয়া লইয়া বুথ মুক্তিফৌজকে এক প্রবল শক্তি করিয়া তুলিয়াছেন। আজ পৃথিবীর ২,৮৬৪ স্থানে প্রচার ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে মুক্তিফৌজের ৯০০০ সহস্র কর্ম্মচারী নরনারীর মুক্তির সংগ্রামে নিযুক্ত রহিয়াছে। আজ মুক্তিফৌজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে বৎসরে প্রায় ৭৫,০০০০০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়া থাকে। একদিন যে মুক্তিফৌজের হাতে এক কড়া কাণাকড়িও ছিল না, সেই মুক্তিফৌজ পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় আজ ১৮কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৮০০০,০০০০০ নগদ সম্পত্তির অধিকারী। একি সামান্য কথা!

সচরাচর ধর্ম্মশাস্ত্র সকলে যে সমস্ত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনা যায়, তাহা অপেক্ষা ঊনবিংশ শতাব্দীর এই ঘটনাটি কি কম আশ্চর্য্য! বর্ত্তমান যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে, আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই মানবসমাজের কল্যাণসাধনের জন্য এরূপ অদ্ভুত আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন ঊনবিংশ শতাব্দীর গতি কোন্ দিকে? ভোগসুখের দিকেই মানবের সমস্ত চেষ্টা, দৈহিক সুখ লাভ করিতে পারিলেই জীবন কৃতার্থ হইল বলিয়া মানুষ মনে করে। দৈহিক সুখের উপরে আর যে কোনও প্রকার শ্রেষ্ঠতর সুখ আছে, ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার উপরে আর যে কোন অতীন্দ্রিয় নিত্য সুখ সম্ভব, ঊনবিংশ শতাব্দীর পোনে ষোল আনা লোকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নয়। ঘটনার স্রোতেই মানুষ ভাসমান, ঘটনার নিয়ন্তা আধ্যাত্মিক শক্তিকে মানুষ চিনিতে পারে না, চিনিবার জন্য ব্যস্তও নয়।

মহাত্মা বুথ্ বর্ত্তমান মানব সমাজের এই গতি ফিরাইয়াছেন--নাস্তিকতা ও স্বার্থপরতার কঠিন পাষাণ গলাইয়া বিশ্বাস ও প্রেমের স্রোত বহাইয়াছেন। যে মহৎভাবে প্রণোদিত হইয়া মহাত্মা বুথ্ এই মহৎ কার্য্যে হাত দিয়াছেন, তাহার দোষ গুণ বিচার করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। জেনারেল বুথের মত ও বিশ্বাসের মধ্যে কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি আছে কি না তাহাও আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। অপূর্ণ কখনই ভুল ভ্রান্তির অতীত হইতে পারে না। অসাধারণ মহত্ত্ব ও অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হইলেও বুথ্ অপূর্ণ মানব বই আর কিছুই নহেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষে

ভুল ভ্রান্তির সম্পূর্ণ অতীত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। কিন্তু সমস্ত ভুল ভ্রান্তির অতীত হইয়া জেনেরল বুথ্ যদি পৃথিবীতে এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যতদূর অসাধারণ বলিতাম, সহস্র ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও তিনি যে সেইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে আরও অধিক অসামান্য বলিয়া মানিতে হয়।"

লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। বইখানি আমরা সকলকে পড়িতে অনুরোধ করি। প্রেমের মাহাত্ম্যে তাঁহারা পৃথিবীর দ্বেষ বিস্মৃত হইবেন।

জীবন ছায়া। ঐ। ইহাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পাঁচটী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি ভক্তি বিশ্বাসপূর্ণ এবং চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। পাঠ নিষ্ফল নহে।

দাসী। মাসিক পত্রিকা। আমরা দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। সাধারণ মাসিক পত্রিকার উদ্দেশ্যের সহিত ইহার উদ্দেশ্য এক নহে। "দাসী কেবল সকলকে স্মরণ করাইয়া দিবে যে সংসারে দুঃখীর অভাব নাই দয়ার পরিচালনের যথেষ্ট প্রয়োজন এবং সুযোগ আছে। দাসী নিজ শক্তি অনুসারে মানব সেবাব্রতে নিযুক্ত থাকিবে। সকলকে দুঃখীর জন্য অন্ততঃ অশ্রুপাত করিয়াও এই ব্রত পালন করিতে বলিবে।" নিতান্ত সুখের বিষয় কেবল কথায় নহে দাসী আপনার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। ইংরাজি ১৮৯১ সালের ২৭শে জুন তারিখে বসুরহাট সবডিভিজনের অন্তর্ব্বর্ত্তী জালাল-পুর গ্রামে প্রথমে দাসাশ্রম সংস্থাপিত হয়। নরনারীদিগের সেবার জন্য অনেকে তাহার সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক এই তিনরূপ স্বাস্থ্য বিধান উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ইহাদের একটি সেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দারিদ্র পীড়িত নরনারীদিগকে সেইখানে আশ্রয় দান করিয়া উঁহারা তাঁহাদের সেবা করেন। পাপীকে পুণ্যোপদেশ ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। দাসীর এই দুই সংখ্যায় সেবালয়ের রোগীর সংখ্যা তাহাদের রোগের বিশেষ বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে একটি কথা যে সকল রোগের বিশেষ বিবরণ দাসীতে প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার সকলগুলি দাসীতে প্রকাশিত হইবার অনুপযুক্ত। দাসী ডাক্তারী পত্রিকা নহে সুতরাং ইহাতে রোগের খুঁটিনাটি পরিচয় দিবার কোনই সার্থকতা নাই, না তাহাতে জ্ঞানবৃদ্ধি না প্রীতিলাভ হয়।

যাহা হউক দাসীর মঙ্গল উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণ সহানুভূতি আছে। ঈশ্বর এই শুভকার্য্যের সহায় হইয়া ব্রতধারীদিগকে সফল মনোরথ করুন ইহাই প্রার্থনা।

নবগ্রাম। জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত। ইহা একখানি উপন্যাস। আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিতেছি। তবে ঔপন্যাসিক শিল্পগঠন হিসাবে অর্থাৎ ঘটনা বিন্যাস বা মনুষ্য চরিত্রের সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম ভাবাঙ্কন অথবা সুকৌশলময় কথোপকথন গাঁথনির জন্য ইহার প্রশংসা নহে। ইহার প্রশংসা বঙ্গজাতির সম্মুখে ইহা যে আদর্শ যে উচ্চ কল্পনা ধরিয়াছে তাহার নিমিত্ত। লেখিকার নায়ক নায়িকাগণ তাঁহার হৃদয়গত

দেশানুরাগ ভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি। ইহাদের মধ্য দিয়া এমন সহজ স্বাভাবিক ভাবে তিনি জাতীয় উন্নতির অবতারণা করিয়াছেন যে, পড়িলে মনে হয় এমন সহজায়ত্ত উন্নতিকে বঙ্গজাতি যেন হেলায় হারাইতেছে। উপন্যাসখানি আমরা স্বদেশবৎসল যুবক যুবতী-দিগকে পড়িতে অনুরোধ করি। আমাদিগের বিশ্বাস ইহা পড়িলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ না কেহ তাঁহাদের নবজীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফলতার পথ দেখিতে পাইবেন।

স্ত্রীধর্ম্মনীতি। পণ্ডিতা রমাবাই সরস্বতী প্রণীত মহারাষ্ট্রী গ্রন্থ হইতে শ্রীরজনী নাথ নন্দী বি এ, বি এল কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত। স্ত্রীলোকের গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় উপদেশ-গ্রন্থের আজ কাল অভাব নাই। তবে পণ্ডিতা রমাবাই প্রণীত বলিয়াই ইহার বিশেষ মর্য্যাদা। অনুবাদক ভূমিকায় পণ্ডিতার যে সংক্ষেপ জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাহা অতীব প্রীতিপ্রদ।

দ্রষ্টব্য।

স্বরলিপির ৪৬৭ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে যে দুইটী (আ—প্র) রহিয়াছে তাহার শেষটী ভুলক্রমে ছাপা হইয়াছে। গান অভ্যাস করিবার সময় উহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

রুসিয়ার বাণিজ্য।

রুসিয়ার বাণিজ্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া এইবার এ প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"। রুসিয়ার ন্যায় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যে বাণিজ্যের দ্বারা লক্ষ্মীকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে রুসিয়ায় লক্ষ্মী-দেবীর কৃপা নাই বলিলেই হয়। ইহার কারণও রুসিয়াবাসীদের সততার প্রতি অশ্রদ্ধা। বোধ হয় সকল দেশেই বণিকেরা সুবিধা পাইলে ঠকাইতে ছাড়েন না কিন্তু আজ কাল সভ্যতার অগ্রসরে তাহার সুবিধা কিছু কম। যে দিন ইউরোপীয়েরা পুঁথির বদলে জাহাজ বোঝাই করিয়া হস্তীদন্ত, রেসম ও স্বর্ণ লইয়া যাইতেন সে দিন এখন আর নাই। জাতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবন সংগ্রামের ঘোর আক্রোশে বণিকেরা প্রত্যে-কেই চেষ্টা করেন যে সমান গুণবিশিষ্ট বস্তুকে কত শস্তায় দিতে পারেন এবং সকলেই সাধ্যমত ভাল জিনিস বাজারে পাঠাইতে চেষ্টা করেন। রুসিয়া সে পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে গিয়াছে সুতরাং বাণিজ্যেও তাহার তত অধিক লাভ হয় না। ইংরাজ যেখানে বলেন "সততাই শ্রেষ্ঠ উপায়" রুসিয়াবাসী সেখানে বলেন "মিথ্যা না কহিলে বিক্রয় হয় না"। ফলে হয় "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট"। রুসিয়া হইতে অন্যদেশে যে সকল দ্রব্য রপ্তানি হয় লাভের আশায় তাহাতে অনেক পরিমাণে তাহারা বাজে জিনিস মিশ্রিত করে। সুতরাং সে জিনিস কেহ কিনিতে চাহে না। রুসিয়ায় যথেষ্ট কেরোসিন উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহাতে এত ভেজাল মিশান থাকে যে কেহ ইহা লইতে চাহে না সেইজন্য কিছুদিন পূর্ব্বে অন্য বণিকেরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে তাঁহারা আর রুসিয়ার কেরোসিন খরিদ করিবেন না, রুসিয়ার বণিকেরা যে তখন ভাজাল মিশান ছাড়িয়া দিলেন তাহা নহে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমেরিকার কেরোসিনের অনুরূপ টিন ও মার্ক প্রস্তুত করাইলেন। ইহাতে ক্রমে মার্কিন-কেরোসিনের প্রতিও লোকের অবিশ্বাস হওয়ায় তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা এই চৌর্য্য আবিষ্কার করিলেন। ব্রেজিলে রুসিয়া হইতে যত পালের কাপড় যায় তাহা কেহই কিনিতে চাহে না। ইংলণ্ড হইতে যাহা যায় তাহা না যাইতে যাইতে বিক্রয় হইয়া যায়। নরওয়ে বা সুইডেনের তক্তা বাজারে থাকিলে রুসিয়ার তক্তা কিছুতেই বিক্রয় হয় না। রুসিয়ায় তুলা যথেষ্ট উৎপন্ন হয় এবং তাঁহারা ইচ্ছা করিলে যত অধিক পরিমাণ ইচ্ছা তুলা বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ করিতে পারেন। কিন্তু তুলার ভার অধিক করার জন্য ছোট ছোট ইট পাটকেল পুরাণ দাড়ি ইত্যাদি তাহার সহিত মিশ্রিত করায় তুলার দর অর্দ্ধেকের বেশী কমিয়া যায়, কিছুই লাভ হয় না। রুসিয়া হইতে ইংলণ্ডে প্রায় বৎসরে ছয়লক্ষ ষ্টার্লিংএর শস্য নীত হয়। রুসিয়ার শস্য স্বভাবতঃ উৎকৃষ্ট কিন্তু ইংলণ্ডে পৌছিবার পূর্ব্বে তাহা

যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। নিস্থ নগরের যে বণিকগণ ইংলণ্ডে শস্য চালান দেন তাঁহারা ইনেটেসের সরকারী শস্যাগারের অধ্যক্ষ শস্য বাছিয়া লইবার পর যে আবর্জ্জনা ফেলিয়া দেন সেই সকল খোলা ও ময়লা তাঁহার নিকট ক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। সে স্থানে তাহা প্রাপ্ত না হইলে অন্যত্র ২৫০০ বস্তা পাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ইংলণ্ডের বণিকেরা প্রথমতঃ অন্যদেশীয় শস্য যে দরে ক্রয় করিতেন রুসিয়ার শস্যের জন্য তাহাপেক্ষা ১ সিলিং ৬ পেন্স দর কম দিতেন। অবশেষে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইঁহারা সভা করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে নিতান্ত আবশ্যকের সময় ভিন্ন রুসিয়ার শস্য কিনিবেন না। ইহাতে এত মাটী মিশান থাকে যে বাজারে সকলে কিনিতে আপত্তি করে। এইরূপ প্রত্যেক দ্রব্যেই রুসিয়া ভাজাল মিশাইয়া জিনিসের দর কমাইয়া দেয়। আমাদের দেশে যেমন একটা কথা চলতী আছে "বিলাতী", বিলাত হইতে আসুক না আসুক মন্দ হইলে আমরা বলি বিলাতী,—সেইরূপ ইউরোপে একটী কথা আছে "রুসিয়ার" অর্থাৎ মন্দ, এবং সে জিনিষ কেহ কিনিতে চাহে না। রুসিয়ার ডিম্ব পর্য্যন্ত কম দামে বিক্রী হয়। বিদেশীয়েরা রুসিয়ায় দোকান খুলিয়া লাভ করেন, কারণ তাঁহারা ভাঁজাল দেন না।

রুসিয়ার কতক কেরোসিন এখন ইহুদী ও সুইসগণের হাতে তুলা পোলগণের ও তক্তা ইংরাজ দোকানদারগণের হাতে। কিন্তু সে লাভ রুসিয়ার নয় এবং রুসিয়াবাসীদের অসততায় ইহাদেরও যে কম কষ্ট পাইতে হয় তাহা নহে। অনেক লোকসানও স্বীকার করিতে হয়। তিন বৎসর আগে এক দল বার্লিন তক্তা-কোম্পানী ৩০০০০ পাউণ্ডের তক্তা কিনিয়া নিপারের খালে ভাসাইয়া আনিতেছিলেন। হঠাৎ প্রচণ্ড শীত পড়িয়া নদীতে বরফ জমায় কাঠ আনা হইল না, বরফের মধ্যে রহিয়া গেল। বসন্তের আগে কাঠ তুলিবার উপায় ছিল না, মধ্যে মধ্যে তাঁহারা আসিয়া তক্তা দেখিয়া যাইতেন। দুই তিনবার ঠিক আছে দেখিলেন, পরের বার আসিয়া দেখেন কাঠে আর তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, একজন ছোটলোক সে কাঠের অধিকারী। তিনি নালিস করিলেন কিন্তু তাহাতেও স্থির হইল যে, কাঠ উঁহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছিল—এখন যে দখল করিয়াছে তাহার। দখল হইবার বিবরণ এইরূপ। তক্তায় B অক্ষর অঙ্কিত ছিল, বিগুণ নামে একজন ভিক্ষুক তাহা দেখিয়া এইগুলি অধিকার করিবার ফন্দি বাহির করিল। আর একজন ভিক্ষুক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিল যে সে বলিবে বিগুণ তাহার নিকট ১০০০০০ রুবল ধারে। এই লইয়া তাহারা ঝগড়ার ভাণ করিয়া নালিসের জন্য উপস্থিত হইল। সেখানে Bর বন্ধুর কথানুসারে Bর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থ শোধ দিবার হুকুম হইল। বন্ধু ওই তক্তাগুলি Bর সম্পত্তি বলিয়া দেখাইয়া দিল। যথার্থ অধিকারী উকীলের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। উকীল বলিলেন যে ইহাতে পুলিসে নালিস চলিবে না, বিগুণ ত চুরী করে নাই। বার্লিন কোম্পানী

বিগুণের নামে আদালতে নালিস করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা প্রথমতঃ ১০।১২ বৎসরের কমে বোধ হয় মিটিত না। দ্বিতীয়তঃ অনেক খরচ হইত, তৃতীয়তঃ, বিগুণ চুরী করে নাই সুতরাং তাহার নামে নালিস করিলে সে আবার মান হানির নালিস করিয়া অর্থ লইতে পারিত! এইরূপ ত আইন।

জুয়াচুরী পূর্ব্বক টাকা লুকাইয়া রাখিয়া সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার ভাণ করা ত রুসিয়ার দৈনিক ঘটনা। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভিন্ন রুসিয়ার নিজ দোকান গুলিতেও এই প্রথা চলিত। দোকানদারেরা প্রথমতঃ রাস্তায় যাহাকে দেখে তাহাকেই বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া কোন জিনিস গছাইয়া দেয় সে লোকটীও কোন রূপে লইতে চাহে না, বলে আমার দরকার নাই; দোকানদারও ছাড়ে না। অবশেষে মুক্তি লাভার্থে বাধ্য হইয়া সে দোকানদারের ইচ্ছামত জিনিস কিনিয়া পলায়ন করে। ইহার মধ্যে দোকানদারেরা নানারূপ কৌশলও খাটায়। একজন কাপড়ের দোকানদার কোটের পকেটে দামী ঘড়ি কিম্বা রূপার সিগারেট কেস এই রকম কোন জিনিস রাখিয়া বাহির হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া তাহাকে কোট কিনিতে বলে। প্রথমতঃ, সে কিনিতে চাহে না অবশেষে হঠাৎ সে জিনিসটা হাতে ঠেকিলে সে মনে করে জিনিসটার অস্তিত্ব দোকানদার বুঝি জানে না; যে কোট কিনিবে সে তাহাও পাইবে। তখন কিনিতে রাজী হয়। দোকানদার টোপ লাগিয়াছে বুঝিয়া যেখানে শুধু কোটটা চারি টাকা বলিত সেখানে বার টাকা বলে। খরিদ্দার তাহাই তৎক্ষণাৎ দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যায় কিন্তু দুই পদ না যাইতেই দোকানদার বাহির হইয়া বলে 'দাঁড়ান মশাই কোটের পকেটে একটা জিনিস রেখে ছিলুম নিতে ভুলে গেছি।' বেচারীর কি দশা। "সময়ে সময়ে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর"ও দেখা যায়। একজন উক্ত রূপে একটি রূপার সিগারেট কেসে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কিছু-দিন পরে আবার উক্ত দোকানে যাইয়া একটী কোট দেখিতে চাহিলেন। তাহার মধ্যে রূপার কেস আছে দেখিয়া তিনি আস্তে আস্তে সেটী বাহির করিয়া তৎপরি-বর্ত্তে একটী তদনুরূপ গিল্টিকরা নকল রাখিয়া দিলেন ও তাহার পর সে কোট তাঁহার মনোমত নয় বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন লোক একজন মদ্য ব্যবসায়ী মহাজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্যবসা কেমন চলিতেছে? এই মহাজন ধার্ম্মিক ও ব্যবসায়ে দক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। উত্তর হইল 'ঈশ্বরের কৃপায় ভালই চলছে গত বৎসর ৮০০০ বোতল মাডিরাই বিক্রী করেছি তা ছাড়া অন্য সব ত আছে। প্রথম ব্যক্তি বলিলেন "এত মাডিরা কোথা পাও মাডির দ্বীপে মোট বছরে ১০০০ বোতল মদ তৈরি হয় আর তার মধ্যে কেবল ৩০০০ বোতল সমস্ত য়ুরোপে আসে।" মহাজন হাসিয়া বলিলেন "ঈশ্বর পাঠিয়ে দেন—আমি যে একজন রাসায়নিককে ৩০০০ রুবেল বছরে দিই সে কি অমনি দিই নাকি? বোতল পিছে আমার ৩।৪ পেনি পড়ে আর ৮।৯ পেনি করে বিক্রী করি। এই মদ থেকে আবার মাডিরা করতে প্রায় এক

সিলিং খরচ পড়ে। ৪ সিলিংএ বিক্রী হয়। একেই বলে ব্যবসা। মদ কিনে মদ বিক্রী কর্ত্তে হলেই এতদিন আমাকে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করতে হ'ত।"

প্রশ্নকর্ত্তা।—কিন্তু ও যে জুয়াচুরী।

মহাজন।—চুপ চুপ আগে একটা কথা শোন। তুমি বিটপালম খাও? বিটপালম থেকে চিনি হয়। তুমি কি বলবে চিনি জুয়াচুরী? চিনি থেকে যে মিষ্টান্ন হয় তা কি জুয়াচুরী?

প্র।—কিন্তু মিষ্টান্ন খেয়ে মানুষ মরে না। ও রকম খারাপ মদে মানুষ মারা যায়।

মহাজন হাসিয়া বলিলেন "মৃত্যু যখন ঈশ্বর দিবেন তখন আপনি হবে, তার আগে যা খাও কিছু হবে না।"

এ কথাটী যে মহাজন তর্কচ্ছলে বলিয়াছিল তাহা নহে। রুসিয়াবাসীরা এরূপ ঘোর অদৃষ্টবাদী যে সমস্ত বিষয়েই তাহারা ঈশ্বরের দোহাই দেয়। পাপপুণ্যজ্ঞান ইহাদের এক প্রকার নাই। একজন হত্যাকারীকে যখন ফাঁসি দিতে লইয়া যায় তখন অন্য লোকেরা তাহাকে বিন্দুমাত্র ঘৃণা করে না, বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমার ভাগ্যে এখনও অমন লিখন লিখেন নাই। একজন বালক কতকগুলি বই চুরি করিয়াছিল। যাহার বই সে নালিস করে। বিচারে দোষ সপ্রমাণ না হওয়ায় বালক খালাস পাইয়া গৃহে গেল। যে তাহার নামে নালিস করিয়াছিল সেও তাহার সঙ্গে যাইতেছিল। ইহাদের প্রতিহিংসা স্পৃহা বলবতী নয়। বালকের ন্যায় ঝগড়া করে, ঝগড়া মিটিলে আবার ভাব হয়। যাইতে যাইতে অভিযুক্ত বালক অপরকে বলিল "তুমি কি বোকা, পুলিস দিয়ে যখন আমার দোকান খোঁজালে, সব দেখলে, কেবল জানলার নীচে দেখলে না। সেখানে দেখলেই বইগুল দেখতে পেতে! তা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না যে তুমি দেখতে পাও, তাই সেখান থেকে তোমার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।" অপরের এ কথা যথার্থ মনে হইল, ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ মিথ্যা, সুতরাং আর নালিস করিবার কথাও সে ভাবিল না। প্রতিশোধস্পৃহা ইহাদের কত কম আর একটী গল্প হইতে বুঝা যায়। একটী ফেরী জাহাজে অনেক লোক পার হইতেছিল। একজন লোকের সেখানে টাকার থলি হারায়। তাহাতে প্রায় ২০০৲ টাকা ছিল। লোকটী জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিল, তিনি খোঁজ করিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে লোকটী আসিয়া বলিল "টাকা পাইয়াছি, ওই সৈন্যটী যে ঘুমাইতেছে উহার পকেটের মধ্য হইতে থলির এক পাশ দেখা যাইতেছিল, আমি টানিয়া লইয়াছি।

অধ্যক্ষ বলিলেন, "চল উহাকে ধরিয়া পুলিসে পাঠাইতে হইবে।"

লোকটী বলিল, "কেন? টাকা যখন পাইয়াছি তখন আবার উহাকে পুলিসে দিবার দরকার কি? আহা বেচারী ঘুমাচ্ছে ওকে উঠিও না।" অধ্যক্ষ আর কিছু বলিলেন না।

উপরে যে বালকের বই চুরী করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহার সম্বন্ধে আরও দুই এক কথা বলিবার আছে। রুসিয়ার সহস্র সহস্র বালককে নিয়মিত

বই চুরী করিতে শিখান হয়। রুসিয়ায় যাহারা পুস্তকের যথার্থ মালিক ও খরচ করিয়া পুস্তক ছাপায় তাহাদের বই বিক্রী না হওয়ায় তাহারা নিতান্ত দরিদ্র কিন্তু আর একদল বিক্রেতা ইহাদের দৌলতে বড়মানুষ। যে সকল বই কাটতী হইবার সম্ভাবনা সেই সকল বই যত সংখ্যা ছাপাইবার কথা মুদ্রাযন্ত্রের বালকদের উৎকোচ দিয়া বিক্রেতারা তাহার অধিক ছাপাইয়া তাহাদের দ্বারা চুরী করায় ও অন্যান্য বালকগণ দ্বারা গোপনে বিক্রয় করাইয়া থাকে। নিজেদের সন্তানদেরও এই কার্য্যে ব্রতী করে। এইরূপে সুকুমারমতি সহস্র সহস্র বালক কঠোর পাপকে বরণ করে, পরে তাহারা দুরাচার হইবে, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? পুস্তক প্রকাশক কি লেখকগণও যে বিক্রেতাগণ অপেক্ষা বিশেষ উচ্চ দরের লোক তাহা নহে, সম্প্রতি ১১৫০০০ সংখ্যা সংজ্ঞাবিশিষ্ট একখানি অভিধানের বিজ্ঞাপন বাহির হয়। একজন কিনিয়া দেখিলেন মোট ২০৬৮১টী কথা আছে। তখন তিনি এই অভিধানটীর আদ্যোপান্ত ইতিহাস সন্ধান করিয়া জানিলেন যে অভিধান খানির অনেক সংস্করণ হইয়াছে। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ পঞ্চম সংস্করণ রূপে মুদ্রিত হয়। তখন ৩০০০০ কথা থাকিবার কথা। মূল্য ২½ রুবল। ১ বছর পরে দ্বিতীয় সংস্করণ চতুর্থ সংস্করণ রূপে বাহির হয়। ইহাতে ওই মূল্যে ৩২০০০ কথা থাকিবার কথা। ১৮৭৫ এ তৃতীয় সংস্করণ ষষ্ঠ সংস্করণ রূপে বাহির হয়। দাম ১¾ কথা ৩২০০০। ১৮৮৩তে চতুর্থ সংস্করণ নবম সংস্করণ রূপে বাহির হয়। ১৮৮৮তে পঞ্চম সংস্করণ অষ্টম সংস্করণরূপে প্রকাশিত হয়। ইহাতেই ১১৫০০০ কথা থাকিবার কথা। সকল দেশেই লেখকগণ পরস্পরের নিকট সাহায্য গ্রহণ করেন এবং যাঁহার নিকট ঋণী তাঁহার নামোল্লেখ করেন। কিন্তু রুসিয়ার লেখকগণ সম্পূর্ণরূপে আগাগোড়া অন্যের লেখা আপনার নামে প্রকাশ করেন। ইহা করিবার প্রধান একটী কারণ এই যে অন্য লেখা নিজ-নামে প্রকাশ করিয়া তাহার পর লেখার জন্য ইউনিভর্সিটী হইতে ডাক্তার উপাধির দাবী করেন। তাহাতে সম্মান এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল অর্থ লাভ দ্বারা সুখ স্বচ্ছন্দতায় কাটাইতে পারেন। কখন কখন এমন হয় যে উপাধি পাইবার পর ধরা পড়েন কিন্তু তাহাতে কোন দণ্ড নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি রুসিয়ার উচ্চতম কর্ম্মচারী জজ, জুরী, ডাক্তার, উকীল কেহই অপাপ ও অধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত নহেন সুতরাং সে কথার পুনরাবৃত্তির আবশ্যক নাই।

রুসিয়ার দুর্দ্দশার আর একটী প্রধান কারণ লোকের সঞ্চয় ভাবের অভাব। যে যখন যাহা পায় তাহাই খরচ করে ভবিষ্যতের কোন ভাবনা নাই। রুসিয়ার দারিদ্র্যের ইহা একটী প্রধান কারণ। অতিরিক্ত আতিথেয়তাও অনেক সময় দরিদ্রতার কারণ। এই সঞ্চয় ভাবের অভাব বশত রুসিয়ায় ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অনেক বড় বড় মহাজন এইরূপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। একজন লোক এই বলিয়া ভিক্ষা করিতেন, একটু হিসাবের চুকে আমার এই দশা, আমায় কিছু দাও।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, ৩৫ বছর বয়সে ২৫০০ টাকা পাইয়া ৬০ বছরের বেশী বাঁচিব না এই স্থির করিয়া বছরে ১০০০ পর্য্যন্ত খরচ করিতেন। ২৬ বছর পরে এখন ভিক্ষুক।

রুসিয়ায় এক দল ভিক্ষুক আছে যাহারা সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, ভিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু অন্য কর্ম্ম অপেক্ষা ভিক্ষা বৃত্তি তাহারা পছন্দ করে তাই এইরূপে ৮।৯ সিলিং রোজগার করে। রুসিয়ায় দুঃখের অভাব নাই, তাহার উপর ইহারা নানা প্রকারে নিজেদের অঙ্গহীন করিয়া কৃত্রিম দুঃখ দ্বারা দুর্দ্দশার মাত্রা বৃদ্ধি করে। রুসিয়ায় যত ভিক্ষুক আছে সমস্ত য়ুরোপে তত আছে কি না সন্দেহ। ইহাদের এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে ইহাদের কর্ম্ম দিলেও ইহারা তাহা করিতে চাহে না। কৃষককুল অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা অনেক ভাল। রুসিয়ার কৃষকদিগের ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কোথাও নাই। তাহাদের কুসংস্কার ইত্যাদিতে তাহাদের নিন্দা করিবার কিছু নাই তাহারা এখনও যে এত ভাল আছে, তাহাদের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্য সহিষ্ণুতা আছে সেই জন্য তাহাদের প্রশংসা করিতে হয়। সত্যাসত্য তাহারা শিক্ষা পায় নাই, সুতরাং তাহারা দয়ার পাত্র, কিন্তু ঘৃণার নহে। এই হতভাগ্যদের দুঃখ যে কবে ফুরাইবে তাহা বলা যায় না। বলা যায় না ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়; এখনও তাহারা ভয়ানক দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পায় নাই। বর্ত্তমান বৎসরের দুর্ভিক্ষে শত শত গ্রাম উচ্ছন্ন হইয়াছে আবার তাহার উপর মাসাবধি কাল ভয়ানক ওলাউঠা আক্রমণ করিয়াছে। ভারতবর্ষেই এ রোগের আক্রমণ অধিক কিন্তু রুসিয়ায় ইহা এখন যেরূপ প্রচণ্ড সংক্রামক ও ভয়ানক রূপে দেখা দিয়াছে, গ্রামের পর গ্রাম জনহীন করিয়া চলিয়াছে, ভারতবর্ষেও প্রায় সেরূপ হয় না। শুনা যাইতেছে রুসিয়া হইতে য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও ইহা সংক্রামিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যাউক ভবিষ্যৎ কোথায় দাঁড়ায়!

হিমালয়ে নির্ঝরিণী।

বিশাল পর্ব্বত বুকে
নির্ঝরিণী খেলে সুখে,
মনে তার কোন চিন্তা নাই!
পৃথিবী রয়েছে তলে
গাছের ছায়াটী জলে
কাছে মেঘ উড়িছে সদাই।

শুভ্রকেশ হিম গিরি
সুপ্রশান্ত আছে ঘিরি,
চারিদিকে সমুচ্চ শিখর;
নির্ঝরিণী উর্দ্ধশ্বাসে
ঝর ঝরে ছুটে আসে,
স্তব্ধ প্রায় দূর বনান্তর।

সফেণ উল্লাসে ছুটে
কখনো উপলে লুটে,
গিরি বুকে যায় যেন থেমে;
কখনো আনন্দ ভরে
শিলাতলে খেলা করে
শিখরে শিখরে নেমে নেমে।
সারাদিন মত্ত প্রাণে
কিসের স্বপন আনে
কল কলে কেন যায় গেয়ে?

অন্ধকার গুহামাঝে
চির প্রতিধ্বনি বাজে,
দেখে,—হিমাচল, নীলাকাশ চেয়ে।
সংসার যাতনা জ্বালা
তুমি ত জান না বালা,
মনের আনন্দে সদা থাক;
সারাদিন অবসাদে
জগতে কে কোথা কাঁদে
তুমি কি তাহার ঠিক রাখ?

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চিকাগো প্রদর্শনীর স্ত্রী-বিভাগ।

আগামী বৎসর চিকাগো নগরে যে প্রকাণ্ড প্রদর্শনী খোলা হইবে, তাহার স্ত্রী-বিভাগের বিবরণ পাঠক পাঠিকাগণের কৌতুকপ্রদ হইতে পারে "জানিয়া আমরা উম্যানস্ হেরাল্ড" নামক পত্রিকার সাহায্যে ভারতীতে আলোচনার নিমিত্ত সে সম্বন্ধে কতকগুলি খবর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সমগ্র জগতে স্ত্রীজাতির শক্তি, হৃদয় ও বুদ্ধি মানবজাতির কল্যাণ সাধনে ও উন্নতিকল্পে কিরূপ অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা বাণিজ্য ব্যবসা শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কিরূপ উন্নতি লাভ করিতেছেন, যাহাতে তাহা সর্ব্বসাধারণে প্রচার হয়, তাহারই জন্য উক্ত মহামেলায় এই স্ত্রী-বিভাগ। ইতিপূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এরূপ সুযোগ আর কখনও বোধ হয় ঘটে নাই। এই প্রকাণ্ড মেলায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্মানিত ও সমাদৃত হইলে স্ত্রীজাতির উন্নতি লাভের পক্ষে যেমন সুবিধা হইবে এমন যে আর কিছুতে হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যবিভাগ পরিদর্শন করিবার জন্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বন্দোবস্তের তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত সেখানকার গবর্ণমেণ্ট একটী প্রতিনিধি সভা নিযুক্ত করিয়াছেন।

চিকাগো স্ত্রী অধ্যক্ষ সভা এই মেলাতে ইংরেজ মহিলাকৃত শিল্পাদি ও অন্যান্য দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য একটী উৎকৃষ্ট স্থান প্রদান করিয়াছেন। এবং প্রতিনিধি সমিতি চিকাগোর এই অধ্যক্ষ সভার সহিত মিলিয়া পরস্পরে পরস্পরের সাহায্যে একযোগে কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছেন।

ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহটী প্রদর্শনী অট্টালিকাবেষ্টিত সুবিস্তৃত প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে ও প্রদর্শনভূমি সংলগ্ন একটী প্রধান প্রবেশদ্বারের সন্নিকটেই সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার বারান্দা ও ছাদোদ্যান হইতে অবলোকন করিলে প্রদর্শনালয় সৌধশ্রেণী ও অদূরবর্ত্তী হ্রদের একটী জাঁকাল, সুন্দর মনোহর দৃশ্য দৃষ্টিপথে পড়ে। অট্টালিকাটী দৈর্ঘ্যে চারিশত ফিট ও প্রস্থে দুই শত ফিট হইবে এবং ইহা ২ লক্ষ ডলার ব্যয় করিয়া ডিরেক্টারগণ কর্তৃক স্ত্রী অধ্যক্ষ সমিতির নিমিত্ত নির্ম্মিত হইতেছে।

এই অট্টালিকা ও ইহার অভ্যন্তরস্থ শিল্পাদি দ্রব্য সমূহ যাহাতে স্ত্রী জাতির প্রতিভার উদ্দীপক স্বরূপ হইয়া উঠে তাহাই কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। উক্ত ইমারতের জন্য, শিল্পকুশলা মহিলাগণ কর্ত্তৃক কতিপয় নক্সা নির্ব্বাচনার্থে প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে কুমারী শেফি হেড্‌ন্ কৃত নক্সাই মনোনীত হইয়াছে।

এই অট্টালিকায় ইচ্ছামত জলপথে বা স্থলপথে প্রবেশ করিবার জন্য অনেকগুলি প্রবেশদ্বার আছে। এবং এই দ্বারগুলির প্রত্যেকের নিকটস্থ বহিঃপ্রকোষ্ঠ ধরিয়া অট্টালিকার মধ্যস্থিত সর্ব্বোচ্চ গ্যালারীতে আসিয়া পড়িলে সম্মুখস্থ আলোক গবাক্ষ ও দ্বিতলের স্তম্ভবেষ্টিত ছাদটী দৃষ্টিগোচর হয়; মহিলাশিল্পী-কৃত বিশেষ বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ কারুকার্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য এই গ্যালারীটী নির্দ্দিষ্ট হইবে। এখন হইতেই অধ্যক্ষ সভা একটী সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যের নিমিত্ত নানাপ্রকারে সাহায্য ও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। ইঁহাদিগের ইমারত নির্ম্মাণের কার্য্যপ্রণালীর সুখ্যাতি এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে ও মেলার সময় ইহার উৎকর্ষতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ছাদোদ্যানের স্তম্ভগুলি স্ত্রী মূর্ত্তির অনুকরণে নির্ম্মাণ করিবার জন্য জনৈক রমণী নিযুক্ত হইয়াছেন ও অট্টালিকাটীর প্রধান প্রধান প্রবেশদ্বার সমূহের উপরিভাগে মূর্ত্তি গঠন ও কার্ণিসে ভাস্করকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সুদক্ষ মহিলাগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যের নিপুণতা ও পারদর্শিতা দেখাইবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। বাড়ীটীর চিত্রোপযোগী স্থলগুলির চিত্রাঙ্কনের ভার, যে সকল অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে, তাঁহাদের হস্তেই অর্পিত হইবে, এবং সম্ভবতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইংরেজ মহিলা-শিল্পীগণ এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইবেন। অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ অঙ্গসৌষ্ঠব কার্য্যের শ্রী সম্পাদন করিবার জন্য রমণীগণ নিযুক্ত থাকিবেন।

যাঁহারা কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠপ্রাচীর, জানলা খড়খড়ি, সোপান সংলগ্ন রেলের মধ্যস্থিত স্তম্ভশ্রেণী, গৃহনির্ম্মাণোপযোগী লৌহ পিত্তল প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্যসমূহ, অট্টালিকাটীর নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহার করিয়া আপন আপন শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকেও বিশেষ সুবিধা প্রদর্শন করা হইবে। যে সকল রমণীগণ বা শিল্পসমিতি

মহিলামন্দিরটী তাঁহাদিগের শিল্পনৈপুণ্য দ্বারা সজ্জিত করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা স্ত্রী অধ্যক্ষ সভার সম্পাদিকার নিকট আবেদন করেন; স্ত্রী অধ্যক্ষ সভা তাঁহাদিগকে দ্রব্যাদির পরিমাণ সম্বন্ধে সময়োচিত বিশেষ বিবরণ দিতে ও পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে তাহা প্রদর্শনোপযোগী স্থল অধিকার করিতে পারে সে বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিতে চেষ্টা করেন।

মহিলামন্দিরটী নানান বিভাগে বিভক্ত করা হইবে, এবং ঐ সকল বিভাগে রমণীগণের সামাজিকসূত্রে একত্রে সমবেত হইবার নিমিত্ত বৈঠকখানা, বারান্দা, পাঠগৃহ, ছাদোদ্যান, সভাগৃহ, বৃহৎ সভার নিমিত্ত একটী প্রকাণ্ড হল প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থান, নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। এই মহতী সভায় মহিলাগণ একত্রিত হইয়া পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন ও সুবিখ্যাত পরিদর্শকবৃন্দের বক্তৃতাদি শুনিবেন।

উল্লিখিত বিভাগে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ও হর্ষপ্রদ বিশেষ বিশেষ ব্যাপারেও রমণীগণ অবারিত প্রবেশ লাভ করিবেন। যে প্রকোষ্ঠটী পুস্তকাগার, তাহাতে কেবল স্ত্রী লেখিকাগণ প্রণীত পুস্তকই স্থান পাইবে। কার্য্যে নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত রমণীগণ তাঁহাদের যে সকল কার্য্য ভাল করিয়া প্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, সেই সকল কার্য্যের অবস্থাবিবরণী অন্য একটী প্রকোষ্ঠে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। একটী আদর্শ চিকিৎসালয়ও থাকিবে এবং তাহাতে স্ত্রী-চিকিৎসকগণ ও সুশিক্ষিত ধাত্রী সকল আপনাপন ব্যবসায়োপযোগী বেশে নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন।

যে সকল বালকবৃন্দ বা মহিলাগণ আকস্মিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বা ক্লান্তিবশতঃ অসুখ বোধ করিবেন তাঁহাদিগের শুশ্রূষা ও স্বচ্ছন্দতা প্রদান করিবার জন্য একটী সাধারণ বিভাগ খোলা হইবে এবং উক্ত চিকিৎসালয়ের কার্য্য পর্য্যায়ক্রমে এক একটী রাত্রিবিদ্যালয় কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কি উপায়ে রোগীর উত্তম শুশ্রূষা হইতে পারে সে বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইবে ও দৃষ্টান্তনিচয় দ্বারা তাহা সপ্রমাণিত করিয়া বুঝান হইবে।

কিণ্ডারগার্টেন গৃহটিও অন্যান্য বিবিধ সমিতির ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইবে এবং উক্ত সমিতির সকলে তাঁহাদিগের কার্য্য প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা প্রদর্শন করিলে তাঁহাদের মধ্যে সমান ভাগে সময় বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রত্যেক বিভাগের প্রতি যথেষ্ট যত্নপ্রদর্শন করা হইবে বিশেষতঃ বালিকাশিক্ষা ও তাহার উন্নতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। স্বাস্থ্যবিধানোপযোগী একটী আদর্শ রন্ধনশালাও নির্ম্মিত হইবে, ইহাতে বায়ু গমনাগমনের উপায় থাকিবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত শ্রম বাঁচাইবার উপায় ও অন্যান্য সুবিধা সকল পরিলক্ষিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সমিতি সকল রন্ধন গৃহে উপস্থিত থাকিয়া পাকপ্রণালী বিষয়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা প্রদান করিবেন। খাদ্য দ্রব্য সমূহের তালিকা সকল বিজ্ঞানবিৎগণের হস্তে অর্পিত হইবে এবং উহাদিগের মূল্য, প্রস্তুত করিতে কিরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে ও পুষ্টিকারিতা বিষয়ে সম্যক আলোচনা হইবে।

নক্সাকারিণী ও শিল্প-প্রণেত্রীগণের সাহায্যার্থে কারুকার্য্যসম্পন্ন সূচী কার্য্য, পুরাতন জরি ফিতা প্রভৃতি ও নানাবিধ রত্নালঙ্কার ও রৌপ্যাদি নির্ম্মিত দ্রব্য সমূহ ভাড়া করিয়া সংগ্রহ করা হইবে। স্ত্রী অধ্যক্ষ সমিতির সহকারী সভাকে নিম্নলিখিত উপায়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

১। প্রতিযোগিতার নিমিত্ত মূল অট্টালিকাতে মহিলাগণের বিবিধ ব্যবসায়ের পরিচায়ক ভিন্ন ভিন্ন প্রদর্শনোপযোগী দ্রব্য সমূহ সংগ্রহ করিতে হইবে।

২। প্রদর্শনোপযোগী প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য মহিলাগণকে কি পরিমাণে শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণ ও যতদূর সম্ভব, তৎসংক্রান্ত কৌতূহলোদ্দীপক কারণ সকল সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩। মহিলা মন্দিরের প্রদর্শন-গ্যালারীতে প্রবিষ্ট হইবার উপযোগী উৎকৃষ্ট শিল্প সমূহ তথায় গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইবে।

৪। ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন জুরীদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত যে সকল মহিলাগণ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সেই বিভাগে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সমিতিকে অনুরোধ করা হইবে।

৫। মহিলাগণ কর্ত্তৃক নিম্ন শিক্ষা হইতে উচ্চ শিক্ষার পরিচালন কার্য্য যাহাতে প্রদর্শিত হয় যত দূর সম্ভব তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং যে স্থলে প্রদর্শন করিয়া দেখান অসম্ভব সে স্থলে মানচিত্র ফটোগ্রাফি প্রভৃতির সাহায্যে যাহাতে বুঝান হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬। মহিলাগণের বদান্যতা, লোক হিতকর ব্রত এবং স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতাবর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহাদের চেষ্টা ও উন্নতি যাহাতে প্রদর্শিত বা লিপিবদ্ধ হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পুরুষ কর্ত্তৃক নগণ্য হইলেও রমণীগণ কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ সুদক্ষ ও কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন, আদর্শানুরূপ অসংখ্য দাতব্যশালা, শিক্ষালয়, সংস্কারনিলয় প্রভৃতি স্থাপনা দ্বারা, পরের দুঃখমোচন ও সামাজিক অত্যাচার এবং চিরপ্রচলিত কুপ্রথা সকলের সংস্কার করিতে সাহসী হইয়া শান্তি প্রচার ও উন্নতিকামনা করিবার চেষ্টা করাই যে রমণীর ধর্ম্ম তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীমতী ফ্রেঞ্চ বেল্ডন যাহাতে তাঁহার আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত দ্রব্যসমূহ মহিলা-মন্দিরে প্রদর্শন করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছে, জীবতত্ত্বসমিতি, এরূপ দ্রব্য অত্যন্ত দুর্ল্লভ, প্রায়ই দেখা যায় না বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এ দ্রব্যগুলি মেলার একটী বিশেষ আকর্ষণ সুতরাং স্ত্রীলোকমাত্রেরই ইহা দেখিতে আসিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

৭। স্ত্রী-অধ্যক্ষসভার মন্তব্য সকল সংবাদ পত্রের সম্পাদিকাগণ কর্ত্তৃক প্রধান প্রধান

পত্রিকাসমূহে প্রকাশ করাইয়া সমগ্র জগতে যাহাতে উহা প্রচার হয় সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে।

৮। পুরাতন জরী, ফিতা, কারুকার্য্য নির্ম্মিত সূচীকার্য্য পাখা প্রভৃতি প্রদর্শনোপযোগী দ্রব্য সমূহ ভাড়া করিয়া সংগ্রহ করিবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে।

৯। মহিলামন্দিরে পুস্তকাগারটির নিমিত্ত স্ত্রীলোকপ্রণীত পুস্তক সমূহ বিশেষতঃ বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পসম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ করিতে হইবে।

১০। যাহাতে পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত মহিলাগণের শিল্পাদি কার্য্যের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ের পরিচায়ক ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রদর্শনোপযোগী দ্রব্য সকল সংগ্রহ করিতে হইবে।

এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি প্রকৃত কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে সমগ্র জগতে স্ত্রীজাতির অবস্থার ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষতার পরিচয় প্রদান বিষয়ে এরূপ অভূতপূর্ব্ব মহৎ সুযোগ আর কখন ঘটে নাই তাহা স্পষ্টই অনুভূত হইবে।

মহিলাদিগের উপজীবিকার কিরূপ নূতন নূতন পন্থা খোলা হইতেছে ও নবোদ্ভাবিত এই সকল পন্থাগুলির মধ্যে কোন গুলি অবলম্বন করিলে তাঁহাদের কার্য্য বিশেষরূপে সমাদৃত হইবে এবং কিরূপ শিক্ষা দ্বারা তাঁহাদিগের ভবিষ্যতে সুবিধা লাভ হইতে পারে বা কি প্রকারে তাঁহারা আপনাদের ও জগতের নিকট তাঁহাদের কার্য্য আদরণীয় করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন তাহা সামর্থ্যবিহীন অসহায়া যে সকল স্ত্রীলোক উপজীবিকার নিমিত্ত সতত জীবনসংগ্রাম করিতেছেন তাঁহাদিগকে প্রতিপন্ন করিয়া বুঝাইতে স্ত্রী-অধ্যক্ষ সভা বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

সাধারণ প্রদর্শনালয়ের যে যে স্থলগুলিতে প্রতিযোগিতার নিমিত্ত প্রদর্শনোপযোগী দ্রব্য সকল স্থাপিত হইবে সেই স্থলে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির দ্রব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। আর এখন যখন জগতের সকল কারখানাতেই রমণীগণ পুরুষদিগের সহিত সমানভাবে কাজ করিতেছেন, তখন উভয়জাতীয় কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ বজায় রাখিতে চেষ্টা করা যে কেবলমাত্র অসম্ভব তাহাই নয় অধিকন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া পুরস্কার বিতরণ না করিলে মহিলাগণ পুরস্কার পাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন না। মহিলাগণকৃত দ্রব্যাদির নিপুণতার বিচার করিয়া পারিতোষিক বিতরণার্থে নিয়োজিত জুরীদিগের মধ্য হইতে সভ্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য স্ত্রী-অধ্যক্ষ সভা বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।

মুসলমানরাজ-দণ্ডবিধি।

এখন আমরা সুশাসিত ইংরাজ রাজ্যে এত শান্তি ও সুশাসন এত আইনকানুনের বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিয়াও পেনাল কোডের কঠোরতা অনুভব করিতেছি। কিন্তু তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মোগল রাজত্বের সেই একচ্ছত্রা উজ্জ্বলতর গৌরবময়ী দিনে দণ্ডবিধি আইনের কিরূপ তীব্রতা ও কঠোরতা ছিল তাহা নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী হইতে সম্পূর্ণ রূপে অবগত হওয়া যাইবে।

ইংরাজরাজের দণ্ডবিধি আইন—দয়া-পরিপূর্ণ বিধানাবলীতে পরিশোভিত এ কথা আমরা বলিতেছি না, এখন রাজা আইন করিয়া সাধ্য মতে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সেকালে রাজা নিজে আইন করিয়া এক এক স্থলে তাহা এ প্রকার শোচনীয় ভাবে উল্লঙ্ঘন করিতেন যে তাহা ভাবিয়া বিশেষ রূপে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আমাদের বর্ণনীয় বিষয় তদানীন্তন ভারত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের কয়েকটি ঘটনা লইয়া সংগঠিত হইয়াছে। গৌরবান্বিত, উদারহৃদয়, আদর্শসম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও যে দণ্ডবিধি আইন সম্পূর্ণরূপে কঠোরতা বর্জ্জিত ছিল তাহা নহে। জাহাঙ্গীর নিজে কতকগুলি আইনকানুন করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাদের ভিত্তি তাঁহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতির সংগঠিত বিধানের উপর। জাহাঙ্গীর যদিও নিজের আইনে কঠোরতর দণ্ডবিধানের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি কার্য্যে তাহা কতদূর পরিণত হইয়াছিল তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ গুলি হইতেই বিশেষ রূপে প্রমাণিত হইবে।

হস্তপদ নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন তৎকালীন দণ্ডবিধির প্রচলিত ধারা ছিল। স্বয়ং জাহাঙ্গীর সাহ তাঁহার পঞ্চম আইনে এইরূপ বিধান করিয়াছিলেন "আমি কোতোয়াল ও কাজীদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছি যে, অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন তাঁহারা কাহারও নাক কাণ কাটিয়া দণ্ড বিধান করিবেন না। এবং আমিও খোদার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে এই প্রকার নৃশংস উপায়ে কাহারও কখন দণ্ড বিধান করিব না।"

আমরা প্রতিপদে দেখিতে পাই তিনি এ সকল বিধানের বা প্রতিজ্ঞাবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কখন চলেন নাই। তিনি তাঁহার নিজলিখিত জীবন বৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"আগরার রাজপথে এক দল দস্যু সর্ব্বদাই লুঠপাঠ করিত। অনেক দিন ধরিয়া আমি তাহাদের আয়ত্বে আনিতে পারি নাই কিন্তু এক সময়ে তাহাদের কয়েক জনকে ধরিতে পারিয়া তাহাদিগকে হস্তীর পদতলে মর্দ্দিত করিয়া বিনাশ

করিয়াছিলাম *। আর এক স্থলে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—"ভগবানদাসের পুত্রেরা রাজ্য মধ্যে বড়ই উপদ্রব ও অত্যাচার করিতেছিল। তাহাদের জন্য নূতন নরক প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি হস্তীপদতলে তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত করতঃ সেই নরকের পথে পাঠাইয়াছি।"

জাহাঙ্গীর তাঁহার রাজত্বকালের একাদশবর্ষের বিবরণের এক স্থলে লিখিয়াছেন—"১০২৫ হিজিরায় (ইংরাজি ১৬১৬ খৃঃ অব্দ) হিন্দুস্থানে এক ভয়ানক "ওয়াবা" মড়ক দেখা দিল। প্রথমতঃ ইহা পঞ্জাবে দেখা দেয় তার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া লাহোর আসিয়া পৌঁছায়। ইহাতে আমার হিন্দুমুসলমান প্রজাবর্গের মধ্যে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিল। লাহোর হইতে আরম্ভ করিয়া সরহিন্দ প্রদেশ দিয়া ইহা দিল্লী আসিয়া পৌঁছিল। এই সময়ে দেশে দুই বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। আমি বহুদর্শী চিকিৎসক ও পণ্ডিতবর্গকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা ইহাকে "দুর্ভিক্ষের" অব্যবহিত ফল স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

এই দুর্ভিক্ষের সুযোগ পাইয়া কতকগুলি দস্যু কোতয়ালির ধনভাণ্ডার লুঠ করিল। আমি সেই হতভাগাগুলাকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদের মধ্যে সাত জনকে ধরিলাম। তাহাদের কাছে লুণ্ঠিত ধনের কতকাংশ পাওয়া গেল। আমি সেই দস্যুদিগের উপর এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম যে তাহাদিগকে যথেষ্ট শাস্তি দিতে মনস্থ করিলাম। আমি ছয় জনকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া তাহাদের দলপতিকে হস্তীপদ-তলে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা দিলাম। সেই হতভাগ্য সবিনয়ে করজোড়ে আমার নিকট প্রার্থনা করিল হাতির পায়ের নীচে যন্ত্রণা পাইয়া মরা অপেক্ষা তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মনাশ করিতে সে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। কৌতূহলপরবশ হইয়া আমি ইহাতে সম্মতি দিলাম। তাহার হাতে একখানি ছোরা দেওয়া হইল। দস্যুপতি অনেকবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইতে বিশেষ সাহসিকতার সহিত আত্মরক্ষা করিল। আমি তাহার বীরত্বে মোহিত হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলাম, এবং রক্ষীদিগকে বলিয়া দিলাম ইহাকে কঠোর পাহারার মধ্যে আটক করিয়া রাখ। কিন্তু সেই অকৃ-তজ্ঞ একদিন অবসর পাইয়া কারাগার হইতে পলায়ন করিল। তখন আমি ক্রোধান্ধ হইয়া জাইগীরদারদের উপর হুকুম দিলাম যেন তাহারা তাহাকে ধরিতে পারি-লেই আমার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া গাছে লটকাইয়া দেয়।"

ইহা ত গেল সাধারণ প্রজা বা দস্যুদিগের কথা। এক সময়ে জাহাঙ্গীর সাহ তাঁহার নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহের মূর্দ্ধা স্পর্শ করিতে আজ্ঞা করেন। সে তাহাতে ভীত হওয়াতে তিনি নিজের পুত্রকে সেই স্থান স্পর্শ করিতে আদেশ করেন। পিতার

---

* Price's Memoirs. PP 34 and 37.

কঠোর শাসন ভয়েই হউক অথবা বীরত্ব দেখাইবার জন্যই হউক কিশোর বয়স্ক কুমার তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। কিন্তু সম্রাট এই সামান্য সাহসহীনতার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে কারাবদ্ধ করিলেন। *

গুজরাটের দুর্গম বন প্রদেশে "কুলী" বলিয়া এক জাতীয় লোক বাস করিত। তাহারা নগরে ও গ্রামে লুণ্ঠন ও তস্করবৃত্তি দ্বারা লোকের উপর অনেক অত্যাচার করিত। ইহাদের অত্যাচার ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত জাতিকে নিধন করিবার আদেশ দিলেন। অনেককে হত্যা করা হইল এবং যাহারা প্রাণ লইয়া পলাইল সুদূর পার্ব্বত্য প্রদেশ ও মরুভূমি পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করা হইল। †

বিখ্যাত ভ্রমণকারী হকিন্স (ইনি রো'সাহেবের আগে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন) তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন "আমি যে সময় তাঁহার রাজসভায় ছিলাম সে সময়ে জাহাঙ্গীর অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ বার তিনি কতকগুলা ক্ষিপ্ত হাতী ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সামান্য অপরাধী বা বেতনভুক্ত লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। ইহাতে অনেকেই পঞ্চত্ব পাইত আবার যদিও আঘাত প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বাঁচিবার কিছু সম্ভাবনা থাকিত, তিনি তাহাকে দুর্গপ্রাকার হইতে যমুনাতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিতেন। কোন লোককে এইরূপে আহতাবস্থায় দুর্গপ্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বাদসাহ অম্লান বদনে উত্তর দিয়াছিলেন "ও লোকটা খোঁড়া ও অঙ্গহীন হইয়া কেন আমাকে যাবজ্জীবন শাপ দিবে তদপেক্ষা উহার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।" হস্তীর বিশালদশনে মনুষ্যদেহ বিদীর্ণ হওয়ার দৃশ্য তাঁহাকে বড়ই আনন্দদান করিত। ‡

আর এক সময়ে একজন অন্তঃপুরিকা হারেমের মধ্যে কোন খোজার প্রণয়ে আবদ্ধ হয়। আর এক যুবক সেই রমণীকে ভাল বাসিত, সে প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া তাহার প্রণয়িনীর জারকে হত্যা করে। এই কথা বাদসাহের কানে উঠিল। তিনি সেই হতভাগিনী রমণীকে মাটীতে অর্দ্ধপ্রোথিত রাখিতে আদেশ করিলেন। তাহার শরীরের অর্দ্ধেক মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত হইল ও অপরার্দ্ধ ভূমির উপরে রহিল। তিন দিন এই প্রকার অবস্থায় অনাহারে থাকিয়া সূর্য্য কিরণ ও রাত্রের দারুণ শীতে কষ্ট পাইয়াও যখন সে বাঁচিয়া উঠিল তখন বাদসাহ তাহার অপরাধ মার্জ্জন করিয়া মুক্তি দিলেন। বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত হত্যাকারী হত্যার পর দিনই হস্তীপদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। §

* Kerr's Collection of Voyages and Travels Vol. ix., P. 275.

† Mill's History of British India. Vol. 2., P. 359.

‡ Narrative by W. Hawkins Vol. 1., P. 220.

§ Sir. T Roe's Accounts of Jahangir Vol. 1., P. 278.

যে সকল আমোদে লোকের জীবন হানি হইত জাহাঙ্গীর সেই সমস্ত নিষ্ঠুর আমোদ দেখিতে ভাল বাসিতেন। হকিন্স সাহেব তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের এক স্থানে লিখিয়াছেন এক দিন এই সমস্ত নিষ্ঠুর ক্রীড়া দেখিতে দেখিতে বাদসাহ এতদুর উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে সেই ভয়ানক রাত্রে তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া তাঁহার প্রাসাদ রক্ষক দশজন প্রহরীকে এক উত্তেজিত সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। তিনি প্রহরীদিগকে একে একে সিংহের সম্মুখে যাইতে আদেশ করিলেন, নিরুপায় হতভাগ্য প্রহরীরা সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণরূপে রক্তাক্ত ও আহত হইয়া মৃতকল্প হইল। তাহাদের মধ্যে আবার তিনজন সেই ভীষণ সিংহের করাল আঘাতে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইল।

"আগষ্ট মাসের ৯ই তারিখে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত দস্যু ধৃত হইয়া বাদসাহের সম্মুখে আনীত হইল। তিনি তাহাদের অপরাধের কোনরূপ বিচারাদি না করিয়াই একবারে বধ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাহাদের দলপতিকে কুকুর দিয়া খাওয়াইবার আজ্ঞা হইল। বাদসাহের আদেশে নগরের জনপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন কোতোয়ালিতে লইয়া সেই দস্যুদলের প্রাণবধ করা হইল। আমার আবাস বাটীর নিকটেই দস্যু দলপতির দণ্ড হইয়াছিল। ওঃ কি ভীষণ দৃশ্য! বারটী বিকটদর্শন কৃষ্ণবর্ণের কুকুর ভীষণ দ্রংষ্টা দ্বারা দলপতির হস্তপদবদ্ধ শরীর সেই প্রকাণ্ড রাজপথে খণ্ড বিখণ্ড করিল। রুধির স্রোতে সেই প্রকাণ্ড রাজপথ কলঙ্কিত হইল। এ সকল মৃতদেহের আবার সৎকার পর্য্যন্ত হইল না। লোকের চোক্ষে বিভীষিকাময় দৃশ্য খুলিয়া সেই সমস্ত রক্তাপ্লুত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মৃতদেহ প্রকাণ্ড রাজপথে কয়েক দিন ধরিয়া পচিতে লাগিল।"

জাহাঙ্গীরের রাজসভায় পারস্য দেশ হইতে অনেক যুবক চাকরির জন্য আসিত। তিনি তাহাদিগকে এক অভূতপূর্ব্ব উপায়ে পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার কটিবন্ধে এক সূচ্যগ্রভাগবিশিষ্ট তরবারি থাকিত। যখন কোন নবাগত পারস্য যুবক তাঁহার সভাভঙ্গের পর উপস্থিত থাকিত তখন তিনি অবসর বুঝিয়া অলক্ষিত ভাবে তাহাদের কর্ণের এক স্থান সেই সূচ্যগ্রভাগ অস্ত্র দ্বারা বিঁধিয়া দিতেন। যদি সে ব্যক্তি এই অতর্কিত আঘাতে কোন প্রকার চীৎকার করিয়া উঠিত তবে সে কোন প্রকার চাকরী পাইত না। এ প্রকার ব্যবহারের জন্য ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইত। আবার যে কোন প্রকার যাতনাব্যঞ্জক শব্দ বা চীৎকার না করিত জাহাঙ্গীর তাহাকে সাহসী বিবেচনা করিয়া তাহার উপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করিতেন।

এক দিন জাহাঙ্গীর স্বীয় বিলাস গৃহে ওমরাহদিগকে লইয়া মদ্যপান করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে পান করিতে আদেশ করিবামাত্র তাহারা এত অধিক পরিমাণে পান করিল যে তাহাতে তাহাদের ঘোরতর মত্ততা জন্মিল। তাহাদের সেই মত্ততার কথা জাহাঙ্গীর পর দিন প্রাতে অবগত হইয়া সেই সম্রান্তবর্গকে কশাঘাত করিতে

আদেশ করিলেন। সেই কঠোর ও নৃশংস বেত্রাঘাতে তাহাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তস্রোতে সেই স্থান প্লাবিত হইল। ইহার পর জাহাঙ্গীর তাহাদিগকে তাঁহার সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত করিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজকুমার খস্রু একসময়ে পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বিদ্রোহ-ব্যাপার মোগল-রাজকুমারদের পৈত্রিক বলিলেও বেশী হয় না। যখন কুমার ধৃত হইয়া পিতার সমক্ষে আনীত হইলেন তখন তাঁহার হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন বিদ্রোহী ছিল। বাদসাহ তাহাদিকে নূতনবিধ ধরণে শাস্তি দিবার মনস্থ করিলেন। একটী বৃষ ও একটী গাধার চর্ম্ম ছাড়াইয়া হাসনবেগ ও আবদুল রহিম নামক কুমারের দুইজন সহযোগীকে সেই মৃত পশু চর্ম্ম মধ্যে পুরিয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হইল। পরে তাহাদিগকে গাধায় চড়াইয়া নগরের পথে পথে পরিভ্রমণ করান হইল। এবং তাঁহার সহ-চরদিগের মধ্যে জনকয়েককে শাণিত বর্ষাফলকের উপর চড়াইয়া মারিয়া ফেলা হইল। বলা বাহুল্য খসরু সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন। এসকল নৃশংস কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইল কেবল বিদ্রোহী কুমারকে শিক্ষা দিবার জন্য।

জাহাঙ্গীর সাহ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া একস্থলে লিখিয়াছেন "একদিন কোতোয়াল আমার নিকট একটী পুরাতন দাগী অপরাধীকে আনিল। তাহার মতন বদমায়েস পাকা চোর আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। প্রত্যেক অপরাধের দণ্ড স্বরূপ তাহার এক একটী অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছিল। প্রথম অপরাধের জন্য তাহার ডান হাত দ্বিতীয় বারে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি, তৃতীয় বারে বামকর্ণ, চতুর্থ বারে একটী পায়ের গোড়ালী এবং সর্ব্বশেষে তাহার নাসিকাচ্ছেদন দণ্ড হইয়া গিয়াছিল। এবার অন্য কোন শাস্তি না পাইয়া প্রাণ দণ্ডের জন্য আদেশ করিয়া তাহাকে জহ্লাদ হস্তে সমর্পণ করিলাম।"

স্যর টমাস রো একস্থলে লিখিয়াছেন—"আমি ১লা ডিসেম্বর ছয় ক্রোশ পথ অতি-বাহিত করিয়া রামসরে পৌছিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম বাদসাহ এক শত লোককে চৌর্য্য ও ডাকাইতি অপরাধে প্রাণ দণ্ড করিয়াছেন। * * * * ৪ঠা তারিখে দেখিলাম পথিমধ্যে একটী উট যাইতেছে তাহার উপর ৩০০ ছিন্ন মস্তক!! কান্দাহারে যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদেরই ছিন্ন মস্তক সেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে দিল্লীতে বাদসাহের নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে!"

গুজরাটের প্রান্ত প্রদেশে রাজা বিক্রমজিত বলিয়া এক ক্ষুদ্র সামন্ত ছিলেন। কল্যাণ বলিয়া তাঁহার এক দুর্দ্দান্ত পুত্র ছিল। কল্যাণ অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল। সে হিন্দু হইয়া এক সামান্য যবনী লইয়া বিলাস সম্ভোগে উন্মত্ত থাকিত। যবনীর পিতা মাতা জানিতে পারিলে পাছে তাহার কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে কল্যাণ তাহার পিতা মাতাকে সুযোগ ক্রমে হত্যা করিয়া নিজের বাড়ীর মধ্যে পুতিয়া রাখে। এই ঘটনা প্রকাশ হইবার পর কল্যাণ যখন বন্দী হইয়া বাদসাহের সম্মুখে আসিল তখন বাদসাহ

তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে আদেশ দিলেন। এ কঠোর দণ্ডের পরও সেই যবনী-জার কল্যাণ যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ হইয়া রহিল।

বিদ্রোহীদিগের শাস্তি জাহাঙ্গীরের বিধানানুযায়ী সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। সম্রাট হইবার পূর্ব্বে তিনি কিরূপ দৃঢ়হস্তে অপরাধীর শাস্তি বিধান করিতেন নিম্নোদ্ধৃত ঘটনাটী পড়িলে পাঠক তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। জাহাঙ্গীরের একজন "ওয়াকিয়ানবিশ" গুপ্ত সংবাদবাহক ছিল। এ ব্যক্তি জানি না কি-অব্যক্ত কারণে আর দুইজন রাজপুরস্থ প্রহরীর সহিত চক্রান্ত করিয়া একদিন যুবরাজ সেলিমের জীবনের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা করে। একথা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন তাহারা তিনজনে কোথায় যে পলাইল তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে প্রকাশ পাইল যে তাহারা প্রাণভয়ে সুলতান দানিয়েলের কাছে আশ্রয় লইতে যাইতেছে। বলা বাহুল্য সেই হতভাগ্যেরা পথিমধ্যে ধরা পড়িল। শৃঙ্খলিত হইয়া যখন তাহারা যুবরাজ সেলিমের নিকট আনীত হইল তখন তিনি তাহাদের দেখিয়া এতদূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে তাহাদের মধ্যে ওয়াকিয়ানবিসকে এই সকল কর্ম্মের অধিনায়ক বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। সে দণ্ডাজ্ঞা এই, তাহার শরীরের চর্ম্ম জীবন্ত অবস্থাতে ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে! তাহার সহযোগী দুই জনের প্রতিও অনুরূপ কুৎসিত দণ্ডবিধানের আদেশ হইল। এ দণ্ডাজ্ঞা পালিত হইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না।

তখন হিন্দুস্থানের জলন্তসূর্য্যস্বরূপ ন্যায়বান আকবর সাহ ভারত সম্রাট। পুত্রের এই অশ্রুতপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতার কথা তাঁহার কাণে উঠিল। যাহারা একথা তাঁহার কাণে তুলিতে সাহস করিল—তাহারা এটুকুও বুঝাইয়া দিল যে দণ্ডিত ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কেবল মাত্র সন্দেহের জোরে যুবরাজ সেলিম তাহাদের প্রতি এই প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব দণ্ড বিধান করিয়াছেন। যুবরাজ তাঁহার অন্য দুই ভ্রাতাদিগের সহিত মিশিয়া মাঝে মাঝে এই প্রকার বিসদৃশ দণ্ড বিধান করিয়া জিঘাংসাবৃত্তির চরিতার্থ করিয়া থাকেন। দয়ালু ন্যায়পরায়ণ আকবর সাহ এই শোচনীয় সংবাদ অবগত হইয়া অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলেন। পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিলেন—"বৎস! তোমার এরূপ নৃসংশতা মার্জ্জনার যোগ্য নহে। আমি একটী ক্ষুদ্রপ্রাণ ছাগবৎসকে চর্ম্মবিযুক্ত হইতে দেখিলে ব্যথিতচিত্ত হই আর আমার ঔরসজাত পুত্র হইয়াও তুমি কিরূপে মানবের স্বাভাবিক দয়া মায়া বিসর্জ্জন করিয়া পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া এই প্রকার নিষ্ঠুর কাণ্ড সমাহিত করিলে?"

আমরা উপরে যে সমস্ত উদাহরণ তুলিয়াছি তাহার উপর আর একটী বিভীষিকাময় চিত্র তুলিয়া বর্ত্তমান প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

জাহাঙ্গীরের সভায় খাঁ দুরান্ নামে এক সম্ভ্রান্ত আমীর ছিল। এক সময়ে এ ব্যক্তি নিতান্ত কুগ্রহবশে বাদসাহকে (জাহাঙ্গীর) তাঁহার অগোচরে কোন প্রকার কটুকাটব্য

বলিয়াছিল। বাদসাহ একথা শুনিয়া অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা দিলেন তাহার মস্তকের উপর হইতে চিবুকের নিম্ন পর্য্যন্ত অর্দ্ধভাবে বিদীর্ণ করিয়া দেওয়া হউক। এবং তাহাকে ছাউনীর চারিদিকে সকল লোকের সম্মুখে ঘুরাইয়া আনা হউক। এই নৃশংস আজ্ঞা পালিত হইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। তাঁহার অনুচরেরা পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া এই কঠোর আজ্ঞা পালন করিল। যাহারা ইহা দেখিল তাহাদের জিহ্বা বোধ হয় চিরকালের জন্য শক্তিহীন হইল।

জাহাঙ্গীরের শোণিত পিপাসার একটী জ্বলন্ত উদাহরণ নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে। তিনি তাঁহার স্বহস্তে লিখিত জীবনচরিতের একস্থলে লিখিয়াছেন "সাহ তমাস্প স্বর্গে গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার একটী কথা আমার আজও স্মৃতিপথে আছে। সেটী না বলিয়া আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। এক সময়ে পারস্যাধিপ (সাহ তমাস্প) তাঁহার প্রাসাদ মধ্যে এক সুন্দর চৌবাচ্ছা প্রস্তুত করাইয়া কয়েক জন বিশ্বস্ত অমাত্যসঙ্গে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। সাহ কৌতুহলপর-বশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সুন্দর চৌবাচ্ছা জল ব্যতীত আর কোন্ দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিলে সুন্দর দেখায় ?" একজন অমাত্য উত্তর করিলেন "যদি ইহা সুবর্ণে পরিপূর্ণ করা যায় তদপেক্ষা সুন্দর ও সুখকর দৃশ্য আর কিছুই হইতে পারে না।" সাহ হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার কথা তোমার ধনলোলুপতার পরিচায়ক।" আর একজন বলিলেন "ইহা সুমিষ্ট সরবতে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে শর্করা ও বরফ মিশ্রিত করিলে ইহার সম্মান রক্ষা হয়।" সাহ তীব্র বিদ্রূপ ছলে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "আমার বোধ হয় তুমি অহিফেন সেবন কর তাই সরবতের ব্যবস্থা করিতেছ।" অনেকে অনেক প্রস্তাব করিল কিছুই পারস্যাধিপের মনোনীত হইল না, তখন তিনি সহাস্যে বলিলেন "দেখ ! তোমরা কেহই আমার মনের কথা বলিতে পারিলে না। আমার ইচ্ছা আমি এই চৌবাচ্ছা নরশোনিতে পরিপূর্ণ করি। যাহারা আমার ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারী, যাহারা রাজ্যের বিদ্রোহী তাহাদেরই শীতল শোনিতে এই জলাধার পূর্ণ হয় ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা।" আমি বলি একথা যথার্থই বলা হইয়াছে কেন না আমার পিতার মৃত্যুর পর আমার রাজ্যমধ্যে এই প্রকার বিদ্রোহীর সংখ্যা দেখা যাইতেছে।"

সেকালে বিচার প্রথা বড় অসম্পূর্ণ ছিল। বিচার কার্য্য অতি তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হইত। অপরাধীরা কখনও ফাঁসি যাইত কখন ছিন্নশির হইত, কখনও বা কুকুর-দ্বারা ভক্ষিত কখনও বা হস্তীপদমর্দ্দিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিত—আবার কোন স্থলে বা বিষাক্ত বিষধর দংশিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। দণ্ড প্রদানের স্থল কারাগার বা কোন নিভৃত নিলয় নহে, প্রকাশ্য জনপরিপূর্ণ বাজার বা চত্বরে এই সমস্ত নৃশংস লোম-হর্ষক বিভীষিকাময় ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত।

এ সমস্ত বিষয় এখন আলোচনা করিলেও হৃদয় ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া উঠে। পাঠক !

উল্লিখিত ঘটনাগুলি আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে, ইতিহাসের জ্বলন্ত সত্য মাত্র। মুসলমান রাজত্ব ও ইংরাজ রাজত্বের শান্তির প্রকার ভেদ একবার দেখুন।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ছবি।

শুধু ছবি শুধু ছায়া
শুধু চিত্রকর মায়া
তাহা ছাড়া আর কিছু নয়?
বুঝাব কেমন করে
কত উহা প্রাণ ধরে
মোর কাছে কত প্রাণময়!
এই এ অনন্ত বিশ্ব,
দেখা যায় কত দৃশ্য,
চন্দ্র তারা রবি গ্রহচয়!
ওরা কি জীবন হারা?
ঈশ্বরের প্রেম ধারা
ওর মাঝে নাহি কিগো বয়!
ওই প্রেম-শোভা মাঝে
সুমধুরভাবে রাজে
ঈশ্বরের স্নেহময় আঁখি!
দেহহীন মূর্ত্তি তাঁর
নহিলে কেমনে আর
দেখিব এ মরতেতে থাকি!
ওই ছবি আঁখি পাতে
তার আঁখিজ্যোতি ভাতে,
জানি আমি তাহা প্রাণবান!
যখন বিপথে যেতে
চাহে হৃদি আঁধারেতে,
তখন ও ছবির নয়ান
দেখিয়া ফিরিয়া আসি
নয়নের জলে ভাসি
তবু ওর নাহি কি পরাণ!
রক্ষক দেবতা সম
জানি সদা পাশে মম
অলক্ষ্যেতে ভাসে সে বয়ান।
যখন কাতর প্রাণে
কিছু না সান্ত্বনা মানে
দেখি ওই নয়ন তখন,
সহসা যাতনা ভার
হয় যেন অপসার
শান্তি পায় আকুল এ মন।
যতদিন আমি আছি
এই ধরা মাঝে বাঁচি
ততদিন সেও বেঁচে আছে।
নাই দেখে চোখে কেহ
জানি তবু এই স্নেহ
বেঁধে তারে রাখিয়াছে কাছে।
ধাতুর প্রতিমা গড়ি
যদি তাঁর পূজা করি
ব্যর্থ হবে সেই আরাধন?
ঈশ্বর আপনি আসি
মূর্ত্তি মাঝে পরকাশি
পূজা নাহি করেন গ্রহণ?

এই প্রেম তার হিয়ে
পঁহুছায় না কি গিয়ে
নাহি টানে হৃদয় তাহার!

এ হৃদয়ে আছে জানি
তাহার হৃদয় খানি
সাকারে এ পূজা নিরাকার!

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

অপত্য।

জীব-বিজ্ঞানে সন্তানোৎপত্তি অতীব কূট প্রশ্ন। বিশেষতঃ কোন বিশেষ ভ্রূণ পরিণতি লাভ করিয়া কি কারণে স্ত্রী বা পুরুষ অঙ্গ বিশিষ্ট হইবে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যা। প্রকৃতির অপরাপর ব্যাপারের ন্যায় ইহাও যে কোন বিশেষ অনিবার্য্য নিয়মক্রমে সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু সে নিয়ম বা নিয়মাবলী কি তাহা জানিবার জন্য কাহার না ঔৎসুক্য হয়? কিন্তু এই জৈবিক তথ্য এতই দুরূহত্বে পূর্ণ যে আজও সম্যকরূপে ইহার মীমাংসা হয় নাই, এখনও এ সম্বন্ধে নানা মতদ্বৈধ রহিয়াছে। অন্যপক্ষে জীববিজ্ঞানের কোন অংশ বোধ হয় ইহাপেক্ষা অধিকতর যত্নসহকারে আলোচিত হয় নাই। প্রমাণস্বরূপ আমরা এই কথার উল্লেখ করি যে, বর্ত্তমান শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবের লিঙ্গভেদোৎপত্তি সম্বন্ধে পাঁচ সাতেরও অধিক মতবাদ দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা অধুনাতন প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতই ব্যাখ্যা করিতে যত্নবান হইব।

ভ্রূণ-বিজ্ঞান বর্ত্তমানে এক বিশাল আয়তন ধারণ করিয়াছে। সুধী ও অধ্যবসায়ী প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দিগের অপরিক্লান্ত গবেষণা ও অনুসন্ধিৎসাপ্রভাবে জীবরাজ্যের জটিল ও অপরিজ্ঞাত বিভাগের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। খৃষ্ট ১৮৫৮ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ অমরনামা ডার্বিনের "জাতিবৈচিত্র্যের উদ্ভব" নামক পুস্তকের প্রকাশাবধি প্রাণীবিজ্ঞানের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহার সমস্ত বিভাগই সম্পূর্ণ নূতনাকার প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমরা এক্ষণে জীবোৎপত্তি সম্বন্ধেও অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা জানি যে, একটি শুক্রাণু (Spermcell or spermatozon) গর্ভকোষ হইতে নিঃসৃত পরিণতাবস্থ একটি ডিম্বাণুসহ সংযুক্ত হইলে সেই বিশেষ ডিম্বাণুটির আভ্যন্তরীণ জীবন্ত পদার্থের (Portoplasm) নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ হইয়া অপূর্ব্ব কার্য্যকারিতার উদ্ভব হয়। ইহারি ভাবী ফল প্রাণীর উৎপত্তি। এই নিষেকিত ডিম্বাণু হইতেই কখন পুত্র কখন কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

গর্ভাধারে নিষেকিত ডিম্বাণু জীব বিশেষে অধিক বা অনধিক কাল অবস্থান করিয়া

পরিপোষিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। গর্ভবাসের প্রারম্ভাবস্থায় ভ্রূণ কিয়ৎকাল কোন লিঙ্গ বিশেষের দিকে প্রবণতা দেখায় না। অনির্দ্দিষ্ট বা ক্লীব অবস্থা উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে স্বল্পস্থায়ী, ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিক স্থায়ী। স্তন্যপায়ী জীব ও পক্ষীদিগের ভ্রূণের প্রারম্ভাবস্থায় অল্প পরেই বলা সম্ভব, উহা পুং অথবা স্ত্রীঅঙ্গ সমন্বিত হইবে। কিন্তু অমেরুদণ্ডক প্রাণী জাতিগণের নিম্নশ্রেণীর জীব—যেমন ভেক—সম্বন্ধে এরূপ বলা যায় না। বেঙ্গাচি একটু বড় হইয়া কোন বিশেষ লিঙ্গোৎপত্তির প্রবণতা প্রকাশ করিলেও অবস্থাবৈপর্য্যে তাহার সে প্রবণতা লুপ্ত হয় এবং তদ্বিপরীত লিঙ্গ বিকাশ করে। অমেরুদণ্ডক জীবের মধ্যে এই নির্দ্দিষ্টাবস্থা অত্যাধিক কাল স্থায়ী। ইহাদিগের ভ্রূণ অনেক দিন পরে কোন বিশেষ লিঙ্গোদ্ভাবনের প্রবণতা প্রদর্শন করে। সুতরাং কোন অমেরুদণ্ডক প্রাণীর অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিত ভ্রূণ দেখিয়াও উহা পুং অথবা স্ত্রীলিঙ্গ সম্বলিত হইবে নির্ণয় করা দুরূহ।

কাহারও কাহারও মতে, ভ্রূণ ঈদৃশ অনির্দ্দিষ্ট অবস্থায় উভ-লিঙ্গ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী অব্যবহিত কারণমালাও অবস্থার প্রতিকূলতা বা অনুকূলতা নিবন্ধন উহা এক বিশেষ লিঙ্গাভিমুখী হয় এবং এক লিঙ্গের সংঘটনের সহিত অপর লিঙ্গ লোপ পায় অথবা নিতান্ত অবিকাশিত অবস্থাতেই রহিয়া যায়। বাস্তবিক অনেকে কোন একটি ভ্রূণের অতি আদিম অবস্থাতেও উহার ক্লীবত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভ্রূণ-বিকাশের তিনটি স্বতন্ত্র অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতি আদিম অনির্দ্দিষ্টাবস্থা, উভলিঙ্গাবস্থা, ও স্বতন্ত্র একলিঙ্গাবস্থা। যখন ডিম্বাণু শুক্রাণু সহযোগে নিষেকিত হইয়া নিশ্চেষ্টতা ভঙ্গ হওতঃ বিভাজিত হইতে হইতে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, সেই অবস্থাকেই তাঁহারা অতি আদিমাবস্থা বলিয়া থাকেন; এই অবস্থা অতি অল্প কালই থাকে। অতি শীঘ্রই ভ্রূণ উভলিঙ্গাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং পরে কোন একটি বিশেষ লিঙ্গ-বিকাশপ্রবণ হইয়া দাঁড়ায়। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীবর্গের ভ্রূণের লিঙ্গবিশেষ প্রাপ্তির প্রবণতা সত্বরই বিকাশ পায়। সমেরুদণ্ডক প্রাণীবর্গের নিম্নশ্রেণীর জাতিগুলির ও অমেরুদণ্ডক জীবসাধারণের মধ্যে ঈদৃশ প্রবণতার বিকাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বসাপেক্ষ। এইজন্যই ইহাদের ভ্রূণ অপেক্ষাকৃত অধিক কাল ক্লীব ভাবে অথবা অস্ফুট উভ-লিঙ্গাবস্থায় অবস্থান করে।

শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মৌলিক উপাদান হিসাবে প্রায় একবিধ। ডিম্বাণু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, শুক্রাণু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। প্রথমোক্তটি অনেক পরিমাণে নিশ্চেষ্ট ও স্থির-প্রকৃতি, শেষোক্তটি অপেক্ষাকৃত কার্য্যশীল ও চঞ্চল। উভয় অণুর সংমিলনেই ভাবী জীবের সূচনা। স্থির চিত্তে একটি অতি আদিম প্রাথমিক এককোষী জীবের পরিবর্দ্ধন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একটি ক্ষুদ্রতম জীবাণু নিজেই পরিবর্দ্ধিত হইয়া দুইটি হইল। এই দুইটি আবার পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া বিভাজিত

হইয়া চারিটি হইল। এই চারিটি আবার পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিভক্ত হইয়া আটটি হইল। এইরূপে ক্রমাগত বিভাজন দ্বারা আপন বংশ বর্দ্ধিত করিতেছে। কিন্তু এই একটি কোষ (Cell) দেখিতে দেখিতে পূর্ণায়তন প্রাপ্তির পর দ্বিভাগে বিভক্ত হইবার কারণ কি? না দুটী বিপরীতধর্ম্মী শক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। এই শক্তিদ্বয়ের একটি গঠন-মূলক অপরটী বিনাশমূলক। আশ্চর্য্য এই গঠন ও বিনাশের সম্পাতেই কোন একটি জীবন্ত পদার্থ উদ্ভূত হয়। এই আপাতঃ অসংলগ্ন কথা নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিয়াই অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনি দুইটি বিপরীতভাবাপন্ন শক্তির ক্রিয়ার ফলে প্রাথমিক নীহারিকার অবস্থা হইতে বর্ত্তমানের এই বিশালায়তন বিস্ময়কর সুসংশ্লিষ্ট জগতের উদ্ভব হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ না থাকিলে এজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সম্ভব হইত না। সামাজিক ভাবে দেখিলেও আমরা দেখিতে পাই যে প্রকৃত উন্নতি দুটি অসম-প্রকৃতি শক্তিযুগল প্রবাহের সন্নিবেশে। সুতরাং গঠন ও বিনাশ সম্পাতেই যে প্রকৃত জীব পরিবর্দ্ধন, তাহা বিস্ময়কর হইলেও অবিশ্বাস্য নহে। এই একটি এক কোটী জীবাণুর পরিবর্দ্ধনের মূলে যে দুটি বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়—ইহাদেরই স্ত্রী ও পুং শক্তির সূক্ষ্মাণুরূপ বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারি। আবার যখন দেখা যায় একটী কোষই বিভাজিত হইয়া একার্দ্ধ নিশ্চেষ্ট ও অপরার্দ্ধ ক্রমাগত বিভাজিত হইয়া অতি ক্ষুদ্র অণুর সদৃশ হইল, এবং পরে ঈদৃশ একটি অণু নিশ্চেষ্ট অর্দ্ধ কোষটির সহিত মিলিত হইতেছে, এবং এইরূপ মিলন হইতেই যখন উহাদের বংশ পরিবর্দ্ধন চলিতেছে, তখনও আমরা স্ত্রী ও পুরুষ উপাদানের অত্যাবশ্যক সম্মিলন দেখি। নিশ্চেষ্ট অর্দ্ধ কোষটি স্ত্রী উপাদান পরিজ্ঞাপক, অপরার্দ্ধের বিভাজিত ক্ষুদ্র অণুসদৃশ অংশটি পুং উপাদান নির্দ্দেশক। কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীস্থ জীবের একের মধ্যেই আবার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দুই স্বতন্ত্র প্রকারের কোষ উৎপন্ন হয় এবং ইহাদের সংযোগেই বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এখানেও দুই প্রকারের কোষ স্বতন্ত্র ও অত্যাবশ্যক দ্বি-উপাদান পরিজ্ঞাপক।

এইরূপ এককোষী জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বহুকোষী জীবের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশের মধ্যে এবম্বিধ দুই স্বতন্ত্র কোষের উদ্ভাবন ও বংশপরিবর্দ্ধন জন্য পরস্পর সংমিলন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, জীব ও উদ্ভিদ্‌রাজ্যের অতি প্রাথমিক ও সহজ বিকাশ হইতে উন্নত ও জটিল বিকাশ পর্য্যন্ত, সেই এক অমোঘ নিয়মাধীন। অত্যুন্নত মানব জাতির মধ্যেও সেই নিমিত্ত পুরুষ ও স্ত্রীর অবতারণা। স্ত্রী ও পুরুষের মিলন, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগ জীবোৎপত্তির অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই কি নিয়মে বা কি কারণের বশবর্ত্তী হইয়া কোন একটি ডিম্বাণু ক্রমে পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হইয়া লিঙ্গ উদ্ভাবন করে? নিশ্চয়ই জনক জননীর স্বাস্থ্য ও শারীরগঠন, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর পুষ্টতা ও পরিপক্কতা, ভ্রূণাবস্থায় পুষ্টিসাধন

প্রভৃতি কতকগুলি কারণ বিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু তাহা বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রথমে যে বহুল ঐতিহাসিক মতবাদের উল্লেখ করিয়াছি তাহার দুই চারিটির বিষয় এস্থলে বলা আবশ্যক।

প্রথম। দুই বিভিন্ন প্রকারের ডিম্বাণুবাদ। এই মতানুসারে দুই প্রকারের ডিম্বাণু কল্পিত হয়—স্ত্রী ও পুরুষ। স্ত্রী ডিম্বাণু হইতে কন্যা, পুং ডিম্বাণু হইতে পুত্র জন্মে। ইহাপেক্ষা সহজ ও প্রাথমিক মতবাদ আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু, বাস্তবিকই লিঙ্গবিকাশ রহস্য এত সহজ নহে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এইরূপে স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতির স্বতন্ত্র ডিম্বাণুই বা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহা হইলে আমাদের সেই মূল প্রশ্নই বজায় থাকিয়া যায়, অতএব ইহাতে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কিছুই হইল না। বিশেষতঃ যখন আমরা জানি ভ্রূণ জরায়ু-বাস কালে, আবেষ্টন-গত কারণে ও অবস্থাধীনে, কোন এক বিশেষ লিঙ্গ প্রবল হইলেও, অপর লিঙ্গ উদ্ভাবন করিতে পারে (যেমন বেঙ্গাচি ; যাহার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে), তখন এ মতবাদের যৌক্তিকতা খাটে না, আরও ঈদৃশ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ডিম্বাণুর অবস্থান গভীর সন্দেহাকীর্ণ।

দ্বিতীয়। কেহ কেহ নিষেক-প্রণালীর উপর লিঙ্গ পার্থক্য নির্ভর করে বলিয়া থাকেন। ইহাদের মতে ডিম্বাণু প্রবিষ্ট শুক্রাণুর সংখ্যার তারতম্যানুসারে লিঙ্গ ভেদ ঘটে। অধিক সংখ্যক শুক্রাণু প্রবেশ করিলে পুত্র এবং অল্প সংখ্যক প্রবেশ করিলে কন্যা জন্মে। কিন্তু এ মতবাদও নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আমরা জানি, ডিম্বাণুর প্রবেশ-পথ এতই আণুবিক্ষণিক পরিসরময় যে, একটি শুক্রাণু প্রবিষ্ট হইলেই সে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। অপরপক্ষে অন্যান্য পণ্ডিতেরা প্রদর্শন করিয়াছেন একাধিক শুক্রাণু নিষেকিত ডিম্বাণু একটা অস্বাভাবিক উৎপত্তিতে পরিণত হয়।

তৃতীয়। অনেকে আবার নিষেক কালের উপর বিশেষ ঝোঁক দেন। তাঁহাদের মতে যদি একটি ডিম্বাণু ডিম্বকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়াই শুক্রাণু সহযোগে নিষেকিত হয় তাহা হইলে উহা পুরুষরূপে বিকাশ পায়। কেহ কেহ শুক্র ও ডিম্বাণু উভয়ের নবত্বের মিলনে স্ত্রী এবং প্রাচীনত্বের মিলনে পুরুষ উদ্ভব হয় বলিয়া থাকেন। এই মতবাদের মধ্যে কতক সত্যতা যে আছে তাহা অনেকটা বোধ হয়। অনেক গৃহপালিতপশুপালক এই নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া পশু ভ্রূণের লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। একজন উদ্ভিদ্‌বেত্তা পুষ্পের মধ্যেও এইরূপ নিয়মের সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে পুষ্পের গর্ভকেশর পরিণতাবস্থ হইয়াই পরাগস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইতে অধিক সংখ্যক স্ত্রী-সন্ততিই জন্মিয়া থাকে।

চতুর্থ। জনক জননীর বয়ঃক্রম। দুই জন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পরস্পর স্বাধীন ভাবে জন্ম-তালিকা সংগ্রহ করিয়া একই সাধারণ তথ্যে উপনীত হইয়াছেন। সংখ্যা-গণনা-জাত অভিজ্ঞান হইতে তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, যদি পিতা মাতাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ

হন, তাহা হইলে ইহাদের সন্তানগণ অধিকাংশ পুত্র হইবে ; আর যদি উভয়ের বয়ঃক্রম সমান হয় অথবা জনক জননী অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে কন্যার আধিক্য হইবে। কিন্তু ইহাদিগের এই সিদ্ধান্ত অপরের অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা যেমন দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, অন্যপক্ষে তেমনি আবার প্রত্যাক্ষাতও হইয়াছে। পিতা মাতার বয়োতারতম্য-তাকে লিঙ্গ নিরূপণের একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে না। যদি বয়ঃপ্রাধান্য বাস্তবিকই পুত্র বা কন্যা উৎপাদনের একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে আমাদের বঙ্গ-সমাজে যেখানে স্বামী ভার্য্যাপেক্ষা প্রায়ই বয়োজ্যেষ্ঠ, আমরা এই নিয়মের কুফল সন্দর্শন করিতাম। অর্থাৎ বাঙ্গালীজাতি পুরুষপ্রধান জাতি হইত এবং হয়ত এতদিনে বিবাহার্থে আর কন্যা মিলিত না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে এ মতবাদ প্রকৃতত: সত্য নহে ; সুতরাং বঙ্গসন্তান-কেও দয়িতাভাবে ক্ষুণ্ণ ও বিষণ্ণ মনে দিনপাত করিতে হয় না, অথবা কন্যাভিলাষী জনক বা জননীর মনস্কামনা অপূর্ণতা নিবন্ধন নিরাশার কাতরোক্তিতে বঙ্গাকাশ পূর্ণ হয় না।

বাস্তবিক, সংখ্যা-গণনার উপর যে কোন মতবাদ বা সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, বিশেষ সাবধানতার সহিত তাহা গ্রহণ করা উচিত। তালিকা সংগ্রহ করিতে গিয়া আমরা অনেক সময়ে এত অনেকগুলি গণনীয় কারণ উপেক্ষা করি যে, সে গুলি বিবেচনাধীন না করাতে তালিকার ফল ব্যর্থ হইয়া যায়। আর তালিকা-গণনা কখনই যথেষ্ট সংখ্যার হইবার নয়! অতএব, সে মতবাদও গ্রাহ্য করা যায় না।

পঞ্চম। অপর কতকগুলি প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বলেন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যিনি বলিষ্ঠ, সন্তান তাঁহার অনুরূপ লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়। স্বামী অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হইলে পুত্র এবং স্ত্রী বলিষ্ঠ হইলে কন্যা সন্তানাধিক্য হয়। কিন্তু এ মতবাদও ঠিক নহে। অনেক সময়ে দেখা যায় যক্ষ্মাগ্রস্ত মাতারই অধিক কন্যা জন্মে। বলাধিক্য মতবাদ ঠিক হইলে এরূপাবস্থায় পুত্রাধিক্যের সবিশেষ সম্ভাবনা। বলাধিক্য মতবাদের ন্যায় মিলনাগ্রহ নামে একটি মত প্রচলিত আছে। মিলন স্পৃহার বলবত্তানুসারে সন্তানগণের লিঙ্গ বিশেষত্ব জন্মে বলিয়া এই মতবাদীরা বিশ্বাস করেন। কিন্তু ইহার কার্য্যকারিতা ও সাত্ত্বব্য সম্বন্ধে অনেকের গভীর সন্দেহ আছে।

ষষ্ঠ। স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন যে, পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে পুরুষই শ্রেষ্ঠ। স্ত্রী ও পুরুষের সমতা অতি অল্প লোকেই স্বীকার করেন এবং স্ত্রীর শ্রেষ্ঠতা কেহই মানেন না। প্রাচীন দর্শনকারেরা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতেন যে, নারীগণ অবিকাশিত পুরুষ বই আর কিছুই নহে। পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ঠতা বোধ হইতেই লিঙ্গোৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মতবাদ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই যে লিঙ্গ-বিশেষত্ব পিতামাতা হইতে একটি বিশেষ গুণরূপে জরায়ু ভ্রূণে বর্ত্তায় না ; কিন্তু উহার বিকাশ ও পরিবর্দ্ধনের মাপের উপর লিঙ্গপার্থক্যের ভিত্তি নির্ভর করে। পুং-সন্তান সাধারণতঃ উচ্চতর বিকাশসম্পন্ন ভ্রূণ। মাতার উৎপাদিকা শক্তি

সর্ব্বাংশে পূর্ণ-বিকাশ সম্পন্ন হইলে, ভ্রূণ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর বিকাশ লাভে সমর্থ হয়; এবং ঈদৃশ ভ্রূণই পুত্র হইয়া থাকে। জননীর গর্ভের এতাদৃশ সানুকূল অবস্থায় উৎপন্ন পুং সন্তান অল্পাধিক মাতার সদৃশ হয়। কিন্তু যদি জননীর উৎপাদিকা শক্তি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে নিষেকিত ডিম্বাণু পুংত্ব লাভ করে না, স্ত্রীত্বে পরিণত হয়। এইরূপে ইঁহাদিগের মতে যখন জননীর শারীর অবস্থা উৎকৃষ্ট তখন পুত্র-সন্তান, আর যখন জননী রুগ্না, অপূর্ণ বিকাশ-সম্পন্না তখন কন্যা সন্তানই অধিক জন্মিয়া থাকে।

ষ্টার্কওয়েদার নামা এক জন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ও স্ত্রীর দৈহিকভাবে উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা স্বীকার করেন না। ইনি বলেন যে, "শারীরিক ভাবে কেহই শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ নহে; সে হিসাবে পুরুষ ও স্ত্রী দুইই সমান।" মোটামুটি ইহা ঠিক; কিন্তু তথাপি দম্পতীর মধ্যে অন্যান্য অংশে একটুও-না-একটু ইতরবিশেষ আছেই। সুতরাং এই হিসাবে একজন অপরাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলা যাইতে পারে। ষ্টার্কওয়েদার এই ভাবের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া বলেন দম্পতীর মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ তাঁহার জন্যই মূলতঃ ভ্রূণের লিঙ্গবিকাশ নিয়মিত ও নিরূপিত হইবে, কিন্তু ভ্রূণ প্রকৃততঃ তদ্বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট হইবে। অর্থাৎ যদি পিতার শ্রেষ্ঠতা থাকে, পিতার জন্যই ভ্রূণের লিঙ্গবিকাশ নিয়মিত ও নিরূপিত হইবে কিন্তু উহা কন্যা হইবে। যদি মাতার শ্রেষ্ঠতা থাকে, ভ্রূণমাতার জন্যই যদিও ভ্রূণের লিঙ্গ নিরূপিত হইবে, তবুও ভ্রূণ প্রকৃতপ্রস্তাবে পিতার লিঙ্গ বিশিষ্ট অর্থাৎ পুত্র হইবে।

উল্লিখিত মতবাদগুলির কাহারও কাহারও মধ্যে কতক সত্যতা আছে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে এবং আমরাও যথাস্থানে তদনুরূপ ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু উহাদের কোন একটি মতই যে সম্পূর্ণ নহে, তাহা বোধ করি আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক করে না। আনুমানিক ও ঐতিহাসিক মতবাদ ছাড়িয়া আমরা এক্ষণে পরীক্ষাসিদ্ধ মতের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

জীব শারীরতত্ত্বের দুরূহ সমস্যা মীমাংসার জন্য নিরীহ ভেকজাতি প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের গভীর অনুসন্ধান পরিদর্শন ও পরীক্ষার যেরূপ সহায়তা করিয়াছে বোধ হয় অন্য কোন জীব সেরূপ করে নাই। কোন নূতন শারীরতথ্যের পরীক্ষা করিতে হইলেই ভেকজাতি সাদরে লাবরেটারিতে আনীত হয় এবং নিতান্তই নিঃস্বার্থ ভাবে আপনাদিগের ক্ষুদ্র জীবন দিয়া আমাদের জ্ঞানোন্নতির সমূহ সহায়তা সাধন করিয়া চলিয়া যায়। আমরা এই প্রবন্ধের মধ্যে পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমেরুদণ্ডক ভেকশাবকগুলি অপেক্ষাকৃত অধিকতর সময় কোন বিশেষ লিঙ্গবিকাশের প্রবণতা না দেখাইয়া ক্লীবাবস্থায় অবস্থান করে। তৎপরে উভ-লিঙ্গাবস্থা অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ কোন বিশেষ লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে উভলিঙ্গ বেঙ্গাচিরা আহারের পুষ্টিতার তারতম্যানুসারে স্বতন্ত্র লিঙ্গবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যদি বেঙ্গাচিরা আপনাপনিই লাঙ্গুল

বিমুক্ত হইয়া ক্রমশঃ লিঙ্গ বিশেষত্ব লাভ করে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে স্ত্রী ভেকের সংখ্যাই অধিক হয়। তিন দল বেঙ্গাচির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ সংখ্যা এইরূপ হইয়াছিল; ৫৪ : ৪৬; ৬১ : ৩৯; ৫৬ : ৪৪। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে গড়ে শতকরা ৫৭টা স্ত্রী ভেক উৎপন্ন হইয়াছিল। অপর তিন দল, যাহাদিগকে খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট করা হইত, তাহাদিগের মধ্যে এইরূপ ফল হইয়াছিল ঃ—যে দলকে গোমাংস ভক্ষণ করান হইত, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের হার ৭৮ ; ২২ ; যাহাদিগকে মৎস্য খাইতে দেওয়া হইত তাহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের হার ৮১ : ১৯ ; আর যে দলকে অতি পুষ্টিকর ভেক মাংস খাইতে দেওয়া হইত তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের হার ৯২ : ৮। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে অনিরূপিত লিঙ্গবিশিষ্ট ভ্রূণ উত্তমরূপে পুষ্টিজনক খাদ্য পাইলে স্ত্রীত্ব এবং যথোচিত খাদ্য না পাইলে পুংত্ব উদ্ভাবন করে।

মধুমক্ষিকাদিগের উৎপত্তি আলোচনা করিলেও আমরা এই তথ্যের যাথার্থ্যের অন্যতর প্রমাণ পাই। সকলেই জানেন মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে তিন শ্রেণীবিভাগ আছে :—স্ত্রী, ক্লীব, ও পুরুষ ; অথবা সপ্রজঃ স্ত্রী, বন্ধ্যা স্ত্রী, ও পুরুষ। ফলবতী স্ত্রী-মধুমক্ষিকাগণ মধুচক্রের রাণী নামে আখ্যাত। বন্ধ্যা স্ত্রী বা ক্লীব মক্ষিকাগণ শ্রমী বলিয়া পরিচিত। ইহা সাধারণ মত যে পুং মধুমক্ষিকাগণ অনিষেকিত অণ্ডজাত। আর যে অণ্ড নিচয় হইতে রাণী ও শ্রমীগণ উৎপন্ন হয়, তাহারা নিষেকিত অণ্ড। কিন্তু কি বিশেষ কারণে একই নিষেকিত অণ্ড নিচয় মধ্য হইতে কতকগুলি ফলবতী স্ত্রী, এবং কতকগুলি বন্ধ্যা স্ত্রী মধুমক্ষিকা সমুদ্ভূত হয় ? পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে আহার বা পুষ্টিতার অল্পাধিক্যবশতঃই কোন একটি নির্দ্দিষ্ট অণ্ড হইতে শ্রমী অথবা রাণী জন্মগ্রহণ করে। রাজভোগের ন্যায় প্রচুর পুষ্টিকর আহারের সুবিধা হইলেই মক্ষিকাশিশুর অভ্যন্তরে সন্তানধারণ ও উৎপাদনের আবশ্যকীয় ইন্দ্রিয় সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে রাণীরূপে পূর্ণায়তন সম্পন্ন হইয়া বহির্গত হয়। পরিমিত ও মোটামুটি আহার পাইলে অণ্ডস্থ কীটের স্ত্রীত্ব বিকাশ শক্তি প্রতিরুদ্ধ হইয়া, উহা অবিকাশিত ও অপূর্ণ স্ত্রী অর্থাৎ শ্রমীরূপে পরিণত হয়। ধাত্রী-মক্ষিকাগণ ইচ্ছা করিলেই বিশেষ মক্ষিকা-শিশুকে রাণী বা শ্রমী করিতে পারে। বাস্তবিক, আহার প্রদানের ইতরবিশেষ করিয়া ইহারা কাহাকেও রাণী কাহাকেও বা শ্রমীরূপে উৎপন্ন করিয়া থাকে। আহারের উপর কোন বিশেষ লিঙ্গ-বিকাশ কত নির্ভর করে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব যদি ইহা মনে রাখি যে, কোন একটি মক্ষিকাশিশু শ্রমীরূপে লালিত পালিত হইয়াও যদি ঘটনাক্রমে পুষ্টিকর আহার পায়, যদি কোনমতে রাণীর অতিরিক্ত ও উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ খাইতে পায়, তাহার শরীরাভ্যন্তরে সন্তানধারণ ও উৎপাদন শক্তি ও অঙ্গের বিকাশ হয় এবং ঈদৃশ শ্রমীকে ফলবতী শ্রমী কহে। আর মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যে ইহা একটি সর্ব্বজনবিদিত সত্যকথা যে মনে করিলেই কোন একটি শিশু-শ্রমীকে রাণী করিতে পারা যায়। অণ্ড স্ফুটিত হইবার

আট দিবসের মধ্যে খাদ্য পরিমাণের সামান্য ইতরবিশেষ করিয়া রাণী ও শ্রমীর গঠনগত ও কার্য্যগত পার্থক্য উৎপাদন করা যাইতে পারে।

ঈমার নামক এক প্রাণিতত্ত্ববিদ অন্য এক প্রকার বড় মৌমাছির বিষয় উল্লেখ করিয়া পুষ্টিতার উপর যে ভ্রূণের লিঙ্গ-বিশেষোৎপত্তি নির্ভর করে, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। রাণী মাতা শীতনিদ্রার পর জাগ্রত হইয়া একটি নীড় প্রস্তুত করে এবং আহারীয় সংগ্রহ করিয়া প্রথম কতকগুলি অণ্ড প্রসব করে এই অণ্ডজাত মক্ষিকাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ত্রী-মক্ষিকার রূপে উৎপন্ন হয়। ইহারা শ্রমী শ্রেণীর হইয়াও ফলবতী। কিন্তু ইহাদের সন্ততিগণ কেবল পুং হয়। রাণীমাতা প্রথম দল অণ্ড প্রসবের পর আবার কতকগুলি অণ্ড প্রসব করে। এই দ্বিতীয় দল জাত মক্ষিকাগণ প্রথম দলোদ্ভূত ভগিনী-দের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর পুষ্টিকর আহার পাইয়া পুষ্ট বলিষ্ঠ ও বৃহৎ আকা-রের স্ত্রী-মক্ষিকারূপে পরিবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তথাচ, ইহাদের প্রসূত অণ্ড হইতে কেবল পুং-সন্তানই জন্মে; কখন কখন দুই চারিটী স্ত্রী-সন্তানও জন্মে। অবশেষে রাণীমাতা তৃতীয়বার যে অণ্ড প্রসব করে, সেই অণ্ড সঞ্জাত কীটগুলিকে, প্রথম বংশের ও দ্বিতীয় বংশের কন্যাগুলির সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণে আহার সঞ্চয় করিয়া লালিত পালিত করে এবং ইহারাই ভবিষ্য রাণীমাতারূপে পরিণত হয়। উপযুক্ত ও যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য দ্বারা স্ত্রী-সন্তান উৎপাদনের ইহা অন্যতম দৃষ্টান্ত।

পিপীলিকাধেনু বা বৃক্ষ-উৎকুণের (Aphides) বংশবর্দ্ধনে আমরা আবার সেই প্রমাণ দেখি। লাউগাছ, বেগুণগাছ, সীমগাছ প্রভৃতি লতা ও গুল্মের কোমল পত্র-পৃষ্ঠে এক প্রকারের ছোট ছোট কীট প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকুণের-মত অনেকটা দেখিতে বলিয়া সাধারণতঃ ইহাদিগকে বৃক্ষউৎকুণ বলে এবং পিপীলিকা-গণ ইহাদের সংরক্ষণ ও ইহাদিগের নিকট হইতে একপ্রকারের মধুর ও পরিষ্কার রসনির্গত করিয়া লইয়া পান করে বলিয়া ইহাদের অন্যতর নাম পিপীলিকাধেনু। অ্যাফিড্‌স্‌দিগের বংশবর্দ্ধন রীতি দুই প্রকার। সঙ্গম ব্যতিরেকে বা কুমারীসম্ভব আর সঙ্গমমূলক। গ্রীষ্মকালে, প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পাইলে বৃক্ষ-উৎকুণমাতা সঙ্গম ব্যতিরেকে রাশি রাশি স্ত্রী-সন্তান প্রসব করে। আমাদের দেশে শীতা-ধিক্য তাদৃশ নাই। সেই জন্য তরু-উৎকুণের আধিক্য এত যে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। নিশ্চয়ই নধর পত্র ভক্ষণ করিয়া কুমারী পিপীলিকা ধেনুগণ পুং-উৎকুণ সংসর্গ না করিয়াও অসংখ্য অসংখ্য অ্যাফিড্‌স্‌ প্রসব করে। কিন্তু ইহারা সক-লেই স্ত্রী-অ্যাফিড্‌স্‌। অথচ অনিষেকিত বা সঙ্গম ব্যতিরেকে জনন প্রসূত অণ্ড হইতে তাবৎ সন্তানের পুংত্ব বিশিষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। শীতঋতুর আবির্ভাব হইলে (শীত-প্রধান দেশে বিশেষতঃ) অ্যাফিড্‌সগণ যথেষ্ট আহার পায় না, যথেষ্ট উত্তাপও পায় না। কাজেকাজেই তখন উহাদের মধ্যে সপক্ষ পুং-অ্যাফিড্‌স্‌ পরিলক্ষিত হয় এবং সেই সময়ে

প্রকৃত সঙ্গম মূলক অ্যাফিড্‌স্ বংশ চলিতে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে বারমাস উত্তাপ সমান রাখিয়া এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া গ্রিণহাউসে উপর্য্যুপরি চারি বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্গম ব্যতিরেকে অ্যাফিড্‌স বংশ উৎপাদিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ উত্তাপের ও খাদ্যের হ্রাস না করিলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে এইরূপ কুমারী জনন চলিতে পারে। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে উত্তাপ ও খাদ্য হ্রাস করিলে পুং-অ্যাফিড্‌সের অভ্যুদয় হয় এবং সঙ্গমমূলক জনন আরম্ভ হয়। বোধ হয়, বঙ্গদেশে উত্তাপাধিক্য ও খাদ্য প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া অ্যাফিড্‌স্ বংশ কেবল সঙ্গমব্যতিরেকী। কেননা আমরা পক্ষযুক্ত পুং-অ্যাফিড্‌স্ এ পর্য্যন্ত একটিও দেখি নাই যদিও রাশি রাশি স্ত্রী-অ্যাফিড্‌স যেখানে সেখানে দেখা গিয়া থাকে। সে যাহা হউক, অ্যাফিড্‌সের বংশবৃদ্ধির নিয়মের মধ্যেও আমরা সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি যে আহারের তারতম্যানুসারে কোন ভ্রূণ বা কোন অণ্ডজাত কীটের ভাবী লিঙ্গ বিশেষত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে।

বিবি ট্রিট প্রজাপতি ও পতঙ্গদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উহাদের শিশুদিগকে গুটি বাঁধিবার পূর্ব্বে যদি অনাহারে বন্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে গুটি বাঁধিবার পর যখন তাহারা প্রজাপতিরূপে নিঃসৃত হয়, তখন পুং প্রজাপতি হইয়া থাকে। আর যদি পোকাকে ভাল করিয়া আহার দেওয়া হয়, গুটি অবস্থা অতিক্রান্ত হইলে উহা হইতে স্ত্রী প্রজাপতিই নির্গত হইয়া থাকে। লেখক দুই বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি তসর কীট লইয়া এই পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষাফল বিবি ট্রিটের পরিদর্শনের সহিত এক হয় নাই। বিফলতার অন্য অনেক কারণ ছিল। প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, আমরা পোকাদিগকে একেবারে আহার বন্ধ করিয়া রাখি নাই। বিবি ট্রিটের ন্যায় দিন কতক একেবারে আহার বন্ধ করিয়া রাখিলে হয়ত আশানুযায়ী ফল হইতে পারিত।

উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে অবিকশিত ভ্রূণের উপর আবেষ্টন অথবা আহারের উৎকৃষ্টতা ও অপকৃষ্টতার প্রভাব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষাকৃত কঠিনতর ব্যাপার। তবে বাহ্য প্রমাণ হইতে যতদূর দেখা যায় তাহা উক্ত সিদ্ধান্তের পোষকতা করে। পশু ব্যবসায়ী এক ব্যক্তি কতকগুলি মেষকে দুই দলে বিভক্ত করিয়া এক দলকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াইতেন অপর দলকে ভাল করিয়া খাইতে দিতেন না। শাবক জন্মিলে গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, যে দল প্রচুর আহার পাইত তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-শাবক সংখ্যার হার অনেক অধিক। আর তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট পুষ্ট মেষী হইতেই অধিক সংখ্যক স্ত্রী-শাবক প্রসূত হইত। মনুষ্য সমাজেও আমরা সাধারণতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকি যে কোন প্রকারের মারীভয় বা যুদ্ধের পর দেশে অধিক সংখ্যক পুত্র সন্তানই জন্মে।

আহারের ন্যায় উত্তাপ ও উক্ত সম্বন্ধে একটি বিবেচ্য কারণ। আমরা ইতি পূর্ব্বে উল্লেখ

করিয়াছি এই উত্তাপের আধিক্যে অ্যাফিড্‌সগণ সঙ্গম-ব্যতিরেকী জননদ্বারা কেবল স্ত্রী-অ্যাফিড্‌স্ প্রসব করে, আর উত্তাপের অল্পতা হইলে সঙ্গম-মূলক জনন দ্বারা পুং ও স্ত্রী উভয়বিধ অ্যাফিড্‌স্ উৎপন্ন হয়। মনুষ্যের মধ্যেও দেখা যায় শীতকালে অধিক সংখ্যক পুত্রই জন্মে। ঘোটকের জন্ম তালিকা হইতে কোন কোন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্ এইরূপ তথ্যেই উপনীত হইয়াছেন। অবশ্য সন্তান ভূমিষ্ঠকালীন উত্তাপ বা শৈত্যের কথা বিবেচ্য নহে। নিষেকিত ডিম্বাণু যে অবস্থায় জরায়ুমধ্যে কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়োদ্ভাবনের প্রবলতা দেখায়, সেই সময়ের ঋতুর অবস্থা লক্ষ্য করাই উচিত। আর ইহাও মনে রাখা আবশ্যক খাদ্যের ভিতর দিয়াও পরোক্ষ ভাবে উত্তাপের কার্য্য-ফল বর্ত্তিতে পারে।

এক্ষণে, ঐতিহাসিক মতবাদ ও সাক্ষাৎ পরীক্ষালব্ধ মতবাদ, এতদুভয় কারণমালার সারসংগ্রহ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সে সম্ভাবিত কারণ গুলি এই :——

(১) দৈহিক হিসাবে জননীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থা, আহারের অপ্রাচুর্য্য, অপেক্ষাকৃত বয়োল্পতা ইত্যাদি অননুকূল অবস্থায় পুত্রসন্তান, আর তদ্বিপরীতাবস্থায় কন্যা সন্তান জন্মে।

(২) জনন-উপাদান হিসাবে অপুষ্ট ডিম্বাণু অপেক্ষা খুব পুষ্ট ডিম্বাণুর স্ত্রীত্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অধিক। নব, পূর্ণায়তন ও সতেজ ডিম্বাণু যদি উহার ক্ষয় আরম্ভ হইতে না হইতে নিষেকিত হইতে পায়, তবে উহার কন্যা সন্তানরূপে বিকাশ পাইবার সম্ভাবনাই অধিক।

(৩) উচ্চ শ্রেণীর জীবের জরায়ুস্থ নিষেকিত ডিম্বাণু আর নিম্ন শ্রেণীর অন্তজকীট যৎকালে অনির্দ্দিষ্ট বা উভলিঙ্গাবস্থায় অবস্থান করে, সেই সময়ে উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য, তাপ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সানুকূল অবস্থার অধীনে কন্যারূপে আর তদভাবে পুত্ররূপে জন্মিবার সম্ভাবনা অধিক।

যমজ সন্তান সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা হইলে আমাদের প্রবন্ধের শেষ হইবে। যখন একটি ডিম্বাণু হইতেই দুটি জীব উদ্ভূত হয়, তখনই প্রকৃত যমজ উৎপন্ন হয়। যখন একাধিক ডিম্বাণু পূর্ণতালাভ করিয়া সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহারা যমজ সন্তান নামে বাচ্য হয় না। কুকুর, ছাগ, মেষ, বিড়াল ইত্যাদির একাধিক শাবক হইলেও সকল সময়ে যমজ নহে। প্রকৃত যমজোৎপত্তি মনুষ্য জাতির মধ্যেই পরিদৃষ্ট হয়। যমজ সন্তান পরস্পর বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও ধরণে একই রূপ হয়; অথবা দুইয়ের মধ্যে আকার ও গঠনগত বৈসাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট ও বিশদ হইয়া থাকে। মনুষ্যের মধ্যে যমজ সন্তানগণ প্রায় একই, লিঙ্গের হইয়া থাকে। কিন্তু ছাগ, মেষ প্রভৃতি একাধিক জীবন্ত সন্তান প্রসবকারীদের মধ্যে সাধারণতঃ এইরূপ নিয়ম পরিদর্শিত হয়।

(ক) যমজ শাবক দ্বয় উভয়েই স্ত্রী।

(খ) একটি স্ত্রী একটি পুরুষ।

(গ) উভয়েই পুং।

(ক) ও (খ) অবস্থাজাত যমজ সন্তানদিগকে স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন (normal) যমজ বলে, আর (গ) অবস্থার জাত যমজকে অস্বাভাবিক জন্ম বলে। (গ) অবস্থাজাত যমজের মধ্যে একটি সাধারণতঃ অস্বাভাবিক ভাববিশিষ্ট হয়। ইহার আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলি পুং চিহ্নের কিন্তু বাহেন্দ্রিয় অনেকটা স্ত্রীত্ব পরিজ্ঞাপক। ঈদৃশ অস্বাভাবিকত্বের কারণ আজও কেহ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

কবি কালিদাস।

কবি কালিদাসের নাম জগদ্বিখ্যাত। ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ শকুন্তলা, কুমার, রঘুবংশ ও মেঘদূত পড়িয়া কবির উপমাপটুত্ব, কল্পনাশক্তি ও মাধুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হয়েন। সুন্দর বসন্তকালের উপবন যেরূপ স্বভাবতঃই মধুর, কালিদাসের কাব্য যেন সেইরূপ স্বভাবতঃই মধুর বলিয়া বোধ হয়, সে মাধুর্য্যে শরীর পুলকিত হয়, মন আনন্দিত হয়। আর উপবনে যেমন স্বভাবতঃই রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া থাকে, তাঁহার কাব্যে সেই রূপ যেন রাশি রাশি উপমা আপনা হইতে ফুটিয়া রহিয়াছে,—যে দিকে দেখি সেই দিক আলো করিয়া রহিয়াছে। কণ্বমুনির আশ্রমে নবপ্রেমবিদগ্ধা অরণ্যবালা,—হিমালয়ের স্নিগ্ধ সানুতে হরপ্রণয়াভিলাষিণী পুষ্পালঙ্কারবিভূষিতা ভূধরকন্যা,—পুরুরবার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী স্বর্গত্যাগিনী প্রণয়বিহ্বলা উর্ব্বশী,—এই রূপ এক একটী চিত্র যেন এক একটী হৃদয়গ্রাহী রত্ন!—কল্পনাসাগর মন্থন করিয়া মানবজাতি ইহা অপেক্ষা উজ্জল বা মধুর লাবণ্যবিভূষিত রত্ন অদ্যাবধি প্রাপ্ত হয় নাই!

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি এই কালিদাস বিক্রমাদিত্য রাজার সভাকবি ছিলেন,—সভার নয়টী রত্নের মধ্যে প্রধানতম রত্ন ছিলেন। অভিধানরচয়িতা অমর সিংহ, জ্যোতিষবেত্তা বরাহমিহির, ব্যাকরণাভিজ্ঞ বররুচি, বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ধন্বন্তরি, প্রভৃতি আট জন মহাপণ্ডিত সেই সভায় ছিলেন,—কালিদাসকে লইয়া নয় জন। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা হয় ঐ বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস কোন্ সময়ের লোক।

বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে বিক্রমাদিত্যের অব্দকে সম্বৎ বলে, এবং এই

সম্বৎ অব্দ ৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতএব বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস ৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দের লোক এইরূপ প্রতীতি ছিল।

আরও শুনিয়া আসিতেছি যে বিক্রমাদিত্য শক নামক এক জাতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁহাকে শকারি কহে। শকগণও খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এ কথা জানা আছে। অতএব বিক্রমাদিত্য ও কালিদাস খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেকার লোক এইরূপ প্রতীতি ছিল।

কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অনেক সন্দেহ উত্থাপন করিয়াছেন। কথাটা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে শক জাতি (Scythians) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। রুষ দেশে ভল্‌গা নদী যেখানে কাস্পীয় হ্রদে মিলিত হইয়াছে তথা হইতে বহুদুর পশ্চিম পর্য্যন্ত ও বহুদুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শকদিগের আদিম ভূমি ছিল। ফলতঃ এক্ষণে তাতার, কসাক্ প্রভৃতি ভ্রমণশীল জাতিগণ ইউরোপ ও আসিয়ার যে যে খণ্ডে বিচরণ করে, পূর্ব্ব কালে সেই সেই প্রদেশ শকদিগের জন্মভূমি ছিল।

খৃষ্টের সাত শত বৎসর পূর্ব্বে তাহারা একবার পঙ্গপালের ন্যায় দক্ষিণ দিকে অবতীর্ণ হইয়া অনেক দেশ প্রদেশ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল। পশ্চিমে বাবিলন ও আসিরীয় রাজ্যের সীমা হইতে পূর্ব্বে পারস্য দেশের মরুভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করিয়া শকগণ অনেক বৎসর পর্য্যন্ত নানা প্রকার উৎপাৎ করিতে লাগিল। অবশেষে মিদীয় দেশের বিক্রমশালী রাজা সৈয়াক্‌জারিস শকদিগকে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন, এবং দক্ষিণ আসিয়া বর্ব্বরদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল।

মিদীয়দিগের পর পারসীকগণ আসিয়াতে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সাইরস, দারা প্রভৃতি পারসীক রাজাগণের কথা ইতিহাসে সকলেই পাঠ করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডরের হস্তে পারসীক রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে পর পার্থীয় রাজাগণ আসিয়াতে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন। পারস্যের উত্তরপূর্ব্বে তাহাদের নিবাস, এবং খৃষ্টের ২৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ২৩৬ বৎসর পর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শত বৎসর তাঁহারা আসিয়াতে প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইউরোপে রোমরাজ্য ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, কিন্তু ক্রাসস্, আণ্টনী, মরিস প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ রোমায় সেনাপতি পার্থীয়দিগের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিল।

এই পার্থীয়দিগের প্রাদুর্ভাবকালে খৃষ্টের অনুমান ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে শক জাতীয় বর্ব্বরগণ আর একবার দক্ষিণ আসিয়া আচ্ছাদন করিয়াছিল। তাহারা এরূপ বিক্রমশালী ও যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ছিল যে দুই জন পার্থীয় সম্রাট্ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। বাক্‌ট্রিয়া নামে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে গ্রীকদিগের একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। শকগণ ১২৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে সে রাজ্যটী গ্রাস করিল, এবং অনেক দিন তথায় রাজত্ব করিতে লাগিল।

ইহা অসম্ভব নহে যে এই স্থানের শক রাজগণ মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত, এবং ৫৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তাহারা বিক্রমাদিত্য নামীয় কোন ভারতবর্ষের সম্রাট দ্বারা পরাস্ত হইয়াছিল। অসম্ভব নহে যে শকদিগের এই পরাজয়ের সময় হইতে সম্বৎ অব্দ চলিয়া আসিতেছে। ইতিহাসে কোন বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক ঐ সময়ে শকদিগের পরাজয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু সম্বৎ অব্দ ৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে একজন বিক্রমাদিত্য ছিলেন, এবং তিনি শকদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার পরের ঘটনাগুলি আলোচনা করা যাউক।

শকগণ অনেক যুদ্ধের পর পার্থীয় রাজগণ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পারস্য রাজ্য হইতে বিদূরিত হইল। কিন্তু তাহারা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে কনিষ্ক নামে একজন শক রাজা কাশ্মীর ও সমস্ত পঞ্জাব অধিকার করিলেন, এবং তিনি যে অব্দ চালাইয়াছেন তাহাকে এখন ও শকাব্দা বলে। কোন কোন পণ্ডিত তাঁহাকে তুরেণীয় বিবেচনা করেন, কিন্তু হিন্দুগণ তাঁহার অব্দকে শকাব্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই শকাব্দা খৃষ্টের পর ৭৮ বৎসরে আরম্ভ হয়, সুতরাং কনিষ্ক নামক শকরাজা কাশ্মীরে খৃষ্টের ৭৮ বৎসর পর রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মাণ হইতেছে।

তাহার পরও ভারতবর্ষ বিশ্রাম লাভ করিল না। বিজাতীয়গণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া স্থানে স্থানে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। শকদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া বাকৃত্রিয়া দেশের গ্রীকগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। খৃষ্টের দুই তিন শত বৎসর পর কাবুল প্রদেশের অধিবাসী কাম্বোজগণ অসিহস্তে ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। এবং খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পর হূন নামক তুরেণীয় বর্ব্বরগণ চীনদেশের নিকট হইতে পঙ্গপালের ন্যায় অবতীর্ণ হইয়া, আসিয়া ও ইউরোপ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে শকগণ যেরূপ উৎপাত করিয়াছিল, খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পরে হূনগণ সেইরূপ ভয়ানক উৎপাত করিয়া মেদিনী কম্পিত করিল। তাহাদের অসংখ্য সেনা ইউরোপ ছাইয়া ফেলিয়া প্রায় আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত হূনবিজয় বিস্তার করিল, এবং অদ্যাপি তাহাদিগের সন্ততি হঙ্গেরি প্রদেশে বাস করিতেছে। আসিয়াতে তাহারা পারস্য প্রভৃতি রাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তখন পারস্য দেশে পার্থীয় সম্রাটগণের রাজ্যকাল শেষ হইয়াছে, সাসনীয় বংশীয় পারসীক সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেছেন। এই সাসনীয় বংশের ফিরোজ নামক সম্রাট ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অচিরে হূনদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া নিহত হয়েন। বহরাম গোর নামক আর একজন পারসীক সম্রাট হূনদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষে ছদ্মবেশে পলাইয়া আইসেন, এবং কথিত আছে যে একটী হিন্দু রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন।

৫৩১ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা নওশরবান্ বিদেশীয় শত্রুদিগকে দূর করিয়া পারস্যরাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি হিন্দু রাজাদিগের মিত্র ছিলেন, হিন্দু শাস্ত্র ভক্তি করিতেন, এবং "পঞ্চতন্ত্র" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদ করান।

ভারতবর্ষে খৃষ্টের পর পঞ্চম শতাব্দিতে মহাবল পরাক্রান্ত গুপ্ত রাজগণ কাণ্যকুব্জে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা হূনদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন, অনেকবার জয় লাভ করেন, এবং অনেকবার পরাস্ত হয়েন। হূনগণ মালব প্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম ভারতবর্ষ অধিকার করিল। কিন্তু অবশেষে কোন হিন্দু রাজা তাহাদিগকে এবং অন্যান্য বিদেশীয় শত্রুদিগকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধার করিলেন। বোধ হয় তিনিও বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি পারসিক সম্রাট্ নওশরবানের সমকালের লোক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য; আমাদের কবি কালিদাস খৃষ্টের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বের শকবিজেতা কোন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন না, খৃষ্টের পরের ষষ্ঠ শতাব্দিতে হূন বিজেতা কোন রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন?

এই গুরুতর বিষয় বিচার করিতে বসিলে অনেক ভাল ভাল সাক্ষীর "জবানবন্দী" লওয়া আবশ্যক! প্রথম সাক্ষী কাশ্মীরের ইতিহাসলেখক কহ্লন পণ্ডিত। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে কনিষ্ক রাজার পর ৩০ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন, তাহার পর যে মাতৃ গুপ্ত রাজা হয়েন তিনি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য রাজার বন্ধু ছিলেন। অতএব কহ্লন পণ্ডিতের সাক্ষ্যতা দ্বারা প্রমাণ হয় যে রাজা বিক্রমাদিত্য রাজা কনিষ্কের চারি পাঁচ শত বৎসর পরের লোক, অর্থাৎ খৃষ্টের পাঁচ শত কি সারে পাঁচ শত বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী চীন দেশীয় ভ্রমণকারী হুয়েন সাং। তিনি খৃষ্টের ৬৪০বৎসর পর ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি বলেন যে তাঁহার আসিবার ৬০ বৎসর পূর্ব্বে শীলাদিত্য বলিয়া এক জন রাজা ছিলেন, এবং শীলাদিত্যের পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন। অতএব তাঁহার সাক্ষ্যতা দ্বারাও প্রমাণ হয় যে অনুমান ৫৫০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্য রাজা হইয়াছিলেন।

তৃতীয় সাক্ষী রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ বরাহমিহির। তিনি যে জ্যোতিষ শাস্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই নিজের জন্ম সময়ের তারিখ দিয়া গিয়াছেন, সে তারিখ ৫০৫ খৃষ্টাব্দ।

চতুর্থ সাক্ষীও রাজা বিক্রমাদিত্যের আর একজন সভাসদ্, ব্যাকরণপ্রণেতা বররুচি। তিনি যে প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন খৃষ্টের পূর্ব্বে তাহার চলন ছিল না, খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পরের পুস্তকেই তাহার চলন দেখা যায়।

পঞ্চম ও শেষ সাক্ষী স্বয়ং কবি কালিদাস! তাঁহার গ্রন্থাবলী হইতেই তাঁহার সময় কতকটা নিরূপণ করা যায়।

কালিদাসের নাটকে যে প্রাকৃত ভাষা দেখা যায় তাহাও খৃষ্টের চারি পাঁচ শত বৎসর পরের প্রচলিত ভাষা, পূর্ব্বের নহে। কালিদাসের মহাকাব্যে যে হিন্দুধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম, প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম নহে। এমন কি কালিদাস ভারতবর্ষের যে বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন তাহাও খৃষ্টের পরকালীন ভারতবর্ষের বর্ণনা। অধিক তর্কে আবশুক নাই, তিনি যে হূন জাতির কথা রঘুবংশে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন সে হূন জাতির নাম ও অস্তিত্ব খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দির পূর্ব্বে সভ্য জগতে বিদিত ছিল না। পঞ্চম শতাব্দিতে হূনগণ জগৎ আচ্ছাদিত করিল এবং পারসীকগণ, রোমীয়গণ ও হিন্দুগণ এই ভীষণ জাতির পরিচয় পাইল। ষষ্ঠ শতাব্দিতে হূনগণ পঞ্জাবে একটী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা সেই সময়ের ভ্রমণকারীদিগের পুস্তক হইতে জানা যায়।

অতএব কালিদাস যে খৃষ্টের জন্মের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এ বিশ্বাস অগত্যা ত্যাগ করিলাম। কালিদাস খৃষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দির লোক।

ইতিহাসে দেখা যায় যে মধ্যে মধ্যে জগতে এক একটী মহা বিপ্লব সংঘটিত হয়। আধুনিক সময়ের মধ্যে ইউরোপে লুথরকৃত বিপ্লব ও ফরাসীরাজবিপ্লব তাহার উদাহরণ স্থল। প্রাচীন কালে বুদ্ধকৃত বিপ্লব ও আলেকজাণ্ডর ও চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক কৃত বিপ্লব তাহার অন্য উদাহরণ। কালিদাসের সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দিতেও সেইরূপ একটী বিপ্লব সংঘটিত হইতেছিল।

হূন জাতি এবং গথ ও সাক্সন জাতি এবং ফ্রাঙ্ক ও বাণ্ডল প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির ভীষণ উৎপাতে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন রোম রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

বর্ব্বরগণ ইতালী প্রদেশ ছাইয়া পড়িল, এবং ফ্রান্স, স্পেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি প্রদেশে যেটুকু রোমীয় সভ্যতা দীপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল। অতএব পশ্চিম ইউরোপ কালিদাসের সময়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন, প্রাচীন সভ্যতা নির্ব্বাপিত হইয়াছে, আধুনিক সভ্যতার উষাচ্ছটাও দৃষ্ট হয় নাই। ইউরোপের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ নগরে ক্ষীণ রোমীয় সভ্যতা ও রাজত্ব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাও স্তিমিত ও নিস্তেজ। তথাপি সেই সময়ের জষ্টিনিয়ন নামক রোমক সম্রাট বর্ব্বরদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রোমীয় সভ্যতা ও রাজ্য রক্ষা করিতেছিলেন, এবং রোমীয়দিগের আইন সংগ্রহ করিয়া আপন নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপের ত এই দশা। আসিয়াতেও হূন ও তুর্কীদিগের উৎপাতে অনেক রাজা রাজ্যচ্যুত ও প্রাণে নষ্ট হইলেন। কিন্তু ৫৩১ খৃষ্টাব্দে নওশরবান পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শান্তি সংস্থাপিত করিলেন। তাঁহার বাহুবলে পারস্য রাজ্য সিন্ধুতীর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিল। এবং তিনি হিন্দু, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা জ্ঞানালোক বিস্তার করিতে লাগিলেন।

জষ্টিনিয়ন ও নওশরবানের সমকালিক সম্রাট্ রাজা বিক্রমাদিত্য। তিনিও বর্ব্বরদিগের হস্ত হইতে স্বদেশ ও প্রাচীন হিন্দু সভ্যতা রক্ষা করিলেন, এবং তিনিও শাস্ত্র ও কাব্যালোচনা দ্বারা আপন নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।

পাঠকগণ এখন দেখুন খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দিতে বিপ্লব কিরূপ। ঘোর বর্ব্বরদিগের উৎপাতে জগৎ বিপর্য্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতেছে, তাহার মধ্যে তিন জন মহাত্মা সম্রাট্ বাহুবলে সেই বর্ব্বরদিগকে প্রতিহত করিয়া প্রাচীন রোমীয়, পারসীক ও হিন্দু সভ্যতা রক্ষা করিতেছেন। তিন জন সম্রাট্ই কাব্যপ্রিয় এবং কবিশ্রেষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত, এবং তাঁহাদের সময়ের কাব্য অদ্যাবধি রোমে, পারস্যে ও ভারতবর্ষে আদৃত।

এইরূপে অন্যান্য দেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তুলনা করিয়া পাঠ করিলে আমরা জগতের ইতিহাস বুঝিতে পারি, এবং ঘটনাবলির পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ ও নিয়মগুলি স্থির করিতে পারি। ষষ্ঠ শতাব্দির ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি, কেবল একটী কথা বলিতে বাকি আছে। যে সময়ে জষ্টিনিয়ন্ কন্‌ষ্টাণ্টিনোপ্‌লে, নওশরবান্ পারস্য দেশে, এবং বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেছিলেন, আরব দেশে সেই সময়ে একটী শিশু মাতৃ স্তন্যপান করিয়া মক্কানগরের পথে ঘাটে খেলিয়া বেড়াইত। সেই শিশুর নাম মুহম্মদ, এবং কালক্রমে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীগণ উপরি উক্ত তিনটী দেশ, এবং আসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অন্যান্য নানা দেশে মুসলমান জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল।

কালিদাসের সময়ে সভ্যজগতের কিরূপ অবস্থা তাহা আমরা বলিলাম। ভারতবর্ষের তখন কিরূপ অবস্থা তাহা কবি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত রঘুবংশ ও মেঘদূতে তাৎকালিক ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশ ও অনেক জাতির বিবরণ পাওয়া যায়। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় ঐরূপ একটি বিবরণ আছে, নবীনবাবুকৃত তাহার সুন্দর অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

৩৪

এইরূপে বহু দেশ পূরব অঞ্চলে
অতিক্রমি রঘুরাজ চতুরঙ্গ দলে,
উত্তরিলা অবশেষে সাগরের পার
তাল বনে পূর্ণ যাহা ঘোর অন্ধকার।

৩৫

বাঁচাইলা নিজ প্রাণ সুহ্ম দেশপতি (১)
প্রণমিয়া পরন্তপ রঘুর চরণে,
প্রচণ্ড নদীর বেগে বাঁচে রে যেমতি
বিনম্র বেতসলতা নমি কায়মনে।

৩৬

পরাজিলা রঘুরাজ নিজ ভুজবলে
তরীযোগে সমাগত বঙ্গ রাজদলে,
নির্ম্মিলা বিজয়স্তম্ভ দ্বীপের উপরে
শত মুখে যথা গঙ্গা পশেন সাগরে।

---

(১) বঙ্গদেশের কোন এক রাজ্য।

৩৭

উন্মূলিয়া শালি ধান্য রোপিলে আবার
দেখ যথা শস্য, পরাজিত রাজগণ
প্রণমি রঘুর পদে প্রসাদে তাঁহার
পুনঃ পেয়ে রাজ্য তাঁরে দিলা বহুধন।

৩৮

বাঁধিয়া হস্তীর সেতু দিলীপনন্দন
সসৈন্যে স্বর্ণরেখা হইলেন পার;
লইল উৎকলরাজ শরণ তাঁহার,
কলিঙ্গের (২) পথ তাঁরে করে প্রদর্শন।

৩৯

কাঁপিল মহেন্দ্র গিরি সেনা পদভরে
গিরিশিরে প্রতাপ প্রকাশে রঘুবীর
যেমতি গম্ভীরবেদী দ্বিরদের শিরে
নিবেশে অঙ্কুশ-ধার নিষাদী সুধীর।

৪০

যুঝিলা মাতঙ্গপৃষ্ঠে কলিঙ্গ ঈশ্বর
প্রহারিলা নানা অস্ত্র রঘুর শরীরে
বর্ষিছিলা শিলা রাশি যেমতি ভূধর
গিরি-পক্ষ ছেদকালে ইন্দ্রের উপরে।

৪১

কলিঙ্গের বাণবৃষ্টি সহি বীরবর
শরজালে হইলা জর্জ্জর কলেবর
জয়ার্থে সে বাণে স্নান করিয়া যেমতি
জিনিলা কলিঙ্গনাথে সূর্য্যকুলপতি।

৪২

লভি জয় রঘুসেনা উল্লাস অন্তরে
রচিল আপানভূমি পর্ব্বত শিখরে
পান করি নারিকেল-সুরা মুগ্ধকরী
তাম্বুলের পত্রপুটে শত্রু যশঃ হরি।

৪৩

মুক্তি দিলা কলিঙ্গেরে দিলীপনন্দন
স্বরাজ্য তাঁহারে রঘু দিলা পুনর্ব্বার
জয়লক্ষ্মী একমাত্র করিলা হরণ
বীরধর্ম্মে; না হরিলা রাজত্ব তাঁহার।

৪৪

পূর্ব্বদিক জয় করি কোশল রাজন্
চলিলা দক্ষিণে (যথা অগস্ত্য উদয়)
পয়োনিধি-উপকূল করিয়া আশ্রয়
পূগময় তটপথে চলে সেনাগণ।

৪৫

রাজসৈন্য সমাগমে কাবেরী তটিনী
জলক্রীড়া বিলোড়িতা সাগর-ভামিনী
গজমদে বিলাসের সৌরভ বিস্তারে
সন্দিগ্ধ সাগর তাই হেরি এ নদীরে।

৪৬

উত্তরিলা রঘুবীর মলয় অচলে (৩)
শোভে যার উপত্যকা অতিমনোহর
কলরবে এল বনে উড়ে শুকদলে
সেনা সন্নিবেশ হেথা কৈলা বীরবর।

৪৭

দক্ষিণে ভানুরও তেজ হয় ম্রিয়মান
তথায় প্রচণ্ড তেজা পাণ্ড্য রাজগণ (৪)
কে পারে তাঁদের তেজ করিতে দমন
রঘু হস্তে সেই তেজ হইল নির্ব্বাণ।

---

(২) বঙ্গ প্রদেশ হইতে মান্দ্রাজ প্রদেশ পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূলে প্রাচীন কলিঙ্গ-রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

(৩) ভারতবর্ষের দক্ষিণে মলয় অচল।

(৪) ভারতবর্ষের অতিদক্ষিণে পাণ্ড্যজাতির রাজ্য ছিল। মাডুরা নগর তাহাদের রাজধানী। রোম রাজ্যের সহিত পাণ্ড্যদিগের বাণিজ্যাদি ছিল।

৫৩

তাম্রপর্ণী (৫) নদীগর্ভে সাগর মিলনে
জনমে যে মুক্তা, যাহা যশোরাশি প্রায়
সঞ্চয়িলা পাণ্ড্যরাজ, দিলীপ নন্দনে
দিলা আজি উপহার নমি তাঁর পায়।

৫৩

চলিল পশ্চিমে সেনা ছাড়ি সহ্য গিরি (৬)
সমুদ্র প্রবাহ প্রায়; যেই পারাবার
জামদগ্ন্য শরে দূরে গিয়াছিল সরি
সেনা-স্রোতে সহসনে মিলিল আবার।

৫৪

রাজসৈন্য ভয়েতে কেরল নারীগণ (৭)
বেশ ভূষা ছাড়ি ব্যস্তে করে পলায়ন
পাছে ধায় সেনাদল ধূলারাশি হায়
লাগিছে তাদের কেশে কুঙ্কুমের প্রায়।

৫৯

মদ মত্ত করিগণ দন্তের প্রহারে
লিখিয়াছে শত ক্ষত ত্রিকূট অচলে
রঘুর বিজয়কীর্ত্তি বর্ণনের ছলে
জয়স্তম্ভরূপে অদ্রি দিক শোভা করে

৬০

পারস্যের (৮) রাজকুলে করিবারে জয়
স্থল পথে তথা রঘু করিলা গমন
তত্ত্বজ্ঞানে পথে যথা চলে যোগিজন
করিতে ই ন্দ্রিয়-রূপ রিপুর বিজয়!

৬১

যবনীর (৯) মুখ-পদ্মে মদরাগ ছটা
ঘুমাইলা রঘুরাজ যবনে বিনাশি
অকালে ঢাকিলে সূর্য্যে জলদের ঘটা
ফোটে কি বালার্ক রাগে কমলের হাসি।

৬২

অশ্ব পৃষ্ঠে মহাবল যবন নিকর
যুঝিল রঘুর সহ আঁধারি অম্বর
উঠিল ধূলার রাশি না চলে নয়ন
শিঞ্জারবে শত্রু পক্ষে মিলে সেনাগণ।

৬৬

চলিল উত্তরে রঘু লয়ে সেনাগণে
জিনিতে উদীচী দেশে নৃপতি নিকরে
তীক্ষ্ণশরে যথা রবি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
শোষিয়া উদক্ রাশি চলেন উত্তরে।

৬৭

সিন্ধুতীরে গড়াগড়ি দিয়া কুতূহলে
ভুলিল পথের শ্রম তুরঙ্গ নিকরে
লেগেছে কাশ্মীর জাত কুঙ্কুম কেশের
কাঁপাইয়া স্কন্ধ তাই দ্রুত বেগে চলে।

(৫) সিংহল দ্বীপের প্রাচীন নাম তাম্রপর্ণী। প্রাচীন গ্রীকগণ এবং চীনভ্রমণকারীগণ সিংহল দ্বীপকে এই নাম দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(৬) সহ্য গিরি—পশ্চিম ঘাট।

(৭) আধুনিক ত্রিবাঙ্কুরই প্রাচীন কেরল রাজ্য ছিল।

(৮) কালিদাসের সময়ে পারস্যরাজ নওশেরবানের রাজ্য ভারতবর্ষের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

(৯) বাক্‌ট্রিয়াদেশের গ্রীকগণকেই হিন্দুগণ প্রথমে যবন (Ionian) বলিত। তাহারা পশ্চিম ভারতবর্ষে সর্ব্বদা যুদ্ধ ও রাজ্য অধিকার করিত। তাহারা শ্বেতবর্ণ; কবি তাহাদিগের রমণীদিগের মুখের শ্বেতবর্ণ কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

৬৮

হুন দেশে বীরগণে বধি রণস্থলে (১০)
লভিলা অতুল যশ কোশল রাজন্
পতিহীন হুণাঙ্গনা বদন মণ্ডলে
শোক জাত রক্ত আভা করি আরোপণ।

৬৯

না পারি রঘুর তেজ সহিতে সমরে
নাম তাঁর পদাম্বুজে কাম্বোজের (১১) পতি
নমিল অক্ষোট বৃক্ষ তাহার সংহতি
যাহে বেঁধেছিল রঘু মাতঙ্গ নিকরে

৭০

লভিলা কাম্বোজে জিনি কোশল ঈশ্বরে
উপহার স্বর্ণ রাশি চারু অশ্ব দল
অপার ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল করতল
গরব রহিত তবু তাঁহার অন্তরে।

কবির এই বর্ণনা হইতে আমরা তাৎকালিক ভারতবর্ষের অনেক দেশের কথা জানিতে পারিলাম। সুহ্মদেশও বঙ্গদেশ, সুবর্ণরেখা পারে উৎকল ও কলিঙ্গ, কাবেরী পারে পাণ্ড্য রাজ্য ও পশ্চিমে কেরল রাজ্য, পশ্চিম দিকে পারসীক, যবন, হুন ও কাম্বোজ জাতিগণ,—এ সকলের পরিচয় পাইলাম। এইরূপে রঘুবংশের অন্যান্য অংশ এবং মেঘদূত পাঠ করিলে ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত অনেক দেশ ও অনেক জাতির কথা জানিতে পারি। আমাদিগের প্রাচীন কাব্যগুলি আদরের ধন, যত্ন সহকারে সেগুলি অনুশীলন করিলে তাহা হইতে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ফুলের মালা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বালিকা চলিল, অন্ধকার বনপথে একাকী চলিল। কি ঘোর ভীষণতা চারিদিকে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, কি এক অদৃশ্য বিকট ছায়া অন্ধকারের অনন্ত সীমা হইতে উঠিয়া বালিকার অনুসরণ করিতে করিতে নীরব অট্টহাসি হাসিয়া ভীমগর্জ্জনে বলিয়া উঠিতেছে "পাইবে না তাহাকে পাইবে না।" নির্ভীক শক্তির সাহসী হৃদয়ও

(১০) হুনগণ খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দির পূর্ব্বে সভ্য জগতে অবিদিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দিতে তাহারা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল। কালিদাসের সময়, অর্থাৎ ষষ্ঠ শতাব্দিতে হুনদিগের পঞ্জাবে একটী হুন রাজ্য ছিল। ইহাদিগের মুখ রক্তিমবর্ণ, কবি তাহা কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন।

(১১) কাবুল প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ। তাহারা বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল।

শিহরিয়া উঠিতেছে, চকিতনেত্রে চকিত পদক্ষেপে বালিকা বৃক্ষান্তরালের ক্ষণবিভাসিত ক্ষণনির্ব্বাপিত ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

বনপ্রান্তে জীর্ণ পুরাতন কালিকা মন্দির, বালিকা দ্বারবর্ত্তী হইল, দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময় বা পাষাণ দেব-দেবীর মূর্ত্তি এখানে নাই, দীপোজ্জ্বল কক্ষে অজিন চর্ম্মোপরি করুণরূপিণী রমণীর প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। শক্তি আসিতেই মন্দির-সেবাধারিণী যোগিনী তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "বৎসে, আমি তোমার জন্ম নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। এত রাত্র পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? তুমি এরূপ স্বেচ্ছা-চারী জানিলে আমি তোমাকে এখানে রাখিতে সম্মত হইতাম না।" শক্তির পিতা অল্প-দিনের জন্য যোগিনীর নিকট কন্যাকে রাখিয়া অন্যত্র গিয়াছেন। শক্তি প্রশান্ত ভাবে যোগিনীর ভৎর্সনা বাক্য শুনিল, শুনিয়া আত্মদোষমুক্তির কিছুমাত্র চেষ্টা না পাইয়া উত্তরে শুধু বলিল "রাজকুমার আসিয়াছেন।" বেশী কিছু বলার আবশ্যকও ছিল না; তাহার মন্দিরে ফিরিতে বিলম্ব হইবার কারণ ইহাতে বেশ সুস্পষ্ট হইল।

যোগিনী বলিলেন "রাজকুমার কে?"

"বাল্যসখা গনেশদেব, দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজা।"

"সূর্য্যদেবের তাহা হইলে মৃত্যু হইয়াছে!" শক্তি সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। যোগিনী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে একবার বলিলেন "ওঁ শান্তি শান্তি!" তাহার পর নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। শক্তি বলিল "আপনি তাঁহাকে জানিতেন নাকি? যোগিনী তাহার উত্তর না করিয়া কিছুপরে কহিলেন "বৎসে, তুমি যুবতী কন্যা, রাজকুমার তোমার শৈশব সখা হইলেও তাঁহার সহিত এরূপ একত্রবাস তোমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত!"

"আমরা বিবাহিত"

"বিবাহিত!" তিনি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কই তোমার পিতার নিকট ত ইহা শুনি নাই!"

"তিনি জানেন না। আমাদের গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল!"

শক্তি তাহাদের খেলার বিবাহবৃত্তান্ত বলিল। যোগিনী একটুখানি করুণ হাসি হাসিয়া বলিলেন।

"বৎসে, তোমার অপরাধ নাই। এ সংসার খেলার ঘর, ভগবান স্বয়ং খেলায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আর তুমি শিশুমতি বালিকা! খেলাকে সত্য ভাবিতেছ ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু রাজকুমারেরও কি এই ভাব! তিনি কি তাঁহার খেলার বধূকে এখন পরিণীতা বধূ করিতে প্রস্তুত?"

যোগিনীও তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন! কেহ কি অন্যভাবের কথা বলিবে না, কোথাও আশ্বাস নাই! সকলেরি মনের ভাব, মুখের কথা একই। সকলেই কেবল বলিবে,—"তাঁহাকে পাইবে না—তাহাকে পাইবে না!"

ঐ কথা শুনিতে শুনিতে সে যেন পাগল হইয়া উঠিল, নৈরাশ্যের সুতীব্র প্রবল বাত্যা-হত হইয়া তাহার হৃদয়নিহিত কোমল করুণভাবটুকু দারুণ কঠোরতায় যেন জমাটবদ্ধ হইয়া গেল, ক্রুদ্ধস্বরে সে বলিয়া উঠিল,—"যদি তাহা না করে ত তাহার উচ্ছেদ সাধন করিব।" মুসলমানের মুখে এই কথা শুনিয়া শক্তি শিহরিয়া উঠিয়াছিল, এখন নিজের মুখে সেইরূপ বলিতেও তাহার বাধিল না। শক্তি ক্রোধাবেগ সংযত করিতে একটু থামিল; তাহার পর বলিল—"দেবি, আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি। আমি উপেক্ষিত, আমি প্রত্যাখ্যাত, ইহার প্রতিশোধ চাই; আমি তাহাকে চাই, সে আমার পদানত হউক, আমি এই চাই, যদি তাহা না হয়--ত—"

"বৎসে, শান্ত হও। কোমল প্রকৃতি স্ত্রীলোকে প্রতিশোধ প্রবৃত্তি নিতান্ত অশোভন, জঘন্য বীভৎস। তুমি কি মনে কর, তোমারি আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য, তোমারি অঙ্গুলি তাড়নে চালিত হইবার জন্য বিশ্বসংসার সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানকে তোমার সুখের পথে ইচ্ছার পথে চাণক্য নিয়োজিত করিয়া তবে কি এ পৃথিবীতে তুমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছ? বৎসে বৃথা রাগ করিতেছ; রাজকুমার বাল্যকালে তোমার সহিত খেলা করিয়াছেন বলিয়া আজ তোমাকে বিবাহ করিতে বাধ্য নহেন; তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করাই তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। তোমার কষ্ট তোমার কর্ম্মফল, তাঁহাকে দোষী করা বৃথা। তুমি চাহিয়া তাঁহাকে পাইতেছ না বলিয়া যে তাঁহার অন্যায় ভাবিতেছ, প্রতি-শোধ আকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিত হইতেছ; কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভিক্ষুকের অধিকার কতটুক? বাস্তব পক্ষে তিনি তোমার প্রতি অন্যায় করেন নাই; তুমিই তাঁহার প্রতি অন্যায় দাবী করিতেছ।"

শক্তি উগ্রস্বরে বলিল—"অন্যায় দাবী! বিশ্বাসের অধিকার, প্রেমের অধিকার, হৃদ-য়ের অধিকার কি সর্ব্বোচ্চ অধিকার নহে? ভিক্ষুকও যদি সর্ব্বপ্রাণে দাতার করুণার প্রতি নির্ভর করে ত তাহাকে ফিরান দাতার অকর্ত্তব্য; আর তৎগতপ্রাণা, অনন্য-হৃদয়া রমণীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া সে অন্যায় করে নাই? সংসারের ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম আমি জানি না, কিন্তু হৃদয়ের ধর্ম্মে ভগবদ্ধর্ম্মে তাঁহাকে দোষী বলিতেছে। আমি জানি আমার বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্ম হৃদয়ের ধর্ম্ম, সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য হৃদয়ের কর্ত্তব্য সে ভঙ্গ করিয়াছে।"

যোগিনী। "বৎসে, তুমি ভুল করিতেছ। হৃদয়ের ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম, হৃদয়ের অধিকার উচ্চাধিকার সন্দেহ নাই। কিন্তু হৃদয়ধর্ম্ম বলি কাহাকে? পারস্পরিক প্রেমভাবই ত হৃদয়ধর্ম্ম; তুমি যাহাকে ভালবাস সেও যদি তোমাকে ভালবাসে তবেই ত প্রণয় বন্ধন; তবেই ত পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কর্ত্তব্য, অধিকার। এই বন্ধন ছিন্ন করিলে বটে বিশ্বাস ভঙ্গ, কর্ত্তব্য ভঙ্গ, ধর্ম্ম ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু রাজকুমার বাল্যকালে তোমার সহিত খেলা করিয়াছেন বলিয়া তোমার সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ এরূপ কল্পনা করা আশা

করা নিতান্ত অসঙ্গত ; প্রেমধর্ম্ম যৌবনধর্ম্ম, বিশেষতঃ পুরুষের পক্ষে ; অথচ বাল্যকাল হইতে তুমি তাঁহার নিকট হইতে দূরে ; তোমার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের অবসরও তাঁহার ঘটে নাই, কিম্বা বিনানুরাগ সত্ত্বেও যথাসময়ে যথানিয়মে তোমাকে তাঁহার পাত্রী মনোনীত করেন নাই, এ অবস্থায় না হৃদয়ধর্ম্মে না সমাজধর্ম্মে, কোন ধর্ম্মেই তিনি তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেন নাই। এক পক্ষ প্রেমে অধিকার নাই ; তুমি অনুগ্রহ ভিখারী মাত্র। অধিকার ভিক্ষাতেও আছে সত্য—যখন ভিক্ষা ন্যায্য প্রাপ্য, নহিলে অন্যায় ভিক্ষা যে চাহে সে অনধিকার দান চাহে,তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে দাতার প্রতি রাগ করিবার কিছু নাই।"

শক্তি বলিল—"একপক্ষ প্রেম ? প্রতিদিন কেন সে তবে ভালবাসা দেখাইত ? কেন সে ফুলমালা পরাইয়া আমাকে তাহার রাণী করিয়াছিল ?"

যোগিনী। "বৎসে সে বালকের খেলা ! কোমলমতি বালকে তুমি যুবকের দায়ীত্ব অর্পণ করিতে পার না।"

শক্তি। "আমি কি তখন বালিকা ছিলাম না ! আমি সেই হইতে পূর্ণ প্রাণে তাহাকে ভাল বাসিতেছি; আর তাহার প্রেম তাহার শপথ বালকের খেলা ! তাহা নহে ; আজও তাহার প্রতি কথায় প্রতি কটাক্ষে তাহার অন্তর নিহিত প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে ; হৃদয়ে হৃদয়ে আমরা একত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। কিন্তু সে ভীরু ! সে কাপুরুষ ! সে বিশ্বাসঘাতক ! তাই মাতৃভয়ে মাতার মিথ্যা অপবাদে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে ! বনোয়ারী লালের ভগিনী কলঙ্কিনী ! মিথ্যাবাদিনি, ভগবান যদি থাকেন ত তোমার বংশ এক দিন এই বনোয়ারি লালের বংশের পদানত হইবেই হইবেই !"

নবম পরিচ্ছেদ।

শক্তি নিশ্বাস লইতে থাকিল, যোগিনীও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন "বৎসে ভগবান আমাদিগকে দুঃখ কষ্ট দিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করেন বলিয়া কি তিনি আমাদের নিকট দোষী ? সেইরূপ রাজকুমার যে তোমার সুখ অবজ্ঞা করিতেছেন সে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে। কেবল তোমার সুখ নহে, কর্ত্তব্যের জন্য প্রাণাধিকা তোমা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহার নিজের সমস্ত জীবনের সুখশান্তি পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিশোধের পাত্র নহেন, শ্রদ্ধার পাত্র ! ভগবান রামচন্দ্র কি করিয়াছিলেন ! তোমাকে বিবাহ করিলে যখন তাঁহার বংশে কলঙ্ককালিমা পড়ে, তখন তোমাকে বিবাহ করা তাঁহার প্রকৃত অকর্ত্তব্য।"

শক্তি আগুণ হইয়া বলিয়া উঠিল, "শ্রদ্ধার পাত্র ! কোন্ কর্ত্তব্য মানব কর্ত্তব্যের বিরোধী ? রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়া মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দেন নাই ; ভীরুতা প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই অবিচারে তাঁহার দেবনামও কলঙ্কিত। সীতা যেমন

তাঁহার সহধর্ম্মিণী তেমনি তাঁহার প্রজা ; তাঁহাকে লোকভয়ে বিনাদোষে ত্যাগ করিয়া তিনি পতির কর্ত্তব্য, রাজকর্ত্তব্য, ঈশ্বর কর্ত্তব্য সকল কর্ত্তব্যই ভঙ্গ করিয়াছেন।”

যোগিনী। “কিন্তু—”

শক্তি। “ইহাতে কিন্তু নাই। রাজকুমারকে যে পতি বলিয়া জানিত, যে তাঁহার ধ্যানে জীবন সমর্পণ করিয়াছিল, মিথ্যা অপযশ ভয়ে তাহাকে অপরিগ্রহণ করিয়া রাজকুমার যে কেবল নিজের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন এমন নহে, সেই একনিষ্ঠহৃদয়াকে সমাজাচার কর্ত্তৃক অন্য পতিবরণে বাধ্য করিয়া তাহার পর্য্যন্ত ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছেন। শ্রদ্ধার পাত্র! ভীরু! কাপুরুষ! অবিচারক! অধর্ম্মাচারী! আমার পিতৃস্বসা কলঙ্কিনী! স্বর্গ তাঁহাকে স্থান দিয়া পবিত্র হইয়াছে। মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!”

শক্তির ক্রুদ্ধস্বর নিস্তব্ধ নিশীথের সাম্য ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া পড়িল। যোগিনী তখন স্বাভাবিক সংযত স্বরে বলিলেন—“মিথ্যা নহে, বৎস, সে কথা মিথ্যা নহে। আমিই তোমার সেই কলঙ্কিনী পিতৃস্বসা, এখনো জীবিত; স্বর্গে স্থান হইবে কি না জানি না এখনো পর্য্যন্ত নরকে স্থান হয় নাই।” শক্তি বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। যোগিনী বলিলেন “শোন বৎসে আমার কলঙ্কিত ইতিহাস শোন। শুনিয়া সাবধান হও। আমিও একদিন ঐরূপ ভাবিতাম, হৃদয়ের ধর্ম্মকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া জানিতাম; হৃদয়দেবতাকে সাক্ষাৎ ভগবানরূপী বলিয়াই জানিতাম। ঈশ্বরের রাজ্যে যাহা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর তাহা তাঁহাতেই উপলব্ধি করিতাম; তাঁহার বাক্য ধ্রুবসত্য, তাঁহার কার্য্য অপাপবিদ্ধ পুণ্যময় বলিয়াই জানিতাম, সংসারের মানুষের ন্যায় তাঁহাতে, কিম্বা তাঁহার আচরণে পাপ তাপ কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে এরূপ ধারণাই ছিল না। পরে বুঝিলাম ইহা মিথ্যা ধারণা, ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংসারে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবানকেও সংসার নিয়মের অধীন হইতে হয়; সংসারধর্ম্ম দিয়া হৃদয়ধর্ম্মকে বাঁধিলেই তবে তাহার পবিত্রতা তাহার মাহাত্ম্য রক্ষা হয়; নহিলে সমাজধর্ম্মের উল্লঙ্ঘনে হৃদয়ধর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল ব্যভিচারী হইয়া——”

শক্তি। “বিশ্বস্তপ্রাণা সরলা নারীজাতির চিরজীবনের সুখশান্তি হরণ করে। আর প্রকৃত দোষী দানব দেবতাগণ এইরূপে পরের সর্ব্বনাশ করিয়া সংসারের লীলাখেলা সম্পন্ন করেন। একবার নহে, সহস্রবার প্রতিশোধ! ভগবান, এ কি তোমার অবিচার! নারীকে কোমল করিয়া গড়িয়াছ কেবল কি পুরুষে তাহাকে পদ দলিত করিয়া সুখ অনুভব করিবে বলিয়া?”

যোগিনী। বৎসে ভগবানের নিন্দা করিও না। ঈশ্বর যাহাদের সহিতে দেন তাহাদের প্রতিই তাঁহার অধিক অনুগ্রহ। পশুর অধিকার অত্যাচার করা, দেবাধিকার অত্যাচার সহ্য করিয়া অত্যাচারীর মঙ্গল সাধন করা। অত্যাচার পৃথিবীর বস্তু, ভালবাসা স্বর্গের ধন। কে বলে ভালবাসার বল নাই, অত্যাচারদাতার বলও ইহার নিকট পরা-

ভূত; পরের দুঃখ তাপ ভার বহন করিয়া ইহা কখনো কাতর নহে, দুঃখ ইহাকে দুঃখ দিতে অপারক; বিধাতার আমাদিগের প্রতি কত করুণা, কত স্নেহ, তাই তিনি আমাদিগকে এরূপ অমূল্য ধনের অধিকারী করিয়াছেন।"

শক্তি। "সহ্য করিয়া যে সুখ পায় সে পাক্, আমার নিকট অত্যাচার অবিচার অসহ্য!"

যোগিনী। "বৎসে যে দণ্ডনীয়, বিধাতা তাহাকে দণ্ড দিবেন। পাপপুণ্য, ন্যায়ান্যায় কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারক আমরা নহি। স্ত্রী-জাতির ধর্ম্ম ভালবাসা—ইহা প্রতিশোধের অতীত। বৎসে ভালবাসিয়া উপেক্ষিত হইবার যে দারুণ কষ্ট তুমি তাহা জানিয়াছ; কিন্তু প্রতিশোধের অতীত হইতে পারিলে যে সুখ লাভ করিবে তাহার মত সুখ আর সংসারে কিছু নাই তাহা লাভে সচেষ্ট হও।"

শক্তি। "সে সুখ আমার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই; কেন না তাহা হইলে আমার সেইরূপই প্রবৃত্তি হইত। সংসারে ফুলের কার্য্য কাঁটার কার্য্য এক নহে। তাই বলিয়া কি কাঁটার আবশ্যকতা নাই? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে গড়িলেন কেন? সংসারে সজ্জন দুর্জ্জন উভয়েই ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধ করে; সজ্জন সাধুতা দ্বারা, দুর্জ্জন শাস্তি দ্বারা পাপের দণ্ড বিধান করে। ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার পক্ষে উভয়েরই আবশ্যক। সংসারে তোমার জন্ম, পুণ্যের দ্বারা পাপের ক্ষয় করিতে; আমার জন্ম, পাপের দ্বারা পাপকে দমন করিতে; কি কর্ম্মফলে বিধাতা আমাকে এরূপ হতভাগ্য করিয়াছেন জানি না; কিন্তু আমিও তাঁহার কার্য্য সিদ্ধি করিতে আসিয়াছি; আমি প্রতিশোধ চাই। সে যদি আমার হয় তবেই তাহার দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত নহিলে ভগবানের কালীরূপিনী বজ্রশক্তির আরাধনায়—"

যোগিনী। "বৎসে কালী হিংসাপ্রবৃত্তির চরিতার্থকারিণী নহেন; হিংসাহননকারিণী শক্তি। প্রতিশোধ কামনায় দেবতা পূজা দানবধর্ম্ম; হিন্দুধর্ম্ম, দেবধর্ম্ম নহে।"

শক্তি। অন্যায়ের প্রতি দণ্ড বিধান যে ধর্ম্মে দেবধর্ম্ম নহে সে ধর্ম্ম আমার নহে। আমি দেবীর নিকট চলিলাম কালী যদি আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন;—তবেই হিন্দুধর্ম্ম, আমার ধর্ম্ম; নহিলে আমি এ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব।

স্বরলিপি। *

শ্রীমতী কুমুদিনী কান্তগিরির অনুরোধে নিম্নলিখিত গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইল।

মিশ্রসিন্ধু—একতালা।

কি হল তোমার ? বুঝি বা সখি
হৃদয় তোমার হারিয়েছে !
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে
হৃদয় তোমার হারিয়েছে !
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখি গেছিলে খেলাতে,

* গত কার্ত্তিক মাসের "ভারতীতে" "বিবাহ উৎসব" নামক গীতিনাট্যের যে কয়েকটী গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে তিনটী গানের তালের নামকরণ সম্বন্ধে বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন নিম্নলিখিতরূপ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

(১ একটি গানের উপর সুর ও তাল লেখা আছে "কাফী—যৎ" কিন্তু তাহার ছেদ বিভাগ (অর্থাৎ এক একটী তাল বিভাগ যে কয়মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে) করা হইয়াছে তিন মাত্রা করিয়া ; আমাদের অল্প জ্ঞানে এইরূপ জানা আছে যে "যৎ" তালের প্রত্যেক তালি বিভাগ সাত মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। পূজ্যপাদ শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও "সাধনার" ১৪৭ পৃষ্ঠায় "তালের সঙ্কেত" স্থানে ঐরূপ লিখিয়াছেন।

(২) দুইটি গানের তাল লেখা আছে "খেমটা", তাহাদের ছেদ বিভাগ করা হইয়াছে চার মাত্রা করিয়া। এখানেও আমার মতের সহিত স্বরলিপির ছেদবিভাগের অনৈক্য ঘটিতেছে।"

উপেন্দ্র বাবুর আপত্তি সঙ্গত। নিতান্ত অনবধানতাবশতঃ ঐ তিনটী গানের তালে ভুল নামকরণ হইয়া গিয়াছে। মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উদ্দেশ্যে "বিবাহ উৎসব" পুস্তক ছাপাইবার পূর্ব্বে পূজনীয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক গানের পাশে পাশে তালের নাম লিখিয়া দেওয়া হয়। তখন রীতিমত ছেদবিভাগ করিয়া না দেখা প্রযুক্ত, শুধু মুখে মুখে গান শুনিয়া ভুলক্রমে একতালাকে যৎ, এবং কাওয়ালীকে খেমটা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। স্বরলিপি করিতে বসিয়া প্রকৃত ছেদবিভাগ ধরা দিলেও, অনবধানতাবশতঃ তালের নামান্তর করা হয় নাই। সে জন্য আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিতেছি

"যৎ" এর পরিবর্ত্তে "একতালা" হইবে, এবং "খেমটা"র পরিবর্ত্তে "কাওয়ালী" হইবে।

মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি, চেতনা পেয়ে,
সহসা সজনি দেখিলে চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝে
হৃদয় তোমার হারিয়েছে!
যদি কেহ, সখি, দলিয়া যায়!
তার পর, দিয়া চলিয়া যায়!
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখি দলিয়া যায়!
তোমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
তোমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর চরণ ভর
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
আজ সে সহসা হৃদয় তোমার
কোথায় সজনি হারিয়েছে।

মিশ্র-সিন্ধু—একতালা।

স১ স১ স́১ । ন১ ধ২ । প১ প১ ম১ । ধ১ প১ র১ । র১
কি হ ল তো মার বু ঝি বা স খি — হৃ

র১ গ১ । ম১ প২ । গ১ মগ১ র১ । স৩ ॥ স́১ স́১ গ́১ । র́১
দ য় তো মার হা — রিয়ে ছে কি হ ল তো

র́গ́১ ম́১ । গ́৩ । গ́৩ ॥ প́১ প́১ প́১ । ম́১ গ́ । ম́১ গ́১ র́১ । স́১
মা — র — কি হ ল তো মার বু ঝি বা স

ন১ ধ১ । প১ মী১ প১ । ধ১ ন২ । র১ র২ । গ১ গপম২ । গ২
জ নী হৃ দ য় তো মার হৃ দয় তো মার হা

র১ । স৩ ॥ স১ র২ । র১ র১ র১ । রপ্‌১ ম২ । গ্ম২ র১ । স৩ । স১
রিয়ে ছে প থের মা ঝে তে খে লা তে গি য়ে —

স১ স১ । স১ স২ । ন্‌১ ধ্‌১ ন্‌১ । স১ র১ র১ । স১ র২
স খি প থের ম ঝে তে খে লা তে গি য়ে

ন্‌১ স২ । র১ গ২ । ম২ ম১ । গ্ম৩ । প১ প২ । ধ১ ধ্ন২ । ন২ ন১
হৃ দয় তো মার হা রিয়ে ছে হৃ দয় তো মার হা রিয়ে

স́৩ । স́১ ম́১ ম́১ । গ́৩ । স́১ র́১ গ́১ । র́১ স́১ । র১
ছে ও — স খি হৃ দ য় তো মার হৃ

র২ । গ১ গপম২ । গ২ র১ । স৩ । স১ স২ । র১ র২ । গ২ গ১ ।
দয় তো মার হা রিয়ে ছে হৃ দয় তো মার হা রিয়ে

ম২ মস১ । স১ স১ রস১ । ন্‌সন্‌২ ধ্‌১ ন্‌১ । স৩ । স৩ ॥ প১ প১
ছে — হৃ দ — য় — তো মা র প্র ভা

গ১ । প১ প১ ধ১ । প১ ধ১ নোধ১ । প১ ধ্ন১ ধ১ ॥ প১ স́
ত কি র ণে ম কা ল বে লা তে ম নে

স́১ । স́১ স́১ স́১ । র́১ স́১ স́১ । স́১ স́১ স́১ । স́২
ল য়ে স খি গে ছি লে খে লা তে ম

ন১ । র্র২ র্র১ । র্স০ । র্স০ । র্গ১ র্র১ র্স১ । ন১ ধ১ নধ১ । প২ র্স১ ।
— ন ল য়ে — খে লা তে গে ছি লে ম ন

ন২ র্সন১ । ধ২ র্র১ । র্স১ র্র২ । র্র১ র্প১ র্প১ । র্মী০ । ধ১ র্প১
ল য়ে ম ন ল য়ে ও — স খি খে লা

র্মী১ । র্গ১ র্র১ র্স১ । ন০ । র্স২ র্স১ । র্র০ । র্র২ ধ১ । ধ২ ধ১ ।
তে গে ছি লে ম ন ল য়ে — — মন কু

ন১ র্স১ র্র১ । নর্স১ র্র১ র্স১ । ন১ ধ১ প১ । প১ র্প১
ড়া ই তে ম ন ছ ড়া ই তে কু ড়া

র্মী১ । র্গ১ র্র১ র্স১ । ন০ । র্স২ র্স১ । র্র০ । র্র২ ধ১ । ধ২ ধ১ ।
তে জ ড়া তে ম ন ল য়ে — — মন কু

ন১ র্স১ র্র১ । নর্স১ র্র১ র্স১ । ন১ ন১ র্সন১ । ধ১ র্স১
ড়া ই তে ম ন ছ ড়া ই তে ম নে

র্স১ । ন১ ন১ র্সন১ । ধ১ র্স১ ন১ । ধ১ প১ প১ । র্গ১ র্গ১
র মা ঝা রে খে লি বে ড়া ই তে ম ন

র্গ১ । র্গ১ র্গ১ র্ম১ । র্প১ র্র১ র্স১ । ন১ ধ১ প১ । র্গ১ র্গ১
ফু ল দ লি চ লি বে ড়া ই তে ম ন

র্গ১ । র্গ১ র্ম১ র্গ১ । র্গম র্পম০ । র্গ০ । র্গ১ র্গ১ র্গ১ । র্গ১ র্গ১
ফু ল দ লি দ লি ম ন ফু ল ব

ম´১ । গ´১ র´১ স´১ । ন১ ধ১ ন১ । র´১ স´১ ন১ । ধ১ প১
লি চ লি বে ড়া ই তে স হ সা স জ

প১ । মী প১ মী১ । ধ১ প২ । র১. র১ র১ । গ১ ম১ প১ ।
নী চে ত না পে য়ে স হ সা স জ নী

ম১ গ১ ম১ । র১ স২ । স১ র১ র১ । র১ র১ র১ । র১ র১
দে খি লে চে য়ে রা শি রা শি ভা ঙ্গা হৃ দ

গ১ । ম১ প২ । র১ র১ গ১ । ম১ প১ । গ মগ১ র১ । স৩ ।
য় মা ঝে হৃ দ য় তো মার হা — রিয়ে ছে

প১ ন১ ধ১ । স´১ ন১ ন১ । প১ ধ১ ন১ । ধ১ প২ । র১ র২ ।
রা শি রা শি ভা ঙ্গা হৃ দ য় মা ঝে হৃ দয়

গ১ গপম২ । গ২ র১ । স৩ । স´১ স´১ গ´১ । র´১ র´১ ম´১
য় মার হা রিয়ে ছে রা শি — রা শি —

গ´১ র´১ গ´১ । র´১ স´২ । র১ র২ । গ১ গপম২ । গ২ র১ । স৩
হৃ দ য় মা ঝে হৃ দয় তো মার হা রিয়ে ছে

স১ স২ । র১ র২ । গ২ গ১ । ম২ স১ । স১ স১ রস১ । ন্‌সন্‌১
হৃ দয় তো মার হা রিয়ে ছে — হৃ দ — য়

ধ্‌১ ন্‌১ । স৩ । স৩ ॥ স১ স১ স১ । স১ স১ স১ । স১ ন্‌১
— তো মার য দি কে হ স খি জ লি

র১ । স০ । স১ র্স১ র্স১ । ন১ ধ১ প১ । প১ মী১ ধ১ । প২ স১ ।
য়া যায় য দি কে হ স খি জ লি য়া যা য়

স১ স১ স১ । স১ স১ স১ । স১ ন১ র১ । স০ । প২ ধ১ । ন১ র্স১
য দি কে হ স খি দ লি য়া যায় তার প র দি

র্র১ । র্গ১ র্র১ সন্১ । স০ । র্স১ র্স১ র্স১ । র্স১ র্স১ র্স১ ।
য়া চ লি য়া যায় শু কা য়ে প ড়ি বে

র্র১ র্স১ ন১ । ধ১ প১ প১ । মী১ প১ মী১ । প১ মী১ প১ ।
ছিঁ ড়ি য়া প ড়ি বে দ ল গু লি তা র

গ১ ম১ গ১ । র১ স১ স১ । স১ র্স১ র্স১ । ন১ ধ১ প১ ।
ঝ ড়ি য়া প ড়ি বে য দি কে হ স খি

প১ ম১ ধ১ । প০ ॥ গ১ গ১ গ১ । প১ প১ ধ১ । প১ ধ১
দ লি য়া যায় তো মা র কু সু ম কো ম

নোধ১ । প১ ধ২ । প১ র্স১ র্স১ । র্স১ র্স১ র্স১ । র্র১ র্স১
ল হৃ দয় ক থ ন স হে নি র বি

র্স১ । র্স২ ন১ । ধ১ ধ১ ন১ । র্স১ র্র২ । র্স১ র্স১ র্স১ ।
র ক র তো মা র ম নের কা মি নী

ন১ ন১ র্সন১ । ধ১ র্স১ র্স১ । ন১ ন১ র্সন১ । ধ১ র্স১
পা প ড়ি স হে নি ভ্র ম র চ র

ন১ । ধপ০ । র্গ১ র্গ১ র্গ১ । র্গ১ র্গ১ ম১ । র্গ১ র্র১ র্স১ । ন১
ণ ভয় দি য় দি ন স খি হা সি তে খে

ধ১ ন১ । র́১ স́১ ন১ । ধ১ প১ প১ । মী১ প১ মী১ । ধ১
লি তে জো ছ না আ লো কে ন য় ন মে

প১ প১ । র২ র১ । গ১ ম১ প১ । ম১ গ১ মগ১ । র১ স২ ।
লি ত আজ সে স হ সা হৃ দ য় তো মার

প২ প১ । ধ১ ধ১ ধ১ । ন১ ন২ । স́১ স́২ । র́১ র́২ ।
আজ সে স হ সা হৃ দয় তো মার কো থায়

গ́১ গ́১ গ́১ । ম২ ম১ । গ́৩ ॥
স জ নী হা রিয়ে ছে

(আ-প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

সাহিত্য।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য, উপায়, উপকরণ ও উপভোগ লইয়া আজকাল অনেকপ্রকার আলোচনা চলিতেছে। সাহিত্যরচয়িতা ও সাহিত্যরসজ্ঞ উভয়শ্রেণীর লোকই এই আলোচনার অধিকারী। প্রস্তাবিত বিষয়টী একদিকে সহজ, অন্যদিকে জটিল। বিভিন্ন মতামতের জঙ্গল ভেদ করিয়া এ সম্বন্ধে সত্যানুসন্ধান করা যেমন কঠিন, সরলবুদ্ধির সহায়ে ইহার মীমাংসা তেমনি সহজ। মীমাংসার প্রথম সোপান সাহিত্য কি ইহার নির্ণয়। চলিত সংস্কৃতে, যাহাতে চিত্তবিনোদন হয় এইরূপ সংযুক্তবাক্যই সাহিত্য। এ অর্থে বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, দর্শন, ব্যাকরণ সাহিত্য নহে। এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থে সাহিত্য শব্দ গৃহীত হইলে তাহার তত্ত্বসংগ্রহ করা অনায়াসসাধ্য, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় ঠিক এই অর্থে সাহিত্য শব্দের প্রয়োগ হয় না। বাঙ্গালায় ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অর্থ। সাহিত্য শব্দের ইংরাজি প্রতিবাক্য লিটারেচার আরও বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়; "মেডিক্যাল লিটারেচার" "ম্যাথামেটিকাল লিটারেচার" প্রভৃতি প্রয়োগই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লিপিবদ্ধ হইলেই "লিটারেচার" শব্দের বাচ্য হয়। বাঙ্গলা সাহিত্য শব্দের এত বিস্তৃত অর্থ নহে। লিটারেচার শব্দের ইংরাজী ভাষার একটী ঔপচারিক অর্থ আছে, সে অর্থে উহা একটী কলাবিদ্যার মধ্যে

পরিগণিত। ষ্টফোর্ড ব্রুক লিটারেচারের যে সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহার স্থূলমর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাষায় পরিচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাব। বোধ হয় বাঙ্গলাভাষায় সাহিত্য এই অর্থে লিটারেচার।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য। রাস্কিন্ একস্থলে বলিয়াছেন "A nation is judged by its greatest men" অর্থাৎ, জাতীয়প্রকৃতির দোষ গুণ বিচার করিতে হইলে জাতির মহৎ ব্যক্তিগণের চরিত্র পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এ কথাটা আরো বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূত ব্যক্তিগণের কোন সাধারণ গুণ নির্ণয় করিতে হইলে সেই শ্রেণীর মহৎ ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই গুণ কিরূপ ভাবে বর্ত্তিয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়। সাহিত্যজগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্ত্তারা যে উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করিয়া মহত্বলাভ করিয়াছেন তাহাই সাহিত্যের আদর্শ, অর্থাৎ যথার্থ উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কি? মানুষের ভিতরে ও বাহিরে যাহা সত্য তাহাতে রসাত্মিকাবৃত্তি স্থাপন করা। মানুষ নিজের কর্ম্মের ফলভোগ করে ইহা সত্য; কিন্তু শুদ্ধ এ সত্যটী প্রচার করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নহে। এই সত্যটী সত্য বলিয়া ইহাতে প্রীতি, ভয় বা অন্য কোন রস উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। সূর্য্যোদয়ের সময়টী মনোহর ইহা সত্য, কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া মানুষের মনে প্রীতি জন্মাইতে না পারিলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। মনুষ্য জীবন ক্ষণস্থায়ী এই সত্যে ভয়, বিস্ময়, দুঃখ, প্রীতি বা অন্য কোন রস উদ্রেক করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

মনুষ্যজীবনে দেখা যায় যে অনেক সময় উপায় ও উপেয় এই দুইটী ভিন্ন করিয়া ধারণা না করায় উপায়কে উপেয় করিয়া দাঁড় করান হয়। সুখে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করাই অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্য। কিন্তু উপায় ও উপেয়ের বিপরীত ধারণাতে অর্থ সংগ্রহই অনেক সময় উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, ব্যবহার-নিষ্পত্তি মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এইরূপ বিপরীত ধারণা বশতই সাহিত্যের একটী ব্যভিচারী বা গৌণ উদ্দেশ্য, সত্যনিরপেক্ষ হইয়া রসাত্মিকা বৃত্তির উদ্রেক। কথাটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। "সবুজ পত্রাচ্ছাদিত একটী বৃক্ষ রহিয়াছে," ইহা সাহিত্য নহে। "আহা- সবুজ পত্রাচ্ছাদিত এই যে বৃক্ষটী রহিয়াছে ইহার কি চমৎকার রঙ্!" ইহা যথার্থ সাহিত্য। এখানে "বৃক্ষ রহিয়াছে" বহির্জগতের এই সত্যে একটী রস পর্য্যবসিত হইল। সাহিত্যের ব্যভিচারী উদ্দেশ্যের একটী উদাহরণ যদৃচ্ছাক্রমে গ্রহণ করা যাউক।

"Pleasure at the helm and youth at the prow.—"

এখানে যৌবন যে সুখতৃষ্ণায় চালিত হয় এই সত্যটীর উল্লেখে আমাদের মনে কোন রসের উদ্রেক হইতেছে না; যে রস উদ্রিক্ত হইতেছে তাহা সুখতৃষ্ণাকে মাঝি ও যৌবনকে দাঁড়ীর সহিত উপমিত করিয়া যে বাক্যালঙ্কার সৃষ্ট হইয়াছে তাহারইসৌন্দর্য্যে একটী প্রীতিরস। যৌবনে যে লোক সুখলিপ্সায় চালিত হয় এ সত্যটী দূরে পড়িয়া থাকিতেছে।

এই নিমিত্ত এস্থানে সাহিত্যের ব্যভিচারী উদ্দেশ্য মাত্র সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া অলঙ্কার মাত্রেই যে সাহিত্যের ব্যভিচারী উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্তস্থল তাহা নহে।

"ছুটেছে ফোয়ারা, হর্ষে মাতোয়ারা
শূন্যে চড়ি ধরে যেন আকাশের তারা,
না পেয়ে নাগাল, ছাড়ি দিয়ে হাল
অধোমুখে মনোদুখে কেঁদে হয় সারা"

এখানে মন রসে সিক্ত হইতেছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যকে হারাইতেছে না, কারণ সত্য যে ফোয়ারা, তাহার ছবিই আমাদের মনে শেষ জাগিতেছে।

সাহিত্যের উপায়। (১) সত্যের রসাস্বাদন ; (২) ভাবময়ী ভাষা ; (৩) সরলতা, সংযম ও (৪) আত্মবিলোপ।

সাহিত্যের উপায় বলিলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে কি উপায় অবলম্বন করিয়া সাহিত্যকার তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন। উদ্দেশ্যে যাহা শেষ, উপায়ে তাহাই প্রথম। রসাত্মক ভাবের সত্যবোধে পর্য্যবসান যেমন সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য, তেমনি সত্যের রসাস্বাদন সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম উপায়। সাহিত্যকারের মন যদি সত্যের রসাস্বাদন করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব।

সত্য অনুভব করিয়া সাহিত্যকারের মনে যে রসভাব উৎপন্ন হয় তাহার উপযোগী ভাষা সাহিত্যের দ্বিতীয় উপায়। ভাষাহীন ভাবও দেহহীন আত্মা উভয়েই সমান নিষ্ক্রিয়।

সাহিত্যকারের মনে যে ভাব উদয় হয় তাহা বিনা আড়ম্বরে ব্যক্ত না করিলে অখণ্ডিত রূপে পাঠকের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। আশপাশের বস্তুতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইলে মুখ্য বস্তু চাপা পড়িয়া যায়, সেই জন্য সরলতাও সংযম সাহিত্যের দুইটা প্রধান ও অপরিহার্য্য উপায়।

সচরাচর মনুষ্য নিজের ভাব ব্যক্ত করে। কিন্তু যথার্থ সাহিত্য কর্ত্তা ভাবে নিজত্ব হারাইয়া ফেলেন, তাঁহার নিজত্ব বিগলিত হইয়া ভাবের সহিত একাকার হইয়া যায়। সে ভাবের অন্তরালে যে আত্মা অধিষ্ঠিত তাহা শুধু সাহিত্যকারের আত্মা নহে, বিশ্বজগতের আত্মা। এইরূপ আত্মবিলোপ ব্যতীত সাহিত্যের উর্দ্ধসীমায় উপনীত হওয়া যায় না। সেক্ষপীয়রের রচনাবলীর অন্তরালে যে আত্মা অধিষ্ঠিত তাহা সেক্ষপীয়র নামক ব্যক্তি বিশেষের আত্মা নহে, তাহা তোমার আমার মনুষ্যমাত্রেরই আত্মা। সেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলীর রচয়িতা শুদ্ধ একজন ব্যক্তিবিশেষ নহে। তিনি স্বীয় গ্রন্থে ব্যক্তিগত জীবন পরিত্যাগ করিয়া একটী অতিমহান্ সুবিস্তৃত জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহা সমগ্রমনুষ্যের জীবন। আমাদের আত্মা সেক্ষপীয়রের আত্মার অন্তর্ভূত এবং তাঁহার জীবন আমাদের জীবনে ওতঃপ্রোত। ইহাতেই সেক্ষপীয়রের শ্রেষ্ঠতা। এইরূপ আত্মবিলোপের অবসরসম্পন্ন বলিয়াই নাট্যসাহিত্য সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয়।

সাহিত্যের উপকরণ। (১) বিষয়, (২) ভাব।

সাহিত্যের উপকরণ কি এই প্রশ্ন উঠিলে সহজেই দুইটি কথা মনে উদয় হয়। প্রথম, কি লইয়া সাহিত্য গঠিত হইতে পারে, অন্য কথায় সাহিত্যের বিষয় কি ? মনুষ্যগর্ভাধরিত্রী ও সর্ব্বাতীত পরমাত্মা এ সমস্তই সাহিত্যের বিষয়। এই চরাচরাত্মক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অতীত পরমাত্মা লইয়াই মনোবৃত্তির বিকাশ ; ব্রহ্মাণ্ডের অতীত বা অন্তর্ভূত যাহা কিছু আছে তাহাতেই অবস্থাভেদে রসাত্মিকা বৃত্তি উৎপন্ন হয়। বৃত্তি ও বৃত্তির বিষয়, অর্থাৎ যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া নদীরসমুদ্রপ্রাপ্তির ন্যায় বৃত্তির চরিতার্থতা হয়, এই দুইটির মধ্যে একটি মিথুনসম্বন্ধ আছে। বৃত্তির সহিত বিষয়ের এই মিথুনসম্বন্ধবন্ধন যাহার দ্বারা রক্ষিত হয়, তাহা মনোভাব। যেমন রাগ একটি মনের বৃত্তি এবং যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রাগের উদয় হয় তাহা রাগের বিষয় ; এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের যে আকাঙ্ক্ষা আছে মানসপটে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনই রাগের ভাব।

সাহিত্যের দ্বিতীয় উপকরণ বস্তুবিষয়ক ভাব। এই দুইটি উপকরণ বিভিন্ন মাত্রায় সম্মিলিত হইয়া সাহিত্যের বৈচিত্র্য রক্ষা করে। দেশকাল পাত্রভেদে একই বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মনোবৃত্তির বিচরণ ; এই নিমিত্ত সাহিত্যের বৈচিত্র্য চিরনূতনভাব ধারণ করিয়া আছে। স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনোবৃত্তি বাহিরের বস্তু অনুসন্ধানপ্রিয়। ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনের শৈশবে বাহিরের বস্তু লইয়াই মনোবৃত্তির খেলা ! কিন্তু ক্রমে তাহা এত অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে সে খেলায় আর মনোযোগ হয় না। তখন সেই চির পরিচিত বস্তুকে নাড়াচাড়া করিয়া, তাহাকে বিবিধ বর্ণে ভূষিত করিয়া, তবে মনে পুনরায় ভাবোদয় হয় এবং সেই ভাববন্ধনে মনোবৃত্তি পুনরায় সেই সকল বস্তুতে পর্য্যবসিত হয়। সাহিত্যের উপকরণবৈচিত্র্যের এই একটি উপায়। যৌবনোদ্গমে মনোবৃত্তির প্রবাহের বেগবৃদ্ধি হইলে অন্তর বাহিরে মিলন করিবার যত্ন জন্মে। সাহিত্যের উপকরণবৈচিত্র্যের ইহা অন্য একটি উপায়। ক্রমে জীবনের প্রস্তরাঘাতে মনোবৃত্তি অন্তঃসলিলা হইয়া পড়ে, মনে নানাবিষয়ে নানাতর্ক উদিত হয় ; এই অন্তঃসলিলা মনোবৃত্তি কাহার প্রতি, কি উদ্দেশে, কি ভাবে ছুটিতেছে, আমার সহিত আমার বাহিরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ—তাহার কোন্ ধারা কোন্ দিকে বহিতেছে, কোন্ রসে কোন্ দিক প্লাবিত করিতেছে, এই শতমুখী মানসগঙ্গার গতি অনুসরণ করিয়া সাহিত্যের অনন্ত যৌবন বৈচিত্র্য ! যখন মনোবৃত্তির বহিঃপ্রসারণ শমিত হইয়া মনোলব্ধ সত্যে নিস্তরঙ্গ হ্রদের ন্যায় স্থিতি করে তখন তাহাকে সেই সত্যে অব্যভিচারী অনুরক্তি বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সাহিত্যের চির মধুর শান্তিরস অক্ষুণ্ণ প্রভাবে বহমান থাকে। যেরূপ স্বর্ণনিহিত মণিখণ্ড স্বর্ণবন্ধনে আবদ্ধ থাকে সেইরূপ সত্যনিহিত মনোবৃত্তি রসাত্মক সত্যবন্ধনে চিরআবদ্ধ।

সাহিত্যের উপভোগ। সাহিত্যের উপভোগের জন্য দুইটি বস্তু আবশ্যক। (১) সহানুভূতি ও (২)আত্মবিস্মৃতি। অপরের মন আপনার মন করিয়া বুঝিতে যিনি অক্ষম

সাহিত্য রসজ্ঞতা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।—নেত্রহীন ব্যক্তির পক্ষে যেমন বহির্জগতের সৌন্দর্য্য, তাহার পক্ষে সাহিত্যের সৌন্দর্য্যও সেইরূপ। বিবিক্তগুণে সহানুভূতি উদ্রেকের অবসর নাই বলিয়া তাহা সাহিত্যের বিষয় হয় না। তবে কোনবস্তুর সম্যক অনুভবের নিমিত্ত তাহার অঙ্গ বিশ্লেষণ করিয়া সেই বিবিক্ত উপকরণগুলিকে যথার্থ বস্তুর আকৃতি দানে জীবন্ত করিলে তবেই তাহাতে সাহিত্যের উপভোগ হয়। যাহাদের মনের গতি স্বার্থময় সুখদুঃখে আবদ্ধ তাহাদের সাহিত্য সম্ভোগ দুর্ঘট।

আপনাকে না ভুলিতে পারিলে পরের মনকে আপনার মন করিয়া লওয়া যায় না। দুর্দ্দমনীয় অশান্ত অহংবৃত্তি যাহার হৃদয়ময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে তাহার নিকট সহানুভূতি অপরিচিত। প্রকৃত সাহিত্যরস উপভোগকালে যখনি মনে হয় আমার ত ওরূপ নহে, আমিত ওরূপ ভাবিনা, ইহাতে আমার কি আসে যায়, তখনি এইরূপ অহং-বৃত্তির উদয়ে সাহিত্যের মায়া কাটিয়া যায়। অহংবৃত্তি সাহিত্যের দানব, ইহার আবির্ভাবে কখনই সাহিত্যযজ্ঞ সফল হয় না। সাহিত্যের অগ্নি শমিত হইয়া পড়ে এবং যজ্ঞে ষোড়শোপচারে পূতিগন্ধ উৎপন্ন হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গান।

আমার পরাণ লয়ে
কি খেলা খেলিবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়!
কোথা হতে ভেসে কূলে
লেগেছে চরণ মূলে
তুলে দেখিয়ো!

এ নহে গো তৃণদল,
ভেসে-আসা ফুলফল,
এ যে ব্যথাভরা মন
মনে রাখিয়ো!

কেন আসে কেন যায়
কেহ না জানে।

কে আসে কাহার পাশে
কিসের টানে!

রাখ যদি ভাল বেসে
চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও, তবে
বাঁচিবে কি ও!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চন্দ্রালোক।

(গী-ড-মোপাসাঁ)

আবে মারিঞা একজন ধর্ম্মসৈনিক; ধর্ম্মসংগ্রামে নিত্যতৎপরতা দেখাইয়া তাঁহার উপাধির সার্থকতা ও প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি এক জন দীর্ঘাকৃতি, শীর্ণকায় পুরোহিত; অত্যন্ত ধর্ম্মান্ধ ও ভাববশীভূত; কিন্তু অতি ন্যায়পরায়ণ। তাঁহার মনের সমুদয় বিশ্বাসগুলি একেবারে স্থির ও অবিচলিত, কখনও তাহাদের নড়চড় হইত না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছেন। ঈশ্বরের কার্য্য কারণ ও অভিপ্রায় সমুদয়ের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

যখন তিনি দীর্ঘপাদক্ষেপে তাঁহার কুটীরসংলগ্ন উদ্যানপথে বিচরণ করিতেন তখন কখন কখন তাঁহার মনে এইরূপ প্রশ্ন উদয় হইত "ঈশ্বর অমুক বস্তু কেন সৃষ্ট করিলেন?" তখন তিনি কল্পনাবলে ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিয়া একাগ্রমনে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতেন ও সাধারণতঃ প্রায়ই কারণ বাহির করিতে সক্ষম হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি এরূপ নহে যে ভক্তিপ্রসূত বিনয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিবেন "হে প্রভু তোমার ইচ্ছা বুদ্ধির অগম্য।" তিনি আপনাকে বলিতেন "আমি ঈশ্বরের ভৃত্য সুতরাং তাঁহার কার্য্যের উদ্দেশ্য জানা আমার কর্ত্তব্য, অথবা না জানিলেও তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হওয়া কর্ত্তব্য।"

তাঁহার নিকট প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুই একটী অখণ্ড যৌক্তিকতা অনুসারে গঠিত বোধ হইত। "কেন" এবং "কারণ" উভয়েই তুলাদণ্ডে সমপরিমাণ। আমাদের জাগরণকে আনন্দময় করিবার জন্যই উষার সৃষ্টি, শস্যগুলিকে পরিপক্ক করিবার জন্য দিনের, বারিসিঞ্চনের জন্য বৃষ্টির, নিদ্রার আয়োজনের জন্য সন্ধ্যার ও নিদ্রার্থে অন্ধকার রাত্রির সৃষ্টি।

কৃষির সাফল্যের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াই ছয় ঋতুর যথানুক্রম। তাঁহার মনে কখন এরূপ সন্দেহও উদয় হইতে পারিত না যে প্রকৃতির কোনরূপ অভিপ্রায় নাই, বরঞ্চ সৃষ্ট বস্তুই আপনাকে প্রাকৃতিক অবস্থার নিকট নত করে, নিজেকে দেশ কালের কঠিন প্রতিকূলতার উপযোগী করিয়া লয়।

কেবল মাত্র স্ত্রীলোককে তিনি ঘৃণা করিতেন।* একান্ত বিবেচনাবিরুদ্ধ ঘৃণা করিতেন, এবং একেবারে অন্তরাত্মার মূল হইতে প্রসূত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। তিনি সর্ব্বদা যীশুখৃষ্টের এই কথাটী আবৃত্তি করিতেন "রমণীর সহিত আমার কিসের সংস্রব?" আরও বলিতেন, তাঁহার মনে হয় ঈশ্বর স্বয়ং যেন তাঁহার এই বিশেষ প্রকারের গর্হিত সৃষ্টির জন্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আছেন। কবিরা যে দ্বাদশ বার মলিন শিশুর কথা বলিয়াছেন তাঁহার নিকট রমণী সেই মালিন্যভূয়ান্ জীব। রমণীই আদম মনুষ্যকে প্রলোভিত করিয়াছিল এবং এখনও তাহারা মনুষ্যের অধঃপতনকার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত। সে দুর্ব্বল অথচ ভীতিজনক এবং অশেষ প্রকারে অনিষ্টকারক। কিন্তু তিনি রমণীর পাপ দেহাপেক্ষা তাহাদের প্রেমময় হৃদয়কে আরও ঘৃণা করিতেন।

অনেক সময় তিনি নিজের প্রতি রমণীর স্নেহভাব অনুভব করিতেন এবং যদিও নিজেকে দুর্ভেদ্য বলিয়া জানিতেন তথাপি নারী-হৃদয়ে যে ভালবাসিবার একান্ত আবশ্যকতার ভাব চিরকম্পমান দেখিতেন তাহাতেই খাপ্পা হইয়া উঠিতেন। তাঁহার বিশ্বাস যে পুরুষকে প্রলুব্ধ ও পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর রমণীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন প্রকার ফাঁদের নিকট যাইতে হইলে যেরূপ সন্তর্পণে ও সতর্কতার সহিত যাওয়া কর্ত্তব্য রমণীর নিকট অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে ঠিক তদ্রূপ সতর্কতার প্রয়োজন। রমণীর আলিঙ্গনাপেক্ষী প্রসারিতবাহুদ্বয় ও অধরযুগল অবিকল একটী ফাঁদ।

কেবল সন্ন্যাসব্রতধারিণীগণের প্রতি তাঁহার একটু কম বিরাগ ছিল, কারণ তাহাদের ব্রত তাহাদের নির্ব্বিষ করিয়াছে। তথাপি তিনি তাহাদের প্রতিও রূঢ় ব্যবহার করিতেন, কারণ তাহাদের সংসারবিবর্জ্জিত পবিত্র মনেও নারীসুলভ, তাঁহারও-প্রতিধাবমান চিরস্নেহের উৎস নিহিত দেখিতে পাইতেন।

তাহাদের পুরোহিতাপেক্ষা অধিকতর ভক্তিরসার্দ্র নয়নে তাহা দেখিতে পাইতেন; তাহাদের যীশুখৃষ্টের প্রতি প্রেমোচ্ছাসে তাহা দেখিতে পাইতেন এবং তাহা যে স্ত্রীলোকের প্রেম ইহা মনে করিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন। এবং তাহাদের সহিত কথোপকথন কালে তাহাদের মৃদুস্বরে, আনতচক্ষে, কিম্বা তাঁহার তিরস্কারজাত নীরব অশ্রুজলে তিনি তাহাদের সেই ঘৃণ্য, অভিশপ্ত স্নেহভাবের পরিচয় পাইতেন, এবং মন্দির হইতে বাহির হইয়া কাপড় ঝাড়া দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতেন যেন কোন বিপদ হইতে দূরে পলায়ন করিতেছেন।

তাঁহার একটী ভাগিনেয়ী ছিল। সে তাহার মাতার সহিত নিকটবর্ত্তী একটী

কুটীরে বাস করিত। মারিঞা তাহাকে "দীন-দয়াময়ী ভগিনী" সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া চিরকুমারী করিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন।

সে বালিকা সুশ্রী, চঞ্চল ও দুষ্টুমিতে ভরা। আবে যখন বক্তৃতা করিতেন সে হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিত; তিনি যখন রাগ করিতেন সে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার চুম্বন করিত। আবে তাড়াতাড়ি আপনাকে তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন কিন্তু সেই সঙ্গে একটী মধুর আনন্দের আস্বাদ পাইতেন, তাঁহার বক্ষে মনুষ্যহৃদয়সুপ্ত নিভৃত পিতৃভাব সচেতন হইয়া উঠিত।

অনেক সময় মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি তাহাকে ঈশ্বরের কথা—তাঁহার নিজের ঈশ্বরের কথা—বলিতেন। বালিকা সে কথা প্রায় শুনিত না। সে কখন আকাশ, কখন ফুল, কখন ঘাসের প্রতি চাহিত, তাহার নয়নে জীবনের আনন্দ দীপ্ত হইয়া উঠিত। কখন একটা উড়ন্ত পতঙ্গ দেখিয়া ধরিতে ছুটিত, একটু পরেই ধরিয়া আনিয়া বলিত "দেখ মামা দেখ কি সুন্দর! আমার ইচ্ছে কর্‌ছে একে চুম খাই।" এই প্রজাপতি কিম্বা ফুলকে চুম্বন করিবার আবশ্যকতায় তিনি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন, কারণ ইহার মধ্যেও সেই নারীহৃদয়ে একান্তবদ্ধমূল নিত্যউচ্ছ্বসিত স্নেহরসের পরিচয় পাইতেন।

একদিন তাঁহার পরিচারিকা, মন্দিররক্ষকের পত্নী, তাঁহাকে চুপে চুপে বলিল যে তাঁহার ভাগিনেয়ীর একটী প্রণয়ী আছে।

আবে তখন ক্ষৌরকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সংবাদে হঠাৎ তাঁহার মনে বিপ্লব উপস্থিত হইল, কথা আটকাইয়া গেল, মুখময় সাবান লেপিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার কথা কহিবার ও চিন্তা করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিল তখন বলিয়া উঠিলেন "তুমি মিথ্যা বলিতেছ—ইহা কখন সত্য নয়।" কিন্তু দাসী তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া বলিল "আমি যদি মিথ্যা বলি ত ভগবান তাহার বিচার করিবেন। তাহারা দুই জনে প্রতি রাত্রে নদীর ধারে বেড়াইয়া বেড়ায়। তুমি যদি রাত দশটার পর একদিন নদীর ধারে যাও তবে নিজ চক্ষেই দেখিতে পাইবে।"

তিনি ক্ষৌরকার্য্যে ক্ষান্ত দিয়া দ্রুতবেগে ঘরে পাদচার করিতে লাগিলেন—তাঁহার মনে কোন গভীর চিন্তার উদয় হইলে তিনি বরাবর এইরূপ করিতেন। একটু পরে আবার যখন কামাইতে চেষ্টা করিলেন তখন নাসিকা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত তিন চারি বার ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল।

সমস্ত দিন তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রাগে ফুলিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বশক্তিমান প্রেমের বিরুদ্ধে পৌরহিত্যোচিত দ্বেষের সহিত অবাধ্য সন্তানের প্রতি পিতৃক্ষোভও মিশ্রিত ছিল। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কন্যা কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিলে পিতার যেরূপ ক্রোধ হয় তাঁহারও সেইরূপ ভাব হইতেছিল।

সান্ধ্যভোজনের পর তিনি একটু পড়িতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তাঁহার ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন ছয়টা বাজিল তখন উঠিয়া একখানি প্রকাণ্ড স্থূলকায় লাঠি হস্তে গ্রহণ করিলেন। রাত্রিকালে পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে যাইলে তিনি এই যষ্টিসহায় হইয়া যাইতেন। সেই মুদ্গারের ন্যায় স্থূলকায় যষ্টিটির প্রতি চাহিয়া, একটু হাসিয়া, তাঁহার পল্লীবাসীর কঠিন মুষ্টিতে তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া শূন্যে দুই একবার চক্রাকারে ঘুরাইলেন। তাহার পর হঠাৎ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তাহা একবার ঊর্দ্ধে উঠাইয়া সহসা একখানি চৌকির উপর পাড়িয়া ফেলিলেন। চৌকীটী দুই খণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

তিনি বাহিরে যাইবার জন্য দরজা খুলিলেন। কিন্তু হঠাৎ কচিৎদৃষ্ট অপূর্ব্ব চন্দ্রালোকে বিস্ময়াভিভূত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

তিনি প্রাচীন কালের সেই কবিপ্রাণ, স্বপ্নশীল ধর্ম্মবীরগণের ভাবাভিভূততা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই শুভ্রাননা রজনীর প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া সহসা বিচলিত হইলেন।

তাঁহার কোমল জ্যোৎস্নাস্নাত ক্ষুদ্র উদ্যানটীতে পল্লববিরল ক্ষীণতনু বৃক্ষগুলি শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সম্মুখের পথে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে। গৃহপ্রাচীরা-চ্ছাদিত মধুচুম্বকলতার সুরভি নিশ্বাসবায়ুতে মনে হইতেছে যেন একটি সুরভিত আত্মা এই নির্ম্মল শীতহীন রজনীতে শূন্যে বিচরণ করিতেছে।

মদ্যপায়ীরা যেমন সুদীর্ঘচুম্বকে মদ্যপান করে তিনি সেইরূপ একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সেই সুগন্ধ পান করিয়া মোহমত্ত ও চেতনালুপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগিনেয়ীর কথা প্রায় ভুলিয়া গেলেন।

যখন গ্রামপ্রান্তে পৌঁছিলেন তখন সেই সোহাগস্পর্শানুকারী আলোকে প্লাবিত; সুকুমার, অবসাদময়, প্রশান্ত রজনীর মাধুর্য্যাপ্লুত,মুক্ত প্রান্তর চোখ ভরিয়া দেখিবার জন্য দাঁড়াইলেন। থাকিয়া থাকিয়া ভেকগণ আকাশে তাহাদের ধাতুধ্বনিবৎ স্বর উদ্গীরণ করিতেছে এবং সুদূরবর্ত্তী পাপিয়া চন্দ্রালোকমোহে তাহার সঙ্গীতমোহ মিলাইতেছে। সে সঙ্গীতে চিন্তা নয়, শুধু স্বপ্ন উদ্রেক করে; সে লঘু, ঝঙ্কারময় সঙ্গীত শুধু চুম্বনের জন্য সৃজিত।

আবে চলিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল, কেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অনুভব করিলেন তাহা একবার ঈষৎ ক্ষীয়মান হইয়া হঠাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল এইখানে একটু উপ-বেশন করিয়া ঈশ্বরকে তাঁহার অপার সৃষ্টির জন্য ধন্যবাদ করেন।

আর একটু দূরে ক্ষুদ্র নদীর বাঁক ধরিয়া একসার পপ্‌লার বৃক্ষ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। নদীর দুই তীরে ও নদীর বঙ্কিম জলস্রোতের উপর একখানি সূক্ষ্ম কুয়াশা ভাসমান রহিয়াছে, জ্যোৎস্নায় তাহা প্রতিঘাত হইয়া চক্‌চক্ করিতেছে।

পুরোহিত আবার একবার থামিলেন, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কি একটী ভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল।

একটী সন্দেহ, একটী কি যেন অস্বচ্ছন্দ ভাব তাঁহার মনকে ব্যাপ্ত করিতে লাগিল। তিনি অনুভব করিলেন তিনি নিজেকে সময়ে সময়ে যেরূপ প্রশ্ন করেন সেইরূপ একটী প্রশ্ন তাঁহার মনে উদয় হইতেছে।

ঈশ্বর ইহা কেন করিলেন? রজনী নিদ্রার জন্য, চেতনাবিহীনতার জন্য, বিশ্রামের জন্য; তবে কেন দিবসের অপেক্ষা এমন কি উষা ও সন্ধ্যার অপেক্ষাও ইহাকে অধিকতর মনোহারী করা হইল? ওই ক্ষুদ্র, সুন্দর গ্রহ, যাহা সূর্য্য হইতে কত অধিকতর কবিত্বময়, সেই প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্ক সূর্য্য যে সকল অতি সুকুমার রহস্যপূর্ণ বস্তুনিচয় আলোকিত করিতে অক্ষম তাহাদের উন্মেষিত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়েই যেন যাহার সৃষ্টি—কেন সে তমসাবৃত ছায়া সমূহকে সমুজ্জ্বল করিতে আসিয়াছে? কেন জগতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতক অন্য সকলের ন্যায় বিশ্রামে গমন করে নাই? কেন সে এই রহস্যপূর্ণ, বেদনাজনক অন্ধকারে সঙ্গীত বর্ষণ করিতেছে?

জগতের উপরে কেন এই অর্দ্ধাবরণ প্রসারিত? কেন এ হৃদয়কম্পন? কেন এ দেহের অবসাদ? কেন এই আত্মার বিপ্লব?

জগতের সকলে যখন নিদ্রিত, কেহ যখন দেখিবার নাই তখন কেন এ মাধুরীর প্রাচুর্য্য? এ মহান্ দৃশ্য, স্বর্গ হইতে পৃথিবীর উপর এই যে কবিত্বের প্রপাত বর্ষিত হইতেছে, এ কাহার জন্য?

আবে এ সকল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু দেখ! ওই দূরবর্ত্তী মাঠপ্রান্তে রজতকুয়াশাসিক্ত বৃক্ষতোরণের নিম্নে পাশাপাশি বিচরণশীল দুটী ছায়া প্রকাশিত হইল। পুরুষটী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘায়ত; তাহার একহস্ত প্রণয়িনীর গলদেশে ন্যস্ত এবং সে মধ্যে মধ্যে প্রণয়িনীর ললাট চুম্বন করিতেছে। হঠাৎ তাহারা যেন এই প্রাণহীন দৃশ্যকে জীবন্ত করিয়া তুলিল। যেন এই অপরূপ চিত্রখানির জন্যই এই স্বর্গীয় ফ্রেম রচিত হইয়াছিল। এই দুটীতে মিলিয়া যেন সেই একটী প্রাণী যাহার জন্য এই প্রশান্ত রজনীর সৃষ্টি।

উভয়ে পুরোহিতের প্রশ্নের জীবন্ত উত্তর স্বরূপ ধীরে ধীরে তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাঁহার প্রভু, ঈশ্বর, স্বয়ং যেন তাঁহার প্রশ্নের এই মূর্ত্তিমান উত্তর প্রেরণ করিলেন।

অভিভূতচিত্তে ও কম্পমান হৃদয়ে তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল যেন বাইবেলে বর্ণিত রুথ ও বোয়াজের প্রণয় কাহিনীর ন্যায় আর একটী পবিত্র প্রেমকাহিনী অভিনীত হইতে দেখিবেন। তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ব্বশ্রুত বাইবেল বর্ণিত প্রেমও ভালবাসার যত কবিতা, যত অতৃপ্তি, যত আকুলতা, যত মধুরতা, যত সঙ্গীত সমুদয় জলন্ত ভাবে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

তিনি আপনাকে বলিলেন "ঈশ্বর বোধ হয় মানবপ্রেমকে মহিমান্বিত করিবার জন্যই এইরূপ রজনীর সৃষ্টি করিয়াছেন।"

তিনি বাহুপাশাবদ্ধ আসন্ন প্রণয়ীযুগলের নিকট হইতে সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তাঁহার ভাগিনেয়ীই বটে। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করিলেন তিনি কি পূর্ব্বে ঈশ্বরকে অমান্য করিতে উদ্যত হ'ন নাই? প্রেম যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হয় তবে তিনি কেন তাহাকে এমন চমৎকার শোভামণ্ডিত করিবেন?

তিনি বিস্ময়ে ও লজ্জায় সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন, যেন একটী নিভৃত মন্দিরে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলেন যেখানে তাঁহার কোন অধিকার নাই।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী।

সমালোচনা।

অশোকচরিত।—শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।

সুযোগ্য লেখনীর অগ্রভাগে এই মহচ্চরিত্র অতি মনোহারী রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশোক-চরিতের প্রতি পত্র প্রতিচ্ছত্র পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সে পাণ্ডিত্য নিতান্ত নিরাড়ম্বর সরলভাষা সরলভাবভূষিত মনোজ্ঞ রচনার মধ্য দিয়া অশোকের আদর্শজীবনের আদর্শ ভাব সাধারণের আয়ত্তমধ্যে আনিয়া পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিভেদে মনুষ্যে মনুষ্যে একত্ব ও সাম্যরূপ সর্ব্বোচ্চ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে জাতি তদনুযায়ী আচরণ করিতে পারিয়াছে সেই জাতিই উন্নতির পথে মহত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই ভাব লক্ষ্য করিয়া যাঁহারা জীবনের কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই মহৎলোক, তাঁহাদের জীবনই জাতীয়জীবনে আদর্শ জীবন। আকবর এই ভাবের মহত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অতুল কীর্ত্তি আর তাঁহার পুত্রগণ সে ভাবের অগৌরব, অপমাননা করাতেই তাঁহাদের পিতৃস্থাপিত সেই রামরাজ্যের অধঃপতন।

অশোক ইহার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদারতায় তিনি ভারত একচ্ছত্র করিয়াছিলেন, এবং সুদূর য়ুরোপেও আপন ধর্ম্ম বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য কিনা করিয়াছেন, অথচ তিনি সকল ধর্ম্মকেই মান্য করিতে বলিয়াছেন, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই সত্য আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কেবল মনুষ্যজাতির মধ্যে নহে জীবজগতেও তাঁহার উদারতা বিস্তৃত, রুগ্ন পশুদিগের শুশ্রূষার জন্য তিনিই সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। খৃষ্ট মানুষকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, বুদ্ধ কেবল মানুষকে নহে জীবজগতকে পর্য্যন্ত ভালবাসিতে শিখাইয়াছেন।

এইখানেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃত মহত্ব। কালে আর সকলি জলবুদ্বুদের ন্যায় মিশাইয়া যায়, উচ্চভাব সকল কেবল এই মরজগতে অমর হইয়া বিরাজ করে। সেই অশোক, যাঁহার নামে কোটি কোটি লোক এক সময় কম্পিত হইত; যাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না, যাঁহার প্রভাবে সমুদয় ভারত এক হইয়াছিল আজ কোথায় তিনি? কোথায় তাঁহার প্রতাপ! কোথায় তাঁহার পাটলিপুত্র নগর, তাঁহার অগণ্য বিহার স্তূপ, স্তম্ভ! সে সব কিছুই নাই, আছে কেবল কতকগুলি ভগ্নস্তম্ভে, কতকগুলি বিকৃত ভগ্নাবশেষ পর্ব্বতপৃষ্ঠে, কতকগুলি লুপ্তভাষার অক্ষরসংযোগে, তাঁহার মহৎভাব প্রণোদিত কয়েকটি আদেশ, যাহাতে আজও তাঁহার নাম ধন্য, তাঁহার জাতি ধন্য, তাঁহার দেশ ধন্য, জগৎ ধন্য! আমরা অশোক চরিত হইতে তাঁহার আদেশ কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"অশোকের ধর্ম্মাদেশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমতঃ কতকগুলি পর্ব্বতের পৃষ্ঠে ক্ষোদিত। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলি স্তম্ভোপরি লিখিত। তৃতীয়তঃ, অতি অল্প আদেশ পর্ব্বতগুহা মধ্যে লিপিবদ্ধ। তন্মধ্যে ১৪টি আদেশ, পাঁচটি পর্ব্বতপৃষ্ঠে পাঁচ প্রকার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত আছে। দুইটি রাজ্যের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, দুইটি পূর্ব্ব প্রান্তে এবং আর একটি একবারে পশ্চিম প্রান্তে, এই পাঁচ প্রান্তের পাঁচ ভাষা। ভারতের ঐ পাঁচ বিভাগে পাঁচ প্রকার প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল এবং এই পাঁচ প্রকার প্রাকৃতেই এই আদেশ গুলি লিখিত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এখানে অনুবাদিত হইল, যথা।—

প্রথম আদেশ।

"দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই আদেশ প্রচার করিতেছেন। এই স্থানে পূজার্থে বিম্বা আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে কোন প্রকার জীব হত্যা হইবে না। এই সকল উপলক্ষ করিয়া অনেক প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহার হইয়া থাকে। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার প্রজাদিগের পিতৃস্বরূপ। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার উপাসকমণ্ডলীতে পূজা একইপ্রকার হওয়া উচিত। পূর্ব্বে দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শীর মন্দির এবং রন্ধনশালাতে আহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ শত সহস্র জীবের বলিদান হইত। এখনও আহারের জন্য একটী কিম্বা দুইটী জীবের হত্যা হয়। কিন্তু আজ এই আনন্দের ধ্বনি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছে যে আজ হইতে একটী জীবেরও প্রাণবধ হইবে না।

দ্বিতীয় আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর বিজিত বিভাগের প্রত্যেক স্থানে এবং চোডা, পাণ্ডিয়, সত্যপুত্র, কেতলপুত্র, তম্বপাণি পর্য্যন্ত যে যে স্থানে বিশ্বাসীরা বাস করেন এবং গ্রীক রাজ আণ্টিওকাসের রাজ্যে যেখানে তাঁহার সেনাপতিরা শাসন করেন, সর্ব্বত্রই দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার চিকিৎসার দ্বিবিধ পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে—মনুষ্যের জন্য চিকিৎসা এবং পশুদিগের জন্য চিকিৎসা। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যদিগের উপযোগী এবং পশুদিগের উপযোগী সর্ব্বপ্রকারের ঔষধও বিতরিত হয়। এবং যে যে স্থানে ঔষধের

আয়োজন নাই, সেই সেই স্থানে এখন হইতে ঔষধ সকল থাকিবে এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হইবে। লতা এবং মূল সকল স্থানে সংরক্ষিত কিম্বা রোপিত হইবে। রাজ্যের প্রধান প্রধান বর্ত্মে মনুষ্য ও পশুদিগের জন্য কূপ সকল খনন করান হইবে এবং বৃক্ষ সকল রোপিত হইবে।

তৃতীয় আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—আমার রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বৎসর পরে এই আদেশ লিখিতেছি। বিজিত প্রদেশের সর্ব্বস্থানে যেথানে বিশ্বাসীরা বাস করে, তাহারা আমার প্রজাই হউক বা বিদেশীই হউক, সকলকার মধ্যে পঞ্চম বর্ষ গত হইলেই একটি করিয়া সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত (অনুশরণ) সম্পাদিত হইবে। ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং জঘন্য ক্রিয়ার দমন ইহার উদ্দেশ্য। আচার্য্য ভিক্ষু সঙ্গের সম্মুখে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি টীকা এবং দৃষ্টান্ত সহ বুঝাইয়া দিবেন। যথা, পিতা মাতার অনুগত হওয়া কর্ত্তব্য; বন্ধু এবং কুটম্ব, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগকে দান করা সাধু কার্য্য; জীব হিংসা, অপব্যয় ঈর্ষাপূর্ণ গ্লানি এ সকল অতিশয় গর্হিত কর্ম্ম।

চতুর্থ আদেশ।

পূর্ব্বকালে শত শত বৎসর ধরিয়া নরবলি, পশুবলি, পিতামাতার প্রতি অসম্মান এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি ভক্তির অভাব সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। অদ্য দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর আদেশে ভেরি রব আকাশে উত্থিত হইল। অগণ্য রথ এবং হস্তী পথের উপর দিয়া কাতারে কাতারে গমন করিতেছে। আকাশে হাওয়াই প্রভৃতি অগ্নি বাজি প্রদর্শিত হইতেছে এবং লোকেরা নানাবিধ দৈব বিষয়ক অভিনয় করিতেছে। প্রিয়দর্শীর দূতেরা প্রিয়দর্শীর ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছে। যে ধর্ম্ম পালন শত শত বৎসর ধরিয়া কখনই হয় নাই তাহা আজ প্রিয়দর্শীর আদেশে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। জীব হিংসার নিবৃত্তি, কুটুম্বদিগের প্রতি সম্মান, পিতামাতার অনুগমন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি ভক্তি এই সকল সদ্‌গুণ এবং অন্যান্য প্রকার ধর্ম্ম সাধনা এখানে বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী এই সকল ধর্ম্ম কার্য্য আরও বর্দ্ধিত করাইবেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্রেরা প্রলয় কাল পর্য্যন্ত এই সকলের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করাইবেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে পর্ব্বত সদৃশ অটল হইয়া তাহারা নীতির নিয়ম সকল পালন করিবে। যে হেতু নীতি এবং ধর্ম্ম এই দুয়ের যোগ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাহার নীতি নাই তাহার পক্ষে ধর্ম্ম পালনও নাই। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক; ইহা যেন নির্জীব না হয়। সেই জন্যই এই আদেশটি দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশবর্ষে লিখিত হইল।

পঞ্চম আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী বলিতেছেন,—বিপদ হইতে সম্পদ আসে এবং প্রত্যেক লোক সম্পদ পাইবার মানসে উপস্থিত বিপদ ঘটায়। সেই জন্যই আমি অনেক সমৃদ্ধি

পাইয়াছি এবং আমার পুত্র পৌত্রেরাও সেইরূপ কার্য্য চিরকাল করিবে। প্রত্যেকে তাহার কর্ম্মের পুরস্কার পায়। যে এইরূপ আচরণ তাচ্ছিল্য করে সে নরকে পাপীদিগের সহিত দণ্ডভোগ করে।

অনেক দিন এমন কোন ধর্ম্মমহামাত্রা নিযুক্ত হন নাই যাঁহারা অবিশ্বাসী পাষণ্ডদিগের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে পারিয়াছেন। আমি এই সকল ধর্ম্ম মহামাত্রাদিগকে নিযুক্ত করিলাম। তাঁহারা যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাস্তিক, পেতেনিক প্রভৃতি দেশ মধ্যে এবং অসভ্য জাতিদিগের দেশের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া সকল শ্রেণীর লোকদিগের হিত সাধন করিবেন, বিশ্বাসীদিগকে রিপুসংযম শিখাইবেন এবং পাপের শৃঙ্খলে বদ্ধ যে সকল লোক তাহাদিগকে উদ্ধার করিবেন। পাটলিপুত্র এবং অপরান্ত প্রভৃতি দেশে যাহাদিগকে লোকেরা ভয় করে এবং যাহাদিগকে লোকে সম্মান করে, এ সকলের সঙ্গে তাঁহারা আলাপ রাখিবেন এবং সকল স্থানেই তাঁহারা প্রবেশ করিবেন। সকলকেই তাঁহারা উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষা দিবেন। অবশেষে যাহারা ধর্ম্মের বিঘ্নকারী তাহারাও ধর্ম্ম প্রচারক হইয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ আদেশ।

সকল সময়ে, সকল কার্য্যের সংবাদ রাজসমীপে উপস্থিত করার পদ্ধতি অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন আমি এই অনুজ্ঞা দিতেছি যে আমি ভোজনে বসি বা রাজভবনে থাকি, অন্তঃপুর মধ্যে থাকি বা কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত থাকি, লৌকিকতা করি বা উদ্যানে বিশ্রাম করি, প্রতিবেদকেরা প্রজাবর্গ কি করিতেছে ইহার সংবাদ আমাকে সর্ব্বদা দিবে। প্রজারা কি মানস করে ইহা আমি সর্ব্বদা শুনিতে চাই। দণ্ডই হউক বা পুরস্কারই হউক যাহা আমি আদেশ করিব তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার ভার প্রতিবেদকদিগের হস্তে দিলাম। প্রতিবাসীরা যেন সকল সময় এবং সকল স্থানে আমাকে সংবাদ দেয়। ইহা আমার আজ্ঞা। আমি যে অর্থ বিতরণ করি তাহা পৃথিবীর উপকারার্থ এবং সেই উপকারের জন্য আমি সদা তৎপর। যে প্রজাবর্গকে আমি শাসন করি তাহাদিগকে আমি ইহলোকে সুখ দান করিব এবং পরলোকে তাহারা যাহাতে স্বর্গ পায় তাহা করিব। এই উদ্দেশে আদেশটি লিখিত হইল। ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হউক এবং আমার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রেরা আমার পর যেন অধিকতর পরিশ্রম সহকারে মানবজাতির হিতসাধনে তৎপর থাকে।

অষ্টম আদেশ।

পুরাকালে নৃপতিদিগের আমোদ কেবল পাশক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতিতে ছিল। কিন্তু দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী তাঁহার রাজ্যাভিষেকের এই দশম বৎসরে, জ্ঞানিগণের আনন্দবর্দ্ধনহেতু একটি নূতন ধর্ম্মোৎসবের সৃষ্টি করিয়াছেন। সে উৎসবটি কি? ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা, দান করা, বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধেয় লোকদিগের সঙ্গে দেখা

করা, প্রচুর স্বর্ণ বিতরণ করা, এই জগৎ এবং জগতবাসিদিগের বিষয় সদা চিন্তা করা, ধর্ম্মের অনুজ্ঞা সকল পালন করা, এবং ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা। এই সকল উপায় দ্বারা তিনি আমোদ প্রমোদ করেন এবং পরলোকেও এই সকল অমিশ্রিত আমোদ দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর থাকিবে।

দ্বাদশ আদেশ।

দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী সকলধর্ম্মকে আদর করেন। পরিব্রাজক হউন, বা গৃহস্থ হউন, ভিক্ষা দিয়া বা অন্যান্য উপায়ের দ্বারা তিনি সকলকে সম্মান করেন। কিন্তু দেবানাম প্রিয় যাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় ইহা যেমন ভাল বাসেন, ততটা ভিক্ষা দান কিম্বা অন্য প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করাকে ভাল বাসেন না। তিনি যে সকলপ্রকার ধর্ম্মকেই উৎসাহ দেন তাহার মূলে একটি কারণ আছে। সে কারণটি এই যে সকলে আপনাপন ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিবে, কিন্তু কখন অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করিবে না। এমন অবস্থা ঘটে যখন অন্যদিগের ধর্ম্মকে আদর করা উচিত। এইরূপে আর্য্যধর্ম্মকে আদর করিলে আপনার ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইবে এবং আর্য্যধর্ম্মেরও উন্নতি হইবে। যে অন্য প্রকার আচরণ করে সে আপনার ধর্ম্মকে ক্ষীণ করে এবং অন্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। যে লোক আপনার ধর্ম্মকে আদর করে এবং অন্য ধর্ম্মকে নিন্দা করে, যে বলে যে "আমাদিগের ধর্ম্মই উজ্জ্বল হউক," সে নিজ ধর্ম্মকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সেই জন্যই বলিতেছি যে সদ্ভাব সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম পদার্থ। লোকেরা পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মকথা শ্রবণ করুক। যে হেতু দেবানামপ্রিয়ের এই ইচ্ছা। সকল ধর্ম্মের বিশ্বাসীরা জ্ঞানে এবং ধর্ম্মে উন্নত হউক, এবং সকলে এই বলুক যে দেবানাম প্রিয় ধর্ম্মের সার পদার্থকে যেমন ভাল বাসেন ততটা ভিক্ষা দান কিম্বা সমাদর চিহ্নকে ভাল বাসেন না। ইহাই ধর্ম্মের সার কথা। সেই জন্য ধর্ম্ম প্রচারার্থ তিনি ধর্ম্ম মহামাত্রা সকল নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা সদা প্রজাদিগের নীতির উপর চক্ষু রাখিবেন, স্ত্রীলোকদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যত গোপনীয় স্থান আছে সে সকলই অনুসন্ধান করিবেন। এই সকল মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে সকল ধর্ম্মই শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবে এবং সদ্ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিবে।

ত্রয়োদশ আদেশ।

এই আদেশটির কথাগুলি স্থানে স্থানে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশটি যথাস্থানে আছে। তাহার অনুবাদ এই—"গ্রীকরাজ আণ্টিয়োকাসের রাজ্যে এবং তুরময়, আণ্টিকিনি, মক এবং আলিকসন্দর, এই চারিজন রাজার রাজ্যে এবং অন্যান্য স্থানে দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মের অনুজ্ঞা সকল, যেখানে প্রচারিত হইতেছে, সেইখানেই লোকদিগকে ধর্ম্মভুক্ত করিতেছে। দেশ বিজয় বহু প্রকারের হইতে পারে। কিন্তু যে জয় সুখদায়ক ভাবমূলক আনন্দ আনিয়া দেয়, সেই জয়ই আনন্দে পরিণত হয়। ধর্ম্মের জয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দপ্রদ। তাহা সুখের জয়—তাহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে না, যে হেতু তাহার মূলে ধর্ম্ম আছে এবং ধর্ম্ম থাকিলেই সুখ হইবে। ঐহিক এবং পারত্রিক সকল পদার্থে এই প্রকার জয়ই বাঞ্ছনীয়।

১৪টি আদেশের মধ্যে ৯টির অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হইল। এই কয়েকটি পাঠ করিয়া পাঠকেরা বুঝিবেন অশোক কিরূপ উদারচেতা ও মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন।"

আমরা কেবল পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বুঝাইলাম ঐতিহাসিক জ্ঞানের মধ্য দিয়া অশোকচরিত কিরূপ আনন্দময় মহৎভাবে হৃদয় পূর্ণ করে। পাঠক এখন নিজে পুস্তক খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার রসাস্বাদন করুন।

নূরজাহান।

চারিদিকে মরুময় প্রান্তর! উপরে অনন্ত-নীলিমাময় দিগন্তব্যাপী আকাশমণ্ডল, আর নীচে সুদূরপ্রসারিত বালুকারাশিপরিপূর্ণ জনমানবপরিশূন্য মরুভূমি। সন্ধ্যার অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া একদিন দুইটী স্ত্রীপুরুষ জঠর-জ্বালার প্রচণ্ডতাড়নে মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে এই বালুকাসাগর পার হইয়া গিয়াছিল। সুদূর তাতার দেশ হইতে এই সুবিস্তৃত মরুময় প্রান্তর পার হইয়া তাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য রত্নপ্রসূ ভারতভূমির পবিত্রক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কে জানিত যে এই অনাহারপীড়িত, পথপরিত্যক্ত, চীরবাসভূষিত, বুভুক্ষু, নিরাশ্রয় দম্পতির সহিত সেই মহাবিশাল ঐশ্বর্য্যময় মণিমুক্তাখচিত, ঔজ্জ্বল্যবিভূষিত মোগল সিংহাসনের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিবে? বিধাতার দুশ্ছেদ্য নিয়ম—নিয়তির অখণ্ডনীয় বিধান—তাহাদের সেই দগ্ধ অদৃষ্টের সহিত ভারতের মোগল সিংহাসনের যে অভেদ্য সম্বন্ধ করিয়াছিল তাহাতে ভারত ইতিহাসের একটী অধ্যায় বিশেষরূপ গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

পাঠক! এই মরুবাহী পান্থ দুইটীকে একবার চিনিবার চেষ্টা করিবেন কি? ইহাদের দুঃখময় জীবনের সুখময় পরিবর্ত্তন ঘটনা একবার ভাবিয়া দেখিবেন কি? স্বামী খাজা আইয়াস্ তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে লইয়া এই মরুময় প্রান্তর পার হইয়া জঠরজ্বালায় দেশ ছাড়িয়া হিন্দুস্থানে স্বীয় অদৃষ্ট পরীক্ষার্থে চলিয়াছেন।

আমরা উপন্যাস আরম্ভ করি নাই। ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাই বলিতে বসিয়াছি। যখন জাহাঙ্গীর শাহ হিন্দুস্থানের বহুমূল্য সিংহাসনে বসিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে ছিলেন তাহার কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল।

আইয়াস জাতিতে পারসীক। এক সময় তাহার অবস্থা ভাল ছিল, এক সময়ে তাহার অদৃষ্ট সুখের উজ্জ্বল জ্যোতিতে প্রতিভাত হইয়াছিল, এক সময়ে বংশগৌরবের শ্রেষ্ঠসম্মানে সে সমাজে সম্মানিত হইয়াছিল। কিন্তু কালের হস্ত—যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সেই সময়ে—তাহাকে দারিদ্র্যের কঠোর নিপীড়নে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছিল।

খাজা আইয়াস সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন কিন্তু বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় এক দরিদ্র রমণীকে। এই রমণীর—স্বামীকে দিবার আর কিছুই ছিল না, ছিল কেবল মাত্র তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি, আর বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম। দুঃখের কঠোর পীড়নের মধ্যেও স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের মুখ দেখিয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন।

কিন্তু এরূপ করিয়া আর কতদিন চলিবে! গৃহের যাহা কিছু জিনিসপত্র ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া দিন কতক উদরান্নের সংস্থান হইল। কোন দিন বা অর্দ্ধেক আহার হয়—

কোন দিন বা সম্পূর্ণই অনাহারে যায়। খাজা আইয়াস্ বড়ই মর্ম্ম পীড়িত হইয়া তাঁহার গৃহমধ্যস্থ সামান্য তৈজসাদি বিক্রয় করিয়া, স্ত্রীকে লইয়া রাত্রির অন্ধকারে, অশ্রুপূর্ণনেত্রে জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার পথ চলিবার একমাত্র সম্বল—একটী রুগ্ন অশ্ব। মুদ্রাও যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গে রহিল। অন্তঃস্বত্বা পত্নীকে লইয়া স্বামী বিষণ্নমনে সেই জনশূন্য মরুময় প্রান্তর অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীকে অশ্বের উপর তুলিয়া দিয়া খাজা নিজে পদব্রজে চলিলেন। অন্তঃস্বত্বা স্ত্রীলোক—কতক্ষণ পথশ্রান্তি সহ্য করিবে? মাঝে মাঝে যে সমস্ত ক্ষুদ্র গ্রাম পাওয়া যাইতে লাগিল সেই থানে আইয়াস দুই এক দিন রহিলেন। তাঁহার সামান্য অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্র থলিয়া এইরূপে পথখরচ যোগাইতে যোগাইতে শূন্য হইয়া পড়িল।

মরুভূমিতে অনেক ব্যবসায়ী গমনাগমন করে। অর্থ শেষ হইয়া যাওয়ার পর খাজা সাহেব ঘৃণা ও লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া সেই অন্তর্ব্বত্নী স্ত্রীর ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য ভিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভিক্ষাও আর মিলে না—যখন মরুভূমে আর লোক দেখা যায় না তখন ভিক্ষা দিবে কে? অগত্যা দুঃখক্লিষ্ট সেই দম্পতি তিন দিন উপবাস করিয়া কাল কাটাইলেন। পরিশেষে তাঁহারা এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন যেখানে আহার প্রাপ্তির কোন উপায় নাই। সূর্য্যের আতপ ও মরুভূমির নিদারুণ ঝটিকার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় নাই—মরুভূমিচারী হিংস্র জন্তুদিগের ও কালসর্প প্রভৃতির হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইবার কোন অবলম্বন নাই।

সংসারে বিপদ কি কখন একাকী আসে? বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম লঙ্ঘন করে কে? খাজা সাহেব আর এক অভাবনীয় বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। সেই ভয়ানক মরুমধ্যে জনমনুষ্য কেহই নাই। কেই বা এই ভীষণ সময়ে তাঁহাদের সহায়তা করে? আইয়াসপত্নী স্বামীকে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সে তিরস্কারে সেই ব্যথিত স্বামীহৃদয় আরও ব্যথিত হইল। এই ভীষণ দুরাবস্থার সময়ে আইয়াসপত্নী এক কন্যা প্রসব করিলেন।

সদ্যঃপ্রসূত কন্যার মুখ দেখিয়া প্রসূতি যদিও সমস্ত কষ্ট ভুলিলেন কিন্তু কি করিয়া এই অসীম মরুভূমে সেই অভাগিনী কন্যার জীবন রক্ষা করিবেন—এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আরও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। যদি কোন পথিক এই পথে যায় এই আশায় সেই হতভাগ্য দম্পতি তখনও বুক বাঁধিয়া ছিলেন, কিন্তু কেহই সেই ভীষণ পথে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া দেখা দিল না। সূর্য্য অস্তাচল শিখরাবলম্বী হইলেন, সন্ধ্যাসুন্দরী দুই একটী ফুটন্ত তারকার সহিত দেখা দিয়া তাহাদের মনে বিপদের ছায়া আনিয়া দিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন রাত্রে তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ঘটিতে পারে। যদিও বা তাহাদের ক্ষুধামুখ হইতে বাঁচিতে পারেন তথাপি পর দিন অনাহারে তাঁহাদের মরিতেই হইবে।

এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে বিপদ অধিক হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া সেই দুর্ভাগ্য দম্পতি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খাজা নিজেও আর চলিতে পারেন না, তাঁহার স্ত্রী ও অশ্বারোহণে অশক্ত—সেই সদ্যপ্রসূত শিশুকে বহন করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। এই সময়ে তাঁহাদের মনে "সন্তান স্নেহ" ও "ক্ষেত্রোচিত কর্ম্ম" উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বাধিল। শেষোক্তটীরই জয়লাভ হইল। পিতা পাষাণে বুক বাঁধিয়া—দয়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া সেই শিশুকন্যাকে পত্রাচ্ছাদিত করিয়া পথপ্রান্তে শোয়াইয়া দিলেন। আর তাহার হতভাগিনী জননী নীরব ক্রন্দনের মধ্যে শোকে মুহ্যমানা হইয়া স্বামীর অনুসারিণী হইলেন।

মাতার হৃদয় কতক্ষণ প্রবোধ মানিয়া থাকিবে? যতক্ষণ কন্যাকে দেখা যায় ততক্ষণ তিনি দেখিতে লাগিলেন। যখন তাহা নয়নপথ বহির্ভূত হইল, তখন সেই হতভাগিনী জনয়িত্রী অশ্ব হইতে ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। খোজা সাহেব আর সহিতে পারিলেন না। তিনি স্নেহপ্রবৃত্তির সহিত অনেক যুঝিতেছিলেন, এখন আর না পারিয়া কন্যাকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন। সেই স্থানে গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। একটী কৃষ্ণসর্প সেই পর্ণাচ্ছাদিত বালিকার উপর ফণা ধরিয়াছিল, যেন সে ক্ষুদ্র বালিকাকে গ্রাস করিতে যাইতেছিল। আইয়াসের চীৎকারে সর্পটী দূরে এক বৃক্ষ কোটরে প্রবিষ্ট হইল। পিতা কন্যাকে নিরাপদ অবস্থায় দেখিয়া কোলে লইয়া আহ্লাদিত মনে পত্নীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। *

আইয়াস, ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীর নিকট এই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার গল্প করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাদের শুভাদৃষ্টবশতঃ একদল পান্থ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঈশ্বরের কি অপূর্ব্ব মহিমা! এই প্রকার অসম্ভাবিত উপায়ে তিনি তিনটী প্রাণীর জীবন রক্ষা করিলেন। সেই করুণাময় ঈশ্বরের অদ্ভুত বিধানে অতর্কিত উপায়ে ধ্বংস মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সেই দম্পতি নিরাপদে লাহোরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বাদসাহশ্রেষ্ঠ উদার-হৃদয় আকবর সাহ তখন লাহোরে অবস্থান করিতেছিলেন। লাহোর তাঁহার অন্যতম রাজধানী ও গ্রীষ্মনিবাস। আসফ্ খাঁ নামক এক বিশ্বস্ত সচিব এই সময়ে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। আসফ্ খাঁর সহিত আইয়াসের

---

* যাঁহারা উল্লিখিত ঘটনায় অবিশ্বাস করিতে চাহেন তাঁহাদের আমরা এই পর্য্যন্ত বলিব যে ইহা আমাদের স্বকপোলকল্পিত বৃত্তান্ত নহে। ইতিহাসে যাহা পাইয়াছি তাহাই লিখিতেছি। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেখিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সুবিখ্যাত Lt. Col. Alexander Dow সাহেবের হিন্দুস্থানের ইতিহাস (১৭৯২ খৃঃ অব্দের সংস্করণ) পাঠ করিয়া দেখিবেন।

বন্ধুত্ব ছিল, সেই বন্ধুত্ব বলে তিনি তাঁহার অধীনে অতিশীঘ্রই একটী কর্ম্মলাভ করিলেন। ক্রমশঃ আইয়াসের কার্য্যদক্ষতার কথা বাদসাহের কানে উঠিল। তিনি তাহাকে "এক-হাজারী মনসবদারী" প্রদান করিলেন।

দুর্ভাগ্য, সৌভাগ্য চন্দ্রমার ভীষণ রাহুগ্রহ। দুর্ভাগ্য যখন একবার অবসান হয় তখন সৌভাগ্যচন্দ্রমা পূর্ণতেজে পুনরায় কিরণ বিকাশ করে। খাজা সাহেবের তাহাই হইল। তাঁহার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাম ও প্রতিষ্ঠা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া উঠিল। তিনি তখন আমীর শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন—সুতরাং কন্যার নাম আমীরোচিত সম্মানের সহিত "মেহের-উল্-নিসা" বা "স্ত্রীলোকের মধ্যে তপন স্বরূপ" রাখিলেন। মেহেরের শরীরে আর রূপ ধরে না। সৌন্দর্য্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে আরও গুণবতী হইয়া উঠিল। নৃত্য, গীত, চিত্র, পদ্য প্রভৃতি কলাবিদ্যাতেও সে স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ প্রতিভা বলে সুনিপুণ হইয়া উঠিল। তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতিগুলি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে জাগিয়া উঠিল। যৌবনোদ্গমের পূর্ব্বে তাহার প্রকৃতি, উগ্রমধুরমিশ্রিত, তাহার কথা বার্ত্তা সরস, ও ঈষৎবিদ্রূপপূর্ণ এবং মনের একাগ্রতা অতি তেজোময়ী হইয়া দাঁড়াইল।

মেহেরউন্নিসার যশোরাশি ক্রমে দিল্লী ও আগরার সম্ভ্রান্ত মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িল। খাজা আইয়াস একদিন জন কতক বাছা বাছা ওমরাহদের নিজগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। যুবরাজ সেলিমও সেই নিমন্ত্রণসভায় আহূত হইয়াছিলেন। উপস্থিত অভ্যাগতদের মধ্যে আহারের শেষে তাতার দেশীয় প্রথামত মদিরা আনা হইল। তাতার দেশের প্রথা এই—গৃহের মহিলাগণ মদিরাপান সময়ে উপস্থিত থাকিয়া মদিরা ঢালিয়া দিবেন। এই ক্ষেত্রে মেহেরউন্নিসা সেই দিন সর্ব্বপ্রথম যুবরাজ সেলিমের সমক্ষে নীত হইলেন।

ইহার পূর্ব্বে একদিন আগরা দুর্গের মর্ম্মরময় বাতায়ন সান্নিধ্যে বসিয়া যমুনার শীকর সম্পৃক্ত সমীর সেবন করিতে করিতে যুবরাজ নদীবক্ষে আটখানি দাঁড় বিশিষ্ট এক ময়ূর-পঙ্খী দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি সহসা সেই ক্ষুদ্র তরণীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি সেই তরণী অপেক্ষা তন্মধ্যস্থ তরুণীর প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। যদিও তিনি আকবরের সন্তান তথাপি পিতার নৈতিক বলের একাংশও তিনি পান নাই। যুবরাজ প্রবৃত্তি দমন করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ দুইখানি নৌকা জলে নামাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। সেই দুই নৌকা পূর্ব্ববর্ত্তীখানির পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে সংবাদ আনিয়া দিল—"নৌকার সওয়ারী খাজা আইয়াসের কন্যা মেহের উন্নিসা।" সেই দূরদৃষ্ট সৌন্দর্য্যে যুবরাজ সেলিমের হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

ইহার পর আবার ঘটনাবশে সেই খাজা আইয়াসের বাটীতেই তাঁহার নিমন্ত্রণ। আবার তাহার উপর চারিচক্ষে মিলন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী মেহেরউন্নিসা সেলিমের মুখে তাহার মনের ভাব দেখিতে পাইলেন। মেহেরউন্নিসা সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন—সেলিম সেই

সঙ্গীতের সুরে ডুবিলেন। গান থামিল, তথাপি সেই সুমিষ্ট স্বর তাঁহার কাণের কাছে নাচিতে লাগিল। মেহের নৃত্য আরম্ভ করিলেন, সেলিম সেই তাললয়বিশুদ্ধ; ভূষণ-শিঞ্জনসমন্বিত নৃত্যে রূপের মধুরিমাময় তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিতে লাগিলেন। এক এক সময় তিনি এতদূর উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে আদব কায়দার ভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এতক্ষণ অবগুণ্ঠনের ঈষৎ আবরণ ছিল। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মেহের সেই অবগুণ্ঠন মোচন করিল। সেই ভয়চকিত চক্ষু, সেই বিলাস বিভ্রমময় মদিরাময়ী কটাক্ষ, আর তাহার পাশে সূক্ষ্ম কজ্জল রেখা। সেই সুবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশরাশি, সেই মলয়ানিল প্রফুল্ল বসন্তমল্লিকাবৎ শুভ্রতর মাতোয়ারা সৌন্দর্য্য রাশি দেখিয়া যুবরাজ সেলিম ইহজন্মের মত অতুল রূপসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

যুবরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মেহেরুন্নিসাকে লাভ করিবার জন্য বিশেষ রূপে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সে ব্যগ্রতা সে আকাঙ্ক্ষা দমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। একদিন সাত পাঁচ ভাবিয়া তিনি পিতার সমক্ষে মেহেরকে বিবাহ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। ন্যায়পরায়ণ আকবর পূর্ব্বে জানিয়াছিলেন যে মেহের উন্নিসার সহিত সের আফ্‌গান নামক এক পাঠান যুবকের পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি প্রিয়তম পুত্রকে ঈষৎ তিরস্কারের সহিত এ বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলেন—এবং কৌশলক্রমে সেরকে মেহেরুন্নিসার সহিত বিবাহ দিয়া বাঙ্গালার সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমান বিভাগের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন।

আকবরের পবিত্রদেহ সেকন্দ্রার অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে শায়িত হইল। সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। পিতার ভয়ে যে কাজ তিনি এতদিন সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সেই কার্য্যও তাঁহার পক্ষে এক্ষণে অতি সুগম বলিয়া বোধ হইল। তিনি এখন সমগ্র হিন্দু স্থানের একচ্ছত্রা অধীশ্বর। রাজ্য মধ্যে এমন কেহ নাই যে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিযোগিতা করে। তিনি ইচ্ছা করিলেই শের আফ্‌গানের নিকট হইতে মেহেরুন্নিসাকে কাড়িয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহার উচ্চপদোচিত সম্মান ও লোকলজ্জাই কেবলমাত্র প্রধান অন্তরায় স্বরূপ হইল। বিশেষতঃ সের আফগান উগ্র-প্রকৃতির পাঠান, বীর, সাহসী ও ভদ্রবংশসম্ভূত। পারস্যের তৃতীয় সুফিসাই এস্মাইলের অধীনে কার্য্য করিয়া সের অনেকেরই জানিত হইয়াছেন এমন কি স্বয়ং আকবর সাহ তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন এ প্রকার স্থলে প্রকাশ্য বল-প্রয়োগে সমূহ অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে।

মনে মনে কোন অদ্ভুত কৌশল স্থির করিয়া জাহাঙ্গীর সাহ সেরকে বর্দ্ধমান হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন জাহাঙ্গীর সাহ দিল্লীতে থাকিতেন। রাজধানীতে সের আফ্‌গানকে আনয়ন করিয়া তিনি তাহাকে উপাধিভূষণে ও নানাবিধ সম্মান চিহ্নে ভূষিত করিলেন। সরল প্রকৃতি আফগান বাদসাহের অনুগ্রহের মর্ম্ম বুঝিতে

পারিলেন না। তিনি যদিও মনে মনে মেহেরের প্রতি জাহাঙ্গীরের আসক্তির কথা জানিতেন, তত্রাচ ভাবিয়াছিলেন সময়ের গুণে ও ঘটনার পরিবর্ত্তনে তাহা লয় পাইয়াছে। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি প্রতারিত হইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত করিবার জন্য প্রথমে যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা ব্যর্থ হইল বটে কিন্তু সেই ঘৃণার্হ ও কাপুরুষোচিত কার্য্য হিন্দুস্থানের বাদসাহের পক্ষে কলঙ্ক জনক।

উপায়টী এই—জাহাঙ্গীর একটী শিকারের দিন নির্দ্ধারিত করিলেন। অনেক দিন বাঘ শিকার হয় নাই এই উদ্দেশ্যে নিকটস্থ জঙ্গলে বাঘ অনুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরিত হইল। সংবাদ আসিল—"নিদারবাড়ী" নামক স্থানে এক ভয়ানক বাঘ আসিয়াছে। বাদসাহ সেরকে সঙ্গে লইয়া সেই বাঘ শিকার করিতে চলিলেন।

যে জঙ্গলে বাঘ ছিল, তাতার দেশীয় প্রথানুসারে তাহার চারিদিক ঘিরিয়া ফেলা হইল। চারিদিক হইতে শিকারীরা ক্রমে বনের মধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল। যখন ব্যাঘ্রের গর্জ্জনে সেই গভীর বন আকুলিত হইয়া উঠিল, তখন বাদসাহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার দলের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে একক গিয়া এই বাঘকে যুদ্ধ দ্বারা নিহত করিতে পার?" সকলেই স্থিরভাবে মুখ চাওয়াচায়ি করিতেছে, এমন সময়ে তিনজন ওমরাহ বাদসাহের চরণপ্রান্তবর্ত্তী হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! আমরা তিনজনেই সশস্ত্র হইয়া ব্যাঘ্রের সহিত একে একে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।" সের ভাবিয়াছিলেন, দলের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, এই দুষ্কার্য্যে সাহস করিতে পারে। কিন্তু তিন জনকে এই অসমসাহসিক কার্য্যে ব্রতী দেখিয়া তিনি পূর্ব্বসঞ্চিত গৌরবনাশ ভয়ে ভীত হইয়া বাদসাহকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"জাঁহাপনা জন্তুকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আক্রমণ করা অপৌরুষের কার্য্য। ব্যাঘ্রাদির যেমন হস্তপদ ও সবল মাংসপেশী আছে, মনুষ্যেরও তদ্রূপ।" এ কথায় দুই একজন ওমরাহ বলিয়া উঠিল—"ব্যাঘ্র হিংস্রজন্তু ও একজন বলশালী মনুষ্য অপেক্ষা অনেক বলবান। বিনা অস্ত্রে কখনও তাহার সহিত যুদ্ধ সম্ভবে না।" "সম্ভব কি না আমিই আপনাদের দেখাইব," এই কথা বলিয়া সের আফ্‌গান সদর্পে অসি চর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন।

বাদসাহ মনে মনে সের আফ্‌গানের বিপদ বুঝিয়া আনন্দিত হইলেন বটে, কিন্তু মৌখিক সহৃদয়তা জানাইয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সের কোন ক্রমে কথা শুনিলেন না। অবশেষে মৌখিক অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বাদসাহ সহসা বিরত হইলেন।

সের সবেগে সেই ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইয়া দুই বাহু দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করিলেন। সকলেই স্থিরভাবে—স্তম্ভিতহৃদয়ে—ভয়চকিত নেত্রে—সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সকলেরই মুখে উৎকণ্ঠা, আবেগ ও বিস্ময়। সের আফ্‌গান নিজে রক্তাপ্লুত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন কলেবর হইয়াও সেই ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া স্বীয় পদতলে মর্দ্দিত করিলেন। সকলেই

সেই অদ্ভুত বীরের জয়োচ্চারণ করিয়া উঠিল। অধিকতর রক্তস্রাবে ও সেই ভীষণকায় শার্দ্দূলের ভীষণ আঘাতে সের আফ্‌গান শয্যাশায়ী হইলেন। এই ঘটনায় একদিকে যেমন তাঁহার বীরত্বের গৌরব বাড়িয়া উঠিল, অন্যদিকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া নীচমনা কামুক জাহাঙ্গীর অন্যতর উপায়াবলম্বনে সেরকে নিহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সে উপায়ও সুদূরপরাহত হইল না। সের আফ্‌গান তাঁহার ক্ষত স্থানগুলি আরোগ্য হইবামাত্রই আমখাসে হাজিরা দিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এ পর্য্যন্ত কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহার নির্ভীক হৃদয় তখনও সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। জাহাঙ্গীর আবার তাঁহার নিধনজন্য এক নূতন ফাঁদ পাতিলেন।

মোগল বাদসাহেরা সর্ব্বাপেক্ষা যে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর ভালবাসিতেন ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহাদের হস্তীশালা, সর্ব্বদাই আসাম, ব্রহ্ম ও গুজরাটের শ্রেষ্ঠতম হস্তীসমূহে পরিপূর্ণ থাকিত। দিল্লী ও আগরার প্রকাশ্য জনপূর্ণ রাজপথে উষ্ট্র, অশ্ব ও শকটাদির ন্যায় হস্তীও কখন কখন হস্তীপক দ্বারা চালিত হইত। ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা বড় কম ছিল না। কখন কখন মাতঙ্গরাজ ক্ষেপিয়া উঠিয়া অনেক হতভাগ্য পান্থের যমালয় গমনে সহায়তা করিতেন। এই প্রকার মৃত্যুসংখ্যা এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে লোকে এই দুর্ঘটনার দৃশ্যে একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

জাহাঙ্গীর তাঁহার বিশ্বস্ত মাহুতকে ডাকাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বৃত্ত হস্তী বাছিয়া লইতে বলিলেন। তাহাকে আরও আদেশ দিলেন যে, সে যেন হস্তীকে অঙ্কুশাঘাতে উন্মত্ত করিয়া সুযোগক্রমে বিশেষ কৌশলের সহিত সের আফ্‌গানের উপর চালাইয়া দেয়। সের আফগান যখন পরদিন দরবারে আসিবেন—বা তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন, সেই সময়ই ইহার উপযুক্ত সময়—এরূপ উপদেশ দিতেও সেই নিষ্ঠুর বাদসাহ পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এই প্রকার উপদেশের পরদিন সের সাহেব পালকী চড়িয়া দরবারে চলিয়াছেন। সহসা বাহকেরা পালকী থামাইল—তিনি পালকী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন এক প্রকাণ্ড উন্মত্ত হস্তী মাহুতের অঙ্কুশের নিষেধ না মানিয়াও দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে। বাহকেরা পালকী নামাইয়া প্রাণভয়ে সরিয়া পড়িল। সের খাঁ নিজের আসন্ন বিপদ দেখিয়া ত্বরিতপদে পালকী হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। অঙ্গত্রাণ স্বরূপ একখানি ক্ষুদ্র তরবারি সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। সেই ক্ষুদ্র তরবারির সহায়ে সের আফগান মত্তসিংহের ন্যায় সেই উন্মত্তহস্তীর শুণ্ডদ্বয় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। অত বড় প্রকাণ্ড জানোয়ারটা এক আঘাতেই ভীষণ চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। জাহাঙ্গীর বাতায়নপথে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া এই সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছিলেন, কিন্তু সে বারেও ব্যর্থ মনোরথ হইয়া নিরাশ হৃদয়ে সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

নিরাশার উত্তেজনাতে—অথবা সের আফগানের অমিতপরাক্রম দেখিয়াই হউক

কিম্বা স্বীয় রূপোন্মাদগ্রস্ত অসার হৃদয়ের অসার প্রবৃত্তি দমন করিয়াই হউক বা উপযুক্ত অবসর না পাইয়াই হউক বাদসাহ জাহাঙ্গীর ছয় মাস কাল সের খাঁর নিধন সম্বন্ধে বীত-চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তাহার পর সের আফগান বাঙ্গলায় নিজকার্য্যে প্রত্যাগমন করেন। প্রকাশ্যরূপে না হউক অপ্রকাশ্যে রাস্তা ঘাটে, বা গুপ্ত মজ্‌লিসে লোকে যে সম্রাটের ও সের আফগানের সম্বন্ধে এই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিত ইহাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। কিন্তু সের আফগান রাজধানী হইতে সহসা প্রস্থান করাতে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন।

মোগল বাদসাহেরা স্বভাবতই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ঐশ্বর্য্য, সেনাবল, মণিমুক্তার উজ্জল জ্যোতি তাঁহাদের সেই স্বেচ্ছাচারকে প্রশমিত না করিয়া বরঞ্চ বিশিষ্ট উপায়ে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর আবার সেই অসীম স্বেচ্ছাচারিতার সহায়তা করিবার জন্য তোষামদপ্রিয় আমীর ওমরাহও আসিয়া জুটিল। জাহাঙ্গীরের এই প্রকার চাটুকার অধীনস্থগণের মধ্যে বাঙ্গালার সুবাদার কুতবুদ্দিন একজন। কুতব "মেহের জাহাঙ্গীর" কাহিনী জানিতেন। বাদসাহের মেহেরকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের পরিমাণ ও তাঁহার অগোচর ছিল না। জাহাঙ্গীরের মনস্তুষ্টির জন্য তিনি তাঁহার প্রকাশ্য আজ্ঞা না হউক অন্ততঃ ইচ্ছার আভাস অনুসারে সের আফগানকে নিহত করিবার জন্য চল্লিশ জন হত্যাকারী সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযুক্ত উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সের খাঁ সাহেব, এত দিন বুঝেন নাই বটে কিন্তু এই ঘটনায় তাঁহার জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। তিনি রাস্তা ঘাটে বাহির হওয়া এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রাণভয়ে নহে, সাবধানতার জন্য। তাঁহার নিজের শারীরিক বল ও ক্ষমতার উপর এতদূর বিশ্বাস ছিল যে,একটী বিশ্বস্ত ভৃত্য ব্যতীত আর কোন শরীররক্ষককে তিনি কাছে থাকিতে দিতেন না। অন্যান্য ভৃত্যেরা কাজকর্ম্ম করিয়া তৎকালীন প্রথামত সন্ধ্যার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইত। খুনীরা একথা জানিয়াও দিবারাত্র প্রচ্ছন্নভাবে বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিল। বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের কাছে দক্ষিণ দিকের একটী ঘরে বসিয়া সের খাঁ লেখাপড়ার কাজকর্ম্ম করিতেন। ইহার পর একটী গলি পথ দিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে যাইতে হয়। একদিন বৃদ্ধ দ্বাররক্ষককে কিয়ৎকালের জন্য অনুপস্থিত দেখিয়া তাহারা গুপ্তভাবে পুরীতে প্রবেশ করিল। নিয়মিত সময়ে বাড়ীর সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিয়াছে। সদর দরওয়াজা ইতিপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছে এমন সময়ে সেরকে নিদ্রিত ভাবিয়া জনকয়েক হত্যাকারী তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে একটী ক্ষুদ্র দীপ সুগন্ধ বিতরণ করিয়া জ্বলিতেছে, সেই অল্পোজ্জ্বল আলোচ্ছটায় একেবারে পাঁচ সাতখানি সুতীক্ষ্ণ ছোরা ক্ষণকালের জন্য ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল। সের আফগান নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বসিয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। তাহারা

তাঁহার মুখে ওজস্বিতা, ও বীরত্বের দীপ্ত চিহ্ন সেই ক্ষীণ আলোকছটায় অপরিস্ফুট ভাবে জ্বলিতেছিল দেখিয়াও ছোরা বসাইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে এক বৃদ্ধের হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়া উঠিল। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ভাই সকল! আমরা ত বাদসাহের হুকুম পাইয়াছি, তবে কেন এই নিদ্রিত যুবককে অসহায় অবস্থায় বধ করি? এস! আমরা মানুষের স্থায় ব্যবহার করি।"

সের আফগান ঠিক এই সময়ে ঘটনাবশে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। বৃদ্ধ দস্যুর শেষের কথাটী তাঁহার কাণে বাজিয়াছিল। সের প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে পারিয়া সবেগে শয্যাত্যাগ করিয়া একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি তুলিয়া লইলেন, এবং গৃহের এক কোণে গিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহভিত্তি দুই পার্শ্বে ব্যূহ স্বরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি ধরিয়া তিনি একেবারে ৮।১০ জনকে ভূপতিত করিলেন। তাঁহাদের শোণিতোচ্ছ্বাসে সেই হর্ম্মাতল ও গৃহভিত্তি রঞ্জিত হইয়া উঠিল। প্রাণের দায়ে যে ব্যক্তি আত্মরক্ষা করে, এবং সেই ব্যক্তি যদি বলশালী বীরপুরুষ হয়, তাহা হইলে সচরাচর যে পরিণাম হয় এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। যাহারা সামান্যরূপে আহত হইয়াছে সের আফ্গানের তরবারি মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া তাহারা যথেচ্ছা পলায়ন করিল। কেবল পলাইল না সেই বৃদ্ধ হত্যাকারী!! সের তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং বহুমূল্য পুরস্কার দিয়া বিদায় দিবার সময়ে বলিয়া দিলেন "ভাই! তোমার উদারতার জন্য আমার জীবন রক্ষা হইল। তুমি যদি উচ্চৈঃস্বরে ঐ প্রকার চীৎকার না করিতে তাহা হইলে হয়ত আমাকে ঘোরতর ষড়যন্ত্রের মুখে আত্মবলি দিতে হইত। তুমি এই সমস্ত বীভৎস ঘটনা সাধারণে প্রচার করিয়া দিও।"

প্রচার করিতে হইল না—সত্য ঘটনা কবে কোথায় অপ্রকাশিত থাকে? চারিদিকে এই নূতনবিধ বীরত্বকাহিনী ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা শুনিল, তাহারা ঘৃণায় কাণে আঙ্গুল দিল, জাহাঙ্গীরের দুষ্প্রবৃত্তির নিন্দা করিতে লাগিল, আর শতমুখে সের আফগানের বীরত্বকাহিনী প্রচার করিতে লাগিল। সের সাহেব রাস্তায় বাহির হইলে সেই অদ্ভুত বীরকে দেখিবার জন্য লোক চারিদিক হইতে জনতা আরম্ভ করিল। তিনি লোকের সহানুভূতিতে মনে মনে সন্তোষ লাভ করিলেন এবং অন্ধকারময় পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মেহেরউন্নিসাকে লইয়া নির্জ্জনে ও নির্ব্বিবাদে জীবন যাপন করিবার জন্য তাণ্ডা হইতে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন।

তাণ্ডা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। সুবাদার কুতবউদ্দিন তখন বাদসাহের তরফে বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা। সেরখাঁকে ইহলোক হইতে অপসৃত করার ভার গ্রহণ করাতেই তাঁহার এই পদোন্নতি। সের আফগানকে হত্যা করিতে অপারক হইয়া তিনি মনে মনে অন্য উপায় কল্পনা করিলেন। তাণ্ডা ছাড়িয়া তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রদেশগুলি দেখিতে দলবল লইয়া বাহির হইলেন।

যাত্রার উদ্দেশ্যটী সম্পূর্ণ কাল্পনিক—এবং এই ছলনার আশ্রয়ে তিনি সর্ব্বপ্রথমে বর্দ্ধমানে আসিয়া দেখা দিলেন। সের আফগানের জীবন যে তাঁহার লক্ষ্যবস্তু, একথাও তিনি বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে ইঙ্গিতে জানাইলেন। সের সাহেব কুতবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী, কুতবের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা থাকিলেও রাজকর্ম্মচারী বলিয়া তিনি ভদ্রতার অনুরোধে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। পরস্পরে আদব কায়দামাফিক সাদর সম্ভাষণাদি হইল। কুতব অশ্বারোহণে ছিলেন, বর্দ্ধমান সহরে প্রবেশ করিতে হইলে একটু জাঁকজমক চাই—এইরূপ ভাণ করিয়া তিনি একজন ভৃত্যকে তাঁহার হস্তী আনিতে আদেশ করিলেন। সের আফগান তখনও বিশ্বস্ত চিত্তে দণ্ডায়মান, কিন্তু কুতবের পার্শ্বচর কোন সৈনিকের হস্তনিক্ষিপ্ত বর্ষার আঘাতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি ভাবিলেন প্রভুর সহায়তা ও পূর্ব্বনিয়োগ ব্যতিরেকে সামান্য ভৃত্যের এতদূর সাহস কখনও সম্ভব নয়। তিনি যে বাগুরা বেষ্টিত হইয়াছেন, তখন নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্র আঘাতে সেই বর্ষাধারী সেইখানে বসিয়া পড়িল। সের আত্মরক্ষার জন্য সহসা স্বীয় অশ্বকে বেগে হস্তীর দিকে চালিত করিলেন। দৃঢ়হস্তে তরবারি ধরিয়া হাওদা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিলেন, এবং দ্বিতীয় আঘাতে কুতবকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। সুবাদারের শীতল শোণিতে জাহাঙ্গীরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

প্রভুকে নিহত হইতে দেখিয়া কুতবের অনুযায়ী ওমরাহগণ সেরকে আক্রমণ করিল। প্রথম আক্রমণকারীর নাম "আবা খাঁ"। বোধ হয় খাঁ সাহেব কাশ্মীর হইতে সুদূর বাঙ্গলায় মরিবার জন্য আসিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনিই প্রতিযোগিতা করিলেন, সের খাঁর সুতীক্ষ্ণ তরবারি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বক্ষে আমূল প্রোথিত হইল। আর আর সকলে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। অব্যবহিত পরেই তাহারা সকলে মিলিয়া এক ক্ষুদ্র ব্যূহরচনা করিয়া সের আফগানকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল। কেহবা বর্ষা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহবা তরবারি চালাইল, কেহবা বন্দুক ছুঁড়িল। সের সাহেব দুই হস্তে সেই বিপক্ষ সেনা মথিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি একা আর কতক্ষণ সহ্য করিবেন? সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন "ভাই! এস বীরের ন্যায় একে একে যুদ্ধ কর।" কেই বা সে কথা শুনে? সের খাঁ অত্যধিক রক্তস্রাবে ও চারিদিক হইতে ভীষণ আঘাতে বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অশ্বটীও এই সময়ে গুলিবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন সের আফগান সেই স্থানে দাঁড়াইয়া স্থির ও নির্ব্বাক্‌ভাবে মক্কার দিকে মুখ ফিরাইলেন, পথিমধ্য হইতে ধূলিরাশি তুলিয়া তাহাই মক্কার পবিত্র মৃত্তিকা মনে করিয়া মস্তকে ছড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে ছয়টী গুলি ছয় দিক হইতে আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। আর সেই মহাবীর উন্মূলিত মহীরুহের ন্যায় ভূপতিত হইয়া ইহলোকের জ্বালা যন্ত্রণা, অত্যাচার, অবিচার, হিংসা দ্বেষ ও কামপ্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচার হস্ত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিলেন।

সেই কাপুরুষেরা যতক্ষণ না সের খাঁর নিশ্চল মৃত দেহ দেখিয়াছিল ততক্ষণ অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই।

রাজা মরিলে রাজা হয়, কুতব মরিলে নূতন সুবাদার হইল। সে সর্ব্বাগ্রে মেহেরউন্নিসাকে বন্দিনী করিয়া দিল্লীতে পাঠাইল।

এক্ষণে কথা হইতেছে মেহেরউন্নিসাকে লইয়া; এ ক্ষেত্রে দুইটী সন্দেহ আমাদের মনে যুগপৎ উদিত হয়। একটী কথা এই—মেহের সের খাঁর প্রতি যথার্থ প্রণয়শালিনী ছিলেন কি না! দ্বিতীয়তঃ—জাহাঙ্গীরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার সময় হইতে তাঁহার মনের ভাব জানিয়া সম্রাটের প্রতি মনে মনে অনুরাগিনী হইয়াছিলেন কি না? সের আফগান তাঁহার পত্নীর একাগ্রতায় কখনও সন্দেহ করেন নাই। তিনি মেহেরকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন "প্রেয়সি! কেন তুমি আমার কাছে থাকিয়া এত কষ্ট পাও, হিন্দুস্থানের সিংহাসন তোমার সুকোমল শরীরভার বহন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, আমার অনুরোধ তুমি জাহাঙ্গীরের অঙ্কলক্ষ্মী হও।" পাঠক! মনে মনে সের খাঁকে অপ্রণয়ী মনে করিবেন কিন্তু আপনারা যাহাই ভাবুন মেহের এই কঠোর প্রশ্নের কোন প্রকার উত্তর না দিয়া দুঃখিত চিত্তে কয়েক দিন ধরিয়া নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই পর্য্যন্ত সের খাঁ এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু বলিতেন না।

সেলিমের সহিত প্রথম সাক্ষাতে মেহেরউন্নিসার মনে একটু সামান্য বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাই তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে অতুলনীয় পতিভক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অল্পে অল্পে বলসঞ্চার করিয়াছিল। যিনি যাহাই বলুন না কেন—সেইটুকু 'অনুরাগ' তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। সেই অনুরাগের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে আর একটী ছায়াময় পদার্থ ছিল—সেটী "উচ্চ আশা"—"আগ্রার মরকতময় সিংহাসন।" দরিদ্রতার মধ্যে জন্মিয়া জীবনের শৈশবভাগ দুঃখ কষ্ট, ও অভাবের মধ্যে যাপন করিয়া কৈশোরে দিল্লী আগ্রার ঐশ্বর্য্যময় ভাবের মধ্যে যাহার জীবন ডুবিয়া গিয়াছিল সে যে রমণী হইয়া সহজে সেই স্বভাবজাত প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিবে ইহা আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না।

হিন্দুর ঘরে জন্মিলে—হয়ত মেহেরউন্নিসা স্বামীর নিধন সংবাদ শ্রবণে আত্মবিনাশ করিতেন। কোন্ পতিপরায়না প্রেমময়ী ভার্য্যা, পতিহন্তারকের হৃদয়ের অংশভাগিনী হইতে চাহে! মেহের সম্মানের সহিত বন্দিনী স্বরূপে দিল্লীতে বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইলেন। এত রক্তপাত, এত নির্য্যাতন, এত অন্যায়, এত অত্যাচার, উচ্চক্ষমতার রাজক্ষমতার ঐত অপব্যবহারের এই খানেই যবনিকাপতন হইল।

মৃতভর্ত্তিকা মেহেরউন্নিসা—দিল্লীতে আসিয়া পৌছিলেন। "রোখিয়া সুলতানা বেগম" তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলেন। হতভাগিনী মেহের উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়া পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাবগতিক দেখিয়া সেই পতিবিরহিতার পতিপ্রেম

শতগুণে উছলিয়া উঠিল। তাহার এরূপ বিরাগের কারণ এই যে জাহাঙ্গীর এত ভয়ানক ব্যাপারের অনুষ্ঠানে তাহাকে লাভ করিয়া একবারও তাহাকে দেখিতে আসিলেন না।

পক্ষিনী পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে ব্যাধ যেমন স্থির চিত্তে অন্য কক্ষে মনোনিবেশ করে, জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে করতলগত করিয়া বোধ হয় তদ্রূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন—জাহাঙ্গীর ঘৃণায়, অনুতাপে, অনুশোচনার কঠোর পীড়নে এ সময়ে মেহের সম্বন্ধে এক প্রকার বীতানুরাগ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন কুতব উদ্দিন (বাঙ্গালার সুবাদার) জাহাঙ্গীরের অতি প্রিয় ছিলেন, সেই প্রিয় কর্ম্মচারীর মৃত্যুর জন্য অযথা কারণে মেহেরকে দায়ী করিয়া ক্রোধবশে তাহাকে এইরূপে দণ্ডিত করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে অশ্রদ্ধা, অবমাননা, মনঃপীড়ার দ্বারা মেহের তাঁহার প্রণয়ীর নিকট অভ্যর্থনা লাভ করিলেন! তাঁহার সেই দুরবস্থার সময়ে বেগম সাহেবের স্নেহপূর্ণ ব্যবহারই এক মাত্র তাঁহার দুঃখময় জীবনে কিছু কিছু শান্তি ও প্রবোধ আনিয়া দিত। বাদসাহের বিশাল পুরী মধ্যে সামান্য পরিচারিকা তাহার জীবনযাত্রার জন্য যেরূপ অর্থ সাহায্য পায়, মেহেরের অদৃষ্টে জাহাঙ্গীরের আদেশ ক্রমে তাহাও ঘটিল না। পাঠক! শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন এই সময়ে মেহেরউন্নিসা (যাহাকে লাভ করিবার জন্য জাহাঙ্গীর এত কাণ্ড করিলেন) প্রতিদিন চৌদ্দ আনা (?) খোরাকী স্বরূপ পাইতে লাগিলেন।

আয়াস-কন্যা উগ্রপ্রকৃতির রমণী ছিলেন—তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কোমলতার সহিত বিধাতা তাঁহার অন্তরে উগ্রভাব ও কঠোরতা মিশাইয়া দিয়াছিলেন। নিরাশ হইয়া অবমানিত হইয়া মেহের দিনকতক আহার নিদ্রা বন্ধ করিলেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? কে তার খপর লয়? মেহের খাইল কি না খাইল কে দেখিতে আসে? মেহের নিরুপায় হইয়া তখন অন্য উপায়ে জাহাঙ্গীরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

বেগম সাহেব যখন পুত্রকে, মেহেরের সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিতেন—তখন জাহাঙ্গীর সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেন। মেহের এ সমস্ত কথা না শুনিতেন এরূপ নহে। তিনি তখন জাহাঙ্গীরের কথা ভুলিয়া অন্য কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন।

মেহেরউন্নিসা বাল্যকাল হইতে নানাবিধ শিল্পশিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ক্রীতদাসীর দ্বারায় বাজার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনাইয়া তথায় নানাবিধ শিল্পকার্য্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। দিল্লী ও আগরা সহরের মধ্যে বড় বড় ওমরাহের অন্তঃপুরে মেহেরের প্রস্তুত, ওড়না, পায়জামা, অঙ্গরাখা, পেশোয়াজ প্রভৃতির সম্মান বাড়িয়া উঠিল। এই উপায়ে সেই বুদ্ধিমতী রমণী ক্রমে ক্রমে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া তথায় নিজ দাস দাসীর পরিচ্ছদের সৌষ্ঠব্য ও পারিপাট্য বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। নিজগৃহ

উত্তমরূপে সজ্জিত করিলেন। কিন্তু নিজের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন যত্নই করিলেন না। গৃহমধ্যস্থ মুকুরে মেহেরের সেই বিষণ্ণ মুখের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইত না—আগুলফ্ লম্বিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি কখনও বেণীসম্বদ্ধ হইত না—সেই গোলাপীরাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর দুইটী তাম্বুলের রাগ গ্রহণ করিত না। মেহের দিবারাত্র নিজের কাজে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত থাকিতেন। একমাত্র শুভ্রবসন তাঁহার সেই ক্ষীণ শরীরের মলিন জ্যোতি ঢাকিয়া রাখিত।

এই প্রকারে চারি বৎসর কাটিল। জাহাঙ্গীর মেহেরের কীর্ত্তিসমূহ একে একে সমস্তই জানিতে পারিলেন। তাঁহার হৃদয়ে সেই ধূমায়িত রূপসম্ভোগাগ্নি আবার তেজ সঞ্চয় করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হারামের সকল স্থানেই কেবল মেহেরের কথা—তাঁহার শিল্পের প্রশংসা—তাঁহার বাসগৃহের সজ্জার প্রশংসা। জাহাঙ্গীর কৌতুহলপরবশ হইয়া একদিন স্বচক্ষে এই সমস্ত দেখিতে আসিলেন।

একদিন গোপনে কাহাকে কিছু না বলিয়া বাদসাহ সহসা মেহেরের গৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন আপাদমস্তক শুভ্রবসনে আবৃতা হইয়া সেই রমণীরত্ন এক সুচিকণ কারুকার্য্যময় সোফার উপর শুইয়া আছেন। পদশব্দে মেহেরের চিন্তার চমক ভাঙ্গিল—তিনি ফিরিয়া দেখিলেন দিল্লীশ্বর গৃহমধ্যে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া। চারিচক্ষে অনেক দিনের পর মিলন হইল—সে মিলনে সেই দুই প্রণয়ীর হৃদয়ে কি অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা কে বলিতে পারে?

জাহাঙ্গীর মেহেরের গৃহসজ্জার পারিপাট্য দেখিয়া, তাঁহার দাস দাসীদের বহুমূল্য বসন ভূষণ দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি নিজে দিল্লীশ্বর, হয়ত তাঁহার গৃহে এরূপ শৃঙ্খলা আছে কিনা সন্দেহ? আশ্চর্য্যের বিষয় এই মেহেরের সহিত তুলনায় তাঁহার দাসী-দের অধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া বোধ হয়। বাদসাহ দেখিলেন তাঁহার ক্রীতদাসীরা নিম্নে মণ্ডলাকারে বসিয়া সূচীকার্য্য করিতেছে, আর তাঁহার অভিমানিনী মেহেরউন্নিসা একখানি সোফার উপর বিমর্ষভাবে অঙ্গ ঢালিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী দেখিতেছেন।

বাদসাহকে দেখিয়া মেহের শয্যা পরিত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মানা হইলেন। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে সামান্য প্রজার ন্যায় তাঁহাকে "কুর্নীস্" করিয়া সম্মান দেখাইলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার ক্ষীণ দক্ষিণ হস্ত, প্রথমে হর্ম্ম্যতল—পরে ললাটভাগ স্পর্শ করিল। অশ্রুপূর্ণ চক্ষে নিম্নদৃষ্টিতে মেহের চুপ করিয়া বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জাহাঙ্গীর তাঁহার হৃদয়াধিকারিণীর অভূতপূর্ব্ব মধুর ভাব নয়ন ভরিয়া দেখিলেন। একবার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মেহেরউন্নিসার সেই অশ্রুপূর্ণ কমনীয় মুখখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে সেই সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন। মেহেরকে বলিলেন "তুমি আমার পাশে আসিয়া উপবেশন কর।"

মেহের অনেক দিনের পর আবার বাদসাহের কাছে আসিয়া বসিলেন, বাদসাহ কৌতু-

জলপূর্ণ নয়নে মেহেরের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মেহেরউন্নিসা! একটা বিষয়ে আমার কৌতুহল আকৃষ্ট হইতেছে। তুমি এই সমস্ত বাঁদীদিগের অধীশ্বরী। কিন্তু তোমার বেশভূষা দেখিলে ইহাদেরই ত কর্ত্রী বলিয়া বোধ হয় ইহার কারণ কি?" মেহের-উন্নিসা অশ্রুপূর্ণ নয়নে উত্তর করিল "জাঁহাপনা! ইহারা আমার বাঁদী, ইহাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করাই আমার প্রভুধর্ম্ম। তাই আমি ইহাদিগকে এইরূপ সুখে রাখিয়াছি। আমি বাদসাহের বাঁদী, বাদসাহ যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছেন আমি সেইরূপ অবস্থাতেই আছি, আমার বেশভূষা বাদসাহের ইচ্ছাধীন আমার নিজের নহে।" যদিও সেই প্রতিভাময়ী রমণী বিদ্রূপের ছলে এই কথা বলিলেন তথাপি বাদসাহ সেই রহস্যের প্রভূত ক্ষমতা স্বীয় হৃদয়ে অনুভব করিলেন। তিনি সুকোমল প্রেমালিঙ্গনে মেহেরকে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন "সুন্দরি! আর আমকে লাঞ্ছনা দিও না, আমি যথার্থই তোমার প্রতি পাষণ্ডের ন্যায়, অপ্রেমিকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। এখনই আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি আজ হইতে আমার ধর্ম্মপত্নী হইলে। দিল্লীর সিংহাসন এখন তোমার ভার বহন করিবার জন্যই নিযুক্ত থাকিবে। আমি কালই আমাদের বিবাহবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিব।"

কে জানিত সেই সমরখন্দের প্রশস্ত প্রান্তরমধ্যে পিতৃমাতৃ-পরিত্যক্তা বালিকার অদৃষ্টের সহিত বিশাল হিন্দুস্থানের এরূপ সুদৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে? সে ফুলটী হয়ত সামান্য যত্নের অভাবে সেই মরুভূমেই শুখাইয়া যাইতেছিল, কে জানে সেই সদাপ্রফুল্ল সুন্দর ফুলটী মোগল হারেমের শোভাসৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবে? দরিদ্র প্রতিবাসী বালকের সহিত ক্রীড়া করিয়া যে বালিকার জীবনের কিশোরকাল অতিবাহিত হইত—কে জানিত সমস্ত ভারতের পরাক্রমশালী ভূপালগণ এমন কি স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাহার হস্তেক্রীড়া পুত্তলি হইবেন?

মেহেরউন্নিসা পরদিন "নূরজাহান" বা "জগৎজ্যোতি" এই উপাধি পাইলেন। তাঁহার উপাধি প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নূতন দাম্পত্য জীবনের সূত্রপাত আরম্ভ হইল।

নূরজাহান প্রতিভাশালী রমণী ছিলেন, এ প্রতিভা না থাকিলে তিনি অত উচ্চে উঠিতে পারিতেন না। সুলতানা রিজিয়ার পর আর কোন রাজ্ঞী হিন্দু-স্থানের সিংহাসনে বসিয়া অতদূর কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কি রাজকার্য্য সম্বন্ধে নানাবিধ সুফলপ্রদসংস্কার, কি গূঢ় রাজনৈতিকআন্দোলন, সকলবিধ বিষয়েই তিনি দক্ষতা দেখাইয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের স্বভাব চরিত্র সংশোধনেও তিনি কম সহায়তা করেন নাই। বাদসাহ দিন দিন মদিরা পানে যেরূপ কলুষিত হইয়া উঠিতেছিলেন—নূরজাহানের শাসন না থাকিলে হয়ত অচিরাৎ তাঁহার জীবনলীলার, অবসান হইত।

নূরজাহানের জীবনের যে কথা সাধারণ ইতিহাসে অপ্রকাশিত তাহাই আমরা পাঠক-বর্গের গোচরে আনিলাম। তাঁহার ভবিষৎ জীবনের যে যে অংশ ভারতইতিহাসের

সহিত দুশ্ছেদ্যরূপে আবদ্ধ. বিস্তৃত ইতিহাস পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। সে সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে এই খানেই আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ।

প্রায় তিনশত বৎসর গত হইল গ্যালিলিও প্রথম দূরবীক্ষণ ব্যবহার করিয়া গগনমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণের এক অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন ; এবং তৎফলে তিনি বৃহস্পতি গ্রহের চারিটী উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করেন। ইহাই দূরবীক্ষণের সাহায্যে জগতে প্রথম আবিষ্ক্রিয়া! উক্ত উপগ্রহচতুষ্টয় একত্রে একই সময়ে এক যন্ত্রাভ্যন্তরে অবলোকিত হইয়াছিল ; গ্যালিলিও চারিটী জ্যোতিষ্ককে বৃহস্পতির সমভিব্যাহারে থাকিয়া কখনও পূর্ব্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও অন্তরালে এবং কখনও বা বৃহস্পতির গাত্রের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াই ইহাদিগকে তাহার উপগ্রহরূপে নির্দ্দেশ করেন। (এস্থলে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে দূরবীক্ষণের সাহায্যে বৃহস্পতি চন্দ্রের ন্যায় বৃহদায়তনের দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং উপগ্রহগুলির ব্যাস পরিমাপের যোগ্য দেখা যায়।) ঐ আবিষ্ক্রিয়ার পর তিনশতাব্দি যাবৎ কত লোক বৃহস্পতি এবং তাহার উপগ্রহগণকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বৃহস্পতি যে সময় সন্ধ্যার অব্যবহিতপরে গগনের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিতি করে (যেমন এক্ষণে কিছুকাল যাবৎ দেখা যাইতেছে) তৎকালে ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে দেখা যায় যে কত সাধারণজীবিকা-ব্যবসায়ী ব্যক্তি অল্পমূল্যের দূরবীক্ষণ ক্রয় করিয়া তাহা রাজপথে স্থাপনপূর্ব্বক পথিকদিগকে 'বার্হস্পত্যমণ্ডল' অবলোকন করাইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। * অতএব ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে এত পর্য্যবেক্ষণের মধ্যেও তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত বার্হস্পত্যমণ্ডলের একটী অধিবাসী গগণে লুক্কায়িত থাকিয়া মানবপ্রক্রিয়াকে উপহাস করিতেছিল! কিন্তু মানুষ দেবত্বপ্রাপ্তির প্রয়াসী, একটী ভৌতিক পদার্থ কতকাল তাহাকে ছলনা করিয়া থাকিতে পারিবে? আজ তিন শতাব্দি পরে ঐ মণ্ডলের একটী নূতন অধিবাসী মানুষের কলকৌশলের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে!

* এক মিনিট সময়ের জন্য উক্তরূপ যন্ত্রাভ্যন্তরে নেত্রপাত করার জন্য এক 'পেনি' মাত্র গ্রহণ করা হয়।

আমেরিকার অন্তঃপাতী 'ক্যালিফোর্ণিয়া' প্রদেশে 'হামিল্টন্' নামে এক পর্ব্বতশৃঙ্গ আছে, তাহার চূড়দেশে এক মানমন্দির অবস্থিত। ইহার নাম "লিক্ মানমন্দির"। জগতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ "বিশ্লেষক দূরবীক্ষণ" (Refracting Telescope) এই মানমন্দিরের সম্পত্তি; ইহাকে সাধারণতঃ "ভীমদূরবীক্ষণ" (Giant Telescope) বলিয়া আখ্যাত করা হয়। দূরবীক্ষণের যে দিক পর্য্যবেক্ষিত বস্তুর দিকে প্রসারিত থাকে সেই দিকের কাচ-খণ্ডের * ব্যাসের পরিমাপ "৩৬-ইঞ্চি"। (অনেক সময় দূরবীক্ষণসমূহকে তাহাদের "বস্তুখণ্ডের" ব্যাসের পরিমাপানুসারে নামাঙ্কিত করা হইয়া থাকে; যথা, লিক্ মান-মন্দিরের "ভীম দূরবীক্ষণের" কথা উল্লেখ করিতে হইলে তাহাকে "৩৬-ইঞ্চি দূরবীক্ষণ" বলা হয়, ইহাতে তাহার ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে লিক্ মানমন্দিরের অধ্যাপক 'বার্ণার্ড' কর্ত্তৃক বৃহস্পতির একটী নূতন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি যখন ইহাকে দৃষ্টি করেন তখন কিছু-তেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে ইহা একটী নূতন উপগ্রহ; কারণ এতকাল ধরিয়া যে মণ্ডলের পর্য্যবেক্ষণ একরূপ জনসাধারণের সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার ভিতরে যে একটী অনাবিষ্কৃত উপগ্রহ লুক্কায়িত রহিয়াছে তাহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বৃহস্পতির অপর উপগ্রহগণকে ভীম দূরবীক্ষণবলে 'বলের' ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট দেখায়; কিন্তু এই নবাবিষ্কৃত পদার্থটী একটী তারকার ন্যায় আকৃতিবিহীন বিন্দুরূপে অবলোকিত হইয়াছিল। অতএব অধ্যাপক বার্ণার্ড মনে করিলেন যে ইহা বৃহস্পতির সহিত সমসূত্রে অবস্থিত কোন নক্ষত্র হইবার সম্ভব; তবে যে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রথমে তাহাকে উপগ্রহ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবতঃ অধিক রাত্রি জাগরণে মস্তক বিঘূর্ণনের, এবং বৃহস্পতির আলোকাতিশয্যবশতঃ অতিক্ষীণ নক্ষত্রের ক্ষণদৃষ্টত্ব ও ক্ষণাদৃষ্টত্বের ফলমাত্র। এইরূপ দৃষ্টিভ্রম মনে করিয়া তিনি সেই রাত্রি পর্য্য-বেক্ষণে ক্ষান্ত রহিলেন, এবং পরদিন পুনরায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া উক্ত জ্যোতিষ্কের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। এই দিবস তিনি বৃহস্পতির আলোকের প্রভাব নিবারণার্থে সতর্ক হইয়া তাহাকে "দৃষ্টিক্ষেত্রের" অন্তরালে রাখিয়া তাহার চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ইহাতে তিনি যে কেবল একটী গতিশীল পদার্থ আবিষ্কার করিলেন তাহা নহে, তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করণান্তর গ্রহের চতুর্দ্দিকে তাহার আবর্ত্তনকালও নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে উক্ত জ্যোতিষ্ক বৃহস্পতির একটী উপগ্রহ; পৃথিবী হইতে ইহাকে বৃহস্পতির চারিদিকে ১২ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিটে একবার আবর্ত্তন করিয়া আসিতে দেখা যাইতেছে; এবং গ্রহ হইতে ইহার দূরত্ব ১১২,৪০০ মাইল।

* ইহার ইংরাজি নাম Object-glass; ইহাকে বাঙ্গলাতে "বস্তুখণ্ড" বলা যাইতে পারে। যন্ত্রের যে দিকে নেত্র সংলগ্ন করিতে হয় তাহাকে ইংরাজিতে 'Eye-piece' বলা যায়; তাহার বঙ্গানুবাদ করিতে হইলে "দৃষ্টি-খণ্ড" বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার জ্যোতির্বিদ্‌বর্গের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, তথাকার কোন অঞ্চলে জ্যোতিষসংক্রান্ত কোন আবিষ্ক্রিয়া হইলে তাহার সম্বাদ প্রথমে "হার্ব্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের" মানমন্দিরে তারযোগে প্রেরিত হইয়া থাকে ; তথা হইতে তাহা পৃথিবীর অপরাপর স্থানে প্রচারিত হয়। তদনুসারে ১১ই সেপ্টেম্বর লিক্ মানমন্দির হইতে হার্ব্বার্ড মানমন্দিরে উক্ত উপগ্রহের আবিষ্ক্রিয়া, তাহার আবর্ত্তনকাল এবং দূরত্বের সংবাদ দেওয়া হয়। কিন্তু হার্ব্বার্ড হইতে ঐ সংবাদ যখন তারযোগে ইউরোপের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়াছিল তখন একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। পরদিবস ইউরোপের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইল যে লিক্ মানমন্দিরের অধ্যাপক "বার্ণার্ড বৃহস্পতির পঞ্চম উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন ; তাহার আবর্ত্তনকাল ১৭ ঘণ্টা, ৩৭ মিনিট, এবং দূরত্ব ১১২,৪০০ মাইল। ইহার কিয়দ্দিবস পরেই ইংলণ্ডের অধ্যাপক "ফ্রিম্যান্" এই মর্ম্মে এক পত্র প্রকাশ করেন যে "উপগ্রহের দূরত্ব স্বীকার্য্য হইলে তাহা হইতে প্রাকৃতিকগণিত মতে ইহা সপ্রমাণ হয় যে বৃহস্পতি হইতে ১১২৪০০ মাইল দূরবর্ত্তী কোন উপগ্রহের আবর্ত্তনকাল ১৭ ঘণ্টা হইতে পারে না ; এমন কি তাহা ১২ ঘণ্টা হইতেও ন্যূন হইবে, নতুবা ঐ উপগ্রহ অচিরে বৃহস্পতির অঙ্গে নিপতিত হইবে।" ফ্রিমান্ গণিতাঙ্ক দ্বারা এই মত সপ্রমাণ ও প্রচার করিলে নানা স্থানে নানারূপ বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে ডাকযোগে এই সংবাদ আমেরিকায় পৌঁছিলে, লিক্ মানমন্দিরের সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ 'হোল্ডেন্' সাহেব ২৫শে অক্টোবর তাহার এক প্রতিবাদ প্রচার করিয়া ইহা বিজ্ঞাপিত করেন যে আবর্ত্তনকালে যে ভ্রমদর্শন হইয়াছে তাহা তারযোগে সংবাদ প্রেরণের দোষে ঘটিয়াছে। এবং ফ্রিম্যান্ যে আবর্ত্তনকাল নির্দ্দেশ করিতেছেন তাহা বার্ণার্ড দত্ত আবর্ত্তন কাল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর ; কারণ বার্ণার্ড পৃথিবী হইতে যে আবর্ত্তনকাল লক্ষিত হয় তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ফ্রিম্যান্ যে আবর্ত্তনের বিষয় বলিতেছেন তাহা বৃহস্পতির কেন্দ্র হইতে দৃষ্টি করিলেই অনুভূত হইবে।

পরিশেষে ১১ই, ১২ই ও ১৪ই সেপ্টেম্বর ক্রমান্বয়ে পর্য্যবেক্ষণের পর বার্ণার্ড উপগ্রহের প্রকৃত আবর্ত্তনকাল ১১ ঘণ্টা, ৫০ মিনিট স্থির করেন ; এবং অনেক বার পর্য্যবেক্ষণান্তে ২১শে অক্টোবর তিনি অধিকতর বিশুদ্ধ ফল প্রচার করেন, তন্মতে উপগ্রহের আবর্ত্তন কাল ১১ ঘণ্টা, ৫৭ মিনিট, ২০·৫ সেকেণ্ড ; এবং দূরত্বের পরিমাণ ১১২৫১০ মাইল। ইহাও সপ্রমাণিত হয় যে উপগ্রহ বৃহস্পতি হইতে পূর্ব্বান্তে যতদূর গমন করে, পশ্চিমান্তে ঠিক ততদূর গমন করে না ; যদি কোন পরিদর্শক সূর্য্যকেন্দ্রে অবস্থিতি করিয়া উক্ত উপগ্রহকে বৃহস্পতির সহিত একত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিত তবে দেখিতে পাইত যে পূর্ব্বান্তে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তিত্বকালে গ্রহবিম্ব হইতে উপগ্রহের দূরত্ব জ্যাপরিমাণে ৪৮·০৯৪ বিকলা মাত্র, কিন্তু পশ্চিমান্তে ঐরূপ দূরত্বের পরিমাণ ৪৭·০৯ বিকলা দৃষ্ট হয়।

ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে যে উপগ্রহের কক্ষের "কেন্দ্র-ব্যবচ্ছেদ" (Excentricity) অত্যন্ত অধিক। *

২৮শে অক্টোবর বার্ণার্ড উপগ্রহের বৃত্তাভাসাকার কক্ষালোচনা করিয়া গণনপূর্ব্বক উপগ্রহের আবর্ত্তনকাল ১১ ঘণ্টা, ৫৭ মিনিট, ১৭ সেকেণ্ড নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

ঐ উপগ্রহ এতক্ষুদ্র যে বৃহস্পতি এবং তাহাকে একত্রে যন্ত্রাভ্যন্তরে অবলোকন করিলে গ্রহের তেজে তাহা ঢাকা পড়িয়া যায়, কোনরূপেই নেত্রগোচর হয় না। সুবৃহৎ যন্ত্রদ্বারা যদিও বৃহস্পতিকে চন্দ্রাপেক্ষা অত্যন্ত বৃহদায়তনের দৃষ্ট হয় কিন্তু সেই যন্ত্রে উক্ত উপগ্রহকে একটী অতি ক্ষুদ্র তারকার ন্যায় মিট্ মিট্ করিতে দেখা যায়। এতদ্দৃষ্টে বার্ণার্ড এই অনুমান করিয়াছিলেন যে, যে সকল দূরবীক্ষণের "বস্তুখণ্ডের" ব্যাস ২৬-ইঞ্চির অনধিক তদ্দ্বারা কিছুতেই উপগ্রহ দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু তৎপরে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে আমেরিকার স্থানে স্থানে অনেকেই "১৮ হইতে ২৪-ইঞ্চি" দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর করিতে সক্ষম হইয়াছেন; এবং কয়েকবার চেষ্টার পর অধ্যাপক বার্ণার্ড ভীমদূরবীক্ষণের সাহায্যে বৃহস্পতিসহ তাহাকে একত্রে দৃষ্টিক্ষেত্রে পর্যাবেক্ষণ করিয়াছেন। গত ৪ঠা নভেম্বর তিনি যে এক পত্র প্রকাশ করেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে তিনি ভীম দূরবীক্ষণের "বস্তুখণ্ডের" অর্দ্ধেক ধূম্ররঙ্গে রঞ্জিত "আবের" আবরণে ঢাকিয়া বৃহস্পতিকে তাহার অন্তরালে রাখিয়াছিলেন, এবং এইরূপে পর্য্যবেক্ষণ করাতে উপগ্রহকে গ্রহের অঙ্গ হইতে ৮ বিকলামাত্র অন্তর পর্য্যন্ত অবলোকন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপগ্রহের আকৃতিদৃষ্টে এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে তাহার ব্যাসের পরিমাণ ১০০ মাইলের অধিক হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তাহার আয়তন পরিমাপসাপেক্ষ হইত।

ইংলণ্ডে উক্ত উপগ্রহের পর্য্যবেক্ষণ জন্য বহু চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু এযাবৎ তাহাতে কেহ সফল হইতে পারে নাই। কারণ তথায় বায়বীর উপদ্রব পর্য্যবেক্ষণকার্য্যে অনেক বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে, এবং ইংলণ্ডে আমেরিকান মানমন্দির সমূহের ন্যায় এত বৃহৎ যন্ত্র নাই। এতদ্ভিন্ন অধ্যাপক ফ্রিম্যান্ উপগ্রহের আবর্ত্তনকালেতে যে ভ্রম দর্শাইয়াছিলেন 'গ্রীন্‌উইচ্' দেবতারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া বহুবার উক্ত ভুল আবর্ত্তন-কালানুসারে গণনাপূর্ব্বক উপগ্রহকে দূরত্বাধিক্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তত্তৎকালে তাহা বৃহস্পতির অন্তরালে অবস্থিতি করাতে প্রত্যেক বারেই বিফল মনোরথ হইয়াছেন। এক্ষণে ভরসা করা যায় যে শীতান্তে ইংলণ্ডের

---

* অধ্যাপক ফ্রিম্যান্ বার্ণার্ডের দূরত্ব ঠিক করিয়া গণিত সাহায্যে তাহা হইতে উপগ্রহের দূরত্ব ৪৮·০৫ বিকলা, এবং আবর্ত্তনকাল ১১ ঘণ্টা ৫৮ মিনিট ৪৯ সেকেণ্ড নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আকাশ হইতে বাষ্পীয় যবনিকা উত্তোলিত হইলে গ্রীণ্‌উইচ্‌ প্রভৃতি মানমন্দিরে তাহা যন্ত্রগোচর হইবে।

যাবতীয় জ্যোতিষ্কাবিষ্ক্রিয়ার ন্যায় এই উপগ্রহেরও আবিষ্কারান্তে নামকরণ লইয়া আন্দোলন উঠিয়াছে! ইংলণ্ডে 'লিন্‌' নামক একব্যক্তি এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন,— "যেকালে মঙ্গলের দুইটী উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল তখন এইরূপ বিচার করা হইয়াছিল যে, যেহেতু গ্রীক্‌ দেবতাদিগের মধ্যে মঙ্গল যোধাধিপতি, এবং 'ডাইমস্‌' ও 'ফোবস্‌' ('Deimos' and 'Phobos') তাহার দুই সারথি ছিল বলিয়া কথিত আছে, অতএব মঙ্গলের উপগ্রহদ্বয়কে উক্ত সারথিদ্বয়ের নামে নামাঙ্কিত করা যাইতে পারে। এক্ষণে বৃহস্পতির উপগ্রহেরও তদনুরূপ বিচার করিয়া নামকরণ করা উচিত, গ্রীক্‌দেবস্থলী হইতে উপগ্রহের নিমিত্ত এমন একটী নাম আহরণ করা কর্ত্তব্য যাহার সহিত বৃহস্পতির চিরসম্বন্ধ রহিয়াছে। এস্থলে এই আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে বৃহস্পতির এই একটি মাত্র উপগ্রহ নহে, তাহার আরও চারিটী উপগ্রহ রহিয়াছে; কিন্তু তিন শতাব্দী যাবৎ তাহারা গ্রহ হইতে দূরত্বের আধিক্যানুসারে যথাক্রমে [১], [২], [৩] ও [৪] বলিয়া অনুনামিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান উপগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়াতে ঐ নিয়মে তাহাকে নামাঙ্কিত করিতে হইলে অপর উপগ্রহ গুলির প্রত্যেকের নাম পরিবর্ত্তিত করিতে হয়। অতএব তাহাদের নাম যেরূপ আছে তাহা রাখিয়া বর্ত্তমান উপগ্রহের এক নূতন নামকরণ আবশ্যক। গ্রীক্‌ দেবলোকে বৃহস্পতি রাজা, এবং বজ্র তাঁহার অস্ত্র, অতএব এই প্রস্তাব করা যাইতেছে যে নূতন উপগ্রহকে 'Fulmen' (ইহা 'বিজলি'র লাটিন প্রতিশব্দ) অথবা 'Keraunos' (ইহা 'বজ্রের' গ্রীক্‌ প্রতিশব্দ) বলিয়া অভিহিত করা হউক।" এখন পর্য্যন্ত এই প্রস্তাবের মীমাংসা হয় নাই।

বর্ত্তমান মাসের 'The Observatory' নামক মাসিক পত্রিকায় আয়র্ল্যাণ্ডস্থ "মার্ক্রী" (Markree) মানমন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ মার্থ সাহেব এক তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উপগ্রহের সর্ব্বাধিক দূরত্ব (গ্রহ হইতে) এবং আগামী মাসে প্রতিদিবস তাহা কোন্‌ কোন্‌ সময় ঘটিবে ও পৃথিবী হইতে কত দূরে দৃষ্ট হইবে তাহা প্রদত্ত হইয়াছে; পাঠকবর্গের নিকট তাহা রুচিকর হইবে না আশঙ্কা করিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯২　　শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

আমেরিকান্ সিমেণ্ট্।

শুনেছিলাম কাচের বাসন ভাঙ্‌লে আর জোড়া যায় না। কিন্তু দেখ্‌ছি এক রকম অ্যামেরিক্যান্ সিমেণ্ট্ পাওয়া যায়; তা'র দ্বারা যেমনই কেন ভাঙ্গা হোক না সুন্দর রূপে জোড়া যায়, তবে ভাঙ্গা বাসনের সমস্ত টুক্‌রো গুলি থাকা চাই। কিন্তু আমিতো তোমাদের সঙ্গে দোকানদারি কর্‌ছি নে—হ'ককথা বল্‌ব—হাজারই কেন জোড়া যা'ক না, একটু দোষ থেকে যায়; বেশ শক্ত হয় বটে, নূতনের মতন বেশ কাজ চলে বটে, কিন্তু যোড়ের মাথায় মাথায় একটু দাগ থেকে যায়। লোকে তাকে সকল কাজেই আনে, কিন্তু টোকা মার্‌লে নূতন কাচের মত বেশ হালকা খন্‌খনে আওয়াজটী দেয় না, কেমন একটা ভারি ভারি শব্দ হয়; অমনি লোকে বলে, "হাজার হোক ভাঙ্গা জিনিষ।"

বল্‌তে আপত্তি কি, আমার একখানি কাচের বাসন ছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। কত সন্তর্পণেই সে খানিকে রেখেছিলাম; যা'কে তা'কে হাত দিতে দিতাম না;—বল্‌তাম, "সাবধান, বড় ঠুন্‌ক জিনিস, তোমরা ভেঙ্গে ফেল্‌বে।" আহা মনে পড়ে, আমি নিজেই সেই খানিকে নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌তাম; পাছে সে খানির উপর কারও নজর পড়ে, তাই সদাই লুকিয়ে রেখে দিতাম,—কখনও কাছ ছাড়া কর্‌তাম না।

কিন্তু লোকে বলে অদৃষ্টে যা লেখা থাকে তা' খণ্ডান যায় না। আমিতো অতটা সাবধানে চল্‌তাম, কিন্তু কিছু দিন পরে কি জানি কেমন করে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়্‌লাম। একটী লোক আমার সেই সর্ব্বদা সশঙ্কিতে-রাখা জিনিষটী নিয়ে নাড়া চাড়া আরম্ভ কর্‌লে;—কিন্তু, অতি সাবধানে, আমা হতেও সন্তর্পণে। আমি ভাব্‌লাম এই জিনিষটীর উপরে দুই জনের নজর থাক্‌লে এর আর ভেঙ্গে যা'বার কোন ভয় থাক্‌বে না। তোমরা বিরক্ত হোয়ো না; সামান্য কাচের বাসনের কথা আর দুই এক কথাতেই শেষ করে ফেল্‌ছি। আমি কিছু দিনের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলাম; আমার সেই বাসনখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম কি সেই নূতন রক্ষকের কাছে রেখে গিয়েছিলাম ঠিক মনে পড়্‌ছে না, কেননা সে আজ অনেক দিনের কথা!

ফিরে এসে আর সে লোকটীকে দেখ্‌তে পেলাম না; শুন্‌লাম সে আর এখানে নেই, কোথায় চলে গিয়েছে! সকলে বল্লে আবার কিছুদিন পরে স্থানান্তরে দেখা হ'লেও হ'তে পারে। সেই হ'তে আমি কি-এক-রকম হ'য়ে পড়লুম। আমার সেই কাঙ্গালের ধন, অতি আদরের জিনিষ, সেই কাচের বাসন খানির আর যত্ন করা হ'ত না। বাস্তবিক সে খানি এতদিন যে কোথায় ছিল তার খোঁজও ছিল না। হঠাৎ একদিন মনে পড়াতে খুঁজে দেখ্‌লাম এক কোণে এক রাশি ধুলোয় ঢাকা যেন কি রকম ভাবে পড়ে

রয়েছে। যেমন ঝাড়্‌ব বলে তুল্‌তে গেলাম, অমনি খন্‌ খন্‌ শব্দে শতাধিক কাচের টুক্‌রো মাটিতে পড়ে গেল; আমার হাতে সেই শতাংশের এক অংশ মাত্র রয়ে গেল ;—আমি অবাক! হায়! কে এ দরিদ্রের কাচের বাসন ভেঙ্গে দিয়ে কোথায় চলে গেল!

*　*　*　*　*　*

আমি সেই ভাঙ্গা বাসনের টুক্‌রো গুলি কুড়িয়ে নিয়ে সযতনে তা'র সমাধি কর্‌তে যাচ্ছিলাম,—কেন না, ভাঙ্গা কাচ কারও বড় একটা কাজে আসে না, অধিকন্তু লোকের পা হাত কেটে যেতে পারে;—এমন সময়ে একজন বল্লে, "আহা ফেল্‌বে কেন, আমি ওকে নূতন কোরে নেব; অমন জিনিষ কি ফেলে দিতে আছে; ঐ ভাঙ্গা টুক্‌রোতে যদি আমার হাত কেটে যায় তা'ও স্বীকার, কিন্তু আমাকে উহা দাও, ও কত কাজে আস্‌বে।" পাছে কারও হাত পা কেটে যায় তাই আমি সমস্ত টুক্‌রো গুলি যত্ন করে কুড়িয়েছিলাম; একটীও হারায় নি। দুঃখিনী সমস্ত গুলি একত্র করে বেশ জুড়ে নিলে; দেখিলাম, অ্যামেরিক্যান্‌ সিমেণ্ট!—আমার সেই আদরের জিনিষখানিকে আবার দেখ্‌তে পেলাম, বেশ কাজও চল্‌তে লাগ্‌ল; কেবল একটু একটু জোড়ের দাগ রয়ে গেল; আর বাজিয়ে দেখ্‌তে গেলে আগের মত সেই হাল্‌কা খন্‌খনে আওয়াজটা আর পাওয়া যায় না।

ভাই, তথাপি তোমরা অ্যামেরিক্যান্‌ সিমেণ্টের আদর কোরো; তোমাদের কারও যদি ভাঙ্গা কাচের বাসন থাকে আমার ন্যায় ফেলে দিতে উদ্যত হয়ো না; অ্যামেরিক্যান্‌ সিমেণ্টের সদ্ব্যবহার কোরো।

শ্রীনীলমণি দে।

টপকেশ্বর ও গুচ্ছপাণি।

বাঙ্গলা দেশ নয় যে লম্বা চওড়া ছুটী পাওয়া যাবে। আমাদের পূজার ছুটী সবে তিন দিন। সে তিন দিনে কোন দূরতর দেশে বেড়াতে যাবার আশা বিড়ম্বনামাত্র। তাই কোন একটা বড় রকম অভিজানের পরিবর্ত্তে এই পর্ব্বতের চারদিকে যা' আছে তাই দেখ্‌ব ঠিক কল্লুম; এখানে যা' আছে তার চেয়ে বেশী আর কোথায় কি বা দেখ্‌ব? পাহাড়ে পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর শস্যশ্যামল প্রদেশ, চিরকলনাদিনী নির্ঝরিণী, হরিৎলতাপল্লবসমাচ্ছন্ন কুসুমকুঞ্জ এবং বিহঙ্গকুলের অবিরাম কলধ্বনি; সংসারের

ক্ষুধিত কোলাহল সেখানে নেই, পাণ্ডিত্য, তর্ক মীমাংসা প্রভৃতির পর্ব্বতপ্রমাণ ধূলিতে সেই নির্ম্মল প্রদেশ আচ্ছন্ন নয়, শুধু স্বভাবের শোভা, পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রকৃতির প্রেমের উৎস; শুধু শান্তি ও বিরাম, সুখ ও সন্তোষ। তাই পাহাড়ে উঠাই ঠিক কল্লুম এবং মহাষ্টমীর দিন, দুই প্রহরের সময় বন্ধুবর শ—বাবুর সঙ্গে টপকেশ্বর চল্লুম। কিন্তু এবার চারিধার যে রকম নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ দেখলুম তা' আর কি বোলবো! তার মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেল্‌তে হয়, কথা কইলে মনে হয় আমার ভিতর হতে আমিটা বাহিরে এসে যেন আমারই সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কচ্চে, আর চারিদিক হ'তে তার গম্ভীর প্রতিধ্বনি উঠ্‌ছে। কোন রকম কোলাহল না থাকলে স্থানের গাম্ভীর্য্য বেড়ে যায়। টপকেশ্বর ত একেই মহাগম্ভীর স্থান, তার উপর সেখানকার অধিবাসী গুর্খাদের সে সময় ঘরে ঘরে পূজা, তা' নিয়েই তারা ব্যস্ত, কাজেই গোলমালের কোন অবসর ছিল না এই পার্ব্বত্য গুর্খাজাতি এই সময় নিজ নিজ ঘরে দেবতার পূজা করে এবং ছাগ মহিষাদি বলি দেয়, উপাসনাবিষয়ে তাদের অসভ্য বলবার যো নেই, তারা ভগবানের মহাসিংহাসনের নীচেই গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠাভরে অবনত হয়, তাঁর প্রতিনিধিত্বের জন্য কোন মৃৎপুত্তলিকার অবতারণা আবশ্যক বলে মনে করে না।

টপকেশ্বরে তিনটে পর্ব্বতগহ্বর আছে, তার মধ্যে একটাতে প্রবেশ করে আমার মনে ভারি আনন্দ হতে লাগ্‌লো; চতুর্দ্দিকে শব্দমাত্র নেই, কেবল গহ্বরের সম্মুখ দিয়ে একটি ক্ষুদ্রকায়া নির্ঝরিণী অবিরাম কুলকুল শব্দে নেচে নেচে এঁকে বেঁকে দ্রুতগতিতে নীচে চলে যাচ্ছে, সে যেন একটা দ্রব স্ফটিকের প্রবাহ। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণচ্ছটা পাহাড়ের উপর বড় বড় গাছের দুই একটা পাতা ঠিক্‌রে এই নির্ঝরের জলে এসে পড়েছে। নির্ঝরিণী যেন তাতেই তার চিররুদ্ধ প্রাণে এক অনন্ত আনন্দের, এক স্বর্গীয় আলোকের বিকাশ অনুভব কচ্চে, আর স্বাধীনতার মুক্ত সমীরণ সেবন করবার জন্যে অধিকতর অধীর হয়ে আজন্মের পিতৃগৃহ ছেড়ে ছুট্‌ছে,। আমার স্বতঃই রবি কবির সেই কবিতাটা মনে এল,

"উন্মাদিনী কল্লোলিনী
ক্ষুদ্র এক নির্ঝরিণী
শিলা হ'তে শিলান্তরে লুটিয়া লুটিয়া
ঘনঘন অট্ট হেসে
ফেনময় মুক্ত কেশে
প্রশান্ত হ্রদের কোলে পড়ে ঝাঁপাইয়া।"

চারিদিকের শত শত অপরিচিত বৃক্ষ শাখা হ'তে কত সুন্দর পাখী সুস্বরে গান করছে, আর পর্ব্বতের গায়ে স্নিগ্ধশ্যাম শৈবাল, সবুজ মখমলের মত বিছানো আছে, তার মধ্যে নানারঙের ফুল। আমার মনে হলো আমি বুঝি মৃত্যুর রাজ্য অশান্তির আলয় ছেড়ে এক

অমর শান্তিপূর্ণ রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি, সৌন্দর্য্যসাগরে প্রাণ ডুবে গেল, অনেকক্ষণ আত্মহারা, বিহ্বল হয়ে রইলুম।

খানিক পরে আমরা অন্যান্য গহ্বরের সন্ধানে চল্লুম। এখানে যে তিনটে গহ্বরের কথা বলেছি তাদের মধ্যে সোজা হয়ে দাঁড়ান যায় না, কিন্তু ভিতরে অনেক দূর যাওয়া যায়; সন্ন্যাসীরা সেই সমস্ত জনমানবশূন্য অন্ধকারময় গহ্বরে ব'সে জপ তপ করে থাকেন, মনঃসংযোগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত স্থান বোধ করি আর নেই। নির্ঝরের জল বেশী হ'লে আর এই সকল গহ্বরে যাওয়ার সুবিধা থাকে না। কারণ যদিও জল কখন গহ্বরের মধ্যে যায় না কিন্তু সেই সকল গহ্বর হ'তে বাহির হয়ে লোকালয়ে আস্‌তে হ'লে নির্ঝরের জল ভেঙ্গে টপকেশ্বর মহাদেবের কাছে যেতে হয়, সেখান হ'তে ধর্ম্মাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের নির্ম্মিত রাস্তা ধ'রে উপরে উঠ্‌তে পারা যায়। পূর্ব্বে বর্ষাকালে টপকেশ্বরে কেহ যেতে পারতো না, কারণ, হয়ত দেখা গেল নদীর তেজ বেশ কমে গেছে, আপাততঃ কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই কিন্তু আবার হয়ত হঠাৎ পাহাড় হ'তে হু হু করে জল এসে পড়্‌লো, আর ৪।৫ দিন ধরে সেই রকম বেগে জল পড়্‌তে লাগলো, তখন সেখান হ'তে জীবন নিয়ে ফিরে আসা কি রকম কঠিন ব্যাপার তা' সহজেই বোঝা যায়, যা'হোক কালীকৃষ্ণ বাবুর অনুগ্রহে সে অসুবিধা দূর হয়েছে।

টপকেশ্বর একটি তীর্থস্থান, যাত্রীগণ একখণ্ড প্রস্তরকে মহাদেব বলে পূজা করে। এর খুব নিকটে মানুষের বাস নেই, ইতিপূর্ব্বে যে গুর্খাদের কথা বলেছি তারা কিছু দূরে দূরে বাস করে। এখানে এসে পড়ে থাক্‌লে খাবার ভাবনা ভাবতে হয় না, গুর্খারা এ সম্বন্ধে ভারি তৎপর, অতিথিকে অনাহারে রেখে আহার কর্ত্তে এরা কিছুতেই রাজী নয়। এমন সাহসী ও অতিথিপ্রিয় জাতি বোধ হয় পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। ইংরাজদের দুই রেজিমেণ্ট গুর্খাসৈন্য আছে, এই দুই রেজিমেণ্টে সৈন্যসংখ্যা দুই হাজারের কিছু বেশী। দুই দলই এখানে থাকে, একদল Old Regiment, দ্বিতীয় দল অল্পদিন প্রস্তুত হয়েছে তার নাম New Regiment (নায়া পল্টন)। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইংরেজরাজ যত যুদ্ধ করেছেন সর্ব্বত্রই দুই দল তাঁদের সঙ্গে ছিল, মিসর যুদ্ধেও এরা ইংরেজসৈন্যের সঙ্গে ছিল। সাহস, আতিথেয়তা সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুণ থাক্‌লেও এরা অত্যন্ত গোঁয়ার এবং মাতাল। এদের যুদ্ধের অস্ত্র বন্দুক ও কামান, কিন্তু জাতীয় অস্ত্র ছোট ছোট তরবারী।

বেলা হয়ে এলো দেখে, আমরা আবার সেই আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে শ্রান্ত দেহে ধীরে ধীরে নেমে আস্‌তে লাগলুম। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে পার্ব্বত্য প্রদেশের শোভা কি সুন্দর! যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের বুঝিয়ে দিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র; ঘুরতে ঘুরতে যখন পাহাড়ের কোন উচ্চ অংশে উঠি, দেখি সূর্য্যের লোহিতচক্র পাহাড়ের অন্তরাল হতে উঁকি মারছে, তার কণককিরণধারা পশ্চিম আকাশের বহুদূর পর্য্যন্ত স্বর্ণময় ক'রে বৃক্ষপত্রে, পর্ব্বতগাত্রে

শ্যামল শৈবালদলে, পার্ব্বত্যপুষ্পের পাঁপড়ীতে ও বিহঙ্গের সুন্দর পক্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে; ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরদল এদিক হ'তে ওদিকে উড়ে যাচ্ছে, তাদের বিচিত্র কূজনে তাদের মুক্তপক্ষ স্বাধীন জীবনে আনন্দোচ্ছ্বাস ও গভীর শান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আবার যখন পর্ব্বতের কোন অধিত্যকাস্থ রাস্তায় এসে পড়ি তখন দেখি সন্ধ্যা খুব গাঢ় হয়ে এসেছে, ঝিঁঝিঁরা গান আরম্ভ করে দিয়েছে আর নির্ঝরের সেই অবিরাম কুলুধ্বনি আরো গম্ভীর হয়ে উঠেছে; পাখীর গান তখন বন্ধ, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষগুলির সে জীবন্ত ভাবও যেন রুদ্ধ; শুধু অন্ধকার ডালে ডালে পাতায় পাতায় স্তূপাকার হয়ে বিভীষিকা বিস্তার কচ্চে, আর তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বহুদূরবর্ত্তী রহস্যময় তারকার স্নিগ্ধ, শুভ্র, আলোকচ্ছটা প্রবেশ করে কবিত্ব ফুটিয়ে তুলচে।

নবমীর দিন বিশ্রাম ক'রে বিজয়াদশমীর দিন আবার ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। দুইটি বন্ধুর সঙ্গে প্রত্যূষে বাহির হয়ে পড়লুম। কনকনে শীত, কিন্তু আমাদের উৎসাহবহ্নি সে শীতকে পরাক্রম প্রকাশ কর্ত্তে দেয় নি। বাসা হতে বাহির হবার সময় সকলেই স্নানের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েছিলুম। নয়া পল্টনের মধ্য দিয়ে আমরা চারিমাইল পথ হেঁটে গেলুম, শেষে হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গে উপস্থিত হওয়া গেল। সহসা একটা প্রকাণ্ড মুক্ত প্রদেশ আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠলো। সূর্য্য তখন আকাশের অনেক দূর উঠেছে, কিন্তু তখনো খুব কুয়াশা, কুয়াশায় দূরস্থ হরিৎ বৃক্ষরাজি ও অনুর্ব্বর ধূসর পর্ব্বতকায় এক হয়ে গেছে, সব যেন ছায়ার মত! আমরা আর বেশীক্ষণ সেখানে অপেক্ষা না ক'রে পর্ব্বত ব'য়ে প্রায় ৫০০ শত ফীট নীচে একটি ক্ষুদ্রকায় প্রখর নির্ঝরের ধারে এসে পড়লুম। এই নির্ঝরের নাম 'গুচ্ছপাণি। চার পাঁচ হাত প্রশস্ত একটি জলধারা পর্ব্বত গহ্বর হ'তে বাহির হয়ে রমণীর কেশগুচ্ছের ন্যায় গিরি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। অন্যান্য পর্ব্বতে চারদিক হতে পর্ব্বতের গা দিয়ে হুহু করে জল পড়ে, আর তা'তেই ঝরণার জল বেশী রকম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠে; "গুচ্ছপাণি" কিন্তু তা' নয়, পর্ব্বতের গা ব'য়ে অতি সামান্যই জল পড়ছে, কিন্তু বহুদূরস্থ পর্ব্বত গহ্বর হ'তে একটা বৃহৎ জলধারা আসচে তাই মূলপ্রবাহ এই গুচ্ছপাণির যে বিশেষত্ব আছে তা অন্য কোন নির্ঝরের আছে কি না জানিনে কিন্তু এই বিশেষত্ব দেখতেই আমাদের আসা। এই নির্ঝরের জল উজিয়ে যেতে বড় কষ্ট নেই, বেশ স্রোত আছে বটে কিন্তু একখানা লাঠির সাহায্যেই উজিয়ে যাওয়া যায়, কোথাও গভীর জল নেই। লাঠির সাহায্যে উজিয়ে আমরা একবারে পর্ব্বতের গায়ে এসে পড়লুম, সেখানে দেখি পর্ব্বতের ভিতর হ'তে যেখান দিয়ে জল আসচে তার মধ্যে প্রবেশ করা যায়। আমরা সেই অন্ধকার পথে প্রবেশ কল্লেম। কোথাও হাঁটু জল কোথাও তার চেয়ে কম, কোথাও বা একটু বেশী, কিন্তু স্রোত ক্রমেই বেশী ব'লে বোধ হতে লাগলো, লাঠির সাহায্যে আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম, আমাদের জুতা, জামা, চাদর, শুকনো কাপড় সমস্ত বোঁচকা ক'রে এক বন্ধু পিঠে বেঁধে নিলেন, অন্য একজনের হাতে খাবার

ও তেলের শিশি। আমরা যে খুব রোম্যাণ্টিক রকম চেহারা খুলিনি তা' স্বীকার কর্ত্তে হবে। মাথার উপরে সহস্র হাত উঁচু পাহাড়, কোন স্থানে মাথা হেঁট করে যেতে হচ্ছে কোথাও সোজা হয়ে যাওয়া যাচ্ছে। গহ্বরের মধ্যে খুব অন্ধকার তা' বলা বাহুল্যমাত্র, কিন্তু কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে একটু আলো দেখা গেল; খুব সাবধানে চল্‌তে হচ্ছিলো; মাথা ও পা দুইই ঠিক রেখে চলা দরকার, মাথা বেঠিক হ'লে পাহাড়ে লেগে তা' চূর্ণ হবার সম্ভাবনা, আর পা একটু পিছলে গেলে স্রোতের টানে পাথরের উপর পড়্‌লে শরীর গুঁড়ো ক'রে ফেলতে পারে। উপরে যে আলোর কথা বলেছি তা ক্রমেই স্পষ্টতর হতে লাগলো; শেষকালে এমন একটা যায়গায় পৌছন গেল যেখানে মাথার উপর পর্ব্বত নেই, পর্ব্বত সেখানে কেটে দুভাগ হয়ে গেছে, উচ্চতা প্রায় হাজার ফিট, সব উপরের ফাঁকের বিস্তার তিন হাতের বেশী হবে না; তখন বেলা ১০টা, সুতরাং সূর্য্যকিরণ পশ্চিমদিকের পর্ব্বতের গায়ে এক হাত আন্দাজ নেমেছিল, আর তাতেই আমরা আলো পাচ্ছিলুম। যাহোক আরো খানিক অগ্রসর হ'য়ে দেখি সেখানে ফাঁক অনেক বেশী কারণ উপর হ'তে একখানা প্রকাণ্ড পাথর ভেঙ্গে পড়েছে, তার নীচে দিয়ে কুলকুল ক'রে জল আসছে, উপরে মুক্ত সূর্য্যালোক। আমরা বহু কষ্টে সেই ভাঙ্গা পাথরখানার উপরে উঠলুম; কি সুন্দর স্থান! দুই ধারে দুই পর্ব্বত সোজা দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যে এক প্রস্তর সিংহাসন আর তার পদধৌত ক'রে নির্ম্মল জলস্রোত ঝর ঝর করে চলে যাচ্ছে। আমরা সেখানে খানিক ব'সে সেই ভাঙ্গা প্রস্তর খণ্ডের অপর দিক দিয়ে আবার উজানে চলতে আরম্ভ কল্লুম, হাতে সেই দীর্ঘলাঠী। বলা বাহুল্য আমরা উত্তর মুখেই অগ্রসর হচ্ছিলুম, আমরা যেখানে নামলুম সেখানে মাথার উপরে খোলা কিছু বেশী, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু সুবিধে নেই কারণ উপরে পাহাড় বড় আবড়াখাবড়া, পশ্চিম দিকের পাহাড় হ'তে খানিকটে অংশ বাহির হ'য়ে কোথাও ফাঁক ঢেকে ফেলেছে কোথাও গাছপালার নিবিড় পত্রের ছায়াতেই আলোর ক্ষীণ আভাটুকু ঢেকে গেছে। আমরা যে পথ দিয়ে চলছিলুম তার পরিসর বড়ই কম দুজন মানুষ পাশাপাশি যেতে পারে না, একজন লোক দুই কুনুই বিস্তার করে দাঁড়ালে কুনুই দুই পাহাড় স্পর্শ করে। প্রায় সর্ব্বত্রই এই রকম পরিসর, কোথাও আধহাত বেশী, কোথাও কিছু কম। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিই যে আমার শরীরের পরিধি আর একটু বেশী বিস্তৃতি লাভ করেনি, নতুবা এ দৃশ্য আমার কাছে অদৃশ্য থেকে যেত। শুনেছি নাকি কেশব বাবুর এই পথে যাবার সময় দুই এক স্থানে একটু চাপাচাপি হয়েছিল। আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়ে দেখি সম্মুখে একটা জলপ্রপাত। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফিট উঁচু হতে হু হু করে জল পড়চে, সে শব্দের বিরাম বিশ্রাম নেই, নিস্তব্ধ পর্ব্বত গহ্বরে সে শব্দ কত গম্ভীর তা' আর কি বোলবো! অবিরাম হু হু শব্দ! আমার মনে হোল যে সংসারের দৈনন্দিন কাজ যেন বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছিলো, কিছু মাত্র কোথাও অনিয়ম ছিল না,

হঠাৎ কোথা হ'তে যেন প্রলয়ের ঝটিকা উঠে জগতের সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙ্গেদিলে, যত নিয়ম উল্‌টে দিলে, তার পর তার গভীর বিক্রমের চিহ্ন ঘূর্ণিত ফেনপুঞ্জে ন্যস্ত ক'রে স্তব্ধতাকে ধ'রে চুবানি দিতে দিতে প্রবল বেগে ভাসিয়ে নিয়ে চল্লো। আমরা আত্মহারা হয়ে খানিক সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে অগ্রসর হবার আর কোন পথ আছে কি না অনুসন্ধান কর্ত্তে কর্ত্তে দেখ্‌লুম সেই প্রপাতের পাশ দিয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা পথ আছে, সেই পথে উঠে আবার অপর পাশের জলে নামা গেল। একটু অগ্রসর হয়ে দেখি আর একটা জলপ্রপাত, এই প্রপাতও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে পার হয়ে আমার বন্ধুদ্বয় জবাব দিলেন। আমি কিন্তু নাছোড় হয়ে সেই অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করে আরো খানিক দূর গিয়েছিলুম, কিন্তু শরীর বড় ক্লান্ত হওয়ায় বিশেষ একা ব'লে আর বেশী দূর যেতে ভরসা হলো না। শুনা গেল বরাবর চলে গেলে পর্ব্বতের অপর পাশ দিয়ে বাহির হয়ে আবার সমভূমিতে পড়া যায়, তার পর সেই নির্ঝর যে পর্ব্বত হতে বাহির হয়েছে তাতে আর প্রবেশ করা যায় না। যা'হোক ফিরে এসে শুষ্কবস্ত্র পরিধান করে আহারাদি শেষ করা গেল। আহারান্তে বন্ধুদ্বয় গল্প জুড়ে দিলেন, আমি সতর্কতার সঙ্গে জলে নেবে পুনর্ব্বার অগ্রসর হতে লাগলুম। পূর্ব্বে একটি সুন্দর পর্ব্বত গহ্বর দেখে-ছিলুম, সেখানে যাবার জন্যে আমার ভারি ঝোঁক চেপেছিলো, আমি ধীরে ধীরে সেই গহ্বরে প্রবেশ কল্লুম, এবং এই মনোরম গহ্বরে প্রায় তিন ঘণ্টা কাটিয়েছিলুম। অপরাহ্ন হয়ে এলো দেখে আমরা তিনজনে আবার কাপড় জুতা সমস্ত বোঁচকা বেঁধে জলে নামলুম, সেই দৃশ্য এখনো আমার মনে অতি স্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত আছে। আমাদের রকম দেখে আমার বড় হাসি এসেছিল, আমি বল্লুম মা দুর্গা কৈলাসে যাচ্ছেন আর অনুচর নন্দীভৃঙ্গী বোচকা লাঠি প্রভৃতি নিয়ে পর্ব্বতে উঠ্‌চে। সে দিন বিজয়া দশমী, তাই বুঝি এই সাদৃশ্যটা ঝাঁ করে আমার মনে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো বাঙ্গালা দেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে তখন কি উৎসব চলছিলো! গৃহে গৃহে প্রতিমা বরণের ধূম লেগে গিয়েছে, সমস্ত বৎসরের আনন্দ আজ শেষ হলো, এত হাসি তামাসা আমোদ আহ্লাদ উদ্যম উৎসাহ বৎসরের মত অবসান হলো ভেবে সরলা বঙ্গললনা আজ অশ্রু-পূর্ণলোচনা। মাকে বিদায় দিতে ভক্ত হিন্দুর হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়। কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে আবার সম্বৎসরের পর অশ্রান্ত সংগ্রাম কর্ত্তে হবে ভেবে বঙ্গযুবকগণ ম্রিয়মাণ। একে একে শস্যশ্যামলা বঙ্গের নদীতীরে জনকোলাহল ও সহস্র সহস্র কৃষ্ণতার চক্ষুর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টির অবিরাম বর্ষণ মনে পড়ে গেল; কতদিন হ'ল বিসর্জ্জনের সেই করুণ বাজনা, সানাইয়ের সেই বিষাদ রাগিণী শুনেছি আজ তারই দূর প্রতিধ্বনি বিস্মৃত স্বপ্নের শেষ আভাসের মত কানে বাজতে লাগলো।

যাহোক এখন আদত কথা বলি, আমরা নন্দী ভৃঙ্গীর মত লাঠির আগায় বোঁচকা বেঁধে কাঁধে ফেলে আর একটা লাঠি হাতে ক'রে ঐ পর্ব্বতের গা হ'তে ও পর্ব্বতের গায়ে

লাফিয়ে যেতে লাগলুম, উজান অপেক্ষা ভাটিয়ে যাওয়া বেশী কষ্টকর, যেন ঠেলে ফেলে দেয়; তার পর পায়ের নিচে উঁচু উঁচু পিচ্ছিল প্রস্তর খণ্ড, খুব সাবধান হওয়া দরকার। আমরা প্রায় অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় বাহির হয়ে এলুম; বাহির হয়ে বরাবর জল দিয়ে একটু ভাটিয়ে গিয়ে দেখি আর একদিক হতে নূতন একটা নির্ঝর আস্‌চে, আবার সেটা উজিয়ে যাবার সাধ হলো, সে দিকে মাথার উপর পর্ব্বত নেই, পথের পরিসরও বেশী, পঁচিশ হাতের কম নয়। এক বন্ধু মোহনাতে বসলেন, আমরা দুজনে অগ্রসর হলুম; এ নির্ঝরটি বড়ই ভয়ানক, পরিসর বেশী বটে কিন্তু জল বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে আসচে সুতরাং ভয়ের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী, একবার হটাৎ পা পিছলে গেলে দশহাত যেতে না যেতেই মাথা একেবারে গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। যাহোক আমরা অসমসাহসে অগ্রসর হতে লাগলুম। অনেক দূর যাওয়া গেল, অবশেষে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় উপরে উঠে বসে পড়লুম। তখন সেই জলদিয়ে পুনর্ব্বার ভাটিয়ে নামা অত্যন্ত অসম্ভব বলে বোধ হলো, শেষে শুনা গেল অত্যন্ত বলবান পাহাড়ী ছাড়া অন্য কোন লোক ঐ রাস্তায় ভাটিয়ে নামতে সাহস করে না। আমরা একে দুর্ব্বল বাঙ্গালী, তাতে এই রকম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, এদিকে বেলাও প্রায় শেষ হয়েছে, চতুর্দ্দিকে ভয়ানক জঙ্গল, আমাদের মনে ভারি ভয়ের সঞ্চার হলো। কি উপায় করা যাবে বসে বসে ভাবচি, সহসা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে খস্ খস্ শব্দ শুনে আমাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হলো। দেখি একটি পার্ব্বতীয় স্ত্রীলোক জঙ্গল ঠেলতে ঠেলতে আমাদের দিকে আস্‌চে, স্ত্রীলোকটি জল নিতে আস্‌ছিলো। আমি তাকে আমাদের বিপদের কথা জানিয়ে হিন্দীতে বল্লুম "হে রমণিরত্ন যদি অনুকম্পা করে আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত এই দুটি প্রাণী আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার লাভ কর্ত্তে পারে"। আমরা প্রত্যাশান্বিত ভাবে অনেকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম কিন্তু কোন উত্তরই পাওয়া গেল না। যে কোন হতভাগ্য প্রেমিক যুবক তাঁর চিত্তহারিণী রূপসীর কাছে হৃদয়ের আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসের কথা বলতে গিয়ে যুবতীর অবহেলা দৃষ্টিলাভ করেছেন, সেই যুবকই বোধ করি একমাত্র, এই অভ্যাগতা রমণীকে নীরবে দণ্ডায়মানা দেখে আমাদের মনে যে নিরাশার সঞ্চার হয়েছিল তা কতকটা অনুমান কর্ত্তে পারবেন। যাহোক আমার বন্ধু পুনর্ব্বার আমাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত কল্লেন, রমণী কোন উত্তর না দিয়ে বিড় বিড় ক'রে মনে মনে কি বোল্লে, আমরা নিরুপায় দেখে সকলে মিলে হাত পা নেড়ে প্রবল ইসারা দ্বারা আমাদের পরিত্রাণের উপায় জিজ্ঞাসা কল্লুম, তখন সে অস্ফুটস্বরে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কল্লে 'কাঁহা যাতা ?" "কাঁহাসে আয়া ?" "কিস্‌তেরে আয়া ?" আমরা এক নিশ্বাসে সব বলে ফেলুম; তখন সে বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে 'বাঃ", অর্থাৎ এই বীরোচিত অভিজান যেন আমাদের এই ক্ষীণ বাঙ্গালীবীর্য্যের পক্ষে খুব অতিরিক্ত। বলা বাহুল্য তার কথায় আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ কল্লুম, সে আরো বুঝিয়ে দিলে যে ভাটিয়ে যাওয়া আমাদের কর্ম্ম নয় তবে সে পর্ব্ব-

তের গা দিয়ে একটা আরণ্যপথ দেখিয়ে দিতে পারে, সে পথ দিয়ে চ'লে গেলে আমরা ঘুরে ফিরে লোকালয়ে উপস্থিত হ'তে পারি। আমরা বাঙনিষ্পত্তি মাত্র না ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে চল্লুম, সে দুই হাতে জঙ্গল ঠেলে অনায়াসেই পাহাড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো; আমার সঙ্গীটি যদিও বাঙ্গালী কিন্তু তিনি জন্মকাল হ'তেই পাহাড়ে, কোন দিনই তিনি বাঙ্গালা দেশ দেখেন নি, এমন কি নৌকা নামক জলচর পদার্থ কোন দিন তাঁর দৃষ্টিগোচরে আসে নি, পাহাড় তাঁর আজন্মের পরিচিত স্থান সুতরাং তিনিও বেশ চোল্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু আমার হাতেখড়ি আরম্ভ হয়েছে মাত্র, আজ এই কঠোর পরিশ্রমে আমি বেচারী মৃতপ্রায়, তার পরে সেই জঙ্গল দু পাশ হতে ক্রমাগত গায়ে এসে বাধ্‌ছে, গা ছড়ে যাচ্ছে, দু এক যায়গা হ'তে রক্তপাতও হ'তে লাগলো। আমার দুরবস্থা দেখে আমাদের পথপ্রদর্শিকা পার্ব্বত্যরমণী আমাকে যথেষ্ট সাহায্য কর্ত্তে লাগলো। পথ চল্‌তে চল্‌তে আমার মনে ভারি একটা দার্শনিক তত্ত্বের উদয় হয়েছিলো, আমার মনে হলো রমণীস্বভাবের কমনীয়তা ও বিশেষত্ব সর্ব্বত্রই প্রায় একরকম বোধ করি, কোন পুরুষ পথপ্রদর্শকের হাতে পড়লে আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমাকে বেশ দু চারটে তিরস্কার সহ্য কর্ত্তে হতো, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি একবার আমার উপর দোষারোপ কল্লে না, মায়ের মত যত্ন করে আমাকে নিয়ে চল্লো এবং যে নির্ঝরের মুখে আমাদের অন্য বন্ধু বিশ্রাম কচ্ছিলেন সেখানে পৌঁছিয়ে দিলে। তারপরে আমরা ধীরে সুস্থে সন্ধ্যার সময় বাসায় ফির্‌লুম।

এখানে বিজয়ার কিছুই নেই কিম্বা এমন কোন জিনিষ নেই যাতে কোরে আমাদের শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশের বিজয়া দশমীর কথা মনে আস্‌তে পারে, থাক্‌বার মধ্যে আছে শরতের নির্ম্মল আকাশ, আর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে বিরলনক্ষত্রা শুক্লা যামিনীর স্নিগ্ধ শ্বেতহাস্য। কিন্তু বিজয়ার কথা মনে করে আমরা বন্ধু বান্ধববর্গের সঙ্গে প্রণামাশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনে ব্যাপৃত হলুম। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মনের ভিতর একটা আকুলতা জেগে উঠ্‌তে লগেলো, মনে হলো যারা আমার নিতান্ত আপনার তারা এখন কত দূরে।

শ্রীজলধর সেন।

ফুলের মালা।

দশম পরিচ্ছেদ।

শক্তি যোগিনীর উত্তরের অপেক্ষা পর্য্যন্ত না করিয়া সত্বরগমনে সহসা গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সেই গৃহের পশ্চাতে জীর্ণ, ক্ষীয়মান ইষ্টক দেওয়ালের ব্যবধানে

কালীর পীঠস্থান ; উদ্যানপথ দিয়া বালিকা তাহার দ্বারস্থ হইল। দ্বার শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না, অনায়াসে তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। দুএকটি তারকা-রশ্মি অমনি তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া মন্দির সুষুপ্ত ভীষণতাকে সহসা চমকিত, জাগ্রত করিয়া তুলিল। তারকালোকদীপ্ত করাল বদনী কালীর সম্মুখে শক্তি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল প্রতিমার রক্তিম লোল জিহ্বা তাহার মতন প্রতিশোধ বাসনাতেই যেন লক লক করিয়া উঠিয়াছে, কুৎসিত ঘৃণ্য বীভৎস্য পিশাচ প্রবৃত্তিগণ দেবীর পিপাসা নিবৃত্তির জন্যই যেন নিজ মুক্তপাতে অজস্র ধারায় শোণিত ঢালিতেছে।—শক্তিকে দেখিবামাত্র সেই রক্ত নির্ঝরকণ্ঠ নৃমুণ্ডগণ সহসা বিকট হাস্যোচ্ছ্বাসিত অধরে যেন তাহার দিকে চাহিল ; তাহার নয়নে নয়ন সংলগ্ন করিয়া কালী কণ্ঠ হইতে একে একে খসিতে লাগিল ; খসিয়া খসিয়া "প্রতিশোধ প্রতিশোধ" শব্দে তাহাকে বেষ্টন করিয়া মহোল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিল।

শক্তি তাহাদিগের কর্ত্তৃক আবিষ্ট, হৃতজ্ঞান, আত্মহারা হইয়া তাহাদের প্রতিধ্বনি গাহিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল—

"হ্যাঁ প্রতিশোধ প্রতিশোধ ; আমি প্রতিশোধ চাই।"

বালিকার স্বর-কম্পন মন্দির স্তব্ধতায় মিলাইতে না মিলাইতে হৃৎকম্পকারী মৃদু গম্ভীর স্বরে দৈববাণী হইল—"তথাস্তু! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে—তোমা কর্ত্তৃক তাহার বংশ লোপ হইবে।"

শক্তি কণ্টকিত দেহে, বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, কোথায় কেহ নাই, সম্মুখে একমাত্র নির্ব্বাক নিস্তব্ধ সেই পাষাণ মূর্ত্তি ; দেবীর রসনা যেন এখনো কম্পিত হইতেছে, তাঁহার কটাক্ষ যেন রোষযুক্ত, শক্তির সন্দেহে তিনি যেন ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। শক্তি কম্পমান হৃদয়ে বলিল "দেবি! আমি প্রতিশোধ চাই, কিন্তু রক্তপাত চাই না। আমি তাহাকে চাই ; সে আমার হউক, আমাকে এই বর দাও।"

আবার মৃদু অথচ বজ্র স্বরে উত্তর হইল "পাইবে না,—তাহাকে পাইবে না"! শক্তির দেহে উষ্ণ শোণিত উচ্ছ্বাস বেগে বহিল ; সে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল "ইহা দেবীর বাক্য নহে! কে তুই!" দেবী-প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে একজন মনুষ্য অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ অন্ধকারে থাকিয়া শক্তির দর্শন শক্তি প্রখর হইয়া উঠিয়াছিল, মনুষ্য তাহার নিকটস্থ হইলে সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহা শাক্ত সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ; তাহার দেহ রক্তবস্ত্রাবৃত ; জটাজুট রক্তজবায় পরিবৃত ; কপালে রক্ত চন্দন, কণ্ঠে ভীষণ নরকপাল মালা। শক্তি কিছুক্ষণ তাহার দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়া চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?" উত্তর হইল "আমি দেবীর দাস। তাঁহার হইয়া দৈববাণী করিতে তাঁহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞাই আমার মুখ দিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

"আমি দেখিতেছি, তোমার উজ্জ্বল ভাগ্যাকাশ ম্লান করিতে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ অগ্রসর, তোমার ভাগ্যের সুখ চন্দ্র এক রাহু গ্রাস করিতে উদ্যত, তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ না পাইলে তোমার মঙ্গল নাই। যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি শক্তির তেজ কিছুমাত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাক, ত তাহার নিপাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শক্তির আরাধনা কর; নহিলে মর্ম্মঘাতকের চরণ লাভই যদি তোমার প্রতিশোধের চরম সীমা হয় ত সে অভিপ্রায়ে দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহার অপমান করিবার আবশ্যক কি; তাহার চরণে গিয়া পড়,—সমাদর না পাও, অনাদরও পাইবে, তাহার পত্নী না হইতে পার, উপপত্নীও হইতে পারিবে!"

সন্ধ্যার দৃশ্য আবার তাহার মনে জাগিয়া উঠিল—বিষতেজে শক্তির সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল সে বলিল, "সন্ন্যাসি, থাম, আর বলিতে হইবে না, আমি চাহি না,—তাহাকে চাহি না—"

"চাহিলেও পাইবে না—সে তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না। এখন বল সেই মর্ম্মঘাতীর উপপত্নী হইবে—"

সহসা আর একজন দেবী প্রতিমার পশ্চাদ্দেশ হইতে আবির্ভাব হইয়া সন্ন্যাসীর কথা পূরণ করিয়া বলিলেন "কিম্বা আমার প্রাণেশ্বরী হইবে?"

তখন প্রভাত আরম্ভ হইয়াছে। উষার অস্পষ্ট নবালোকে শক্তি সুলতান পুত্র গায়সুদ্দিনকে চিনিল। রাজকুমার নিকটে আসিয়া তাহার প্রক্ষিপ্ত হস্ত হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন—"সুন্দরি বল; তুমি বঙ্গেশ্বরী হইবে কি না; তোমাকে না পাইলে আমার রাজ্যধন সব মিথ্যা!" মুহূর্ত্তকাল শক্তি বিচলিতমনা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। একদিকে রাজ্য সম্পদ প্রেম সম্মান; অন্যদিকে দারিদ্র্য অপমান অবহেলা। একজন তাহার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতেছে, আর একজনের নিমিত্ত সে সর্ব্বস্ব পণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু কিছুতেই সে তাহার হইবে না। শক্তির নিজের ভাগ্য নির্ব্বন্ধ স্থির করিতে অধিক সময় লাগিল না। মুহূর্ত্তে আত্মস্থ হইয়া দৃঢ় স্বরে বলিল "জাঁহাপনা, আমি তোমারি হইলাম।" রাজকুমার কণ্ঠ হইতে যখন হীরক হার উন্মোচন করিয়া তাহার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন তখন কেবল একবার মুহূর্ত্তের জন্য শক্তির মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িল; বদ্ধ ওষ্ঠাধর কমলদলের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে কম্পিত হইয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যোগিনী শক্তির কথার উত্তর স্বরূপ বলিলেন "পাপের দ্বারা পাপের ক্ষয়, অন্যায়ের দ্বারা ন্যায় সাধন কখন হইতে পারে না।—তাহাতে পাপের ভার, অন্যায়ের ভার বৃদ্ধি পায় মাত্র। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।"

কিন্তু কাহাকে বলিতেছেন! শক্তি কোথায়! তিনি হতাশ্বাস হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন। শক্তি দ্বার মুক্ত রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল, চঞ্চল বাত্যাহত হইয়া কোলঙ্গাস্থিত দীপ সহসা নিভিয়া গেল; বৃক্ষাবলী ব্যবহিত উত্তরাকাশ খণ্ড অমনি যোগিনীর নয়নে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নভোপথে চিরপ্রদক্ষিণ শীল অত্যুজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল; চিরস্থির ধ্রুবতারকার হীন-কান্তি নির্দ্দেশ করিয়া গর্ব্বিত শোভাবৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছিল। যোগিনী শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন "দেবাধিদেব বিশ্বপতি; সত্যই কি আমাদের প্রবৃত্তির উপর, আমাদের কর্ম্মাকর্ম্মের উপর আমাদের কোন হাত নাই? তোমার হাতে আমরা ক্রীড়া পুত্তলী মাত্র। যেমন চালাইতেছ তেমনি চলিতেছি? আমাদের পাপ পুণ্য মঙ্গলা-মঙ্গল সুখ দুঃখের একমাত্র অর্থ একমাত্র উদ্দেশ্য তোমার সৃষ্টি বৈচিত্র্য রক্ষা! তাহা ছাড়া ইহার অন্য কোন অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই? তবে প্রভো কর্ত্তাই বা কে? কর্ম্মই বা কি? কর্ম্মের ফল ভোগই বা কেন? সামান্য ফল ভোগ নহে,—ক্ষুদ্র কর্ম্ম বুদ্বুদ একবার বিকম্পিত সঞ্চালিত হইলে কোথায় তাহার অবসান, কে বলিতে পারে? পিতার কর্ম্ম সন্তান সন্ততিতে বহমান, একের অপরাধে অন্যের শাস্তি! আমার অপরাধে, আমার কর্ম্মফলে কেন প্রভু নিরপরাধ বালিকার এ মর্ম্মদাহ—তাহার সুখহানি! কিম্বা ইহা উপ-লক্ষ মাত্র, তাহারি কর্ম্মফলে আমার নামের সহিত সম্বন্ধ হইয়া নিজের ভাগ্য নির্ব্বন্ধই এইরূপে পূর্ণ করিতেছে?

প্রভু হে তাহাই সত্য; জগতে তোমার অবিচার নাই; যাহার যাহা প্রাপ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় সে তাহা লাভ করিতেছে। আমরা অজ্ঞানমতি, তাই না বুঝিয়া তোমার নামে কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছি।"

যোগিনীর চিন্তা স্তম্ভিত হইল, চিত্তে চিত্ত স্থির করিয়া তিনি নয়ন মুদিত করিলেন,—শত শত নক্ষত্র জ্যোতি তাঁহার মূর্দ্ধাপথে বিভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রচ্ছন্ন গূঢ় প্রহেলিকা তিনি যেন প্রত্যক্ষের মত অভিব্যক্ত দেখিতে পাইলেন। তখন প্রশান্ত আনন্দময় ভাবে মগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বিভুহে, তোমার অপার মহিমা! তোমার সৃষ্টিতে সকলি সার্থক! বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে আর তাহার ক্ষুদ্র অণু পরমাণুটি পর্য্যন্ত কিছুই এ চরাচরে তুচ্ছ নহে, সকলেই সমান উদ্দেশ্যপূর্ণ, সমান মহান্! কেননা সর্ব্বভূতে তোমার সমদৃষ্টি, সকলেতেই তুমি সমভাবে বিরাজমান।

অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্
আত্মাগুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্।

উন্নতিই তোমার সৃষ্টির মূলতত্ত্ব, আর তোমাকে লাভ সকল উন্নতির চরম পরিণতি।

সৃষ্ট জগতের জড়াণু হইতে চেতনাত্মা পর্য্যন্ত এই একই লক্ষ্যে জন্মজন্মান্তরব্যাপী উন্নতি চক্রে বিঘূর্ণিত, ধাবিত হইয়া স্ব স্ব বিকাশ সাধন করিতে করিতে জগতের বিকাশ সাধন করিয়া চলিতেছে। এই উন্নতি-যাত্রায় পাপ পুণ্য প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সুখ দুঃখ কিছুই নিরর্থক নহে। তাহারা ভবসমুদ্রের বিভিন্নরূপী পারনৌকা। তবে কোন পথে কোন নৌকায় কোন যাত্রী এ সমুদ্র পারে যাইবার উপযুক্ত তাহা সর্ব্বজ্ঞ কাণ্ডারী তুমি, তোমার নিকটেই মাত্র বিদিত। ক্ষুদ্র দৃষ্টি আমরা আদিঅন্ত দেখিতে পাই না তাই তুফান দেখিলেই আতঙ্কে মরি।

হে বিপদবারণ কাণ্ডারি, তোমার প্রতি নির্ভর চিত্ত হইলে আর কোন ভয় ডর থাকে না। তুমি পাপ দিয়া পুণ্য ফুটাও, প্রবৃত্তি দিয়া নিবৃত্তিতে লইয়া যাও, নিষ্ঠুর হইয়া করুণা প্রকাশ কর।

তোমার মহিমা অপার অগম্য? তুমি যাহাকে বোঝাও সেই কেবল বোঝে। আমাকে বুঝাও প্রভু কি উদ্দেশ্যে এখনো আমার এ সংসারে স্থিতি! তোমার করুণাবারি সিঞ্চনে যখন এ অধম জীবন ধন্য করিয়াছ তখন জীবনের কোন কাজ আর এখনো অসমাপ্ত?''

যোগিনীর চিন্তায় ব্যাঘাত জন্মিল। প্রথমে অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল, তাহার পর দ্বারদেশে উষ্ণীষধারী অশ্বারোহী যবনের মূর্ত্তি প্রভাতালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়া কহিল, বন্দিগি মায়িজি! কামরার বাহিরে আসুন, বাদশাহের মেহেরবাণী জানাইতে আসিয়াছি।"

মায়িজি দ্বারস্থ হইয়া দেখিলেন অদূরে বৃক্ষতলে একখানি সুসজ্জিত শিবিকার নিকট আরো অনেক সৈন্যসামন্ত লোকজন! তিনি দ্বারস্থ অশ্বারোহীকে বলিলেন—"শিবিকা কেন?"

মুসলমান ওমরাও বলিল—"আমাদের বেগমকে লইবার জন্য। আপনার এখানে যে খবসুরত যুবতী আছেন, তাঁহাকে বাদশাহ সাদি করিবেন; তাঁহাকে লইয়া আসুন।" যোগিনীর স্বাভাবিক শান্ত সংযত ললাটেও বিরক্তির রেখা পড়িল, তিনি বলিলেন "বাদশাহ জানেন না কি যুবতী হিন্দু কন্যা! তাহার সহিত বাদসাহের বিবাহ হইতে পারে না।"

উত্তর হইল—"মুসলমানের হিন্দু বিবাহে বাধা নাই। মুসলমান ধর্ম্ম, উদার ধর্ম্ম, জগতের ধর্ম্ম, সে ধর্ম্ম যাহার, সে লোক সকলকেই আপনার করিতে পারে।

যোগিনী বলিলেন—"কিন্তু যুবতী ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে কেন?"

সে হাসিয়া বলিল—

"নারী জাতির মধ্যে এমন নির্ব্বোধ কেহ নাই, যে বাদসাহকে খসম করিতে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। আপনি তাহাকে লইয়া আসুন, তাহার পর সে বন্দোবস্ত আমরা করিব।"

যোগিনী দৃঢ় স্বরে বলিলেন—"না তাহা হইবে না, তাহার পিতা আমার কাছে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছেন যে পর্য্যন্ত তিনি ফিরিয়া না আসেন সে পর্য্যন্ত আমি তাহাকে তোমাদের নিকট দিতে পারি না।"

ওমরাও বলিল—"আপনি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন!—ইচ্ছা সুখে যদি তাহাকে না দেন ত আমি গৃহে প্রবেশ করিব"। যোগিনী বলিলেন—"প্রজার রক্ষার ভার রাজার হস্তে ন্যস্ত—প্রজার প্রতি অত্যাচারের ক্ষমতা তাঁহার নাই! আমি তাহাকে দিব না, তুমি বাদসাহকে গিয়া বল"। সৈনিক বলিল—"যদি ভাল চাহেন তাহাকে দিন; না দিলে রাজবিদ্রোহী বলিয়া আপনাকে ধরিতে হুকুম দিব—" বলিয়া সৈনিক অশ্বাবরোহণে তৎপর হইল; যোগিনী ইত্যবসরে বিদ্যুদ্বেগে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া কালীমন্দিরের দিকে ছুটিলেন; মন্দিরের নিকটে আসিয়া দেখিলেন যবনহস্তে হস্ত রাখিয়া শক্তি তাহার সহিত একত্রে মন্দিরনির্গত হইতেছে। যোগিনী হতজ্ঞান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শক্তি ও কে?"

শক্তি উত্তর করিল, "যুবরাজ গায়সুদ্দিন, আমার পরিণীত স্বামী।"

যোগিনী চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইলেন,—মুসলমান শক্তিকে লইয়া বনপথে অন্তর্হিত হইল।

* * * *

কিছু পরে যোগিনী নতমুখ উন্নত করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তের নবোদিত অগ্নিরূপ সূর্য্য-গোলকের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সহসা সতেজে বলিলেন—"বিশ্বপতি, আমার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি। এই অত্যাচার অবিচারগ্রস্ত দেশকে উদ্ধার করাই আমার জীবনের কাজ। কেবল আমার নহে, আমাদের উভয়ের জীবনের কার্য্য একই। তাহাকে প্রবৃত্তি পথ দিয়া আমাকে নিবৃত্তি পথ দিয়া একই ব্রতানুষ্ঠানে তুমি নিয়োজিত করিতেছ হে ভগবন! তুমি স্রষ্টা, তুমিই সৃষ্টি; তুমি জ্ঞান, তুমিই মায়া; তুমিই প্রবর্ত্তক, তুমিই নিবর্ত্তক; তুমি কর্ম্ম, তুমিই ফল। এই বুদ্ধিতে প্রবুদ্ধ করিয়া তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিবার তেজ আমাতে অর্পিত হউক। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

স্বরলিপি।

কানাড়া—কাওয়ালী।

আ শেষ।

র২। রপম গো৪। গো২ র১ স১। র২ স১ রস১। ন্২ স২। ম২

আ মা — র প রা ণ — ল য়ে কি

প২। মপ১ ধনো১ নোধ১ প১। মগো১ রস১ স১ রগো১। র৪।

খে লা — — খে লা — — — বে

রনো১ নোধ১ প১ ধ১। পধপ১ ম১ গর১ গ১। ম১ গ১ প১

ও — গো — প — রা — ণ — প্রি

ধপমগ১। ম৩ পমগোর১। গো২ রস১ র১ ॥ প১ ন১ ন২।

— য় — — আ — কো — থা

(আ—প্র)

র্স১ ন১ র্স১ ধ১। নো১ ধ১ নো১ প১। প২ প১ ধপ১।

হ — তে — ভে — সে — কু লে —

ম১ প১ প১ ধ১। নো১ র্স১ ধর্স১ নোধপ১। প১ ধপ১

লে — গে — ছে — চ — র —

ম১ পম১। গো১ র১ স১ রসনোধ১। নো১ রস১ র২।

ণ — মূ — লে — তু — লে

—৪। র১ গ১ ম১ গ১। গম১ পম১ গোর১ সরসনোধ১।

— দে — খি — য়ো — — —

ন্ো১ রস১ র২ । —৪ । র১ গ১ ম১ পধপ১ । ম১ গো১ রস১ র১॥
তু — লে — দে — খি — য়ো — — আ

(আ—প্র)

[ন২ ন২ । ন১ প১ ন২ । র্স১ ন১ রর্সনস২ । র্সন২
এ ল হে — গো তৃ — ণ দ

র্স১ গ১ । গ১ ম১ প১ ধ১ । নো১ র্স১ নোধ১ প১ । প১
— ল ভে — সে — আ — সা — ফু

ধ১ ন১ র্স১ । { ন২ র্গর্রর্সন১ র্স১ । }] ন২ র্স২ । র্স২
— ল — { ফ ল — }]

র্সপ১ গ১ । ম২ প১ পম১ । নো১ ধ১ নো১ ধ১ । নো১ প১
— ল এ যে — ব্য — থা — ভ —

প২ । পধপ১ ম১ প২ । —২ পম১ গ১ । ম২ প১ গ১ । নো১
রা ম — ন — — — এ যে — ব্য

ধ১ নো১ প১ । প১ ধ১ মপ১ ধ১ । প১ ম১ গোর১ সর১ ।
— থা — ভ — রা — ম ন — —

ন্ো১ রস১ র২ ।—৪ । র১ গ১ ম১ গ১ । গম১ পম১ গোর১
ম — নে — রা — থি — য়ো — —

সর১ । ন্ো১ রস১ র২ ।—৪ । র১ গ১ ম১ গমপ১ । ম১ গোর১
— ম — নে — রা — থি — য়ো —

স১ র১ ॥ ম২ প২ । প২ প১ ম । নো১ ধ১ নো১ প১ ।
— আ কে ন আ সে — কে — ন —
(আ—প্র)

পধপ১ ম১ প । —৪ । ম২ প২ । র্স২ নোপ১ মপ১ । মগো৪ ।
যা — — য় কে হ মা জা — নে

র১ স১ র২ । র২ র১ নো১ । ধ১ প১ প১ ধপ১ । মপম১ গো২
— — — কে আ — সে — কা — হা —

ম১ । র২ স২ । স২ ধ২ । ন২ ন২ । র্স৪ । —২ ন২ । [ন২ ন২ ।
য় পা শে কি সে য় টা নে — — [রা

ন১ প১ ন২ । র্স১ ন১ র্রর্সন১ র্স১ । র্সর্রর্স১ ন১ র্স২ ।
য — দি ভা — ল — বে — সে

র্স২ র্র২ । র্র২ র্রর্মগো২ । র্গো১ র্রর্গোম১ র্র১
চি র প্রা ণ পা — ই

র্স১ । { র্র১ র্স১ র্রর্স১ ন১ }] র্র১ র্স১ র্র১ ধ১ ।
— { বে — সে — }] বে — সে —

নো১‿নোধ১ নো১‿নোধ১ । নো১ ধপ১ পধপ১ ম১ । প৪ । প২
ফে — লে — য — দি — যা ও

ম১ ম১ । প২ র্স২ । নো১ প১ ম১ পধ১ । পমগো৪‿ । গো২
ত বে বাঁ চি বে — কি — ও —

রস১ র১ ॥
আ —।
(আ—প্র)

ইংলণ্ডের গার্হস্থ্যজীবন।

২

(বিবাহ ও স্বামী স্ত্রী)

'বিবাহ' শব্দটী অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অর্থ তার এতই দীর্ঘ যে তার আর অন্ত পাওয়া যায় না; অল্প দিন হ'তে ইংলণ্ডের এক খানা প্রসিদ্ধ দৈনিক কাগজে 'ইংরেজ স্ত্রীর উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা' সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড বাদানুবাদ আরম্ভ হয়েছে। এই উপলক্ষে পুরুষপক্ষ হ'তে যে সকল চিঠি পত্র প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে তাঁরা স্ত্রীতে সেই জিনিষটী বিশেষ ক'রে চান যেটী মাইনে করা রাঁধুনী রাখ্‌লে আরও ভাল করে পেতে পার্ত্তেন।

এখন স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ অধিকার আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে ভোগ কর্ত্তে পান। ত্রিশ বছর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিলাসিনীগণ গৃহস্থালীর কোন কাজেই লাগ্‌তেন না; তখনকার দিনে শুধু আদব কায়দারই বাহুল্য ছিল, 'শোভন' হওয়াই তখন প্রত্যেক লোকের জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল; আর নিজেদের সঞ্চরণশীল, প্রাণহীন প্রাণীতে পরিণত ক'রে তবে সেই লক্ষ্য সাধিত হোত। তখনকার দিনে উচ্চহাস্য ছোটলোকের লক্ষণ ছিল; কি কি রান্না হয়েছে তার খবর রাখা ততোধিক 'ছোটলোকত্ব', তবে স্ত্রীলোক ঠাকুরমার শ্রেণীতে 'প্রোমোসন' পেলে পর যদি তিনি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেন তাহ'লে কেউ কিছু মনে কর্ত্ত না; এরকম অবস্থা কিছু চিরকাল থাকতে পারে না তাই তার একটা তুমুল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, এখন সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক সমস্ত কাজই করে থাকেন, আর এই জন্যই তাঁরা এখন পুরুষের উপযুক্ত সঙ্গিনী হয়েছেন।

আজ কালের দিনে পুরুষেরা এতেও সন্তুষ্ট নন, তাঁরা খাঁটি 'রাঁধুনী স্ত্রী' চান; এই শ্রেণীর জীবেরা বলেন "যদি তোমরা দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা পছন্দসই রকমে চালাতে পার ত সুনজরে থাক্‌বে।"

ইংলণ্ড এবং অপর দেশের স্ত্রীদের মধ্যে তুলনায় কারা ভাল, এবিষয় নিয়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান দৈনিক পত্র টাইমসে যথেষ্ট আন্দোলন চলছিল। এ সম্বন্ধে একজন ভদ্রলোক আমাদের যে উপদেশ দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা যাক্‌।

"হে ইংলণ্ডের রমণীমণ্ডলি, তোমরা কেতাব, পিয়েনো এবং ঐ রকমের অকর্ম্মণ্য দ্রব্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাদা তোয়ালে গলায় জড়িয়ে রান্না ঘরে আনাগোনা আরম্ভ ক'রে দাও; আগে থেকে পারিবারিক সুখের গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষিত হও, তারপর পূর্ণোদর সুতরাং

হৃষ্টচিত্ত স্বামী মহোদয়বর্গের উপর মহোল্লাসে জয় পতাকা উড্ডীন ক'রে বিদেশী প্রতিদ্বন্দিনীদিগের হস্ত হ'তে নিজ নিজ সত্ব রক্ষা কো'র।”—অতি উত্তম প্রস্তাব—পুরুষদের পক্ষে!!

এখন দেখা যাক্ বিবাহিত জীবন সুখে অতিবাহিত করবার জন্যে এ দেশের স্ত্রীপুরুষ কিরকম শিক্ষা পেয়ে থাকে; চিরাগত কায়দার অনুরোধে আগে মেয়েদেরই কথা আলোচনা করা যাক্।

সচরাচর বিলাতী বালিকা যতটুকু লেখাপড়া শেখে তাতে ক'রে তাদের মনে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি অনুশীলনের স্পৃহা অনেকটা বলবতী হয়; সাধারণতঃ মেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া শেখে। কিন্তু স্কুলেই হোক আর বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রীর কাছেই হোক আট হতে আঠার বছর বয়স পর্য্যন্ত তাদের লেখাপড়াতেই কেটে যায়। তার পর তাঁরা 'বাহিরে' আসেন, অর্থাৎ সভ্যসমাজের আমোদ আহ্লাদ, নাচগান, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে যোগ দিতে আরম্ভ করেন; যদি তাঁদের আমুদে মহলেই অধিক গতিবিধি হয় তবে তাতেই সব সময় কেটে যায়।

এই গেল একরকমের মেয়ের নমুনা; আর একদল মেয়ে স্কুল ছেড়েই গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মে যোগ দেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুচি অনুযায়ী বিষয়-বিশেষের শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। শিক্ষাজনিত মানসিকসুগঠন বশত সেই সময়ের সকল প্রকার আন্দোলনেই তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং ক্রমে ক্রমে চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা তাঁরা চিন্তাশীলা, বুদ্ধিমতী, সুরুচিসম্পন্না এবং মনোরম সঙ্গিনী হয়ে উঠেন; মেয়েদের সম্বন্ধে “অলমতি বিস্তরেন।”

এখন একবার পুরুষ মহাশয়দের কথা উত্থাপন করা যাক্। তাঁরাও প্রথমে স্কুলে লেখাপড়া শেখেন তারপরে কেহবা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, আর যাদের ব্যবসা বাণিজ্য ক'রে খেতে হয় তারা কোন আফিসে 'শিক্ষানবিশী' কর্ম্মে আরম্ভ করে; তাদের দিন একরকম মহানন্দে কেটে যায়, তারা আপনাতে ও আপনার আমোদ প্রমোদ ছাড়া আর কিছুতে বড় মন দেয় না এবং নিজের প্রতি অটল বিশ্বাসভরে লঘুপদক্ষেপে লঘুহৃদয়ে পৃথিবীতে বিচরণ ক'রে বেড়ায়।

হঠাৎ এক শুভদিনে কোন সান্ধ্যসমিতিতে এই প্রকার এক পুরুষরত্নের সঙ্গে কোন কুমারীর সাক্ষাৎ হ'লো, চারি চক্ষুর সম্মিলনে উভয়েরই “কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!” যুবকটি যুবতীর গৃহে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ কল্লেন; যদি বর কন্যাকর্ত্তার মনোনীত হয় তাহ'লে এরকম যাতায়াতে তাঁরা উৎসাহ প্রকাশ ক'রে থাকেন, তারপর কন্যাকার্ত্তা যদি যৌতুক দান বিষয়ে বদান্যতা দেখাতে কুণ্ঠিত না হন তাহলে ঘনিষ্ঠতা আরো বৃদ্ধি হয়; যুবক ভাবেন এমন সঙ্গিনী আর মিলবে না, যুবতীর মনের ভাবও তদ্রূপ। তাদের উভয়ের অনেক বিষয়ে মতের মিল দেখা যায়; তারা একই গ্রন্থকারের

ভক্ত; এবং কোন কোন বিষয়ে বা বেশ সৌহার্দ্যভাবে মতভেদ হয়ে থাকে। এবং মাসেক দুমাস কি তারচেয়েও কম দিনের মধ্যেই উভয়ের বিবাহ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য এই কদিন উভয়েই পরস্পরের নিকট নিজের চরিত্রের উৎকৃষ্টতম দিকটাই উন্মুক্ত করে রেখেছিলেন। যাহোক প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ শেষ হলে অভূতপূর্ব্ব স্বপ্নাতীত আনন্দোচ্ছ্বাসে কতক দিন বেশ কেটে যায়। কিন্তু শীঘ্রই এই আনন্দের জের কমে আসে; যুবতীর মনে প্রথম আঘাত লাগে সে যখন বুঝতে পারে যে যে উপায়ে প্রথমে সে তার স্বামীর মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছিল এখন তাতে আর চোলবে না, এবং গৃহস্থালীর ব্যাপারে আনাড়ী হয়ে শুধু বুদ্ধিগত সখিত্ব কোন কাজের কথা নয়। যুবতীর সম্মুখে এখন দুই পথ খোলা, হয় তাকে একটু তফাতে থেকে তার কুমারী জীবনে যেরকম বিদ্যানুরাগী ছিল সেই বিদ্যানুরাগ রক্ষা করে চলতে হয়, কিম্বা নিজেকে পুরুষজাতির বিবাহের পরস্তন আদর্শরমণীতে পরিণত কর্ত্তে হয়—সে উচ্চ আদর্শটা হচ্ছে একাধারে রাঁধুনীগৃহিণী!

এতকাল প্রজাপতির মত আনন্দময় জীবন কাটিয়ে এসে শেষে তার রূপগুণের এমন একটা অনাদর সে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ কর্ত্তে পারে না, গৃহে অন্যের দাসত্ব করা তার স্বভাব নয়, বিনা প্রতিবাদে এ ব্যাপার সহ্য কর্ত্তেও সে রাজী নয়, কাজেই গুটীপোকার মত সে নিজের আবরণ ভেদ করে বাহির হয়ে আর তার ভিতরে প্রবেশ কর্ত্তে ইচ্ছা করে না। বুদ্ধিমতী বালিকা স্বামীপ্রদর্শিত বৃত্তি অবলম্বন কর্ত্তে সম্পূর্ণ নারাজ, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝাতে চায় যে তার বিদ্যাবুদ্ধি কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হবার উপযুক্ত; কিন্তু তার বিদ্যাও গুণপনার সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি থাকে তাহলে সে একথাও স্বীকার করে যে যদি গৃহস্থালীর কাজের তত্ত্বাবধান কর্ত্তে গেলে লেখাপড়ার চর্চ্চার কিছু অসুবিধা হয় তত্রাচ তাতে জ্ঞানপ্রবৃত্তির চর্চ্চার একটা মারাত্মক ক্ষতি হয় না।

স্বামী মহাশয়েরা খবরের কাগজে স্বার্থপূর্ণ বড় বড় অকেজো প্রবন্ধ লিখে প্রতিপন্ন কর্ত্তে চান যে রান্না ও গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করাই হচ্ছে তাঁদের স্ত্রীগণের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহা পুরুষজাতির মানসিক অবনতির এক বিস্ময়জনক অভিব্যক্তি। যখন পুরুষেরা বিবাহ করেন তখন তাঁরা বিদ্যাচর্চ্চা বুদ্ধিবৃত্তিপরিচালনেচ্ছা ও নিজ নিজ প্রিয় বস্তুগুলি কি বিসর্জ্জন করে থাকেন? কখনই না, অন্ততঃ যাঁরা একটু বুদ্ধির ধার ধারেন তাঁরা ত কিছুতেই তা পারেন না। তা হলে একজন যুবতী বিবাহ করেছে শুদ্ধ এইমাত্র অপরাধে তার যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ কোরবে এ কিরকম যুক্তির কথা? রমণীর অদৃষ্টে এই রকম অবুঝ স্বামী জুটলে সে শীঘ্রই বুঝতে পারে গৃহে তার গুণের আদর হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কবিগণ যে গৃহকে বিরাম মন্দির ভেবে শতমুখে তার মহিমা কীর্ত্তন করেন সেই গৃহ তখন তার কাছে নিতান্ত অশান্তির আলয় বলে মনে হয়।

গৃহিণীদের আর এক কণ্টক দাসদাসীর; কর্ত্তামহাশয়েরা আবার অহরহ "বেবন্দোবস্ত" "বেবন্দোবস্ত" করে চীৎকার করে সেই কণ্টকটী আরও বেশীদূর প্রবেশ করিয়ে দেন।

বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে মেয়েরা মানসিক উন্নতির দিকে বেশীমাত্রায় মনোযোগ দেওয়ায় গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম সুশৃঙ্খল ভাবে চোলচে না, এদিকে সমস্ত জিনিষ এমন কি স্ত্রীপর্য্যন্তও নিজেদের সেবা ও সুখবৃদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয়েছে ইহাই পুরুষ জাতির ধ্রুব বিশ্বাস হওয়াতে তাঁরা স্ত্রীজাতির মানসিক উন্নতি দেখতে নারাজ হয়ে শুধু রাঁধুনী স্ত্রীর জন্য চীৎকার আরম্ভ করেছেন! যে মেয়েগুলি বেশ বুদ্ধিমতী ও শিল্প সাহিত্যে অনুরাগিণী, বিবাহ করবার সময় বরেরা বেছে বেছে তাঁদেরই পছন্দ করেন, কিন্তু বিবাহের পর তিন দিন যেতে না যেতে পুরুষরত্নেরা সেই বহু আয়াসলব্ধ পত্নীদিগকে অনন্যকর্ম্মা হয়ে তাঁদের দগ্ধোদরপূর্ত্তির আয়োজনরূপ মহাব্রতে প্রাণ মন সমর্পণ কর্ত্তে বাধ্য করা উচিত মনে করেন।

এই জাতীয় স্বামী স্ত্রী কাকেও দেখে করুণার উদ্রেক হয় না; স্বামী বিবাহ করেন শুধু স্ত্রীর রূপ আর চা'ল চলন দেখে, কিন্তু তাতেত আর সংসার চলে না। স্ত্রী বিবাহ করেন গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হবার প্রলোভন সম্বরণ কর্ত্তে না পেরে, কিন্তু গিন্নি হতে গেলে, যে সব ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে নিতে হয় তিনি তা থেকে স'রে দাঁড়াতে চান, কাজেই উভয়ে নিজ বুদ্ধির দোষে কষ্ট পায়, কে তাদের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাবে?

অনেক সময় এমন হয় যে কোন অভিন্নহৃদয় যুবক যুবতী পরস্পরের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং কর্ত্তব্যসম্পাদনে সাহায্য ক'রে থাকে, এরকম বিবাহ হ'লে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সে কালের ভাব পরিবর্ত্তন হওয়ায় এখন স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই কিছু কিছু ত্রুটি দেখা যায়। এই প্রবন্ধের আরম্ভেই উল্লেখ করেছি যে এখন স্ত্রীলোকের আদর্শ পুরুষের চক্ষে অপেক্ষাকৃত হীন হয়ে পড়েছে, এদিকে স্ত্রীলোকেরাও সেকালের কুপ্রথা হতে দূরে থাক্‌তে গিয়ে ভুলে যাচ্ছেন যে গৃহস্থালীর কতকগুলি কাজ আছে যা শুধু মেয়েদের দ্বারাই ভাল করে সম্পন্ন হতে পারে, আর কতকগুলি পুরুষেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফরাসী এবং জর্ম্মাণদেশীয় স্ত্রীগণের সঙ্গে আমাদের তুলনা কর্ত্তে গিয়ে অনেকে সেই দেশের পুরুষগণকেই উচ্চ আসন প্রদান করে থাকেন। জর্ম্মাণদেশীয় স্বামীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নেই, তবে ফরাসী স্বামীগণ সম্বন্ধে একথা বেশ বলা যায় যে তাঁদের আর যে দোষই থাক, ঘর গৃহস্থালী কোর্ত্তে গেলে গিন্নিদের যে কত জ্বালা সহ্য কর্ত্তে হয় সে বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান আছে, আর সেই জন্যই তাঁরা গৃহিণীদের যথাসাধ্য সাহায্য করে থাকেন। সে যাই হোক সবদিক ভেবে দেখলে বিবাহিত জীবনের সুখের সম্ভাবনা ইংলণ্ডেই সবচেয়ে বেশী মনে হয়, তবে যে গোলযোগ বাধে সে স্বামীমহাশয়দের দোষে, তাঁদের বদ্‌ফর মাইসের জ্বালাতেই স্ত্রী বেচারীরা অবাধ্য হয়ে উঠে। স্বামী স্ত্রীতে বণিবনাওএর অভাব থেকেই প্রণয়ের অভাব হয় আর প্রণয়হীন বিবাহ দুর্ব্বহ শৃঙ্খল ব'লে মনে হয়।

মিস্ এ, এফ, মরিস্।

বেদগান।

(ত্রিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবে গীত।)

বশিষ্ঠ ঋষি, মং ৭, অং ৫, সূং ৮৯, ২ ইঃ।

—গৃৎসমদ ঋষি, মং ২, অং ৩, সূং ২৮, ৬ ইঃ।

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥১

বায়ু-চালিত মেঘের ন্যায় যদি আমি চঞ্চল ভাবে ধাবিত হই তবে হে সর্ব্বশক্তিমন্ আমাকে কৃপা কর, আমাকে কৃপা কর।

ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥২

দীনতাবশতঃ আমি প্রতিকূলে উপনীত হইয়াছি, হে ঐশ্বর্য্যবন্, নির্ম্মল পুরুষ, আমাকে কৃপা কর, হে ঈশ্বর, আমাকে কৃপা কর।

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদ জ্জরিতারম্। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥৩

জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা আক্রমণ করিয়াছে। কৃপা কর হে ঈশ্বর আমাকে কৃপা কর।

যৎকিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যা শ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুযোপিম মা ন স্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥৪

হে বরুণ, যখন আমরা দেবতাদিগের সমক্ষে বিদ্রোহাচরণ করি, অজ্ঞান বশতঃ তোমার ধর্ম্মলঙ্ঘন করি তখন হে দেব, সেই পাপ হেতু আমাকে বিনাশ করিও না; আমাকে ক্ষমা করিও।

অপোসুম্যক্ষ বরুণ ভিয়সং মৎ সম্রাড্ ঋতাবোনু মা গৃভায়।
দামেব বৎসাদ্ বিমুমুগ্ধ্যংহো নহি ত্বদারে নিমিষশ্চনেশে ॥৫

হে বরুণ, আমার ভয় দূর কর। হে সত্যবন্ সম্রাট্, আমার প্রতি কৃপা কর। গোবৎসের বন্ধনের ন্যায় আমার পাপ সকল বিমোচন কর। তোমাকে ছাড়িয়া কেহ এক নিমেষ কালেরও প্রভু নহে।

মা নো বধৈ র্বরুণ যে ত ইষ্টা বেনঃ কৃণ্বন্ত মসুর ভ্রীণন্তি।
মা জ্যোতিষঃ প্রবসথানি গন্ম বি ষু মৃধঃ শিশ্রথো জীবসে নঃ ॥৬

যাহারা তোমার প্রিয়কার্য্য-অনমুষ্ঠানজনিত পাপে লিপ্ত হয় তাহাদিগকে তোমার যে সকল অস্ত্র তোমার ইচ্ছামাত্র হনন করে হে বরুণ সেই অস্ত্র সকল আমার প্রতি

নিক্ষেপ করিও না। আমাকে জ্যোতি হইতে নির্ব্বাসিত করিও না। হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও যাহাতে আমি জীবন ধারণ করিতে পারি।

নমঃ পুরা তে বরুণোত নূনম্ উতাপরং তুবিজাত ব্রবাম॥
ত্বে হি কম্ পর্ব্বতেন শ্রিতান্য প্রচ্যুতানি দূলভব্রতানি ॥৭

পুরাকালে তোমার স্তবগান করিয়াছি, অদ্যাপি তোমার স্তবগান করিতেছি, আগামী কালেও হে সর্ব্বপ্রকাশ তোমার স্তবগান করিব। হে দুর্দ্ধর্ষ, তোমাকে আশ্রয় করিয়া অটল ধর্ম্মনিয়ম সকল যেন পর্ব্বতে খোদিত হইয়া রহিয়াছে।

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানিমাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং।
অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সী রুষাস আ নো জীবান্ বরুণ তাসু শাধি ॥৮

আমার কৃত পাপ সকল দূর করিয়া দাও রাজন্। অন্যকৃত পাপের ফলও যেন আমাকে ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা এখনো অনুদিত রহিয়াছে হে বরুণ, সেই সকল উষায় জীবিত রাখিয়া আমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দাও।

স্বরলিপি।

রাগিণী ভূপালী—তালফের্তা।*

(আ)

স১ । র২ প১ প১ । গ৪ । গ২ ধ১ প১ । —১ গ১ র১ স১ ।
য দে — — মি প্রস্ ফু রন্ — নি ব দৃ

স২ স২ । ধ্২ স২ । ন্২ র১ স১ । স৪ ॥ স২ র্স২ । —৪ । ন১
তির্ নধ্ মা তো অ দ্রি ব হ মৃ ড়া — স্থূক্

(শেষ)

ধ২ । প২ মী১ ধ১ । প৩ স১ ॥[গ২ গ২ । গ১ গ১ গ১ গ১ । —১
ষ ত্র মৃ ড় র য [ঋ ত্বঃ স ম হ দী —

(আ—প্র)

র১ স্২ । ন্১ স২ ন্১ । —১ স১ র১ গ১ ।{ —১ র১ স১
ন তা প্র তী পং — জ গ মা { — শু চে

---

* ইহার তৃতীয় শ্লোকের প্রথমাংশের তাল শুধু রূপক, বাকী সমুদায় কাওয়ালী।

র১। }]—১ র১ স২। স২ র্স২ ।—৪। ন২ ধ২। প২ মী১
— . }]— শু চে মৃ ড়া — স্থক্ ষ ত্র · মৃ

ধ১। প৩ স১ ॥ গ১ প২। প২ ধ২। প২ ধ১। প২ ধ২। প২ ধ১।
ড় য় য অ পাং ম ধ্যে ত স্থি বাং সং ভূ ষ্ণা
(আ—প্র)

—২ র্স১ র্স১। স২ র্স১। র্স১ র্স১ ন১ র্র১। র্স৩ ।—৪ ॥ গ২
— — বি দ্ব জ্ব রি তা — — রম্ — মৃ

গ২। —৪। গ২ র২। স২ ন্২ র২ । স৪। স২ র্স২ ।—৪। ন২
ড়া — স্থক্ ষ ত্র মৃ ড় য় মৃ ড়া — স্থক্

ধ২। প২ মী১ ধ১। প৩ স১ ॥ গ২ গ২। প২ প২। মী১ প২
য ত্র মৃ ড় য় য যৎ কিন্ চে দং ব ন্ধ
(আ—প্র)

মী১। গ২ ধ২। প১ মী২ গ১। —১ র২ স১।—১ স১ স২।
ন দৈ ব্যো স্ব নে ভি — দ্রো হং — ম স্থ

স৩ স১। স২ স১ স১। —৩ স১। ধ্২ স২। ন্২ গ১ র৩। স২
ষ্যা শ্চ রা ম সি — অ চি ন্তো যৎ ত ব ধ

স১ স১। স২ স১ স১। র২ গ২। গ২ প২। প২ ধ১ ধ১।
র্মা যু ন্মো পি ম মা নস্ তস্ মা দে ন সো

-১ ধ২ র্স১। র্স১ ন১ র্র১ র্স১। র্স৩ স১ ॥ স১ স৩। স২
— দে ব রী — রি ষ হ য অ পো স্থ
(আ—প্র)

স২ । স১ স১ স২ । স১ স১ স১ স১ । —১ স২ স১ । —১ স২ র১ । গ৪ ।
ম্যক্ ষ ব ন্ধ ণ ভি য় সং — মৎ সম্ — রাড খ্ব তা

র৩ স১ । ন্৩ র১ । স২ স২ ॥ [গ২ গ২ । গ১ গ২ গ১ । —১ গম১ মগ১
বো স্থ মা গৃ ভা য় [দা মে ব বং সা — — —

র১ । রগ১ র১ স১ স১ {—১ সর১ সর১ গ১ । }]—১ স৩ । স১ র২
দ্ বিবু যূ — গ্ধ্যং {— হো — — }]— হো ন হি

গ১ । প২ ধ২ । প১ স´১ ধ২ । প১ প২ গ১ । —৩ পপ১ । গ২
ত্ব দা রে নি মি শষ্ চ নে শে — — দা

গ২ । গ১ গ২ গ১ । —১ গম১ মগ১ র১ । রগ১ র২ স১ । —১ স৩ ।
মে ব বং সা — — — দ্ বিমু মু গ্ধ্যং — হো

স১ র২ গ১ । প২ ধ২ । প১ স´১ ধ২ । প১ প২ গ১ । —৪ ॥
ন হি ত্ব দা রে নি মি যশ চ নে শে —

গ২ প২ । প১ ধ২ প১ । ধ২ প১ ধ১ । —১ প১ ধ২ । স´১
মা নো ব ধৈ ব ন্ধ ণ যে — ত ইয টা

স´২ । স´২ স´২ । স´২ স´১ স´১ । স´১ স´২ স´১ । —১
বে ণঃ ক্বণ স্বন্ ত ম স্থ র ভ্রী —

ন১ র´২ । স´৪ । গ´১ । র´২ স´১ স´১ । —১ ন১ র´১ স´১ ।
— নন তী মা জ্যো তি ষঃ — প্র ব স

স´২ স´১ স´১ । —১ ধ১ ধ১ ধ১ । প১ প২ গ১ । — প১
থা নি গন্ — ম বি মু মূ ধঃ শি — শ্র

গ২ । র২ স১ র১ ।—১ র১ গ২ । —৪ । গ১ গ২ গ১ । গ২ গ২ । গ১ গ২
থো জ ব সে — ন হ ন মঃ পু রা তে ব ন্ধ

গ১ ।—১ গ১ গ২ । গ২ গ১ প১ । প১ প১ প২ । প১ প১ প২ ।
গো — ত নূ নম্ উ তা — প রং তু বি জা

প২ প১ প১ ।—২ প১ প১ ।—১ ধ১ ধ২ । ধ২ র্স১ র্স১ ।—১
স্তব ব্র বা — ম ন্ত্বে — হি কম পর্ ব তে —

র্স২ র্স১ । র্স২ র্স২ ।—১ স২ র১ । গ২ গ২ । ধ২ প১ প১ ।
ন শ্রি তা ন্থ প্র চ্যু তা নি দূ ল ভ

—১ স১ র২ । গ৪ ॥ স১ স১ স১ স১ ।—৪ । স২ স২ । স১ স১
— ব তা নি প র শ্ব ণা — সা বী র ধ

স২ । স১ স২ স১ । স২ স২ । স২ র২ । র২ গ১ গ১ । গ২
মং ক্ষ তা নি মা হং রা জন্ ন ন্য ক্ষ তে

র১ ন্১ । র১ স৩ ॥ স২ র২ । প২ মী১ প১ । গ২ র১ র১ ।
ন ভো — জং অ ব্যষ্ টা — — ইন্ দ্র ভূ

গ১ র১ স২ । গ১ র২ স১ । স২ স২ । গ২ র২ । স১ স২ স১ ।
— য় সী রু ষা স আ নো জী বান্ ব রু ণ

ধ্২ স২ । ন্২ র১ স১ ।—১ গ১ র২ । প১ মী২ ধ১ । প২ র্স২
তা স্থ শা — — — — — — — — — —

ধ২ প২ । গ২ র২ ।—২ ন্২ । র৩ স১ । স৩ স১ ।
— — — — — — — — ধি ষ

(আ—প্র)

শ্রীসরলা দেবী।

মেঘদূত।

১

পুণ্য-স্মৃতি বিক্রমের গৌরব-মুকুটে,
পদ্মরাগ-মণি তুমি হে অমর কবি,
বাসন্তী উষার চারু জ্যোতি তায় ফুটে,—
কল্পনা-ত্রিদিবে জাগে সুষমার ছবি!

২

স্ফটিক-অলকা-কোলে মণি-গৃহ-মাঝে,
ওই যে বিদগ্ধ-প্রাণা যক্ষের রমণী,
ঢেকেছে লাবণ্য-রাশি বিরহের সাজে,
নিদাঘে কুসুম-প্রায় মলিন-বরণী;
পতি তার ওই দূর ভূধর-আবাসে,
প্রভু-শাপে বহে হৃদে গুরুভার ব্যথা,
কাতরে যাতনা বলি জলধর-পাশে,
যাচে তায় বনিতায় লইতে বারতা;
দুদিকে প্রেমের ছবি, আকুলি বিকুলি,
পুরুষের বেদনায় প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস,
রমণী নীরবে ধরে বুকে ব্যথাগুলি,—
বিবর্ণ অধর চারু, মরম-নিশ্বাস!
অন্তরিত তনু দুটি; কিন্তু দুটি মন,
অতিক্রমি বাধা, বিঘ্ন, গিরি, বন, নদী
হইয়াছে আঁখিনীরে সুদূরে মিলন,
স্বপ্ন আলিঙ্গনে বাঁধা আছে নিরবধি!
প্রাবৃটে প্রকৃতি সহে বিরহ-বেদনা,
কিবা কথা মর-ধামে যাহাদের বাস,—
হৃদি-ভাঙা ব্যথারূপে তড়িত দেখনা,
ভরেছে ধরণী প্রাণ, ভরেছে আকাশ;
অসহ্য বাসনা যবে মিলনের তরে,
উদ্বেল উচ্ছ্বাসে যেন ভাঙে ভাঙে বুক,
দূরতার অন্তরায় অতিক্রম করে,'

বিদ্যুৎ-চমকে চুমে এ উহার মুখ!
বিরহের চির-নব এ পুরাণ কথা
গাহিলে হে কবিবর, পিকবর প্রায়,
ঢালে সে ঝঙ্কারে যথা পরাণের ব্যথা,
ঢালিলে বিষাদ-গান মধুর ভাষায়।

৩

বিরহ কি শুধু ব্যথা,—কেবলি বেদন?
না, না, কবি, তুমিইত দিয়াছ বলিয়া,
শ্রান্ত মদনের সে যে আবেশ-স্বপন,—
জাগে রতিপতি বল দ্বিগুণ লভিয়া;
প্রণয়-তরুর সেযে রবির কিরণ,
প্রণয়-তরুর সেযে বরষার ধারা,
প্রণয় তরুর সেযে বসন্ত পবন,
বাড়ে তায় গোড়া বাঁধি প্রণয়ের চারা।
বেদনা ত বটে তায়,—কিন্তু কি মধুর!
অন্ধকারে চামেলির সৌরভ যেমতি,
নিশীথ-সমীরে কিম্বা বাঁশরীর সুর,
পরাণ আকুল করে,—বিরহে তেমতি।

৪

কাঁদিছ কি যক্ষবালা,—কেঁদনা, কেঁদনা,
ভাল কি বাসনা তুমি বিচ্ছেদ বেদনা?

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

নূতন ধরণের উপন্যাস।

আমরা আটজন লোকের নিকট হইতে নববর্ষের স্বপ্নের তৃতীয় পরিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ভাষাবিন্যাস ভাল হইয়াছে কিন্তু তাহাতে উপাখ্যান অংশ কিছুই অগ্রসর হয় নাই। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসুর লেখার শেষ অংশে উপাখ্যানের অনেকটা সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু রচনাটি আদ্যোপান্ত তেমন প্রশংসা-

যোগ্য হয় নাই; এই কারণে আমরা উভয়ের লেখা মিশ্রিত করিয়া লইলাম এবং পুরস্কার সমান ভাগ করিয়া দেওয়া গেল।

আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে যিনি ইহার সর্ব্বোত্তম চতুর্থ পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠাইবেন, তাঁহাকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতরূপ পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

নববর্ষের স্বপ্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বাড়ী ফিরিলাম বটে কিন্তু যেমনটি গিয়াছিলাম তেমনটিই কি ফিরিলাম? অন্যকে ফাঁকি দিতে পারি কিন্তু নিজেকে ফাঁকি দেওয়াটা তত সহজ নহে, কাজেই বুঝিলাম একটু একটু করিয়া আমি অনেকটা হারাইয়া গিয়াছি। বাড়ী আসিয়া কিছুই ভাল লাগিল না, সন্ধ্যার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরে কেরোসিনের আলো জ্বলিতেছে; সকালে টেনিসনের কবিতাবলী পড়িতেছিলাম, চাকরের কথা শুনিয়া বইখানি টেবিলের উপর খুলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, আসিয়া দেখি সেখানি সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। যা যেখানে ছিল সমস্তই ঠিক্ ঠাক আছে কিন্তু এই বারো ঘণ্টার মধ্যে আমার মনো-রাজ্যেই এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। অন্যমনস্ক ভাবে একখানা পুস্তক খুলিয়া দুই চারি লাইন পড়িলাম কিন্তু কিছু অর্থ বোধগম্য হইল না। বিরক্তভাবে সে খানি টেবি-লের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘরের বাহিরে আসিলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অনন্ত অন্ধকার তাহার নীরব পক্ষপুটে জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া রুদ্ধনেত্রে পড়িয়া আছে, কেবল দূর আকাশে লক্ষ লক্ষ তারকার স্তিমিত দৃষ্টি, নিকটস্থ পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে তাহাদের বিমল শ্বেত জ্যোতি প্রতিফলিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকের জন কোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে, আমাদের বাড়ীর কাছে যে মুদীর দোকান আছে সেখানে শুধু একজন লোক একটি মৃৎপ্রদীপের ক্ষীণালোকের কাছে বসিয়া সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতেছে আর দশবারো জন লোক বিস্ময় বিহ্বল চিত্তে সেই কাহিনী শুনিতেছে; আমি ধীরে ধীরে পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া বসিলাম। বাঁধা ঘাটের ধারে একটা ঝিঁ ঝিঁ তার নৈশ সঙ্গীতের আখড়া ভারি জমাইয়া লইয়াছিল, আমার পদ-শব্দে সে সঙ্কুচিত হইয়া তাহার গীতধ্বনি খানিক বন্ধ রাখিল কিন্তু শীঘ্রই আবার পূর্ণোৎসাহে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বালিকার সেবা করিতে পারিলাম না কেন? আসিবার সময় তাহার চেতনা দেখিয়া

আসি নাই, তাহার মুখ তেমনি মলিন, তেমনি ক্লিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছি; যদি তাহার চেতনা দেখিয়া আসিতে পারিতাম; যদি সেই ধূলিম্লান যূথিকাকুসুমের ন্যায় নিষ্প্রভ ওষ্ঠে এক বিন্দু হাসি দেখিয়া ফিরিতে পাইতাম ত জীবনকে ধন্য মনে করিতাম। আবার মনে হইল, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, তাহার জন্য আমি এত কাতর হই কেন? এই বৃহৎ নগরে ত প্রতিদিনই একটা না একটা এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। কত অনাথ শিশু মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছে, কত অনাথিনী অনাহারে পথিপার্শ্বে পড়িয়া আছে, ক্ষুধায় ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে, তাহাদের মুখে বিন্দুমাত্র জল দেয় এমন লোক কেহ নাই, তাহাদের জন্য ত আমার প্রাণ কাঁদে না। ব্যথা দেখিয়াই যদি আমার এ যাতনা, তবে ব্যক্তিবিশেষের ব্যথাতেই এ রুদ্ধ যন্ত্রণা ফুটিয়া উঠে কেন? কিন্তু আমি আপনাকে বুঝাইতে পারিলাম না, শুধু সেই সুন্দর মুখ, নৈশকমলের ন্যায় অবরুদ্ধ সেই ম্লান নয়ন মনে পড়িতে লাগিল। যদি তাহার আঘাত সাংঘাতিক হয়! আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সহসা আমার চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইল, শুনিলাম আমাদের চাকর উচ্চৈঃস্বরে "ছোট বাবু ছোট বাবু" করিয়া ডাকিতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া আমি ঘরে ফিরিলাম, ঘড়িতে দেখি দশটা বাজিয়াছে! অন্যমনস্কভাবে আহার করিতে বসিলাম, নাম মাত্র খাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আমার আকার প্রকারে বোধ করি কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কারণ মা আহারের শেষাশেষি আসিয়া, আমাকে দেখিয়া একটু বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন "তোর কি কোন অসুখ ক'রেছে", আমি 'না' এইমাত্র বলিয়াই উঠিয়া আসিলাম। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না, শেষ রাত্রে অল্প নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল কিন্তু সে নিদ্রা স্বপ্নময়; স্বপ্নেও সেই মলিন মুখ ও নিমীলিতনেত্র দেখিতে পাইলাম। কিন্তু স্বপ্নে সব ঠিক দেখা যায় না, দেখিলাম ধীরে ধীরে নেত্র উন্মীলিত হইল এবং সেই কাতর নেত্রের ব্যাকুল দৃষ্টি আমার মুখের প্রতি প্রসারিত হইল, যেন দুই বিন্দু অশ্রু ও একটি বিষাদকম্পিত নিশ্বাস তাহার সাগ্রহ উপহার!

পরদিন প্রভাতে পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য উঠিল, এবং পৃথিবীর প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল, শুধু আমারই জীবন উদ্দেশ্যশূন্য, আগ্রহশূন্য মনে হইতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য! পৃথিবীতে সকলই নবীন, সকলই উৎসাহময় আর আমিই সহসা এই নবীন জীবনে অত্যন্ত বৃদ্ধ ও কর্ম্মহীন হইয়া পড়িলাম; জীবনের সমস্ত আশা ও সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ভাসাইয়া সেই পীড়িতা বালিকার কথাই মনে জাগিতে লাগিল। বেলা ৩টার সময় রামবাবুর সঙ্গে দেখা হইল, তিনি বলিলেন "মেয়েটি অনেক ভাল আছে, তার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেছ ব'লে নরেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রেছেন।" আমি কোন উত্তর না করিয়া একদিকে প্রস্থান্ করিলাম।

সাতদিন পরে নরেন্দ্রবাবু আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বেলা ১১টার সময় আমি আহারার্থে সেখানে উপস্থিত হইলাম; আমার কাকার বন্ধুর বাড়ী, সেখানে আমার স্বচ্ছন্দগতিবিধিরই কথা, কিন্তু আমি নিজে কিছু লাজুক শ্রেণীর লোক, তাই চুপে চুপে

চোরের মত বাহিরে গিয়া বসিলাম; নরেন্দ্রবাবু তখন একটা ইংরাজী কাগজ পড়িতে-ছিলেন। আমি উপস্থিত হইতেই সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং মধুরস্বরে বলিলেন "বাপু এ তোমাদেরই ঘর বাড়ী, তোমরা যে সর্ব্বদা আসাযাওয়া কর না এই আশ্চর্য্য, তোমরা এখানে আছ তাই আমি এদের রেখে নির্ভাবনায় বিদেশে থাকি, সেদিন যদি তুমি অত যত্ন না কর্ত্তে তাহলে কি আর লতি বাঁচতো?" আমি ঘাড় নত করিয়া রহি-লাম। অল্পক্ষণ পরে আহারের জন্য ভিতরে ডাক পড়িল, আমিও নরেন বাবু আহারে বসিলাম। পরিবেশিকা এবারো পূর্ব্বের মত লতিকা নিজে।—পরিবেশনপরায়ণা লতিকার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম, অসুখ সারিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু এক মধুর ক্লান্তিভরে সেই তরুণ দেহযষ্টি আচ্ছন্ন, প্রবল ঝটিকার পর কোমল বল্লরী যেরূপ ক্লিষ্ট দেখা যায় সেইরূপ।

লতিকাকে সঙ্কুচিত হইয়া পরিবেশন করিতে দেখিয়া নরেন্দ্র বাবু হাসিয়া তাহাকে বলিলেন "তুই এত সঙ্কোচ বোধ কচ্ছিস্ কেন? সুরেশ কি আমাদের পর? সুরেশ না থাকলে যে তোকে আর এ জন্মে দেখতেই পেতুম না।" তাহার পর আমি কি রূপে সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চেতনাহীন দেহপ্রান্তে বসিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, সে সমস্ত ঘটনা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া তিনি লতিকাকে বলিতে লাগিলেন। আমি লজ্জায় মুখ তুলিতে পারিলাম না, একটু আস্তে বলিলাম "অত প্রশংসার কাজ কিছু করিনি।" লজ্জা ছাড়িয়া লতিকার দিকে চাহিলে বুঝি কৃতজ্ঞতা ও বিনয়মণ্ডিত কুসুমসুকুমার একটি কোমল মুখ, লজ্জারঞ্জিত দুইখানি প্রফুল্ল কপোল এবং আবেশচঞ্চল কৃষ্ণতারশোভিত নয়নপল্লব আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইত, কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। আহারান্তে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলাম, একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম যদি এই তৃষিত নয়নের ব্যাকুল দৃষ্টি সেই অন্তঃপুরবর্ত্তিনীর সাক্ষাৎ পায়। কিন্তু আশাপূর্ণ হইল না, বিমর্ষ চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রভা আমাদের ভারি বুদ্ধিমতী, সে এক আঁচড়েই মানবহৃদয়ের বড় বড় গুপ্ত রহস্যের ভাণ্ডার আবিষ্কার করিয়া ফেলে, সুতরাং তাহাকেই আমার সবচেয়ে বেশী ভয়। আমার ভয় যে নিতান্ত অমূলক তাহাও নহে, সে প্রথম হইতেই আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। দেখিলাম আজ কাল সে আমাকে বিবাহের কথা একটু আঁটাআঁটি করিয়া বলে এবং আমি ধরা পড়িবার ভয়ে একটু বেশী প্রতিবাদ করিলে সে শুধু হাসে, কিন্তু আমি অত্যন্ত সাহসের সহিত কৃত্রিম দৃঢ়তা প্রকাশ করিলেও আমার একটা অপ্রস্তিভের ভাব ঢাকা পড়ে না। আমি বিপদ দেখিয়া সম্মুখযুদ্ধে ভঙ্গ দিলাম, এবং গ্রীষ্মাবকাশের সুবিধা পাইয়া মুঙ্গের যাত্রার আয়োজন করিলাম! মুঙ্গেরে আমার ভগ্নিপতি প্রভার স্বামী চাকরী করিতেন, অনেকদিন হইতেই তিনি আমাকে মুঙ্গেরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন, এবার তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করা অতি উচিত বলিয়া

বোধ হইল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একবার আমার সেই পূর্ব্বকথিতা সুরসিকা আত্মীয়ার সহিত দেখা করিলাম। তিনি মৃদু হাস্যে বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন "আরো দিন কতক না হয় মুক্ত আকাশে গগনবিহারী পাখীর মত নির্ব্বিবাদে ঘুরে বেড়াও, খাঁচা কিন্তু তৈয়েরী হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই।" দুই একটা সময়োচিত উত্তর ক'রে সহাস্য আস্যে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার পর হাবড়া ষ্টেসনে আসিয়া নিয়মিত সময়ে গাড়ীতে চড়িলাম, সে সময়ের মনের ভাব মুখে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আলোতিক ষ্টেসন,—শত শত নরনারী নানা দিগ্দেশে যাত্রা করিতেছে; প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন আশা, বিভিন্ন অভিপ্রায়; কে বলিবে কয় জনের আশা সফল হইবে, আর কতজনের আশাপূর্ণ হৃদয় ফাটিয়া যে অশ্রু বহিবে তাহাতে তাহাদের সমস্ত যাতনা নির্ব্বাপিত হইবে না। হায়! প্রত্যহ আমরা কত সুন্দর মুখ, কত প্রেমপূর্ণ চক্ষু দেখিতে পাই, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, তাহার পর তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে অপসারিত হইয়া যায়, সমস্ত জীবনে হয়ত আর তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে না, কিন্তু যদি কখনো একখানি মুখকমল দুইটি নলিন নয়ন, হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত হইয়া প্রাণে এক ঘোর অতৃপ্তি জাগাইয়া অদৃশ্য হয় এবং এই জীবন নাটকের শেষ যবনিকা পতনের পূর্ব্বে আর দৃষ্টিপথের মধ্যে না আসে ত উপায় কি? তখন কি আমরা এই ভগ্নহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আবেগ নিতান্ত সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া অসহায় বিপন্নের ন্যায় প্রেমজ্যোতিহীন এই অন্ধকার পূর্ণ সংসারসাগরে ডুবিয়া মরিব? ভাবিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারি না।

মুঙ্গের প্রথম প্রথম বেশ লাগিল। হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনে মনের ভারও অনেক কমিয়া গেল; সেই রৌদ্রতপ্ত উজ্জ্বল নীলাকাশ, প্রশস্ত প্রান্তর, স্বচ্ছসলিলা পূর্ণপ্রবাহিণী; বায়ু-হিল্লোলিত, দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ শ্যামল বনশ্রেণী ও সুদূরবিস্তৃত অনুর্ব্বর ধূসর গিরিরাজি;—এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যের বৈষম্যের মধ্যে নিজের হৃদয়ের ক্ষুদ্র চিন্তা ও অধীর তৃষ্ণা যেন হারাইয়া যায়! এই রকম কতক শান্তি কতক অশান্তি, কতক চিন্তিত কতক নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন যোগেশ বাবু (আমার ভগ্নিপতি) বৈকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন "কিহে তুমি নাকি ভারি বীরত্ব প্রকাশ করেছ?" আমি একটু বিস্মিত ভাবে বলিলাম "তোমার কথাটা কিছুমাত্র বোধগম্য হো'ল না।" তিনি বলিলেন "ইংরেজী কাগজে দেখলুম তুমি নরেন্দ্র বাবুর মেয়েকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হ'তে বাঁচিয়েছ, ব্যাপারটা এতদিন কি বোল্‌তে নেই, যাহোক, কি হয়েছিল ভেঙ্গে বল দেখি।" আমি একে একে সমস্ত ঘটনাই যথাযথ বিবৃত করিলাম। নরেন্দ্রবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথাটাও বাদ গেল না, এবং কথাপ্রসঙ্গে লতিকার রূপগুণেরও খানিকটে প্রশংসা করিতে ভুলি নাই; কিন্তু তখন বুঝি নাই যে শেষের বিষয়টা শীঘ্রই প্রভার কানে উঠিবে ও আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে অতি সংগোপনে পোষিত একটি চিন্তা প্রতিবেশিনী রমণী-

মণ্ডলীর নিকট একটা প্রীতিকর আন্দোলনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষ আমার সেই বিদ্রূপপরায়ণা ঠাকুরাণী, তাঁহাকেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়। যাহা হউক এ সম্বন্ধে আর বেশী চিন্তা না করিয়া নীরব ঔদাস্যের সহিত সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলাম।

এইরূপ ভাবে দেখিতে দেখিতে এক দুই করিয়া তিন মাস কাটিয়া গেল, প্রভাও মুঙ্গেরে আসিয়াছে। এক দিন দেখি সে একখানি চিটি লইয়া আমার ঘরে আসিতেছে। আসিয়া বলিল "দাদা একখানা নিমন্ত্রণের চিঠি আসিয়াছে বোধ হয়" এই বলিয়া চিঠি খানি আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। কি জানি কেন আমার অন্তর বিচলিত হইল। পত্রখানি হাতে লইয়া উপরে লালকালীতে লিখা আমার নাম দেখিলাম। দেখিলাম নরেন্দ্র বাবুর হস্তাক্ষর। পত্র খুলিতে ভরসা হইল না। চিঠিখানি টেবিলের উপর রাখিলাম এবং শুধু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শিরোনামাটীই বার বার পড়িতে লাগিলাম। মন তখন বাহ্য জ্ঞান রহিত এবং কি এক বুদ্ধির অগম্য ভাবনা জালে সমাচ্ছন্ন।

ক্রমে ক্রমে পত্রখানি উন্মুক্ত করিলাম। খুলিয়া দেখি তাহার ভিতর দুই খণ্ড পত্র। একখানায় নরেন্দ্রবাবু কন্যার বিবাহের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। অপর খানায় সংক্ষেপে লিখিয়াছেন যে গত কল্য দৈবাৎ একটি সদ্বংশজাত যোগ্যপাত্র পাওয়া গিয়াছে। আর এমাসে আগামী কল্য বই আর শুভদিন নাই বলিয়াই ঐ দিনে তিনি তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছেন।

পত্র পড়িয়া সদ্যনিহত ছাগশিশুর ন্যায় ছট্ফট্ করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই প্রভা পুনর্ব্বার সেই গৃহে প্রবেশ করিল। আমার মুখচোখের ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। সাম্‌নেই খোলা চিঠি পড়িয়াছিল, চকিতে তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। তাহার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না।

মালতীমাধব।

৪

দশ অঙ্কের দুটী মাত্র অঙ্ক শেষ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। অথচ সে সমস্ত ঘটনা গুলিই শুধু একটী দিনব্যাপী। অদৃষ্টপূর্ব্বা মালতীকে মকরন্দোদ্যানে প্রথম দেখিয়া মাধব আত্মবিহ্বল হইলেন, এবং বাতায়ন হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট মাধবকে মকরন্দোদ্যানে পুনর্ব্বার দেখিয়া মালতী অধীরতর হইলেন। মাধবের গ্রথিত মালা মালতীর

হস্তগত হইল, এবং পরস্পরের চিত্রিত পরস্পরের প্রতিচ্ছন্দক উভয়ের দৃষ্টিগোচর হইল। কামন্দকী নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহে ভূরিবসুর সম্মতিসম্বাদ আনিয়া পিতার স্নেহে মালতীর সন্দেহ উদ্রেক করাইয়া দিলেন, এবং মাধবের গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার প্রতি মালতীর অনুরাগ আরও প্রগাঢ়তর করিয়া তুলিলেন।

নাটকের আইনানুসারে ইহার পরের অঙ্কে মালতী ও মাধবের পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী। কি উপায়ে তাহা সংঘটিত হয়? তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে কামন্দকীর দুই পরিচারিকার মুখে শোনা গেল, কামন্দকী খুব এক সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী তিথি উপলক্ষে দেবারাধনার নিমিত্ত মালতীকে লইয়া শঙ্করগৃহে গমন করিবেন। স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় এইরূপ বলিয়া পুষ্পচয়নার্থ মালতীকে শঙ্করগৃহসংলগ্ন কুসুমাকরোদ্যানে প্রেরণ করিবেন। ভগবতীর আদেশক্রমে মাধব ও সেখানে বৃক্ষান্তরালে উপস্থিত থাকিবেন। ক্রমশঃ সুযোগমত অন্যোন্যদর্শন ঘটিবে।

পরিচারিকা যাহা যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঘটিল। লবঙ্গিকাদ্বিতীয়া মালতী উদ্যানে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন। মাধব বৃক্ষান্তরাল হইতে তাঁহাকে দেখিয়া মনা-গুণে আরও দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এমন সময় একটী সামান্য ঘটনা ঘটিল; সামান্য— অর্থাৎ, আর সকলের পক্ষে; কিন্তু নবপ্রণয়ীর পক্ষে—অসামান্য। মালতীর প্রেমে মাধব জরজর, মালতীকে না পাইলে তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ, মালতীর রূপে মাধব সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, অথচ মালতীর কণ্ঠনিঃসৃত কোন বাক্যশ্রবণে তাঁহার কর্ণ এ পর্য্যন্ত চরিতার্থ হয় নাই। কথাটা বড় সামান্য নয়; যাহাকে ভালবাস তাহার কণ্ঠ-ধ্বনি কেমন জান না, মানুষটার অর্দ্ধেকই তোমার অবিদিত; এমন স্থলে প্রথম যে দিন তাহার কণ্ঠ শুনিবে সে দিন নানা অঘটন ঘটিতে পারে।

মালতী পুষ্পচয়ন মানসে লবঙ্গিকাকে ডাকিয়া শ্রান্তিক্লিষ্ট মধুর স্বরে বলিলেন "সখি চল এই কুব্জকনিকুঞ্জে পুষ্পচয়ন করি।"

এমন পুলকরসমাখা কথা কেহ কখন বলে নাই। মেঘমালার প্রথম বর্ষণে কদম্বের কেশর যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, প্রথমপ্রিয়াবচন শ্রবণে মাধবের দেহ সেইরূপ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কামন্দকী দেখিতেছেন মাধবের অবলোকনে মালতীর অঙ্গ জড়তা প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ স্বেদযুক্ত হইতে পারিত; শ্রান্তি, মালতীর আননে সেই স্বেদবিভ্রম বিকাশিত করিয়াছে। তিনি বলিলেন "বৎসে ক্লান্ত হও, বিশ্রাম কর, তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে, এইখানে উপবেশন কর।"

"আমার হৃদয়ের দ্বিতীয় অবলম্বনস্বরূপ মাধব নামক যে কুমারের কথা সে দিন তোমা-দের বলিয়াছিলাম, তাহাকে কি মনে আছে? সেই মন্মথোদ্যানের যাত্রার দিন হইতে

সে নিতান্ত পীড়িত হইয়া রহিয়াছে, শুনিয়াছি মালতীই তাহার পীড়ার কারণ। নিশ্চল সমুদ্রবক্ষ চন্দ্রসন্দর্শনে যেমন আলোড়িত হয়, তোমার মুখচন্দ্রমা তাহার স্থির হৃদয়কে সেইরূপ বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছে।"

মাধব অন্তরাল হইতে কামন্দকীর বর্ণনা শুনিয়া এবং তাঁহাকে তাঁহার সপক্ষতা করিতে দেখিয়া সবিস্ময় আনন্দে মনে মনে বলিলেন "বাঃ কি দিব্য গুছাইয়া বলিতেছেন! কি উপন্যাসশুদ্ধি!"

কামন্দকী বলিতে লাগিলেন "মাধব জীবনের প্রতি আস্থাশূন্য হইয়া এমন কোন দুঃসাহসিক কার্য্য নাই যাহা করিতে অগ্রসর না হয়েন।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিলেন "তিনি মুকুলিত, কোকিলকূজনিত আম্রবৃক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন—"

"কি ভয়ানক!"

"বকুলগন্ধবাহী বায়ুর পথে দেহ স্থাপন করেন—"

"কি দুঃসাহসিকতা!"

"এবং দগ্ধ হইয়া মরিবার আশায় সরস পদ্মপত্র বুকে রাখিয়া বারম্বার চন্দ্রকিরণের শরণাপন্ন হন।"

মালতী ভয়ে সারা!

মাধব মনে মনে বলিলেন "ভগবতী কি ওরিজিন্যাল্।"

কামন্দকী আবার বলিতে লাগিলেন "আমার বোধ হয় অক্লেশসহিষ্ণু সুকুমার বৎস শীঘ্রই মৃত্যুকে বরণ করিবে।"

তাহার জন্য মাধবের জীবন সংশয় ইহা জানিয়া মালতী ভীত হইয়া জনান্তিকে বলিল "কি হইবে সখি।"

লবঙ্গিকা মালতীর কথার কোন উত্তর না দিয়া ভগবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আপনি ত মাধবের কথা বলিলেন, কিন্তু আমাদের প্রিয় সখির কি অবস্থা তাহা জানেন না"। এই বলিয়া মালতীর প্রেমবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল।

সে বিবৃতির মুখ্যপাত্র ভগবতী নহেন,—বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী মাধব। লবঙ্গিকা যাহা বিবৃত করিল তাহার এক অক্ষরও যে কামন্দকীর অবিদিত নহে তাহা সে জানে, এবং মাধব যে অন্তরালে রহিয়াছেন তাহাও সে জানে, তাই ভগবতীকে উদ্দেশের ছলে, মাধবের হিতার্থে এত আনুপূর্ব্বিক পুনর্বিবৃতি। লবঙ্গিকা গল্প শেষ করিয়া মালতীর বক্ষের আবরণ ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া কামন্দকীকে বলিল "এই দেখুন, মাধবের স্বহস্ত রচিত বলিয়া সেই বকুলের মালা আজও মালতীর কণ্ঠাবলম্বন করিয়া তাহার প্রাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।"

মালতীর প্রেমের প্রগাঢ়তার এই নিদর্শনে অভিভূত হইয়া মাধব বলিলেন "ধন্য বকুলমালিকা!"

সহসা নেপথ্যে একটা ঘোর কোলাহলধ্বনি শোনা গেল। সকলে ত্রস্তে কর্ণপাতিয়া শুনিলেন "রে রে শঙ্করগৃহাধিবাসি! রক্ষা কর রক্ষা কর, প্রিয়সখি মদয়ন্তিকাকে রক্ষা কর! দৃপ্ত শার্দ্দূল বলপূর্ব্বক শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া লৌহপিঞ্জর উদ্‌ঘাটিত করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বহু লোক নিহত হইয়াছে, রাজপথ রক্তপঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, এখন সে অমাত্য নন্দনের ভগিণীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে—কে আছ রক্ষা কর।"

মাধব ত্রস্তে অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন "বুদ্ধরক্ষিতে কোথায়, কোথায়?

"উদ্যানের সম্মুখস্থ পথে।"

মাধব ছুটিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। এই পলকের মধ্যেই কিন্তু, চিত্তবিক্ষেপের এরূপ প্রভূত কারণ সত্ত্বেও প্রণয়ীযুগলের মধ্যে একটী ছোট খাট প্রেমলীলা অভিনীত হইয়া গিয়াছে,—অতর্কিতদর্শনজনিত মালতীর আনন্দ, তৎপ্রকাশ, এবং মাধবের তাহাতে আত্ম-প্রসাদ। মাধব মদয়ন্তিকার রক্ষার্থে যাইতে উদ্যত হইলেন, ভগবতী বলিলেন "বৎস, অপ্রমত্ত হইয়া যুদ্ধ করিও।" মাধবের আর যাওয়ার আবশ্যক হইল না, সকলে দেখিল কে একজন পুরুষ নিজের দেহ দিয়া মদয়ন্তিকাকে রক্ষা করিলেন। শার্দ্দূল নিহত হইল, কিন্তু তৎসঙ্গে সেই পুরুষও রক্তাক্ত দেহে অচেতন হইয়া ভূপতিত হইলেন, মদয়ন্তিকা তখন তাঁহার দেহালিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। সকলে বিস্ময়ের সহিত চিনিল সে পুরুষ মকরন্দ—মাধবের সখা। সখার ঈদৃশ অবস্থাদর্শনে মাধবও শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

এখন আমরা চতুর্থ অঙ্কে আসিয়া পড়িলাম। মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা প্রমুগ্ধ মাধব ও মকরন্দকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। মদয়ন্তিকা কাঁদিয়া বলিলেন "ভগবতি রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, মদয়ন্তিকার নিমিত্ত সংশয়িতজীবন, বিপন্নজনানুকম্পী মহাপুরুষকে রক্ষা করুন।"

ইতর লোক যাহারা উপস্থিত ছিল সকলেই মকরন্দের শুভ কামনা করিতে লাগিল। কামন্দকী কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া তাঁহাদের মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, মালতী ও মদয়ন্তিকা তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের পর মকরন্দের চেতনা হইল, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন পার্শ্বে মাধব মূর্চ্ছিত হইয়া রহিয়াছেন। বুঝিলেন অভিন্নহৃদয় সখা তাঁহারই কারণে মূর্চ্ছিত। মালতীর হস্তস্পর্শে মাধবেরও ক্রমে চেতনা হইল। বিপদ কাটিল, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল, কামন্দকী তাঁহাদের উভয়ের শির আঘ্রাণ করিলেন।

এখন সখিগণের পরস্পরের একটু বিশ্রান্তালাপের অবসর। বুদ্ধরক্ষিতাকে মদয়ন্তিকাকে বলিল "জানিস্? এই সেই।"

"জানি, ইনি যে মাধব, আর ইনি যে তিনি, তা বুঝ্‌তে পেরেছি।"

"আমি কি তোকে বাড়িয়ে বলেছি?"

"যোগ্য না হলে তোমার মতন লোক তার পক্ষপাতিনী হবে কেন ? এই মহানুভবের প্রতি মালতীর অনুরাগপ্রবাদও রমণীয়।"

পাঠকগণের মনে পড়িবে, প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ব্যক্ত হইয়াছে যে একটী প্রতিনায়ক ও প্রতিনায়িকার মিলন এই নাটকের গৌণ বস্তু। মকরন্দ ও মদয়ন্তিকা সেই প্রতিনায়ক ও প্রতিনায়িকা। কামন্দকী আমাদের ইতিপূর্ব্বেই জানাইয়াছেন যে ক্রমাগত মকরন্দের গল্প করিয়া করিয়া তাঁহার প্রতি মদয়ন্তিকার পরোক্ষ প্রেম অঙ্কুরিত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি বুদ্ধরক্ষিতাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধরক্ষিতার কৃতকার্য্যতার প্রমাণ আমরা এখানে পাইতেছি।

মদয়ন্তিকা শেষ যে কথাটী বলিলেন তাহার ভারি একটী হৃদয়ঙ্গমতা আছে। তিনি নিজের হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেছেন প্রেম ভারি সুন্দর, তাই সমবেদনার দ্বারা মাধবের প্রতি মালতীর অনুরাগপ্রবাদও তাঁহার রমণীয় বোধ হইল, সহানুভূতির দ্বারা মালতীর সহিত সখিত্ব অনুভব করিলেন ; তাঁহাদের পরস্পরের প্রেমে পরস্পরের প্রেম মনোহরতর হইল। তিনি সস্পৃহলোচনে মকরন্দকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। মদয়ন্তিকার ব্যবহার কামন্দকীর দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই, তিনি আনন্দিত হৃদয়ে তাঁহার দ্বিতীয় অভিসন্ধির সাফল্যমুখে অগ্রসরতা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

তিনি মকরন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ঠিক এই সময় কিরূপে মদয়ন্তিকার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলে।"

মকরন্দ বলিলেন "অদ্য গ্রামে মাধবের চিত্তোদ্বেগকারী কোন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ কুসুমাকরোদ্যানে আসিতে পথে এই সম্ভ্রান্তাকুমারীকে সমূহ বিপদাপন্না দেখিলাম।"

মাধব ও মালতীর মন চঞ্চল হইল। মাধবের চিত্তোদ্বেগকারী কি বার্ত্তা মরকন্দ শ্রবণ করিয়াছেন ? মাধব মকরন্দকে প্রকাশ্যে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। মকরন্দের উত্তর দিতে হইল না, একজন অনুচর আসিয়া মদয়ন্তিকাকে কহিল, "আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমাত্য নন্দন আদেশ করিতেছেন "বৎসে মদয়ন্তিকে আজ মহারাজ স্বয়ং আমাদের গৃহে আসিয়া ভূরিবসুকে সম্মান ও আমাকে মালতীদান করিবেন, অতএব শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাগমন কর, প্রমোদের আয়োজন করিতে হইবে।"

মকরন্দ বলিলেন "এই সেই বার্ত্তা।"

নন্দনের অনুচরের সমক্ষে সকলে মালতীকে অভিনন্দন করিতে লাগিল। মাধব নৈরাশ্যকঠিন হৃদয়ে বলিলেন "আমার আশাতন্তু সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া এতদিনে বিধি সুস্থ হইলেন বোধ হয়।"

মদয়ন্তিকার সহিত অনুচর অন্তর্হিত হইলে কামন্দকী বলিলেন "মাধব তুমি কি এতদিন মনে করিয়াছিলে ভূরিবসু তোমায় মালতী দান করিবেন ?

মাধব অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না,—না।"

"তবে ত পূর্ব্বাবস্থা হইতে কিছুমাত্র পরিহীন হও নাই, তবে তুমি এত বিষণ্ণ কেন ?"

মকরন্দ বলিলেন "এতদিন মালতী মাধবের না হউন, অপর কাহারও ছিলেন না, সুতরাং তখন আশার অবসর ছিল, এখন ত আর তাহা নাই।"

"রাজা যখন ভূরিবসুর নিকট নন্দনের জন্য মালতীর হস্ত প্রার্থনা করেন, তখন ভূরিবসু কি উত্তর দিয়াছিলেন জান ? তিনি বলিয়াছিলেন মহারাজের তাঁহার কন্যার উপর সকল ক্ষমতাই আছে।"

"তাহাত শুনিয়াছি।"

"আজ অনুচরের মুখে শুনিলে রাজা স্বয়ং মালতীকে দান করিবেন। বৎস সাংসারিকগণের ব্যবহারতন্ত্র বাক্যতেই প্রতিষ্ঠিত, বাক্যই পুণ্যাপুণ্যের হেতু। ভূরিবসু বলিয়াছেন মহারাজের তাঁহার কন্যার উপর সকল প্রভাবই আছে। ইহার অর্থ মহারাজের তাঁহার নিজের কন্যার উপর, রাজকুমারীর উপর সকল ক্ষমতাই আছে, ইচ্ছা করিলে তাহাকে যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারেন। ইহার অর্থ এমন নহে যে ভূরিবসুর কন্যাদানে মহারাজের কোন অধিকার আছে। ভূরিবসুর যাহা হৃদ্গত অর্থ আমার প্রাণপণ চেষ্টায় তাহা সিদ্ধও হইবে।"

মকরন্দ ভগবতীর কথা শুনিয়া চরিতার্থ হইলেন, মাধব ও মালতী কিন্তু ইহার কিছুই জানিলেন না। মালতী দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িলেন। নেপথ্য হইতে জনৈক অনুচর জানাইল, মালতীর মাতা তাঁহাকে শীঘ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিতেছেন। কামন্দকী মালতীকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মাধব কঠিন হৃদয়ে বীভৎস সঙ্কল্প করিলেন। শ্মশানে নরমাংস বিক্রয় করিবেন, তাহার তুল্য পাপ আর নাই, সুতরাং সেই পাপে তাঁহার মৃত্যু হইবে। মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিয়া বন্ধুর প্রতি ফিরিলেন। যতক্ষণ হৃদয়ে কোন বিষয়ে দ্বিধা থাকে ততক্ষণই বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করা যায় না। সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত ইতস্ততঃ যখন দূর হইয়াছে, সংকল্প হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তখন অন্য বিষয়ে প্রশান্তভাবে মন ফিরান সহজ। মাধব মকরন্দের প্রতি ফিরিলেন, তিনিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন মদয়ন্তিকা ও মকরন্দ যেন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। সেই কথা এখন পাড়িলেন।

"সখা এখনো তোমার মন মদয়ন্তিকার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে ?"

"সখা আমাকে রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া ব্যস্ততাবশতঃ উত্তরীয়স্খলন জানিতে না পারিয়া, এক বৎসরের হরিণ শিশুর ন্যায় ত্রস্ত চঞ্চল লোচনে, অমৃতসম্বলিত অঙ্গের দ্বারা তিনি যে আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন আমার তাহাই কেবল মনে পড়িতেছে।"

"তুমি তাহাকে পাইবে, মৃত্যু সম্মুখীন দেখিয়া তোমাকে যখন আলিঙ্গন দিয়াছিলেন

তখন তুমি ছাড়া আর কেহ তাঁহার হৃদয়রঞ্জন করিতে পারিবে না। তাহার পরেও তাঁহার স্তিমিত, রমণীয় লোচন তোমার প্রতি তাঁহার স্নেহ ব্যক্ত করিয়াছে।”

শ্রীসরলা দেবী।

সম্পাদকের চিত্রচয়ন।

বিলাতী কুসংস্কার।

আমাদের হাঁচি টিকটিকির কথা শুনিলে সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতি প্রভূত আমোদ উপভোগ করেন। কিন্তু এই বিজ্ঞানালোকিত যুগেও ইংলণ্ডে অতি অল্প লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের মন কুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে ব্যক্তি মাত্রেরই একটি না একটি সযত্নপোষিত কুসংস্কার আছে কিন্তু কেহই অপরের কুসংস্কারকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন না। এখন আর ‘ভুতের’ উপর আগেকার মত বিশ্বাস দেখা যায় না বটে কিন্তু আধুনিক প্রেততত্ব সম্পূর্ণরূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

যাত্রা করিয়া পিছে ফিরিয়া দেখা, লবণ ছিটাইয়া ফেলা, সিঁড়ির নীচে দিয়া যাতায়াত করা, তেরো জন লোক একত্রে ভোজনে বসা প্রভৃতি ঘটনা আজ পর্য্যন্তও অশুভসূচক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই সমস্ত কুসংস্কার বহুলরূপে প্রচলিত এবং শীঘ্র ইহাদের উচ্ছেদ সাধনের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কেবল অজ্ঞলোকের মনে যে এই সমস্ত সংস্কার বদ্ধমূল এরূপ নহে, যে সকল লোকের মন শিক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা পরিমার্জ্জিত তাহা-রাও এই সমুদয় সংস্কারের হস্ত হইতে মুক্ত নহে। ইয়র্কশায়রবাসীদের আজও এরূপ সংস্কার আছে যে আয়না ভাঙ্গিলে সাতবৎসর কাল কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কর্ণওয়ালে কোন খনিখননকারীই খনির মধ্যে শিশি দেয় না। আবার এরূপ স্থান অনেক আছে যেখানে ডাকিনী প্রেতিনী ও পরীজাতীয় জীবের জলজীয়ন্ত অস্তিত্বে লোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

স্ত্রীলোকদিগের ধারণা এই যে পুরুষদলের মধ্য দিয়া যাওয়া শুভজনক, কিন্তু পথে দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়া যাইলে বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আইভিলতার স্বপ্ন মঙ্গল জনক এবং সমুদ্র যাত্রার পক্ষে অনুকূল বায়ুর পরিচায়ক। শনিবারে হাঁচিলে সৌভাগ্য লাভ হয় কিন্তু শনিবারে বিবাহ করিলে বিভ্রাট ঘটে, বিবাহ কার্য্যে বুধবারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত দিন। কোন কোন স্থানে ডিসেম্বর মাসের শেষদিনও বিবাহের পক্ষে অনুকূল বলিয়া আদরণীয় হইয়া থাকে। বিবাহোপলক্ষে পাত্রীর সবুজ পরিচ্ছদ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য; কারণ

অমঙ্গলের পরিচায়ক। ইউরোপের পশ্চিম উপকূলস্থ দেশ সমূহে রবিবার জন্মের পক্ষে বিশেষ শুভদিন। ডিভনসায়রে নববর্ষের দিন বস্ত্রাদি ধৌত করা নিষিদ্ধ। এইরূপ আরো কত নিষেধবিধি আছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন।

খৃষ্টের স্বর্গারোহণ দিনে, লর্ড পেনহ্রিনের ওয়েল্‌স্ প্রদেশস্থ বিস্তীর্ণ প্রস্তরখনির কাজ বন্ধ থাকে; খনিখননকারীদিগের এই বিশ্বাস যে পর্ব্বদিনে কাজ করিলে নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইবে। গুডফ্রাইডে পর্ব্বোপলক্ষে যে সমুদয় পাখা বিক্রয় হয়, মঙ্গলদায়ক বিবেচনা করিয়া লোকে তাহা যত্নপূর্ব্বক বৎসরেক কাল পর্য্যন্ত ঘরে রাখিয়া থাকে। ইংলণ্ডের উত্তর প্রদেশে সন্তানের স্তন্যপান কাল পর্য্যন্ত প্রসূতি জ্বরের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য গলদেশে পশমের নীলবর্ণ সূত্র ধারণ করিয়া থাকে। একদা কোন স্ত্রীলোক চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইলে অপহৃত বস্তুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পুলিস দেখিতে পাইল যে স্ত্রীলোকটি শুভদায়ক বিবেচনায় সমুদয় প্রেক সমেত একখানি ঘোড়ার নাল শরীরে ধারণ করিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সে নাল তাহাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। বোস্ট্রীটের পুলিশ ষ্টেসনে একজন সিঁধেল চোরের পকেট খুঁজিতে খুঁজিতে একখণ্ড পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পুলিস তাঁহাকে অবগত করায় যে এই সমস্ত নিশাচরদিগের বিশ্বাস যে পাথুরে কয়লা বিঘ্নবিনাশের পক্ষে ইন্দ্রজালস্বরূপ। অনেক লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে যে কোন কোন মূল্যবান প্রস্তরেরও এইরূপ বিঘ্নবিনাশিনী শক্তি আছে। শেষ রুষো-তুর্কিয় যুদ্ধের সময় কতকগুলি রুসিয় সৈনিক অঙ্গুলীতে তুরস্কদেশজাত নীলপ্রস্তরযুক্ত অঙ্গুরী ধারণ করিয়াছিল, তাহাদের বিশ্বাস এরূপ প্রস্তর অপঘাত মৃত্যু নিবারণের অব্যর্থ কবচ!

অনেকেরই বিশ্বাস যে Caul এর প্রাণরক্ষণী শক্তি আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে টেমস্ নদীতে একব্যক্তি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। তাহার শব ব্যবচ্ছেদের সময় প্রকাশিত হয় যে সে সর্ব্বদাই এই বলিয়া অহঙ্কার করিত যে সে যখন Caul লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তখন তাহার জলে ডুবিয়া মরা অসম্ভব।

যাহারা নৈশশিকারের নিমিত্ত ফিরে তাহারা টেমস্ নদীর সমীপবর্ত্তী স্থানবিশেষকে বিভীষিকার চক্ষে দেখে, তাহাদের সংস্কার এই যে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেই তাহাদের গাত্রে মনুষ্যের অস্থি নিক্ষিপ্ত হইবে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ স্থানে একটি গর্ত্ত আছে তাহা দস্যু নিহত নরকঙ্কালে পূর্ণ, এই স্থানের সমীপবর্ত্তী হইলে আর নিস্তার নাই, সাহসে ভর করিয়া কেহ অগ্রসর হইলে তৎক্ষণাৎ কঙ্কালনিক্ষেপে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইবে।

নাবিকেরাই যে নিরীহ বিড়ালদিগকে ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের কারণ জ্ঞান করিয়া থাকে এরূপ নহে, কোন কোন অভিনেতার দৃঢ় প্রতীতি এই যে বিড়ালের দ্বারা শুভাশুভ উভয়ই সূচিত হইতে পারে; "দি প্রাইভেট সেক্রেটারী" নামক হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের

যখন রিহার্সাল দেওয়া হয় সেই সময় অকস্মাৎ এক কৃষ্ণমার্জ্জারের আবির্ভাবেই নাকি উক্ত প্রহসন উৎরাইয়া গিয়াছিল।

এমন কোন ব্যবসা কিম্বা বৃত্তিই নাই যাহা শুভাশুভ কোন না কোন ঐন্দ্রিজালিক পদার্থদ্বারা সংসাধিত না হইতে পারে। যে সকল লোক জুয়া খেলা করে তাহাদিগের কুসংস্কার চিরপ্রসিদ্ধ; তাহারা বলে যে নানাপ্রকার অদ্ভুদ্ উপায়ে তাহারা অদৃষ্টের ফলাফল বলিয়া দিতে পারে, এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে স্বপ্নই সর্ব্বপ্রধান। তাহাদের বিশ্বাস যে সংখ্যাদ্বারা ও ফলাফল নির্ণীত হইতে পারে।

ফ্লরেন্স নগরে ১৩ সংখ্যাকে লোকে এতই ভয় করিয়া থাকে যে অনেক রাস্তায় এই সংখ্যা আদৌ নাই, ১২½ এক লম্ফে ১৩ অতিক্রম করিয়া ১৪র ঘরে উপনীত হইয়াছে। নেপলস্ নগরে পুরাতন সমাধি স্তম্ভের তারিখ,এবং পক্ষীর ঝাঁক কিম্বা দ্বারসংলগ্ন লৌহদণ্ডের উপর চন্দ্রর শ্মি পতিত হইলে যে সমস্ত প্রতিবিম্ব পড়ে তাহার সংখ্যা দেখিয়া শত শত হতভাগ্য নির্ব্বোধ ব্যক্তি আপনাদিগের শেষ ও সামান্য সম্বল পর্য্যন্তও স্ফূর্ত্তির টিকিট কিনিবার জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। তাহাদের স্থির বিশ্বাস তাহারা যত টাকা জিতিবে তাহা এই সমস্ত সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ফরাসীদেরও এবিষয়ে কম কুসংস্কার নাই। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ একখান 'লটরী টিকিট' হস্তগত করিতে পারে যে তাহার 'নম্বরের' শেষ দুই রাশি তাহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীর বয়সের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে ৫ লক্ষ ফ্রাঙ্ক জিতিবে তদ্বিষয়ে তাহার আর কোন সন্দেহ থাকে না। কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে যদি টিকিটের 'নম্বর' তাহার নিজের, স্ত্রীর অথবা তিন সন্তানের কাহারো বয়সের সহিত মিলিয়া যায় তাহা হইলে তাহার জয়ের আশা অব্যর্থ। মানুষের অজ্ঞতা সকল দেশেই প্রায় সমান, যদি ইংলণ্ডে আমাদের মত স্ফূর্ত্তি খেলা থাকিত তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে "রাম দুই তিন, অমাবশ্যা, ঘোড়ার ডিম্" প্রভৃতি আমাদের দেশপ্রচলিত প্রবচনের ন্যায় তদ্দেশ প্রচলিত নানা প্রবচনের উপর অন্ধবিশ্বাসের প্রভূত প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইত।

নববর্ষের প্রারম্ভে যে রঙ্গের 'ফ্যাশান' দেখা যায় সেই রঙ্গে চুল ও দেহ রঞ্জিত করিতে লোকের এখনো যথেষ্ট আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যমন্দিরের নটনটীগণ আজ-কাল কটাচুল, ভুরু ও দাড়িদ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে প্রীত করিতে কতই ব্যস্ত! কিন্তু মহা-বীর নেপোলিয়ান কটাচুল ও গুম্ফধারী সেনাপতিকে বিশ্বাস করিতেন না। শুনিতে পাওয়া যায় আমেরিকার একজন প্রধান ধনী যে কেরাণীর ও যে ব্যক্তির বর্ণ যত কাল তাহাকে তত অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকেন (তাঁহার সমস্ত কেরাণী ও প্রিয়পাত্র কাফ্রি কি না সে বিষয়ে অবশ্য আমরা কোন সংবাদ পাই নাই)।

স্কটলণ্ডের কোন কোন স্থানের অধিবাসীবর্গ শূকরের নামোল্লেখে মাত্র ভয়বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'ইন্‌ভারনেস্' নামক স্থানে একটি ভাইনঘটিত মকদ্দম

উপস্থিত হইলে কোন কুলোকের একটি মৃৎ-প্রতিমূর্ত্তি প্রমাণ স্বরূপ আদালতগৃহে উপস্থিত করা হয়। সে স্থানের লোকের বিশ্বাস ডাইনেরা অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত এইরূপ প্রতিমূর্ত্তি ব্যবহার করিয়া থাকে; সাক্ষীরা আসিয়া প্রকাশ করে যে ডাইন বিদ্যার পুনঃ প্রচলিত হওয়ায় গোমেষাদি পশুর মধ্যে মড়ক আরম্ভ হইয়াছে এবং কৃষকগণের মধ্যে বিবিধ পীড়ার আবির্ভাব হইয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে টেম্‌সের পুলিশ আদালতে একটি স্ত্রী আসিয়া কহে যে তাহার একখানি শাল হারাইলে সে "বাইবেল ও চাবি" নামক পরীক্ষা দ্বারা চোর বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে প্রণালীতে চোর ধরিয়াছিল, তাহা এই:—সমবেত সাক্ষীগণের সমক্ষে একখানি টেবিলের উপর একখানা বাইবেল রাখিয়া দিল, সেই বাইবেলের পত্র মধ্যে একটা চাবি রাখিয়া ঐ চাবির সহিত একগাছি সূতা বাঁধিয়া রাখিল। তাহার পর চাবির যে অংশটুকু বাহির হইয়াছিল তাহা ধরিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কতকগুলি প্রতিবেশীর নাম বলিতে লাগিল, দোষী ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তাহার হাত মুচড়াইয়া চাবিটি মেজের উপর পড়িয়া গেল; স্ত্রীলোকটি কহিল যাহার নিকট সে শাল বন্ধক রাখিয়াছিল, এই প্রকারে তাহার নাম আবিষ্কৃত হইল।

এই সমস্ত ঘটনা যে দেশে নিত্য ঘটিয়া থাকে সে দেশে যে 'হনুমান চরিত্র' ও 'কাক চরিত্রের' ন্যায় সহস্র সহস্র পুস্তক বিক্রীত হইবে তাহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে এবং ধূর্ত্ত গণকেরা আইনের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া যে শত শত ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোককে প্রতারিত করিবে তাহারই বা আশ্চর্য্য কি?

ডাক্তারী ঔষধে অনেক অমঙ্গলের শান্তি হইতে পারে বলিয়াও অনেকের বিশ্বাস আছে। কোন যুবতী তাঁহার প্রণয়পাত্রকে তৎপ্রতি আস্থাশূন্য দেখিয়া একজন ডাক্তারের নিকট প্রণয়বর্দ্ধক ঔষধ চাহিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চঞ্চলমতি প্রণয়ীর উন্মার্গগামীপ্রেম নিশ্চয়ই তৎপ্রতি ধাবিত হইবে। স্ত্রীলোকটি ডাক্তারকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে ঔষধ যেন অত্যন্ত তেজস্কর হয়, কারণ তাঁহার প্রণয়পাত্র একজন কৃষক, দৈর্ঘে সাড়ে চারি হস্ত—পরিধিতেও তদনুরূপ। ডাক্তারের নিকট এরূপ আবেদন এই প্রথম নহে, বলা বাহুল্য তিনি কোন আবেদনকারীরই মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সমরসেটসয়রে কোন গোয়ালার গাভীগুলির দুগ্ধ কমিয়া গেলে সে ভাবিল যে তাহার উপর 'উপর দৃষ্টি' হইয়াছে। সে একজন ওঝার নিকট গিয়া এক গিনি প্রণামী দিয়া আপনার অমঙ্গল বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে ধূর্ত্ত ওঝা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে যত দিন তাহার "উপর দৃষ্টির" শান্তি না হয়, ততদিন ওঝাকে তাহার গোশালায় থাকিতে হইবে, এবং প্রতিদিন তাহাকে খোরাকীবাদ এক পাউণ্ড হিসাবে ফি দিতে হইবে; নির্ব্বোধ গোয়ালা তাহাতেই রাজী হইল। আর কিছু না হউক ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে শুদ্ধ আমাদের দেশেই যে গোপপুত্র ৬০ বৎসরের পূর্ব্বে সাবালক হয় না তাহা নহে, ইংলণ্ডেও এই সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

ইংলণ্ডে যাদু বিদ্যার ভাণ করিয়া অতি সত্বর ও সহজে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। আইনের কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না থাকিলে এই উপায়ে কত লোক যে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিতে পারিত তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশে যে সকল লোক "বাত ভালো" বলিয়া পথে পথে চীৎকার করিয়া বেড়ায় ইউরোপে সেইরকমের লোকদিগকে জিপ্‌সি বলে। অধিকাংশ ইংরেজ মহিলার ধারণা জিপ্‌সিরা অদৃষ্ট গণনায় বিশেষ পারদর্শী। ইংলণ্ডে সাধারণ শিক্ষার বহুলপ্রচারসত্বেও কৃষকদিগের জিপ্‌সিভীতি কিছুমাত্র প্রশ-

মিত হয় নাই; কিছু দিন পূর্ব্বে একজন কৃষক 'শনি' ছাড়াইবার জন্য জিপ্‌সিদিগের আড্ডায় উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় 'বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়' যে অবশ্যম্ভাবী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রবঞ্চকেরা মধ্যে মধ্যে নির্ব্বোধ কৃষকের নিকট টাকা লইয়া একখানি রঞ্জিত রুমালে বাঁধিয়া রাখিত, এবং চাষাকে ভরসা দিত যে এই প্রক্রিয়াদ্বারা তাহার প্রচুর ধনাগম হইবে। জিপ্‌সিরা কৃষককে একদিন কোন তরলপদার্থ পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলে, তাহার বোধ হইল যেন গ্লাসের মধ্যে কতকগুলি বাড়ী ভাসিতেছে, জিপ্‌সিদিগের আদেশ অনুসারে সে গ্লাসের সেই তরলপদার্থ বামস্কন্ধের উপর দিয়া অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিল; কৃষক বেচারা ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের সুখ কল্পনায় মুগ্ধ, সে ক্রমে একশত পাউণ্ড পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সমর্পণ করিল, সুবিধা দেখিয়া তাহারাও একদিন চম্পট দিল, তখন কৃষকপুত্রের চৈতন্যোদয় হইলে সে অনন্যোপায় হইয়া নিকটবর্ত্তী থানায় আপন দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিল।

নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন, ইংলণ্ডদেশে কুসংস্কার কিরূপ প্রবল।

কোন যুবক হঠাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন, তাঁহার পিতামাতা চিকিৎসককে না ডাকাইয়া একজন নিশিগ্রস্তা স্ত্রীলোককে ডাকিয়া আনিলেন; স্ত্রীলোকটি আসিয়া নিজ আবিষ্কৃত একটি ঔষধের ব্যবস্থা করিল, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবামাত্রই রোগীর যন্ত্রণা ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল এবং সেই রাত্রেই তাহার জীবনলীলার অবসান হইল।

সালিশবরী নামক স্থানে আর একটি স্ত্রীলোক স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফল আপনি প্রাপ্ত হয়; সে প্রকাশ করে যে তাহার উপর দেবতার 'ভর' হইয়াছে, উপযুক্ত দক্ষিণা পাইলে সে স্ত্রীলোকদিগের অদৃষ্টের ফলাফল গণনা করিয়া দিতে পারে। এই ঐন্দ্রজালিক কার্য্যে সে তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এরূপ আলোড়িত করিয়াছিল যে অবশেষে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

আমরা এখন মন্ত্রতন্ত্রবিদ্যাবিশারদ ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ গণক ও জ্যোতিষী মাত্রাতনের (Mathratton) বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। পুলিশ এই ব্যক্তির অধিকারে যে সমস্ত পত্র ও দলিল প্রাপ্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানিতে পারা যায় এই "ত্রিকালজ্ঞ পণ্ডিত" বহুকাল ধরিয়া তাহার লাভজনক ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হইয়াছিল। সাত বৎসরের জন্য যে সৌভাগ্য কামনা করিত তাহাকে তাহার ঔষধের মূল্য স্বরূপ সাত পেন্স দিতে হইত এবং ৫০ পাউণ্ডের কমে কেহই তাহার "মৃতসঞ্জীবনী" নামক ঐন্দ্রজালিক ঔষধ লাভ করিতে পারিত না; তাহার পত্রাদি পাঠ করিলে ইংলণ্ডীয় লোক যে কুসংস্কারের কিরূপ দাস তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সমুদয় বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ দাম্পত্য প্রেমে হতাশ হইয়া দুঃখের জীবন বহন করে তাহারা গণকের নিকট জীবনসঙ্গী অথবা জীবনসঙ্গিণীর অগ্রে মৃত্যু হইবে জানিতে পারিলে কতই না আনন্দে উৎফুল্ল হয়! কোন ভদ্রলোক তাহার মাতার কবে মৃত্যু হইবে জানিবার জন্য গণকের নিকট গিয়াছিল, কারণ তাহার মাতার মৃত্যুর পর তদীয় প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। জনৈক বিরহিণী বিরহ জ্বালায় নিতান্ত ব্যথিতা হইয়া গণককে কহিল "যদি তুমি দৈববলে প্রবাসী প্রণয়ীর সহিত মিলন করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করিব।" এক সময় ইংলণ্ডে ঐন্দ্রজালিক কবচের এতই আদর বাড়িয়াছিল যে একখানি কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া যে কবচ প্রস্তুত হইত তাহাতে আট পাউণ্ড লাভ হইত।

অতি অল্প দিন হইল রুষিয়া দেশে তিন জন ভদ্রলোক পুরোহিতের বেশ ধারণ করিয়া

একজন কৃষকের নিকট আসিয়া কহিল "আমরা প্রভু যিশু খৃষ্টের দ্বাদশ প্রিয় শিষ্যের মধ্যে তিনজন প্রধান শিষ্য, মর্ত্ত্যধামে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য আমরা পুনর্ব্বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি, আমাদের প্রসাদেই তুমি এই সমস্ত ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কিন্তু তুমি দাতার কর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া ধনমদে মত্ত রহিয়াছ।" এই কথা শুনিবামাত্র নিরীহ কৃষক কম্পিত কলেবরে নতজানু হইয়া কৃপা প্রার্থনা করিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের হস্তে ৫০০ শত মুদ্রা প্রদান করিল। যখন স্বাধীন এবং সভ্য ইংলণ্ডের লোক নানাপ্রকার কু-সংস্কারের দাস, তখন অর্দ্ধসভ্য রুসিয়ায় যে এরূপ ঘটিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

প্রাকৃতিকবিকৃতি নিবারক ঔষধের বিজ্ঞাপন দাতারও লাভ অল্প নহে; বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গের ক্রেতা আসিয়া উপস্থিত হয়। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ফ্রান্সদেশে ইহার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত ঘটিয়াছিল। স্থূলদেহ, দর্শকবৃন্দের প্রশংসা লাভের প্রধান অন্তরায় জ্ঞান করিয়া জনৈক স্থূলাঙ্গী অভিনেত্রী এক ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই ডাক্তারটি নানাবিদ্যায় সুপণ্ডিত, তিনি সেই অভিনেত্রীর স্থূলাঙ্গকে সুঠাম কৃশাঙ্গে পরিণত করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং ক্রমাগত দুইশত পঁয়ত্রিশবার তাঁহার শরীরকে মাজিয়া ঘসিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দিলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়াতে ডাক্তার যে অসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় দেন, অভিনেত্রীর সহিষ্ণুতা তাহা অপেক্ষা কিছুমাত্রও কম নহে। কিন্তু এত চেষ্টাতেও দেহায়তন কিছুমাত্র ক্ষীণ না হওয়ায় অভিনেত্রী ভগ্ন মনোরথ হইয়া ডাক্তারের নিকট বিদায় লইলেন, বলা উচিত যে এই ব্যাপারে তাঁহার ছয়শত ফ্রাঙ্ক খরচ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে যে প্রকার আড়ম্বরপূর্ণ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস-জনক বিজ্ঞাপনের ঘনঘটা নয়নগোচর হয়, আশুপ্রত্যয় সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে হইলে তাহা অপেক্ষাও এত অধিকতর আশ্চর্য্য নমুনা পাওয়া যায় যাহাতে রামায়ণ মহাভারতের মত দুই পাঁচখানি গ্রন্থ রচিত হইতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর স্ফীত করার আবশ্যক নাই। উপসংহারে সামান্য একটি নমুনা দেওয়া গেল ;—

দুইজন ফরাসী সংবাদপত্রের সম্পাদক "মানুষের আশু প্রত্যয়ের কোন সীমা আছে কি না ?" এই বিষয় লইয়া ঘোর বাদানুবাদের পর একটা বাজী রাখিলেন, অনন্তর তাঁহাদের একখানি সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি বাহির হইল ;—

"আমি কিছুই অঙ্গীকার করিতেছি না, কোন কার্য্য সম্পাদন করিব বলিয়া স্বীকারও করিতেছি না, পাঠকগণ, তোমরা যদি কেহ এক ফ্রাঙ্ক, পঞ্চাশ সেণ্টিম মূল্যের ডাকটিকিট আমার নিকট পাঠাইয়া দাও তাহা হইলে হয়ত তোমার অদৃষ্টে বিশেষ আমোদ ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহারো কিছু স্থিরতা নাই। 'এফ্, ডি' নামে পোষ্ট আফিসের ঠিকানায় পত্রাদি লিখিতে হইবে।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই প্রকার সহজ ও নূতন বিধ বিজ্ঞাপনে আশাতীত ফল দেখিতে পাওয়া গেল ; কিছুদিন পর্য্যন্ত বৃষ্টিধারার মত ষ্ট্যাম্পবোঝাই পত্র আসিতে লাগিল। সম্পাদকদ্বয়ের মধ্যে যিনি জয়ী হইয়াছিলেন তাঁহার প্রাপ্য এত অধিক হইয়াছিল যে তাহা হইতে অনেকগুলি টাকা তিনি সাধারণহিতকর কার্য্যে দান করেন, তাহার পর তিনি এই ঘটনা সংবাদ পত্রে প্রকাশ করায় প্রতারিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রেরিত অর্থের কিরূপ সদ্গতি হইল জানিতে পারিয়া যে ঐকান্তিক আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না।

অশুদ্ধশোধন।

পৌষ ১২৯৯

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০৩	৫	অমেরুদণ্ডক	সমেরুদণ্ডক
৫০৩	৮	নির্দ্দিষ্টাবস্থা	অনির্দ্দিষ্টাবস্থা
৫২৭	স্বরলিপির প্রথম পংক্তি	ম^{১}	মী
৫২৯	৯	র্গ^{১} (চতুর্থ)	র্প^{১}
৫৩১	২	ন^{১} (প্রথম)	ন্^{১}
৫:১	৩	সন্^{১}	র্স র্ন^{১}
৫৩১	৬	ম^{১}	মী^{১}
৫৩১	১০	ম^{১}	র্ম^{১}
৫৩২	৪	ম^{২} ম^{১} ।	র্ম^{২} র্ম^{১} ।

যে ভুলগুলি থাকায় অর্থবোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা কিম্বা গান বেসুরা হইবার সম্ভাবনা সেইগুলি সংশোধিত হইল।

ছাপায় কোন কোন স্থলে স্বরলিপির মাত্রাসংখ্যা বেঠিক হইয়া যায়; যথা চারি মাত্রার তালে কোন ঘরের মাত্রা সংখ্যা হয়ত পাঁচ কিম্বা তিন হইয়া গিয়াছে। সে স্থলে বিজ্ঞ পাঠক নিজে ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইবেন।

ভুষণা ও মুকুন্দ রায়।

বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে ভূষণার মুকুন্দ রায় একজন বিশেষ স্মরণীয় ব্যক্তি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী জমিদারদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি একটুকু স্বাধীন ভাবে সৈন্য সমাবেশ করিয়া নবাব বা বাদশাহগণের অধীনতা জাল ছিন্ন করিয়া দেশের মধ্যে মাথা তুলিয়াছিল তাঁহাদেরই অনেকের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠে রঞ্জিত রহিয়াছে। পাঠানরাজ্যের উৎপত্তির সঙ্গে এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি বা জমিদারীগুলির সৃষ্টি হয়। আবার মোগল অভ্যুদয় কালে পাঠানরাজ্যের অধঃপতনের সঙ্গেই এই রাজ্য বা জমিদারীগুলির কতক উন্নতি কতক অবনতি ঘটে।

বক্তিয়ার খিলিজী, যখন বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিয়া প্রবল বাত্যারূপে পূর্ব্ব বঙ্গের দিকে আপতিত হইতেছিলেন, অনুমান হয় সেই সময় বাকলা চন্দ্রদ্বীপের "দনুজমর্দ্দন" রায়ের বংশাবলী অথবা নিকট সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কি কুটুম্বগণ ছড়াইয়া পড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে কয়টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী সৃষ্টি করেন। কালে সেই জমিদারীর সৃষ্টিকর্ত্তাগণ আপনাপন গৃহবিচ্ছেদ, সমাজবিরোধ প্রভৃতি কারণে নানা সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়েন। দনুজমর্দ্দন রায় নিজে বঙ্গজ কায়স্থ এবং এই সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদারীর প্রবর্ত্তয়িতাগণও বঙ্গজ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত। বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, লক্ষ্মণমাণিক্য এবং ভূষণার মুকুন্দ রায় ইহাঁরা আবার বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের প্রবর্ত্তয়িতা। মোট কথা বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে চারিটী পৈট বা দল আছে;—(১) বাকলা চন্দ্র দ্বীপের পৈট বা বাখরগঞ্জী সমাজ; (২) বিক্রমপুর সমাজ; (৩) ভূষণাপৈট বা ফতে-পুরে সমাজ; এবং (৪) টাকি শ্রীপুরের সমাজ। বঙ্গজ-কায়স্থগণ ফতেপুর নামক কোন স্থানবিশেষে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল বলিয়াই "ফতেপুরে" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবে। আমাদের আলোচ্য ভূষণার ভৌমিক মুকুন্দরায় এই "ফতেপুরে" সমাজভুক্ত বঙ্গজ কায়স্থ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন।

ভূমি শব্দের প্রতি ইক্ প্রত্যয় করিয়া বঙ্গভাষায় যে ভৌমিকশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা হইতেই বোধ হয় তৎকালে ভূসম্পত্তিশালী জমিদারদিগকে ভৌমিক বা ভুঞা বলিত। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গের গণ্যমান্য দ্বাদশজন জমিদার কে "বারভুঞা" বলা হইয়াছে। এই সমস্ত ভৌমিকদিগের কোনরূপ ধারাবাহিক বৃত্তান্ত অদ্যাপিও সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত নাই। প্রাচীনের নিকট গল্প, জনশ্রুতি, তাম্রফলক, বাটীর ভগ্নাবশেষ, খনিত জলাশয়, স্তূপাকার মৃত্তিকা এবং মধ্যে মধ্যে দুই একখানা দান পত্রের নমুনা

ভিন্ন ভৌমিকগণের বিষয় অবগত হওয়ার বিশেষ কোন উপায় নাই। আমরা বহুদিবস হইতে "দ্বাদশ ভুঞা"দিগের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাপিও বিশেষ কোন ঐতিহাসিক সত্য নিস্কাশিত করিতে পারিতেছি না; তবে সময় সময় যৎসামান্য যাহা অবগত হইতেছি তাহাই সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া যাইতেছি। অনুমান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ফরিয়াদপুর জেলার দক্ষিণে এবং যশোহর জেলার পূর্ব্ব অংশে প্রাচীন ভূষ।। সংস্থাপিত হয় এবং অদ্যাপিও ভূষণা নামে একটী সামান্য জনপদ বঙ্গের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে যে স্থান দিয়া মধুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে তাহার উত্তর-পশ্চিম অংশে "কালী গঙ্গা" নামক এক নদীর "খাদ্" বর্ত্তমান রহিয়াছে; অনুমান হয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নদী প্রবাহিত ছিল। ভূষণা ইহারই তীরে সংস্থাপিত; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কতক বারাশীয়া নদীর, কতক মধুমতীর নির্ম্মল জলরাশি ভূষণার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এক সময় ভূষণা সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। আজ কাল বঙ্গের যেমন রাজধানী কলিকাতা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে সেইরূপ ভূষণা পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে "সংগ্রামসা" নামক এক ব্যক্তি ভূষণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। জনপ্রবাদ এই যে সংগ্রামসাহের জাতিজ্ঞান অল্পই ছিল। তিনি বঙ্গবাসীদিগের নিকট ব্রাহ্মণের নিম্নেই কোন জাতি উচ্চ ইহা প্রশ্ন করিয়া উত্তর শুনিয়াছিলেন "বৈদ্য-জাতি," তাই তিনি "হাম বৈদ্যি" বলিয়া পরিচয় দিতেন, তদবধি এ অঞ্চলে "হাম বদ্দী" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। এই সম্প্রদায়ের লোক অম্বষ্ঠজাতির সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধে কোন অংশে চিরপ্রচলিত নিয়মে বদ্ধ নহে। এক সময় যে ভূষণা সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল—অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। আমরা স্বচক্ষে ভূষণার এক বৃহদাকার জলাশয় দেখিয়াছি; স্তূপাকার ইষ্টকরাশি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। কলিকাতার স্যারকুলার রোডের ন্যায় বিস্তীর্ণ আকার অথচ অত্যুচ্চ একটী রাজপথের ভগ্নাবশেষ এখনও ভূষণার বিগত গৌরবের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত নিদর্শনগুলি ঠিক কোন সময়ে সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান ছিল তাহা জন-প্রবাদ কিছুই বলিতে পারে না; তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগের বোধ হয়,যে, ভূষণার মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণের গৌরবের চিহ্ন এ নিদর্শনগুলি নহে; কেননা অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গের শিবজী, সীতারাম রায়, ভূষণার মুসলমান গৌরবের চিহ্ন একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান জলাশয়টী দেখিলে মুসলমানদিগের খনিত বলিয়া বোধ হয় না।

রাজধানীতে যে প্রকার বহুবিধ লোকের সমাগম আমরা অদ্যাপি দেখিয়া আসিতেছি ভূষণায়ও তাহা যথেষ্টরূপে ছিল; অদ্যাপিও তাহার নিদর্শন আছে। যশোহর ফরিদপুরে অদ্যাপিও "ভূষণাই পটী" নামক তিলী, বেণে প্রভৃতি বর্ণের সমাজ আছে। বিগত নীল-

বিদ্রোহের আকরস্থান বিনোদপুর এবং মহাম্মদপুরেও "ভূষণাই পটী" তিলী, বেণে, কর্ম্মকার, রজক, প্রামাণিক প্রভৃতি জাতির বসতি আছে; এক সময়ে ভূষণা যে বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ভূষণার সাতৈরের "শীতল পাটী" অতি প্রসিদ্ধ। বোয়ালমারির কার্পাস সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরও উদরপোষণ করিয়াছে। মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রস্তরসদৃশ বহুবিধ বাসন, প্রদীপ ঘট, সুরই বহুদিন হইতে এ দেশে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। জনপ্রবাদে জানা যায় ভূষণা হইতেই পূর্ব্ব বঙ্গে "ইক্ষুভঙ্গপদ্ধতি প্রথা" প্রচলিত হইয়া ইক্ষু গুড়ের আরম্ভ হয়।

যে সমস্ত কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণগৃহস্থগণ ভূষণার নিকট বাস করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশের নিস্কর ভূমিগুলি নাকি ভূষণাপতি মুকুন্দ রায়ের দত্ত; তবে কতক সীতারামেরও বটে। যশোহরের পূর্ব্বে অথচ ভূষণার নিকটস্থ "দীঘলবালা" গ্রামে কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভূষণাপতি মুকুন্দ রায়ের নামলিখিত এক খানি পুরাতন তুলট কাগজের "তায়দাদ" আছে। মুকুন্দ রায় কোন্ সময়ে নশ্বর মানবদেহ ত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। তবে মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতি সময়ে যে তাঁহার উন্নতি হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত; কেন না, আকবর শাহের সমকালীন সময়ে "বার ভূঞা" প্রথা প্রচলিত হয়। বিদ্রোহী পাঠানগণ ভূষণা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদের হস্তেই সম্ভবতঃ ভূষণার অধঃপতন হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের হস্তে যে ভূষণার শাসনদণ্ড দীর্ঘ দিন পরিচালিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান হয় না। কেন না এক সময়ে ভূষণা দিল্লীর মোগল ভূপতিগণের প্রতিনিধি মুরশিদাবাদস্থাপয়িতা ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব মুরশিদকুলি খাঁর জামাতা "আবুতারফ" দ্বারা শাসিত হইত এবং দিল্লী হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত "সংগ্রামসা"ও এক সময় ভূষণার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন। যৎকালে আবুতারফ ভূষণার ফৌজদার সেই সময় সীতারাম ভূষণা দখল করেন। মুকুন্দ রায় সীতারামের কিঞ্চিদধিক দুই শতাব্দীর ঊর্দ্ধতন লোক। কিন্তু এই দীর্ঘ সময় পর্য্যন্তও মুকুন্দ রায়ের রাজশ্রীর চিহ্ন ভূষণায় ছিল। যখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে সীতারাম ভূষণা আক্রমণ করিয়া মুসলমানী প্রাসাদ ভগ্ন করেন; তখনও মুকুন্দ রায়ের নাম ঘোষিত হইত। শুনা যায় তাঁহার এক রূপসী কন্যার রূপজমোহে মুগ্ধ হইয়া পাঠান সর্দ্দার না কি ভূষণা দখল করিয়া হিন্দু ললনার ছায়া স্পর্শ করাতে হিন্দু লক্ষ্মীর হস্তেই জীবনত্যাগ করিয়াছিল।

বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ ১২৯১ সালের চৈত্র মাসের ভারতীতে "বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিহাস শীর্ষক প্রবন্ধে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে সনদ্বীপ অধিকারের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "সার্দ্ধ দ্বি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া লঙ্কা বিজয় করিতে ধাবিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে জাতির জলরণপাণ্ডিত্যের খ্যাতি উজ্জয়িনীনগরনিবাসী কবিকুলতিলক কালিদাসের কর্ণ

গোচর হইয়াছিল, ১২।১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে চীন পরিব্রাজকগণ যে জাতির অর্ণবপোত সকল মহাসমুদ্র বক্ষে ভাসমান দর্শন করিয়াছিলেন, ১৬০২ খৃষ্টাব্দে সেই বাঙ্গালী জাতির সেই গৌরব সূর্য্য, বঙ্গোপসাগরে সনদ্বীপ সমক্ষে অস্তমিত হইল। আর কি উদয় হইবে না? আর কি বাঙ্গালীরা সমুদ্রের বক্ষে পদাঘাত করিয়া দেশদেশান্তরে বিচরণ করিবে না? আর কি বাঙ্গালী জাতির অর্ণবপোত সমূহের উন্নত পতাকার প্রতিবিম্ব সৌর-মণ্ডল উপকূলে, সিংহল, যব, বালীদ্বীপে পতিত হইবে না। আর কি বঙ্গীয় নাবিকদিগের সুমধুর ভাটীয়াল গীত সামুদ্রিক হিল্লোলে নৃত্য করিয়া মহাসমুদ্রগামী ভিন্নদেশীয় মানব-দিগের কর্ণকুহরে অমৃতধারা সিঞ্চন করিবে না?"

যাহা হউক বঙ্গের বিগত গৌরবের আলোচনায়ও বর্ত্তমান নির্জ্জীব বাঙ্গালীর হৃদয়ে কতক সজীবতা ফিরিয়া আসে। যখন মনে আসে এই দেশে এই "প্লীহা ফাটিয়া মরণাপন্ন" জাতির দেশে সিংহলবিজয়ী বীরের কথা দূরে থাক্ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দনুজমর্দ্দন রায়, প্রতাপ আদিত্য কেদার রায় ও চাঁদ রায়, সীতারাম রায়, লক্ষ্মণ মাণিক্য, মুকুন্দ রায়প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন জানি বাঙ্গালী চিরপরাধীন দুর্ব্বল জাতি নয়, উত্তরাধিকারিতা সূত্রে পূর্ব্বপুরুষের বীর্য্য আমাদের দেহে কি কিছুমাত্র নাই?

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু ও বিদেশীয় সৃষ্টিতত্ত্বের ঐক্য।

অন্যান্য সভ্য জাতিরা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করেন। কিন্তু হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা বা দেবদেবীর উপাসনার অভ্যন্তরে যে কি গূঢ় ও অনির্ব্বচনীয় সত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত ও রোমাঞ্চিত হইতে হয়। যদিও আমরা পরে সৃষ্টি ও মানবতত্ত্ব পর্য্যালোচনার সময় পর্য্যায়ক্রমে উহা প্রমাণ করিব কিন্তু আপাততঃ সর্ব্বধর্ম্মের মূল যে এক তাহার প্রমাণ জন্য এই স্থলে সংক্ষেপতঃ দেবদেবীর মৌলিকতত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয় দর্শান আবশ্যক। তদ্দ্বারা আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় রহস্য ভেদ ও প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় কথঞ্চিৎ সহজ হইতে পারে।

আমাদের ষড়দর্শনের মধ্যে সাংখ্যদর্শনই আদি ও প্রধান এবং জাগতিক গূঢ়তত্ত্ব ও সৃষ্টিক্রম সকল ঐ সাংখ্যদর্শনে অতি পরিষ্কাররূপে মীমাংসিত হইয়াছে। ঐ সাংখ্য-দর্শনে উল্লিখিত জাগতিক মূল প্রকৃতি ও আমাদের পৌরাণিক মহাকালী একই। উহাই ক্যাবেলিষ্টিকগণের সেফিরা (Sephira, the female principle)। ঐ দার্শনিক,

পৌরাণিক, ক্যাবেলিষ্টিক ও পিথাগরীয়ান্‌দিগের মতের পরস্পরের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি হইতেই অনন্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। উক্ত পুরুষই ক্যাবেলিষ্টিক-গণের এন্‌সফ্ (Ensoph, the male principle); তাঁহারা বলেন "সেফিরা (প্রকৃতি) এনসফের (পুরুষ) সহিত সংযুক্ত হইয়া দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বস্তুই সৃষ্টি করিয়াছেন।* আমাদের সমস্ত পৌরাণিক দেবদেবীই যে মানবের সদ্‌বৃত্তি বা উচ্চশক্তি এবং অন্তর ও বাহ্য জগতের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ, দৈত্য পিশাচাদি কুবৃত্তি ও কুশক্তি সকল, ঋগ্‌বেদ ও উক্ত বেদবিহিত সন্ধ্যা ও বন্দনাদির মধ্যে বিশেষতঃ উপনিষৎ ও সাংখ্যদর্শন প্রভৃতি সমস্ত দর্শন শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি আমাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মপুস্তক ভগবদ্গীতার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রতিছত্রে উপরোক্ত গূঢ় দার্শনিকতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক সত্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। উহা আমরা পরে পর্য্যায়ক্রমে দেখাইব। তবে এই স্থানে প্রধান প্রধান সভ্যজাতির দর্শনশাস্ত্র হইতে সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে গুটি-কয়েক স্থূল স্থূল বিষয় বিবৃত করা আবশ্যক।

সাংখ্যকারের মতে অষ্ট প্রকৃতি ও ষোড়শবিকার। ঐ অষ্ট প্রকৃতির মধ্যে মূল প্রকৃতি এক। তাহার মধ্যে দুইটি সূক্ষ্ম ও পাঁচটী স্থূল প্রকৃতি আছে। ষোড়শবিকার, প্রকৃতির বিকৃত অবস্থা মাত্র। ঐ দুইটী সূক্ষ্ম প্রকৃতি সাংখ্যকারের মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব। উহা হইতে সমস্ত সৎ ও অসদ্‌বৃত্তিযুক্ত মনের সৃষ্টি হইয়াছে। অসদ্‌বৃত্তির মূল আসক্তি ও বাসনা এবং উহাই ক্যাবেলিষ্টিকগণের Spiritus and Nazarenes,। উহা হইতেই আমাদের ষড়রিপু, ক্যাবেলিষ্টিকদিগের Seven capital sins, এবং সদ্‌বৃত্তির মূল প্রীতি ও ভক্তি হইতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত দশবিধ ধর্ম্ম ও ক্যাবেলিষ্টিকদিগের Seven Cardinal Virtues সৃষ্ট হইয়াছে।

পাঁচটী স্থূল প্রকৃতিই পদার্থ শক্তি অর্থাৎ কঠিন, তরল তেজ ও বায়ু প্রভৃতির মৌলিক-তত্ত্ব। ইহাই ক্যাবেলিষ্টিকগণের Karaletanos or the spirit of matter। ঐ স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি হইতে দশটী ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ু (বায়ুর ৫টী গুণ বিশেষ) ও মনো-বৃত্তি এই ষোড়শবিকারের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডিক মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব, ক্যাবেলিষ্টিক-গণের Adoni and Animamundi বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই ক্যাবেলিষ্টিকগণের মতে উহারা সৃষ্টিকর্ত্তা। "The King of Light and Creator" উহাঁরাই আমাদের পৌরাণিক বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, এবং খৃষ্টানদিগের আদম (Adam)। আমাদের প্রকৃতি ও পুরুষ সংযুক্ত ঈশ্বরই আদমক্যাড্‌মন্; (Adam Kadmon)। উহা হইতে সৃষ্টিকারী দ্বিতীয় আদমের (Adam the Second) উৎপত্তি হয়। আমাদের পৌরাণিক মতেও মহাবিষ্ণু হইতে সৃষ্টিকারী ব্রহ্মার উৎপত্তি। দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে সাংখ্যকারের মতে

* Isis Unveiled Vol. I. p, 272.

প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বের সৃষ্টি। খৃষ্টানদিগের সর্পই (The serpent) ক্যাবেলিষ্টিকগণের Karaletanos। আমাদিগের পৌরাণিক মতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবাসুরের পিতামহ। দার্শনিক মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব হইতে অন্তর ও বাহ্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ অন্তর ও বাহ্য জগতের সমস্ত সদ্‌বৃত্তি বা উচ্চ শক্তিই দেবগণ ও অসৎবৃত্তি বা নীচশক্তিসমূহ অসুরগণ।

যদিও পাঁচটী স্থূল ভূত প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত আছে কিন্তু ঐ স্থূল ভূত সকল যে সূক্ষ্মভূত হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা সমস্ত দর্শনশাস্ত্রসম্মত। যথা ;—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে যথাক্রমে বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী অর্থাৎ উহাদের প্রত্যেকের উপাদানের সৃষ্টি হইয়াছে। জাগতিক অহংতত্ত্ব ব্রহ্মা; ও আকাশ কশ্যপ; (অদিতি কশ্যপের স্ত্রী ও দেবগণের মাতা। উহা আকাশের শক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যথা ;—

যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী।
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠতি সাঃভূতেভির্ব্যজায়ত॥

(কঠোপনিষৎ ৪র্থ বল্লী ৭ম শ্লোক)।

বঙ্গার্থ—জগতের প্রাণ (Cosmic force) হইতে হিরণ্যগর্ভরূপে দেবতাময়ী অদিতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ অদিতি সর্ব্ব জীবের হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। এ দিকে ক্যাবেলিষ্টিকগণের Animamundi হইতে Spirit and Nazarenes ও উহা হইতে Karaletanos উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাদানের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। অতএব মনুষ্য ও সমস্ত জীব জন্তুর অন্তর ও বাহ্য শক্তি ও উপদান সকল, অন্তর ও বাহ্য জগতে বিরাজমান আছে। এই জন্যই জীবের মানসিক ও শারীরিক শক্তির সহিত অন্তর ও বাহ্য জাগতিক দৃশ্য ও অদৃশ্য পদার্থশক্তির বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত আকাশীয় পদার্থশক্তি ও এই পৃথিবীস্থ জীবশক্তি সকল পরস্পর সম ও বিষম জাতীয় বিধায়পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। ঐ সকল শক্তির ক্রিয়া, স্থিতি ও গতি প্রভৃতি নির্ণয় দ্বারা ফলিত জ্যোতিষের (Astrology) সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক সমস্ত বাহ্য পদার্থশক্তি অন্তঃশক্তির ন্যায় সৎ ও অসৎ এই দুই ভাগে বিভক্ত।

এক্ষণে যদি প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ অনন্ত জগতের অন্তর্বাহ্য সমস্ত শক্তি নির্ণয় করিয়া বহু অংশে বিভক্ত করতঃ তাহার ক্রিয়া শক্তি স্থির করিয়া থাকেন তবে সেই সকল মহাত্মাগণ, যে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী ও চিহ্নিত ব্যক্তি তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ সকল শক্তি আয়ত্তাধীনে আনার নাম যোগসিদ্ধি। উহার স্থিতি,গতি,ক্রিয়া ও ফল প্রভৃতি নির্ণয়ের নাম জ্যোতিষ শাস্ত্র ; তত্ত্ব নির্ণয়ের নাম দর্শন শাস্ত্র ; দোষ ও গুণ প্রভৃতি নির্ব্বাচনের নাম শ্রুতি, স্মৃতি, চিকিৎসা ও আইন প্রভৃতি এবং উহার রূপক ও অলঙ্কারই আমাদের

পুরাণ, ঐ সকল শক্তি সাধনে আনার নাম তন্ত্র ইত্যাদি। মূল প্রকৃতি ঠিক ত্রিগুণান্বিত। আর্য্যঋষিগণ প্রকৃতিকে ত্রিগুণে বিভক্ত করিয়াছেন। অন্যান্য দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণও প্রকৃতির ঐরূপ গুণত্রয় নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রে সত্ব বিকাশশক্তি, রজঃ পরিচালন শক্তি ; তমঃ পোষন শক্তি। সত্ব হইতে জ্ঞানের বিকাশ (উহা দৈবী-শক্তি) রজঃ হইতে প্রবৃত্তি ও উদ্যমের (উহা তৈজস বা আসুরিক শক্তি) ও তমঃ হইতে ভ্রান্তি মোহের (উহা পৈশাচিক বা পদার্থশক্তি) সৃষ্টি হইয়াছে। ক্যাবেলিষ্টিক ও পিথাগরীয়ানদিগের মতও ঐ প্রকার। ক্যাবেলিষ্টিকগণ রূপান্তর ও ভাষান্তরে উক্ত ত্রিগুণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা ;—

In the shoreless ocean of space radiates the central, spiritual and invisible sun. The universe is his body, spirit and soul and after this ideal model are framed all things ...... The first light is his soul, the Infinite, Boundless and Immortal breath : under the efflux of which the universe heaves its mighty Cosom' infusing Intelligent life throughout creation. The second emanation condenses cometary matter and produces forms within the Cosmic-circle : sets the countless worlds floating in the electric space, and infuses the unintelligent, blind life-principle into every form. The third, produces the whole universe of physical matter; and as it keeps gradually receding from the Central Divine Light its brightness wanes and it becomes Darkness and the Bad (Isis Unveiled page 302.)

তাৎপর্য্যার্থ। অসীম অনন্ত আকাশের মধ্যে কেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক ও অদৃশ্য দীপ্তমান সূর্য্য বিরাজমান আছেন (ইহাই ভগবদ্গীতার দ্যাবা পৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ (এবং) স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং)। এই অনন্ত জগৎ তাঁহার দেহ আত্মা ও জীবন। এইরূপে অগ্রে আদর্শ জগৎ (অন্তর্জগৎ) সৃষ্ট হইয়া তদনুসারে সমস্ত বাহ্য বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথম দীপ্তিই তাঁহার জীবন ও তাঁহার সেই অনন্ত অসীম এবং অবিনশ্বর নিঃশ্বাস। এই নিঃশ্বাস বহির্গমন হইতে অনন্ত জগতের অনন্ত শক্তিরাশি সমস্ত জগতে প্রবুদ্ধ জীবনীশক্তি বিস্তার করিয়াছে (ইহাই আমাদের সত্বগুণ)। তাঁহার দ্বিতীয় শক্তি নিঃসরণই আধ্যাত্মিক তৈজস উপাদান ; ইহা দ্বারা বৈদ্যুতিক অনন্ত আকাশে অগণ্য অনন্ত জগতের আদর্শ সকল ভাসমান। ঐ শক্তি বিস্তার দ্বারা জগতস্থ প্রত্যেক বস্তুর আভ্যন্তরীণ অপ্রবুদ্ধ জীবনীশক্তির সৃষ্টি হইয়াছে (ইহাই রজঃগুণ)। ঐ পদার্থ শক্তি কেন্দ্রিক দৈবী জ্যোতি হইতে ক্রমে দূরবর্ত্তী হওয়ায় উহার উজ্জলতা ক্রমে মলিন তমসাচ্ছন্ন এবং কুপদার্থে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট,—পিথাগরীয়ানদিগের Divine Light, astral light and material light (magnetic fire).

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দার্শনিক মীমাংসা শিক্ষাতত্ত্ব প্রণেতা।

সহস্র ধারা।

গুচ্ছপাণি দর্শন শেষ ক'রে বাসায় ফিরে হাত পা বেদনার কথা আর কহতব্য নয়। তার পর দিন শনিবার চুপচাপ কোরেই কেটে গেল। কিন্তু রাত্রে আবার আমাদের সভা বোসলো, সভায় সভ্য আমরা পাঁচ ছয় জন; রবিবারে কোথায় যাওয়া যায় এ নিয়ে সভ্যগণের মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত। তিন জন সিদ্ধান্ত কোল্লেন তাঁরা লছমন সিদ্ধির পাহাড়ে যাবেন; লছমন সিদ্ধি দেরাদুন হ'তে ৬ মাইল, লছমন নামে একজন সন্ন্যাসী লছমনে যোগসিদ্ধ হয়ে ছিলেন তাই সে স্থান পবিত্র। আমরা দুই বন্ধু সহস্র ধারা দর্শনের বন্দোবস্ত কল্লুম; সহস্র ধারা দৃশ্য শোভার জন্য ভারতবর্ষে বিখ্যাত। রবিবার অতি প্রত্যুষে লছমন সিদ্ধির দল রওনা হওয়ার পর আমরা যাত্রা কল্লুম, আজ আমি পদব্রজে চল্‌তে নিতান্তই নারাজ, গোড়ে বলদের মত এলিয়ে পড়লুম; কাজেই একখানা এক্কা ভাড়া ক'রে তার উপর দেহভার সংস্থাপন করা গেল এবং বেলা নটার সময় রাজপুর নামক একটা সহরে উপস্থিত হয়ে আর গাড়ী চলবার রাস্তা নেই দেখে আমরা সেখানেই অবতরণ কল্লুম।

রাজপুর একটা ছোট নগর, কতকগুলি সাহেবী হোটেলে ও ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকায় এই ক্ষুদ্র নগর পূর্ণ। সাহেবেরা মসুরী বা ল্যাণ্ডর সহরে উঠবার সময় এখানে খানাপিনা শেষ ক'রে থাকেন। রাজপুর হতে ক্রমাগত দুই হাজার ফিট্ উপরে উঠ্‌লে মসুরী যাওয়া যায়; নিকটে আর একটা বড় আড্ডা নেই বো'লে এখানে লোকের জনতাও কিছু বেশী। রাজপুর দেখ্‌লে মনে হয় মানব তার ক্ষুদ্র হাত দুখানিতে প্রকৃতি দেবীর পাষাণময় অঙ্কে একখান খেলানার দোকান সাজিয়ে রেখেছে। নির্জ্জন পর্ব্বত ক্রোড়ে জনকোলাহল পূর্ণ মানব অশ্ব ও যানসঙ্কুল এই ক্ষুদ্র জনপদ বেশ মনোরম। বিশেষ শরতের এই উজ্জ্বল প্রভাতে এই পীত রৌদ্রে যখন অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশ ও কর্ম্মশীল মনুষ্যগণের উৎসাহপূর্ণ মুখ হাস্যময় বোধ হচ্ছিল তখন আমার মনে সুশ্যামল বঙ্গদেশের শরতের প্রভাতে এক মধুর পল্লীগ্রামের দৃশ্য মনে পড়ছিল।

রাজপুর হতে সহস্রধারা দু মাইলের কিছু বেশী। আমি পূর্ব্বাপরই হাঁটতে নারাজ, কিন্তু পাহাড়ে ডাণ্ডিছাড়া আর উপায় নেই, কাজেই পাঁচ শিকা দিয়ে এক ডাণ্ডি ভাড়া করা গেল, শালপ্রাংশুমহাভুজ চার পাহাড়ীর কাঁদে স ডাণ্ডি আমার এই সুগুরু দেহভার সংস্থাপিত ক'রে উপরে উঠ্‌তে লাগলুম। বন্ধুবর ও চ—বাবু মাথায় চাদর বেঁধে লাঠি হাতে পদব্রজে চোল্লেন, তাঁর ছত্রটি পর্য্যন্ত আমার মস্তকে ছায়া দান কোর্ত্তে লাগলো। এই রাজবাঞ্ছিত অভিযানে আমার মনে ভারি আনন্দ বোধ হ'তে লাগলো কিন্তু যাঁরা এই রকম পরের স্কন্ধে বিচরণ কো'রে, আপনার সাহঙ্কার দৃষ্টির নীচে বিশ্বসংসারকে 'নস্যাৎ'

ক'রে এক অপূর্ব্ব গর্ব্ব অনুভব করেন তাঁদের সেই আনন্দ আস্বাদন করা আমার ভাগ্যে ঘ'টে উঠেনি। পাহাড় দিয়ে নাবাউঠা করা এক দুরূহ ব্যাপার, এক এক-বার উঠ্তে যেন বুক ভেঙ্গে যায়, আবার নাববার সময় বোধ হয় কে যেন পা দুখানা ধ'রে সবলে নীচের দিকে টান দিচ্ছে, আমার মনে ভয় হতে লাগলো বুঝিবা ডাণ্ডিওয়ালারা এখনি মুখ থুবড়ে পড়বে আর আমি ডাণ্ডি সমেৎ ধরণীতলে পতিত হয়ে ইহ জীবনের সুখ মিটিয়ে ফেলবার সুবিধে পাব। যাহোক বাল্যকাল হ'তেই ফিলজফাইজ করার প্রতি আমার কিছু অতিরিক্ত ঝোঁক আছে কাজেই আমার মনে হ'তে লাগলো পাহাড়ে উঠা-নাবা পাপ পুণ্যের পথ মাত্র, পুণ্য পথে উঠা যেমন কঠিন, পাপ পথে অবতরণ তেমনি অনায়াসসাধ্য; কিন্তু এই আদিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মধ্যে বিলক্ষণ একটা বৈসাদৃশ্য আছে; পাহাড়ে নাবতে আরম্ভ ক'রে ইচ্ছা হোলেই আমরা একটু থেমে আবার উঠতে পারি, কিন্তু পাপপুণ্যপথের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তা সুধু একটু মাত্র ইচ্ছাতেই অতিক্রম করা যায় না; তা অতিক্রম কর্ত্তে হৃদয়স্থ দেববল ও পশুবলের অবিশ্রাম সংগ্রাম অপরিহার্য্য; পাপ পুণ্যের গতি সামান্য ইচ্ছা দ্বারা নিয়-ন্ত্রিত হবার নয়।

ডাণ্ডিতে চ'ড়ে দু মাইলের কিছু বেশী পথ অতিক্রম ক'রে বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় এক বটবৃক্ষ তলে উপস্থিত হওয়া গেল, আমার সঙ্গী পূর্ব্বেই সেখানে উপস্থিত হয়ে বিশ্রাম কচ্ছিলেন; আমি এইখানে ডাণ্ডি ছাড়লুম, এখানে এসে আমাদের একটা নির্ঝর পার হ'তে হোল, এই নির্ঝর খানিক দূর গিয়ে সহস্র ধারায় মিশেছে; আমরা সেই নির্ঝর পার হ'য়ে তার অপর পার দিয়ে অগ্রসর হলুম এবং বরাবর সেই ঝরণার ধার দিয়ে যেতে লাগলুম। দু দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বত, পর্ব্বত গাত্রে সহস্র প্রকার সুন্দর পুষ্প বিকশিত, আর শত শত সমুন্নত বৃক্ষ তাদের সুদূরবিস্তৃত শাখা প্রশাখায় সেই রমণীয় প্রদেশ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেচে; কুল কুল শব্দে ও বিহঙ্গকুলের হর্ষকাকলীতে সেই বিজন প্রদেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে; আমার মনে হোল, ত্রিদিবের নন্দন কানন এমনিই হবে, মন্দাকিনীর স্ফটিক প্রবাহ এমনিই নির্ম্মল ও শুভ্র, দেববালা-গণের অমর সঙ্গীত এই বিহঙ্গ কাকলীর মতই মধুর, এ কাকলী যেন মূক প্রকৃতি মাতার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দগীতি।

সেই নির্ঝরের ধার দিয়ে সোজা চ'লে অল্পদূরেই সহস্রধারা দেখতে পেলুম; সহস্র ধারায় জল পড়ছে এই অর্থে নির্ঝরের নাম 'সহস্র ধারা', সহস্রের অর্থ এখানে অসংখ্য। আমরা যে দিকে দাঁড়িয়েছিলুম সেই পারেই সহস্রধারা, কিন্তু সম্মুখে আর রাস্তা না থাকায় আমাদের অপর পার অবলম্বন কর্ত্তে হলো। এই সময় আমাদের দুজন পাহাড়ী পথপ্রদর্শক জুটেছিল, সাহেব বা কোন বড় লোক দেখলে এরা পথ দেখিয়ে দেয় এবং নানা প্রকার প্রস্তর খণ্ড সংগ্রহ ক'রে এনে উপহার দেয়, বলা বাহুল্য এই উপায়ে এরা

যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে। আমাদের যখন এরা বড় লোক ব'লে ঠিক করেছিল তখন এদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতাকে তারিফ কর্ত্তে হয়।

অপর পারে যে পর্ব্বত হ'তে অজস্র ধারে জলধারা পড়ছিল আমরা ঠিক তারই নিকটে গিয়ে দাঁড়ালাম; যে দৃশ্য আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হ'লো তা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, বাস্তবিকই তা বর্ণনার বিষয় নয়, স্বধু চেয়ে দেখা ও আপনাকে ভুলে যাওয়া ভিন্ন ভাববার বিষয় কিছু থাকে না কেবল মনে হয় "Gaze, wonder and adore." প্রাণ তখন আপনা হতেই বিশ্বপিতার চরণে অবনত হয়, ভগবানের স্নিগ্ধ প্রেম অতি বড় অবিশ্বাসীর হৃদয়ও ধীরে ধীরে আপ্লুত করে ফেলে, এমনি হৃদয়মুগ্ধকারী দৃশ্য, কবিত্বপূর্ণ সৌন্দর্য্যের মধুর বিকাশ, উদার নির্ঝরিণীর মর্ম্মস্পর্শী চিরকলতান! সৃষ্টির কোন্ প্রথম দিনে সমুজ্জ্বল প্রভাতালোকে বুঝি কোন নির্ঝর বালার বক্ষ হতে পাষাণভার অপসারিত হয়েছে তাই সে তার দীর্ঘ কারাবাসের অবসানে নিস্তব্ধ চতুর্দ্দিক তার প্রেমানন্দ রবে ঝঙ্কারিত কর্ত্তে কর্ত্তে আপনার লক্ষ্য পথে অগ্রসর হচ্ছে, এ গানের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই; কত পাখী তাদের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কিন্তু তার কুলুধ্বনির শেষ হয় নি, কত পূর্ণিমা নিশি নির্ব্বাক হয়ে তার স্বচ্ছ রজতস্রোতে ঢল ঢল শুভ্র চন্দ্রিকা রাশি ঢেলে দিয়েছে, আবেশবিহ্বল মৌন দৃষ্টিতে তার উচ্ছ্বাস নিরীক্ষণ করেছে, সে উচ্ছ্বাসের আজও শেষ নেই; কত সুন্দর ফুল নির্ঝরের চতুর্দ্দিকে ফুটে তার কলতান সুরভিত করে তাদের পাষাণ শয্যায় দেহলতা পাতিত করেছে, সে তবু ছুটে চলেছে।

অত্যুচ্চ পর্ব্বত হ'তে যে অজস্রধারে জল পড়ছে, সে জলধারা সূক্ষ্ম নয়, মুক্তাফলের ন্যায় স্থূলাকারে পর্ব্বতের উপর হ'তে ক্রমাগত নীচে পড়ছে; এইখানে পর্ব্বত সম্মুখের দিকে অনেকটা হেলা, কাজেই তার গা হতে যে সমস্ত জলবিন্দু অবিশ্রান্ত পড়চে তা সোজাসুজি নীচেই পড়ে, অপর পারে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হয় যেন পর্ব্বতের উপর হ'তে কে অনবরত মুক্তা ঢেলে দিচ্ছে কিন্তু পৃথিবীর উষ্ণতায় তা গলে জল হয়ে যাচ্ছে। পর্ব্বত ঠিক সোজা হয়ে উঠলে এ শোভা দেখবার সুযোগ হতো না কারণ তা হ'লে পর্ব্বতের গা বয়ে জল পড়তো, কিন্তু বিধাতা এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য জগতের উপভোগ্য করবার জন্যই যেন পর্ব্বতকে মাটীর সঙ্গে সূক্ষ্মকোণী অবস্থায় স্থাপিত করেছেন, আর অবিশ্রান্ত মুক্তাস্রোত ধরণীতল সিক্ত করছে; নির্ঝর যেন অস্ফুটস্বরে গাচ্ছে;—

"তাঁহার আনন্দ ধারা জগতে যেতেছে ব'য়ে,
এস সবে নর নারী আপন হৃদয় লয়ে।"

বাস্তবিকই এই পুণ্য নির্ঝরস্রোতে একবার শরীর সিঞ্চিত করে নিলে আর শূন্য হৃদয়ে তৃষিত প্রাণে ফিরে যেতে হয় না তখন সত্যই মনে হয়

"দেখেছি আজি তব প্রেম মুখ হাসি,
পেয়েছি চরণ ছায়া
চাহি না কিছু আর পূরেছে কামনা,
ঘুচেছে হৃদয় বেদনা।"

মুক্তাফলের ন্যায় জলবিন্দু ক্রমাগত মাটীতে পড়চে, আর তার উপর সূর্য্যকিরণ-সম্পাত হওয়ায় সর্ব্বক্ষণই উজ্জ্বল রামধনু প্রতিফলিত হচ্ছে। একে ত সবই খুব সুন্দর তার উপর এই রকম রামধনু সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ, বিধাতা প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে যেন বিবাহবাসর সজ্জিত ক'রে রেখেছেন।

জ্ঞানের সহিত ভক্তি, কবিত্বের সহিত বিজ্ঞান এই মহাপুণ্য ক্ষেত্রে একত্র সম্মিলিত হয়ে কর্ম্মভূমির উদ্দেশ্যে দ্রুত ছুটছে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ ভ্রমণকারী সহস্রধারা দেখে Calcutta Reviewর কোন সংখ্যায় তার এক বর্ণনা প্রকাশ কোরেছেন, তাঁর বর্ণনার খানিক অংশ এখানে অনুবাদ করে দিলে বোধ হয় আমার বক্তব্য অনেক পরিষ্কার হবে। তিনি বলেন "এই দিন ভ্রমণের প্রারম্ভে আমরা একটী অতি সুন্দর দৃশ্য দেখে অতিশয় পুলকিত হয়েছিলাম, তা আবার একখানি শিলাখণ্ডের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকায় অধিকতর মনোরম দেখাচ্ছিল, আমরা নিকটে গিয়ে একটা উঁচু স্থানে দাঁড়াবামাত্রই হঠাৎ দেখতে পেলাম পাহাড়ের এক স্থান খনন করে তার ভিতর থেকে একটী ঝরণা ঝরুছে। এর দুপাশে দুটা গহ্বর থাকায় প্রায় ১০০ ফিট উঁচু একটী খিলান হ'য়েছে—তার তলাটা প্রস্থে ৮০ কিম্বা ১০০ গজ হবে। উপরে পাহাড়ের সকল স্থান হতেই জল চুঁইয়ে বিন্দু বিন্দু করে একটী গহ্বরে পড়ছে এবং সেখান হতে একটী ছোট খালের আকারে নীচে নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। ঝরণার ঠিক উপরে বড় বড় গাছ ও প্রচুর সতেজ গুল্ম থাকায় কতকটা ছায়া হয়েছে, আবার সূর্য্যের প্রখর কিরণ জলবিন্দুর উপর উজ্জ্বলরূপে প্রতিফলিত হয়ে সেই মনোহর দৃশ্যটীকে বর্ণনাতীত সুন্দর করে তুলেছে। গাছ পালার নানা প্রকার রঙ ও আলোও ছায়ার বৈচিত্র্যে তার উপরিভাগটী ঠিক মাদারঅব্‌পার্লের মত দেখাচ্ছে।"

সহস্রধারার এই মধুর দৃশ্য দেখার পর আমরা Sulpher Spring (গন্ধকের উৎস) দেখতে গেলুম। সেটি সহস্রধারা হতে বেশী দূরে নয়, আমরা যেতে যেতেই গন্ধকের অতি তীব্র গন্ধ পেলুম, নিকটে গিয়ে দেখি একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের গাত্রস্থ এক ছিদ্র পথে ধীরে ধীরে জল আসচে, সেই জলে গন্ধকের গন্ধ। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন ঐ পাহাড়ের ভিতর গন্ধকের খনি আছে, তাই চুঁইয়ে এ জল আস্‌চে। সুদৃশ্যের জন্য সহস্রধারা কবি ও ভাবুকের নিকট আদরণীয় কিন্তু বৈজ্ঞানিকের নিকটও তার কম আদর নয়। Dr. Warth এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁর কাছে কবিত্বের বড় মর্য্যাদা

নেই, তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক পুস্তকের (Manual of Natural Sciences) এক স্থানে লিখেছেন "চুণের পাথরের ভিতর দিয়ে যে ঝরণা আসে তার ভিতর কোন দ্রব্য রাখলেই তাতেই একটা চুণের লেপ পড়ে, রাজপুরের নিকট সহস্রধারায় আর একটী ঝরণার জলে লৌহ আছে ও আর একটীতে Hydrogen Sulphide এর গন্ধ পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত জিনিসের সঙ্গে সহস্রধারায় চুণের পাথরে যে সাদা Gypsum পাওয়া যায় তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে।" সহস্রধারার জল চুণের পাহাড় হ'তে পড়ছে তাই সে জলের এক আশ্চর্য্য গুণ হয়েছে, গাছ পাতা প্রভৃতি যা কিছু সেই জলে পড়ে তাই চুণ হয়ে যায়; Dr. Warth কতকগুলি এই রকমের সংগ্রহ ক'রে Forest School এ রেখে দিয়েছেন, আমিও সেই রকম অনেকগুলি পাথর এনেছি, একটাতে এক খণ্ড কাঠের খানিকটা কাঠ আছে বাকি অংশ পাথর হয়ে গেছে; গাছের পাতা ও ডাঁটা বেশ বুঝতে পারা যায় অথচ সমস্তটাই পাথর, এমন কি সুন্দর সুন্দর লতা পর্য্যন্ত কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়েছে; একটা গাছের পাতা এনেছি তার এক দিক পাথর হয়ে গেছে আর এক দিক পাতাই আছে। প্রকৃতি রাজ্যের এই আশ্চর্য্য নিয়ম দেখে হঠাৎ সঙ্গদোষ-গুণের কথা আমার মনে উদয় হলো, কোমল লতা পাষাণের সঙ্গে থেকে সেও পাষাণ হয়েছে! কত দেবচরিত্র যে নরপিশাচদের সহবাসে মনুষ্যত্ব হ'তে বঞ্চিত হয়ে পশুত্ব প্রাপ্ত হয় তার সংখ্যা নেই।

পূর্ব্বেই বলেছি সহস্রধারা সুধু দেখেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না; সেই আনন্দ ধারা, প্রেমধারা, পতিতপাবনী পূতধারার নীচে ব'সে শরীর পবিত্র ক'রে লওয়ার প্রলোভন সম্বরণ দুরূহ হয়ে উঠে। আমরা স্নানবস্ত্র পরিধান করে ঝরণার নীচে মাথা পাতলুম। মাথার উপর অজস্র জলধারা পড়তে লাগলো, যেন বহুদিনের পাপ তাপ ধৌত ক'রে আমার এই পাপকলুষিত, সংসার তাপে জর্জ্জরিত জীবনকে এক শুভ্র শান্ত পবিত্র পরিচ্ছদ পরিয়ে দিলে, এই পবিত্র ধারাপাতে শরীর যে রকম স্নিগ্ধ ও প্রফুল্ল হলো সে স্নিগ্ধতা ও প্রফুল্লতা বহুদিন অনুভব করিনি; এখান হ'তে আর উঠে আস্তে ইচ্ছা হচ্ছিলো না। এ দেশে আসার পর আমি কোন দিন শীতল জলে স্নান করিনি, কেবল এক দিন গুচ্ছপাণিতে স্নান ক'রেছিলাম তাও অল্প একটু জল মাথায় দিয়ে, কিন্তু এখানে এত শীতল জল অনবরত মাথায় দেওয়াতেও কিছুমাত্র অসুখ বোধ হ'লো না। স্নানান্তে আহারাদির পর এখানে অনেকক্ষণ বসে রইলুম, প্রাণ আর এস্থান ছাড়তে চায় না, সুধু ইচ্ছা করে নির্ঝরের কুলুধ্বনি, বিহঙ্গের কুজন আর প্রস্ফুটিত কুসুমসৌরভাকুল সমীরণের মৃদুহিল্লোলবিক্ষুব্ধ বৃক্ষপত্রের অবি-রাম শরশর শব্দে এই দুঃখশোকসন্তপ্ত, সংসারসংগ্রামে নিপীড়িত হৃদয়ের ক্লান্তি দূর করি।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে উঠে যে বৃক্ষতলে ডাণ্ডী রেখেছিলুম সেখানে ফিরে

এলুম, তখনো খানিকটে বেলা ছিল তাই বৃক্ষমূলে একটু বিশ্রাম করা গেল। ফিরবার সময় আমার সঙ্গী বন্ধুকে ডাণ্ডীতে চড়বার জন্য বিশেষ অনুরোধ আরম্ভ কল্লুম, অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তিনি ডাণ্ডীতে উঠলেন। আমি তাঁর অনুগমন কর্ত্তে লাগলুম। কিন্তু খানিক অগ্রসর হ'য়ে দেখি সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড চড়াই, এইখান হ'তে পাহাড়ের গা ব'য়ে উপরে উঠবার রাস্তা, কিন্তু রাস্তাটা ভয়ানক গড়ান, সেই গড়ান ব'য়ে উপরে উঠতে গেলে বুকের হাড়গোড় মট্‌মট্ ক'রে ভেঙ্গে যাচ্ছে মনে হয়। ডাণ্ডী আগে চ'লে গেল, আমি ঘুরে ফিরে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলুম, কিন্তু চড়াইএর এক অষ্টমাংশ উঠেই আমার প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হলো। একে দেহ ভার নিতান্ত লঘু নয়, তার উপর এরকম ভ্রমণ অভ্যাস নেই কাজেই পা আর চলে না, মধ্যে একবার ব'সে পড়লুম; কিন্তু আমি এই প্রবল চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে যতটুকু উঠেছি তা পাঁচ চেইনের বেশী হবে না, এতেই এরকম গলদঘর্ম্ম! কি করা যায় স্থির করবার জন্যে কিছুকাল চিন্তা করা গেল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই মীমাংসা হয়ে উঠল না, তখন জরাজীর্ণ, শুষ্কদেহ চিররোগীর মত অতি ধীরে ধীরে পা ফেলে অগ্রসর হ'তে লাগলুম, কিন্তু আমাকে আর বেশীদূর যেতে হলো না, দেখি সম্মুখেই বাঁকের মাথায় আমার বন্ধু ডাণ্ডী নামিয়ে বসে আছেন। তিনি ইতি পূর্ব্বেই দৈববাণী করেছিলেন যে চড়াইএ উঠা আমার মত বীরপুরুষের কর্ম্ম নয়। কিন্তু আমি তাঁর কথার ঘোর প্রতিবাদ করায় তিনি আমার অবিবেচনার ফল ভোগ করবার একটু অবসর দেবার জন্যে এই পথটুকু ডাণ্ডীতে এসেছিলেন এবং আমার শোচনীয় অবস্থার বিষয় কতকটা অনুমান ক'রে এই নির্জ্জন প্রদেশে আমার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছিলেন। আমি সেখানে পৌছান মাত্র তিনি দুই একটি ভর্ৎসনায় আমাকে আপ্যায়িত ক'রে ডাণ্ডীতে উঠে বসবার জন্য পরামর্শ দিলেন, আমি বাক্যব্যয় মাত্র না ক'রে নিতান্ত সুশীল ও সুবোধ বালকের মত তাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী হলুম, তিনি পদব্রজে চড়াইএ উঠে দেখতে দেখতে যে কোথায় অদৃশ্য হ'লেন তা আমি ভেবেও স্থির কর্ত্তে পাল্লুম না, কেবল একবার অনেকদূর হতে তাঁর আনন্দধ্বনি শুনতে পেয়েছিলুম। অনেক দিন পাহাড়ে বাস ক'রে এবং সরকারী কর্ম্মোপলক্ষে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অতি দুরারোহ স্থান সকলে যাতায়াত করায় এ রকম ভ্রমণ তাঁর বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি উপরে এসে দেখি তিনি অনেক পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিয়েছেন। তাঁর আর ডাণ্ডী আবশ্যক হলো না, আমি রাজপুর পর্য্যন্ত ডাণ্ডীতেই চল্লুম। রাজপুর হতে আমাদের বাসা প্রায় ছয় মাইল, রাজপুরে এসে আবার একখান একা ভাড়া করা গেল। সূর্য্য প্রায় অস্ত যায় যায় এমন সময় আমাদের একা রাজপুরের সংকীর্ণ উচু নীচু ও আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে দেরাদুনের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো; যেতে যেতে সান্ধ্যপরিচ্ছদপরিহিত দু পাঁচ জন সাহেবকে এদিক ওদিক যেতে দেখলুম, কনককেশী ক্ষীণাঙ্গী দুই একটি মেমসাহেবও আমাদের

স্পন্দনের ঘর্ঘর শব্দে তাঁদের চকিত নেত্র উত্তোলন ক'রে একবার আমাদের দিকে চাইলেন; আমাদের একা শীঘ্রই পর্ব্বতপ্রান্তস্থ এই ক্ষুদ্র নগরী অতিক্রম কোল্লে, ধীরে ধীরে চারিদিকে বেশ অন্ধকার হয়ে এল, কেবল পশ্চিম আকাশে একটু আলো আছে, কিন্তু সে লোহিতরাগও ধীরে ধীরে অপসৃত হ'তে লাগলো এবং এতক্ষণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলি অস্তমিত তপনের শেষ কিরণচ্ছটায় রঞ্জিত হয়ে ছিল তারা ক্রমে বিবর্ণ হয়ে দূরদূরান্তরে ভেসে যেতে লাগলো। আকাশে তারকার নীরব দৃষ্টি, বায়ু সঞ্চালনে পার্ব্বত্য বৃক্ষ পত্রের শরশর কম্পন ও আমাদের একার ঘড়ঘড় ধ্বনির মধ্যে দিয়ে বশিষ্ঠাশ্রমপ্রত্যাগত রাজা দিলীপের ন্যায় আমরা অগ্রসর হতে লাগলুম। দেখতে দেখতে পর্ব্বতবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে মৃৎপ্রদীপগুলি জ্বলে উঠলো, তার দুই একটা রশ্মিচ্ছটা আমাদের গাড়ীতে এসে পড়তে লাগলো এবং কতকগুলি পার্ব্বত্য বালক বালিকা তাদের অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও সরলতাপূর্ণ কচি মুখগুলি নিয়ে উৎফুল্ল ভাবে আমাদের গাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াতে লাগলো। আমার মনে পড়লো বহুদিন পূর্ব্বে একবার রেলের গাড়ী চড়ে স্বদেশে যাচ্ছিলুম, সন্ধ্যাকালে যখন আমাদের গ্রামের কাছে গাড়ী এলো তখন লাইনের দু ধারে যে সকল কৃষকের বাড়ী আছে সেই সকল বাড়ী হতে প্রদীপের আলো আমাদের গাড়ীর শাশিতে লেগে প্রতিফলিত হচ্ছিলো এবং এই রকম একদল গ্রাম্য বালক তাদের কৌতুকবদ্ধ নীরব সম্ভাষণ দৃষ্টি আমাদের দিকে প্রেরণ কচ্ছিলো; আজ এই পর্ব্বত প্রান্তস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলিতে সেইরূপ আলোকরশ্মি ও পার্ব্বত্য বালকবালিকার সরল মুখচ্ছবি এবং কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি দেখে সেই নববসন্তসমাগমে গৃহ প্রত্যাগনের কথা মনে জেগে উঠছিল, আর গৃহে উপস্থিত হো'লে মার সেই উচ্ছ্বাসপূর্ণ স্নেহ সম্ভাষণ, যবনিকান্তরাল হ'তে প্রিয়তমার আগ্রহপূর্ণ সপ্রেম দৃষ্টি! সে দিন আর এ দিনে কি গভীর ব্যবধান! এই ব্যবধানের উপর একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন আর কেহ সেতু নির্ম্মাণ কর্ত্তে সক্ষম নয়। মনের মধ্যে এই রকম নানা চিন্তার উদয় হতে লাগলো কিন্তু আমাদের যান অবিলম্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হো'লো সুতরাং প্রাচীন চিন্তাগুলি কিছুকালের জন্যে হৃদয়পেটকে আবদ্ধ ক'রে তাড়াতাড়ি একা হতে নাবা গেল এবং স্মিতমুখে বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে এই পর্য্যটন সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে মহানন্দে সেই সন্ধ্যা অতিবাহিত করা গেল।

শ্রীজলধর সেন।

সম্পাদকের চিত্রচয়ন।

রাণী ও কবি।

বোধ হয় টেনিসনের "এনক আর্ডেন" নামক ধীবর কাহিনীতে ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় যেরূপ সমালোচনার তুফান উঠিয়াছিল এমন আর কোন কাব্যে কখন হয় নাই। উচ্চ নীচ সকলেই ইহাতে যোগ দিয়াছিল, এবং ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বহুবিধ টীকা হইয়াছিল। গল্পটী নিতান্ত সামান্য।

আনা লি যখন নিতান্ত বালিকা তখন ফিলিপ ও এনক নামে তাহার দুইটী বাল্য-সখারই সে প্রণয়িনী। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল। এনকের সহিত আনার বিবাহ হইল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার বিপদজালে তাঁহাদের ক্ষুদ্র সংসার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এনক দায়ে পড়িয়া একখানি চীনদেশগামী অর্ণবপোতে দূরদেশে যাত্রা করিলেন। অনেক বৎসর পরে যখন স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখিলেন যে আনা এখন ফিলিপপত্নী। আনা ফিলিপের উপরোধ অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত এনকের অপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু যখন অনেক দিন অতীত হইল তবুও এনকের কোনরূপ সংবাদ পাওয়া গেল না তখন এনকের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া ফিলিপের আজন্ম ভালবাসার খাতিরে ও এনকের সন্তানের ভাবী সুখের আশায় ফিলিপের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিল। এনক দেশে আসিয়া প্রথমতঃ একটী দোকানে বসিয়া এই গল্প শুনিলেন। তাঁহার আকৃতি এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তিনি তাহার পর ফিলিপের বাটীর সন্নিকটে যাইয়া স্বচক্ষে তাহাদের সুখ দেখিলেন। আনা এখন ফিলিপকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে। তাহার আর কয়েকটী সন্তান হইয়াছে। তাহাদের লইয়া এখন সে সুখী। মহৎ হৃদয়, আত্মবিসর্জ্জনপরায়ণ এনক তাহাদের সে সুখ ভঙ্গ করিলেন না। ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত একটী শৈলময় সমুদ্র তীরে কষ্টকর ধীবরব্যবসা অবলম্বন করিয়া কাটাইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আনাকে কিছু জানান নাই। মৃত্যুশয্যায় আনার নিকট তাঁহার সন্তানের এক গুচ্ছ কেশ প্রেরণ করিয়া সংবাদ পাঠাইলেন। এই কেশ গুচ্ছটী তিনি বিদেশ যাত্রা কালে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তখন হইতে আজীবন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। গল্পটী এই।

সংসারের নেপথ্যকোনে ধীবরউপনিবেশে যে মধ্যে মধ্যে এরূপ ঘটনা সংঘটিত

হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার শৈলবেষ্টিত সমুদ্রতীরবাসী ধীবরদের মধ্যে এক এক জন সহসা অন্তর্দ্ধান হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারে না সে ব্যক্তি জীবিত কি মৃত। তাই সেখানে এরূপ অনেক আশ্চর্য্য সত্য কাহিনী শুনা যায়।

রাণী ভিক্টোরিয়া টেনিসনের রচনাগুলি অতি যত্ন সহকারে পাঠ করিতেন—খুব অল্প লোকেই এত যত্ন লইয়া পড়িত। টেনিসন যে এই কাব্য দ্বারা পবিত্র বিবাহ বন্ধন শিথিল করিতে প্রয়াস পাইতেছেন অল্পদিনের মধ্যেই টেনিসনের শত্রুবর্গ রটিত এই অপবাদ রাণীর কাণে উঠিল।

রাণী ধর্ম্মবিভাগের এক জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে ইহার নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর করিলেন যে এইরূপ ঘটনা যে মাঝে মাঝে সংঘটিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ অন্যায় কার্য্যকে আত্মবিসর্জ্জনের মহৎ আচ্ছাদনে আবৃত করিলে লোকের ন্যায়ান্যায় জ্ঞান তিরোহিত হয়। আনা এনকের পত্নী। এনকের উচিত ছিল তাহাকে পত্নী বলিয়া দাবী করা। সে তাহা না করিয়া দূরে গিয়া মরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এনকের এই অন্যায় কার্য্যে টেনিসন আত্মবিসর্জ্জনের মুকুট পরাইয়া তাহার যথার্থ আকৃতি ঢাকিয়া লোকের মনে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবার ভাব উদ্দীপ্ত করিতেছেন।

রাণী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, নীতি জগতে কাব্যটীর যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আর এক জন মহিলাকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। এই মহিলাটী টেনিসনের Lady Vere de Vere এর আদর্শ। তিনি আরও কঠিন সমালোচনা করিলেন।

এই বহু আন্দোলিত বিষয়ে রাণী বিপক্ষদলের দুই জনের কঠিন সমালোচনা শুনিয়া কবির নিজের মত শুনিতে উৎসুক হইলেন। সেই দিনই অপরাহ্নে গাড়ীতে চড়িয়া বায়ুসেবনার্থে বাহির হইয়া অন্য দিনের অপেক্ষা একটু বেশী দূরে—টেনিসনের ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। অস্‌বর্ণ হইতে টেনিসনের বাটী বেশী দূর নহে। অচিরে তাঁহার গৃহের চতুষ্পার্শ্বস্থিত ঘন ফার বৃক্ষাবলী দৃষ্টিগোচর হইল। রাণী দেখিতে পাইলেন টেনিসন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন। টেনিসনের লম্বা চুল ও দাড়িতে তাঁহাকে দূর হইতেই স্পষ্ট চেনা যাইত। রাণীর সহিত দুইটী রাজকুমারী ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে চিত্রোপকরণ ছিল। সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে রাণী কন্যাদের বাগানের এক পার্শ্বে ছবি আঁকিতে নিযুক্ত করিয়া নিজে টেনিসনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। টেনিসন তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুত আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন কিন্তু রাণী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। যে প্রশ্ন তাঁহার মনে আন্দোলিত হইতেছিল তাহার মীমাংসার জন্য উৎসুক হইয়া টেনিসনকে

তাঁহার পার্শ্বে পাদচারণা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন ও তাঁহার সর্ব্বজনানুভূত সহৃদয়তার সহিত টেনিসনের কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা পশ্চিম সমুদ্র তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সুদূর নিম্নে গভীর সুনীল সমুদ্র প্রসারিত। বিক্ষিপ্ত বসন্ত কুসুমের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীগুলি সাদা সাদা পাল তুলিয়া তাহার বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দ্রুতগামী ষ্টীমার হইতে কুণ্ডলীকৃত শ্বেত ধূমরাশি উঠিয়া তাহাতে শোভাবৈচিত্র্য সম্পাদন করিতেছে। শিরোপরে অতি উচ্চে নির্ম্মল নিথর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র সমুদ্রজীবী পক্ষীগণ চক্রাকারে উড়িয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে তাহাদের একটি তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে।

বন্ধনচ্যুত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত একরাশি কাষ্ঠভারে তাঁহাদের গতি রোধ হইল। নিকটে একটী সুন্দর নীলনয়না দশম বর্ষীয়া বালিকা নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখানকার ইতর লোকের সকলেরই নিকট প্রায় রাণীর মূর্ত্তি পরিচিত, বালিকাও রাণীকে চিনিত। গির্জ্জার দ্বারের সম্মুখেই তাহার কাঠের বোঝা রাণীর মন্দিরপ্রবেশের পথ রোধ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে অথচ তাহা একবারে স্থানান্তরিত করা তাহার সাধ্যাতীত। বেচারী কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। টেনিসন তখনি হেঁট হইয়া বালিকার কাষ্ঠগুলি কুড়াইয়া দিলেন এবং রাণী তাহাকে একটী মুদ্রা দিয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা বলিল, "আনা" তাহার পর তাহার কাষ্ঠভার লইয়া আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। গমনকালে কঠিন ভারে দোদুল্যমান তাহার সেই সুকুমার দেহখানি দেখিতে দেখিতে রাণী বলিলেন "কি মিষ্টি মুখখানি" তাহার পর তিনি এই ঘটনার পূর্ব্বে যে বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন "দেখ টেনিসন তোমার আনালিকেও আমি বরাবর ঠিক ঐ রকম কল্পনা কর্ত্তুম। মানে যখন সে ফিলিপ ও এনকের ঝগড়া মিটাবার জন্যে এক দিন দুজনকেই বিবাহ করতে অঙ্গীকার করছে।" টেনিসন স্থির ভাবে উত্তর করিলেন। "হাঁ—ওকে দেখে তার ছবি আঁকা যেতে পারে।" এই সময় একটী অনতি গভীর জলাশয়ের অপ্রশস্ত তীরে রাণীকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য টেনিসন আস্তে আস্তে পশ্চাতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। জলাশয়ের বায়ু-আন্দোলিত মৃদু মৃদু উর্ম্মিমালা দেখিয়া রাণীর Idylls of the King এর এক স্থান মনে পড়িল ও তিনি তাহা আবৃত্তি করিলেন। তাঁহাদের উভয়পার্শ্বে অনতিদূরে কয়েকটী শৈবালাচ্ছন্ন সমাধি ছিল। হঠাৎ তাহার একটীর উপর রাণীর চোখ পড়িল। রাণী বলিয়া উঠিলেন "এ কি! ওই নামটা এনক নয়?" টেনিসন উত্তর দিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু রাণী তাঁহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "তাইত। উহা এনকইত বটে, মাঝে মাঝে আমাদের মনে একটা জিনিস কেমন লাগে যা অন্য সময়

নজরেই আসে না। যেমন এনক এই নামটা। কতবার কত সমাধির উপর ও নাম দেখেছি। দশটা বাইবেলের নামের মধ্যে এটাও একটা মাত্র। আর কখন এ বিষয়ে কিছু মনে হয় নি।” তার পর টেনিসনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “ভারি দুঃখের বিষয় যে তোমার ফিলিপের নামের কেহ এখানে সমাধিস্থ হয় নি। তোমার কাব্যের ঘটনাস্থান এই মন্দিরই হ’তে পারত। ওই হেজেল বৃক্ষের নীচেই তোমার গল্প অভিনীত হ’তে পারত। আমার এ কথায় তুমি কি বল ?”

টেনিসন। বিশেষ কিছুই না।

মহারাণী। কেন ?

টেনিসন। কারণ তা হ’লে ওই নির্দ্দোষ বালিকাটীতে অপবিত্র বিবাহবন্ধনের কালিমা অর্পণ করতে আমার বড় কষ্ট হবে।

মহারাণী। কোন্ বালিকা ?

টেনিসন। যে এখনি ওই বেড়ার পাশ দিয়ে গেল। ওই সুকেশী কাঠুরিয়া বালিকা।

মহারাণী। ওর সঙ্গে তোমার কবিতার কি যোগ ?

টেনিসন। এই পর্য্যন্ত যে বিসপ—এর কথা যদি সব সময়ই ঠিক হয় তবে ওই বালিকা পিতৃনামে বঞ্চিতা হবে।”

রাণী গভীর চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হইলেন। একটু পরে বলিলেন।

“তুমি কি বলতে চাও যে এই স্থানে তোমার এনক আর্ডেনের গল্পের মত একটী সত্য ঘটনা অভিনীত হয়েছিল।” টেনিসনকে নীরব দেখিয়া আবার বলিলেন “আমি জানি যে তোমার গল্পের ইতিহাস তুমি লোকের কাছে জানাতে ভালবাস না। কিন্তু সত্যই কি এনক আর্ডেন এইখানে বাস করত এবং সত্যই কি ওই প্রস্তরের নীচে তার দেহ সমাহিত আছে ?”

টেনিসন বলিলেন “মহারাণি! সামান্যতম শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এমন মহত্ত্ব দেখা যায় ঐতিহাসিক যা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে একান্ত আগ্রহান্বিত হয়ে থাকে কিন্তু যা কেবল এই লোকদের জীবন যে নীরবে লক্ষ করে তারই চোখে পড়ে। যে সহৃদয়তার সঙ্গে এইরূপ একটী মহত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করতে পারে সেই ধন্য এবং যে এই ঘটনার মূল সৌন্দর্য্য ও সরলতা রক্ষা করে কবিতায় চিত্রিত করতে পারে সেও ধন্য। তার কথা পবিত্র স্বর্গীয় বীজের ন্যায় নিকটে এবং সুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়।”

মহারাণী শ্যামল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সেই ধূসরবর্ণ শৈবালাচ্ছন্ন সমাধির উপর সুধীরে হস্ত রাখিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন ভাবে সেই দুঃখপীড়িত মানবের বিরামভবন নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর গৃহাভিমুখী হইয়া একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন “ভগবান তাহাকে সুখী করুন, সে যে উচিত কার্য্য করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

হালী বিলাতী-নাট্য।

[লেডি ফ্লরেন্স ডিক্সি একটী অভিনব প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি ইংরাজসমাজকে জানাইয়াছেন যে, অনেকগুলি মহিলা' আর কোন উপায়ে ভোট দিতে না পারায়; পুরুষের নামে বাটী ভাড়া লইয়া, ভোটাধিকারিণী হইয়া, পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া Polling booth এ গিয়া ভোট দিয়া আসিয়াছেন। লেডি ফ্লরেন্স এখন পরামর্শ দেন যে মহিলারা এখন হইতে নিজেকে পুরুষ বলিয়া চালাইয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশলাভ করুন; এমন কি আভাস দিয়াছেন যে, এই ছদ্মবেশী অভিনয় এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। সমুদয় খ্রীষ্টজগতের চক্ষে ধূলা দিয়া জনৈক রমণী একবার রোমের পোপের পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন সত্য; পুরুষ সাজিয়া রমণী সৈনিকপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন; জাহাজের নাবিক হইয়া সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রাও করিয়াছেন। স্ত্রী-এন্‌জিন্‌-ড্রাইভার ও স্ত্রী-কোচ্‌ম্যানের কথাও শুনা গিয়াছে। কিন্তু লেডি ফ্লরেন্স ফাঁস করিয়া দিবার পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও সন্দেহ করে নাই যে ইংলণ্ডের কোন কোন সুযোগ্য ব্যবস্থাপক ছদ্মবেশী রমণী।]

দৃশ্য, পার্লামেণ্ট, হাউস অব্‌ কমন্স।

বক্তা। (স্বগত, ঈষৎ অস্বস্তির সহিত) আচ্ছা বেডফোর্ড পার্কের অনারেবল মেম্বর আমার প্রতি ক্রমাগত একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন কেন, আমি বুঝ্‌তে পারিনে। আগামী মাসে আমার বিবাহের সম্বাদ ঘোষণা হওয়া অবধি তিনি এমন ভৎর্সনাপূর্ণ চোখে আমার প্রতি চা'ন।

বেডফোর্ড পার্কের অনারেবল মেম্বর। (তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তীর প্রতি) সত্যিই কি বক্তার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে?

পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি। গেছে বৈ কি। আমি সে মেয়েটীকে চিনি। বেড়ে দেখ্‌তে! চমৎকার লোক!

বেডফোর্ড পার্কের অনারেবল মেম্বর। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) আশা করি উনি সুখী হবেন—আমি—আমি—না—না—কিছু হয়নি—কিছু হয়নি—(প্রবল অশ্রুপাত)

বক্তা। (স্তম্ভিত হইয়া) বেডফোর্ড পার্কের অনারেবল মেম্বর পীড়িত হয়েছেন!

(কতকগুলি অনারেবল মেম্বরের রোরুদ্যমান এম্‌, পিকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হওন; এম্‌, পির হিষ্টিরিয়া হইতে ক্রমশঃ মূর্চ্ছা; ডাক্তারসাহায্যে তাঁহাকে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে স্থানান্তরিতকরণ। কয়েক মিনিট পরে ডাক্তার কর্ত্তৃক বক্তার জরুর তলব)

বক্তা। কি হয়েছে? ব্যাপারখানা কি ডাক্তার?

ডাক্তার। এ—এ—ই—ব্যাপারখানা ভারি অদ্ভুত! বেডফোর্ড পার্কের অনারেবল মেম্বর একজন রমণী!

বক্তা। কি ভয়ানক! এত ভারি বিপদ!

বেডফোর্ডের অনারেবল মেম্বর। (প্রলাপোক্তি) ওঃ আমি তাকে ভয়ানক ভালবাসি, ভয়ানক ভালবাসি।

বক্তা। একি!—একি সেই——? না—না—

অনারেবল মেম্বর। (চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক বক্তাকে দেখিয়া রক্তিমকপোল হইয়া) আপনি এখানে?

বক্তা। সত্যি মহাশয়—কিম্বা আমাকে মাপ কর্‌বেন—মহাশয়া আমি অবাক্ হয়ে গেছি।

অনারেবল মেম্বর। আমাকে ঘৃণা কর্‌বেন না। আমার হাত ছিল না। গেল হপ্তা থেকে আমি জানি আমি আপনাকে ভালবাসি। যখন আপনার বিবাহ সম্বাদ প্রচার হ'লো তখনই শুধু আমার সব সংযম চলে গেল। আপনি আমার ছদ্মবেশ জান্‌তে পেরেছেন, আপনি যখন ভদ্রলোক তখন অবিশ্যি এ কথা প্রকাশ কর্‌বেন না? আমার কাছে শপথ করুন, শপথ করুন! আমি হোম বিলের বিপক্ষেই ভোট্ দেব। আপনি আর আমাকে কখন দেখ্‌তে পাবেন না।

বক্তা। এ রকম অবস্থায় বোধ হয়—বোধ হয়—কথাটা প্রকাশ না হওয়াই ভাল।

অনারেবল মেম্বর। যদি এ কথা প্রকাশ হয়—আমি লজ্জায় মরে যাব। আপনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করেছেন, আমার জীবন রক্ষা করুন।

বক্তা। (বিরোধী ভাবসমূহে বিক্ষুব্ধ হৃদয় হইয়া) তা অবশ্য, আমার কিছুমাত্র পুরুষোচিত ভদ্রতা থাক্‌লে আমি এ বিষয়ে নীরব থাক্‌তে বাধ্য এবং যদি ডাক্তার ম'শায়——

ডাক্তার। আমাদের ডাক্তারী ভদ্রতা আমার মুখ বন্ধ রাখ্‌বে।

বক্তা। মহাশয়া—তবে বিদায়। এ পৃথিবীতে আমাদের যদি আর কখন দেখা না হয় তা'হ'লেও জান্‌বেন আপনার দুঃখে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি র'ইল।

(বক্তার লজ্জারক্তিম আননে, সাশ্রুনয়নে সভাস্থলে প্রত্যাগমন এবং সমুৎসুক সভ্যবৃন্দকে বিজ্ঞাপন যে অনারেবল মেম্বরকে গাড়ী করিয়া বাড়ী পাঠান হইয়াছে।

আলোচ্যবিষয়ের পুনরুত্থাপন।)

জনৈক অনারেবল মেম্বর। (সহসা) কি ভয়ানক! মেজের উপর একটা ইঁদুর!

লেটন্ বিজার্ডের অনারেবল মেম্বর। (তাঁহার কাষ্ঠাসনের উপর লাফাইয়া উঠিয়া এবং তাঁহার কোটের প্রান্তভাগ গুটাইয়া গায়ের চারিদিকে জড় করিয়া) ওঃ ওঃ ওঃ।

বক্তা। অর্ডার! অর্ডার! অর্ডার!

লেটন্ ব্লিজার্ডের অনারেবল মেম্বর। আমি কি কর্‌ব, ওকে মেরে ফেল, মেরে ফেল, নাহ'লে আমি ক্ষেপে যা'ব।

বক্তা। অনারেবল মেম্বরের আচরণ সভাস্থলের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞাজনক।

লেটন্ ব্লিজার্ডের অনারেবল মেম্বর। ওকে মেরে ফেল, ঐ দেখ, এদিকে আস্‌ছে, এখনি আমার আঁচলের ভিতর ঢুকে পড়্‌বে।

সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া। অ্যাঁ ?

অনারেবল মেম্বর। (পাণ্ডুবর্ণ হইয়া) এই যা আমি কি বল্লুম !

বক্তা। (সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে) মহাশয় ! আপনি আর একজন রমণী ?

কতকগুলি সভ্য। কি ?

অনারেবল মেম্বর। আমার উপর রাগ কোরো না বাপু, ঐ ইঁদুরটা না এলে আর কিছু তোমরা এ কথা জান্‌তে পেতে না।

বক্তা। সার্জ্জন ! এই মহিলাটীকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

অনারেবল মেম্বর। রক্ষে কর, রক্ষে কর ! ঐ ইঁদুরটাকে মেরে না ফেল্লে আমি ওখান দিয়ে যেতে পার্‌ব না।

বক্তা। মহাশয়া আপনার এখানে কোন অধিকার নেই। আপনি কোন্ সাহসে নিজেকে পুরুষ বলে ছলনা ক'রে পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত করিয়েছেন।

অনারেবল মেম্বর। (ভীতচিত্তে) আমি একলা নই, ঐ জুনিয়ার লর্ড অব্ অ্যাড্‌মির‍্যাল্-টিও ত মেয়ে। (জুনিয়ার লর্ডের প্রতি) ভাই আর চালাকী কর্‌লে কি হ'বে, তুমি অস্বীকার কর্ত্তে পার না, তুমি মেয়ে।

জুনিয়ার লর্ড। প্রগল্‌ভ কোথাকার !

অনারেবল মেম্বর। আমাকে প্রগল্‌ভ ফ্রগল্‌ভ বোলো না। (সভ্যবৃন্দের প্রতি) দেখ বাপু ইনি একটী বিধবা, এঁর দুটী ছেলে আছে (সভাগৃহে তুমুল কলরব এবং সভ্যগণের পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি-অবলোকন)

বক্তা। (স্বগত) তাই বলি চাকরটা রোজ রোজ মেজের উপর মাথার কাঁটা কুড়িয়ে পায় কেন ? (প্রকাশ্যে) মহাশয় কিম্বা মহাশয়াগণ—আপনারা যাই হোন্; আপনারা জানেন, আজ অপরাহ্নে যে ব্যাপার আমাদের জ্ঞানগোচর হ'ল, কর্ত্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে, সে বিষয়ে যতদিন না একটা কিছু স্থির হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমি এ সভা স্থগিত রাখ্‌তে বাধ্য। আশা করি, অনারেবল মেম্বরগণ আগামী বারে তাঁ'দের সঙ্গে——

(বক্তার কথার শেষাংশ গোলমাল অব্যক্ত রহিল এবং পুলিশের সাহায্যে সভাগৃহ শান্ত করিতে হইল)।

যবনিকা পতন।

ফুলের মালা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ফুল্লবসন্তে, বিহঙ্গকূজিত, মলয়হিল্লোলিত, চ্যুতাঙ্কুরসুরভিত কাননতল প্রফুল্লমুখী রমণীগণের আনন্দবিহারে পুলক-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল! হায়! মন্দভাগ্য, অশোকতরু! তুমি আজ কোথা? তোমার পরিবর্ত্তে পেয়ারা-বৃক্ষ আজ রঙ্গিনী রমণীর চরণ স্পর্শ-সুখে দোদুল্য, কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। রমণী ক্রমশ অধঃ হইতে উর্দ্ধদেশের কোমলতর শাখায় উত্তরণ করিতেছেন; নীচের দর্শক নারীবৃন্দ কেহ বা অবাক নয়নে উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে; কেহ বা এক মুখে সেই আর্য্যাঙ্গনার বীর্য্যপনার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে তৎপথানুসরণে প্রয়াসী হইয়া সহস্রবার স্কন্ধমূলে পদার্পণ করিতেছেন, সহস্রবার ব্যর্থকাম হইয়া স্খলিত পদে নামিয়া পড়িতেছেন।

কোন কোন কোমলা কামিনী বা নারীজনোচিত আচারভ্রষ্টা এই পৌরুষিক রমণীর দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ডে যুগপৎ ঘৃণা ভয় ও রোষে মুহ্যমান হইয়া কখনো সক্রোধ ভর্ৎসনায় কখনও অনুনয় বিনয় করিয়া বার বার তাহাকে বৃক্ষ হইতে নামিতে অনুরোধ করিতেছেন।

বীর্য্যবতী বৃক্ষারোহিণী ইহাতে আরো রণরঙ্গে মাতিয়া হাসিয়া হাসিয়া বৃক্ষ হেলাইতেছেন, শাখা দুলাইতেছেন; এবং টুপটাপ করিয়া পেয়ারা ফেলিয়া দিয়া তাহাদের রুষ্ট হৃদয় তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

অন্য দিকে ফুলের শিলাবৃষ্টি চলিয়াছে। ফুলগাছের অদৃষ্টে পদাঘাত সুখ নাই; তাহারা কোমল হাতের ঝাঁকা খাইয়াই হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীর অন্নের মত অনবরত ফুল বিতরণ করিতেছে, রমণীগণ তরুতল মণ্ডিত করিয়া তাহা কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন।

নবযৌবনবতী স্বামীসোহাগিনী ভামিনীগণ ইহাতে বীতলোভ, তাঁহারা এই ভাবুকতাহীন, গদ্যময় আমোদের প্রতি দূর হইতে ভ্রূকুঞ্চিত নেত্রে চাহিয়া ফুলবাগানে ফুল চয়ন করিয়া বেড়াইতেছেন।

কোন কোন রমণীর আবার ফল ফুল কিছু আহরণেই সুখ নাই, তাঁহাদের মনে শীকারের আমোদই জাগিতেছে। প্রেমের ফাঁদে নয়নছাঁদে যে শীকারু তাঁহাদের ঘরে বাঁধা, আঁখির ফেরে তাহারা কিরূপ খেলে, কিরূপ চলে তাহা মনে পড়িয়া গিয়া সেই খেলা খেলিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয় বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু আপাততঃ তাহার সুবিধা না

হওয়ায় টোপ বড়সিতে মাছ খেলাইয়াই তাঁহারা দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

দুই জন রমণী এ সকল আমোদ হইতে দূরে আম্রকুঞ্জে শিলাতলে বসিয়া মনের কথা কহিতে কহিতে পুষ্পালঙ্কার রচনা করিতেছিলেন।

আম্রকুঞ্জ সুকণ্ঠতানে শিহরিত করিয়া সহসা দূর হইতে গীতধ্বনি উঠিল—

"সইলো মকর গঙ্গাজল!
সাত রাজার ধন মাণিক আমার কোথায় আছিস বল!
সর্ষে ফুল হেরছি চোখে তর্ষে রেখে ছল।"

সূচের ফুল সূচে রহিল—কামিনী সহসা উন্মুখ হইয়া বলিয়া উঠিল—"ঐলো রঙ্গি পোড়ারমুখী আসছে!"

রঙ্গিণী সুন্দরী গাহিতে গাহিতে অবিলম্বে আম্রকুঞ্জে আসিয়া দেখা দিলেন। কুসুম বলিল—"মর তুমি, বুড়োস্বামীর সোহাগের গান আর আমাদের শোনাতে হবে না।

রঙ্গিণী নিকটে আসিয়া বলিল—"আচ্ছা তুই ভাই আমার যুবস্বামী"! বলিয়া চিবুক ধরিয়া আবার গান আরম্ভ করিল।

তুমি ধনী চাঁদবদনী, জীবন মরণ কাটি।
ক্ষেণেক তোমার অদর্শনে, মরি লো দম ফাটি॥
তুমি আমার তালুক মুলুক, তুমি টাকার তোড়া।
তুমি চেলি বারাণসী, তুমি, শালের জোড়া॥
ওলো আমার সাধের ধোঁকা, কহি চুপে চুপে।
সদাই ভয় জাগে মনে, (তোমায়) কে নেয় কথন মুপে॥
তুমি আমার পায়সান্ন, মিষ্টি মেঠাই ছানা।
শীতের তুমি দোলাইখানি, গরমির চিনি পানা॥
বর্ষাকালের ভরসা তুমি, তালপত্রের ছাতি।
তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা, (ওলো) সকল ভাতির ভাতি॥
তুমি বেদ আগম পুরাণ, তুমি তর্ক যুক্তি।
তুমি আমার ভজন পূজন, সাত পুরুষের মুক্তি॥
তুমি আমার যাগযজ্ঞি, সব পুণ্যির ফল।
সকল কর্ম্মের সিদ্ধি ওলো, দাও চরণে স্থল॥
স্বর্গ সুধা সঞ্চারিত, তোমার প্রেমকূপে।
পাপ তাপের দমন তুমি, মুড়ো খ্যাংরা রূপে॥
হেসে হেসে কাছে এসে, (ওলো) সকল দুঃখ ঘুচো।
অধীন তোমার দাসানুদাস, শ্রীচরণের ছুঁচো॥

তাহার গান শেষ হইলে কামিনী কহিল—"বুড় রসের গুঁড়, একবার সোহাগ দেখনা ?"

রঙ্গিণী বলিল "তোমার কি ছোকরা নাগর গা ? একটা রসের কথা ত তার মুখে এ পর্য্যন্ত শুনিনি ! অমন স্বামী আমার হলে আমি বনবাসী হতুম !"

কুসুম বলিল—"ঠাকুরজামাই আমাদের ডুবে ডুবে জল খায়। তা আর একটা গানা।"

রঙ্গিণী বলিল—"ঐ গানের পাল্‌টা শুনবি ? আমাকে ভাই যেমন বল্লে আমিও অমনি শুনিয়ে দিলুম !"

কামিনী। এবার থেকে তোর স্বামীর কবির দলে তুইও মিশিস।

রঙ্গিণী "যে আজ্ঞে" বলিয়া গান ধরিল।

ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল।
খুসীর খুসী মহাখুসী, আমার—সপত্নী কোন্দল ॥
তুমি আমার ঘরকন্না, উন্‌কুটি চোষট্‌টি।
ধান কুট্‌তে ঢেঁকি তুমি, মান কুট্‌তে বঁট্‌টি ॥
বেড়ির মুখে হাঁড়ি তুমি, তুমি খোন্তা হাতা।
মসলা পেষার সিল নোড়া, কলাই পেষার যাঁতা ॥
হাঁড়িশালের হাঁড়ি তুমি, ঘোড়াশালের ঘোড়া।
তিন ভুবনে কোথায় মেলে তোমার একটি জোড়া !
গোশালেতে তুমি আমার, বাঁধা কামধেনু।
আর, মন মজাতে তুমি প্রভু, বংশীধারীর বেণু ॥
ভাঁড়ারঘরের ভরাভর্ত্তি, শয়নঘরের বাতি।
ভাগ্যিবলে কভু মেলে, পদ্‌গমুজের নাতি ॥
বিপদ্‌কালে তুমি আমার, মহাবীর হনু।
দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে, অদর্শনে মনু ॥
ও প্রাণ মকর গঙ্গাজল !
ঈরিষা তিরিষা বারণ, আর, বারণ প্রেমানল ॥
কাঁচাচুলের দড়ি তুমি, পাকা ধানে মই।
শাঁতলাভাজার তুমি আমার, মুড়ি মুড়কি খই ॥
ব্যন্নুনেতে লবণ তুমি, মাছের মুড়ো ঝোলে।
মোচার ঘণ্টে বড়ি তুমি, কাঁচা-আম শোলে ॥
ভাপা দই তুমি সাফা ; দুধের ক্ষীর চাঁচি।
তোমা নইলে কেমন করে, বল প্রাণে বাঁচি ॥

টোপা কুলে সলপ তুমি, অরুচিতে রুচি।
তোমায় পেলে নিমেষেতে, নয়নের জল মুছি॥
তুমি আমার, পান্তাভাতে বেগুণপোড়া, ফ্যান্‌সা ভাতে ঘি।
কেমন কোরে বল্‌ব বঁধু, তুমি আমার কি॥
তুমি আমার জরিজরাও, তুমি পাকাকোটা।
সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি, গোবরজলের ফোটা॥
শীতের তুমি ওড়ন পাড়ন, গ্রীষ্মে জলের জালা।
বসন্তে বাহার তুমি, বর্ষাকালের নালা॥
এক মুখেতে কর্‌ব তোমার কত গুণগান।
তুমি আমার বেশ বিন্যাস, স্বামীর সোহাগ, মান॥
তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ, পাণে দোক্তা চুন।
তোমায়, এক দণ্ড না পাইলে একেবারে খুন॥
যৌবন জোয়ারজলে, তুমি রূপের ঢেউ।
যতন কোল্লেই রতন মেলে, (আমা বই) তোমায় পায় না কেউ॥
তুমি আমার, সোণার রংয়ে জোড়া ভুরু, কাল জুলপিচুল।
খাসা নাকে ঠাসা নথ, তাহে নলক দুল॥
বাউটি তাবিজ রতন চক্র, তুমি সুগোল হাতে।
সিঁথি ঝুম্‌কো কণ্ঠহার, ধুকধুকিটি তাতে॥
মলের তুমি রুণু ঝুণু, চন্দ্রহারের থামী।
আমারূপী বোচ্‌কাবাহী, তোমায় নমি স্বামি॥

নিরূপমা সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে বলিল, "সত্যি রঙ্গিণী এমন গায়!"

কামিনী বলিল, "ঠিক যেন শ্যামের বাঁশির মত!"

রঙ্গিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এই যে বৌরাণী।"

নিরূপমা বলিল, "তোর কিন্তু ভাই এই গানটা আজ রাজকুমারকে শোনাতে হবে।"

যদিও গণেশদেব এখন রাজা; কিন্তু নিরূপমা তাঁহাকে আগেকার অভ্যাস অনুসারে এখনো রাজকুমার বলে।

রঙ্গিণী বলিল, "তোমার গান আমি কেন গাব ভাই? তুমি আজ রাজাকে এই গান গেয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ো, রাজা যুদ্ধে জিতেছেন—তাঁকে ত বক্‌সিস করা চাই।"

প্রাণভরা আনন্দ ঢাকিতে গিয়া নিরূপমা একটু মোহন লজ্জার হাসি হাসিয়া বলিল—"না ভাই তোরা সবাই গাবি—আমি ফুলের মালা পরাব।"

কুসুম বলিল—আমরা ত আগে তোমার গলায় পরাই—তুমি তার পর তোমার গলার থেকে খুলে রাজার গলায় পরিও।" বলিয়া হাসিয়া হাসিয়া একজন রাণীর গলায়, কেহ তাহার হাতে, কেহ মাথায় ফুলের গহনা পরাইতে পরাইতে তিনজনে মিলিয়া গান ধরিল"—

প্রাণ সই লো সই,
শোন্ তোমারে কই—
আমি জানিনে যে তোমা বই।

নিরূপমা গাহিল—

রাখ চতুরালি, শঠ বনমালী,
দুখিনী রাধে আমি চন্দ্রাবলী নই,—

সখীরা গাহিল,—

ছি ছি ছি প্যারী, মিছে মানচাতুরী,
হের—হৃৎসাগরে পিরীত-নীরে নাহি মানে থৈ,
দিয়ে চরণ-তরী, রাই কিশোরী
রাখ যদি তবেই রই।"

তাহাদের গান শেষ না হইতে হইতে নিরূপমা বলিল,—"না ভাই এ মালা পরান হ'বে না,—আমি আজ নিজে মালা গেঁথে তাঁর গলায় পরাব,—ঐ তো অনেক ফুল আছে, আমি গাঁথি।" নিরূপমা শিলাতলে মালা গাঁথিতে বসিল।

সূঁচে ফুল পরাইতে পরাইতে সহসা তাহার প্রফুল্ল মুখখানি কেমন বিষণ্ণতায় মলিন হইয়া পড়িল,—তাহার সেই পুরাতন দিনের কথা মনে পড়িয়া গেল; তাহার মনে হইল, শক্তি আসিয়া সহসা যদি সেই পুরাতন দিনের মত তাহার হাতের মালাগাছি কাড়িয়া রাজার গলায় পরাইয়া দেয়! সভয়ে সে উন্মুখ হইয়া চাহিল, শক্তিকে না দেখিয়া নিশ্চিন্তভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার মালা গাঁথিতে লাগিল, এই সময় দূরে বাঁশরী ধ্বনিত হইল; কামিনী বলিয়া উঠিল; "ঠিক যেন রাজার বাঁশির সুর।" নিরূপমা আর একবার মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"রাজকুমার আজ এখনও এলেন না!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাজকুমারের সেদিন প্রমোদ-উদ্যানে গিয়া ক্রীড়াকৌতুক করিবার দিন নহে। নিস্তব্ধ রাত্রি—তারকাখচিত গগনদেশ সম্মুখে করিয়া রাজকুমার একাকী বারান্দায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তিষ্ক চিন্তালোড়িত—হৃদয় বেদনাপূর্ণ, তাঁহার মনে হই-

তেছে "কি করিলাম!—কি করিলে ঠিক হইত! ভগবান কি অপরাধে আমা হইতে তাহার এই দশা ঘটাইলে! এত ভালবাসার এই পুরস্কার! কি করিলাম—হায় কি করিলাম!"

নিরূপমা সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার চোখ টিপিয়া ধরিল।—রাজকুমার চমকিয়া অন্যমনে বলিয়া উঠিলেন, "শক্তি!" নিরূপমার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল, থতমত খাইয়া সে বলিল—"আমি নিরূপমা!" রাজকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিরূপমা! বস" তাঁহার কথায়, তাঁহার ভাবে নিরূপমা অন্য দিনের প্রেমাগ্রহের অভাব অনুভব করিল, পাখীর বুলির মত তাহা যেন তাঁহার অভ্যস্ত সম্ভাষণবাক্য। নিরূপমার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে না বসিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া রহিল। নিরূপমা এখন পঞ্চদশবর্ষীয়া; কিন্তু সরলতাপূর্ণ নির্ভরভাবে নিরূপমা এখনও ক্ষুদ্র শিশু, তাহার যৌবনোদ্দীপ্ত হৃদয়ভরা প্রেম, সেই আত্মনগণ্য সভয় সঙ্কোচভাবে মিলিত হইয়া এখনও শৈশব-কোমল, স্নিগ্ধভাস; নবীন মধুর।

কিছুক্ষণ পরে রাজকুমারের হুঁস হইল, নিরূপমা না বসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আতিথ্যের ক্রটি হইলে অতিথিবৎসলের যেরূপ মনোভাব হয়, রাজকুমার সেই ভাবে অনুতপ্ত হইয়া তাহাব হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে নিকটে মর্ম্মর চৌপায়ার উপর তাহাকে বসাইলেন,—নিরূপমা বসিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।—রাজকুমার নিজের ব্যথা গোপন করিয়া, তাহাকে শান্ত করিবার ইচ্ছায় তাহার গলদেশে বাহু বেষ্টন করিয়া সস্নেহে বলিলেন—"কি হইয়াছে নিরূপমা?" নিরূপমা কোন উত্তর করিল না, রাজকুমার অনেকক্ষণ ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সে তাহার অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টিতে স্থাপিত করিয়া বলিল—"রাজকুমার বল তুমি আমাকে ভালবাস?"

তিনি তাহার অলকগুচ্ছ নাড়াইয়া বলিলেন,—"একশবার কি ঐ কথা বলতে হয় নাকি?"

নিরূপমা আধ বাধ স্বরে বলিল,—"তুমি যদি, তুমি যদি" রাজকুমার তাহার কম্পিত অধরে চুম্বন করিলেন—সে তাঁহার গলা ধরিয়া বলিল—"আমার মনে হয় শক্তি যদি আসে ত তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে।" রাজকুমার সে কথার কোন উত্তর না করিয়া সেই সরলা সাশ্রুনয়নার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সে বলিল, "বল ভুলিবে না? বল তুমি আমার!"

রাজকুমার বলিলেন,—"তোমার নয় ত কার?" সে বলিল—"জানিনে কার! কিন্তু আমার বড় কষ্ট হচ্ছে!"

বলিয়া তাঁহার কোলে মাথা লুকাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল। রাজকুমার সেই রোরুদ্যমানা প্রেমময়ী পত্নীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া দারুণ যন্ত্রণাপূর্ণ হৃদয়ে নীরব হইয়া রহিলেন;—এক দিকে শক্তিকে বিবাহ করিয়া আনিলে নিরূপমার মত কোমল

লতিকার হৃদয় দলিত করিতে হয়, অন্যদিকে, শক্তিকে বিবাহ না করিলে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয়; যে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে—তাহাকে বাধ্য হইয়া অন্যের পাণিগ্রহণ করিতে হয়; তিনি এখন কি করিবেন?

রাজকুমার উক্তরূপ সমস্যার মধ্যে পড়িয়া দুশ্চিন্তাপূর্ণহৃদয়ে অনিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইতেই নল রাজার ন্যায় নিদ্রাতুরা পত্নীর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া শক্তির অন্বেষণে বাটীর বাহির হইলেন। তাহার সহিত একবার দেখা করিয়া, যাহা হয় শেষ মীমাংসা করিবেন। কিন্তু তাহার আর আবশ্যক হইল না; বনপথ অতিক্রম না করিতে করিতে বাদ্যরব শ্রুত হইল; রাজপথে পড়িয়া দেখিলেন, অশ্বারোহী পদারোহী সৈন্য সামন্তে এবং উৎসুক গ্রামবাসীর সমাগমে চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একজন রাজপুরুষ ঢাক পিটিয়া বলিতেছে, "নবাব গায়সুদ্দিন রাজবিদ্রোহী। সুলতান শাহের আজ্ঞায় তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাইতেছি; কে সৈনিক হইবে, আইস।"

রাজকুমার একজন অশ্বারোহীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবাব শা কি দোষ করিয়াছেন?" উত্তর হইল—"কাল যে হিন্দুকন্যাকে উৎসবপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত বাদশাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে গিয়া নবাব শা নিজে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন!" রাজকুমার বজ্রাঘাতে যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

বার্ত্তাবহ কপোত।

(প্রথম প্রস্তাব।)

গৃহ-পালিত পশু পক্ষীর মধ্যে কপোত মানবের এক অতি প্রাচীন সহচর। মনুষ্য স্বকীয় কার্য্যসাধনজন্য অনেক শতাব্দী হইতেই এই সুদৃশ্য, শান্ত ও বুদ্ধিমান কপোতের নিয়োগ করিয়া আসিতেছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ ডারউইন বলেন, মিসরিক পঞ্চম রাজবংশ হইতে কপোতের মানবসমাজে অধিবাস করিবার কথা শোনা যায়। সে হিসাবে খৃষ্টশকের চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহারা লোকালয়ে নীত হইয়াছে, ইহাই মানিতে হয়। বাস্তবিক, পারাবতগণ অতি প্রাচীনতম কাল হইতেই যে মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে সাদরে স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। গ্রীক্ কবি হৌমার গ্রীকের এমন অনেক নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, যথায় তত্রত্য অধিবাসীরা অনেক পরিমাণে কপোত পালন করিত। রোমীয়গণ গ্রীস অধিকার করিবার পর নিতান্ত আগ্রহ সহকারে

কপোতবংশ পরিবর্দ্ধন করিতেন। তাঁহাদের এক এক জন পাঁচ সহস্রেরও অধিক কপোত পোষণ করিতেন এবং বর্ত্তমানে যেরূপে বেগগামী অশ্ব (Race-horse) বা শিকারী কুকুরের বংশাবলীর জন্মবিবরণী ধারাবাহিকক্রমে রক্ষিত হয়, তদ্রূপ বেগবান কপোতদিগের বংশপরম্পরার জন্মবিবরণী রক্ষা করা হইত।

সংবাদ-বহন জন্যও কপোত অনেক কাল হইতে মানবের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন মিসরিক কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি আজও পর্য্যন্ত বিদিত করে যে, মিসর, সাইপ্রস ও কাণ্ডীর পোতবাহকগণ স্ব স্ব পরিবারবর্গকে আগমন বার্ত্তা গোচর করিবার জন্য কূলের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া শিক্ষিত কপোত উড়াইয়া দিত। কপোতগণ গৃহে উড়িয়া আসিয়া, প্রত্যাগত নাবিকদিগের স্ত্রীপুত্র পরিজনকে উহাদের আগমনবার্ত্তা জানাইয়া উহাদিগের উদ্বেগাকুলিত হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার করিত। বর্ত্তমানে, ফরাসী বীরগণ ঠিক এইরূপে আপন আপন পরিবারবর্গকে কপোত সাহায্যে প্রত্যাগমন বার্ত্তা বিদিত করিয়া থাকে, সিরিয়া দেশেও, লোকে এতদুদ্দেশ্যে কপোত নিয়োগ করিত।

য়ুরোপের মধ্যে গ্রীস সর্ব্ব প্রথমে কপোতদিগের এই অপূর্ব্ব ক্ষমতার ব্যবহার করে। আলম্পিক ক্রীড়ায় যাহারা জয়ী হইত, তাহাদিগের নাম গ্রীকগণ কপোত দ্বারাই সমুদয় গ্রীস মধ্যে পরিঘোষণা করিত। গ্রীস অধিকারের পঞ্চাশ বৎসর পরে রোমীয়গণ কপোত দ্বারা পত্র-বহন কার্য্য সম্পাদন করিত। ইহারা কপোত সমভি-ব্যাহারে ক্রীড়াক্ষেত্রে বা সর্কাসে উপস্থিত থাকিত এবং অশ্ব ধারণ বা তরবারী যুদ্ধের ফল লিখিয়া ক্রীড়া প্রাঙ্গণ হইতেই কপোত উড়াইয়া দিত। কপোতগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গৃহবাসী পরিজন ও বন্ধুবর্গকে ক্রীড়ার ফল জ্ঞাপন করিত।

প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন যখন খৃষ্টশকের ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে ডেসিমস ব্রুটস সডেনায় অবরুদ্ধ হন, তখন তাঁহার বহিঃস্থ লোকদিগের সহিত সংবাদ বিনিময় করিবার তাঁহার অন্য কোন উপায়ই ছিল না। তিনি কপোতের পদে পত্র বাঁধিয়া উহাকে উড়াইয়া দিতেন। বহিঃস্থ লোকেরা কপোতের নিকট হইতে পত্র লইয়া সংবাদ জানিতে পারিত। প্লিনি আরো বলেন যে, লোকেরা এই কপোতদিগের প্রতি এতই অনুরক্ত হইত যে, ইহাদের বাসের জন্য তাহারা আপন আপন আবাসের উপর উচ্চ উচ্চ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিত। তাহারা প্রত্যেক কপোতের উৎপত্তি ও বংশের নাম যথাক্রমে বর্ণন করিতে পারিত।

উল্লিখিত অবরোধ বিবরণ হইতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, রোমান সৈন্য মধ্যে কপোত-নিয়োগ প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং সামরিক উদ্দেশ্যে অধুনা যে বার্ত্তাবহকপোত ব্যবহৃত হয়, এ প্রথা বাস্তবিকই অধুনাতন কালের নহে। অনেক প্রাচীন কালের।

আসিয়া অঞ্চলেও অনেক প্রাচীনকালাবধি কপোত নিয়োগ চলিয়া আসিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে আরব্যগণ মোসল নামক স্থানে এক কপোত ডাকের আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর অতি প্রারম্ভ হইতেই আরবের প্রধান প্রধান নগরগুলির মধ্যে কপোতসাহায্যে নিয়মিতরূপে খবরাখবর চলিত। আরব্য ইতিহাসকারগণ বলেন যে, ৬৮৭ হিজিরা শক অর্থাৎ (১২৭০ খৃঃ অঃ) হইতে বোগদাদের খালীফ কপোত ডাক স্থাপন করিয়া ফেয়েরো নগরের সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে ঈদৃশ কপোত ডাক মিসর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে ইহার কার্য্যকারিতা এতই আদৃত ও মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত যে, খালীফগণ এবম্বিধ শূন্যমার্গে সংবাদপ্রেরণপ্রণালী শাসনবিভাগের এক শাখারূপে পরিগণিত করিয়াছিলেন। সপ্তদশশতাব্দী পর্য্যন্ত রাজকীয় ব্যয়ে এক কপোত ডাক নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু ইহার পরেই মোগলদিগের আক্রমণকালে, তুরস্কদিগের অনবধানতা প্রযুক্ত এ প্রথা এক প্রকার রহিত হইয়া যায়। তথাপি প্রমাণের অভাব নাই যে, তুরস্কগণ সপ্তদশ শতাব্দীতেও কপোতকে বার্ত্তা বহনের কার্য্যে নিয়োগ করিত। তুরস্কগণ কপোতের বার্ত্তা বহন ক্ষমতা এরূপ উচ্চ চক্ষে দর্শন করিত যে, বৃথা আমোদ বা সখের জন্য তাহারা এতদুপরি এক কর স্থাপন করিয়াছিল। যাহারা সখের জন্য কপোত পোষণ করিবে তাহারা এই কর দানে বাধ্য। যদিও কেহ কেহ এরূপ কর দান করিয়াও কপোত পোষণ করিত বটে, তাহা হইলেও সাধারণতঃ তুরস্কগণ সখের জন্য কপোত পালন নিতান্ত লজ্জাকর ও ঘৃণনীয় বিষয় মনে করিত। আজও পর্য্যন্ত আরব্য ও পারস্যের মধ্যে যে যে স্থানে তাড়িতবার্ত্তা প্রচলিত হয় নাই, সেই সেই স্থানে কপোতসাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে।

মিসর ও সিরিয়া দেশেও কপোত দ্বারা সংবাদ প্রেরণের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। লোকেরা কপোতের পক্ষের নিম্নে অথবা পুচ্ছ দেশের কোন একটি পালকে পত্রগুলি বাঁধিয়া দিত। ঈদৃশ পত্র লিখিবার জন্য এক প্রকার অতি লঘুভার পাতলা কাগজ ব্যবহৃত হইত। ওই কাগজ, ইহার ব্যবহার অনুসারে পক্ষীর কাগজ নামে অভিহিত হইত।

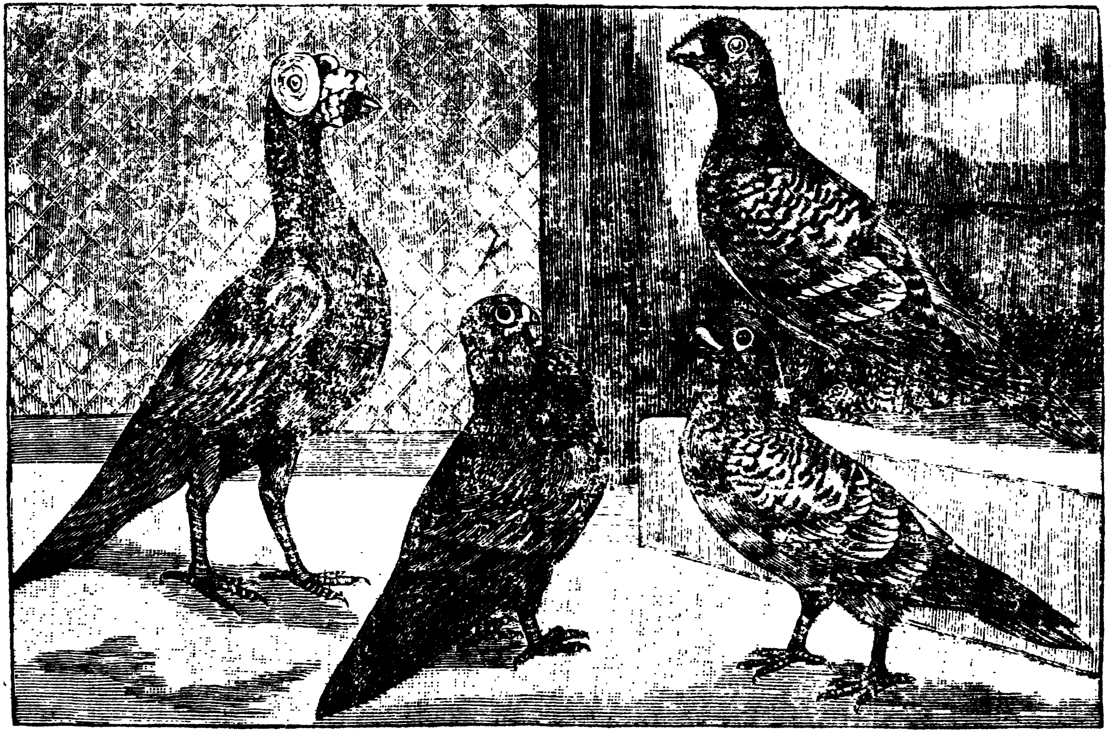
সুলতানের কার্য্যে যে সকল পারাবত ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগের পদে ও চঞ্চুতে এক প্রকার চিহ্ন থাকিত। সুলতান স্বয়ং পারাবতদিগের পক্ষ হইতে পত্র খুলিয়া লইতেন।

কপোতের ঈদৃশ অসাধারণ ক্ষমতা ও কার্য্যকারিতার জন্য, ইহারা লোকসাধারণে অত্যুচ্চ সম্মান সহকারে আদৃত হইত। অনেকে তৎকাল-প্রচলিত কুসংস্কার বশবর্ত্তী হইয়া, ইহাদের প্রতি দৈবশক্তি আরোপ করিত। আসিয়া প্রভৃতি দেশে লোকে ইহাদিগকে রাজার প্রেতাত্মা বলিয়া সম্মান করিত।

ক্রমে, প্রাচ্য দেশ হইতে বার্ত্তাবহ কপোত প্রতীচ্য দেশে নীত হইল। যেমন অপরাপর সভ্যতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান পূর্ব্ব দেশ হইতে ক্রমে পশ্চিম রাজ্যে গিয়াছিল, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ দেখিতে পাই; বার্ত্তাবহ কপোত সম্বন্ধেও আমরা তাই দেখি। বোগদাদকপোত অপর সমুদয় জাতির কপোতাপেক্ষা বার্ত্তাবহনে সবিশেষ দক্ষ। এই জন্য তুরস্ক ও পারস্যে ইহাদিগকে সাতিশয় যত্নসহকারে পালন করা হইত। এই বোগদাদকপোতের এক যোড়া কোন ওলন্দাজ পোতবাহক সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে লইয়া যায়। তৎকালে হলণ্ডবাসীগণ পারস্য ও তুরস্কের সহিত বাণিজ্য করিত। ইহারাই বোগদাদকপোত লইয়া গিয়া স্বদেশীয় জঙ্গলী কপোতের সহিত সঙ্গম করাইয়া এক নূতন শ্রেণীর বার্ত্তাবহ কপোতের সৃষ্টি করে। য়ুরোপ অঞ্চলে নানা স্থানে যে অসংখ্য অসংখ্য বার্ত্তাবহ কপোত বর্ত্তমানে পরিদৃষ্ট হয়, তাহারা সকলেই আদৌ এই বোগদাদ কপোত যুগল হইতেই সমুদ্ভূত। আমরা বারান্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর পারাবতের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক মীমাংসার সবিশেষ আলোচনা করিব।

ওলন্দাজ বণিকগণ কর্ত্তৃক বার্ত্তাবহ কপোত যেমন সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপে আনীত হয়, ওলন্দাজগণও সেইরূপ সর্ব্ব প্রথমে বার্ত্তাবহ কপোতের সংবাদ বহনের অসাধারণ ক্ষমতার প্রভাবে বিশিষ্টরূপে উপকৃত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হলণ্ডে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয় এবং যে যুদ্ধের পর হলণ্ডবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করে, সেই যুদ্ধের সময় (১৫৭৪ খৃঃ অঃ) স্পানিয়ার্ডগণ Legden অবরোধ করিয়াছিল। নগরের অধিবাসীরা বহিঃস্থ অন্য কাহারো সহিত কোনরূপ সংবাদ বিনিময় করিতে পারিত না এবং তাহাদের উদ্ধার সাধন জন্য অন্য প্রদেশবাসীরা কীদৃশ উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাও তাহাদের জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। এদিকে খাদ্যাগমের সমুদয় পথ রুদ্ধ হওয়াতে নগর মধ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইল। প্রজাপুঞ্জ অনাহারে ও রোগে অভিভূত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আমরা এস্থলে এক ফরাসী লেখকের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জীর্ণ শীর্ণদেহ পুরুষ ও ছিন্নবাসপরিহিতা স্ত্রীগণ সমবেত হইয়া নগরের শাসন কর্ত্তার সমক্ষে উপস্থিত হইল এবং সুসময়ে অনুরোধ করিল যে, হয় তাহাদিগকে খাদ্য দেওয়া হোক, নতুবা শত্রু হস্তে নগর অর্পণ করা হোক। এই শাসনকর্ত্তা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজার (প্রিন্স অরেঞ্জ্) নিকট হইতে কপোত দ্বারা এক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সমবেত প্রজাগণকে ইহার মর্ম্ম বিদিত করিলেন। ইহাতে লেখা ছিল যে, মিউস এবং ইসেলের সম্মুখস্থ বাঁধ ভেদ করা হইয়াছে এবং জিলণ্ডের নৌ-সেনা-নায়ক রণতরী ও খাদ্য সামগ্রী সমভিব্যাহারে অবরুদ্ধ নগরবাসীদের উদ্ধারার্থ ত্বরায় আগমন করিতেছেন। সাহসী শাসনকর্ত্তা এই রাজ-বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া বলিলেন যে, আমি আমার ঈশ্বর ও দেশের নামে যে শপথ পরিগ্রহ করিয়াছি,



১ ২ ৩ ৪

বিভিন্ন জাতীয় বার্ত্তাবহ কপোত।

(১) পারস্য বা বোগদাদ কপোত ; (২) ক্রাভাতে ; (৩) লেজোয়া ; (৪) আঁভার্সোয়া।

তদনুসারে কার্য্য করিব। তোমাদিগকে খাদ্য প্রদানের শক্তি আমার নাই কিন্তু যদি আমাকে বধ করিয়া তোমরা সন্তুষ্ট হও, এই আমার শরীর লও। ইহা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া আপনাদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি কর।" ,

কিন্তু উল্লিখিত রাজকীয় বার্ত্তা শ্রবণে এই অবরুদ্ধ শীর্ণ, রুগ্ন ও ক্ষুধার্ত্ত অধিবাসীগণ এতই আশ্বস্ত হইয়াছিল যে, তাহারা শাসনকর্ত্তার কথায় উত্তর দিল যে, "আমরা দেশকে শত্রুহস্তে কবলিত করিবার পূর্ব্বে ক্ষুধা নিবারণের জন্য আপনাদের বাম হস্ত কাটিয়া ভক্ষণ করিব এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্বদেশ রক্ষা করিব।" হলণ্ডবাসীগণ এইরূপে এক অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত আশ্বাসবাণী পাইয়া নবোৎসাহে প্রাণপণে স্বদেশরক্ষার্থ যত্ন করিতে লাগিল। ইহার কতিপয় দিবস পরেই স্পানিয়ার্ডগণ নিরাশ হইয়া, নগর অবরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থানপর হইল।" এইরূপে দেখা যাইতেছে, কপোতই প্রকৃতপক্ষে সে বিষম সঙ্কটের কালে হলণ্ডদেশ রক্ষা করিয়াছিল। হলণ্ডবাসীগণও তাই উক্ত পরমোপকারী কপোতদিগের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে কখনই বিমুখ হয় নাই। ঐ ঘটনার পর হইতে, উহারা রাজব্যয়ে প্রতিপালিত হইত। উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ্ এই মর্ম্মে এক রাজাদেশ প্রচার করেন যে, উক্ত কপোতগণ রাজব্যয়ে প্রতিপালিত হইবে এবং উহাদের মৃত্যুর পর মৃতদেহকে এমবাম করিয়া নগরের প্রকাশ্য স্থানে রক্ষিত হইবে। আজও পর্য্যন্ত এমবাম করা কপোতদেহ হলণ্ডের টাউনহলে রহিয়াছে দেখা যায়।

এই ঘটনার প্রায় তিন শতাব্দী পরে, ইউরোপের ইতিহাসে আমরা পুনরায় দেখিতে পাই এই নিরীহ কপোতজাতি সামরিক বার্ত্তাবহনে নিয়োজিত হইয়াছে। ১৮৭০—৭১ খ্রীঃ অব্দে যখন সুপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কো জর্ম্মাণ যুদ্ধ হয় সেই সময়ে সামরিক উদ্দেশ্যে কপোত ব্যবহারের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে, অতি অল্প লোকেই মনে করিত, যুদ্ধবিগ্রহে কপোত এতাদৃশ উপকার সাধিত করিতে পারে। কিন্তু এই ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ সমরের পর হইতে, বার্ত্তাবহ কপোত এক্ষণে ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের অন্য সকল দেশের সমরবিভাগেরএকটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্গ, সৈন্য, রণতরী, লৌহবর্ত্ম, তাড়িতবার্ত্তা প্রভৃতি দেশরক্ষার জন্য যেরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বার্ত্তাবহ কপোতও তদ্রূপ। এই নিমিত্ত বর্ত্তমানে দুর্গ ও সেনানিবাসের সঙ্গে সঙ্গে কপোত-আড্ডাও ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গের বিদিতার্থ ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে বার্ত্তাবহ কপোত কিরূপে ব্যবহৃত হইত, তদ্বিবরণ নিম্নে সন্নিবদ্ধ করিলাম।

পারি মহানগরী তখন জার্ম্মাণ সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত। নগরাধিবাসীগণ প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের সহিত কোনরূপে সংবাদ পরিচালন করিতে পারিতেছে না। সংবাদ আদান প্রদানের সমুদয় পথ রুদ্ধ। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ শত্রু হস্তে। স্থলপথে

অগণ্য জার্ম্মাণ-সৈন্য সঙ্গীন লইয়া অহর্নিশি পাহারা দিতেছে। জলপথে লৌহনির্ম্মিত এক প্রকার জাল প্রসারিত থাকিয়া—নদীর পথ অগম্য করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র আকাশ-পথ কেবল অনিরুদ্ধ। স্বদেশ-বৎসল ফরাসিগণ সে মহা সঙ্কটের কালে অবারিত আকাশপথ দিয়া প্রাদেশিক লোকদিগের সহিত মনোভাব বিনিময় করিত। শত্রুগণ কোনমতে এই চির-উন্মুক্ত পথের রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিপন্ন কিন্তু সুচতুর ও বুদ্ধিমান ফরাসি বেলুন ও কপোত সাহায্যে পারি ও বিভিন্ন বিভাগে সংবাদ পরিচালিত করিত। সর্ব্বদা পারি হইতে কতকগুলি পারাবত ব্যোমযানে করিয়া বহির্দ্দেশে নীত হইত এবং ইহাদিগকে প্রাদেশিক ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উড়াইয়া দিয়া তত্তৎস্থানের সংবাদ পারি নগরে আনীত ও প্রচারিত হইত। উড্ডয়ন-পটু ও বেগগামী কপোতগণ স্বকীয় স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে সুদূর স্থান হইতেও অনায়াসে স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিতে পারিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ সময়ে ফরাসী-সমরবিভাগ কপোতের ঈদৃশ আশ্চর্য্য শক্তির কথা বিন্দুমাত্রও অবগত ছিলেন না। তথাপি যখন শত্রুবর্গ রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হস্তগত করে, তখন মহানগরী ও অন্যান্য প্রাদেশিক বিভাগের সহিত সংবাদ পরিচালনার্থ শূন্যপথ ব্যতীত আর কোন পথ উন্মুক্ত না দেখিয়া, লোকেরা ব্যোমযান সাহায্যে উহা সংসাধন করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু যেমন বর্ত্তমানে বেলুন সম্পূর্ণরূপেই বহমান বায়ুর অধীন, অর্থাৎ যে দিকে বায়ু বহে, বেলুন কেবল সেইদিকেই যায়, তখনও সেইরূপই ছিল। বায়ুর প্রতিকূলে বা অন্য কোন দিকে গমন করিবার সাধ্য বেলুনের তখনও ছিল না, এখনও নাই। (যদিও সম্প্রতি আমেরিকা ও ফ্রান্স উক্তরূপ বেলুননির্ম্মাণে কতক অংশে সফল হইয়াছে।) সেই জন্য ফরাসিগণ কপোত সাহায্য দ্বারা বেলুনকে কোনরূপে কার্য্যকারী করিবার মনস্থ করিলেন।

নানা কপোতপালনসমিতির ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষগণ সমর-সচিবের নিকট আবেদন করিলেন যে, তাঁহারা আপনাদিগের শিক্ষিত কপোত সাহায্যে বেলুনে উঠিয়া, প্রাদেশিক সংবাদ প্রেরণে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সমর-সচিব তাঁহাদিগের কথায় কেবল কর্ণপাত করিলেন না এমত নহে, অনেককে এ প্রস্তাবের জন্য উপহাসও করিয়াছিলেন। তৎকালে পারিতে অধিক সংখ্যক উৎকৃষ্ট কপোত ছিল না। যে গুলি ছিল, তাহারা সকলেই মধ্যবিদ ধরণের। এইজন্য ইহাদিগের সাহায্যে প্রকৃত কার্য্য সাধন করিবার পূর্ব্বে কয়েকবার পরীক্ষা করা আবশ্যক ছিল। এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথমে সুবিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "লা নেচারের". বর্ত্তমান সম্পাদক গাস্‌ট টিসাঁডিয়ে * সেলেস্টিয়াল নামক বেলুনে তিনটি কপোতসহ আরোহণ করিয়া

---

* Tissandier আজও জীবিত আছেন এবং বর্ত্তমানে দক্ষতার সহিত La Nature নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। ইনিই সেই স্বদেশহিতৈষী বেলুনারোহী

৩০ সেপ্টেম্বরে পারি পরিত্যাগ করেন। সেই দিবসেই উহাদের মধ্যে দুইটি কপোত পারিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাদিগের দ্বারা টিসাঁডিয়ে পারিস্থ বন্ধুদিগকে বিদিত করিয়াছিলেন যে, তিনি নিরাপদে Drutx নগরে অবতরণ করিয়াছেন।

ইহার পর, ৭ই অক্টোবরে গাম্বেটা অন্য এক বেলুনে আরোহণ করিয়া নগরের বাহির হন। ইহাঁর সহিত অনেকগুলি বাছা বাছা পায়রা ছিল। কপোতকপালনসমিতির সভ্যগণ কয়েকটি উৎকৃষ্ট কপোত বাছিয়া ইহাঁর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। গামবেটার বেলুনারোহণ নিতান্ত নিরাপদ ছিল না। কেন না, বেলুন জার্ম্মাণ সৈন্যব্যূহ-সীমা অতিক্রম করিতে না করিতে উহার প্রতি অনেক গুলি বর্ষণ হইয়াছিল। এমন কি একটা গুলি গামবেটার হস্ত স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তথাপি, গামবেটা সুস্থশরীরে ও নিরাপদে পারির সীমা অতিক্রম করিয়া Montdidier নামক স্থানে অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যখন গামবেটা-প্রেরিত প্রথম কপোত পারি অভিমুখে আসিতেছিল, তখন সকলেই নিতান্ত ঔৎসুক্যসহকারে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং যখন ইহা গামবেটার নিরাপদ অবতরণ পরিজ্ঞাপন করিল, তখন ফরাসীহৃদয়ে আনন্দের আর সীমা রহিল না। এই কপোতটি আঁভার্সোয়া (Anversois) জাতীয়। ইহা অনেকবার কপোত উড্ডয়ন প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক লাভ করিয়াছিল। গামবেটার নিকট অপর যে তিনটি কপোত ছিল, তাহারা ইহার পরে পারিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ইহার পর হইতেই কপোতগণ এই অসাধারণ ক্ষমতার জন্য লোকের প্রগাঢ় অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতার পাত্র হইল। প্রাচীন কালে নগরে নগরে যেমন একদা বার্ত্তাবহ কপোতদিগের সমাদর হইত ফ্রাঙ্কো-প্রশিয়ান যুদ্ধের অবসানে ফরাসীগণ কপোতদিগের মহদুপকার স্মরণার্থে সেইরূপ তাহাদের সম্মানার্থ অনেক প্রকারের নিদর্শন ক্ষোদিত করিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি ক্ষোদিত মূর্ত্তি আজও নয়নগোচর হয়। ইহাতে দেখা যায় যে, এক ভীষণদৃশ্য দুর্গ-প্রাকারের কিনারার উপর একটি মলিনা সুন্দরী যুবতী বিষাদ-চিহ্নিত পরিচ্ছদে অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশের প্রতি বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আর উচ্চ বিমান হইতে একটি কপোত চঞ্চুবিস্তার করিয়া দ্রুতপক্ষ সঞ্চালনে তদভিমুখে অবতরণ করিতেছে।

বাস্তবিক সেই ভয়ানক অবরোধকালে কপোত অনেক সাহায্য করিয়াছিল। কপোত পারি-অবরুদ্ধ পরিবারগণকে বহিঃস্থ আত্মীয় স্বজনের সংবাদ বিদিত করিত। নগরের বহির্দ্দেশে শত্রুগণের সহিত স্বদেশীয় লোকদিগের সংগ্রামের সংবাদ আনয়ন

Tissandier কি না জানিবার জন্য আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু ইংলণ্ডে অবস্থানকালে উক্ত সম্পাদককে চিঠি লিখিয়াছিলেন। টিসাঁডিয়ে স্বয়ং অতি ভদ্রভাবে উত্তর দান করিয়া বলিয়াছেন, উনিই সেই বেলুনারোহী—লেখক।

করিত। কত পরিবারকে বহিঃস্থ আত্মীয়গণের নিকট হইতে পত্র দ্বারা অর্থ-সাহায্য আনিয়া দিয়া অনাহার-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিত। এই জন্যই পারিবাসীরা প্রাচীন-দিগের ন্যায় কপোতকে "পবিত্র" কপোত বলিত।

ঐরূপ বেলুনারোহণ ও কপোত দ্বারা অন্যান্য প্রদেশ হইতে পারিতে বার্ত্তা প্রেরণ সম্ভব দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের ধ্যানভঙ্গ হইল। তখন যাহাতে পারি ও অন্যান্য প্রাদেশিক বিভাগের সহিত বেলুন ও কপোতসাহায্যে সংবাদ পরিচালন সম্ভবিত হয়, তন্নিমিত্ত এক নূতন আদেশ প্রচারিত হইল। তৎকালীন সুবিখ্যাত কপোতকর্ষণ-কারিগণ ডাকবিভাগের প্রধান কর্ত্তার নিকটে স্ব স্ব পারাবতসহ বেলুনারোহণে পারি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য ইচ্ছা বিদিত করিল। তাহারা সকলেই একে একে বেলুনে উঠিয়া পারির বাহিরে গিয়াছিল। সে সময়ে তাদৃশ শিক্ষিত কপোতসংখ্যা অতি অল্পই ছিল। কিন্তু সংবাদ এত অধিক হইত যে, তন্নিমিত্ত নূতন পন্থা উদ্ভাবনের আবশ্যক হইয়াছিল। এই সময়েই Micro-photographyর আবিষ্কার হয়।

লোকে কথায় বলে, 'কায আটকাইলেই বুদ্ধি যোগায়', অভাবই নূতন উপায় উদ্ভাবনের জনয়িতা। ফরাসীগণ সেই বিষম সঙ্কটকালে সম্পূর্ণ নূতনরূপে ফটোগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার পন্থা আবিষ্কার করিল। ইহাতে যেমন একদিকে ফরাসী জাতির আবিষ্কার-কুশল প্রখর মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি অপরদিকে স্বদেশবৎসল স্বাধীনতানুরাগী ফরাসী জাতির জীবন্ত, ঐকান্তিক স্বদেশপ্রাণতারও অতি সুন্দর মহৎ ও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বাস্তবিক, সেই অবরোধকালে যদি ফরাসীগণ বেলুন ও কপোতসাহায্যে একমাত্র অনিরুদ্ধ শূন্যপথ দিয়া পারির সহিত প্রাদেশিক বিভাগের যোগাযোগ সংস্থাপনে সমর্থ না হইত, আর যদি Micro-photograph সাহায্যে অধিক সংখ্যক সংবাদকে ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে সন্নিবদ্ধ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিত, তাহা হইলে ভাগ্যদেবী প্রশিয়ার তাদৃশ অশেষ বাহুবল অভিমুখে, ফরাসীদিগের উপর স্বীয় প্রসন্ন দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন কি না সন্দেহ।

অবরোধকালে প্রাদেশিক বিভাগ হইতে রাজধানী পারিতে কত অধিক সংবাদ আসিবার আবশ্যক হইত, পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আমাদের এখানকার দৈনিক ইংরাজী পত্রিকা অপেক্ষাও বৃহদাকারের ষোলখানি পত্র একত্র করিয়া তাহাতে যত সংবাদ মুদ্রিত করা সম্ভব তাহা হইতে অধিক সংবাদ এক একবারে পাঠাইবার আবশ্যক হইত। ক্ষুদ্র কপোত কখনই এতাদৃশ বৃহদায়তন সংবাদ-পত্র-ভার বহন করিতে পারে না। অথচ এত অধিক সংবাদ প্রেরণও নিতান্তই আবশ্যক। তাই স্বদেশপ্রাণ ফরাসীর উদ্ভাবনী শক্তি উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইল। ফল-স্বরূপ সমুদয় সভ্যজগৎ এক্ষণে Micro-photography বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিয়াছে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে Micro-Photographic বার্ত্তা কপোত দ্বারা বাহিত হইত।

রাজকীয় ও সাধারণ ব্যক্তির যত সংবাদ থাকিত, সমুদয় একত্র করিয়া বড় বড় কাগজে মুদ্রিত করা হইত। এখানকার দৈনিক ইংরাজী পত্রিকার আকারের অপেক্ষাও বৃহদাকারের ষোলখানি কাগজে তাবৎ প্রেরণীয় সংবাদ প্রথমে মুদ্রিত করা হইত। তৎপরে ইহার ফটোগ্রাফ লওয়া হইত। ফটোগ্রাফ লইলে ইহা উহার আয়তনের $\frac{1}{৮০০}$ ভাগ হইত মাত্র। কিন্তু এই ফটোগ্রাফ কাগজের উপর তোলা অসম্ভব। কেননা ইহাতে অক্ষরগুলি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উঠিত যে তাহাদিগকে পাঠ করা কোন মতেই সম্ভবপর হইত না এই জন্য জিলেটিন ও ব্রোমাইট পটাসিয়মের পাত ফটোগ্রাফিক প্লেটরূপে ব্যবহৃত হইত। ইহা ওজনে দুই সেণ্টিগ্রাম (এক গ্রেণের এক তৃতীয়াংশ) বই আর অধিক হইত না। কিন্তু ইহারি মধ্যে উপর্য্যু-ল্লিখিত বৃহদায়তনের প্রাত্যহিক পত্রিকার ষোলখানিতে যত সংবাদ মুদ্রিত করা সম্ভব, তাহাই থাকিত।

উক্তরূপ জিলেটিন পত্রটুকু কাচপৃষ্ঠ হইতে তুলিয়া লইলে, উহা আপনিই গুটাইয়া যাইত এবং তখন অনায়াসে একটা পালকের কলমের মধ্যে প্রবিষ্ট করান সম্ভব হইত। এইরূপে একটা পেন কলমের মধ্যে উল্লিখিত জিলেটিনের ২০ টা পত্র একত্রে যাইতে পারিত, এবং ইহাদের সমবেত ভার এক গ্রামের (প্রায় ১৫$\frac{১}{২}$ গ্রেণ) অধিক হইত না। আর প্রায় ২০।৩০ লক্ষ পত্রের মর্ম্ম উহাদের মধ্যে নিহিত থাকিত।

এইরূপ একটি পালকের কলম বার্ত্তাবহ কপোতের পুচ্ছের একটি শক্ত পালকে সূত্র দ্বারা আবদ্ধ থাকিত। যে কোন পালকে বাঁধিলে হইত না। কেন না, যদি সেই পালকটি উড্ডয়ন কালে খসিয়া যায়, তাহা হইলে সকলি ব্যর্থ হইবে। এই নিমিত্ত এমন একটি পালক বাছিতে হইত, যাহা নূতন, অর্থাৎ শীঘ্র খসিয়া পড়িবে না। যে পালকের বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, তাহাই নূতন বলিয়া জানিতে হয়। নূতন পালকই সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত হইয়া থাকে। কপোত উল্লিখিত Microphotogrophic লিপি সহ অনায়াসেই অনেক দূর অতিক্রম করিয়া আসে। পালক ও উহার মধ্যস্থ লিপি সমূহের ভারে বিন্দুমাত্রও ভারগ্রস্ত বোধ করে না। কোন কপোত কর্ত্তৃক এতাদৃশ লিপি আনীত হইলে, উক্ত লিপিখণ্ডকে একবার য়্যামোনিয়ার জলে ডুবাইয়া লইতে হয়। তাহা হইলে গুটাইত জিলেটিন পত্র-খণ্ড তৎক্ষণাৎ সহজেই খুলিয়া যায়। তৎপরে প্রবল অণুবীক্ষণ সাহায্যে উহা পাঠ করিলেই হইল।

এবম্বিধ ফটোগ্রাফিক লিপি প্রস্তুতকরণে যথেষ্ট নৈপুণ্য আবশ্যক। বিশেষ দক্ষতা ও যথেষ্ট অভ্যাস না থাকিলে উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অতি সুকঠিন। ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে যখন ডাক বিভাগে বার্ত্তাবহ কপোত ডাক হরকরার কার্য্যে নিয়োজিত হইল, এবং হস্তলিপি বা মুদ্রিত সংবাদের পরিবর্ত্তে ফটোগ্রাফিক বার্ত্তা প্রেরণের আবশ্যক হইল, তখন এই দুরূহ কার্য্য সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য পারি হইতে সুশিক্ষিত

ও সুদক্ষ ফটোগ্রাফার এবং কপোত পালকগণ আবশ্যকীয় সরঞ্জাম সহ বেলুনে আরোহণ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিল। ইহাদিগকে পারির বাহিরে আনিবার জন্য দুটি বেলুন নিয়োজিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটি অনতিবিলম্বে জার্ম্মাণদিগের গুলির আঘাতে বিদ্ধ হইয়া শত্রু সৈন্য মধ্যে পড়িয়া যায়। বেলুনারোহীগণ শত্রু হস্তে বন্দী হইবার পূর্ব্বেই কপোতদিগকে উড়াইয়া দিয়াছিল। একটি কপোত জার্ম্মাণদিগের দ্বারা ধৃত হয় এবং ইহা দ্বারা জার্ম্মাণেরা এক মিথ্যা সংবাদ পারিতে প্রেরণ করে। কিন্তু ফরাসিগণ এই চাতুরী সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিল। অপর বেলুনটিও নামিবার সময় জার্ম্মাণ সৈন্যদলের মধ্যেই পতিত হয়, কিন্তু ইহার আরোহীগণ শত্রু হস্ত অতিক্রম করিয়া পলায়ন করে এবং অনেক পথ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে বোর্দো নগরে উপস্থিত হয়। তথা হইতে কপোত প্রেরণ করিয়া আপনাদিগের নিরাপদ-সংবাদ পারি মহানগরীতে পরিজ্ঞাপন করে। কপোতগণ এত দূরে নীত হইয়াও আপন আবাসে অর্থাৎ পারিস্থ কপোত-নিবাসে প্রত্যাগমন করিতে পারিয়াছিল।

৬ই ডিসেম্বর জার্ম্মাণগণ আর্লিয়াঁ পুনরাধিকার করে এবং লোয়ার নগরীর সৈন্যদলকে পরাস্ত করিলে, সে সংবাদ পারিতে পাঠাইবার জন্য ৪টি কপোত প্রেরিত হয়। উহাদের মধ্যে কেবল একটি রক্তাক্ত কলেবরে * সে দুঃখের সমাচার অবরুদ্ধ নগর মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। আবার যখন ফরাসীরা জার্ম্মাণদিগের সহিত এক যুদ্ধে জয়ী হয়, সে জয়-সংবাদও সুবিশ্বস্ত কপোত অনতিবিলম্বে পারির অধিবাসীদিগকে বিদিত করিয়া আশান্বিত করিয়াছিল। কেবল জয় পরাজয় সংবাদ নহে, কপোত দ্বারা বাহির হইতে বিল প্রেরিত হইত এবং অনেক অবরুদ্ধ পিতা মাতা বা স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়গণ সেই বিল লইয়া আপনাদিগের আহার-ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া অনাহার-মৃত্যু হইতে রক্ষা লাভ করিয়াছিল।

পারির সেই অবরোধাবস্থায় যদি ঈদৃশ বিশ্বস্ত কপোতের সাহায্য না পাওয়া যাইত তবে বোধ হয়, ফ্রান্স বর্ত্তমানের ফ্রান্স থাকিত না। সে বিষম শঙ্কটকালে কপোত দ্বারা আশাতীত ফল লাভ হইয়াছিল। দ্রুতগামিত্বেও কপোতগণ রেলওয়ে বা তাড়িতবার্ত্তা অপেক্ষা হীনতর ছিল না। কেন না, একদা বোর্দোস্থ ফটোগ্রাফারগণের সংবাদ প্রেরণ জন্য এক দ্রব্যের আবশ্যক হয়। পারি ব্যতীত কুত্রাপি উহা পাওয়া যায় না। কপোত দ্বারা পারি হইতে উহা পাঠাইবার কথা বলিয়া পাঠান হইল।

---

* কারণ, কপোতগণ নিরাপদে উড়িয়া আসিতে পারিত না। জার্ম্মাণগণ, কপোতে ফরাসীদের সংবাদ লইয়া আসে জানিতে পারিয়া, উহা নিবারণ করিবার জন্য সমূহ চেষ্টা করিত। বন্দুকের গুলি ত ছিলই, তাহা ছাড়া উহারা আবার বাজপাখী পুষিত। ফরাসীরা পায়রা উড়াইলেই, জার্ম্মাণরা বাজপাখী ছাড়িয়া দিত। এই জন্য অনেক কপোত মারা যাইত। কেহ বা আহত হইয়াও স্বাবাসে ফিরিত।

চারি দিবসের মধ্যে বেলুন সহযোগে সে দ্রব্য উক্ত ফটোগ্রাফারগণ প্রাপ্ত হইল। বর্ত্তমানে, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ সাহায্যেও এত সত্বর ইহা সম্ভবিত হয় না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অবরোধ কালে যে সমুদয় কপোত ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সকলেই মধ্যবিদ ধরণের, তেমন উৎকৃষ্ট কেহই ছিল না। সেই জন্য অনেক কপোত বাহির হইতে উড়াইলে পর, পারিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। কথিত, ৩৬০টা কপোতের মধ্যে ৭৩টি কেবল সংবাদ লইয়া পারিতে আসিতে পারিয়াছিল। আর কেবল একটি কপোতই ছয় বার সংবাদ আনিয়াছিল। যদি এ সমুদয় কপোত উপযুক্ত রূপে শিক্ষা পাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কখন এত অধিক সংখ্যায় নষ্ট হইত না। বিশিষ্টরূপে শিক্ষা পাইলে ও উত্তমবংশীয় হইলে বার্ত্তাবহ কপোত যে অনায়াসে বহু দূর হইতে স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। একদা ফ্রান্সের কোন এক নগর হইতে পাঁচ শত শিক্ষিত ও উত্তমবংশীয় কপোতকে অন্য এক দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহারা সকলেই স্বাবাসে পুনরাগমন করিয়াছিল, একটিরও পথ-ভ্রম ঘটে নাই। তবে, জার্ম্মাণ-অবরোধ কালে অনেক বার্ত্তাবাহী কপোত যে নিহত হইয়াছিল, তাহার অন্য কারণও ছিল। প্রথমতঃ জার্ম্মাণগণ ফরাসীদিগের এই কৌশল বুঝিতে পারিয়া, পারি-অভিমুখে কপোত দেখিলেই বধ করিবার সমূহ চেষ্টা করিত। জার্ম্মাণেরা এই জন্য সর্ব্বদা আকাশের দিকে লক্ষ রাখিত। বন্দুক ও বাজপাখী দ্বারা অনেক কপোত বধ করিত। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বোধ ফরাসী কৃষকগণও অনেক সময়ে না জানিয়া ক্রীড়াচ্ছলে পরমোপকারী বার্ত্তাবাহী কপোতকে গুলি করিয়া মারিত। তৃতীয়তঃ অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত কপোত পথ-ভ্রান্ত হইয়া অবশেষে অনাহারে অথবা অন্য কোন কারণে প্রাণত্যাগ করিত।

কিন্তু এইরূপ নানা প্রতিবন্ধক সত্বেও অবরোধ কালে বার্ত্তাবহ কপোত দ্বারা লক্ষাধিক গুপ্ত পত্র ও বিল ইত্যাদি পারিতে আনীত হইয়াছিল। কথিতযে, শেষ বার্ত্তাবহ কপোত যে সমুদয় পত্রিকা আনয়ন করিয়াছিল, তন্মধ্যে চল্লিশ সহস্রেরও অধিক ভিন্ন ভিন্ন লিপি ছিল। সাধারণ মুদ্রাপ্রকরণের অক্ষরে তৎসমুদায় মুদ্রিত হইলে পাঁচ শত খণ্ড বড় বড় পুস্তক প্রণীত হইতে পারিত। অতএব, উক্ত কপোতগণ যে এক অসম্ভবিত ও অপ্রত্যাশিত সাহায্য দানে তৎকালে ফরাসী জাতির অপরিমেয় উপকার সাধন করিয়া প্রভূত কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না।

অবরোধ কালে বার্ত্তা বহন জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কপোতপালকদিগের সহিত এইরূপ চুক্তি করিয়াছিলেন। কপোতের অধিকারীকে কপোত লইয়া যাইবার পূর্ব্বে এক শত ফ্রাঙ্ক (বর্ত্তমানে ষাট টাকারও অধিক) প্রদত্ত হইত। বাহিরে লইয়া গিয়া উড়াইয়া দিলে পর যদি উহা নিরাপদে পুনরায় স্বাবাসে ফিরিয়া আসিতে পারে,

তাহা হইলে উহা উহার প্রভুরই সম্পত্তি হইত, গবর্ণমেণ্ট কোন দাবী করিতে পারিতেন না। আর যদি কপোত প্রত্যাবর্ত্তনে অক্ষম হইত, অথবা পথি মধ্যে ধৃত বা নিহত হইত, তাহা হইলে উহা গবর্ণমেণ্টের হইত। অর্থাৎ কপোতাধিকারী উহার জন্য আর কোন দাবী করিতে পারিতেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমানে প্রায় সমুদয় য়ুরোপে সামরিক কপোতের আড্ডা স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফ্রান্স ও জার্ম্মাণিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখানে সৈন্যদিগের কাওয়াদ শিক্ষার ন্যায়, সামরিক কপোত নিচয়কে নিয়মিতরূপে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। শিক্ষার রীতি সর্ব্বত্র ঠিক একরূপ না হইলেও উদ্দেশ্য এক। ইহাদিগকে শিক্ষিত করিবার সাধারণ নিয়মের নিম্ন লিখিত বিবরণ আমরা কোজিয়ে নামক খ্যাতনামা ফরাসী কপোতপালকের পুস্তিকা হইতে সংগ্রহ করিলাম। ইহার শিক্ষিত কপোতগণ ফ্রাঙ্কো প্রশিয়ান সমর কালে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সমূহ সহায়তা করিয়াছিল।

শিশু কপোতকে শিক্ষা দিতে কিছু সময় আবশ্যক। তিন বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, কপোত পূর্ণ-বিকাশ সম্পন্ন হয় এবং দ্রুতগামিত্বের চরমসীমা প্রাপ্ত হয়। পঞ্চদশ বা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বার্ত্তাবহন কার্য্যে ইহারা সবিশেষ দক্ষ থাকে। কেহ কেহ বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত উক্ত ক্ষমতার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু দুই হইতে ছয় বৎসর বয়সের মধ্যেই কপোতগণ আপনাদিগের সমুদয় ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। একটি সুদক্ষ কপোত এক মিনিটে ১৮০০ মিটার (প্রায় ১৯৭০ গজ) অর্থাৎ এক মাইলেরও অধিক ভ্রমণ করিতে পারে। শিশু কপোতকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ইহাকে একটি পিঞ্জরে করিয়া অল্প দূরে লইয়া যাইতে হয়। এই পিঞ্জর কোন রূপ বস্ত্র বা অন্য কোন দৃষ্টিরোধকারী পদার্থ দ্বারা মণ্ডিত নহে। সুতরাং কপোত স্থানান্তরিত হইবার কালে, পিঞ্জরের অভ্যন্তর দিয়া বাহিরের সমুদয়ই দেখিতে পায়। নিশ্চয়ই অনেক উত্তুঙ্গ ও সুবৃহৎ পদার্থ তৎকালে ইহার নয়ন-গোচর হয়। এই জন্য গৃহ হইতে দূরে নীত হইলেও, ইহার সহসা পথ বা দিগ্‌ভ্রান্তি ঘটে না। পরে, যখন সেই দূর স্থান হইতে ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহা পরিচিত পদার্থগুলি লক্ষ্য করিয়া অনায়াসে আপন আবাসে প্রত্যাগমন করে। ক্রমশঃ এই দূরত্বের সীমা বৃদ্ধি করিতে হয়। এইরূপে অভ্যস্ত হইলে একটি কপোত ৩০০ কিলোমিটার (১ কিলোমিটার=১০৯৪ গজ) দূর হইতে স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ দীর্ঘ ভ্রমণের পর ইহাকে ছয় দিবসের বিশ্রাম প্রদান করা আবশ্যক। যুবক কপোতদিগকেও শিক্ষা দিবার সময় দুইটি আড্ডার মধ্যে,—অর্থাৎ একবার কোন আড্ডা হইতে উড়াইয়া স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিলে পর, ইহাদিগকে তিন দিবসের বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন।

সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কপোতের জন্য প্রথম বৎসরে এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রয়োজন ;—একটি কপোত প্রথমবারে যতখানি দূর উড়িয়া আসিতে পারে, দ্বিতীয়বারে তাহাকে প্রথমবারের দূরত্বের সহিত উহার অর্দ্ধেক যোগ করিয়া যতদূর হয়, ততদূরে লইয়া গিয়া ছাড়িতে হইবে। অর্থাৎ যদি প্রথমবারে বার ক্রোশ অন্তর হইতে উড়িয়া আসিয়া থাকে, দ্বিতীয়বারে (১২+৬) ১৮ ক্রোশ অন্তর হইতে উড়াইতে হইবে। তৃতীয় বারে (১৮+৯) ২৭ ক্রোশ অন্তর হইতে উড়াইতে হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ শিক্ষা দিলে ইহারা চারিশত হইতে পাঁচশত কিলোমিটার পর্য্যন্ত দূর হইতে উড়িয়া আসিতে সক্ষম হয়। সুশিক্ষিত হইলে কপোতেরা এইরূপে অনেকদূর ভ্রমণ করিয়াও গৃহে প্রত্যাগত হইয়া থাকে। একদা স্পেনের একটি কপোত কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিনে এক স্থান হইতে উড্ডীন হইয়াছিল। ঐ স্থান উহার আবাস হইতে ৯৮০ কিলোমিটার অন্তর। সুদক্ষ কপোতটি ৬ ঘণ্টার মধ্যে এই দূরপথ অতিক্রম করিয়া সেই দিবসেই আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল।

সামরিক কপোতদিগকে কোন কোন স্থানে গ্রীষ্ম ও বসন্তকালেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু কোজিয়ে বলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিলে যখন যে কোন কালেই কপোতদিগকে আপনাদের কার্য্যকারিতার পরিচয় দিতে হইবে, তখন সকল কালেই উহাদিগের শিক্ষা পাওয়া উচিত। বিশেষতঃ, শীত, কুজ্ঝটিকা, ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতিতে ইহাদিগকে অনেক প্রকারের প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা সহিতে হয়। বস্তুতঃ শীত-কালে কপোত উড্ডীন করিলে শতকরা ৪৩টি করিয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

কোজিয়ে তৎপরে এক এক সামরিক কপোত-আড্ডায় কি সংখ্যায় কপোত রাখা উচিত এবং আড্ডায় কপোতের গমনাগমনের সুবিধার জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন। যদিও তাহা সম্পূর্ণরূপে সমরবিভাগের পক্ষেই বিশেষ জ্ঞাতব্য, তাহা হইলেও আমাদিগের সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত অনাদৃত হইবে না বলিয়া আমরা কতক অংশ এস্থলে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

তিনি বলেন, প্রত্যেক কপোত-আড্ডায়, উহার সহিত যতগুলি বিভিন্ন ষ্টেশনের সংযোগ আছে, ততগুলি স্বতন্ত্র কপোত নিবাস থাকা আবশ্যক। পারির সহিত উহার উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে দশটি স্বতন্ত্র ষ্টেশনের যোগ আছে। সুতরাং পারিতে দশটি ভিন্ন ভিন্ন কপোত-নিবাস সংস্থাপিত। এইরূপ এক একটি স্বতন্ত্র ষ্টেশনের জন্য এক একটি স্বতন্ত্র কপোত-নিবাস থাকিলে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে নীত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় কোন কপোতকে আর পথ অন্বেষণ করিতে হয় না। কেননা, এক এক কপোত-নিবাসের কপোত কেবল এক নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশন হইতে এক নির্দ্দিষ্ট পথে আসিতেই অভ্যস্ত হয়। এইরূপ বন্দোবস্ত থাকিলে শিশু কপোতগণ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হইতে না হইতেই আপনাদিগের পথ এমন চিনিয়া লয় যে, দুই শত

কিলোমিটার দূর ব্যবধান হইতে ছাড়িলেও তাহাদের আবাসে প্রত্যাগমন করিবার সম্ভাবনার অনুপাত ১ : ৩। অর্থাৎ চারিটির মধ্যে অন্ততঃ একটি নিশ্চয়ই স্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। পথিমধ্যে পথভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত, শিকারীর গুলি, হিংস্র পক্ষীর আক্রমণ, ঝড়, শীত ও হিমানীর প্রখরতা প্রভৃতি কারণ জন্য কপোতের নিরাপদ প্রত্যাগমন অসম্ভবিত হইতে পারে। উপর্য্যুল্লিখিত অনুপাতাঙ্কের মধ্যে এই কারণ গুলিকেও সেই জন্য গণনীয় করা হইয়াছে। এই জন্য কোন ডেস্পাচ বা সংবাদ নিশ্চিত পৌঁছিবার জন্য একাধিক কপোত প্রেরণ আবশ্যক। অর্থাৎ তিনটি বা চারিটি কপোতের সহিত কোন সংবাদ পাঠাইলে, উহা ক্ষোয়া যাইবার আশঙ্কা থাকিবেক না।

প্রত্যেক সামরিক কপোত আড্ডায় সাধারণতঃ ৭২০টি কপোত থাকে। (এই সংখ্যা নিতান্তই অনিশ্চিত ও আনুমানিক। সামরিক অধ্যক্ষদিগের বিবেচনানুসারে সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।) তবে যদ্যপি কোন নগর ছয় মাস কাল অবরুদ্ধ হয় এবং প্রতি দিন সংবাদ প্রেরণের আবশ্যক থাকে, তাহাহইলে প্রত্যহ ৪টি, (৪টির কম পাঠাইলে সংবাদ পৌঁছানর তত সুনিশ্চিততা থাকেনা) ৩০ দিনে ১২০টি ; ছয় মাসে ৭২০টি কপেতের আবশ্যক হইবে। প্রত্যেক দুটি ষ্টেশনের মধ্যে দুই শত কিলোমিটারেরও অল্প ব্যবধান থাকা উচিত। কারণ, সাধারণতঃ একটী কপোত এক দমে ৫০ হইতে ১৫০ কিলোমিটার চারি ঘণ্টায় যাইতে পারে। অধিক দূর ভ্রমণের আবশ্যক হইলে অপেক্ষাকৃত পুরাতন ও বয়স্ক কপোত ব্যবহারে ফল দর্শিবার সম্ভাবনা অধিক। অত্যধিক দূর হইলে, কেবল প্রাচীন কপোত প্রেরণেই সংবাদ প্রাপ্তির সুনিশ্চিততা অবধারিত করা উচিত নহে। তাদৃশ কপোতের সংখ্যার উপরই অনেক নির্ভর করে। কোজিয়ে বলেন সাধারণতঃ প্রত্যেক পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্ব-বর্দ্ধনের সহিত এক একটী কপোত সংখ্যাও বৃদ্ধি করা উচিত। নিম্নের তালিকা ইহা বিশদ করিবে।

২৫০	কিলোমিটারের জন্য	৫টি কপোত	১—২ বৎসর	বয়ক্রম।
৩০০	"	" ৬টি "	২—৩ "	"
৩৫০	"	" ৭টি "	৩—৪ "	"
৪০০	"	" ৮টি "	" " "	"

অবশ্য কপোতের বয়ঃ পরিমাণ তত অধিক বিবেচ্য নহে। সুদক্ষ কপোত ও উহার সংখ্যার উপরই কোন সংবাদ প্রাপ্তির নিশ্চিততা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

সকল দেশেই সামরিক বিভাগের আভ্যন্তরীণ কার্য্য কলাপ অতি সংগোপনে ও সাধারণের অগোচরে সম্পন্ন হয়। দেশ-সংরক্ষণের বিবিধ পন্থা তত্তৎ দেশীয় সামরিক কর্ম্মচারী ব্যতীত অপর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বার্ত্তাবহ কপোতের শিক্ষাদান রীতি, সংখ্যা, আড্ডা প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত সংবাদ পাওয়া দুরূহ। প্রত্যেক

জাতির .উহা নিজস্ব। সুতরাং উপরে কোজিয়ের পুস্তিকা অবলম্বন করিয়া যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তাহা বার্ত্তাবহ কপোত সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য।

এ পর্য্যন্ত যতদূর বলা হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, শিক্ষিত কপোতগণ কেবল বাহির হইতেই স্বাবাসে সংবাদ আনিতে পারে; কিন্তু স্বাবাস হইতে অন্যত্রে বা যথা তথা সংবাদ পরিচালনা করিতে সক্ষম নহে। পারির কপোতগণ প্রাদেশিক বিভিন্ন স্থানে নীত হইয়া সংবাদ-সহ কেবল পারিতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারিত; পারি হইতে অন্য কোন স্থানে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিত না। প্রত্যুত কপোতের এই একটী স্বাভাবিক গুণকেই শিক্ষা ও অভ্যাস দ্বারা উৎকর্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইয়া সুচতুর মানব উহাদ্বারা আপনা-দিগের এত মহদুপকার সাধন করিয়া লইয়া থাকে। বার্ত্তাবহ কপোত জাতি স্বভাবতঃ আপন জন্মস্থানকে অতিশয় ভালবাসে। ইহাকেই তাহাদের Homing instinct বা স্বাভাবিক জন্মস্থান প্রিয়তা কহে। অন্য শ্রেণীর কপোতের মধ্যে এই স্বাভাবিক গুণ এত অধিক ভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। বার্ত্তাবহ কপোত অথবা, (ইহাদিগের বাসস্থান প্রিয়তার জন্য ইহাদিগকে যেমন বলা হয়,) গৃহী কপোত আপন নীড়, শাবক, ও স্বীয় সহচরীকে অতিশয় ভালবাসে। এই স্বাভাবিক ধর্ম্মের জন্যই ইহারা অনেক দূরে নীত হইয়াও স্বাবাসে প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হয়। এই স্বভাবধর্ম্ম ব্যতীত গৃহে ফিরিয়া আসিবার আরও একটী বিশেষ আকর্ষণ আছে। নিরূপিত সময়ে আহার। দেখা গিয়াছে অন্য সময়ে কপোত যেখানে থাকুক না কেন, আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ে উহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবে। খাদ্যের আকর্ষণ কিরূপে ও কত পরিমাণে কপোতদিগের দূরপথ অতিক্রম করিবার পক্ষে শিক্ষা দান করিতে পারে, নিম্নলিখিত গল্পটী হইতে তাহা বিশেষরূপে অনুমিত হইবে।

লা পেরডি রু নামক একজন অতি সুপ্রসিদ্ধ কপোত-পালক কাসিয়ে নামক অপর একজন খ্যাতনামা কপোত-পালককে একটী কপোত দিয়াছিলেন। কাসিয়ে ইঁহাকে অন্য একটীর সহিত 'যোড়' বাঁধিয়া নিজ গৃহে রাখিলেন, এবং পরে যখন দেখিলেন উহা উহার সঙ্গিনী কপোতের সহিত সম্যক রূপে মিলিত হইয়াছে এবং সর্ব্বদা উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে, তখন উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। অর্থাৎ এত দিন উহার পালকগুলি বদ্ধ ছিল, ভাল উড়িতে পারিতনা; এক্ষনে বন্ধন খুলিয়া দিলেন। লা পেরডি রুর কপোত সম্পূর্ণরূপেই পূর্ব্বাবাস ভুলিয়া গিয়াছিল; কাসিয়ে কপোতনিবাসকেই আপন আবাস করিয়া সঙ্গিনী কপোতের অনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদা থাকিত। কিন্তু কাসিয়ে একদা শিক্ষার নিমিত্ত স্বীয় কপোতদিগকে মাঠে খুঁটিয়া খাইবার জন্য ঘরে আহার দেওয়া রহিত করিয়া দিলেন। ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া লা পেরডি রুর কপোত পূর্ব্বাবাস স্মরণ করিল এবং দলস্থ অন্য কপোতদিগের সহিত

মাঠে চরিতে না গিয়া প্রত্যহ দুইবার, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, নিয়মিতরূপে রুর কপোত নিবাসে আসিত। উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিয়া পুনরায় কাসিয়ের গৃহে প্রত্যাগমন করিত।

কপোতের এই স্বাভাবিক গৃহ প্রিয়তাকে আরো ফুটন্ত করিয়া মনুষ্যেরা বার্ত্তাবহ কপোতদিগকে কার্য্যকারী করে। গৃহ ও খাদ্যের লোভে ইহারা অনায়াসে অতি দূর পথও অতিক্রান্ত হইয়া আসিতে সক্ষম হয়। দূর স্থান হইতে পথ-নির্ণয় করিয়া আবাসে প্রত্যাগমন সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করিতেন যে, এক স্বতঃ নিহিত শক্তি (Instinct) বলে ইহারা এইরূপ করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। দৃষ্টি-শক্তিই ইহাদের একমাত্র সহায়। আকাশে উড্ডীন হইলে পৃথিবীর অনেক দূর এক কালে দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। বেলুনারোহীগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। একটু ঊর্দ্ধে উঠিলে যে, অনেকদূর সহজেই দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসে, ইহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কপোতগণও তাই যখন আকাশে উড্ডীন হয়, অনেকদূর পর্য্যন্ত এককালে দেখিতে পায়। স্বাবাসের নিকটস্থ কতিপয় উচ্চ নিদর্শন নিশ্চয়ই ঠিক করিয়া রাখে। দূর হইতে আসিবার কালে সেই সেই নিদর্শন লক্ষ্য করিয়া অনায়াসে স্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাতে আর কোন অদ্ভুতত্ত্ব নাই। এদেশে কাকগণ ও অন্যান্য পক্ষীরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কুলায় পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে অনেক দূরে চলিয়া যায়। সন্ধ্যাগমে আবার স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবৃত্ত হয়। কাহারো পথ-ভুল হয় না। স্বাভাবিক গৃহ-প্রিয়তা ও দিক-নির্ণয় জ্ঞান এই দুই গুণে অপেক্ষাকৃত কষ্টসহিষ্ণু ও উড্ডীয়ন-ক্ষম কপোত বহুদূর হইতেও অনায়াসে স্বাবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহাদিগের এই দুই শক্তি ক্রমশঃ এইরূপ পরিস্ফুট হয় যে চারি পাঁচ শত মাইল অতিক্রম করিয়া স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন করে। আজও বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেলেস নগরে প্রতি বৎসর কপোতদিগের উড্ডীয়ন ক্ষমতার প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। ব্রসেলেস হইতে লইয়া গিয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ ভাগে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং কপোতগণ ব্রসেলস বা উহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে পুনরাগমন করে। দূর হইতে আসিবার কালে দৃষ্টিশক্তিই যে কপোতের একমাত্র সহায়, এ সম্বন্ধে একবার যে একটী পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা হইতেই নিঃসন্দেহ-রূপে প্রতীতি হয়। একদা কতকগুলি ব্রসেলস পায়রাকে ইটালীর রাজধানী রোমে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহারা দক্ষিণ ফ্রান্স হইতে বেলজিয়মে আসিতেই অভ্যস্ত। ব্রসেলস হইতে রোম প্রায় ৯০০ মাইল অন্তর। ইহার অর্দ্ধেক স্থান কপোতদিগের সম্পূর্ণ অপরিচিত! বিশেষতঃ উত্তুঙ্গ আল্পস পর্ব্বত-শ্রেণী কোন প্রকারের সুপরিচিত নিদর্শনকে সম্পূর্ণরূপেই কপোতদিগের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই নিমিত্ত যে কয়েকটি কপোত বহু দিবস পরে বেলজিয়মে প্রত্যাগত হইয়াছিল, তাহারা ভূমধ্য-সাগরের উপকূল দিয়া উড়িতে উড়িতে দক্ষিণ

ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে তথাকার পরিচিত নিদর্শন দেখিয়া পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ইহারা স্বাবাসে প্রত্যাগমন করে। যদি বাস্তবিকই ইহাদিগের কোন এক স্বাভাবিক বোধ শক্তি থাকিবে, তাহা হইলে কি নিমিত্ত এতদিনের পর আর এরূপ বক্র পথ অবলম্বন করিয়া ইহারা প্রত্যাগমন করিবে। দৃষ্টি ও দিক্-নির্ণয় জ্ঞান যে ইহাদিগের এক মাত্র পরিচালক ইহাই তাহার অকাট্য প্রমাণ।

সামরিক কপোতকে সাধারণতঃ কেবল কোন এক দূরবর্ত্তী স্থান হইতে ছাড়িয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাওয়া আসা শিক্ষা দেওয়া হয় না। অন্ততঃ সামরিক উদ্দেশ্যে এরূপ শিক্ষা প্রদানের বিষয় বিখ্যাত ফরাসী কপোতপালকগণ উল্লেখ করেন নাই। তবে এরূপ শিক্ষা প্রদান যে অসম্ভব নহে, তাহা বেশ বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত রুর কপোতের কাসিয়ের গৃহ হইতে খাদ্যাভাবে রুর অর্থাৎ উহার প্রাচীন নিবাসে প্রত্যাবর্ত্তন গল্প হইতেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, আরণ্য পক্ষীরা আপনাদের ও আপনাদের শিশু শাবকদিগের জন্য খাদ্যান্বেষণ করিতে গিয়া কিরূপে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতাটিকে পরিস্ফুট ও পরিবর্দ্ধন করে। সুচতুর মনুষ্যেরা কপোতের এই স্বাভাবিক গুণকেই কৌশলক্রমে শিক্ষিত ও আরো ফুটন্ত করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন করাইতে পারে এবং তৎসাহায্যে অনায়াসে সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ করিতে পারে।

মনে করা যাউক যে এক জন একটি কপোতকে এক স্থানে কেবল শুষ্ক খাদ্য দিল, এক বিন্দু জলপান করিতে দিল না। অন্য এক স্থানে লইয়া গিয়া ইহাকে জলপান করাইল কিন্তু আর কোনরূপ খাদ্য দিল না। কিয়দ্দিন প্রত্যহ এইরূপ করিলে কপোতটী আপনাপনিই এক স্থানে আহার ও অন্য স্থানে পান করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। তখন অনায়াসেই কোন দুটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে এইরূপ কপোত দ্বারা প্রত্যহ সংবাদ আদান প্রদান চলিতে পারে। অবশ্য, এরূপ অভ্যাস সাধন অতি অল্প দূর ব্যবধানের মধ্যেই সম্ভবিত হইতে পারে। ওলন্দাজগণ একবার যাওয়া আসা করিবার জন্য কতকগুলি কপোতের পরীক্ষা করিয়াছিল। কপোতগণ ত্রিশ কিলোমিটার ব্যবধান অতিক্রম করিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে পুনরায় নিরাপদে প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক জন কপোতপালক যিনি স্বচক্ষে এই পরীক্ষা দর্শন করিয়াছিলেন তিনি বলেন যে দক্ষিণ হলণ্ডের অন্তঃপাতী লিডেন নগর হইতে কপোতদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহারা সকলে ২—৫ মিনিটের সময় হার্লামে (উত্তর হলণ্ডের অন্তঃপাতী আর একটী নগর) উপস্থিত হয়। উপস্থিত হইয়াই, এক মুহূর্ত্ত নষ্ট না করিয়া, নিতান্ত পথশ্রান্ত ও ক্ষুৎপীড়িত পথিকের ন্যায় আহার করিতে লাগিল। তিন কোয়ার্টারের পর কপোত-নিবাসের দ্বার অবারিত

দেখিলে, উহারা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইয়া ২০ মিনিটের মধ্যে লিডেন্ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই কপোতদিগের মধ্যে দুইটি অবিশ্রান্ত ভাবে ক্রমাগত নয় মাস এইরূপ করিয়া বার্ত্তাবহন করিত। চারিটি আপনাদিগের স্বেচ্ছাক্রমে সকল ঋতুতেই এইরূপে এই দুই স্থানের মধ্যে প্রত্যহ যাতায়াত করিত। হলণ্ডবাসীগণ যে উপায়ে কপোতদিগের ঈদৃশ আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিকাশ করিত, তাহা উহারা ভিন্ন অপর কেহ জানে না। জিজ্ঞাসা করিলে বলে ইহা বলিবার নয়। বস্তুতঃ ইহাতে গুপ্ত প্রণালী বা নিয়ম আর কিছুই নাই। শুদ্ধ আহার এক স্থানে আর পানীয় অন্য স্থানে, এইরূপ অভ্যাস করাইলেই কপোত অনায়াসে কোন দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে গমনাগমন করিতে অভ্যস্ত হইতে পারে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সামরিক কপোত আড্ডা বর্ত্তমান য়ুরোপের সর্ব্বত্রেই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ড ব্যতীত অন্য তাবৎ য়ুরোপীয় রাজ্য বার্ত্তাবহ কপোত-নিবাস স্থানে স্থানে সংস্থাপন করিয়াছে। অবশ্য দুর্গ, পরিখা, সেনা-নিবেশ প্রভৃতি নানাবিধ দেশ সংরক্ষণ বিধান কেবল তত্তৎ দেশীয়দিগেরই নিজস্ব; অপর কাহারও জানিবার নয়। তথাপি কয়েক বৎসর হইল ফরাসী বৈজ্ঞানিক পত্র লা নেচারে বিভিন্ন দেশের কপোত আড্ডার একটী মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যায় ফ্রান্সে ১৯টী, স্পেনে ১৮টী, প্রশিয়ায় ১৭টী, পর্ত্তুগালে ১৪টী, ইটালীতে ১৪টী, অস্ট্রিয়ায় ৭টী, রুশিয়ায় ৫টী, এবং সুইজার্লণ্ডে ৪টী সামরিক কপোত আড্ডা সংস্থাপিত আছে। অধিকাংশ আড্ডাগুলি রাজধানীর সহিত সংযোজিত। রাজকীয় ব্যয়ে কপোত নিচয় প্রতিপালিত ও নিয়মিতরূপে শিক্ষিত হয়। বেলজিয়মে এরূপ কপোত আড্ডার প্রয়োজন হয় না। কারণ সেখানে লোকে ঘরে ঘরে শিক্ষা দিয়া থাকে। যুদ্ধ বা অবরোধের সময়, আবশ্যক হইলে, এই সমুদয় সাধারণ লোকের কপোত দেশের জন্য অনায়াসে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফ্রান্সেও অনেকে পায়রা পুষিয়া থাকে। সম্প্রতি পারি নগরে কপোতের সংখ্যা গণনা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় পারিতে একাদশ সহস্র পায়রা আছে। তন্মধ্যে পাঁচ সহস্র শিক্ষিত। উপনগরে সাত সহস্র তন্মধ্যে তিন সহস্র শিক্ষিত। রুবৈ নামক এক স্থানে এক লক্ষ অধিবাসী। কিন্তু পঞ্চদশ সহস্র কপোত। ইহার সন্নিকটে অপর একটী গ্রামে দশ হাজার লোক বাস করে, কিন্তু প্রায় তিন হাজার পায়রা তথায় আছে। সমস্ত ফ্রান্সে প্রায় এক লক্ষ শিক্ষিত কপোত আছে। আর ফ্রান্সের সাত চল্লিশটী প্রাদেশিক বিভাগের প্রত্যেক বিভাগেই কপোতপালকদিগের এক একটী মণ্ডলী আছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় ফ্রান্সে বর্ত্তমানে কপোত-শিক্ষার আধিক্য কত।

শ্রীশ্রীপতি চরণ রায়।

স্বরলিপি।

মহীশূরী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

চির বন্ধু, চির নির্ভর, চিরশান্তি
তুমি হে প্রভু!
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ!
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চিররজনী।

মহীশূরী পূর্ণ ষড়জ—তাল একতালা।

(একি) লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ প্রাণেশ হে!
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে।)
বিকশিত প্রীতি কুসুম হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
পুলকিত চিত কাননে।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
কিরণ মগন গগনে।

মাদ্রাজী সিন্ধু—কাওয়ালি।

অন্তরের ধন, প্রাণ-রঞ্জন, স্বামি।
এসেছি হেথা আজি তোমারি আশে।
প্রেম-চন্দ্র! তোমা হেরি দুখ-ঘন দূরে যায়
বিমল জোছনা ভায়, আনন্দ বিকাশে।
সুন্দর মূরতি হেরিয়ে বিস্মিত মোহিত আমি;
সঙ্গীত শুনি অন্তরে, সুধাময় তব বাণী।

স্বরলিপি।

মহীশূরী থাম্বাজ—ঠুংরি।

[প১ প১ । ধ২ । —১ ধ১ । প১ ধ১ । পধ১ নো১ । ধপ১
চি র ব — ন্ধু চি র নি র্ ভ
শেষ

ম১ ।] গ১ ম১ । ধধ১ প১ । —১ প১ । গম১ পধ১ । নর্স২
র] চি র শা — — ন্তি তু মি হে

—১ নো১ । ধপ১ ম১ ‖ ধ১ ন১ । র্স১ ন১ । র্স১ প১ । পধ১
— — প্র ভু তু মি চি র ম — ঙ্গ
(আ—প্র) ত ব জ য় স — ঙ্গী

নো১ । ধনো১ র্স১ । ন২ । র্স২ । —২ । র্সনো১ ধপ১ । মগ১
ল স — খা হে — — — —
ত ধ্ব — নি ছে — — — —

ম১ । ধ১ ন১ । র্স১ ন১ । র্স১ প১ । পধ১ নো১ । ধনো১
— তু মি চি র ম — ঙ্গ ল স
— ত ব জ য় স — ঙ্গী ত ধ্ব

র্স১ । ন২ । র্স২ । —২ । র১ র্স১ । নো১ ধ১ । পমগ১ ম১
— খা হে — তো মা র জ গ তে
— নি ছে — তো মা র জ গ তে

ধ১ ন১ । র্স১ ন১ । র্স১ ধ১ । ধনো১ র্স১ । নো২ । ধপ১ মগ১ । ম২ ।
তু মি চি র ম — ঙ্গ ল স খ্য — হে
ত ব জ য় স — ঙ্গী ত ধ্ব নি — ছে

ধ১ ন১। র্স১ ন১। র্স১ প১। পধ১ নো১। ধনো১ র্স১।
তু মি চি র ম — ঙ্গ ল স —
ত ব জ য় স — ঙ্গী ত ধ্ব —

ন২। র্স২। —২। —১ ধ১। ধনো১ র্সর১। র্গ২। —২। র্গর২। র্স১
খা হে — — — চি র স — ঙ্গী চি
নি ছে — — — চি র দি — বা চি

র্স১। র্গর১ র্স১। নোধ১ পম১ ॥ [প১ প১। প২।
র জী ব নে — [চি র শ্রী
র র জ নী — (আ—প্র)

ধনো১ র্স১। নো১ ধ১। র্সনো১ ধ১। পমগ১ ম১। ধ১ প১।
তি — সু ধা নি র্ ঝ র তু মি

নো২। —১ ধ১। পধ১ নোধ১। র্স২। নোধ১ প১।]
হে — — হৃ দ য়ে শ —]

মহীশূরী পূর্ণষড়জ—একতালা।

নর্স১ রর্স১ ন১। *
লা — —
[ন১ র্স১ ন১। প২ ম১। মগো২ গো১। র১ ন্১ স১। —১
[লা — — ব ণ্যে পূ র্ণ প্রা — ণ —

র১ গ১। ম১ গ১ গ১। পম৩। { —১ ন১ ন১। }] —৩। ম৩।
প্রা — ণে — শ হে { — এ কি }] — আ
শেষ

পুনরাবৃত্তির কালে উপরের সুর গাইতে হইবে।

ম১ ম১ র১ । গো৩ । গো১ র১ স১ । র৩ । সরস১ ন্১ ন্১ ।
ন ন্ দ ব স ন্ ত স মা — গ

স৩ । —১ ন১ ন১ ॥ র্গো১ র্গো১ র্´১ । র্ম র্গো২ র্গ১ । র্´২
মে — এ কি বি ক শি ত — প্রী
(আ—প্র) হ র ষ গী ত উ

র্´১ । র্´১ র্স১ ন১ । র্স৩ । —১ নর্স১ র্´র্গর্ম১ । র্ম৩ । র্ম১ র্ম১
তি কু সু ম হে — — — আ ন ন্
চ্ছ সি — ত হে — — — আ ন ন্

র্´১ । র্গো৩ । র্গো১ র্´১ র্স১ । র্´৩ । র্সর্´র্স১ ন১ ন১ । র্স৩ । —৩ ।
দ ব স ন্ ত স মা — গ মে —
দ ব ব ন্ ত স মা — গ মে —

র্গো১ র্গো১ র্´১ । র্ম র্গো২ র্গো১ । র্´২ র্´১ । র্´১ র্স১ ন১ । র্স৩ ।
বি ক শি ত — প্রী তি কু সু ম হে
হ র ষ গী ত উ চ্ছ্ব সি ত — হে

—১ নর্স১ র্´র্গো১ । র্´র্´১ র্সর্স১ নোনো১ । পপ১ মম১ রর১ । সস১

রম১ পনো১ । র্সর্´১ র্গো২ । র্গো১ র্গো১ র্´১ । র্ম র্গো২ র্গো১ । র্´২
— — — — বি ক শি ত — প্রী
— — — — হ র ষ গী ত উ

র্´১ । র্´১ র্স১ ন১ । র্স১ ন১ প১ । ম১ গো১ র১ । গো১
তি কু সু ম পু ল কি ত চি ত কা
চ্ছ সি — ত কি র ণ ম গ ন গ

গো১ ম১ । ন১ ন১ ন১ ॥ [ম১ প১ ম১ । গো১ গো১ র১
ন নে — এ কি [জী — — ব ন ল
গ ণে — এ কি (আ—প্র)

মগো৩ । র১ ন্১ স১ । ন্১ স১ ন্১ । স১ গো১ র১
তা অ ব ন তা — — ত ব চ

মগো১ র১ গো১ । ম৩ । —৩]
র — — ণে —]

* মাদ্রাজী সিন্ধু—কাওয়ালী।

র২ র১ ম১ । —১ পধ১ নোর্স১ নোধ১ । প৪ ॥ —২ মপ১ মপ১
অ স্ত রে — র — — ধ ন প্রাণ র

শেষ।

মগো১ রস১ স২ । —২ র১ ম১ । রগোম১ গোর১ স২ ।
— ন্ জন্ — স্বা — মী — —

র২ র১ ম১ । —১ প১ ধ১ ম১ । প৪ ॥ [—২ প১ প১ ।
অন্ ত রে — র — — ধন [— এ সে

---

* ফাল্গুন মাসের তত্ত্ববোধিনীতে এই সুরটীকে ভুলক্রমে মহীসূরী ভজন নামে অভিহিত করা হইয়াছে।' ইহা ভজনের সুর আদৌ নহে, এবং মহীসূরীও নহে। ইহাকে মাদ্রাজী সিন্ধু বলিবার সার্থকতা এই পর্য্যন্ত যে ইহা জনৈক মাদ্রাজী গায়কের নিকট হইতে শিক্ষিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীতে ইহাকে একতালা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভুল হইয়াছে, তাহাতে যে সুর যতক্ষণ স্থায়ী হওয়া উচিত তাহার অপেক্ষা কম ক্ষণ স্থায়ী হইয়া সুরের চেহারা বদ্‌লিয়া গিয়াছে।

শ্রীস—

প১ ধ১ র্স১ র্স১ । —৪ । নর্স১ র্র১ র্র১ র্গোর্১ । র্স৪ ।]
ছি — ·হে থা — আ — জি — —]

র্স১ র্র১ র্সনো১ ধপ১ । —১ প১ প১ ধপ১ । মপ১ ধপ১ মগো১
তো — মা — — রি আ — শে — —

রস১ ॥ —২ ধ১ নো১ । ধ১ প১ প১ ধপ১ । ম১ প১ মগো১
(আ-প্র) — প্রে ম চ — ন্দ্র — তো মা হে

রস১ । স৪ । ধ১ র্স১ ধর্স১ নোধ১ । প৩ ধপ১ । ম১ প১
— রি প্রে ম চ — ন্দ্র — তো মা

মপম১ গোর১ । স৪ । ধ২ নোধ১ প১ । প১ ধ১ প১ ধপ১ ।
হে — রি প্রে ম — চ — ন্দ্র —

ম১ প১ মগো১ রস১ । স৪ । —২ সস১ স১ । স৪ । —২ রগ১ গ১ ।
তো মা হে — রি — দুখ ঘ ন দূ রে

ম৪ । প১ পধ১ নোর্স১ র্স১ । ধর্স১ নোধ১ প১ ধপ১ । ম৪
যা য় প্রেম — ম চ — ন্দ্র — তো

প১ মগো১ রস১ । স৪ । সস১ স১ স২ । —২ রগ১ গ১ । ম৪ ।
মা হে — রি দুখ ঘ ন — দূ রে যায়

—২ র্স১ র্স১ । র্র১ র্র১ র্র১ র্মর্গো১ । র্রর্স১ র্র১ র্স১ প১ ।
— বি ম ল জো ছ না — ভা — য়

পধ১ 'নো১ নোধ১ প১ । —১ ধপ১ ম১ প১ । মগো১ রস১ —২ ॥
আ — ন — — ন্দ বি কা কা শে —
(আ—প্র)

(দ্রুত লয়)

ম১ স১ স১ স১ ।
সু — ন্দ র
[স২ স১ স১ । স১ স১ স২ । স১ স২ স১ । স২ স১ স১
সু ন্দ র মূ র তি হে রি য়ে বি স্মি ত

স২ র২ । গ১ ম২ ম১ ।] র্স৩ র্স১ । —১ র্র১ র্স১ নো১ ।
মো হি ত আ মি স ঙ্গী — ত শু নি

ধ১ প১ প১ প১ । র্স১ নো১ ধ১ প১ । প১ ধপ১ ম১ প১ ।
অ — স্ত রে সু ধা ম য় ত ব বা —

ম১ গো১ র১ স১ ॥
— নী — —
(আ—প্র)

শ্রীমতী সরলা দেবী

সতীদেহ স্কন্ধে শিবের চিত্র-দর্শনে। *

"মহাদেবঃ সতীদেহং স্কন্ধে নিধায় নৃত্যতি।
তদ্দেহং বিষ্ণুনা ছেত্তুং ক্রিয়তেঽসৌ সুদর্শনঃ॥"

(১)

তাত মুখে শুনি নাথ-বিনিন্দন
বর্জ্জিল দেহ ভবানী,
দক্ষ-সুতা-শব আনিল সত্বর
নন্দী যথা শূলপাণি।

(২)

যোগ সমাপনে নেত্র-প্রসারণে
চাহিল, শঙ্কর ভোলা;
হেরিল সম্মুখে প্রাণহীন দেহ
ভামিনী, পাণ্ডু-কপোলা।

(৩)

কাঁপিল শঙ্কর রাগে থর থর
শূল করে করি তূর্ণ,
ভীষণ-ভাষণে আদেশিলা হর
নাশিব ভূ করি চূর্ণ;

(৪)

তাম্র জটাজূটে জাহ্নবী কল কল
ছল ছল উছল তরঙ্গ!
গর্জ্জিল দারুণ আশীবিষগণ
গর-গর-গরল-বিভঙ্গ!

(৫)

ভালে ধ্বক্ ধ্বক্ স্ফুলিঙ্গ লক লক
হুত-ভুক্ গর্জ্জন রোলে;
চন্দ্র-সূর্য্য ছুটী লোচন ঝক ঝক
ঘূর্ণিত স্মর-হর মোলে।

(৬)

পাদ-ক্ষেপনে ভূধর টলমল
ঘন ঘন ধরণী বিকম্প,
স্কন্ধে-সতী ধরি তাণ্ডব নর্ত্তনে
অবনী বিমর্দ্দন-ঝম্প।

---

* এই কবিতাটী পড়িতে (—) চিহ্নিত অক্ষরগুলিকে দীর্ঘ ও শেষ অক্ষরগুলিকে স্বর-সংযোগ করিয়া পড়িতে হইবে।

(৭)

কাঁপিল বসুমতী   সূর্য্য রোধিল গতি
পবন চলাচল রোধে ;
স্রোতস্বতী কুল   ছাড়িল কুল কুল
চমকিত গত্যবরোধে।

(৮)

বৃক্ষ শাখা পর   পাখীগণ সব
ছাড়িল কাকলি গীত ;
সিংহ, ব্যাঘ্র, গজ,   ভল্লুক, শৃগাল,
স্তম্ভিত, চিন্তিত, ভীত।

(৯)

সৃষ্টি বিনাশন   চিন্তি বিবেচন
নারায়ণ করি শেষে,
চক্র সুদর্শন   ধারি উপর
কাটিল দেহ নিমেষে।

(১০)

খণ্ড খণ্ড করি   দেশ দেশান্তরে
ফেলিল শঙ্করী দেহ,
সিদ্ধ পীট বলি   মানিত ভূতলে
পুণ্য তীর্থ এবে সেহ।

(১১)

প্রেয়সীরে তথা   না হেরি সর্ব্বথা
ইন্দ্রিয় বিকল শরীরে ;
কাঁদিল শঙ্কর   কাঁদিল ভূধর
ঝর ঝর নির্ঝর নীরে।

(১২)

যোগাসন স্বয়   সংগ্রহি সত্বর
পদ্মাসন সমাসীন ;
কুম্ভক নামক   যোগরাজ-পর
দৃষ্টি নাসা-পুট-লীন।

(১৩)

বাত রহিত ঋজু   দীপ শিখাসম
কম্পন বিরহিত অঙ্গ,
জ্যোতির্ম্ময় বপু   ভানু শতোপম
ধাঁধিল কিরণ তরঙ্গ।

(১৪)

সম্প্রতি ভীষণ   মেঘ-গরজসম
অম্বরে স্ফুরিত বাণী
শৈলরাজ গৃহে   সম্ভবি সত্বর
ত্র্যম্বকে পাইবে রাণী।

শ্রীপ্রসন্ন নাথ রায়।

সমালোচন বিদ্যা।

(সাধারণতঃ)

যে বিদ্যার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক অপরাপর বিদ্যাসমূহের তত্ত্ব নির্ণীত হয় ও যাহা বিদ্যাবিশেষের প্রসূনবর্গের পরস্পর-সম্বন্ধ নির্ণয় করে, তাহাই সমালোচন বিদ্যা। যে বস্তু যাহার চরম উপাদান, তাহাই তাহার তত্ত্ব। বিদ্যার তত্ত্ব বলিলে তিনটী পদার্থ বুঝায়—তাহার বস্তু ; সাধনের উপায়, ও ফল। যেমন ভাস্করবিদ্যার বস্তু হইতেছে, মূর্ত্তি ; সাধনের উপায়—প্রস্তরাদিতে তাহার অভিব্যক্তি; এবং ফল, তৃপ্তি। চিত্রবিদ্যার বস্তু বর্ণ ও ভাবসমন্বিত প্রাকৃতিক পদার্থ। সাধনের উপায় সেই পদার্থের পটে প্রতিফলন, এবং ফল তৃপ্তি। সঙ্গীতবিদ্যার বস্তু ভাব ; সাধনের উপায় স্বরবিন্যাস ; এবং ফল তৃপ্তি। সাহিত্যবিদ্যার বস্তু জগৎ ও পরমাত্মা, সাধনের উপায় ভাবময়ী বাক্য যোজনা এবং ফল তৃপ্তি। ব্রহ্মবিদ্যার বস্তু পরব্রহ্ম, সাধনের উপায় শ্রুত্যুক্ত সাধনচতুষ্টয় এবং ফল পরা-তৃপ্তি। এখানে দেখা যাইতেছে যে, বিদ্যামাত্রেরই ফল, তৃপ্তি এবং বস্তু কোন না কোন-রূপ সত্য, কেবল উপায়ের বিভেদেই বিদ্যার বিশেষত্ব হইতেছে।

এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিয়া বিদ্যার মৌলিক সত্য সকল নির্দ্ধারণ করা সমালোচনার প্রধান কার্য্য। তাহার পর বিদ্যার প্রসূনবর্গের দোষ গুণ আলোচনা করিয়া তাহার পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় করা সমালোচনার দ্বিতীয় কার্য্য। এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য সমালোচ্য বিদ্যার প্রসূনগুলির প্রথমতঃ দোষ গুণ বিচার করিবার আবশ্যক হয়। যেমন সাহিত্যবিদ্যার প্রথমতঃ সাহিত্যতত্ত্বগুলি নির্ণয় করিয়া পরে বিশেষ বিশেষ সাহিত্যপ্রসূনের গুণগুলি আলোচনা করিতে হয়। এই উপায়ে নাট্য, কাব্য, উপন্যাস, পারমার্থিক প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রকারের সাহিত্যের মৌলিক সত্যগুলি নির্ব্বাচিত করিতে হয়। এইরূপ সমষ্টিভাবে বিচার করিয়া পরে ব্যষ্টিভাবে গ্রন্থবিশেষের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

সমালোচন-বিদ্যা একটী আপেক্ষিক বিদ্যা। ইহার নিজের স্বতন্ত্র কার্য্যকারিতা নাই। এক দিক হইতে দেখিলে সমালোচনবিদ্যা বন্ধ্যা। অপর বিদ্যাসমূহে যে ফল প্রসব করে, অর্থাৎ আমাদের যে সকল সত্য বা সৌন্দর্য্য উপহার দেয়, সমালোচন বিদ্যা তাহার সমষ্টি বৃদ্ধি করে না, কিন্তু সেই সকল সত্য ধারণা ও সেই সকল সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

কোন্ প্রণালী অনুসারে বিদ্যার অনুশীলন করিয়া সর্ব্বজনসমাদৃত ফলোৎপাদিত হইয়াছে এবং সেই সমাদরের হেতু কি—এই বিষয় পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্য ধারণা ও সৌন্দর্য্য উপভোগের পরিবর্দ্ধক।

সমালোচনবিদ্যার দুইটী অঙ্গ। এক অঙ্গ বিজ্ঞান (Science) বা বিচার (Theory); দ্বিতীয় অঙ্গ সাধন (Art) বা আচার (Practice)। এই প্রবন্ধের আরম্ভে সমালোচনবিদ্যার বিচার-অংশমাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহার সংজ্ঞা করা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার আচার অংশের ব্যাখ্যা আবশ্যক।

সমালোচনবিদ্যার আচার অংশের লক্ষণ এই ;—যে প্রণালীতে বিদ্যা অনুশীলন করিলে ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট প্রসূন উৎপাদিত হইতে পারে, সেই প্রণালী নির্দ্দেশ—বিদ্যা দ্বারা অভীপ্সিত ফললাভের উপায় নির্দ্ধারণ।

সমালোচনবিদ্যার বিচার অংশের কার্য্য উপস্থিত বিদ্যাপ্রসূনের বিধিপূর্ব্বক গুণান্বেষণ। এবং আচার অংশের বিশেষ কার্য্য, বিদ্যাকর্ত্তৃক ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট ফললাভের উপায় নির্দ্দেশ। সমালোচনবিদ্যার আন্বীক্ষিকী বিদ্যার (Logic) সহিত অনেকটা প্রকৃতিগত সাম্য লক্ষিত হয়। আন্বীক্ষিকী বিদ্যারও দুই অঙ্গ,—বিচার ও আচার। ইহা যথাযথ চিন্তার তত্ত্বান্বেষী এবং চিন্তার যথার্থ প্রণালীর পরিদর্শক।

এক্ষণে দাঁড়ায় এই যে সমালোচনবিদ্যার সর্ব্বাঙ্গীন সংজ্ঞা করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয় ;—যে বিদ্যার দ্বারা বিচারপূর্ব্বক অপরাপর বিদ্যাসমূহের ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে তত্ত্ব নির্ণীত হয় ও যাহা বিদ্যাবিশেষের প্রসূনবর্গের পরস্পরসম্বন্ধ নির্ণয় করে এবং যাহা বিদ্যাবিশেষের অনুশীলন দ্বারা উৎকৃষ্ট ফলোৎপাদনের যথার্থ উপায় উদ্ভাবন করে তাহাই সমালোচন বিদ্যা।

(বিশেষতঃ)

কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে, সাধারণ কোন ভাব সত্য হইলেও তাদৃশ হৃদয়গ্রাহী হয় না। দুঃখশোকমাত্রেই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কিন্তু দুঃখের সেই সাধারণ ভাব অতি অল্প লোকেরই মমতা আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই দুঃখশোক আংশিক ভাবেও ব্যক্তিবিশেষে দেখিলে লোক করুণায় অভিভূত হয়। কোন কোন সংস্কৃত দার্শনিক পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, নিদৃষ্টান্ত বস্তুর ধারণা হয় না। ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা সাধারণভাবে বলা হইয়াছে তাহার বিশেষ ভাবে আলোচনার আবশ্যক। এ দেশে সাহিত্যবিদ্যাতে সমালোচনা প্রয়োগের বিশেষ অবসর দেখা যায়, এজন্য সাহিত্য সম্বন্ধীয় সমালোচনাকেই বিশেষরূপে ধরিলে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে।

যেমন অন্ধকারের দ্বারা আলোক পরিস্ফুট হয়, সেইরূপ অনেক সময় ভ্রমের দ্বারা সত্য বিকশিত হয়। সচরাচর একটী ধারণা দেখা যায় যে, সাহিত্যকর্ত্তামাত্রেই সাহিত্য-সমালোচনাক্ষম। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই ধারণাটি যতই বদ্ধমূল হউক না কেন, ইহা ভ্রমাত্মক। যে শক্তি দ্বারা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় ও যে শক্তির দ্বারা সমালোচনাকার্য্য পরিপাটীরূপে সম্পন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও

তাহারা বিভিন্ন। সাহিত্যকার প্রতিভার বলে গূঢ়তম সত্য ও সামান্যদৃষ্টিভীরু সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন। কিন্তু সেই সমুদয় আবিষ্কৃত সত্য ও সৌন্দর্য্যের তুলনা ও সম্মেলন সমালোচনার কার্য্য। সত্য বটে, যে যেমন সিদ্ধপুরুষের মণিমন্ত্র ঔষধির দ্বারা বশীভূত হইলেই ভূত তবে সেই পুরুষের কথামত অন্যের বশতাপন্ন হয়, সেইরূপ সাহিত্য-সিদ্ধ পুরুষের বশীভূত সত্য ও সৌন্দর্য্য সমালোচক প্রভৃতি সাধারণ লোকের কার্য্যে আসে। কিন্তু তথাচ সাহিত্য ও সমালোচনা—এ দুইটি বিদ্যা পরস্পরমিথুনভাবাপন্ন হইলেও বিভিন্ন। জল উত্তাপ সহযোগে বাষ্পাকারে পরিণত হয়—ইহা একটি সত্য। যে বিদ্যার দ্বারা এই সত্যটি আবিষ্কৃত হয়, তাহা এক এবং এই সত্যকে জগতের অপরাপর সত্যের সহিত মিলাইয়া যে বিদ্যার দ্বারা রেলগাড়ী তৈয়ারি করা হয়, তাহা আর এক। অপর একটি দৃষ্টান্ত লইলে বোধ হয় কথাটা আরও পরিস্ফুট হইবে। আসবাব, ছবি বা প্রস্তরমূর্ত্তি গড়া এক এবং ঐ সকল পদার্থে গৃহ সুসজ্জিত করা ভিন্ন। এই দুইটি বিভিন্ন বিদ্যা অনেক সময় এক আধারে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদের ভেদ লোপ হয় না। প্রতিভাবলে সাহিত্যকার একখানি মনোহারী সত্যাশ্রিত গ্রন্থ রচনা করিলে, সমালোচন-বিদ্যার সাহায্যে তাহার সাহিত্যদরবারে আসন নির্দ্দেশ করা হয়। যতক্ষণ গ্রন্থের আসন নির্দ্দিষ্ট না হয় ততক্ষণ মনুষ্যজীবনের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব জন্মায় না।

এ সকল কথা যথাযথ ভাবে আলোচনা করিলে দাঁড়ায় এই যে, আপনাকে ও প্রকৃতিকে পাইলেই সাহিত্য রচনা হয় কিন্তু সাহিত্যের অন্তর্গত বহু গ্রন্থের জ্ঞান না থাকিলে সমালোচনা হয় না। কিন্তু বস্তুতঃ অনেক সময় সাহিত্যরচনা ও সমালোচনা-শক্তি একাধারে এমনি মিশ্রিত ভাবে থাকে যে রচনাবিশেষ যুগপৎ সাহিত্য ও সমালোচনা শব্দের বাচ্য হয়। ডিকুইন্সি, কোলরিজ, ও মেকলের প্রতিভাপ্রসূন ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। বোধ হয় চন্দ্রনাথ বাবুর "শকুন্তলা তত্ত্ব" ও রবীন্দ্রনাথ বাবুর "হিতবাদী"তে প্রকাশিত কয়েকটী রচনা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এ সম্বন্ধে আর একটী ভ্রান্ত ধারণা সচরাচর লক্ষিত হয় তাহাও এস্থলে আলোচনার যোগ্য। অনেকে মনে করেন যে সাহিত্যের রসাস্বাদন শক্তি ও সমালোচন শক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। এ কথাটি শুনিলে একটা রূপ কথা মনে পড়ে। কোন মায়াবীর মন্ত্রবলে একটা ব্যাং রাত্রে পরমা সুন্দরী রাজকন্যা হইত এবং দিবসের আলোক গায়ে লাগিবামাত্র নিজের মূর্ত্তি ধরিত। প্রস্তাবিত ভ্রান্তধারণাটিও সেইরূপ অবিবেচনার অন্ধকারে সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু বিবেচনার আলোক লাগিবামাত্র উহা নিজের ভ্রান্তি-মূর্ত্তি ধরিবে। যাহা যথার্থ সাহিত্য তাহা সাধারণতঃ সকল লোকেরই প্রীতি আকর্ষণ করিবে, কিন্তু সাধারণ লোক তাহার যথার্থ স্থান নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম এবং সাহিত্যে সাহিত্যে মেলন ও মনুষ্য রাজার দরবারে তাহার যথা-যোগ্য আসন দান করা সমালোচনারই বিশেষ কার্য্য। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ কেহ

না ভাবেন যে আমরা সাধারণের ভোটকেই সাহিত্যের কষ্টি পাথর বলিতেছি। সর্ব্ব সাধারণের "ভোটে" যাহা মনুষ্যত্বের নিকৃষ্টসীমা তাহাই পাওয়া যায়। আজ সর্ব্ব সাধারণের ভোটে যাহা উত্তম কাল তাহা অধম হইয়া দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু মানুষের যাহা মহত্ব—মহৎ মনুষ্যের যাহা বিশেষগুণ, এক কথায় যাহা মনুষ্যত্ব তাহা স্থায়ী ও অবিচঞ্চল। সাহিত্য কেন, মনুষ্যের কৃত্য মাত্রেরই তাহা চিরকালের মানদণ্ড।

এই জাতীয় আর একটী ভ্রম এই যে সচরাচর সমালোচনা বলিলেই কোন গ্রন্থের দোষগুণ অনুসন্ধান, প্রশংসা বা নিন্দা. বুঝায়। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রণিধান করিয়া দেখিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে এইরূপ সমালোচনা অতি অকিঞ্চিৎকর, সমালোচনা নামের যোগ্যই নহে। কোন একখানি গ্রন্থের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দোষগুণ সংখ্যা করিলেও সমালোচনার উদ্দেশ্য সাধিত না হইতেও পারে।

১। গ্রন্থের দোষগুণ আলোচনা সমালোচনা নহে।

২। গ্রন্থ সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের মতামত সমালোচনা নহে।

৩। সর্ব্বকালসমাদৃত গ্রন্থের ছাঁচে আলোচ্য গ্রন্থকে ঢালিবার চেষ্টা সমালোচনা নহে।

৪। পাঠার্থীর জন্য হস্তাঙ্কিত পথপ্রদর্শনী সমালোচনা নহে।

কিন্তু সত্য মাত্রেই একটা Paradox, সত্য সত্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এজন্য তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে একবার যাহাকে "হাঁ" বলিতে হয় আর বার তাহাকে "না" বলিতে হয়। সত্য নির্ব্বাচনের এই প্রণালী অতি প্রচীন কাল হইতেই প্রচলিত। "তদেজতি তন্নৈজতি" ইত্যাদি শ্রৌত প্রয়োগই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। এই-রূপ উভয় পক্ষ নিরস্ত না করিলে সহজে সত্য নির্দ্দেশ হয় না। যদি সমালোচন বিদ্যা সত্য হয় তবে তাহার সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটিবে। সুতরাং এই মাত্র আমরা যাহাকে যাহাকে সমালোচনা নয় বলিলাম, তাহারাই আবার সমালোচনা বটে।

সর্ব্বকালসমাদৃত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সাহিত্যের যে আদর্শ জন্মে তাহাকে সমালোচকের জীবনের সহিত মিশাইয়া লইলে যে জীবন্ত আদর্শ জন্মে তাহাই সমালোচনার যথার্থ আদর্শ সেই আদর্শের সহিত সমালোচ্য গ্রন্থকে মিলাইয়া লইবার জন্য গ্রন্থের দোষগুণ আলোচনা করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের অনুকরণে পরবর্ত্তী সাহিত্য নির্জ্জীব হইয়া না পড়ে এবং মধ্যবর্ত্তীকালের শিক্ষা নিষ্ফল না হয় এজন্য সমালোচকের নিজের অনুভূতি অনুসারে মতামত প্রকাশ করিতে হয়। নিজের খেয়ালের দ্বারা সাহিত্য কলুষিত না হয় এজন্য সমালোচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। সমালোচনা পাঠার্থীর পথ প্রদর্শনী না হউক, সুরুচির মন্দিরের সাধারণ পথপ্রদর্শক সমালোচনা ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

যেমন গ্রহ উপগ্রহকে সূর্য্যের চারিদিকে স্ব স্ব কক্ষে চালিত করিবার জন্য মাধ্যা-

কর্ষণ শক্তির প্রয়োজন সেইরূপ সাহিত্য রচনাকে সত্যের সহিত সুরুচি বন্ধনে রাখিবার জন্য সমালোচনার প্রয়োজন। যেমন সমাজ রক্ষার জন্য অপরাধিগণকে বন্দী করিয়া তফাৎ করিতে হয় সেইরূপ সুরুচি রক্ষার জন্য সমালোচনার দ্বারা অপরাধী গ্রন্থকে দূর করিতে হয়। যেমন বীজ বপন কালে পরীক্ষা করিয়া বীজ লইতে হয় সেইরূপ ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে গ্রন্থ বিশেষরূপ বীজ বপন করিবার জন্য সমালোচনার আবশ্যক।

বঙ্গসাহিত্য যে এরূপ নির্জীব ও ইহার প্রবৃত্তি যে অকিঞ্চিৎকরপদার্থে সীমা-বদ্ধ, ইহার প্রধান কারণ উপযুক্ত সমালোচকের অভাব। অদ্যাবধি বঙ্গসাহিত্য যথোপ-যুক্তরূপে সমালোচিত হয় নাই। আমার মনে হয় যে বঙ্গীয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদক-গণ যদ্যপি উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বঙ্গ-সাহিত্য-সমালোচনার জন্য আমন্ত্রণ করেন তাহা হইলে সাহিত্য উন্নতির একটি সোপান নির্ম্মিত হয়।

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

নূতন ধরণের উপন্যাস।

তিন জন পাঠক নূতন ধরণের উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার মধ্যে ভদ্রকনিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষের রচনা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি পুরস্কার পাইলেন, এবং তাঁহার রচনা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কোন কোন পাঠক জানিতে চাহিয়াছেন, যে লেখক একবার এক পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তিনি পুনর্ব্বার অন্য পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠাইতে পারেন কিনা।—পারেন। আগামী ২৮ শে চৈত্রের মধ্যে যিনি সর্ব্বোত্তম পঞ্চম (শেষ) পরিচ্ছেদ লিখিয়া পাঠা-ইবেন তিনি পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতরূপ পুরস্কার পাইবেন।

নববর্ষের স্বপ্ন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রভা আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার পরই আমি ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলাম। ঘণ্টা কতক অসহ্য যন্ত্রণায় কাটিল। তাহার পর কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম টেবিলের উপর ডিসরেলির "হেনরিয়েটাটেম্প্‌ল্‌" পড়িয়া রহিয়াছে। সেক্সপীয়র কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ ও ও ডিসরেলি প্রভৃতি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস লেখকেরা অনেকেই নায়ক নায়ি-

কার প্রথম দর্শনেই মন হারানর কাহিনী লিখিয়াছেন। কিন্তু হৃদয় বলিয়া একটী পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে ঘোর সন্দেহ ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই জন্য ঐরূপ উপন্যাসে আমার বড় আস্থা ছিল না। এখন বুঝিয়াছিলাম যে প্রথম দর্শনে কেন, স্বপ্ন দর্শনেও মনোরাজ্যে একটা গুরুতর গোলযোগ ঘটিতে পারে। সেই জন্যই বোধ হয় বইখানা দেখিয়া একবার ইচ্ছা হইল যে নিজের জীবনের গত তিন চারি মাসের ঘটনা ও চিন্তার সহিত মিলাইয়া দেখি, উপন্যাসলেখক আমার মত অবস্থাপন্নের মানসিক গতি কতদূর যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। উপন্যাসটী পূর্ব্বে একবার পড়িয়াছিলাম। সুতরাং সব না পড়িয়া যে যে স্থান আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থায় ভাল লাগিবার সম্ভাবনা তাহাই পড়িতে লাগিলাম। একটু খানি পড়িয়াই কিন্তু আর ভাল লাগিল না। খোলা বই হাতে ধরিয়া ভাবিতে লাগিলাম। এখন যাহা ঘটিতে বসিয়াছে তাহাতে আমার ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না, আমার দুঃখের শান্তি হইবে না, আমার মত হতভাগ্য আর সংসারে নাই !

ভাবিতে ভাবিতে লতিকাকে শেষ আর একবার দেখিবার বাসনা হইল। একবার ভাবিলাম কেনই বা হৃদয়ের অশান্তি বাড়ান। কিন্তু কিছুতেই এই বৃথা আকাঙ্ক্ষা মন হইতে দূর করিতে পারিলাম না। সেই রাত্রেই কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার অভিলাষ হইতে লাগিল। টাইমটেবলে দেখিলাম রাত্রি ১১টার সময় একটা ট্রেন মুঙ্গের ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে ১১টার সময় কলিকাতায় পঁহুছে। কিন্তু যোগেশবাবু ও প্রভাকে কি বলিয়া বিদায় লইব। বাটী পঁহুছিয়াইবা অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিবার কি কারণ নির্দ্দেশ করিব। একবার ভাবিলাম লতিকার বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষার ভাণ করিয়া বিদায় লই। কিন্তু মনের ভাব গোপনের এই চেষ্টা যে নিষ্ফল হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম। লতিকাই যে আমার হৃদয়ের অশান্তির কারণ প্রভা তাহা বেশ বুঝিয়াছিল। এখন অকস্মাৎ এই রাত্রে ঐরূপ সামান্য কারণে কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিলে আসল কারণ সম্বন্ধে তাহার মনে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না। মানুষের উপহাসাস্পদ হইবার ভয় এতই অধিক যে লতিকাকে দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও সেই ভয়ে কুণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু মনের তোলা-পাড়া কিছুতেই গেল না। যতবার ভাবি যে "কলিকাতা যাওয়া শ্রেয়ঃ কিনা আর ভাবিব না, না যাওয়াই স্থির" ততবারই আবার তাহাই ভাবিতে আরম্ভ করি ; যেন এখনও কিছুই স্থির হয় নাই। এইরূপ অবস্থা অপেক্ষা মনের গুরুতর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না ! ক্রমেই এই অশান্তির গুরুভারে মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারিলাম না। শেষে বুঝিলাম যে যতক্ষণ কলিকাতা যাইবার উপায় থাকিবে, যতক্ষণ ১১টা না বাজিবে, যতক্ষণ ট্রেন মুঙ্গের ছাড়িয়া না যাইবে ততক্ষণ আমার ভাগ্যে এই

দুঃসহনীয় চিত্তচাঞ্চল্যের বিরাম ঘটিবে না। নিরাশ হইয়া দুই হস্তে মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলাম।

যাহার সহিত কখন বাক্যালাপ হয় নাই এবং যাহাকে জীবনে দুইবারের অধিক দেখি নাই তাহার জন্য হৃদয়ের এই ব্যাকুলতা অসম্ভব মনে করিয়া অনেকে হয় ত আমার মনের তৎকালীন অবস্থার এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে করিবেন। কিন্তু যিনি আমার মত ভুক্তভোগী তাঁহাকে আমার অবস্থা বুঝাইবার আবশ্যক নাই, আর যিনি এখনও স্বাধীন চিত্ত, এখনও আমার মত জালে পড়েন নাই তাঁহাকে বুঝাইবার প্রয়াস বিফল হইবে।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটিল। একবার উঠিয়া জানালা খুলিলাম। দেখিলাম আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধ। একটী ক্ষুদ্রতম তারার মলিন আলোকও দেখা যায় না। আমার বোধ হইল যেন আমার নবীন জীবনের বর্ত্তমান নৈরাশ্যান্ধকার ও উদ্যমহীনতা কিরূপ অস্বাভাবিক তাহা আমাকে অনুভব করাইবার জন্যই বাহ্য প্রকৃতি এই ভাব ধারণ করিয়াছে। এই সময়ে একটা ঘড়ীতে ১১টা বাজিল। আশা হইল পরে কপালে যাহাই থাকুক আপাততঃ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার অসহ্য যাতনা হইতে রক্ষা পাইলাম। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু আবার গতানুশোচনা কষ্টকর হইয়া উঠিল। ভাবিলাম হায় কেন যাইলাম না, কেন তাহাকে বিবাহ সভায় শেষ দেখিয়া লইলাম না। মনের ভিতরে ভিতরে একটা দুরাশাজনিত অনুতাপের সঞ্চার হইতে লাগিল, যেন কলিকাতায় যাইলে কত কি ঘটিতে পারিত। আমি যেন হেলায় হারাইলাম। এখন আর সব নিষ্ফল।

ক্রমে নৈরাশ্যে আমার হৃদয় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। এই সময়ে সেই নিস্তব্ধ নৈশগগন-প্রান্তে একটা ক্ষীণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। চমকিয়া উঠিলাম, বিদ্যুৎ-বেগে হৃদয়ে আশা পুনঃপ্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে সে শব্দ স্ফুটতর হইয়া সন্নিকটস্থ বৃক্ষ পত্রের মর্ম্মর শব্দে মিশাইতে লাগিল। প্রচণ্ড ঝটিকা ও বৃষ্টি আমার ঘরের রুদ্ধ জানালার কপাটে আঘাত করিতে লাগিল। বাহ্য প্রকৃতির অশান্তি যতই বাড়িতে লাগিল ততই যেন আমার হৃদয়ের অস্থিরতা ও অনিশ্চয় অপহৃত হইল। বৃষ্টির স্রোতে ঝটিকার প্রবলবেগে যেন হৃদয়ের উদ্যমহীনতা ভাসিয়া গেল। তখন আর সংশয় নাই, এখনও উপায় আছে, কলিকাতায় যাইব।

সেই যে ক্ষীণ শব্দ শুনিয়াছিলাম সে ট্রেণের বাঁশীর শব্দ। ষ্টেশনের অতি নিকটেই আমাদের বাড়ী। অল্প পরেই ট্রেণের শব্দও শুনিলাম, বোধ হইল যেন ষ্টেশনের নিকট আসিতেছে। বুঝিলাম ট্রেন আসিতে আজ বিলম্ব হইয়াছে। জানিতাম যে মুঙ্গের ষ্টেশনে গাড়ী প্রায় আধ ঘণ্টা থামে। তখন হৃদয়ের বিষম আবেগে আর পূর্ব্বাপর ভাবিবার অবকাশ পাইলাম না। যাইবার পূর্ব্বে প্রভাকে ও যোগেশবাবুকে যে বলা আবশ্যক

তাহা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। বাটী হইতে বাহির হইয়া ষ্টেশনে আসিলাম। রেলের যে কর্ম্মচারী টিকিট দিতেছিলেন তিনি আমায় চিনিতেন। টিকিট চাহিবামাত্র তিনি সাতিশয় বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া কি বলিলেন। আমার মুখ ও বেশ দেখিয়া বিস্মিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু আমি তখন এতদূর আত্মবিস্মৃত যে তিনি কি বলিয়াছিলেন ও আমি তাহার কি উত্তর দিয়াছিলাম তাহা কিছুমাত্র স্মরণ নাই। টিকিট লইয়া ট্রেনে উঠিলাম।

অতি শীঘ্রই ট্রেন ষ্টেশন ছাড়িয়া দ্রুতগতিতে পূর্ব্বমুখে চলিল। ঝড় বৃষ্টি সমান বেগে চলিতে লাগিল। আমি গাড়ীর একটী মুক্ত বাতায়ন পথে মুখ বাড়াইয়া অর্দ্ধ চেতন অবস্থায় বসিয়া রহিলাম।

মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে মন একেবারে চিন্তাশূন্য থাকিতে পারে না। আমি জানি না এই সময়ে আমার মনে কোন ভাবনা ছিল কি না, কিন্তু কোন ভাবনা মনের মধ্যে থাকা আমি অনুভব করি নাই। সমস্ত রাত্রি এইরূপ জাগিয়া ঘুমাইয়াছিলাম।

অবশেষে শ্রাবণের ধূসরবসনা ঊষা পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল। সেই প্রাতঃকালীন স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে, আমার মাথায় অনেকগুলি পাগলামী খেয়ালের উদয় হইল। লতিকার সহিত মিলনের নানারূপ অদ্ভুত ও অসম্ভব উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলাম। তখন কিন্তু সকলই অতি সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল ; তাহার মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সহজ মনে হইয়াছিল সেটী এই যে লতিকাকে আমার মনের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়া। পাঠক আপনি হাসিবেন এবং এখন আমিও আপনার সহিত যোগ দিতেছি, কিন্তু সে সময়ে ইহাতে কিছুমাত্র হাস্যকর দেখিতে পাই নাই।

গাড়ী হাওড়ায় আসিল। জনস্রোত পরিদর্শনের আর আমার তখন প্রবৃত্তি নাই। সমাজ, সাম্রাজ্য ও বাহ্য প্রকৃতির ঘোরতর বিপ্লব ও তখন আমার কাছে কিছুই নয়। আমি বরাবর বাড়ীর দিকে চলিলাম। যাইবার সময় নরেন্দ্রবাবুর বাটীর সম্মুখ দিয়া গেলাম। বাড়ীতে বিবাহের কোন উদ্যোগ দেখিলাম না, কেন তাহা ভাবিবার ইচ্ছা হইল না। তথাপি মনে অজ্ঞাতসারে আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু নরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভরসা হইল না।

বাটী প্রবেশমাত্র মাকে দেখিতে পাইলাম। মা আমায় দেখিয়াই বলিলেন "কি সুরেশ, হঠাৎ না বলিয়া কহিয়া চলিয়া আসিয়াছ কেন? যোগেশ টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছে, আমরা ভাবিতেছি। তোমার এরূপ আকার কেন, কি হইয়াছে?" মার কথা শেষ হইতে না হইতেই আমার সেই বৌ-ঠাকুরাণী আসিয়া বলিলেন "কি গগনবিহারী বিহঙ্গম নিজে পিঞ্জর খুঁজিতে আসিয়াছ? কিন্তু অন্য একটীর সন্ধান কর, অভিলষিত পিঞ্জরটী হাতছাড়া—।" আমি এই অবধি শুনিয়াছিলাম। তাহার পর

কি হইয়াছিল জানি না। কতদিন পরে চৈতন্য পাইলাম জানি না। যখন পুনর্ব্বার জ্ঞানলাভ করিলাম তখন আমি শয্যাগত। প্রভা আমার শয্যার কিছু তফাতে বসিয়া আছেন। আর বোধ হইল যেন একখানি পরিচিত মুখ—সে মুখখানি বড়ই মধুর—দ্বারের পর্দ্দার আড়ালে লুকাইল। কিন্তু চৈতন্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম এই মধুর মুখখানি সেই স্বপ্নে দৃষ্ট কিম্বা সত্যকার তাহা তখন স্থির করিতে পারি নাই।

সমালোচনা।

অপরিচিতের পত্র। লেখকের নাম নাই। শ্রীমতী বসন্তকুমারী, শ্রীমান্ অ—রিকে তাঁহার বাতায়নবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়াছেন। কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার প্রণয়পাত্রের নাম ধাম জানিয়া, এবং নিজের যথার্থ নাম ও ঠিকানা অপ্রকাশিত রাখিয়া অ—রির সহিত পত্রব্যবহার চালাইয়াছেন। মৃত্যুকালে অনুরোধ করিয়াছেন "যদি আমাদের এই পবিত্র গোপনপ্রণয়ে আমাদের কোনও দোষ হইয়া থাকে তবে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমাদের এই গুপ্ত প্রেম জগতের কাছে প্রকাশ করিও। নিজমুখে দোষ স্বীকার করিলে পৃথিবী আমাদের ক্ষমা করিবে।"

বসন্তকুমারীর এই শেষ অনুরোধ হয় বাতুলতা—নয় চূড়ান্ত নভেলিয়ানা। সত্য ঘটনা হইলে (প্রকাশক তাঁহার মন্তব্যে অন্ততঃ ভাণ করিয়াছেন যেন ইহা সত্য ঘটনা) এরূপ অনুরোধের সম্মানার্থ তাঁহাদের গোপন প্রণয় কাহিনী জগতে প্রকাশ করা নিতান্ত অবিবেচনার কাজ; কল্পিত ঘটনা হইলে নিতান্ত নিরর্থক, যে হেতু সাহিত্য হিসাবে এ গ্রন্থের কোনই মূল্য নাই।

শ্রীমান অ—রি গম্ভীরভাবে, সরলহৃদয়ে করুণরসের অবতারণা করিতে গিয়া পাঠকের প্রচুর হাস্যরসের খাদ্য যোগাইয়াছেন। তাঁহার ভূমিকা ও চিঠিগুলি অন্তঃসারশূন্য সেণ্টিমেণ্ট্যাল বাঙ্গালীচরিত্রের প্রকৃষ্ট নমুনা।
